# জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

## প্রথম খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

**Jagadish Gupta Rachanavali (Vol. I)**
**(Collected Writings of Jagadishchandra Gupta)**

**প্রথম প্রকাশ** : ১৩৬৫

**সম্পাদক** :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী
**সহযোগী সম্পাদক** :
শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**প্রকাশক** :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

**মুদ্রক** :
দুলালচন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

**প্রচ্ছদ-শিল্পী** :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

# সূচীপত্র

**উপন্যাস ঃ**



**অপ্রকাশিত নাটক ঃ**



**গল্প ও কাহিনী ঃ**

উপন্যাস

লঘু-গুরু

## ॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

টুকী ?

টুকী বলে,—উঁ ।

টুকীর ঐ আন্‌মনা জবাবটা লোকের ভারী মিষ্টি লাগে ; যার সম্মুখে পড়ে, যে দেখে, সেই ডাকে—টুকী ?—টুকী অম্‌নি স্বচ্ছন্দে সংগে সংগে সাড়া দেয়,—উঁ ।—কেউ হাসিয়া চলিয়া যায় ; কেউ তার গালে আদরের একটা ঠোনা মারে ; কেউ দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে খানিক দেখে ।

টুকী রাস্তায় লেপ্টাইয়া বসিয়া ধুলা জড় করিয়া গম্বুজ বানায়—থাবড়াইয়া থাবড়াইয়া তাহাকে মজবুত করে—আর লোকের ডাকে নির্বিকারে সাড়া দিয়া যায়, দেরী করে না, কাহাকেও বঞ্চিত করে না ।

কেবল তার জবাবটি শুনিতেই লোকের নিষ্প্রয়োজনের আগ্রহ ।

কাহারো দিকে সে মুখ তোলে না ; যে তুলিয়া দেখিতে চায় তাহাকেও নিরাশ করে না ।

প্রতিবেশিনী ত্রিনয়নী বলে,—আহা, মা-মরা মেয়েটি ।—বলিয়া নিঃসন্তানা করুণ চক্ষে টুকীর দিকে চাহিয়া থাকে ।

তার পাশের বাড়ীর উমাশশী বলে,—মেয়েটিও ম'লো বলে' ; গাড়ী চাপা ত' সেদিন পড়েইছিল ; আমাদের হীরেলাল ছুটে গিয়ে তুলে আনলে ।

জবা বলে,—টুকী ?

টুকী বলে,—উঁ ।

—রাস্তায় আর আসিস নে—বাড়ী যা ।

টুকী আর কথা কয় না—মেয়েরা খিলখিল করিয়া হাসে ।

সাথীরা আসে, বলে,—টুকী, খেলবি আমায় নিয়ে ?

টুকী তাতেও রাজী, ঘাড় নাড়িয়া ডাকে ।

টুকীর তৈরী গম্বুজটিকে ঘিরিয়া মেয়েরা বসিয়া যায়—কতরকম সৃষ্টিছাড়া কথা বলে—কোঁদল করে ; বলে,—টুকী, সুরুকে তাড়িয়ে দে ; দেখ্ না, ঝগড়া করছে—সরে বোস, কুঁদুলি ।—দুইজনে গায়ে গায়ে পড়িয়া ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দেয় ।

কিন্তু টুকী কর্তা হইয়াও তাকাইয়া দেখে না, কার ব্যবহার কি রকম, কার আচরণে কে অসন্তুষ্ট । খেলার পত্তন টুকীরই করা ; উহারা পরে আসিয়াছে, তাই টুকীর কাছে নালিশ করে ; কিন্তু বিচার না পাইয়া আইন নিজের হাতে নেয় ।

একজন বলে,—উঠে যা তুই—

—আমি যাব কেন ? তুই যা, ছুঁচলোমুখি—

—এঁ্যাঃ—খ্যাদাবার কর্তা এসেছেন । টুকী বলছে যেতে ?

টুকী থাকিতেও বলে না, যাইতেও বলে না—এবং দুই চারিটি সরোষ বাক্য বিনিময়ের পরই যে সংগ্রাম, নখর চালনায় তুমুল হইয়া ওঠে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করে না—গম্বুজ উহারাই বেপরোয়া পা চালাইয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়—তারপর ছিটকাইয়া দিক্‌-বিদিকে যাইয়া পড়ে ।

টুকী তাহাতেও রাগ করে না। আস্তে আস্তে বাড়ী যায়।

টুকীর মা নাই, বাপ আছে ; লোকে বলে, টুকীর বাবা পাষণ্ড, তার হিতাহিত জ্ঞান নাই, মমতা নাই, লঘু-গুরু বিচার নাই।

টুকী যখন মায়ের পেটে পুরা দশমাসের তখন একটি ঘটনায় অর্থাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া টুকীর মা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়—এবং টুকী ভূমিষ্ঠ হয় অকালে—তখন সেখানে কেউ ছিল না।

শৃগালে নাকি টুকীর গা শুঁকিতেছিল, হঠাৎ কে আসিয়া পড়ায় শৃগাল পলায়ন করে।

লোকে টুকীর মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে টুকীর বাবাকে, আর বলে পাষণ্ড ; কিন্তু টুকীর বাবা বিশ্বম্ভরের তাতে কিছু যায় আসে না।

বগলা বলে,—মেয়েটির কোথায় যেন ঘা লেগেছিল, মনেই বুঝি, তাই ও অমন, কথা কইতে পারে না। ছেলেমানুষ, ছল্‌বলিয়ে বেড়াবে, তা না—কেবল উঁ উঁ উঁ।

গিরিরাণী বলে,—কালা বোবা কাণা খোঁড়া হয়নি, এই ঢের, মরে নি যে সে আরো ঢের।

—মা-টি ত মরে বেঁচেছে। নিত্যি নিত্যি মিত্যু যন্তণা সওয়ার চেয়ে একেবারে যাওয়া ভাল ; বেঁচেছে সতীলক্ষ্মী।—বলিয়া টুকীর মায়ের নিষ্কৃতি লাভে বগলা সুখ বোধ করে।

কোলের ছেলের মুখে স্তন ধরাইয়া দিয়া বিনোদিনী বলে,—সোয়ামী নিয়ে হয়েছে আমাদের এক সমিস্যে। নাদুস নুদুস গণেশের মত, তা-ও ভাল নয় ; পরশুরামের মত খাঁড়াধারী তা-ও বাবু ভাল নয় ; রামের মত ভালমানুষ, কেবল বনে পাঠাতেই আছে, আর কৃষ্ণের মত ষোল শ—

—থাম্ তুই, নেকি। দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনা— মুখে পোকা পড়বে যে !

বিনোদিনী ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলে,—না, না, তুলনা কই করলাম ! মানুষের আচরণের কথা বলছি। হেই বাবা, মনে আমার পাপ নেই, বাবা।

বিনোদিনীর কাতরতা দেখিয়া ওরা হাসে।

চমৎকার বলে,—মরতে ত' হবেই সবাইকেই ; ভুগে না মরে' না হয় সোয়ামীর হাতেই প্রাণটা গেল ! জলজ্যান্ত মিত্যু, স্বগ্গ লাভ হাতে হাতে—মরণে পদ্মনাভণ্ড—আমি ত' মন্দ বলি নে।—বলিয়া চমৎকার হাসে, তার সঙ্গে ওরাও আবার হাসে।

শ্রাবণের এক রাত্রে মদের বোতল আর কতিপয় বন্ধু জুটাইয়া একটু আমোদ করিবার উপক্রমেই বিশ্বম্ভর বাধা পাইয়াছিল। হিরণের দেহ তখন আলস্যে ভরা। সেই নিদারুণ বাদলায় উঠিয়া ভিজিয়া ভিজিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া পিছল উঠানে বেড়ানো তখন তার পক্ষে বড়ই কষ্টকর—কিন্তু চাটের সব উপকরণ একত্র করিতে হইলে, সে কষ্ট অপরিহার্য। হিরণ তাই আপত্তি জানাইয়াছিল।

বিশ্বম্ভর অবুঝ এবং অসহিষ্ণু হইয়া মুখের ভাষায় তাহাকে যথোচিত অপমান করিয়া হাতে হাতে আরো উচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়িয়া আসিতেই হিরণ পলাইতে যাইয়া পিছল উঠানে আছাড় খায়।

মেয়েটিকে প্রসব করিয়া সে আর উঠে নাই ; মাথাটা তুলিতে পারিত বটে, কিন্তু কোমর তুলিতে পারে নাই।

টুকী পরের হাতে মানুষ—পরেই তাহার নাম রাখিয়াছে টুকী।

—ওরে মোক্ষ, ওলো ত্রিনয়নী, ওলো বগলা, তোরা শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়, দেখে যা তামাসা।—বলিয়া আরো কয়েকজনের নাম ধরিয়া চঞ্চলা চেঁচাইতে লাগিল, বলিল,—ওমা, আমি যাব কোথা!

ব্যাপার এমন কিছুই নয়, টুকী কাপড় পরিয়াছে।

কোলের ছেলে, হাতের কাজ, মাথার কাপড় ফেলিয়া ত্রিনয়নী, বগলা প্রভৃতি ছুটিয়া আসিল, এবং রাস্তার ধারে যেন পর্বোপলক্ষে পুর-ললনাগণের উৎসব লাগিয়া গেল।

মা আসে নাই দেখিয়া চঞ্চলা আবার চেঁচাইতে লাগিল,—মা, এস শীগ্‌গির।

—কি লা?—বলিয়া চঞ্চলার মা চপলাও আসিয়া দাঁড়াইল।

চঞ্চলা বলিল,—ঐ দেখ।

হাসি জমাইতে চপলাই প্রধান। সে একবার টুকীর দিকে এবং একবার বগলাদের দিকে চাহিয়া হাসির কলরোল তুলিয়া দিতেই সবাই যেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া হাসি জুড়িয়া দিল।

—আর পারিনে মা, ম'লাম।—বলিয়া হাসি থামাইয়া চঞ্চলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডাকিল,—টুকী?

টুকী বলিল,—উঁ।

—তোমার ঐ মার্কামারা উত্তর, তা' ত জানিই। কাপড় কে দিয়েছে লা?

টুকীর ডুরে কাপড়খানি কোমরের নীচে কিছুদূর নামিয়াছে বটে, কিন্তু আঁচল গা পর্যন্ত ওঠে না। খাট আঁচল টানিয়া টানিয়া টুকী হয়রান হইতেছিল, চঞ্চলার প্রশ্নের জবাব দিল না। চপলা জিজ্ঞাসা করিল,—কাপড় কে দিয়েছে বললিনে?

টুকী বলিল,—মা দিয়েছে।

—মা কোত্থেকে এল?

সুরমা বলিল,—তুমিও যেমন, ওর কথা শুনছ! এদিকে এগিয়ে আয়, দেখি কেমন কাপড় হয়েছে। যা ত' মোক্ষ, ওকে ধরে নিয়ে আয়।

মোক্ষ টুকীরই সমান। সে দৌড়াইয়া যাইয়া টুকীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে সুরমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

কাপড়ের জমি পরীক্ষা করিয়া চপলা বলিল,—দিব্যি কাপড় হয়েছে। মা দিয়েছে?

—হুঁ।

কিন্তু তখনও টুকীর আঁচল তুলিয়া গায়ে দিবার চেষ্টার বিরাম নাই। মোক্ষ বলিল,—মা, আমার অম্‌নি একখানা কাপড়—

—থাম্‌। বেশ কাপড়, খাসা কাপড়, পাড়ও ভাল। দিদি, কি বল?

চপলা বলিল,—বেশ কাপড়। দিগম্বরী মার্কা, নয় টুকী?

কিন্তু টুকীর আঁচল গায়ে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলেই খসিয়া পড়িতেছে। টুকী আঁচল ধরিয়া বাড়ী গেল—এবং ইহাই লইয়া পাড়ার ঐ মেয়েদের সেদিন প্রায় একটা বেলা কাটিল।

অতঃপর সমস্যা হইল, এই মা-টি কে ? কোথা হইতে আসিল ? এবং এই ব্যাপারের অপরাপর সমাচারই বা কি ?

সুরমা চোখ টিপিয়া বলিল,—মেয়ের মায়ের আবার অভাব ! মেয়ে যায় যাক, থাকে থাক ; বাপের নিজের গরজেই সে এসে উঠবে। মুখিয়ে আছে মাগীরা, কেবল ডাকার অপিক্ষে।—বলিয়া একটি দুঃখের নিঃশ্বাস সে কেন ফেলিল কে জানে।

ত্রিনয়নী বোঁটার চুণ জিব দিয়া চাটিয়া লইয়া বলিল,—কি পান যে উঠেছে আজকাল, গালে দিলেই ঝালে মরি। যা বল্লি, সুরি, ঠিক—কেবল ডাকার অপিক্ষে। আবার এ-ও বলি, পেটের জ্বালা না থাকলে পাপের পথে লোক এত যেত না—অন্নপূণ্যা মেয়েটি ত' ভালই ছিল—পেটের দায়ে এখন সে কি-ই না করছে !

চঞ্চলা বলিল,—কাজ নেই বাপু ও কথায় ; ওকে বলে' ধমক খেয়ে মরি !

সবাইকে এক সঙ্গে ধমক দিবার লোক কাছাকাছি কেহ না থাকিলেও ও-কথাটা তখনকার মত ঐখানেই বন্ধ হইল।

টুকীর বাবার টুকীর জন্য মা সংগ্রহ—সে-ও এক কথার মত কথা—মনের মানুষে দেখিলেই চেনে, যে কথাটা আছে তাহারই এক মস্ত দৃষ্টান্ত। টুকীর বাবা টুকীকে মাঝে মাঝে পরের জিম্মায় রাখিয়া কিছুদিনের জন্য ভগিনীপতির গৃহে যাইয়া থাকে। অনেকবার গেছে—সেই ভগিনীপতির গৃহে যাইবার পথেই খেয়া নৌকায় হয় উহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ।

বিশ্বম্ভরের ভগিনীপতির বাড়ী আধ মাইল চওড়া এক নদীর ধারে ; গাড়ী হইতে নামিয়া তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়া নদী পার হইয়া তবে লালমোহনের বাড়ীতে পৌঁছিতে হয়। বিশ্বম্ভর লালমোহনকে তাই ঠাট্টা করিয়া বলে,—তোমার বাড়ী মগের মুল্লুকে হে।

স্প্রিং-এর ছাতাটা মুড়ি দিয়া বিশ্বম্ভর ওপারের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল—কিন্তু একই দৃশ্য কতক্ষণ দেখিতে ভাল লাগে, আর একই আসনে কতক্ষণই বা বসিয়া থাকা যায় ! ওপারের তিনটা ঘাট চোখে পড়ে—একটা ঘাট কেবল মেয়েদের—মেয়েরা আসিয়া জল লইয়া যাইতেছে—কাহারো বেশিক্ষণ লাগে, কেউ আসে আর চলিয়া যায়। আর একটা ঘাট পুরুষদের—মাড়োয়ারীর লোটা মর্দন আর শেষ হয় না—'সীতারাম' 'সীতারাম' করিয়া সে থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আর এক ঘাটে কেবল পান্সী—বাতাসের ধাক্কায় এ উহার গায়ে যাইয়া পড়িতেছে—তাদের দোল খাওয়ার অন্ত নাই ; হালগুলি জলের ভিতর ঝুলিয়া আছে। খেয়া নৌকা ভিড়িবার বাঁশের মাচাটা পান্সীর ঘাটেই—পারার্থী দু'টি একটি লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, ওপারের টিনের সাদা চালগুলি ক্রমোচ্চ সোপানের মত উঠিয়া গেছে—পাড়ের উপরকার নিম গাছটায় একটা দাঁড়কাক ঘাড় বাড়াইয়া বসিয়া আছে।

এ সব দেখাই, আর একঘেয়ে। একবার হেঁট হইয়া, একবার হাঁটু তুলিয়া, একবার পা ছড়াইয়া, একবার পা গুটাইয়া বসিতে বসিতে হঠাৎ একবার এপারের দিকে ঘুরিয়া বসিতেই অন্য কিছু চোখে পড়িবার আগেই যাহার উপর চোখ পড়িল এবং যাহার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের চোখাচোখি হইয়া গেল সে-ই মনের মানুষ।

নদীর জল তখন 'ধীর পবনে ঢেউ তুলিয়া' নৌকার গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ

করিতেছে—পূর্বাহ্ণের অনুত্তপ্ত রৌদ্র তখন সুন্দর—দিগ্বলয়লগ্ন সবুজের গায়ে সুন্দর—নদীর নির্মল জলে সুন্দর—আকাশের নীল অঙ্গে সুন্দর। নৌকার উপরকার অতগুলি লোক একেবারে নিঃশব্দ।

শিবসুন্দরের এই প্রকট পটভূমির কেন্দ্রে বসিয়া বিশ্বম্ভরের সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হইল, অর্থাৎ সে চিনিতে পারিল, এই আমার মনের মানুষ। তার মনের খবর সে জানে, কিন্তু বিশ্বম্ভর নিজের মন বুঝিয়া অবাক হইয়া গেল। দুইজনে নামিয়া দুই পথে গেল। তারপর আরো আশ্চর্য এই যে, পথের দেখা মানুষটিকে বিশ্বম্ভর ভুলিতে পারিল না—শূন্যে শূন্যেই কে যেন শিকল পরাইয়া দিয়াছে, আর সে বন্ধন তাহাকে অকাতরে মানিতে হইতেছে—পুলক খুব।

ভগিনীপতি লালমোহন বিশ্বম্ভরের রকম দেখিয়া খুব আশ্চর্য হইয়া গেল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বিশ্বম্ভর কয়েকবার আসিয়া দু' দশ দিন থাকিয়া গেছে; কিন্তু মুগ্ধ কবিবরের ছবির চক্ষের মত এমন উড়ু উড়ু বিমনাভাব তার কোনদিনই লেখা যায় নাই।

বিশ্বম্ভর গপ্পে লোক, কথাবার্তায় সে বেশ তৎপর—এক কথায় সে মজলিসী; কিন্তু এবার তার মুখে তেমন রা নাই; সুরু করে বটে প্রাণপণে, ঠিক আগের মতই, কিন্তু কথার মাঝখানে হঠাৎ আনমনা হইয়া যায় কিম্বা কি বলিতে কি বলে তার মানে হয় না। আগুন নিবিয়া যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই লালমোহনকে কলিকা পালটাইতে হইল দুবার।

বারকতক শ্যালকের কথার মানে না পাইয়া এবং হুঁকার প্রতি অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া লালমোহন বলিল,—এবার তোমার হয়েছে কি হে?—বলিয়া পূর্বাপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে সে বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কি হয়েছে! কিছুই হয়নি।

ভগিনীপতির সরল প্রশ্নের এই কপট উত্তর দিয়া বিশ্বম্ভর অন্যদিকে চাহিয়া অত্যন্ত নির্লিপ্ত হইয়া রহিল।

—আমি যেন তোমায় চিনিনে, কখনো দেখিনি যেন নতুন দেখছি!—লালমোহনের কথার সুর অত্যন্ত বক্র।

বিশ্বম্ভর তাহা যেন বুঝিলই না; বলিল,—নতুন কি দেখছ?

—কথায় মন নেই, যা তোমার প্রধান গুণ; কথায় কথায় ভুল করছ, কি বলতে কি বলছ তার ঠিক নেই। শুদোলাম টুকীর কথা, তুমি তার জবাব দিলে, দক্ষযজ্ঞ পালা ভাল। ব্যাপারটা কি? হয়েছে কি?—বলিয়া লালমোহন আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে কনুই দিয়া ঠেলিয়া দিল।

বিশ্বম্ভর সুদূরভাবে বলিল,—বলব পরে।

—বল না এখনই—

—উঁ হুঁ, পরে; এ ত বিয়ে নয় যে লগ্নের মধ্যেই সারতে হবে! অপেক্ষা করতে পারো।

লালমোহন নাচিয়া উঠিল—এই ত' আমার দাদার মত কথা!—বলিয়া লালমোহন অপেক্ষা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কষ্টের সঙ্গে।

পাঁচ মিনিটকাল কণ্টকাসনে কাটাইয়া লালমোহন বলিল,—এইবার বলো।

—আঃ জ্বালালে!—বিশ্বম্ভর একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

লালমোহন আর একটু ঘেঁসিয়া গেল। বিশ্বম্ভর পুনরায় গম্ভীর হইয়া বলিল,—শুনবে নেহাতই ?

—শুনব।

—তবে শোনো। কিন্তু কাউকে কিছু বলো না আমার অদেষ্টে যা-ই থাক।

—খুব খারাপ না কি ?

—না।—বলিয়া বিশ্বম্ভর কপাল টিপিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

—তারপর ?

—বলি। তোমাদের খেয়া নৌকার মাঝি কে ?

—মহাদেব।—বিশ্বম্ভরের প্রশ্নের উত্তর দিয়া লালমোহন এই তৃতীয়বার হা করিল।

বিশ্বম্ভর যেন আপন মনেই বলিল,—সে হয় তো চেনে।

—কাকে ?

—যার কথা বলব এখন—একটি স্ত্রীলোক।

শুনিয়া লালমোহনের এতক্ষণকার শুষ্ককণ্ঠ ভিজিয়া যেন লোলুপ হইয়া উঠিল; বলিল,—তাই নাকি ?—বলিয়া সে এমন করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে লাগিল, যেন জানিতে তার কিছুই বাকী নাই।

বিশ্বম্ভর সেইদিকে চাহিয়া বলিল,—অমন করে হাসলে হবে কি ! কিছু বলিই নি এখনো, তুমি বুঝবে কোত্থেকে !

—আচ্ছা, না বুঝলাম—বল দেখি কেমন চেয়ারার লোক সে, দেখি যদি চিনতে পারি। খেয়া নৌকায় দেখা বুঝি ?

—হু।

—অত লোকের সামনে—

—কোনো কথাই হয়নি। কথাই ত' বলতে চাই, সেইজন্যেই ত' তাকে খুঁজছি।

—দেখতে কেমন ?

বর্ণনাটা লালমোহন ভুরু কুঁচকাইয়া আর চোখ বুজিয়া শুনিল। শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুমান করিতেও পারিল না যে সে অমুক। রং ফর্সাও নয়, কালও নয়; শরীর মোটাও নয়, রোগাও নয়, তার স্বাস্থ্য ভাল, গড়ন লম্বাটে—সেইজন্যেই দোহারা দেখায়—পরণে 'গঙ্গা-যমুনা' পাড় শাড়ী, সাদা সেমিজ; নাকের অগ্রভাগ একটু চাপা, টানা টানা ভুরু, বড় বড় চোখ ইত্যাদি।

মনটা রসে নিমজ্জিত ছিল বলিয়া রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি দোষ ঘটিল কিনা বলা যায় না—কিন্তু বিশেষণ উজাড় করিয়া দিয়াও কাজ হইল না—লালমোহন ব্যক্তিটিকে নির্দেশ করিতে পারিল না; বলিল,—চলো, পাটনীর সঙ্গে দেখা করে' আসি।

বিশ্বম্ভর কেবল বলিল,—ছিঃ !

কিন্তু ঘৃণা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল এবং মহাদেব যাহার নাম করিল সে দুষ্প্রাপ্য নহে।

তারপর লালমোহনেরই ঐকান্তিক উদ্যোগে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়া বিশ্বম্ভরের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া গেল। তাহাকে দেখিবার পর একটি বেলা উত্তমেরও মুখে অন্নজল রোচে নাই শুনিয়া বিশ্বম্ভর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, মনের মানুষ মানুষে দেখলেই চেনে। সত্যি কি না ?

উত্তম অধোবদনে, আর লালমোহন হাঁটু চাপড়াইয়া জবাব দিল,—তা আর বলতে।

"শোনো এসো" বলিয়া বিশ্বম্ভর লালমোহনকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল,—বেশ ভদ্র। নয় হে ?

—ভদ্র বই কি, খুব ভদ্র।

উহারা যাইয়া উঠিতেই উত্তম যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার যথেষ্ট অমায়িকতা এবং সরলতা প্রকাশ পাইয়াছিল—বসিবার আসন দিয়াছিল, সতরঞ্চি, আঁচল দিয়া মুছিয়া দিয়াছিল ; জলযোগের আয়োজন করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু ক্ষুধার আপত্তি দেখাইয়া উহারা জলযোগ করিতে সম্মত হয় নাই।

বিশ্বম্ভর বলিয়াছিল,—কত খাওয়াতে পার পরে দেখব।—শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তম হাসিয়াছিল এবং লালমোহন উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে সশব্দে যোগদান করিয়াছিল।

এ-সব তখনকারই কথা, আর একবার মনে করিয়া দু'জনেই পুলকিত হইল।

লালমোহনের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—চেহারাও বেশ—

লালমোহন বলিল,—হ্যাঁ, এখনো বেশ ইয়ে আছে।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর অশেষ তৃপ্তি বোধ করিল ; বলিল,—বাড়ীখানিও বেশ।

উত্তমের বাড়ীর তিন দিকে আম-কাঁঠালের বাগান। বাগানের মালিক অবশ্য অন্য লোক। রাস্তার পাশেই একটা মুদির দোকান—'কেরোসিনও' পাওয়া যায়। সেই দোকানের পাশ দিয়া গলি রাস্তা—গলির বাঁদিকে একখানা বাড়ীর পরেই উত্তমের বাড়ী ; বাসের ঘরখানা খড়ের, বাকি তিনখানা টিনের ; চারিদিক ঘিরিয়া বাঁশের বেড়া – বেড়ার উপরেও আল্‌কাতরা মাখান টিনের আবরণ—উঠানটি মাজা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে ; উঠানের একদিকে বাসন মাজিবার জন্য খানকতক ইট পাতা—জলে জলে কালো হইয়া গেছে ; তার একটু দূরেই পাঁচ ছ'টা মানকচুর গাছ : তাদের গোড়ায় ছাই ঢালা—তুলসী গাছও আছে, তার তলায় পোড়া সল্‌তে দুটি পড়িয়া আছে।

লালমোহন বিবেচনা করিয়া বলিল,—শ' পাঁচেক দাম খুব হবে এ বাড়ীর।

তারপর লালমোহন উত্তমকে ডাকিয়া বলিল,—আমি চলি, উত্তম। রেখে গেলাম শ্যালকটিকে—রাখতেও তুমি, মারতেও তুমি।

উত্তম বাহির হইয়া আসিল, বলিল,—আবার আসবেন যেন।

লালমোহন পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই আরো খানিক ফষ্টি-নষ্টি করিয়া বিদায় লইল।

বিশ্বম্ভর উত্তমের বাড়ীতেই সে রাত্রিতে আহারাদি করিল ; এবং আহারাদির পর খাটে বসিয়া বলিল,—আমার একটা ছোট মেয়ে আছে কিন্তু, বিরক্ত হবে না ত' ?

উত্তম বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে যাইবে ঠিক হইয়া গেছে।

উত্তম তাহাকে পান দিতে এ-ঘরে আসিয়াছিল ; সুপারি কুচাইতে কুচাইতে, বিরক্তির কথায় বিরক্ত হইয়া উত্তম বলিল,—তা থাক, আমি ত' পুতনা নই।

পুতনার উপাখ্যান বিশ্বম্ভর জানিত। উত্তমের পৌরাণিক ভর্ৎসনায় সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া আশ্বস্ত এবং নিরস্ত হইল।

সে রাত্রিতে আরো অনেক কথাই বলা আর শোনা হইল। উত্তমই বক্তা—গৃহস্থালী

পাতাইতে হইবে—তাহারই সম্বন্ধে তিল তুলসী হইতে টুকী পর্যন্ত রাজ্যের খুঁটিনাটি গোছানোর কথা শুনিতে শুনিতে আলস্য জমিয়া বিশ্বম্ভরের হাই উঠিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সমারোহ করিয়া লালমোহন নবযুগলকে নৌকায় তুলিয়া দিল—খেয়া নৌকায় নহে, ভাড়া করা পান্সী নৌকায় এবার তাহারা নদী পার হইবে।

সঙ্গে জিনিসপত্তর বেশী নহে : বাসন বোঝাই একটা কাঠের সিন্দুক, তাহার ভিতরেই বিছানা দেওয়া হইয়াছে ; কাপড়-ভরা একটা ট্রাঙ্ক—আর একটা ছোট বোচকা, তাতে কম্বলের আসন, সতরঞ্চি প্রভৃতি আছে। শিশি, বোতল, কৌটা, পিঁড়ি, ষ্টিলের গ্লাস, শিল, নোড়া প্রভৃতি উত্তম দোকানীকে দান করিয়া আসিয়াছে।

লালমোহন নৌকার ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল,—তোমার বাড়ী বিক্রীর ভার আমি নিলাম, খদ্দের আমি পেয়ে যাব ; চাবি আমার কাছে রইল।

উত্তম বলিল,—আচ্ছা।

নৌকা ছাড়িয়া দিল। বিশ্বম্ভর চেঁচাইয়া বলিল,—চল্লুম ভাই।

লালমোহন বলিল,—আচ্ছা। সুখে থেকো, সুখে রেখো।

পান্সী তখন দূরে গেছে। বিশ্বম্ভরের হাসির আওয়াজটা লালমোহনের কানে আসিল।

বাড়ীতে পোঁছিয়াই বিশ্বম্ভর কেমন কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। ঘর দুয়ার ভাল নয় ; স্ত্রীর কাছে সে নিজে লক্ষ্মীছাড়া আচরণের বড়াই করিত—এ-ও স্ত্রীলোক ; কিন্তু ইহার সম্মুখে তাহার সেই আচরণের ফল অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া বিশ্বম্ভরের এখন মনে হইতে লাগিল।

অপ্রতিভের মত সে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—ঘরদোর খুব অযত্নে আছে কি না তাই এমন ; গৃহলক্ষ্মীর অভাবে—

যেন গৃহলক্ষ্মীর অভাবেই গৃহ এমন শ্রীহীন ! উত্তম বলিল,—তুমি ত' ছিলে !

হিরণ এমন করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে অপদার্থ বলিলে বিশ্বম্ভর মুখ নাড়া দিয়া বলিত, ছোট মুখে বড় কথা বলিসনে।

এখন বলিল,—আমি ! আমি কি একটা মানুষ !

কিন্তু বিশ্বম্ভরের এই অমৃতোপম এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় বচনে উত্তম কর্ণপাতও করিল না ; বলিল,—একটু বসি—তারপর দেখছি কোথায় কি আছে।

বিশ্বম্ভর তাড়াতাড়ি বলিল,—হ্যাঁ, বসো।—বলিয়া কূপের দিকে অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, উত্তম বারণ করে কিনা—হিরণ হাতের দড়ি বালতি কাড়িয়া লইত—কিন্তু উত্তম তখন অন্যমনস্ক, বারণ করার কথা তার মনেই হইল না।

বিশ্বম্ভর হাত পা ধুইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া ঠাণ্ডা হইল। উত্তমকে ডাকিল,—পা ধোবে এস।

—যাই।—বলিয়া উত্তম উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই তার যাওয়া হইল না।

ঝাঁকড়া চুল নাচাইয়া টুকী ছুটিয়া আসিয়াই নূতন মানুষ সম্মুখে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। উত্তম আবার বসিয়া পড়িল।

বিশ্বম্ভর একবার চকিতে উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিল কে জানে, বলিয়া উঠিল,—টুকী, তোর মা।

টুকী তার মাকে দেখে নাই।

"এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?" বলিয়াই দৌড়াইয়া আসিয়া সে উত্তমের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। উত্তম তাহাকে কোলের উপর হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া, হাত যতদূর যায় দু'হাতে করিয়া ততদূরে ঠেলিয়া লইয়া তাহাকে যেন একবার পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল,—পরবাসে ছিলাম, মা।

—সে কোথায়?

উত্তম বলিল,—সে অনেক দূরে।

—আমার জন্যে কি এনেছ?

—কাপড় এনেছি।

টুকী বলিল,—দাও, পরি।

উত্তম তার বোচ্‌কা খুলিয়া কাপড় বাহির করিয়া পরাইয়া দিল—এবং সেই কাপড় দেখিয়া টুকীদের মহল্লায় যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

## ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

উত্তমকে লোকে দেখিয়া দেখিয়া গেল।

উত্তমের মনে হইল, স্ত্রীলোক এখানে অসংখ্য। কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতে আসিল, কেহ সটান সম্মুখে আসিয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল, কেহ না দেখিবার ভান করিয়া দেখিতে লাগিল।

ইহারা সবাই বিশ্বম্ভরের পরিচিত, 'পাড়াঘরের' লোক, 'ভাই-ব্রাদারী' আচরণ—কিন্তু বিশ্বম্ভরের কাছে ইহারাও আজ নূতন নূতন মনে হইতে লাগিল। প্রথমটা বিশ্বম্ভর চক্ষুলজ্জায় ঘরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা জুৎসই প্রত্যুত্তর মনে পড়িয়া যাইতেই সে ইহাদের সম্মুখে আসিয়া ঘাড় তুলিয়া দাঁড়াইল। কেহ ট্যাঁ ফোঁ করিলেই সোজা সে বলিবে, নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। বিশ্বম্ভরের মনে হইল, ধৃষ্ট ব্যক্তিকে চরকায় তেল দিবার কথা মনে করাইয়া দিলে অনেকখানি বলা হইবে।

কিন্তু নিজের চরকার কথা বোধ হয় প্রত্যেকেরই মনে ছিল; বিশ্বম্ভরকে মুখ খুলিতে হইল না; এমন কি, তাহাকে কেহ দেখিতে পাইয়াছে বলিয়াই বুঝা গেল না।

নীরব সভার মান রক্ষা করিল টুকী। বন্ধস্রোতে ঢেউ তুলিয়া লজ্জাকর দৃষ্টিকটুত্ব সেই জন্মিতে দিল না; স্বাধিকার গর্বে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সবাইকে জানাইতে লাগিল,—আমার মা, আজ এসেছে।

উত্তমের আদ্যন্ত নিরীক্ষণ এবং কণ্ঠস্থ করা শেষ করিয়া উল্লাসী, ভুজঙ্গিনী, বগলা, ত্রিনয়নী প্রভৃতি ফিরিতেছিল, মোহিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা দাঁড়াইল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ঘর কোথা গা?

উত্তম কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য বিশ্বম্ভর একটু আগাইয়া আসিল। উত্তম বলিল,—এখন এখানেই।

—আগে কোথায় ছিলে?

—ঘরের আমার ঠিকানা ছিল না, যেখানে থাকতাম সেই-ই ঘর।

—ঝি-গিরি করতে বুঝি ?

—তাও না করেছি এমন নয়।

সওয়াল-জবাবে মোহিনী পটু ; জিজ্ঞাসা করিল,—তা-ও মানে ? আর কি করতে ?

উত্তম হাসিমুখে জবাব দিতেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর সে হাসিমুখেই দিল, বলিল,—ধরন দেখে, বা না দেখেই যা ভেবেছ তা-ই ঠিক।

স্তূপের ভিতর মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চোখে দেখা গেল না, কিন্তু এই স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া মনে মনে মোহিনীর জিব এতখানি বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বম্ভর বলিল,—রইল ত এখানেই, ক্রমশ আলাপ ক'রো। আমরা এখন হেঁটেহুঁটে এলাম।

মোহিনীর অনুকরণে ইত্যবসরে যাহাদের কিছু কিছু বক্তব্য জন্ম লইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ফুরসৎ তাহাদের মিলিল না—বিশ্বম্ভরকে বদরাগী বলিয়া সবাই জানে।

মোহিনী মনের ঝাঁঝ হজম করিয়া পিছু হটিল। মোক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া যাইতে যাইতে বোধ হয় টুকীকে শুনাইয়া বলিয়া গেল,—আমারও মা আছে, নয়, মা ?

বিশ্বম্ভর বলিল,—নতুন মানুষের গন্ধ পেলেই ওরা দল বেঁধে কি দেখতে আসে তা জানি নে। নতুন বৌ এসেছে যেন !

উত্তম কথা কহিল না।

অল্পস্বল্প জলযোগ করিয়া ওরা ক্লান্তদেহে সকাল সকাল শুইতে গেল, কিন্তু এখানকার প্রথম রাত্রি উত্তমের নিরুদ্বেগে অথচ নিরানন্দে কাটিল।

সামান্য দু' একদিনেই বিশ্বম্ভরের ভুল ভাঙিয়া গেল ; উত্তমকে সে যে বস্তু মনে করিয়াছিল সে বস্তু সে নয়—এ বাধ্য করিতে জানে এবং বাধ্য করিবার কাজে অনাস্বাদিত-পূর্ব একটা মাধুর্য ঢালিতে জানে, তাহা উপভোগ করাইতে জানে। স্ত্রী সে নয় ; বিশ্বম্ভর অনুভব করিতে লাগিল, স্ত্রীর নবতর এবং উৎকৃষ্টতর একটা রূপ সে ! স্ত্রীকে গণ্ডির মধ্যে ফেলিয়া পিষিতে পারা যায় ; নিজের মনটাকে তৈরী করিয়া লইতে পারিলেই পেষণ অনায়াসসাধ্য—স্ত্রী সে গণ্ডীর বাহিরে যাইবে না ; কিন্তু ইহার সে সঙ্কীর্ণতা নাই ; সমস্ত পৃথিবী ইহার জন্য মুক্ত—এ স্বেচ্ছায় ডানা গুটাইয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

ভাবিয়া বিশ্বম্ভর সুখ পায়, আর অবাক হইয়া থাকে। কিন্তু সে মনে মনে হাসেও ; ভাবে, উদরের জ্বালা বড় জ্বালা—কতজনকে পোষ মানাতেই হয়, কতজনের পোষ মানিতে হয়—কত ছলা, কত কলা, কত ঢং, কত ঠাট।

তবে এ সব কথা ভুলিয়া থাকাই ভাল ; তাই বিশ্বম্ভর ভুলিয়াই থাকে।

টুকীর বেশ যত্ন হইতেছে। টুকী আর রাস্তায় খেলিতে যায় না ; তাদের বাড়ীতেই এখন খেলা বসে—কিন্তু খেলিতে খেলিতে একদিন খেলায় বড় ব্যাঘাত ঘটিয়া গেল।

টুকীর মা জলের ঘট, রান্নার হাতা, খুন্তি, কড়াই, বেড়ি, বালতি, উনুন, থালা বাটি পর্যন্ত কয়েক প্রস্থ কিনিয়া দিয়াছে ; সেইসব তৈজসপত্রে বনভোজনের আয়োজন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে—কে আগে ভোজনে বসিবে, কে পরিবেশন করিবে, ইত্যাদি সমস্যা লইয়া ঘোরতর একটা বিতণ্ডা চলিতেছে।

মিতিনের গলার সামর্থ্য বেশী ; তাহারই মতামত শিরোধার্য হইয়া আসিতেছে, এমন

সময় টুকীর এবং তার খেলার জুটিদের সুউচ্চ মতানৈক্য এক নিমেষে আঁতকাইয়া চুপ হইয়া গেল।

পাড়ার মেয়েরা নেপথ্যে কি পরামর্শ করিয়াছিল এবং কাহার উস্কানিতেই তাহারা নাচিয়া উঠিয়াছিল, কে জানে—যার যার মেয়ে খেলিতে আসিয়াছিল, সেই জননীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ঝড়ের মতো সবেগে সেই ভোজনালয়ে আসিয়া পড়িল; চটাপট চড় বসাইয়া দিয়া দিয়া তাহারা আপন আপন মেয়েকে টানিয়া তুলিল, লাথি লাগিয়া খেলার পাত্রগুলি আর অন্ন ব্যঞ্জন দূর দূরান্তে ছিটকাইয়া পড়িল, মেয়েগুলি চীৎকার করিতে লাগিল; টুকী ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিতে শিশুর কণ্ঠমুখর প্রাঙ্গণ নিঃশব্দ নির্জন হইয়া খা খা করিতে লাগিল।

যে বয়স্কা রমণী আর শিশুটি সেই ভগ্নাবশেষের মাঝখানে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনের অবস্থা তখন তাহাদের পায় একরূপ।

উত্তম দাওয়ায় বসিয়া আসন্ন শীতের জন্য লেপের খোল সেলাই করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া বনভোজনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া অল্প অল্প হাসিতেছিল, ডাকাত পড়ার মত উহারা আসিয়া পড়িতেই সে শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চণ্ডীর রণলীলা সে আগাগোড়া দেখিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করে নাই। তাহারা চলিয়া যাইবার পর এই আকস্মিক আক্রমণের হেতু হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে পাংশুমুখে সেই বিধ্বস্ত আনন্দক্ষেত্রের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তারপর একটু হাসিয়া আবার নিজের কাজে বসিয়া গেল। টুকী যাইয়া বিষন্নমুখে তাহার মায়ের কোল ঘেঁসিয়া বসিল। উত্তম সূচ থামাইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—বনভোজন হ'ল না রে! চল্ আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

টুকী তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল, বলিল,—চল মা, যাই।—বলিয়া উঠিতে গেল।

উত্তম বলিল,—এখন বোস্। তোর বাবা আসুক, কোথায় যাব পরামর্শ করি।

টুকী নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে উত্তম বলিল,—তোর বাবাকে খেলা ভেঙে দেবার কথাটথা কিছু বলিসনে। আমি আর তুই চুপিচুপি পালিয়ে যাব। বেশ?

টুকীর দুঃখ ঘুচিল, বলিল,—আচ্ছা।

টুকীর মুখে কথার প্রবাহ দেখা দিয়াছে; দেখিয়া পাড়ার লোকে অবাক হইয়া গেল। টুকী এখন কেবল মানুষের ডাকে উঁ বলিয়া সাড়া দিয়াই কথা শেষ করে না; দু'মাসেই সে অনেক কথাই বলিতে শিখিয়াছে।

চপলা বলে,—মা নাই যার
কথা কোথায় তার!

শুনিয়া মোহিনীর সর্বাঙ্গ চিটমিট করে, বলে,—অমন মায়ের মুখে আগুন।

—তা হোক, টুকীর ও-ই সার্থক।

—পণ্ডিত করিসনে লা তুই, সেদিনকার মেয়ে!

—পণ্ডিত আবার কি হ'ল! খাঁটি কথা। তারপর দ্বিগুণ গম্ভীর হইয়া বলিল,—বুড়ো হ'লে বিন্দাবনে ও-ও যাবে।

এই ক্রূর উক্তি শুনিয়া, মোহিনী ধৈর্য ভাঙিয়া বেহুঁশ হইয়া গেল। বৃন্দাবনে তীর্থ করিয়া মোহিনী কেবল সেদিন দেশে ফিরিয়াছে; সেখানকার নামাবলী বস্ত্রের গায়ে এখনো কোরা গন্ধ তেমনি সতেজ রহিয়াছে।

কিন্তু উত্তমের সংশ্রবে বৃন্দাবনের উল্লেখ যেন তাহারই কোনো একদিনের প্রতি স্থূল একটা ইঙ্গিত—তাহা সহ্য করিবার মত নয়।

মোহিনীর হাতে মালা ঘুরিতেছিল, সেটা বন্ধ হইয়া গেল, এবং হরিনাম বিস্মৃত হইয়া সে এমন ভাষা অনর্গল উচ্চারণ করিতে লাগিল যাহা শ্রুতিস্বাদে অমৃতময়ী নহে।

চপলা কানে আঙুল দিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

চপলার সঙ্গে উত্তমের ভাব হইয়াছে ; চপলা তার কাছে যাওয়া আসা করে।

সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিয়া বিশ্বম্ভর উঠান হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—টুকী, তোরা সব কই রে ?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে টুকীর জবাব আসিল,—আমরা রান্নাঘরে আছি, বাবা। মা রান্নার যোগাড় করছে।

—কী রান্না হবে এ বেলা ?

টুকী বলিতে লাগিল,—ও বেলাকার ডাল আছে, বাবা। এ বেলা আলু সেদ্ধ ভাত হবে, মাছের ঝোল হবে।

বলিতে বলিতে টুকী তার মায়ের সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিল,—তুই এরি মধ্যে এত কথা শিখলি কোথায়, টুকী ?

তারপরে উত্তমের উদ্দেশে বলিল,—তুমি এসেই টুকীকে কথা কইতে শিখিয়েছ, আগে কেবল উঁ উঁ করত, তার বেশী জানত না।

উত্তম বলিল,—কিন্তু আমি ত শুনেছি, তুমি তার উল্টো পথে চলেছ, অনেক কথা ভুলছ।

বিশ্বম্ভর কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি রকম, কি রকম ?

উত্তম মুখ ফিরাইয়া বলিল,—এই যেমন এটা সেটা পান করা—

—কার কাছে শুনলে ?

—যার কাছেই শুনি, ঠিক কি না ?

—ঠিক বই কি, কিন্তু ভুলিনি ত !

—তবে টের পাইনে যে ?

—হিরণ মরেছিল আমার দোষেই—টুকী যেদিন হয় সেদিন বেজায় মাতাল হয়ে পড়েছিলাম—বর্ষার দিনে এই রান্নাঘরের ভিজে মাটিতে পড়ে সে—

টুকী বলিয়া উঠিল,—বাবা, মা কাঁদছে।

বিশ্বম্ভর থামিয়া গেল ; শুনিতে পাইল, উত্তম সত্যই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বম্ভর হঠাৎ অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া উত্তমের সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁদছ যে ?

উত্তম ততক্ষণে কান্না সম্বরণ করিয়াছে ; সহজ সুরেই বলিল,—তোমার আচরণে—তুমি মানুষ মেরে তা-ই মানুষের কাছে গল্প করছ !

—মুখ বাড়িয়ে বড়াই করছিনে ত ! আর সেইদিন থেকে আমি ও-জিনিষ ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু বিশ্বম্ভরের এই সুমতির সংবাদেও উত্তম সুখী হইতে পারিল না। মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা

সে চেষ্টা করিয়া, ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—তখন তার নাম ছিল বনমালা—তারও আগের নাম তার যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু। কিন্তু যেদিন ঐ কাজে দুরন্ত ঘৃণা ধরিয়া গেল, আর যেদিন তার বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, ঐ দু'দিনের ব্যবধান খুব অল্প—তার হিংস্র পুরুষ-বুভুক্ষা লুপ্ত হইয়া তখন পুরাতন গৃহ-বুভুক্ষা জাগরিত হইয়াছে। মনে মনে সে কল্পনা করিত, বিপরীত পথে চলিয়া শয়তানকে শাসন করিরা মানুষ করিয়া তুলিতেও না জানি কত আনন্দ—ভালবাসা দিয়া সুখী করাও বুঝি সুখের।

কিন্তু আর একটি নারীর শোকে বিশ্বম্ভর তাহাকে দুর্বৃত্তদমনে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, যেন তার জীবনের আগ্রহ আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে সে বঞ্চিত করিয়া দিয়া গেছে। সেই নারীর প্রতি উত্তমের ঈর্ষা জন্মিল; কিন্তু তার অশ্রুত্যাগ কপট নহে।

এদিকে তার পত্নীর মৃত্যুসংবাদে উত্তমের অশ্রুমোচন বিশ্বম্ভরের তেমন পছন্দ হইল না। তাহার মনে হইল, এটুকু বাপু তোমার নেহাৎ বাড়াবাড়ি—কথায় কথায় চোখে জল আনিয়া যদি আমাকে তুমি গদগদ করিয়া তুলিতে চাও, তবে সে সুদিনের দেরি আছে বলিয়া মনে করিয়া রাখ।

হঠাৎ বিশ্বম্ভর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা, তার দিশে পাওয়া ভার—মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর, পদির পিসী কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।

শ্লোক আওড়াইয়া বিশ্বম্ভর পুনরায় হাসিতে লাগিল। উত্তমের মনে হইল বলে, অর্থাৎ সে মরেছে বলেই আমি আসার সুবিধে পেয়েছি! কিন্তু বলিল না। জীবনের এতদিন তার মানুষের শোকে কাঁদিয়া কাটে নাই, মানুষকে কাঁদাইয়া কাটিয়াছে; তাহার দুয়ারে ঈর্ষাক্ষিপ্ত মানুষ নিজের বুকে ছুরি বসাইয়াছে তাহা সে চাহিয়াও দেখে নাই। বিশ্বম্ভরের এই বিদ্রূপে প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ বলিয়া সে নিঃশব্দে গ্রহণ করিল।

টুকী বলিল,—মা আমার ঘুম পাচ্ছে।

—তা ত' পাবেই, রাত যে ঢের হয়েছে। একটুখানি তোর বাবার সঙ্গে গল্প কর।—বলিয়া উত্তম রন্ধনে ব্যাপৃত হইল।

শুইতে আসিয়া বিশ্বম্ভর দেখিল, মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দুই স্থানে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে—একটা ছোট, একটা বড়; বড়টাতে টুকী ঘুমাইতেছে।

বিশ্বম্ভর মনে মনে হাসিয়া তামাক টানিতে লাগিল এবং উত্তম আসিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—রাগ করেছ নাকি?

উত্তম শান্ত কণ্ঠে বলিল,—না। তুমি কি পাগল! রাগ করবার পথ আমার আছে নাকি!

তার যে রাগ অভিমান সত্যই সাজে না, নিজের কথা কানে যাইয়া তাহা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর বলিল,—হিরণ কি বলত জান?

উত্তম স্বতন্ত্র শয্যা টানিয়া লইয়া একত্র করিতে যাইতেছিল—হিরণের নামে সে বিছানা ছাড়িয়া দিয়া উদ্‌গ্রীব হইল, বলিল,—কি বলত?

—আমি তোমাকে শুদোচ্ছি, রাগ করেছ নাকি! তখন সেই আমাকে শুদোত রাগ করেছ নাকি? লা-র ওপর গাড়ী, গাড়ীর ওপর লা—আমিই এখন তোমার দাসানুদাস।—বলিয়া বিশ্বম্ভর নিজের কথাতেই হাসিতে লাগিল।

—কষ্ট হচ্ছে ?

—কিচ্ছু না। সে জোর করে ধরতে পারত না বলেই ত' তাকে খারাপ লাগত—তুমি তা পারবে বলেই ত' জানি।

উত্তম বলিল,—কিন্তু শক্তি ত' মানুষের চিরদিন সমান থাকে না।

বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া আসিল। শত পুরুষের মুখে সহস্রবার সে এই পৌরুষের কথা শুনিয়াছে ; স্ত্রী একেবারে ব্যক্তিত্ববর্জিত পদানত কৃপাভিক্ষু বলিয়াই তাহাকে তার ভাল লাগে নাই—যেখানে প্রখর স্পষ্ট কথা, উদ্দামতা, কাড়াকাড়ি করিয়া পূর্বোপভুক্ত সামগ্রী ভোগ করিবার দুর্দমনীয় নেশা ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেই স্থানটি তাহাদের এমন মধুর লাগে যে, আত্মবিস্মৃতিতে মৃত্যুভয় পর্যন্ত থাকে না। এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।

ঐ কথাটা ইহারও মুখ হইতে শুনিবার সম্ভাবনা আছে, কেবল স্থান পরিবর্তনের বিভ্রমে পড়িয়াই উত্তম তাহা ভাবিতে পারে নাই—শুনিয়া কষ্ট হইলেও নিজের দিকে চাহিয়াই সে কষ্ট সে হজম করিল।

পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া উত্তম হাসিমুখে বলিল,—টুকীকে ভুললে আমাদের চলবে না ; আমাদের দুরন্তপনা ওর চোখে না পড়াই ভাল—নয় ?

শুনিয়া বিশ্বম্ভর মজ্‌গুল হইয়া গেল। এম্‌নি কথাই সে শুনিতে চায় ; বলিল,—হ্যাঁ, সে কি আমি বুঝিনে ! তুমি এসে আছ বলেই যে সে এককালে—

কি ভাবিয়া বিশ্বম্ভর কথাটা শেষ করিল না, তাহা সেই জানে ; কিন্তু তার অনুক্ত কথাগুলি উত্তমের বুকে যেন ঝড়ের ঝাপ্‌টা মারিয়া গেল। খানিক নিঃশব্দে থাকিয়া উত্তম বলিল,—তুমি বুঝে চললেই সে ঠিক পথে যাবে !

পরদিন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাভঙ্গের পর ঘরের বাহিরে আসিয়া যে দৃশ্য বিশ্বম্ভরের চোখে পড়িল, তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনি হাস্যোদ্দীপক ; দেখিল, উত্তম বারান্দায় পাটি বিছাইয়া শুইয়া হাতের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া আছে—আর তাহার কোলের কাছে টুকী। বিশ্বম্ভরের আরো চোখে পড়িল, টুকীর সমুখে খোলা রহিয়াছে বর্ণপরিচয় ; টুকী তার ছোট তর্জনীটা বাড়াইয়া প্রকাণ্ড ঘ অক্ষরটি স্পর্শ করিয়া আছে। দেখিয়া বিশ্বম্ভরের নিদ্রাজনিত আলস্য এবং শ্লেষ্মা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল ; বলিল,—তুমি লেখাপড়াও জান না কি ?—বলিয়া দুচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বম্ভর ভঙ্গীপূর্বক হাসিতে লাগিল।

টুকী বলিয়া উঠিল,—জানে, মা বড় বড় বই পড়ে, দেখবে ?—বলিয়াই সে উঠিয়া যাইয়া এক ক্ষেপে খান-তিনেক উপন্যাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেপে একখানা বৃহদাকার বই আনিয়া বাপের হাতে দিল। বিশ্বম্ভর বড় বইখানা খুলিয়া দেখিল—রামায়ণ। জিজ্ঞাসা করিল—কেউ উপহার দিয়েছিল বুঝি ?

উত্তম কথা কহিল না। বিশ্বম্ভর একবার হাই তুলিয়া বলিল,—বেশ, বেশ—এ খবর ত' আগে জানতাম না ! টুকী, মন দিয়ে পড়িস।

টুকী বলিল,—পড়ব। মা রোজ পড়াবে বলেছে।

—তুমি কতদূর পড়েছিলে ?—জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বম্ভর অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, উত্তম তাহার দিকে অমন করিয়া চাহিয়া আছে কেন ? যেন রাগিয়া গেছে !

শিশুর মনে কোন্ কথাটা গাঁথিয়া যায়, কোন্ কথাটার সে অর্থ খোঁজে তাহা ত' কিছুই বলা যায় না ! আজ না হোক, কাল না হোক একদিন যদি টুকী আজকার কথাটা মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের পরিচয় কতদিনের যে পরস্পরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিই অজ্ঞাত রহিয়া গেছে ! তখন সে কি জবাব দিবে !

উঠিয়া আসিয়া এবং বিশ্বম্ভরকে তফাতে ডাকিয়া লইয়া উত্তম তাহাকে ঐ কথাটাই বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু বিশ্বম্ভর ভবিষ্যতের সাবধান হইবে শপথ করিলেও ইহা সে বিশ্বাস করিতেই চাহিল না, অতটুকু মেয়ের সে হুঁশ আছে। বিশ্বম্ভর মাথা নাড়িয়া বলিল,—ওটা তোমার অতিরিক্ত ভয় ।—তারপর একটা খাঁটি কথাই সে বলিল,—শুনতে ও পাবেই ; পাড়ায় যে সব ডাকিনীরা আছে—

শুনিয়া উত্তমের মুখ কালো হইয়া উঠিল ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে । সম্মুখে লণ্ঠন আর তরকারীর ডালা লইয়া উত্তম বঁটি পাতিতে যাইতেছে এমন সময় বিশ্বম্ভর খুব মুখ ভার করিয়া আসিয়া উত্তমের কাছে বসিয়া পড়িয়া হাত পা ছাড়িয়া দিল—যেন গুরুতর সমস্যার মধ্যে সে পড়িয়াছে—দুশ্চিন্তার ভারে মাথা তোলা যাইতেছে না ।

উত্তম খ্যাঁচ করিয়া একটা বেগুন দ্বিখণ্ডিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি ?

বিশ্বম্ভর অতি কষ্টে মাথা তুলিল ; বলিল,—একটা কথা ভাবছি, উত্তম । বলবো কি না—

উত্তম মুখ টিপিয়া একটু হাসিল ; বলিল,—বলো, মন হাল্‌কা হোক ।

—কিন্তু—

ঐ পর্যন্ত বলিয়াই বিশ্বম্ভর মাথা দুলাইতে লাগিল ; তারপর বলিল,—কথাটা খুব ভালও নয়, আর নেহাৎ যে খারাপ তা-ও নয়—তবে এখন তোমার ইচ্ছে ।

—আমি চলে' যাব ?

বিশ্বম্ভর আহত হইয়া বলিল,—না, না, ভালবাসা হয়েছে, এখন চলে যাবার কথা বলতে আছে !

—তবে কথাটা কি ?

—টুকী কই ?—বিশ্বম্ভর সাবধান হইয়াছে ।

উত্তম বলিল,—চপলাদের বাড়ীতে আছে ।

বিশ্বম্ভর লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া বোধ হয় উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া লইল ; বলিল,—কথাটা এই : আমার কয়েকজন খুব বন্ধু আছে ; আমার সংগে খুব তাদের দহরম-মহরম—একাত্মা হরিহর বললেই চলে । তারা অনেকদিন এ বাড়ীতে আসে না—

শুনিয়া উত্তমের স্থির রক্ত একবার মস্তিষ্ক পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইল ।

বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল,—তাই তারা তোমার অনুমতি চায়—

উত্তম চতুর্থ আলুটা কুচাইতে কুচাইতে একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল—নির্বোধ মানুষটিকে নির্বোধ জানিয়াই কে যেন নাচাইয়া দিয়াছে। বলিল,—তা আসুন তাঁরা। তোমার বাড়ীতে আসবেন তোমার সম্মতি নিয়ে ; তোমার মত থাকলেই হ'ল—আমার এত্তেলা সহবৎ কেন !

—হিরণ, মানে টুকীর মা থাকতে তারা হামেশাই আসত ।

—এখনও আসতে চান আসুন ; আমি তাতে বাধা দেব কেন ! আমার অনুমতি তাঁরা নিতে পাঠিয়েছেন কেন—তুমি বা কথাটা বলতে এমন ইতস্তত করছিলে কেন ?

বিশ্বম্ভরের "ইতস্তত" কেন ঠেকিতেছিল তাহা সে এইবার বলিল।

—তারা ত' আসবে, বসবে, আমোদ করবে ; তুমিও যদি বসো সেখানে, তবেই—তাই তারা—

—টুকীর মা থাকতো ?

দাঁতে জিব কাটিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—না, না ; সে ছিল বউমানুষ—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি অকারণেই নত হইয়াছিল—উত্তমের মুখের দিকে চাহিলে সে দেখিতে পাইত, তার মুখে যেন রক্ত নাই, ঠোঁট কাঁপিতেছে।

উত্তম একটু সময় লইয়া জবাব দিল ; বলিল,—কিন্তু টুকীর সামনে ত' তা হতে পারে না। আমি এসে আছি বলে' যে পথে সে যেতে পারে বলে' তোমার ভয় আছে, সেই পথটাই খুলে দেয়া হবে যদি তার সামনেই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি বসি।

বিশ্বম্ভর বলিল,—সে ঘুমুলে ?

—তা-ও হয় না ; তোমরা ত' আস্তে কথা কও না ; যদি সে জেগে ওঠে।

—কিন্তু আমি যে তাদের একরকম আশা দিয়েই এসেছি। বড় ক্ষুণ্ণ হবে তারা ; আমাকেই হয়তো—

—তুমিই রাজি হওনি, এই কথা বলবেন ত' তাঁরা ? তাঁদের কাউকে ডেকে আনো, যা বলবার আমিই বলব ; তুমি নিরপরাধ থাকো।

—ক্ষুণ্ণ তাঁরা হলেনই বা ; অমন ক্ষুণ্ণ অন্যত্রও তাঁরা অনেকবার হয়েছেন। তুমি হওনি ?

বিশ্বম্ভর এ প্রশ্নের কোন জবাবই দিল না, মুখ ব্যাজার করিয়া সে উঠিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত একটা শব্দও উত্তমের কানে আসিল।

এবং সে চলিয়া যাইবার পর উত্তম কিছুক্ষণ হাতের কাজ বিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া অদৃষ্টের ফেরের কথা ভাবিতে লাগিল।

নিশিকান্তের বৈঠকখানায় যাহারা বিশ্বম্ভরের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় একাসনে বসিয়া ছটফট করিতেছিল, তাহারা তত্রস্থ "পিত্তর যাত্রা-পার্টি'র" লোক—সবাই তারা অভিনেতা এবং পুরা তিন ছিলিম গাঁজার ধোঁয়া গিলিয়া তাহারা তখন নেশায় চোখ ঘোলা আর ছোট করিয়া বসিয়া আছে।

যাত্রার রিহার্সেল ঐ ঘরেই প্রত্যহ হয় ; আজ এখনো সবাই আসিয়া জুটে নাই।

প্রসাদ হঠাৎ বলিয়া বসিল,—গীতাভিনয় বড় একঘেয়ে লাগছে ভাই, আজ দু'দিন—বড় বদ্‌সুরো লাগছে, কেন তা জানিনে। অন্য কোথাও গিয়ে একটুখানি অন্যরকমের আনন্দ করলে কেমন হয় ?

বিচারের ভার সভার হাতে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ চুপ করিয়া রহিল।

তবলার মাথার তুলার গদিটা টানিয়া লইয়া ক্ষুদিরাম সেটাকে চার ভাঁজ করিয়া প্রসাদের গা বরাবর ছুঁড়িয়া দিল।

হ্যাঙ্গিং ল্যাম্পের শিখাটার উপর যাইয়া না পড়িতে পাইয়া একটা শুভ্র দেহ ক্ষুদ্র কলেবর পতঙ্গ কাচের আবরণের উপর বসিয়া অবিরাম পাখা কাঁপাইতেছিল—চিন্তামণি

তাহাই একমনে দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ সবাই নীরবে থাকিবার পর চিন্তামণি চোখ নামাইয়া বলিল,—ম'লো না বেটা—

—কে হে ?

—ঐ পোকাটা। প্রসাদ কি বলছিলে ? ও মনে পড়েছে, তা' নিন্দের হয় না। বিশ্বম্ভর ত' আমাদের সেই কবে থেকে একেবারে একঘরে করে' রেখেছে।

বিশ্বম্ভর মন্দিরার পুনঃ পুনঃ দড়ি আঙুলে জড়াইয়া আর খুলিয়া খেলা করিতেছিল, বলিল,—আমি কি করবো ?

ক্ষুদিরাম বলিল,—আমাদের নিয়ে বাড়ীতে বসাতে পারো—

এবং তারপর যে যে কথা উঠিল তার অধিকাংশই "গায়ের জুরি" আর উত্তমের অশ্রাব্য এবং বিশ্বম্ভর যাহা খণ্ডন করিতে পারিল না, তাহারই ফল পূর্বোক্ত উত্তম-বিশ্বম্ভর সংবাদ।

বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে থাকিতে উহারা মদ খাইয়া সেখানে যা তা হল্লা করা হইয়াছে—এখন তাহা হইতে পাইবে না কেন ?—চার পাঁচজনে সমস্বরে এই প্রশ্ন করিয়া বিশ্বম্ভরকে ঠাসিয়া ধরিয়া নিরুত্তর এবং জব্দ করিয়া দিলে বিশ্বম্ভরকে অগত্যা উঠিতে হইল—দু'দিক বজায় রাখা গেল না।

"শুনে আসি।" বলিয়া বিশ্বম্ভর উত্তমের কাছে শুনিতে আসিল ; কিন্তু ফল হইল না।

যাত্রাপার্টির কেহ কেহ আশা করিতেছিল, দৌত্য সফল হইবে ; কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছিল, দৌত্য নিষ্ফল হইবে।

নিশিকান্ত প্রথম দলের। সে তর্ক করিতে করিতে তবলা বাঁধা হাতুড়ি তুলিয়া লইয়া হাঁটু পাতিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে—এবং তাহারই পক্ষের বাসনওয়ালা শ্রীমন্ত দ্বিতীয় দলবর্তী "ক্ষেন্তীর পাঁচকড়ি"র সংগে "পাঁচ সিকা হইতে পাঁচ শো পর্যন্ত যত ইচ্ছে" বাজি রাখিতে যাইবে, এমন সময় বিশ্বম্ভর ফিরিয়া আসিল।

হাতুড়ি সমেত বসিয়া পড়িয়া নিশিকান্ত বলিল,—কি হ'ল হে ?

নিশিকান্ত বড় মুখ করিয়া বলিয়াছিল, রাজি না হয়েই পারে না—ওদের আমি চিনি। এখনো বড় আশা করিয়াই সে সংবাদ শুধাইল। কিন্তু বিশ্বম্ভর এত ব্যাকুলতার উত্তরে কেবল দু'বার মাথা নাড়িল, যেন মাথাটা নাড়িতে পারিলেই সব সমাচার জানান হইয়া যায়।

পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল,—খবর যৎপরোনাস্তি খারাপ—ওর মুখ দেখ্ না—এখুনি হেরেছিলি বাজি।

বাস্তবিকই বিশ্বম্ভরের মুখখানা তখন অপরাধীর মত নিষ্প্রভ। সতরঞ্চির বাহিরেই সে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—হ'ল না, ভাই ; কথাটা পাড়তেই পারলাম না।

সত্য কথাটা বিশ্বম্ভরের মুখে ফুটিল না। "একাত্মা হরিহর" সব বন্ধুগণের প্রতি আকর্ষণ তার যথেষ্ট ; সে বিষয়ে তাহাকে কেহ অবিশ্বাস করে না ; দুর্বলতাবশতই তার মনে হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার—সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া বক্তব্য জোরালো করিয়া আর জিদ দেখাইয়া। তাই সে উত্তমকে রাজি করিতে গিয়াছিল।

কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় তার মনের গতি ফিরিল ; তার মনে হইতে লাগিল, আমি তাহাকে ভালবাসি, সেও ভালবাসে। এককালে সে দশজনের পক্ষে

সুলভ ছিল বলিয়াই, কেবল সেই কারণেই, এখনও তাহাকে হাটের মধ্যে নিজে ডাকিয়া আনিয়া সুলভ প্রাপ্যের দলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং লোকসানের ভয় আছে—তাহাকে চিরদিনের মত হারাইবার ভয় আছে।

হারাইবার ভয়টাই ফলপ্রদ হইল বেশী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব তুলিয়া লইয়া সে বন্ধুগণের অপ্রীতি এবং বিরোধ বিদ্রূপের কথা ভুলিয়া গেল।

উত্তম সম্মত হয় নাই বলিয়া বিশ্বম্ভরের একটু আনন্দ জন্মিল; কিন্তু মুখে কাতরতার ছায়া না থাকিলে ত চলিবে না!

ক্ষুদিরাম বলিল,—সবুরে গিন্নী হ'লে পারতে; এ যে বাবা নিষ্ঠাবতী খাণ্ডারী; চোপা চালিয়ে তুলো ধুনে দেবে!

প্রসাদ এতক্ষণ বাক্যব্যয় করে নাই। সে এইবার বিশ্বম্ভরের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—এরা না বুঝুক, আমি দরদ বুঝছি হে বিশু। তবে একটা কথা এই যে, বনের পাখী নতুন খাঁচায় ঢুকিয়েছ; তুমি ভাবছ খাঁচা তার ভাল লাগছে; কিন্তু ভুল তোমার ভাঙবে—বেঁচে থাকি ত' তা দেখেই যাব।

শুনিয়া 'পিওর যাত্রা পার্টি'র সভ্যগণ আশান্বিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

সৎব্রাহ্মণ চিন্তামণি বলিল,—আশীর্বাদ করছি প্রসাদ, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

কিন্তু বিশ্বম্ভর শিহরিয়া উঠিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—যাই, ভাই, শরীরটে ভাল নেই।

চোখ বুজিয়া পাঁচকড়ি বলিল,—উড়বে বলেছে অমনি ভয়।

ক্ষুদিরাম বলিল,—আহা হা, যেতে দাও—

বন্ধুগণের 'একাত্ম' অট্টহাসির শব্দ কানে লইয়া বিশ্বম্ভর সিঁড়িতে পা দিল।

টুকী তখন লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া মায়ের সাহায্যে বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করিতেছিল।

বিশ্বম্ভর আসিয়া উহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—আমার ও কথাটা বলা ভাল হয় নাই—

—কে বললে?—বলিয়া উত্তম বিশ্বম্ভরের দিকে মুখ তুলিল।

—আমিই বলছি।

—শুনেই সুখী হলাম। তোমার 'হরিহর' বন্ধুরা এত অল্পে যে হাল ছেড়ে দিলেন?

—আমি ত' তোমার কথা বলিনি, নিজের কথা বলেছি, যেন তোমাকে আমি কথাটা বলতে সাহসই পাইনি। তোমার কথা বলতে ত' তারা আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে আসত—যে গুণ্ডার দল!

উত্তম নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল, —বড় খোঁটা দিলে একটা!—একটু থামিয়া বলিল,—বললে গিন্নী হ'লে পারতে, কিন্তু এ যে খাণ্ডারী!—বলিয়া মন ভাল না থাকা সত্ত্বেও বিশ্বম্ভর হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল,—কিন্তু তুমি ত' তেমন নও। আমিও কিছু ভাঙলাম না; ভাবলাম, ভয়ে ভয়ে থেমে থাকে, সে মন্দ নয়।

শুনিয়া অসাধারণ লজ্জায় উত্তমের মুখ হেঁট হইয়া গেল; বলিল,—স্ত্রীকে বেড়ালের মত বস্তায় পুরে বিদেয় করা কি দুধ মাছ দিয়ে তাকে পোষা তোমাদের ইচ্ছে; কিন্তু তাকে নিয়ে তোমাদের এ কি খেলা!

বিশ্বম্ভর বুঝিল না ; বলিল,—কার কথা বলছ ?

—তোমাদেরই কথা। খাণ্ডারী বলেই তারা আমায় ছেড়ে দিলে, কিন্তু হিরণ খাণ্ড়ারী ছিল না বলে তাকে তোমরা—

বলিয়া উত্তম অশ্রু দমন করিতে লাগিল। কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না যে, তাহাকে তোমরা তিলে তিলে হত্যা করিয়াছ।

টুকী বলিল,—হিরণ কে মা ?

কেহ কথা কহিল না। টুকীও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল,—বাবা, লক্ষ্মী, মোক্ষ, মিতিন, গিনিরা সবাই আমার বই দেখে গেছে ; ছবি দেখে তারা বললে, আমাদেরও বই আছে—মিছে কথা বাবা, তাদের বই নেই।

উত্তমের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অগাধ বেদনা তার মুখাবয়বে সুপরিস্ফুট হইয়াও বিশ্বম্ভরের চোখেও পড়িল না ; টুকীর কথায় সে হাসিয়া বলিল,—তাদের মা ত' তোমার মায়ের মত নয় !

টুকী বলিল,—তাদের মা কেবল মুড়ি ভাজে ; পড়তে জানে না।—বলিয়া মাতৃ-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া টুকী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উত্তম বলিল,—এ বেলা কি খাবে ?

বিশ্বম্ভর বলিল,—রুটী করো খানকতক, রাঁধা মাংস পোয়া দেড়েক নিয়ে আসি—

—কসাইয়ের মাংস খাবে ?

—খাব বই কি, চিরকাল খেয়ে আসছি—তার তাতে আপত্তি ছিল না ; তোমার আছে না কি ?

—না।—বলিয়া উত্তম ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

—আমি তোকে পড়াই এখন, আয়।—বলিয়া বিশ্বম্ভর উঠিয়া পুরোহিতের পূজার বসার মত করিয়া বেশ গুছাইয়া সরস্বতীর সম্মুখে শুচি হইয়া বসিল, বলিল,—বল্ দেখি এটা কি ?

টুকী বাপের মোটা আঙুল সরাইয়া দিয়া বলিল,—চ।

—এটা ?

—ঝ।

বিশ্বম্ভর পুলকিত হইয়া উঠিল, বলিল,—বাঃ, এরি নাম বিদ্যে ! খনা ছিল মেয়ে মানুষ—টুকীও তার মত শোলোক লিখবে।—বলিয়া টুকী কি শ্লোক লিখিবে তাহারই একটা নমুনা বিশ্বম্ভর প্রস্তুত করিবে এমন সময় বাধা পড়িল।

দরজা হইতে কে ডাকিল,—বিশ্বম্ভর ?

বিশ্বম্ভর চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—কে ?

—আমি ক্ষুদিরাম। শরীরটা ভাল নেই বলে এলে—এখন কেমন আছ তাই খোঁজ নিতে এলাম।

বন্ধু দুয়ারে আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করা নিশ্চয়ই দরকার ; হিরণের আমলে কোনো পিছটানের বালাই ছিল না, কিন্তু কিছু পূর্ব্বের তার নিজেরই সেই অনুভূতি যেন এখন বন্ধুদের অবাধে ভিতরে আনার পক্ষে নিষেধ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ তার নিজেরই কাছে এই নিষেধটা যেন কাপুরুষ নিমকহারামের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ক্ষুদিরাম হাঁকিল,—আসব ?

বিশ্বম্ভরের মনের স্বন্দ্ব দূর হইয়া গেল ; বলিল,—এস, এস, তার আবার জিজ্ঞাসা কি !

—ঘোমটা টানতে বলো।—বলিয়া ক্ষুদিরাম খুব শব্দাড়ম্বর করিয়া কাশিয়া সাড়া দিতে দিতে আর হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাঁড়াইল ; জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন আছ এখন ?

—বস। তারপর কি মনে করে ?

—মনে আর যাই থাক পাপ নেই—ডাকতে এসেছি।—বলিয়া ক্ষুদিরাম চাপিয়া বসিল, বলিল,—গোবরা এক কালোয়াৎ ধরে এনেছে, খাস দিল্লীর শিক্ষে—চল্।

বিশ্বম্ভর অনিচ্ছার সংগে উঠিতে লাগিল।

ক্ষুদিরামও উঠিয়া পড়িল, এবং হঠাৎ সেই ঘরেরই দরজার কাছে যাইয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনি ত দেখাই দিলেন না ! দাদাকে নিয়ে চললাম—কখন ফিরবে তার কিন্তু কিছুই ঠিক নেই।—তারপর হঠাৎ বলিল,—আসি ?

"আসি" কথাটা ক্ষুদিরাম যে সুরে উচ্চারণ করিল, উত্তমের কানে তাহা নূতন নহে, এখনকার মত বিদায় লইয়া আবার 'আসার' ইংগিতে অতৃপ্তির প্রার্থনায় পরিপূর্ণ সে সুর—উত্তম তাহা অনেক শুনিয়াছে। সে অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল,—আসুন।

ক্ষুদিরাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিশ্বম্ভরকে টানিয়া লইয়া একটা দণ্ডবত করিয়া বাহির হইয়া গেল, যেন কতবড় জয় সে করিয়াছে। এবং পথে উত্তমের সম্বন্ধে যে-সব কথা সে অনর্গল বলিয়া গেল তাহা নীরস, বিশ্বম্ভরের তাহা ভাল লাগিল না।

দিল্লীর শিক্ষিত বাঙালী কালোয়াতের গানও সে শুনিতে পাইল না, অর্থাৎ কালোয়াতের আগমনের সংবাদটাই মিথ্যা। ক্ষুদিরাম বলিল,—ক্ষমা কর্ ভাই, মুখ অমন করে থাকিসনে, যমের মত ভয়াবহ—তোকে না দেখে আমরা বেশীক্ষণ থাকতে পারিনে। বোস্।

"যমের মত ভয়াবহ"—ক্ষুদিরামের নিজের কথা নয় ; গীতাভিনয় হইতে চুরি।

কিন্তু বিশ্বম্ভর বসিল না। "তোমাদের সংগে আমার এই পর্যন্ত" বলিয়া বিশ্বম্ভর "পিওর যাত্রা পার্টির" সংগে যেন সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়া গোঁ হইয়া চলিয়া আসিল।

উত্তম জিজ্ঞাসা করিল—কেমন গান শুনলে ?

—মিথ্যে কথা বলে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে—কালোয়াৎ আসেইনি।

উত্তম হাসিতে লাগিল,—তোমায় ধরে নিয়ে যেয়ে তাদের লাভ কি হ'ল ?

—আমি ত উপলক্ষ—তোমার সংগে কথা কইতে এসেছিল ঐ ছুতো করে। তুমি ওর সংগে কেন কথা বললে ?

উত্তম তা জানে, সে অল্প অল্প হাসিতেছিল ; কিন্তু প্রশ্নের ভংগী শুনিয়াই তার হাসি মিলাইয়া গেল ; বলিল,—তাই সে অল্পে গেল।

—অল্পে না গেলে আমি ঘাড়ে ধরে তাকে বাড়ীর বার করে দিতাম।

বিশ্বম্ভরের উত্তেজনার দিকে চাহিয়া উত্তমের আবার হাসি আসিল, বলিল,—বেজায় মন্দ !

—ঠাট্টা নয়, তাই দিতাম। যাই, মাংস নিয়ে আসি।—বলিয়া বিশ্বম্ভর ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখিল, পয়সা আছে।

—অভ্যেস যায় না ম'লে।—বলিয়া যাইবার সময় একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বম্ভর বাহির হইয়া গেল।

উত্তম চেঁচাইয়া বলিল,—ঠিক কথা।

খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিশ্বম্ভর দেড় পোয়া রাঁধা মাংসের পরিবর্তে আধসের বেগুন আনিয়া দিয়া বলিল,—এই বেগুন ভাজো।

—মাংস পেলে না ?

—পেতাম কি না জানিনে ; মাংসের দোকানে আমি যাইনি।

—হঠাৎ অরুচি ?

— তুমি যে বারণ করলে !

— এত অনুগত তুমি তা ত' ভাবিনি। বিয়ের ঠিক পরের কথাগুলো তোমার মনে পড়ে ?

—পড়ে বই কি ; সে ত' সেদিনকার কথা।—বউ ছিল ছিচ্‌কাঁদুনে ; আর বার-মাস তার নাকে থাকত সর্দি—আর খালি পালাই পালাই করত।

— তারপর ?

—বড় হ'য়ে আর বিশেষ জ্বালায় নি।

শুনিয়া উত্তম একমুহূর্ত কি ভাবিল ; বলিল,—তারপর ?

—আবার তারপর কি ? তারপর, বৌ-মরা পুরুষ যারা, আলু ভাতে বেগুন পোড়া।

উত্তম হাসিয়া বলিল,—তারপরে তার ইচ্ছে শিরোধার্য করতে লাগলে কবে থেকে ?

—করতাম মাঝে মাঝে।

—সেটা থামল কবে ?

—অল্পদিন পরেই—বরদাস্ত করতে পারলে না—যা বলে তাই যেন বেদ-বাক্য—মাথায় চড়ে' গেল আর কি।

—প্রথম তার গায়ে হাত তুললে কবে ?

—তা মনে নেই। এত জেরা কেন তোমার ?

উত্তম বলিল,—না, তাই শুদোচ্ছি।

বিশ্বম্ভরের মনের মোটামুটি একটা ছবি উত্তম কৌশলে গ্রহণ করিয়াছে, স্থূলবুদ্ধি বিশ্বম্ভর তাহা টেরও পাইল না।

বিশ্বম্ভরের মনের প্রবণতার একটি হদিস পাওয়া গেল—মোহ তার জন্মে, কিন্তু অপছন্দ হইলে গায়ে হাত তুলিতেও তার বাধে না—নৈতিক মর্যাদার বোধ নাই—সূক্ষ্ম সুখ-দুঃখের অনুভূতির ধার সে ধারে না—গা ছাড়িয়া দিয়া ধরা দিলে সে ফেলিয়া দিতে চায়—বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ঘুরিয়া আসে—পনর' আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র।

বিশ্বম্ভর উত্তমের মুখের দিকে তৃষিত চক্ষে চাহিয়াছিল। বলিল,—তোমার চোখ দুটো বেশ—নেশায় লাল হয়ে ঢুলু ঢুলু হ'লে দেখতে আরো ভাল হয়।

উত্তম সে দিক দিয়া গেল না ; বলিল,—টুকীকে ডাকো ; সে চপলাদের বাড়ীতে আছে।

—ডাকছি। এই পয়সা ক' আনা রাখো।

কয়েকটি আনি দু'-আনি পয়সা উত্তমের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বিশ্বম্ভর তার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ তোমার হস্তে আত্মসমর্পণের আর কিছু বাকি রহিল না। কিন্তু তার মনের ভাবটি সত্য—ঐটুকু বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াই উত্তমকে একান্ত নিজস্ব করিয়া লওয়ার সুখে বিশ্বম্ভরের তখন বিহ্বলতা আসিয়া গেছে।

উত্তম বলিল,—সবই ত' আমার হাতে দিয়ে বসলে, যদি আমি নিয়ে-থুয়ে পালাই ?

—পুলিশ লেলিয়ে দেব ; ওয়ারেণ্ট বেরুবে—ক্যাঁক করে গিয়ে ধরবে !—বলিতে বলিতে উত্তমকে পাওয়ার সুখ বিশ্বম্ভরের রক্তে সঞ্চারিত হইয়া গেল।

উত্তম জিজ্ঞাসা করিল—বেগুন ভাজা আর রুটীতে হবে ত' ?

—হবে হবে—যাই টুকীকে আনিগে।—যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, টুকীর বিয়ের কি করা যায় বল ত' ?

অসময়ে অবান্তর প্রশ্ন, কিন্তু একান্ত ঘনিষ্ঠ মর্মসহচরীর কাছে এই উৎকণ্ঠা তখনই প্রকাশ না করিয়া বিশ্বম্ভরের চলিল না—উভয়ে যেন সমান অংশীদার।

উত্তম বলিল,—পরে বলব।

—বেশ। বলিয়া রাজি হইয়া বিশ্বম্ভর টুকীকে ডাকিতে গেল।

টুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে আড়কোলা করিয়া আনিয়া যথাস্থানে পেঁছাইয়া দিতেই উত্তম বলিল,—টুকীর বই ?

—তা ত' জানিনে ; তবে সেখানেই পড়ে আছে। চপলা বুঝি তখন বইয়ের কথাই বললে।

বিশ্বম্ভর আবার গেল। প্রথমবার উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই ; টুকী মাদুরের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল ; চপলারাই তিন-চারজন নিঃশব্দে বসিয়াছিল, কিম্বা বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছিল—কেবল চপলা তখন হাসিয়া বলিয়াছিল,—তোমার মেয়ে খুব বিদ্যেবতী হবে, বিশুদা ; ভারি ভক্তি ; বই মাটিতে পড়লেই বই কপালে তুলে আছড়ায়।

এবার কিন্তু সে একটা গুরুতর দুঃসংবাদ শুনিয়া আসিল।

রাস্তা পার হইয়া বাহিরের রোয়াক দিয়া যাইয়া চপলাদের যে ঘরে পেঁছান যায় সেটি তাহাদের বাহিরের ঘর—অন্তঃপুরিকাগণের ব্যবহারের ঘর সেটা নহে ; সেই ঘরের পর উঠান, এবং উঠান পার হইয়া তবে সেই ঘর যেখানে টুকীর বই আছে।

সেই ঘরের সম্মুখে আসিতেই বিশ্বম্ভর শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে,—মাগী মেয়েটাকে ভালবাসে—কিন্তু মাথা খাবে ঐ—বড় হ'লে নিয়ে পালাবে।

এ মেয়েরা সন্দেহের টানাটানি সহ্য করিতে পারে না ; যা বলিবে তাহাই যেন ঘটিতে বাধ্য এমনি তাদের অনাবৃত স্পষ্টতা। আর একজন কে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন ?

—খুকি ! বুঝিসনে যেন কিছু। রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে ; এসে বাঁধাবাঁধির ভেতর আছে—কিন্তু টুকীর রোজগারের বয়েস হ'লে—

উহাদের মধ্যে যে বিশেষ ধর্মভীরু সে "মাগো !" বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল।

প্রথমা বলিল,—তা যদি না-ও হয় তবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হবে—বেশ্যার হাতে মানুষ হচ্ছে।

উহাদের আলোচনা চলিতেই লাগিল।

বিশ্বম্ভর বই না লইয়া এবং কিছুমাত্র সাড়া না দিয়া ফিরিল—তার মনে হইতে

লাগিল, সহসা জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইয়া সে অন্তরে আঘাত পাইয়াছে খুব। উহাদের সন্দেহ ঠিক—টুকীকে যদি চুরি করিয়া উত্তম না পালায় তবে তার নামে যেন লোকে কুকুর পোষে। আর যদি নাও পালায় তবে বিবাহ তার দেওয়াই যাইবে না—ইহাও ওরা ঠিকই বলিয়াছে। কার এত গরজ পড়িয়াছে যে, ভদ্রলোকের মেয়ে ছাড়িয়া দিয়া বেশ্যার হাতে যে মানুষ হইয়াছে সেই টুকীকে ঘরে লইবে!

অত্যন্ত হতবুদ্ধি নিরালম্ব অবস্থায় বিশ্বম্ভর ফিরিয়া আসিয়া বারান্দা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই প্রান্তে যাইয়া বসিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া টুকীর দিকে চাহিয়া রহিল।

টুকী তখন ঘুম ভাঙিয়া খাইতে বসিয়াছে—তাহাকে তরকারী দিতে আসিয়া উত্তম জিজ্ঞাসা করিল—বই এনেছ?

বিশ্বম্ভর বলিল,—আর বই! আমার মাথা ঘুরে গেছে।

উত্তম বলিল,—তোমাকেও খেতে দি?

—আর খাওয়া! আমি আর খাব না।

বিশ্বম্ভরের চিন্তাশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া উত্তম হাসিতে লাগিল; বলিল,—মাংস থেকে বেগুন, বেগুন থেকে অনাহার। না খেলে যে মাথা আরো ঘুরবে।

—দাও খাই।—বলিয়া কয়েকবার মাথা নাড়িয়া বিশ্বম্ভর যেন অনিবার্য অদৃষ্টের হাতেই আত্মসমর্পণ করিল—এবং খাইতে বসিয়া বিশ্বম্ভর একটিবারও মাথা তুলিল না।

পানের বাটার কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া উত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—বই আনতে গিয়ে কি ঘটেছিল এমন যে তোমার মাথার মত মাথাও ঘুরে গেল?

—সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নেই—আমি নিজেই সাবধান হব।

—আর একজন সঙ্গে থাকলে তোমার সাবধান হবার সুবিধে হবে—যে ভোলা মন তোমার! তোমার যখন ভুল হয়ে যাবে আমি সাবধান করে দেব, আমার ভুল হ'লে তুমি দেবে।

কিন্তু বিশ্বম্ভরের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না—সম্মুখে যথার্থই গুরুতর বিপদ, কিন্তু উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুতেই ভাবিতে পারা যায় না যে, অনির্দেশ্য ক্রম ঘনায়মান অকল্যাণের ছাপ সঙ্গে লইয়া এ আসিয়াছে—বরং যেন ভরসা হয়।

বলিল,—বলিই কথাটা তোমাকে—

বিশ্বম্ভর চৌকা হইয়া বসিয়াছিল—হাঁটু তুলিয়া বসিল; বলিতে লাগিল,—বই আনতে গিয়ে শুনলাম তোমার কথা নিয়ে সেখানে কথা হচ্ছে—

উত্তম উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল,—একজন বলছে, তুমি নাকি টুকীকে নিয়ে পালাবে সে বড় হ'লে—তুমি যা করতে ওকে দিয়ে তাই করবে, রোজগার করাবে। আর তা যদি নাও কর, তবু টুকীর বিয়ে দেয়া যাবে না—

—কেন?

—তুমি মানুষ করছ বলে'।

উত্তমের ডান হাতখানা হঠাৎ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—হাতে জাঁতি ছিল, সেখানা ঝনাৎ করিয়া মাটিতে পড়িল।

পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃতি সম্বরণ করিয়া উত্তম হাতের জাঁতি তুলিয়া লইল, বলিল,—সে কথা বিশ্বেস কর তুমি?

বিশ্বম্ভর অকাতরে বলিল,—তা' করা যায় বই কি।

—তবে আমি যাব ?

বিশ্বম্ভর কথা কহিল না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তম বলিল,—কিন্তু আমি যে টাকা রোজগারের মতলবে টুকীকে নিয়ে পালাব না তার প্রমাণ আমি দিচ্ছি।—বলিয়া উঠিয়া গেল। বড় ট্রাঙ্কটি খুলিয়া টিনের একটি হাতবাক্স বাহির করিল, হাতবাক্সটি খুলিয়া বিশ্বম্ভরের চোখের সম্মুখে তার ডালা তুলিয়া দিতেই বিশ্বম্ভর যেন বিদ্যুতাহত হইয়া লাফাইয়া উঠিল।

বাক্সে আর কিছু নাই, বাজে জিনিষের দাগ পর্যন্ত বাক্সের ভিতরে নাই—রাশীকৃত স্বর্ণালঙ্কার একপাশে সাজান—আর একপাশে তাড়া তাড়া নোট।

বিশ্বম্ভরের দিশেহারা দৃষ্টির দিকে চাহিয়া উত্তম বলিল,—এ সব আমার। টাকা আমার ঢের আছে ; এখন বিশ্বেস করতে পারো বোধ হয়।

বিশ্বম্ভর যেন দ্বিতীয় জগৎ হইতে প্রশ্ন করিল,—কত টাকা হবে মোট, নোট গয়নায় ?

—পাঁচ হাজার।

বিশ্বম্ভরের তখনকার লোলুপতা বাস্তবিকই করুণার জিনিষ। একখানা অলঙ্কার হাতে করিয়া বলিল,—পাঁচ হাজারের সুদও ত' ঢের।

শুনিয়া উত্তম এত দুঃখেও না হাসিয়া পারিল না ; বলিল,—হ্যাঁ, সুদও ঢের।

—ব্যবসা বেশ চলতি ছিল, বলতে হবে।

উত্তম বলিল,—হ্যাঁ।

—এ সব কি একজনের দেয়া, না অনেকের ?

অকস্মাৎ নিজেরই অজ্ঞাতে উত্তমের চোখ এক পলকের জন্য নত হইয়া গেল ; পরক্ষণেই সে চোখ তুলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু বিশ্বম্ভরের প্রশ্নের জবাব দিল না।

বিশ্বম্ভর বাক্সের ডালা নামাইয়া দিয়া বলিল,—তবে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু উপায় ?

—এই টাকাতেই হবে, তুমি যদি না ওড়াও।—বলিয়া চাবির গোছা বিশ্বম্ভরের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া উত্তম বলিল, আমি এখন শুই ; আমায় আর কথা বলিও না।

—পান খেলে না ?

—বাধা পড়ে গেল।

অনেক কথা বিশ্বম্ভরকে তখন পাইয়া বসিলেও অতগুলি টাকার মালিক উত্তমকে আর ঘাঁটাইতে তার সাহসই হইল না।

অকাতর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিশ্বম্ভর অচিরেই নাক ডাকাইতে লাগিল ; কিন্তু উত্তম চোখ বুজিতে পারিল না। তাহার হতাশার অন্ত নাই।

এই বিশ্বম্ভর লোকটিকে কেন সে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা তার নিজের কাছে মাঝে মাঝে জটিল একটি সমস্যার মত মনে হয়—মনে হয়, অর্থহীন—তাহার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি কিছুই নাই—অন্তরের দিকে চাহিলেও চোখে পড়ে, সেখানে বিশ্বম্ভরের স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সেই তখনকার তার মনের আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে অপার আনন্দ দিয়া ভুলাইয়াছিল—গৃহবাসিনী হইয়া লালিত হইবার, লালন করিবার ইচ্ছার উত্তেজনা তাহাকে বোধ হয় অসহিষ্ণু চক্ষুহীন করিয়া দিয়াছিল। সে আকাঙ্ক্ষা আর ইচ্ছা আজো তেমনই অখণ্ড অটুট আছে, গঞ্জনার প্রহারে তাহার গায়ে দাগ পড়ে নাই ; কিন্তু তার সেই ইচ্ছাকে বিশ্বম্ভর যেন দুস্তর অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইতেছে।

সে যে সমাজের কতখানি গ্লানি তাহা সে জানে—তাহার অতিশয় সচেতন মনে যত তীক্ষ্ণ অপ্রত্যাশিত আঘাত লাগিতে পারে তাহা সে সহ্য করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু বিশ্বম্ভর তাহাকে ভালবাসিয়াও কেন এমন ! সে কেবল কাঞ্চনকেই নিয়ামক আর কাঞ্চনের বন্ধনকেই সর্বাগ্রগণ্য মনে করিয়া একমুহূর্তেই তার প্রাপ্য লোকলজ্জা, বিরূপ সমাজের লাঞ্ছনার শঙ্কা বিস্মৃত হইয়া গেছে।

সে কেউ নয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এতটুকু জোর সে পায় নাই যাহার জোরে সে নিজের মনের দ্বিধাটুকুও পরিত্যাগ করিতে পারে। মন কি তার কিছুই নহে !

বিশ্বম্ভর আর নিজেকে জড়াইয়া, বিশ্বম্ভরকে চিনিয়াও এই অবুঝ একই চিন্তা উত্তমকে যেন নিংড়াইয়া নিঃশেষ করিতে লাগিল।

টুকী এখন টুকটাক কাজকর্ম করে ; গৃহস্থালীর কাজে সে শিক্ষানবিশী করিতেছে। টুকীর প্রধান গুণ ধৈর্য ; একই কাজে বহুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে তার বিরক্তি কি চাঞ্চল্য জন্মে না—হাতের কাছে সে আদেশের প্রতীক্ষায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—ছটফট করে না।

উত্তম বলে—টুকী, কাপড় ছেড়ে রান্নার জল দে।

—দিই।—বলিয়া টুকী কাপড় ছাড়িয়া আসে।

একদিন কাপড় ছাড়িতে যাইয়া টুকী তার বাপের সংগে ফিরিয়া আসিল। বিশ্বম্ভর রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল,—টুকীকে কাপড় ছাড়তে পাঠিয়েছ যে ?

উত্তম বলিল,—টুকীর মুখে শোনোনি ?

—না।

—রান্নার জল দেবে।

বিশ্বম্ভরের মনে পড়িল, সে গৃহকর্তা ; বলিল,—তোমার শুচিবাই দিন দিন বাড়ছে দেখছি। গেরস্তের ঘরে ওটা কিছু কিছু থাকা ভাল ; কিন্তু তুমি অনেক গেরস্তের বৌকেও হার মানিয়ে দিতে পার।

উত্তম দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া রান্নার হাঁড়ি সরা প্রভৃতি ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছিল ; মুখ ফিরাইয়া বলিল,—আমি কি তা আমার মনে থাকে, কখনো ভুলিনে ; তোমার তা বারবার মনে করিয়ে দিতে আসার দরকার দেখিনে।

উত্তমের ভ্রূভংগীর করাল ঘটা দেখিয়া গৃহকর্তার গরম ছুটিয়া গেল ; বলিল,—না, তাই বলছি।

—আমার শুচিজ্ঞান নেই, কিন্তু ওকে শেখাতে হবে বলেই বাইরে দেখাই। এই কথাটি মনে রাখলেই তোমার অনেক কথা বাঁচবে, অনেক হেঁয়ালির উত্তর পাবে।

লম্বা বচন শুনিয়া বিশ্বম্ভর আরো দমিয়া গেল ; "তা ঠিক তা ঠিক" বলিতে বলিতে রান্নাঘরের বারান্দা ছাড়িয়া একেবারে শূন্য গোয়ালে যাইয়া উঠিল।

অসহ্য ক্রোধ সম্বরণ করিয়া উত্তম যখন টুকীকে আবার ডাকিল, তখনো টুকী জল ভরিয়া দিবে বলিয়া খালি ঘটিটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বলিল,—জল দেব মা ?

—দে।—বলিয়া উত্তম তাকাইয়া দেখিল সে কাপড় ছাড়িয়া আসিয়াছে কিনা।

টুকী দ্রুতগতি বাড়িয়া উঠিতেছে। স্বাস্থ্য তাহার চমৎকার, মুখশ্রী সুন্দর, সুকুমার,

বাঁধন-সুন্দর। কেবল তা-ই নয়, পড়াতেও সে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে; কথামালা ধর-ধর করিয়াছে, ধারাপাতের প্রায় সিকি কণ্ঠস্থ হইয়াছে ; টাকা আনা গণ্ডার অঙ্ক চিনিয়াছে।

বিশ্বম্ভর বলে,—আর কিছুদিন বাদে টুকী আমাকেই পড়াবে ; কিন্তু আমি ওর মত চটপট শিখতে পারব না।—বলিয়া চরিতার্থ হইয়া বিশ্বম্ভর হাসে।

টুকী বলে,—ধেৎ।

টুকী শেলাই শিখিতেছে, কার্পেটের উপর উলের কাজেও তার হাতেখড়ি হইয়াছে। মায়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা আর আনুগত্যের সীমা নাই—মা জানে কত।

কিন্তু তার কানে একদিন এক সুহৃদ বিষ ঢালিয়া দিল ; বলিল—টুকী, তোর হাতের ওই চুড়ি পেতলের না সোনার ?

টুকী বলিল,—সোনার।

—মানুষের ঘাড় ভেঙে কত টাকা এনেছে রে তোর মা ?

সরল মনে টুকী উত্তর করিল,—তা জানিনে।

শুনিয়া উল্লাসী, গুঞ্জ প্রভৃতি পাঁচ সাতটি মেয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

টুকী বলিল,—আরো গয়না দেবে বলেছে মা।

গুঞ্জ বলিল,—বিশ্বম্ভর বনেদি বনে গেল। ওলো টুকী, তোর মা এত সোনা পেলে কোথায় জানিস ?

টুকী জানিত না ; বলিল,—না।

মোক্ষ তার মায়ের চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সোনা কোথায় পাওয়া যায় মা ?

মোক্ষর মা হাসিয়া ধমকাইয়া উঠিল,—তোর সে খোঁজে কাজ কি লা হতভাগী! সব কথাতেই উনি আছেন—জেঠিমা!—মেয়েকে ঠেলিয়া দিয়া মোক্ষর মা টুকীকেই পুনশ্চ সম্বোধন করিল,—শুদোস তোর মাকে, এত সোনা তাকে কে দিয়েছে।

—বাবা দিয়েছে।

আবার সবাই হাসিয়া উঠিল। মোক্ষর মা বলিল,—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ—বিশ—ত্রিশ—শ—দুশো—অংগদ রায়বারের রাবণ রাজা—যেদিকেই চাই সেদিকেই তোর—হা হা হা।

হাসিতে হাসিতে একটি নিদারুণ কথা, সাপের বিষ—দাঁতে যেমন বিষ জমে তেমনি, মোক্ষর মায়ের জিহ্বাগ্রে আসিয়া জমিল—মোক্ষর মা অনুভব করিতে লাগিল, একটি স্থানে সেই সঞ্চিত বিষ ঢালিয়া বিষের ভাণ্ড উজাড় করিতে না পারিলে যেন সে নিজেই বাঁচিবে না।

মোক্ষর মা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। টুকীর হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে লইয়া গেল ; তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল,—তোর মা বেশ্যে ছিল ; গয়না দিয়েছে হাজার লোকে—তোর এ বাবা দেয়নি। যা শুদোকে তোর মাকে।—তারপর টুকীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিল,—শুদোস, বুঝলি ?

টুকী তখনই কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ; যেন পরের বশে উচ্চারণ করিল,—শুদবো।

মোক্ষর মা তাহাকে ঠেলিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল—টাটকা টাটকা শুধাইবে ; বিলম্ব হইলে ছেলেমানুষ যদি ভুলিয়া যায় ?

তারপর দলের ভিতর ফিরিয়া আসিয়া মোক্ষর মা অপরিমেয় তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে গলিয়া গলিয়া এমন হাসি হাসিতে লাগিল, যেন ইহজন্মে নিষ্কৃতির নাগাল সে পাইয়া গেছে।

টুকী জানিত, বিভিন্ন নামধারী এ-বাবা সে-বাবা বলিয়া মানুষের কিছু থাকে না। তাহার বুদ্ধি হইয়াছে ; ব্যাপারটি কি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা না হইলেও যেন অকারণেই তাহার কান্না পাইতে লাগিল।

লালমোহন আসিয়াছে, 'ভাগে ভাগে' রাঁধিতে হইবে, তাই সকাল সকাল উনুনে কয়লা দিয়া উঠানের ছায়াময় স্থানে বসিয়া উত্তম পায়ের আঙুলের ফাঁকে তেল দিতেছিল।

টুকী আসিয়া দাঁড়াইতে সে বলিল,—মুখ ভার করে এলি কেন রে ?

টুকী বলিল,—মোক্ষর মা তোমায় গাল দিয়েছে মা।

উত্তমেরব ুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। জীবনের কথা টুকীর কাছে লুকাইবার চেষ্টায় সে যেন অন্ধকারে কণ্টকবনে বেড়াইতেছিল—ঘরে সে সাবধান, কিন্তু বাহির হইতেই কোনদিন তার চেষ্টার কিভাবে অবসান হইয়া যাইবে, এই শঙ্কায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার সম্বিৎ চমকিয়া ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। কিন্তু অব্যবহিত পরের প্রশ্নটা তাহাকে করিতেই হইবে ; জিজ্ঞাসা করিল,—কি বলেছে ?

—বললে, তোর মা বেশ্যে ছিল !

তারপর টুকী বেশ্যা কাহাকে বলে তাহা প্রশ্ন করিল ; কিন্তু ঐ একটি কথা শুনিয়াই উত্তমের কান নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—টুকীর প্রশ্ন সেখানে প্রবেশ করিল না।

তারপর টুকী তার বাবার কথা কি বলিল, সোনার কথা কি বলিল, এবং আর কি বলিল না বলিল তাহাও উত্তম শুনিতে পাইল না ; সে যেন বিষের ঘোরে ঝিমাইতে লাগিল।

যখন উত্তম মুখ তুলিল, তখনও টুকী যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে ; তার বক্তব্য শেষ হইয়া গেছে।

টুকীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তমের মনে হইল, তার অম্লান সুপ্রসন্ন মুখশ্রীর উপর যেন গভীর ছায়াপাত হইয়াছে, সে ছায়া দুরপনেয়।

যে অতীত সে প্রাণপণে মুছিয়া দিয়াছিল, তাহাই যেন নবারুণের স্নিগ্ধ আলোক গায়ে মাখিয়া সুসজ্জিত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। জীবনের প্রবাহ তখন অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছ গৃহগোমুখীতে তার উৎস। কিন্তু যেদিন সেই প্রবাহ পঙ্কিল হইয়া উঠিল, সেইদিন আকাশের আলোক প্রবাহবক্ষে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। সে ভুল যেমন চিরসঙ্গী তেমনই অমার্জনীয়—তারপরের কথাগুলি সে ভাবিতে পারিল না—বুকে যেন কাঁটা বিঁধিতে লাগিল।

টুকীর মত যখন সে অতটুকু মেয়ে ছিল তখনকার দিনগুলি যেন জীবন্ত হইয়া তৃষিত রক্ত-ভুক সরীসৃপের মত তাহাকে শোষণ করিয়া নিস্তেজ করিতে লাগিল।

নিষ্পলক চক্ষে সে দাঁড়াইয়া আছে—টুকী তাহার সম্মুখে।

এমন সময় বিশ্বম্ভর প্রাতঃকালীন আড্ডা সারিয়া ফিরিল। তাহাকে দেখিয়াই টুকী বলিয়া উঠিল,—বাবা, মোক্ষর মা মাকে বেশ্যে বলেছে।

বিশ্বম্ভর উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল,—তাই বলেছে নাকি ! ভারি অন্যায় করেছে ত'।

আলাপী লোকের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়া যাওয়ায় লালমোহনের একটু দেরী হইয়াছিল—বিশ্বম্ভরের হাসির শব্দ দরজার বাহির হইতে শুনিয়া সে দৌড়াইয়া আসিয়া দেখা দিল, বলিল—হেসে যে ফাটিয়ে তুললে ! ব্যাপার কি ?

বিশ্বম্ভর বলিল,—টুকীর মাকে মোক্ষর মা বেশ্যে বলেছে, ভারি অন্যায় ত'। মেয়ের আমার আকুলি দেখ !—বলিয়া সে যেন হাসিতে হাসিতে দিশেহারা হইয়া গেল।

টুকীর বিমূঢ় মুখের দিকে চাহিয়া লালমোহনও হাসিতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু দৈবাৎ উত্তমের দিকে চোখ পড়িতেই সে হাসি বন্ধ করিয়া হাস্যনিরত বিশ্বম্ভরকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমকাইয়া উঠিল,—চুপ করো।

ধমক খাইয়া বিশ্বম্ভর থামিল। উত্তম মুখ ফিরাইয়া চলিতে সুরু করিল।

বিশ্বম্ভর বলিল,—টুকী, মোক্ষর মা মিছে কথা বলেছে তোকে ক্ষ্যাপাতে। কিন্তু খবরদার, মোক্ষদের বাড়ীতে কি কারু বাড়ীতে তুই যাবিনে আর। গেছ যদি শুনি, তবে হাড় গুঁড়িয়ে ছাতু করে' দেব।—বলিয়া বিশ্বম্ভর যাত্রার কায়দায় অত্যন্ত রুষ্ট এবং স্থির প্রতিজ্ঞের মূর্তি ধারণ করিয়া রহিল।

টুকী কি ভাবিল, সমগ্র ব্যাপারটা সে কিভাবে গ্রহণ করিল কে জানে ; কিন্তু হঠাৎ সে ফাঁৎ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া মায়ের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইয়া তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল।

তারপরই বাড়ী নিঃশব্দ হইয়া গেল। বিশ্বম্ভর আর লালমোহন ঘরে উঠিয়া গেল—উত্তম কোথায় আছে তার কোনো উদ্দেশই রহিল না—টুকীরও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লালমোহন বলিল,—সকালবেলাটাই মাটি করে দিলে হে।

—এমন কি হয়েছে ?

—দেখলে না ওর মুখখানা, কেমন যেন করছিল—

—তাই নাকি ? আমি ত' অত দেখিনি।

বিশ্বম্ভর চোখে দেখিয়াছে সবই, কিন্তু বুঝিতে পারে নাই।

—হুঁ্যা ; আমার ত দেখে ভয়ই হচ্ছিল।

—খুব রেগে গেছে বুঝি ?

লালমোহন ঘাড় নাড়িল, বলিল,—কি বল, রাগলে মানুষের ত' তেমন চেহারা হয় না—টুকীর কথায় অত হাসা ভাল হয়নি।

বিশ্বম্ভর কথা কহিল না ; কিন্তু মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। উত্তমের অধিকারে কুবেরের যে ভাণ্ডার সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহা তাহারই, উত্তম নিজের মুখে তাহা বলিয়াছে। সে যদি রাগ করিয়া টাকার বাক্সটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া যায় তবে ত—

বিশ্বম্ভর ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—টুকী ?

রান্নাঘরের ওদিক হইতে টুকী বলিল—উঁ।

—তোর মা কি করছে রে ?

—চান করে এল।

—এদিকে একবার আসতে বল।

লালমোহন ঘুরিয়া বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল—উত্তম আসিয়া দাঁড়াইল।

তার সদ্যস্নাত মুখমণ্ডলের উপর হইতে জল আর আলোর ইন্দ্রজাল তখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সিক্ত কেশ কাপড়ের উপর দিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া আছে, চোখের পাতা তখনো ভিজে, তাহাতে তাহাকে বিষণ্ণ দেখাইতেছে—গোটাকতক জড়ানো চুল ভুরুর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অতিশয় সংযত পবিত্র মূর্তি ; পরিচয় না দিলে এ যে কি তাহা বুঝিবার যো নাই।

বিশ্বম্ভর দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল,—আমায় ক্ষমা কর উত্তম ; না বুঝে ভারি অন্যায় করে ফেলেছি।—বলিয়া ক্ষমার্থী কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উত্তম বলিল,—কিছু অন্যায় হয়নি ; সত্যি কথাই বলেছ—আমার নাম সবাই জানে, মোক্ষর মা যা বলেছে তাই বলে। কিন্তু টুকীর কাছে ও কথাটি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, তুমি তা রাখতে দিলে না।

লালমোহন তার তামাকমাখা আঙুলের দিকে চাহিয়া বলিল,—সে বুঝতে পারেনি—আর জেনেইছে ত' তা নিয়ে আর—

—পরের মুখে শোনা আর নিজের বাপের কাছে তার প্রমাণ পাওয়া দুটো আলাদা কথা। সে বুঝতে পারেনি বলছিলেন, এখনই না পারুক বেশী দেরীও নেই। আজকার ব্যাপারটা সে ভুলতে পারবে না।

বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা করিতেছিল, "ক্ষমা করো" বলিয়া উত্তমের পা দুখানা জড়াইয়া ধরে, কিন্তু লালমোহন রহিয়াছে—

বলিল,—তুমি রাগ করনি ত ? চলে যাবে না ত ?

—তা যাব না।

লালমোহন হাত ধুইতে কুয়োতলায় গেল—বিশ্বম্ভর তখন হাত জুড়িয়া বলিল,—যাবে না ত ?

—যদি যাই তবে হাতবাক্সটি যেমন আছে তেমনি তোমাকে দিয়ে যাব। তেতালার বড়বাবু লোক পাঠিয়েছিল, তার কাছেই যাব।

বিশ্বম্ভর খাড়া হইয়া উঠিল,—কোন্ তেতালার ?

উত্তম বলিল,—এখান থেকে তেতালা ত একটাই দেখা যায়।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর চক্ষের নিমেষে সংহার মূর্তি ধারণ করিল—তৃতীয় নেত্র দিয়া অগ্নি নির্গত হইবার আগে শঙ্কাতুর মদনের দিকে চাহিয়া শিবের বোধ হয় এমনি চেহারা হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর খাটো গলায় গর্জন করিয়া বলিল,—ঐ শালা ! শালা তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল ! শালাকে আমি পথের মাঝে ধরে জুতবো। আগে বলনি কেন ?

উত্তম হাসিয়া বলিল,—মিছে কথা ব'লে।

—আমার দিব্যি মিছে কথা ?

—তোমার দিব্যি।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর সংহারমূর্তি সম্বরণ করিল ; বলিল—তাই বলো। সাহস পেলে ত ? বিশ্বম্ভরকে সবাই চেনে। সেবার—

কিন্তু উত্তম ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

লালমোহন অনর্থক এখানে আসে নাই ; উত্তমের বাড়ী বিক্রয়ের ভার সে লইয়াছিল ; বাড়ী বিক্রয়ের টাকা এবং ক্রয়-বিক্রয়—আইনজনিত কাগজপত্র সে দিতে আসিয়াছিল।

বৈকালে যাইবার সময় সেগুলি উত্তমের হস্তে অর্পণ করিয়া টুকীকে আদর করিয়া উত্তমকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া অবশেষে লালমোহন বলিল,—বিশ্বম্ভর বোকা, কিন্তু তোমায় সে ভালবাসে।

উত্তম একটু হাসিয়া বলিল,—তা জানি—

কিন্তু বলিল না যে, ঐ কারণেই আঘাত পেঁছায়, কিন্তু বসে না। নতুবা এতদিন তার চিহ্নও থাকিত না।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিতেই টুকী বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া গৃহস্থের সন্ধ্যার মাঙ্গলিক কর্মগুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইল—ধুনচিতে আগুন করিল, দুয়ারে জল ছিটাইল—মৃৎপ্রদীপের একটি প্রজ্বলিত সলিতা লইয়া তুলসীতলায় প্রদান করিয়া গড় করিল।

কাঠের চারপায়া একখানা সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া উত্তম তাহার উপর লক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপন করিয়াছে। ছোট্ট একখানি পিতলের রেকাবিতে দুটি পানের খিলি আর একটু চিনি দিয়া টুকী ভোগ সাজাইল—পিতলের দুটি গেলাসে করিয়া জল দিল। তেলের দীপের পাশে বসিয়া আর গলায় আঁচল জড়াইয়া টুকী লক্ষ্মীর বন্দনা আবৃত্তি করিল। উত্তম তাহাকে শ্লোকগুলি মুখস্থ করাইয়াছে।

ঘরের দুয়ারে পা মেলিয়া বসিয়া উত্তম চোখ দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল—কিন্তু মন তার যে চিন্তায় বিভোর হইয়া গেল তাহা বড় কঠিন।

আজ সারাদিন তার মনের আঁধার কাটে নাই—সকালবেলাকার সেই ঘটনার সূত্রে তার মনে হইতেছিল, তার নিজের মনটাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু—জন্মগত সংস্কার, শিক্ষার শাসন, গৃহের হাওয়া, সম্বিতের উন্মুখতা, বিবেকের অঙ্কুশ এতগুলি শক্তি যেদিকে টানিতেছিল—স্খলিত হইয়া সে তাহারই বিপরীত দিকে কি করিয়া আসিয়াছিল।

এ চিন্তা তার নূতন নয়, এবং তাই বলিয়া ছোট নয়—দীর্ঘদিন ধরিয়া সে স্তব্ধবাক হইয়া একটি নিমেষের কথা ভাবিয়া আসিতেছে। সেই একটি নিমেষে সমস্ত শক্তি অভিভূত পরাস্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতম একটি পথের পাশে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিল—নিদারুণ অন্ধতার মাঝে সে যে পথে পা বাড়াইয়াছিল, আজ পর্যন্ত সে পথের শেষ হয় নাই—শেষ চোখে পড়ে না। যাহা হইতে পারিত তাহার চিত্রটা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইয়াই তাহার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে।

কিন্তু তার সবটাই ত' অসত্য নয়।

এ মেয়েটি তার পেটের মেয়ে নয়—একেবারে পর—কিন্তু ইহার দিকে চাহিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তার দেহ যেন শীতল হইতে থাকে। চিরন্তনী কন্যা এ—বধূ, স্ত্রী, জননী—শরতের আকাশ যেমন অনাবিল, ইহার জীবনও আদি প্রান্ত হইতে কল্পনায় যতদূর দেখা যায় সেই শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত তেমনি ছায়াহীন অনাবিল—পৃথিবীর কাহারো দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সঙ্কোচের হেতু নাই।

এমনি করিয়া নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে উত্তম টুকীর ভাবনায় তন্ময় হইয়া যায়। সন্ধ্যার শান্ত সমাগমকে সে উর্ধ্বায়িত অন্তরে গ্রহণ করে।

টুকী শ্লোক আবৃত্তি শেষ করিয়া আসিয়া মায়ের কোলের কাছে বসিল ; বলিল—মা, শান্তর কথা বলো।

উত্তম পৌরাণিক অনেক কথাই জানে, সাধ্বী নারীর পাতিব্রত্য আর আত্মত্যাগের গল্প সে সহজ করিয়া টুকীকে শোনায়।

বলিল—কার কথা বলব ?

—সীতার কথা আবার বলো। সীতাকে আগুনে কেন ফেলা হ'ল !

—রাম রাজা ছিলেন কি না, তাঁর প্রজারা সীতার সতীত্বে—

—সতীত্ব মানে কি ?

—যে মেয়ে স্বামী বৈ আর কাউকে জানে না তাকেই সতী বলে।

—যে জানে তাকে কি বলে ?

—তাকে যাই বলুক, সে কথায় আমাদের কাজ নেই।

—বেশ্যে কাকে বলে মা ?

হঠাৎ উত্তমের কেমন গোলমাল হইয়া গেল। মেয়ে কথাটা ভোলে নাই—সে চিন্তিত হইল ; বলিল,—আর একদিন বলব। তারপর সীতার কথা শোন্।—বলিয়া উত্তম সীতার কথাই সুরু হইতে আরম্ভ করিয়া গল্প করিয়া গেল।

শেষ করিয়া বলিল,—সীতা স্বামী বৈ আর কাউকে জানতেন না, অপর লোকের মুখের দিকে চাইতেন না ; তাঁকে প্রণাম কর।

টুকী হাত দু'টি কপালে তুলিয়া সীতার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে কোন্ এক বদ্‌রাগী আর বদ্‌রসিক জমিদারের বাড়ীতে 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ' পালা গাহিতে যাইয়া সামিয়ানা চাপা পড়িয়া বিশ্বম্ভরদের "পিওর যাত্রা পার্টি" উদ্ধার হইয়া গেছে।

কিন্তু বিশ্বম্ভরের অবস্থা আজকাল ভাল।

উত্তম কিছু পুঁজি দিয়া তাহাকে দোকান করিয়া বসাইয়া দিয়াছে, দোকানের উন্নতিই দেখা যাইতেছে ; দোকানে চাকর রাখা হইয়াছে—ক্রমান্বয় বড় হইতে আরো বড় ঘরে দোকান স্থানান্তরিত করিয়া এখন যে ঘরে বিশ্বম্ভরের দোকান সে ঘরের ভাড়াই মাসিক পঁচিশ টাকা, পাশের বাড়ীটা নিজের টাকায় ক্রয় করিয়া সে বাড়ীর পরিসর বাড়াইতেছে।

উত্তমও ভাল আছে বলিতে হইবে।

পাড়ার নারী-সমাজের যারা মাথা তারা উত্তমকে ভক্তিপূর্বক শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে—মোক্ষর মায়ের প্রকাশ্য মুখের উক্তি, আর নিজেদের স্বগতোক্তি, তাহারা ভুলিয়া গেছে—তাহারা সবাই এখন উত্তমের মিষ্ট স্বভাবে মুগ্ধ, বিনয়ে প্রীত, আপ্যায়নে তুষ্ট হইয়া আছে।

কিন্তু ভিতরের আসল কথা এই যে, ফেরৎ দিব না সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াও ওদের কেউ উত্তমের কাছে ধার চাহিয়া খালি হাতে ফেরে নাই—ভদ্র স্ত্রীলোকের নাম উত্তম সংগে সংগে রক্ষা করে—আরো সুখ যে, কড়ার কবুল করাইয়া লয় না, চাহিতে লোক পাঠায় না, দেখা করিতে আসিলে চাহিয়া মানুষকে হেয় করে না।

কিন্তু সবার সেরা টুকী।

টুকী এখন তের বছরের ; মায়ের শাসনে আর শিক্ষায় সে এখন ঘোর পৌত্তলিক, অর্থাৎ তুলসীকে নারায়ণ মনে করে, সীতার ছবিকে পূজা করে—গৃহস্থালীর কাজে সে নিষ্ঠাবতী ও সূচীশিল্পে সুনিপুণা—কথাবার্তায় সুশীলা—ইত্যাদি।

সুখে স্বচ্ছন্দে সংযমে অবিলাসে একটা নিবিড়তার ভিতর দিয়া উহাদের দিন চলিতেছে।

কেবল মাঝে মাঝে বিশ্বম্ভর অকারণে গর্জন করিয়া প্রশ্ন করে,—টুকী তোমার কথা শোনে ত ?—তারপর কোন জবাব না আসিতেই সে আবার বলে,—যদি না শোনে, তবে আমাকে ব'লো।

যেন টুকীকে শায়েস্তা রাখিবার এবং পরিচালিত করিবার মুরদ একমাত্র তারই আছে।

বিশ্বম্ভরের গর্জন শুনিয়া টুকী আড়ালে যাইয়া হাসে। উত্তম বলে,—কথা শোনে।

বিশ্বম্ভর বলে,—রাঁধতে শিখছিস ত ?

টুকী আড়াল হইতেই বলে,—যা খেলে সবই আমার রাঁধা।

—তাই না কি ?—বলিয়া বিশ্বম্ভর মিনিটখানেক বিস্ময়ের ঘোরে থাকে—তারপর বলে,—পুরুষ মানুষ বশ হয় কেবল রান্নার গুণে : রূপে নয়, আর কিছুতে নয়, ভাল রাঁধতে পারলে ত' আর যায় কোথা—যাই দোকানে আমি গিয়ে বসলে রামপদ খেতে আসবে।

বলিয়া আরো দুটি পান মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইয়া যায়। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলে,—একটু চুণ দে টুকী, বোঁটায় ক'রে—

টুকী চুণ আনিতে যায়। সেই অবসরে বিশ্বম্ভর বলে,—আমি খুঁজছি ছেলে, বুঝলে ? যেমন টুকীর চেহারা তেমনি সুচেহারার একটি ছেলে পেলেই তাকে ধরব।

কিন্তু দুর্ভাবনায় উত্তমের বুক শুকাইয়া যায়।

টুকীর সমবয়স্কা মোক্ষর বিবাহ হইয়া গেছে ; এবং তারপরই টুকীর বিবাহ সম্বন্ধে বিশ্বম্ভরের উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে—তার আড়ম্বরের অন্ত নাই।

কিন্তু বিশ্বম্ভর টুকীর উপযুক্ত সুচেহারার কাহাকেও ধরিবার পূর্বেই লালমোহন পত্র লিখিল,—"তোমায় পত্র পাইয়াছি। আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে ; তাহাদের সংগে কথাবার্তা কহিতেছি। পাত্রের পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাত্রীকে দেখিতে যাইবে। না দেখা পর্যন্ত তাহারা বিশেষ কিছু বলিতে পারিবে না।"

চিঠির ফল অন্যদিকে যাহাই হউক, টুকী লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

উত্তম ডাকিলে সে চট্ করিয়া কাছে আসে না।

উত্তম একবার ত' তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গুটান বিছানার আড়াল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল,—ভয় কি, মা ?

টুকী তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—তুমি যে বড় একা থাকবে মা।

উত্তম তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। সে চিরদিনই এত একা যে তাহার তুলনা নাই—কোথাকার কোনো বস্তু এমন নিঃসংগ নহে—সন্ধ্যার একটি নক্ষত্র, মরুর আকাশে একটি পক্ষী এত নিঃসংগ নহে—তারাও পথিপার্শ্বে সংগীর আবির্ভাবের কথা ভাবিতে পারে, পথের প্রান্তে নিঃসংগতার অবসানের আশা করে ; কিন্তু উত্তমের তাহাও ছিল না।

রূপ ও সুখাপিপাসু লোকের অজস্র গমনাগমন হইয়াছে, কিন্তু আত্মার অক্ষয় সংগী হইয়া ওঠে নাই কেউ।

উত্তম হাসিয়া বলিল,—এমন পাগ্‌লামির কথাও শুনি নাই ; মা একা থাকবে বলে' মেয়ে শ্বশুরঘর করবে না ?

কিন্তু টুকী বুকভরা দুঃখের ভারে মুখ তুলিতে পারে না।

বিশ্বম্ভর লালমোহনের চিঠি হাতে করিয়া বিরক্তিভরে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিল,—ছেলে কেমন তা ত' লেখেনি, নির্বোধ—ছেলে আমি বাজিয়ে নেব ; তাতে বিয়ে হোক চাই না-ই হোক।

উত্তম বলে,—তা' নেব।

টুকী সরিয়া যায়। চারিদিকে চাহিয়া দেখে—তারই স্বহস্ত-রোপিত ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়া আছে, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা, গোলাপ—ফলের গাছে ফল ধরে—বিলাতি আমড়া, বকফুল, পাতিলেবু, করমচা, লিচু—

এখানকার ছোট ছোট মেয়েদের খেলার মেলা ঐ শিউলিতলায় বসে—তাদের খেলার পাত্রগুলি গাছের তলায় গড়াইতেছে, মাটিমাখা—

দেখিয়া টুকীর বড় একা একা মনে হয়—বুক ফাট্‌ফাট্‌ করে।

বিশ্বম্ভর বলিল,—টাকা দিয়েই যদি ছেলে কিনতে হয়, তবে বাজারের সেরা ছেলেই কিনব।—বলিয়া নিজের ব্যবসা-বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া বিশ্বম্ভর নিজের মনেই খুসী হইয়া ওঠে।

পুনরায় লালমোহনের চিঠি আসিল—"ছেলের বাপ আর কনিষ্ঠ ভাই মেয়ে দেখিতে যাইতেছে ; তাহাদের অভ্যর্থনার যেন ত্রুটি না হয় ; ইহারা খুব মানী লোক।"

চিঠি উত্তমের হাতে দিয়া বিশ্বম্ভর নিজেই ঝাঁটা লইয়া ঝুল ঝাড়িতে লাগিয়া গেল—কারণ লালমোহন লিখিয়াছে, "ইহারা খুব মানী লোক।"

উত্তম তাহার হাতের ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল, বলিল—কম্মের গোঁসাই, থাম—মাথার ঝুলটি ফেলে দিয়ে কাজে যাও—

বিশ্বম্ভর হাসিতে লাগিল ; বলিল,—যার কর্ম তার সাজে—তাই না ? কিন্তু আমরা যে তাদের চেয়ে কম মানী নই ওটা যেন ওরা মনে করতে না পারে।

—তুমি নিজে হাতে ঝুল ঝেড়েছ শুনলেই তারা তা-ই মনে করবে।

শুনিয়া টুকী দুঃখ তুলিয়া ফিক্‌ফিক্‌ করিয়া হাসে।

যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে ছেলের পিতা আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিলেন, এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইল না—দোকানের ভৃত্য রামপদ বিশ্বম্ভরের অনর্থক ফরমাস খাটিয়া খাটিয়া হয়রাণ হইয়া গেল—পা ধুইবার জল হইতে দাঁত খুঁটিবার খড়্‌কেটি পর্যন্ত ছেলের বাপ ধর্মদাস এবং ছেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আদ্যনাথের জন্য উত্তমই গুছাইয়া রাখিয়াছিল।

টুকীকে দেখিয়া তাঁহারা পছন্দ করিলেন ; বলিলেন,—খাসা মেয়ে।

তারপর টুকী তার হাতের লেখা দেখাইল, হাতের সেলাই দেখাইল, আলপনা-আঁকা কাষ্ঠাসন দেখাইল, উলের কাজ, ফুলের সাজি দেখাইল—এবং তারপর পরিবেশন করিয়া খাওয়াইল।

ছেলের বাপ ধর্মদাস আঁটসাট সাদা কালোয় মিশ্রিত আধপাকা চেহারা হিসাবী পাকাবুদ্ধির লোক ; মেয়ের রূপ গুণ দেখিয়া ষোল আনা তিনি পরিতুষ্ট হইলেন, তাহা বাচনিক প্রকাশও করিলেন ; কিন্তু দর কমাইলেন না।

বিশ্বম্ভর তবুও রাজি হইল ; বলিল,—টাকা আপনি চাইছেন, দেব; টাকার আমার ঘাটতি নেই—কিন্তু ছেলেটিকে আমরা একবার দেখব।

—তা দেখবেন। আই-এ পাশ ; ইটি তার ছোট ভাই ; এর চেয়েও সে দেখতে সুশ্রী।

বিশ্বম্ভরের মনে পড়িল, সেও মানী লোক। গম্ভীরভাবে বলিল,—তা যদি হয় তবে আমার অমত হবে না—তবু একবার দেখব।

ধর্মদাস বলিলেন—বেশ।

যাইবার সময় ধর্মদাস অজ্ঞাতে আনন্দস্মিত এই শুভ অনুষ্ঠানটিকে বিয়োগান্তক করিয়া তুলিলেন, ছেলেকে বলিলেন—আদু, তোর বৌদির মাকে পেন্নাম করে আয়—বিয়ে ত হবেই।

বিশ্বম্ভর হাসিতে লাগিল।

কিন্তু ওদিককার একটুখানি খোলা দরজাটা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—আদু ওরফে আদ্যনাথ যাইয়া ঠেলিয়া দেখিল, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

বিশ্বম্ভর বলিল,—উনি পেন্নাম বোধ করি, এখনই নেবেন না—

আদ্যনাথ অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জমুখে নতজানু হইয়া সেই বন্ধ দুয়ারের চৌকাঠের উপরেই কপাল ঠেকাইল।

বিশ্বম্ভর চেঁচাইয়া বলিল,—আশীর্বাদ কর গো—নতুন ছেলে পেন্নাম করছে।

টাকার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া ধর্মদাস হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন—এবং তিনি চলিয়া যাইতেই তিনজনে তিনস্থানে নির্বাক হইয়া রহিল—বিশ্বম্ভর উঠানে দাঁড়াইয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল—উত্তম চৌকাঠ ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, টুকী দাওয়ায় বসিয়া রহিল বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে।

আগে এমন হইলে বিশ্বম্ভর হাসিয়া উঠিত—কিন্তু শিক্ষা পাইয়াই হউক, কি ইহার সঙ্গে টুকী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই হউক আজ সে হাসিল না।

হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—আমি দোকানে চললাম।—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

টুকীর বিবাহের যথার্থ বিঘ্ন কোথায় তাহা কেবল ভাবিয়া তেমন স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় নাই—বালক প্রণত হইয়া, যাহা মনে অর্ধবিকশিত ছিল তাহারই যেন সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা স্থাপিত করিয়া রাখিয়া গেছে।

সেটা টুকীরও চোখে পড়িল, বলিল,—তোমরা আমার বিয়ে দিও না, মা।

—অমন কথা বলিসনে টুকী।

—বড় ভয় করছে আমার।

উত্তমেরও ভয় হইতেছিল। অতিশয় মর্মান্তিক ছলনার সত্য গোপনের শাস্তি আর কেহ ভোগ করিবে না—ভোগ যদি করিতে হয় তবে উহাকেই করিতে হইবে—সে এমন শাস্তি যে তার মাপ-পরিমাপ নাই।

মায়ের সম্বন্ধে টুকীর জানিতে কিছুই বাকি নাই—কিন্তু প্রসূত ফলের রসমাধুর্যই সারাপ্রাণ দিয়া সে অহর্নিশ উপভোগ করিয়াছে ; চরিতার্থতায় ধন্য কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া গেছে ; বৃক্ষমাতার কোথাও কদর্যতা আছে কিনা চোখ মেলিয়া তাহা সে দেখিতে যায় নাই।

ধর্মদাস দিনস্থির করিয়া পত্র দিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্র আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

লালমোহন লিখিয়াছিল,—"ছেলে আর তোমাকে দেখিতে হইবে না ; ইংরেজি-পড়া লায়েক ছেলে—তুমি কি বুঝিবে তার ! আর সে আমার চেনা জানা ছেলে।"

বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল—ধাপ্পাবাজ, ধর্মদাসের চেহারা দেখেই আমি তখনই বুঝেছি—দর বাড়াচ্ছে, বুঝলে ?

উত্তম বুঝিল। কিন্তু অধীর হইয়া বিশ্বম্ভরকে দিয়া পুনরায় পত্র লিখাইল—তাহার উত্তরে ধর্মদাস লিখিলেন,—আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আপনি অন্যত্র পাত্রের অনুসন্ধান করুন।

হঠাৎ বেনামী পত্র পাইয়া ধর্মদাস অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, "মহাশয়, আপনি যাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, সে ব্যক্তি একটি রক্ষিতা লইয়া বাস করিতেছে। কন্যাটি তার গর্ভজাতা নহে ; কিন্তু তাহাকে সেই স্ত্রীলোকটিই মানুষ করিয়াছে। অতএব সাবধান হউন।"

ধর্মদাস শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দিনস্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিয়া বেনামী পত্র পাইয়া তিনি পত্র লেখা স্থগিত রাখিয়া সন্ধান লইতে গুপ্তচর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—সে জানিয়া আসিল যে পত্রোক্ত কথা যথার্থ !

বিবাহ ভাঙিয়া গেল।

লালমোহন যাতায়াত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া অনুনয় করিয়া ধর্মদাসের নিকট হইতে তাঁহাদের আশ্চর্য ব্যবহারের কোনো কারণই বাহির করিতে পারিল না।

এমনি হইল চার পাঁচবার।

কেহ শত্রুতা সাধন করিতেছে নিশ্চয়ই। বিশ্বম্ভর আস্ফালন করিতে লাগিল,—পেলে তাকে কাটি—

কিন্তু পাওয়া তাকে গেল না।

বিশ্বম্ভর শত্রুকে কাটিতে না পারিয়া উত্তমকে দিনে দু'শোবার শুনাইতে লাগিল, তোমার জন্যেই আমার এই বিপদ।

উত্তম উত্তর করিতে পারিত, আমাকেই না হয় কাটো। কিন্তু আত্মগ্লানির উপরেও টুকীর ভাবনাই তাহাকে নীরব করিয়া দিয়া সকল ব্যথার বড় হইয়া উঠিয়াছে।

টুকীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া উত্তম বলে,—টুকী, আমায় তুই ক্ষমা কর—আমি তোকে সুখ দেব ব'লে আসিনি, কিন্তু তোর সুখ ইচ্ছে করেছি, ভগবান তা জানেন। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালাম আমিই।

টুকী তাহার পায়ের ধুলো লয় ; বলে—তুমি আমার মা, আমি কি তা ভুলতে পারি !

* * * কাহার মুখ দর্শনপূর্বক সেদিন ইহাদের প্রাতরুত্থান ঘটিয়াছিল কে জানে—পাত্র মিলিয়া গেল, বার্তাবহ বার্তা আনয়ন করিল, পাত্র আছে, সর্বতোভাবে উপযুক্ত ; তবে বয়স একটু বেশী।

উত্তম মুখ ভার করিল। বিশ্বম্ভর বলিল,—তা হোক। পাপের ফল ভুগতে ত' হবেই।

উত্তম থামিয়া গেল।

এই ছেলে অর্থাৎ লোকটির সঙ্গেই টুকীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। টুকী শ্বশুরঘরে গেল।

## ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

চিরটাকাল মানুষের ক্ষেতের ধান, গোহালের গরু, ঘরের কপাট প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আটক বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের দেনা শোধ করাইয়া বাহান্ন বৎসরে যখন পরিতোষের হুঁশ হইল যে, ধর্ম যদি কুত্রাপি থাকেন তবে এই বেলা তাঁহাকে স্মরণ করা দরকার, তখন সে পেন্সন লইয়া ঘরে আসিয়াছে। ধর্মে মন দিয়াই সে পুণ্যসঞ্চয়ের এবং বিতরণের প্রধান পন্থা সেই খোল কিনিয়া আনিল, আনিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজাইতে সুরু করিয়া দিল। পরিতোষের বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া এবং সেখান হইতে টুংটাং খোলার আওয়াজ আসিতেছে শুনিয়া ধর্মপ্রবণ দু'চারজন বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ বাজনা থামাইয়া, খোলের পেটের উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া বলিল,—এমন আশু ফলপ্রদ জিনিষ আর নেই, ভাই, এই খোল যেমন—চাঁটি মেরেছে কি মন সাদা; শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নিজের আবিষ্কার—তিনি পূর্ণতার অবতার কিনা; লোকের মন কিসে মজে তা তিনি জানতেন—অত বড় পণ্ডিত তখন ভু-ভারতে ছিল না; কিন্তু তিনি তর্ক কখন আগু বাড়িয়ে করতে যাননি—দাম্ভিককে শিক্ষা দিতে যেটুকু দরকার তার একতিল বেশী তর্ক কখন তিনি করেন নাই—তিনি সহজ সরল সর্বপাপহর হরিনাম দিয়ে গেছেন; গতিরন্যথা—কিন্তু চাই রুচি। রুচি সম্বল করে এসে বস, গাও না গাও শোনো বসে, অমনি দয়া পাবে—তুমি মুক্ত—

বলিয়া মুক্তিপথের মত অতি শুভ্রপুলকিত দন্তপাতি সে শ্রোতৃবর্গের সমুখে প্রসারিত করিয়া দেয়।

বঙ্কু বলে,—বটেই ত'।

মূল বক্তার উক্তির সমর্থন করিবার লোক আছে দেখিয়াই বোধ হয় সংশয়ীর সংশয় দূর হইয়া যায়; যাহারা দাঁড়াইয়াছিল এত সুলভে পাপক্ষয় করিয়া লইবার প্রলোভন তাহারা সম্বরণ করিতে পারে না; চাপিয়া বসে। পরিতোষ বলে,—প্রমাণ পেলে ত হাতে হাতে! বসতে ত' আমি তোমাদের কাউকে বলিনি—তবু তোমরা বসলে কেবল নামের গুণে। এস, ভাই, নাম করি—হরিনাম সর্বনামসার।

খোলের বাদ্যের সঙ্গে সবাই মিলিয়া সমস্বরে হরিনাম করিতে লাগিয়া গেল—"নিতাই এনেছে নাম—হরিবোল, হরিবোল।"—দ্বিতীয় দিনে তিন জোড়া করতাল আসিয়া পড়িল।

তারপর, ক্রমশঃ নামপিপাসু ভক্তগণের সংখ্যা বাড়িয়ে এখন পরিতোষের বৈঠকখানা মোক্ষ বিতরণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে—লোকে সেই পথে চলিতে চলিতে স্থান-মাহাত্ম্যে সেখানে দাঁড়াইয়া পড়ে—বৈঠকখানার ধুলা হাতে করিয়া কপালে মাখে।

দেনাদারের টাকা আর ডিগ্রীদারের ঘি দুধ খাইয়াই হোক, কি ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াই হোক, পরিতোষের দাঁতগুলি মজবুত আছে ; চুল একটিও পাকে নাই ; পরিপাকশক্তি হরিনামের সংগে মাল্‌পো খাইবার মত তেজস্বী ও প্রচুর।

কিন্তু পরিতোষ বিপত্নীক ; ছত্রিশ বছর আগে সে ধুমধাম করিয়া বিবাহ করিয়াছিল— "দুদিনের জন্যে" ; স্ত্রী অল্পদিনেই মারা যায়—সেই হইতে যত্ন করে এমন একটি নিঃস্বার্থ আপনার লোক পরিতোষের নাই বলিয়াই জনশ্রুতি—কিন্তু নাম বিতরণের তিন দিন না যাইতেই নিখরচায় যত্ন করিবার লোক তাহার মিলিয়া গেল ; বঙ্কু তাহার বড় ভক্ত হইয়া উঠিল—সংগ ত্যাগ করে না ; পরিতোষ যেদিন তার নিজের বাড়ীতে আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেদিন বঙ্কুই রাঁধে বাড়ে, জল তোলে, বাসন মাজে, ঘাড়ে করিয়া কাঠকয়লা বাজার আনে—কিন্তু খায় না, বলে—কণিকামাত্তর দাও ঠাকুর।—বলিয়া একটিমাত্র অন্ন লইয়া মুখে দেয়।

যে হাতে করিয়া অন্ন গ্রহণ করে সে হাতখানা যেন তার নিজের নয়, কোন এক মহাপুরুষের, এম্‌নি শ্রদ্ধাভরে আর সন্তর্পণে স্বতন্ত্র করিয়া একদিকে তুলিয়া রাখে—হাত ধুইয়া হাতের জল কাপড়ে কি গাম্‌ছায় না মুছিয়া মাথায় মোছে।

বঙ্কুর বুকে সর্বদাই আড়ষ্ট ভাব, চোখে শঙ্কিত ভাব, হাতে পায়ে তটস্থ ভাব।

যখন চাকরিতে ছিল তখন পরিতোষের আয় ছিল ঢের ; পেন্সনের তের টাকা নয় আনা পাঁচ পাই তার সিকিরও কম—অত রোজগারেও টাকা বিশেষ জমে নাই , বাজে খরচ ঢের ছিল বলিয়া কাঁচা আমদানি দাঁড়ায় নাই, অথবা কাঁচা আমদানি ছিল বলিয়াই বাজে খরচ ঢের হইত তাহা বলা যায় না। তবে ঋণ কিছু ছিল ; সরকারী তহবিলে যে টাকা জমিয়াছিল তাহাই তুলিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে—"হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে।"

ধর্ম জগতে তেমন আয় নাই ; উদ্ভট একটা কিছু দেখিলেই লোকে তেমন আর প্রণামী লইয়া দর্শন করিতে ঠেলাঠেলি লাগায় না—তবু ঢাক বাজাইয়া খুব একটা বিপ্লব সমারোহ ঘটাইয়া তুলিতে পারিলে কিছু সুফলের আশা করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে বিস্তর "আগাম কাঠ খড়ের" দরকার—

কেওটপাড়ার পাঁচু কেওট কি শনিবারে ধর্মরাজের "ভর" আনাইয়া দোতালা বাড়ী করিয়াছে—সে-ও এখন অস্তোম্মুখ—এখনো তাহাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া উঠিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহাতে যেমন চাই লোকবল, তেমনি চাই পরিশ্রম ; পরিতোষের মন ওঠে না।

সুন্দরী বলে,—তোমায় নিয়ে আমার চিরকালই দুঃখে গেল। দুঃখে ভাজা হয়ে গেছি। বলিয়া সুন্দরী আড়চোখে শরীরের দিকে চায়, যেন দুঃখে ভাজা হইয়া না কাটিলে চামড়ার রং ফর্সা থাকিত।

পরিতোষ বরাবর গম্ভীর এবং হাসে কম। সুন্দরীর অভিযোগে সে গম্ভীরভাবে বলে,—চিরকালের কথা আমায় ব'লো না। আমি ত' আজ তিরিশ বছর দেখছি—ঠিক এম্‌নি—টোল খেতে দেখলাম না কখনো। তার আগে—আচ্ছা তোর বয়স কত হ'ল ঠিক করে বল্‌ দেখি ?

সুন্দরী চট্‌ করিয়া বলে,—বত্রিশ।

—বটে। আমার সংগে সেই আস্তাকুঁড়ে প্রথম যখন দেখা তখন তুমি দু'বছরের এই তুমি বলতে চাও!—বলিয়া পরিতোষ আরো গম্ভীর হইয়া যায়। তারপর মনে মনে

হিসাব করিয়া বলে,—যেবার তুই এই ডোমপাড়ার বাড়ীতে আসিস সেবার আমি উশ্বপুরে প্রথমে বদ্‌লি হই—সে আজ উনত্রিশ বছরের কথা—মনে আছে ?

সুন্দরী কোঁদল লাগায় ; বলে,—হিসেব মউরী আমার ! অত হিসেব নিকেশে কি হবে শুনি ? তুমি যেমন ছোক্‌রা, আমি তেমন ছোক্‌রী।—বলিয়া হন্‌হন্[1] করিয়া চলিয়া যায় ; অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া থাকে।

সময়টা রাত্রি। পরিতোষ খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে।

কাঁদা ডোমের চালার সামনে কাঁচা কয়লার স্তূপে আগুন দিয়াছে—তরঙ্গিত অগ্নির ধূমাগ্র শিখা লক্‌লক্ করিতেছে—তার রক্তচ্ছায়া পুষ্করিণীর জলের ভিতর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেছে—একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ার কঞ্চি আর বাঁশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—ঊর্ধ্বে খানিকটা স্থানের পাতাগুলি শির শির করিয়া কাঁপিতেছে।

সুন্দরী একেবারেই উধাও হয় নাই ; রাগ করিয়া গেলেও কাজেই গিয়াছিল।

আঁচলটা সুষ্ঠুভাবে গায়ে জড়াইয়া সে পরিতোষের পাশে আসিয়া জড়ো হইয়া বসে ; বলে—কি দেখছিস ?—বলিয়া পরিতোষের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আগুন দেখিতে পায়।

দু'টি লোক আগুনের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল—একজন একদিকে চলিয়া গেল—একজন সেখানে আগুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—লোকটির পায়ের কাছে একখানা বাঁশের লাঠি পড়িয়া আছে, মৃৎকলসী যেটা যেখানে লুটাইতেছে সেটা বোধ হয় তাড়ির।

দুইজনেই সেই দিকে চাহিয়া থাকে—পরিতোষ একসময় বলিয়া ওঠে—বলতে নেই, কিন্তু মড়া পোড়ানোর কথা মনে পড়ে গেল।

—ভয় কি ! তোকে আমি কবরে দেব।—বলিয়া সুন্দরী খল্‌খল্ করিয়া হাসে ; বলে—গোটাকতক টাকা দে দিকিনি ! আকিন্ ডোমের বউ এসেছিল, টাকা নিতে, দেব বলেছি ; টাকায় দু'আনা সুদ মাসে—দিবি ?

—কোথায় পাব ?

—পাখীর মত শেখান বুলি ত' তোর আছেই ! "কোথায় পাব ?" শুদিয়ে কোনো ফল পেয়েছিস আমার কাছে, কি কারু কাছে ? আমি টাকার ভাঁড়ার দেখিয়ে দিতে পারিনি—ভাল কথা, শুনেছি ও-বাড়ীতে নাকি হাঁড়ি কেড়েছ—বঙ্কু পেসাদ পাচ্ছে ?

পরিতোষ বলিল—হুঁ।

—সে খরচ ত' চলছে !

—চালাতে হচ্ছে—চার ছড়াচ্ছি, চারে মাছ এল বলে। কিন্তু টাকা আমার নেই।

—দে গোটাচারেক নিদেন পক্ষে—ভরি চল্লিশেক রুপো পাওয়া যায়।

পরিতোষ নির্লিপ্তভাবে বলিল,—দেখি চেষ্টা।

কিন্তু সে জানে, চেষ্টা করিবার স্থান নাই বলিলেও চলে—টাকার অভাব কিছুদিন হইতে বড় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

—দেখ্ তাই, মাথা খাস ! ওমা, ভাত বুঝি পুড়ে আঙার হয়ে গেল।—বলিয়া সুন্দরী দৌড়াইয়া গেল।

পোড়ে নাই, কেবল ধরিয়া উঠিতেছিল—রান্নাঘরে ভেতর হইতে সুন্দরী বলিল,—কাল সকালে আসবার সময় একেবারে বাজার করে আনিস, চুনো মাছ খেতে খেতে ছাই অরুচি ধরে গেল—মোটা মাছের ভাগা পাস তো আনিস !—বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া

থাকিয়া উত্তর না পাইয়া সুন্দরী মুখ বাড়াইয়া দেখিল, পরিতোষ তাহাকে না জানাইয়াই বাহির হইয়া গেছে।

"এখন এত ভাত কে গিলবে!" বলিয়া হাঁড়ির দিকে চাহিয়া সুন্দরী আপন মনেই ঝগড়া করিতে লাগিল।

কীর্তন-সভায় পরিতোষের আর অষ্টপ্রহরই উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হয় না, দাসরসে আপ্লুত বঙ্কু খবরদারী করে, আর ঝুঁকি সামলায়।

সুন্দরীর বাড়ী হইতে পরিতোষ নিজের বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, বঙ্কু মাদুর পাতিয়া খোল-করতাল স্থাপিত করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আলোর তেজ কমাইয়া রাখিয়াছে এবং তামাক সাজিয়াছে, টিকা ধরাইয়া লইলেই হয়।

নিখুঁত প্রভুভক্তি এবং দূরদর্শিতা দেখিয়া পরিতোষ হৃষ্টা হইয়া বসিল। আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল, খোলে দু'বার তর্জনীর আঘাত করিতেই বঙ্কু ভিতর হইতে বলিল, "এসেছ দয়াল?"

পরিতোষের নিজের বাড়ী মানে ঐ একখানা ঘর, দুটি কুঠ্রী; একটি বৈঠকখানা, একটি শয়নঘর; ঘেরা বারান্দায় রান্না হয়।

বঙ্কু আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল—টিকে ধরাব গোঁসাই?

—ধরাও, ততক্ষণে আসুক সবাই।

টিকে ধরাইয়া হুঁকাটি পরিপাটি করিয়া মুছিয়া পরিতোষের হাতে দিয়া বন্ধু বলিল, —একটা কথা বলব, প্রভু?

বঙ্কু পরিতোষকে কখন বলে প্রভু, কখন দয়াল, কখন গোঁসাই, কখন অবতার, কখন গোর। গুরুর অনুকরণে বঙ্কু গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছে।

কথা বলিবার অনুমতি চাহিয়া বঙ্কু অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া রহিল।

পরিতোষ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—বল।

—কথাটি বলবার তরে সেই বারটা থেকে হিক্কে তুলে 'বেড়াচ্ছি—খুঁজতে বেরোইনি, তুমি বিরক্ত হবে বলে'। শুনবে কথাটা?

—শুনব।

—রাখ'ত' বলি।—বলিয়া ভিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে মাথা কাত করিয়া বঙ্কু সকাতরে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া হাসিবার কথা, কিন্তু পরিতোষ সহজে হাসে না। বলিল,—বল শুনি। রাখবার মত হয় রাখব।

—রাখবার মত নয় এমন কথা আমি কোনদিন কয়েছি, গোঁসাই! মনে করে' দেখ, অমন কথা একটিও পাবে না।—বলিয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিল,—বিয়ে করবে?

পরিতোষ তার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; বলিল,—হঠাৎ?

—না, প্রভু, তোমাকে করতেই হবে—বল করবে?

—ভেবে দেখি।

—তা' তুমি দেখ। কিন্তু অমত করো না।—বলিয়া হঠাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া বঙ্কু পরিতোষের দু'পা জড়াইয়া ধরিল—তার বৃহৎ ধড় আর ছোট মাথাটা নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

পরিতোষ বলিল,—ওঠ্। তোর এত আগ্রহ কেন রে?

বঙ্কু উঠিল না ; বলিল—তোমার মনে সুখ নেই, প্রভু, আমি জানি।

—বিয়ে করলে সুখ হবে ?

বঙ্কু আশান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন সে বলিলেই হইবে ; বলিল,—হবে। তোমার চরণ ছুঁয়ে বলছি হবে।

—আমি যে বুড়ো।

—তবু হবে।

—আমার মনে সুখ নেই, আর বিয়ে করলেই আমার দুঃখ যাবে, তুই কেমন করে' জানলি ?

বঙ্কু তীরের মত সোজা। বলিল, টাকা দেবে ঢের।

—কত ?

—ঢের।

—তবু কত ?

—দেড় হাজার ত' দেবেই—

কিন্তু কথা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না—কীর্তনীয়া-ভ্রাতারা একদল আসিয়া পড়িলেন।

পরিতোষ বলিল,—আমি বিয়ে করব সুন্দরী !

—অক্লেশে। আমি বউয়ের কি হব ?—বলিয়া সুন্দরী ঘুঁটের ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘুঁটে হাতে করিয়া আসিয়া ভুরু তুলিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী বাড়ীর তিনখানা ঘরের একখানাকেই ঘর বলা চলে—যেখানায় গরু থাকিত সেখানা পড়ো পড়ো হইয়া আছে—কবে কার মাথায় পড়ে ঠিক নাই—আর একখানা ঘর নয়, বেড়ার সংগে আধলা বাঁশ সারবন্দী করিয়া টিনের আচ্ছাদন দেওয়া আছে—সেখানায় রান্না হয়—দরজা আছে।

ভূতপূর্ব গোয়ালে কয়লা-ঘুঁটে থাকে। পরিত্যক্ত ভাঙা বাক্স, অকেজো কেনেস্তারা, টিনের দুটো ফুটো মগ ইত্যাদি সেখানে থাকে—পায়রা পোষা কবে হইয়াছিল—তার কেরোসিন কাঠের বাক্সটি সারা গায়ে উঁইয়ের মাটি মাখিয়া সেখানেই পড়িয়া আছে।

ঘুঁটে ক'খানি মাটিতে নামাইয়া সুন্দরী প্রশ্নের উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, যেন বউয়ের সংগে তাহার কি সম্পর্ক হইবে জানিতে পারিলেই আর কোনো গোল থাকে না।

পরিতোষ বলিল,—এমন অবস্থায় কি হয় তা' ত জানিনে—যা হোক কিছু হবে।

—ঠাট্টা নয়, সত্যি করবে নাকি বিয়ে ?

পরিতোষ তার মুখের দিকে চাহিল—মুখ অপ্রসন্ন নয় ; বলিল—বঙ্কু ত' আড়ে হাতে লেগে গেছে ; না করিয়ে ছাড়বে না। আমিও ভেবে দেখলাম করাই সংগত। সবাই ত' অসময়ে পালাবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ও বাড়িতে হাঁড়ি কেঁড়েছি ; এখন, না পালাতে পারে, এমন একটি লোক আমার চাই।

সুন্দরী ভ্রূভংগী করিয়া বলিল,—পালাবার জন্যে মুখিয়ে আছি ! এতদিন বাদে বড় নেমকহারামের মত কথা বললে, ভক্ত আমার ! সেবার জলবসন্ত হ'লে কে ঘেটেছিল বসে' বসে' ?

—তুমি।

—তবে ?

—হাজার দেড়েক নগদ পাওয়া যাবে, বন্ধু বলেছে।

—তবে আমার ওজর নেই, করো তুমি বিয়ে। আর পারিনে দিন-রাত নেই নেই করতে—ইঁদুরে খুঁটে খাবে এমন দানাটি নেই ঘরে। আমার মায়ের মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে—মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে ; আমি ডোমপাড়ার ঘাটে মরব না—তুমি বিয়ে করো।—বলিয়া সুন্দরী ঘুঁটে লইয়া প্রস্থান করিল।

এই পরিতোষই টুকীর বর।

বিবাহ অকাট্য এবং চূড়ান্ত হইয়া যাইবার আগে আর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই :

একদিন ধূলায় মাখামাখি হইয়া, রৌদ্রে ভাজা-ভাজা হইয়া, তৃষ্ণায় প্রাণান্ত হইয়া নৃপেন্দ্রনগর হইতে ছেলে দেখিয়া বাড়ী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় এলাইয়া পড়িয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—আর পারিনে আমি—খুন হ'য়ে গেলাম—

বলিয়া বিরক্তভাবে হাঁটুর কাপড় টানিয়া তুলিয়া দিয়া বিশ্বম্ভর ধূলোচ্ছন্ন পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

উত্তম আসিয়া দাঁড়াইল। টুকী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল বাপের হাতের কাছে রাখিয়া দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

গা একটু জুড়াইলে বিশ্বম্ভর সুখবরটা প্রকাশ করিল,—তবে এইবারই শেষ ; আর আমি যাচ্ছিনে কোথাও—

"কি হ'ল ?" প্রশ্নটি মুখে করিয়া উত্তম দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু বিশ্বম্ভরের রকম দেখিয়া তাহার মুখ ফুটিল না।

বিশ্বম্ভর হাঁ করিয়া খানিকটা বাতাস ছাড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—ছেলে কালো রোগা বিশ্রী। আমার পছন্দ হ'ল না—তবে আর একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, সেখানেই দেব।

বিশ্বম্ভর ছেলে দেখিতে গিয়াছিল—পথের কষ্টে উত্তমের উপর আর তৎসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উপর তিতি-বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দ্বিতীয় পথিক সেই গাছের ছায়াতেই আসিয়া বসিল। সেই পরিতোষের বন্ধু, সে বাড়ী গিয়াছিল।

"মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?" প্রশ্ন করিয়া বন্ধু সে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া দ্বিকীয় প্রশ্ন করিল—এবং এম্‌নি করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সে বিশ্বম্ভরের 'পেটের কথা' একটি একটি করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইল—উত্তমের পরিচর্যাটি পর্যন্ত।

উত্তমেরই উপর রাগ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—এই ছেলে-শিকারে ছুটে ছুটে আমি মশায়, বলব কি, আমি আর পারছিনে। মেয়ে দেখিয়ে, ছেলে দেখে কথা পাকা করে' বিয়ে ভেঙে গেছে স্ত্রীলোকটি আছে বলে'—

নিত্যানন্দপুরের পাত্রের পিতা সে-কথা তাহাকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল,—কিন্তু আমি সেজন্যে বেশি টাকা দিতে রাজি আছি।

বন্ধু বলিল,—খেসারৎ ? কত টাকা ?

—দেড় হাজার পর্যন্ত।

—বয়স একটু বেশী হইলে আপত্তি আছে ?

—কিছু না·; এখন পেলে বাঁচি।

—তবে আমি আপনাকে পাত্র দেব।

বলিয়া বিশ্বম্ভরের ঠিকানা লইয়া বঙ্কু চলিয়া গিয়াছিল।

উত্তম আপত্তি করিল,—ছেলের বয়েস যে বেশী বলছ?

—তা হোক; মেয়ের বিয়ে কবে হয়ে যেত—তোমার জন্যেই ত যত ইয়ে আমার, যত কষ্ট; তোমার কথা আমি শুনব না।—বলিয়া বিশ্বম্ভর মাছের মাথা চিবাইয়া চিবাইয়া রস গিলিতে লাগিল।

—কিন্তু আমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে মেয়ের সুখ দেখবে না!

—আমার মেয়ের সুখ আমি দেখব, তুমি থাম। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা!—বলিয়া বিশ্বম্ভর উত্তমকে একেবারে নিরস্ত এবং নিঃশব্দ করিয়া দিল।

নির্বোধ অনুভব করিতেই পারে নাই যে, সে অধিকারী বটে, কিন্তু কৃতী নহে। তাহার যে কন্যা আজ তাহার পিতৃ-চক্ষুর কাছে ভুবনমোহিনী, তাহাকে তিলোত্তমা করিয়া তুলিয়াছে ঐ রমণী। কোথায় থাকিত সে নিজে, আর কোথায় ভাসিয়া যাইত তার কন্যা, যদি ঐ পতিতা তাহাদের পালন না করিত। কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার যে সুরুচি তার আজ পরিষ্কার হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাও উহারই দান—অন্তরের যে ছটায় সে আজ পৃথিবীকে শ্রীসংযুক্ত দেখিতেছে, তাহা উহারই শুচি শুভ্রতার প্রতিবিম্ব—নিজের সৃষ্টি তাহাদের কিছুই নাই।

বিশ্বম্ভর নিজের ঝোঁকেই বলিয়া চলিল,—এই হয়রাণি আমার কেবল তোমার জন্যে; তুমি এসে না জুটলে কবে আমি খালাস পেয়ে যেতাম।

উত্তম বলিল,—নিশ্চয়ই যেতে; কিন্তু আমি এখন মলেও ত' তা শোধরাবে না; অনিষ্ট যা করবার তা করা হয়ে গেছে।—বলিয়া পিঠের উপর একটা আন্দোলন অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উত্তম দেখিল, টুকী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

উত্তম টুকীকে লইয়া বিশ্বম্ভরের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল—টুকী চোখ মুছিয়া বলিল—মা, তুমি বাবাকে ক্ষমা করো; বাবা কিছু বোঝে না।

উত্তম কথা কহিল না। টুকী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি বাধা দিও না; বাবার যা ইচ্ছে করুন।

"মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—শুনিবার পর উত্তম আর দ্বিরুক্তি করিল না।

একদিন টুকীদের দুয়ারে রসনচৌকি বাজিতে লাগিল।

সবাই দেখিল পরিতোষের বয়স বেশী হইলেও চুলে কলপের ছোপ নাই, আর অবসর-প্রাপ্ত রাজ কর্মচারী অর্থাৎ পদাতিকের মতই সুগম্ভীর আভিজাত্যের ছাপ মারা।

বঙ্কু সসম্ভ্রমে ভাবিতে লাগিল, কীর্তনের মূলগায়ক হওয়া ইহাকে যেমন মানায়, বরবেশেও তেমনি মানাইয়াছে—ধর্মনেতা হইলে বোধ হয় আরও মানায়।

## ॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

টুকী স্বামিগৃহে অর্থাৎ সুন্দরীর ডোমপাড়াস্থ বাসভবনে পদার্পণ করিল—সুন্দরী তাহাকে হাত ধরিয়া পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির করিল। একহাতে লণ্ঠন তুলিয়া আর একহাতে ঘোমটা তুলিয়া সুন্দরী তার মুখ দেখিল; বলিল—খাসা মেয়ে।—'এসো' বলিয়া তাহাকে লইয়া ঘরের মেঝের মাদুরে বসাইয়া দিল।

কিন্তু অনুষ্ঠান কিছুই হইল না।

বধূকে কেহ বরণ করিল না; শাঁখ বাজিল না; হুলুধ্বনি উঠিল না—কেবল ডোমপাড়ার কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ উঠানের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া খানিক তামাসা দেখিয়া চলিয়া গেল। বরযাত্রী যাহারা গিয়াছিল, তাহারা বোধ হয় পথ হইতেই ভিন্ন পথে চলিয়া গেছে।

টুকী নিরীহ হইলেও সপ্রতিভ—মাকে ছাড়িয়া আসার কষ্ট ছাড়া দুশ্চিন্তার কষ্ট সে এতক্ষণ ভোগ করে নাই; কিন্তু এখন যেন তার বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল—চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখের লণ্ঠনের আলোকে যতটা স্থান আলোকিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সবই অন্ধকার—জন-মানবের সাড়া নাই।

সাড়া ছিল, কিন্তু দূরে। সুন্দরী পরিতোষের কোঁচার কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল; বলিল,—টাকা দাও।

পরিতোষ বলিল—দিচ্ছি, সবুর। হাতমুখ ধুই, বসি।

—আমার হাতে দিয়ে বসো।

সুন্দরীরই পরামর্শে নগদ পণ পনর শত টাকার উপর দান-সামগ্রীর পরিবর্তে পরিতোষ তাহার কাঞ্চনমূল্য নগদই লইয়াছে তিন শত।

তারপর অনেক অস্ফুট এবং নীরব ধস্তাধস্তির পর সুন্দরী টাকা হাতাইয়া লইয়া নিজের বাক্সে বন্ধ করিল।

নির্জনতা ও নিঃশব্দতার মাঝে বসিয়া টুকীর মনে হইতেছিল, তাহাদের বাড়ীর মত এ বাড়ীর মাটিতে যেন স্ফূর্তি নাই, দুস্তর বিস্তীর্ণ একটা আবরণ কোথায় যেন চাপিয়া আছে—ময়লার স্তর একটির পর একটি করিয়া জমিয়া তাহাদের ভিতর দুর্গন্ধ আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দুর্গন্ধ যেন এখন রন্ধ্র পাইয়া অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছে, কোথায় অবিরাম একটি সাঁই সাঁই শব্দ উঠিতেছে।

টুকীর ভয় করিতেছিল; সুন্দরীর ঝনাৎ করিয়া বাক্স খুলিবার শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ বলিল—কি?

পরিতোষ যে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা টুকী দেখে নাই। ভয় পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সাহস পাইয়া বসিয়া পড়িল।

সুন্দরীও হাসিয়া বলিল,—কি?

পরিতোষ বলিল,—কিছুই না।

—কিছুই না বলে মাথা নাড়লে কি হবে। চোখে যে তোর নেশা!—বলিয়া সুন্দরী পরিতোষের গায়ে একটি আদরের চাপড় মারিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে উঠিয়া গেল।

হেঁট হইয়া টুকীর মুখের কাপড় তুলিয়া বলিল,—বেশ বৌ হয়েছে, পয়মন্ত চেহারা! —তারপর টুকীকে বলিল—আমি তোর দিদি হই, বুঝলি?

টুকী মাথা কাত করিয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে।

সকালবেলা যে চীৎকারে টুকীর ঘুম আঁৎকাইয়া ভাঙিয়া গেল, তেমনটি সে আগে কখনো শোনে নাই—যেন সহস্র শ্যেন উঠানে পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

পরিতোষ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

দরজা খুলিয়া তাহার চোখে পড়িল, সুন্দরী উঠানের উপর উন্মাদের মত আলুথালু হইয়া একবার ঠাস হইয়া মাটিতে পড়িতেছে, পরক্ষণেই উঠিয়া বসিয়া আবার পড়িতেছে —আর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া—ক্ষণে ক্ষণে নাক ঝাড়িয়া এমন শব্দ তুলিয়াছে যে, শুনিলে বুকের রক্ত জল হইয়া যায়।

—কি হ'ল?—বলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া পরিতোষ যখন নামিয়া আসিল তখন পিলপিল করিয়া ডোমপাড়ার লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেছে।

সুন্দরীর চোখ দিয়া জলের ধারা নামিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া তার কোলের কাপড়ে আর উঠানের মাটিতে পড়িতেছে—চুল মুখে পিঠে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কপালে চুলে গালে ধুসর ধুলো চোখের জলে ভিজিয়া কাদা হইয়া উঠিয়াছে।

এম্‌নি শোচনীয় মুখখানি তুলিয়া সুন্দরী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, —দেখ, তোরা ঘরের ভেতর গিয়ে ওরে, আমি মরেছি। আমি আর নেই—আমার বুক গেল।—বলিয়া বুকে একসঙ্গে দুই হাতের এক চপেটাঘাত করিয়া সুন্দরী আবার ঠাস হইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরের দিকে চাহিলে কি দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়িবে এই ভয়ে কেহ অগ্রসর হইয়া উঁকি দিতেই সাহস করিল না—পরিতোষ হরিনাম করিতে লাগিল।

—যাও, দেখগে।—বলিয়া সুন্দরী চুল ঝাড়া দিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দু'হাত তুলিয়া তাড়িয়া আসিতেই পরিতোষ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মস্ত বড় সিঁদ—ঘরের পিছনে স্তূপীকৃত মাটি—এবং সেই উদার গহ্বর পথে সুন্দরীর বাক্সটা অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিতোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইয়া সিঁদটা আর একবার দেখিয়া আসিয়া আবার মাটিতে পড়িয়া সুন্দরী ডানা আছড়াইতে লাগিল।

মাধুরী মারা গেলে অক্ষয়ের মা যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুন্দরীর দশা তাহার সহস্রগুণ কাহিল হইয়া উঠিল—মাধুরী ত' বিড়াল; কিন্তু এ নোটে টাকায় আঠার শত টাকা—তার উপর নূতন বৌয়ের দামী দামী কয়েকখানা কাপড়ও ঐ বাক্সেই রাখা ছিল।

ঘুমাইব না সংকল্প করিয়া সুন্দরী শয়ন করিয়াছিল—ভবিষ্যতের গায়ে আকাশ-কুসুম ফুটিয়া ফুটিয়া পুলকে বুক নাচিতে নাচিতে তার পুলকের উপরেও যখন ঘুমের পীড়ন দুঃসহ হইয়া উঠিল, তখন সে উঠিয়া বসিয়া বিছানার উপর ঢুলিতে লাগিল—একবার পা গুটাইয়া কাৎ হইয়া পড়িল—তখন চোখের উপর তার মনের জোর ক্রমশ দুর্বল হইয়া আসিতেছে—তখনও সজাগ মনে সে ভাবিতেছিল, না, ঘুমাই নাই।

তারপর সকালবেলা ছ্যাঁৎ করিয়া ঘুম ভাঙিয়া বিদ্যুৎগতিতে প্রথম নজর যাহার উপর যাইয়া পড়িল সে ঐ সিঁদ—দেখিয়া সুন্দরীর আন্তরাত্মা হাহাকার করিতে করিতে

যেন সেই সিঁদের মুখ দিয়াই বায়ুবেগে নির্গত হইয়া গেল—তাহার নিজের বলিতে অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা কেবল বুকের আগুন আর কান্নার স্বর।

সেই কান্নার স্বরও যখন ভাঙিয়া বুঁজিয়া আসিল তখন সুন্দরী তাপজর্জর মূর্ছিতের মত পড়িয়া রহিল—না দিল কাহারও ডাকে সাড়া, না দিল মুখে একফোঁটা জল।

দারোগা আসিয়া আলগা মাটির উপর তিন জোড়া পায়ের দাগের আর সিঁদের মুখের মাপ লইয়া প্রাথমিক তদন্তের জরিপকার্য শেষ করিয়া গেলেন—অবশ্য ডোমপাড়ার বলবান কয়েকটি যুবককে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—তাহারা ভয়ে আধখানা হইয়া কায়ক্লেশে যাহা উচ্চারণ করিল, দারোগা তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত সার নোটবুকে টুকিয়া লইয়া কেবল বলিলেন,—হুঁ—

শুনিয়া ডোমপাড়ার লোকগুলি আরো ভয় খাইয়া গেল।

পরিতোষ সিগারেট আনিয়া দারোগাকে খাওয়াইল।

কিন্তু সুন্দরী একবার চোখ তুলিয়া দারোগার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। চোর ধরাইয়া না দিলে দারোগা চুরির আস্কারা করিতে পারে বলিয়া সুন্দরীর বিশ্বাস নাই।

টুকী প্রথম তোড়ে থমকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাঁধিয়া বাড়িয়া সেই স্বামীকে খাওয়াইল—কিন্তু বাড়ীতেই আর একটি "লোক" ত্রিতাপে তাপিত হইয়া অভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া নিজের ভাতও ঢাকা দিয়া রাখিল; বলিল,—দিদি, অসুখ করবে যে!

সুন্দরী তখনই জবাব দিল না, একটু সময় লইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া টুকীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই রে—আমায় সেঁকো এনে দে, তা না পাস আফিং দে, আমি খেয়ে এ জ্বালা জুড়োই। তোর কষ্ট হচ্ছে না টুকী?

টুকী বলিল,—হচ্ছে দিদি, অতগুলো টাকা!

—কত টাকা ছিল রে?

—আঠার শ'।

টাকার পরিমাণ সুন্দরী না জানিত এমন নয়; টুকীর মুখে শুনিয়া সে টুকীরই বুকের উপর মাথাটাকে লুটাইতে লাগিল; বলিল,—কেন তুই বললি? আমি কি তা জানতাম না!—ওরে আমি আবার গেছি—

বলিয়া ঢলিয়া মাটিতে পড়িবার উপক্রমেই টুকী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

পরিতোষ আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরীর পৃষ্ঠাস্থিত শুষ্ক ক্ষতের চক্র চিহ্নটার দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—কেঁদে কেউ হারানিধি ফিরিয়ে পায়নি—তুমি না খেলে বউ খাবে না। ওঠো—খাও দাও—

কাটা কাটা কথা শুনিয়া সুন্দরী টুকীকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল পরিতোষের দিকে চাহিল—চারি চক্ষুর মিলন হইল—সুন্দরীর চোখের পাতা ফুলিয়া আমড়ার মত দেখাইতেছে, যেন দুনিয়ার শোক একত্র হইয়া বটিকাকারে সুন্দরীর চোখের পাতায় আসিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিতোষ তার কথার জবাব পাইল,—কোনোকালে নেই ষষ্ঠী পুজো, আজকে হঠাৎ দশভুজো—

পরিতোষ ঠোঁট মুচকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

টুকী বলিল,—দিদি, তেল আনি?

—আন্‌।

বঙ্কু পরিতোষের হাতে হুঁকা দিয়া বলিল,—বড় লোকসান হইয়া গেল প্রভু।

বৈষ্ণব পরিতোষ বলিল,—হরির ইচ্ছে।

—তাঁর ইচ্ছে ত' হঠাৎ লোকে ধরতে পারে না ; কিন্তু এটা যেন বড় বোঝা যাচ্ছে।

—কি বুঝছ ?

—এই অন্ন বস্ত্র—সংসারে থাকতে হ'লে চাই ত !

ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া খানিক হুঁকা টানিয়া পরিতোষ বলিল,—বিয়ে করাটা ভাল হয়নি, বঙ্কু।

—দাঁড়িয়ে গেল তাই ; কিন্তু মন্দ হ'ত না, যদি টাকাগুলো চোরে না নিত।

—হঠাৎ দিক্‌ভুল হয়ে গেছে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন—আমি লোভী তাই পাপী। আমার মৃত্যু খুব সন্নিকট, বঙ্কু।

—পেট একটা বাড়ল ; কি হবে কে জানে।

তারপর আর কোনো কথা হয় না—নীরবতার মধ্যেই দুইটি হৃদয় আকুল হইয়া অবস্থান করে। পরিতোষ হুঁকা রাখিয়া বলে,—হরি হরণ ক'রে সাবধান করে দিলেন। আমায় বড় শিক্ষে দিলেন, বঙ্কু, আমি বুঝতে পারছি—আমায় ধরাধামে রাখবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

বঙ্কু দাঁতে জিব কাটিয়া ঘাড় নাড়িয়া পরিতোষের এই পরম কল্যাণ আশার সশঙ্ক প্রতিবাদ করে।

কিন্তু হরি ঠাকুরের পরিতোষকে ধরাধামে রাখিবার ইচ্ছাটা একেবারেই যায় নাই—তিনি পরিতোষকে দিয়া টুকীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া গেলেন।

লেখে,—আমি ভালই আছি, মা ; আমার জন্য ভাবিও না। বাবাকে বলিও, তাঁহার জন্য আমার সোয়াস্তি নাই। তুমি বাবাকে যত্ন করিও। যদি দুঃখ দেন তবে ক্ষমা করিও। মেয়ে হইয়া ক্ষমার কথা তোমাকে আমি আর কি বলিব। তুমি চিরকাল তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছ। এখানে আসিবার সময় তোমাকে বড় দুর্বল দেখিয়া আসিয়াছি।

উত্তম লেখে,—স্বামী পরম গুরু, সাক্ষাৎ ভগবান ; তাঁহাকে কিছুতেই অবহেলা করিবে না, ইহাই আমার একমাত্র কথা। কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লঘু ভাবিও না ; যদি অনুমতি দেন তবে তাঁর চরণ পূজা করিও।

টুকী তা করে।

টুকী অযত্নস্থাপিত শুষ্কমঞ্জরী তুলসী গাছটিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে ; লক্ষ্মীর আসন পাতিয়াছে—নিত্য তাঁর অর্ঘ্য রচনা করে ; পঞ্চমুখী প্রদীপ মৃন্ময়ী জননীর সম্মুখে জ্বালিয়া দেয়—গলবস্ত্র হইয়া প্রণত হয়। ঠাকুর-দেবতার ছবিই তার কত !

সুন্দরী হাসিয়া বলে,—দেয়াল ছেয়ে দিলি বউ, ছবির কাগজ এঁটে। তোর কিছুই অল্পে কুলোয় না দেখছি !—বলিয়াই সুন্দরী অনুভব করে তার গায়ে যেন কাঁটা দিয়াছে।

বালিকা টুকী বলে,—অমন কথা বলো না, দিদি। মনটিকে যত ছড়িয়ে রাখা যায় তত সে ভাল থাকে, মা বলত।—বলিয়াই তার প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে।

কিন্তু যে কথার ভয় সে করে সুন্দরী তাহাই বলে ; বলে,—উত্তম ত ?—বলিয়া

খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ওঠে ; এমন কঠিন সে হাসি যে টুকীর তাহা সহ্য হয় না— হঠাৎ চোখে জল আসে—হাস্যনিরতা রমণীকে অতিশয় বীভৎস মনে হয়।

টুকীর মুখের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সুন্দরী আবার বলে,—টাকা কিছু জমিয়ে নিয়ে ধর্ম্মনিষ্ঠে করলে দু'কালেরই উপায় হয়। সে তরে গেছে। বলিয়া চল্‌ চল্‌ করিয়া সরিয়া যায়।

টুকীর কেন যেন মনে হয়, এ যেন নিজের সঙ্গে তাহার মায়ের তুলনা করিয়া পরাভবের জ্বালায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

রাত্রে টুকী পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করিল,—দিদি তোমার কে ?

কীর্ত্তনমদে উন্মত্ত হইয়া রসাবেশে পরিতোষের চোখে ঘুমের ক্লান্তি ছিল ; জড়িত স্বরে বলিল,—তোমার মা তোমার বাবার যা হয়।—বলিয়া একটু সজাগ হইয়া মুখ মুচড়াইয়া হাসিল, পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, এবং গভীর আলস্যভরে বাঁ হাতখানা তুলিয়া টুকীর কোলের উপর ছাড়িয়া দিল।

টুকীর মুখ নত আর পাংশু হইয়া গেল। তার বাবা এই কথাটি উল্লেখ করিলে তার মায়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিত—সেই ছবিটিই তার সর্বাগ্রে মনে পড়িল। বুঝিবার মত বুদ্ধি হইলে তাহাকেও ঐ কথাটি বিদ্ধ করিত, কিন্তু মায়ের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নাই।

তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এই সত্য কথাটাই এই কুটীর পর্যন্ত আসিয়াছে, কিন্তু তার মায়ের অতুলনীয় মুখের আলেখ্য, হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া, কণ্ঠের প্রতিধ্বনি এখানে পৌঁছে নাই—যেন সদা সচেষ্ট হেয় একটা ষড়যন্ত্রের কাছে নিরুপায় হইয়া পরাভব স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে—এমনি অসহ্য বেদনায় টুকীর বুক ফাট্‌ফাট্‌ করিতে লাগিল।

এবং এই মুহূর্তেই তাহার বিবাহের রহস্য কুজ্ঝটিকা কাটিয়া সমুদয় স্বচ্ছ হইয়া গেল, পুনঃপুনঃ বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে—যিনি তাহার স্বামী তিনি রাজী হইয়াছিলেন কেবল আত্মমর্যাদাবোধহীন সহধর্মী বলিয়া—এত বড় মর্মান্তিক কথাটা সে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিয়া গেল কেবল ঐ খুঁতটা আছে বলিয়াই ত। মায়ের কথা বিস্মৃত হইয়া পিতার প্রতি টুকীর এমন নিদারুণ একটা অভক্তি জন্মিল, যাহা আগে দেখা যায় নাই। সে সৌভাগ্যবতী ; তাই অমন মায়ের হাতে সে মানুষ হইতে পাইয়াছে ; কিন্তু পিতার ত' মানুষ হইবার আগ্রহ ছিল না !

এই ব্যক্তি তাহার পিতা দুর্বলতার সুযোগে তাহার মায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে—সঙ্গে সে আসিয়াছে আনুষঙ্গিকভাবে—সে পত্নী নয়, দায় মুক্তির দক্ষিণা।

টুকী একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর রূপহীন দেহখানার দিকে চাহিয়া রহিল—তার হাতখানা কোলের উপর হইতে আলগোছে তুলিয়া নামাইয়া দিল।

পাশের ঘরে তখন সুন্দরীর নাকের ডাক জাঁকিয়া উঠিয়াছে—সর্বভুক রাক্ষসের সঘন উদ্‌গারের মত।

দেয়ালে ছবি ছিল—সেইদিকে টুকী নিষ্পলক চক্ষে খানিক চাহিয়া রহিল।

কোন এক সতী স্বামীর পাদপূজা করিতেছে—ফুল ঢালিয়া পা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে—কিন্তু সে কি এইরকম স্বামী ? মা অমনটি না হইলে পিতাকেও বোধ হয় সে এমনই বীভৎস দেখিত ; কিন্তু মা-ই পিতাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল—চোখে

মায়াঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছিল—পৃথিবী তাই সুন্দর দেখাইত। টুকী মনে মনে মায়ের চরণে প্রণত হইল।

অর্থ চোরে লইয়াছে—টুকী হঠাৎ কামনা করিল, তাহাকে যেন শীঘ্র যমে লয়।

রাত্রি গভীর হইল। বাদুড়ের দল আহারান্বেষণে নিকটবর্তী বৃক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের ডাকের শব্দ, পাখার শব্দ, টুপটাপ ফল পতনের শব্দ টুকীর কানে আসিতে লাগিল—শৃগাল একটা খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ করিয়া বাহিরে কোথায় শুষ্ক পাতার উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

আপাদমস্তকে চমকিয়া উঠিয়া টুকী পরিতোষের গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিল,—ওঠ ত'!

—উঁ?

—ওঠো; আমার ভয় করছে।

পরিতোষ চোখ বুজিয়াই বলিল,—শোওনি এখনো?

—না। ভয় করছে।

—শোও।—বলিয়া পরিতোষ ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু শুইয়াও সহজে টুকীর চোখে ঘুম আসিল না—মায়ের উপদেশগুলি তার স্মরণ হইতে লাগিল—কোনো অবস্থাতেই স্বামীকে লঘু ভাবিও না, ভাবিতেও নাই। কেন নাই সে-কথা স্ত্রী হইয়া প্রশ্ন করিতে নাই, করিলে অপরাধ হয়, পথচ্যুতি ঘটে; বিধাতা অপ্রসন্ন হন, পরকালের জন্য দুঃখ সঞ্চিত হয়।

আত্মগ্লানি জন্মিয়া টুকী বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

করতল দু'টি একত্র করিয়া ললাটে তুলিয়া স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিল—এবং ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, সে যেন কাঁদিতেছে; মা শিয়রে বসিয়া আছে—নিঃশব্দে তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইতেছে—আর কেউ কোথাও নাই।

সে যেন বলিতেছে,—মা, তোমার কাছে যাব আমি।

মা বলিল—তা হয় না, মা; সীতা সয়েছিলেন কত! স্বামীর দেওয়া দুঃখ অকাতরে সয়েছিলেন বলেই ত ত্রিকালের নারীকুল তাঁর নাম নিয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছে—

বলিতে বলিতে মা যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল। টুকীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, ভোর হইয়াছে।

টুকী পান সাজিতেছিল।

পা ঝুলাইয়া তক্তপোষের ধারে বসিয়া পরিতোষ আগে খানিক দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া লইল, তারপরে টুকীর আনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি আমায় অত ভক্তি করো না, পাদোদক আমি আর দিতে পারব না।" তারপর সে যে তৃণাদপি সুনীচ সেই কথাটি তার মনে পড়িয়া গেল; বলিল,—"শ্রীকৃষ্ণের দাস আমরা, তুমিও তাঁরই জীব।" বলিয়া পরিতোষ মহা বিরক্তির সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিল।

টুকী বলিল,—আমাকে তা খেতেই হবে।

—জোর করে' না কি?

টুকী কথা কহিল না। পরিতোষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার মা বলে' দিয়েছে বুঝি?

—মা যা-ই হোক, তার কথা সত্যি।

—কি সত্যি ? পতি দেবতা ?

টুকী বলিল,—হুঁ।

পরিতোষ পা দুলাইতে সুরু করিল, হাসিটা ফুটিতে দিল না ; বলিল,—দেবতার ভোগের জন্যে কিছু টাকা আনাও দেখি চিঠি লিখে—পারবে ?

—যখন বলছ তখন লিখব।—বলিয়া টুকী পান লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তার প্রসারিত বাহুর দিকে চাহিয়া পরিতোষ সহসা মুগ্ধ হইয়া গেল—

এবং একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল, সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তার হাতের আঙুলে আর কপালে ও চুলে ভুরুতে অজস্র চালের কুঁড়ো।

সুন্দরী প্রশ্ন করিল,—কি কথা হচ্ছে চুপি চুপি ?

পানটা মুখে দিয়া পরিতোষ বলিল,—আমি নাকি দেবতা। কিন্তু দেবতার যে পয়সার অভাবে ভোগ সরছে না ভাল করে'! তাই কিছু টাকা আনাতে বলছি। চিঠি—

সুন্দরী তাড়িয়া উঠিল,—আমি আর তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে নেই ; পয়সা আনাও টাকা আনাও, অথবা যা জানো করো। বিয়ে করতে গেলে কেন, পরের মেয়েকে খামকা কষ্ট দিতে !

পরিতোষ চাহিয়া দেখিল, টুকী অনেক দূরে সরিয়া গেছে। উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—কষ্ট ত' হ'ত না ; চোরে নিলে—

—উৎপাতের কড়ি উৎপাতেই ত' যাবে ! উত্তমের ও পয়সা ত' পুরুতগিরি পয়সা নয়—কাজেই গেল।

—তোমার গেল কিসে ?

—কথার ভারি ফুর্তি দেখচি যে ! প্রথম বয়সে বাহাত্তুরে উড়নচণ্ডী, শেষ বয়সে—বলিতে বলিতে সুন্দরী হাসিয়া উঠিয়া দুই হাতে ঢপাঢপ পেট বাজাইয়া দিল ; তারপর পরিতোষের মাথায় আলগা একটা চাটি মারিয়া বলিল,—এয়ার ভাল !

এমন সব হাস্যোপহাস কথোপকথন টুকীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ; সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া একবার সুন্দরীর, একবার পরিতোষের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ অজানিত একটি লজ্জার আঘাতে তার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল—টুকী মুখ নামাইল—এবং তাহার লজ্জারুণ আনত মুখের দিকে চাহিয়া সুন্দরী চটুল চক্ষে পরিতোষকে কি ইঙ্গিত করিল তাহা সেই জানে—কিন্তু পরিতোষের গাম্ভীর্য পর্বতের গাম্ভীর্যের মত—একেবারে স্পর্শ করিয়া না দাঁড়াইলে নির্ভয় হইয়া তাহাকে বোঝাও যায় না, নিশ্চিন্ত হইয়া ভোলাও যায় না।

টুকী চিঠি লিখিল—ডাকঘর হইয়া টাকা আসিল।

এবং তার দু' একদিন পরেই খানিক বেলায় এক ব্যক্তি তাহাদের দরজায় আসিয়া ডাকিল—টুকী ?

টুকী অভ্যাস মত বলিল—উঁ।—তারপরই কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, তার বাবা দরজার সম্মুখে হাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে—টুকীকে দেখিয়া বিশ্বম্ভরের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল।

টুকী ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল ; বলিল—বাবা, কখন এলে ?

বিশ্বম্ভর খুব করিয়া চোয়াল নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—এসেছি ত' অনেকক্ষণ ;

বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করে করে হদিস আর পাইনে। কেউ বলে, এদিকে যান, কেউ বলে ইদিকে যান; কেউ বলে, হাট পেরিয়ে সোজা চলে যান পোয়াটেক; তারপর একটি কবরেজের ডাক্তারখানা দেখবেন; সেইটে ডাইনে রেখে গলির ভেতর ঢুকে পড়লেই দু'-খানা বাড়ীর পরেই পরিতোষের আখড়া—সে কি আখড়াধারী নাকি?

উত্তর না পাইয়াও বিশ্বম্ভর উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—আবার কেউ বললে, ডোমপাড়ায় খুঁজুন গিয়ে পাবেন—জামাইয়ের ক'খানা বাড়ী?

টুকী বিশ্বম্ভরের এ প্রশ্নেরও জবাব দিল না; বলিল—এস।

বিশ্বম্ভর জুতা খুলিয়া চাদর রাখিয়া মাদুরে বসিয়া হাঁটুতে হাত বুলাইতে লাগিল; বলিল,—হাঁটতে হয়েছে অনেকটা—

—ব্যথা করছে?

—সামান্য। জামাই কোথা?

টুকী ঘুরিয়া আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—তাঁর বাড়ীতে আছেন।

—এটা তবে কার বাড়ী?

—তাঁরই।

বিশ্বম্ভর হাঁটু লইয়া ব্যস্ত ছিল—টুকীর মুখের দিকে চাহিলে সে বুঝিতে পারিত যে ঘরণী কন্যার মনে ব্যথা আছে।

—ও-ঘরে খুট্‌খাট্ আওয়াজ হচ্ছে! আর কে আছে এ বাড়ীতে?

—দিদি আছেন।

—পরিতোষের দিদি? সধবা না বিধবা?

টুকী উত্তর করিল না। বিশ্বম্ভর অন্তরালে সঞ্চরমানা দিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—এস, মা লক্ষ্মী, আমায় লজ্জা করতে হবে না; তুমি আমার কন্যার মত।—বলিয়া বিশ্বম্ভর টুকীর মুখের দিকে চাহিল—অর্থাৎ আচরণ ঠিক হইতেছে কি না দেখ।

টুকী জিজ্ঞাসা করিল—মা কেমন আছে?

—ভালই আছে, তবে মনে হয় যেন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।

টুকীর চোখে জল আসিল, বলিল—বাঁচবে ত?

শুনিয়া বিশ্বম্ভর হাসিতে লাগিল, বলিল,—বাঁচবে বাঁচবে। গৃহলক্ষ্মী হয়ে আছে বলে মন খারাপ হয়ে যদি না মরে তবে বহুৎ দিন বাঁচবে। পরকালের ভয়ে তীর্থেও ত' যাবে; আমি বলি, ঘুরে এস একবার; তা জবাব দেয় কি জানিস। বলে, আমার পাপ কি তীর্থে রেখে আসব? তীর্থ তা হ'লে বিঘে জেরে যাবে। শুনলি কথা—বলিয়া বিশ্বম্ভর হাসিতে লাগিল।

টুকী স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল সুদূরবর্তী একটি বৃক্ষচূড়ার দিকে—সরু একটা ডাল, তাতে তিনটি মাত্র পাতা; সেই ডালে ছোট একটা পাখী নিরুদ্বেগে বসিয়া রৌদ্রের তাপ গ্রহণ করিতেছিল।

সুন্দরী ওদিকে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া ভব্যভাবে পুত্রের বয়সী কিন্তু পিতৃস্থানীয় আত্মীয় সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল—কিন্তু থামিয়া গেল—উত্তমের উদ্দেশে উচ্চারিত বিশ্বম্ভরের শ্লেষ উক্তির পর তার পা হঠাৎ চলিতে চাহিল না।

বিশ্বম্ভর মুহূর্তেক নিঃশব্দে থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সে ভাবনা নেই, সে

মরবে না। কিন্তু তোর কি হয়েছে বল্‌ দেখি? কাহিল হ'য়ে গেছিস—গয়না সব খুলে রেখেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কেন, খুলে রাখলি কেন?

টুকী বলিল,—ভাল লাগে না।

—মায়ের বাতাস লাগল বুঝি? তার ত' বৈরাগ্যের সীমা নেই; রোজ দু'বেলা সে খায় কি না সন্দেহ। তোরা যে সব গাছ-পালা লাগিয়েছিলি, তার তলায় জংগল হ'য়ে গেছে—সেদিন ত তার ভেতর থেকে একটা সাপই বেরুল—

বলিতে বলিতে হঠাৎ কান্নার শব্দে থামিয়া বিশ্বম্ভর টুকীর দিকে চাহিতেই টুকী ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল—বিশ্বম্ভর অবাক হইয়া রহিল।

তারপর পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল,—কাঁদছিস কেন, টুকী? কাঁদছিস কেন? সে ভালই আছে। তোমার বোনকে সামলাও এসে, মা লক্ষ্মী।—বলিয়া বিশ্বম্ভর সুন্দরীর উদ্দেশে ঐ ভাঙা ঘরখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু সুন্দরী সেই ভাঙা ঘরের বাহিরে আসিতে পারিল না—কোনো প্রতিবন্ধক নাই জানিয়াও তার পা উঠিল না। উত্তমকে সে দেখে নাই—টুকী এবং বঙ্কু কেবল দু' একবার তাহার নামোচ্চারণ করিয়াছে মাত্র—সুন্দরীর সম্মুখে সে ছায়া নিক্ষেপ করে নাই; কিন্তু এখন তাহার মনে হইয়াছে, উত্তম স্বাভাবিক নয়, অনুকূল নয়, অপরিচিত নয়, সুদূর নয়। সুন্দরী আরো অনুভব করিল, এই লোকটি প্রণয়িনীর মর্মবাণী কিছুমাত্র হৃদয়ংগম করিতে পারে নাই। সুন্দরী ভীত হইল, হতাশ হইল।

টুকী চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া বলিল,—বাবা, তুমি বসো; আমি কাজ সারি।

—সার। জল দে, গামছা দে—

—দি'!—বলিয়া টুকী উঠানে নামিতেই দরজার আড়াল হইতে সুন্দরী চাপা গলায় তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—তোর বাবাকে ঘরে নিয়ে বসা, আমি বেরুতে পাচ্ছিনে।

টুকী বলিল,—বেরোও তুমি; কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার বাবার নেই।

শুনিয়াই সুন্দরীর দ্বিধা অন্তর্হিত হইয়া গেল; হাসিয়া বলিল,—তা বুঝতে পেরেছি।

পরস্পরের মনের সন্ধান পাইয়া দুইজনেই অবাক হইয়া আছে, এমন সময় পরিতোষ আসিয়া উঠিল। এবং শ্বশুরকে একেবারে সম্মুখেই উপবিষ্ট দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—"আপনি কখন এলেন?"

প্রশ্ন করিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া শ্বশুরের পদধূলি লইল।

বিশ্বম্ভর জামাতাকে কোল দিয়া পাশেই বসাইল; বলিল,—আট দশ মিনিট হ'ল এসেছি—নয়, টুকী?—কিন্তু টুকীর দেখা মিলিল না। বিশ্বম্ভর বলিতে লাগিল,—বাড়ীই খুঁজে পাইনে—

বলিয়া বাড়ীর তল্লাসে প্রশ্ন করায় নানা লোকে নানা স্থান নির্দেশ করিয়া তাহাকে কিরূপ "ডোম-কানা" অবস্থায় ফেলিয়াছিল, তাহারই একটা সরস এবং সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—তোমার বোন ত আমার সামনে বেরুলেই না—

বিস্মিত হইয়া পরিতোষ বলিল,—আমার বোন?

—তাই ত' শুনলাম, টুকী বললে, দিদি।

—ও—আমার বোন নয়।

—তবে ?

জামাই শ্বশুরের সম্মুখে ঘাড় নামাইতে বাধ্য হইল—টুকী ঘোমটা টানিয়া কি কাজে কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল—সে আড়ালে গেল—আর যে ঘরে টুকীর দিদি অবস্থান করিতেছিল সেই ঘরের ভিতর হইতে হাসির একটু কলকল আওয়াজ কেবল টুকীর কান পর্যন্ত আসিল।

পরিতোষ ঘাড় নামাইয়াছিল কি কারণে তাহা সেও জানে না—এই প্রসঙ্গে শ্বশুরকে লজ্জা করিবার কারণ তার নাই—সেদিকে পরিতোষ অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী হিসাবে খুব দৃঢ়, আর প্রেমিক হিসাবে খুব উদার।

বলিল,—আমার বোন নয়, আত্মীয়াও নয়—অমনি—

পরিতোষ আরো কিছু বলিল কি না, বিশ্বম্ভরের অট্টহাসির শব্দে তাহাই শোনা গেল না।

টুকীর মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

কিন্তু যার যেখানে ব্যথা—বিশ্বম্ভর প্রশ্ন করিল,—আমার মেয়ের সঙ্গে বনিবনাও হয়েছে ত ?—যেন আর কিছুই লক্ষ্য করিবার নাই।

পরিতোষ বলিল,—খুব। সেদিকে আপনি ভাববেন না।

—কষ্ট না পেলেই হ'ল।—বলিয়া বিশ্বম্ভর নিশ্চিন্ত হইয়া গেল।

সুন্দরী অম্লান মুখে বাহির হইয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরের আসনের সম্মুখে মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সরিয়া গেল।

টুকীকে কে যেন দু' হাত ঠেলিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতে লাগিল, এ লোক তিনটির মাঝখানে পড়িয়া সব ছন্নছত্র করিয়া দিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এমন হাল করিয়া দেয় যেন উহাদের আর চিহ্নও থাকে না—নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা হঠাৎ অসহ্য হইয়া সে উহাদের সম্মুখ দিয়া ঘরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না।

বিশ্বম্ভর টুকীর হাতে দশটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া পরিতোষের আর সুন্দরীর প্রণাম লইয়া সুস্থ মনে প্রস্থান করিল, কিন্তু টুকী তাহার সঙ্গে একটি কথা কহিল না—মাকে কিছু বলিবার আছে কি না প্রশ্ন করিয়াও বিশ্বম্ভর উত্তর পাইল না।

বিশ্বম্ভর চলিয়া যাইতেই টুকী কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের মত বসিয়া কি ভাবিল ; তারপর হঠাৎ হাতের টাকা উঠানময় ছড়াইয়া দিয়া সেইখানেই সে কাঁদিতে বসিয়া গেল।

সুন্দরী কাছেই ছিল ; টাকা কুড়াইতে কুড়াইতে সে বলিতে লাগিল,—আহা, কচি মেয়ে, কাঁদবেই ত ! আমারই বুক হু হু করছে—বাপ এল আর চ'লে গেল !

পরিতোষ বলিল,—টাকা ক'টি কুড়িয়ে এনে আমার হাতে দিও।

—তা দিচ্ছি। তুমি বৌকে আগে সুস্থ করো। হাজার হোক, বেটি ছেলে—মায়ের মত মানুষ করেছে !—সুন্দরী আপন মনেই শতেক কথা বলিতে লাগিল।

কিন্তু টুকীকে সুস্হ করিতে আসিয়া পরিতোষ যে আশঙ্কা কখনও করে নাই সেই ঝড়ের সম্মুখেই পড়িয়া গেল।

—কাঁদলে কি উপায় আছে—

সান্ত্বনার এই কটি কথা উচ্চারণ করিতেই টুকী গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—আমার বাবাকে তুমি অপমান কেন করলে ?

ভ্রূকুটি দেখিয়া পরিতোষ থতমত খাইয়া গেল ; বলিল,—অপমান ? অপমান কি করলাম তাঁর ?

—তিনি বোঝেন নি, কিন্তু করেছ তুমি। দিদির কথা কেন তাঁর কাছে বললে ?

দু' পা সরিয়া আসিয়া হাসি দুর্লভ হইলেও, পরিতোষ হাসিয়াই বলিল,—সাধু সাধু ! কিন্তু তোমার বাবা—

—তফাৎ আছে—মা অত নোংরা নয়। আমার সামনে তার কুৎসা করো' না, তুলনা করো' না।—বলিয়া টুকী দরজার দিকে পা বাড়াইতেই দেখিল সুন্দরী দাঁড়াইয়া তার কথা শুনিতেছে—তার চোখ দুটো জ্বলিতেছে।

কিন্তু সুন্দরী রাগ করিল না।

বলিল,—আছে বোন,· তফাৎ মানুষে মানুষে, তার উপায় নেই—হাতের পাঁচটা আঙুল সমান করে' ত' ভগবান গড়েননি। তুমি কি করছ দাঁড়িয়ে ? যাও।

—টাকা ক'টি ?

—ঐ যাঃ ! গিলে ফেললাম।—বলিয়া সুন্দরী, হাঁ করিয়া মুখের ভিতরটা পরিতোষকে দেখাইয়া বলিল,—দেখতে পেলি ? যা।

পরিতোষ বাধ্য বালকের মত নিঃশব্দে সুন্দরীর আদেশ পালন করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সুন্দরী টুকীর গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে বলিল, যে গরু দুধ তার চাঁট খাওয়া যায় ; মুখে বলিল,—আমি ত' তোকে অযত্ন করিনি, বোন।

টুকীর বোধ হয় প্রতিবাদ করিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখনই কে যেন সুন্দরীকে তল্লাস করিয়া ডাক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল,—মা রয়েছিস গো ?

ডাক শুনিয়া সুন্দরী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টুকীও বাহির হইয়া আসিল। আঁচলে টাকা দশটি বাঁধিতে বাঁধিতে সুন্দরী আগন্তুক রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি খবর ? খালাস হয়েছে ?

—না, মা, আর সামালতে লারছি।—বলিয়া বিপন্না রমণী একফোঁটা অকপট অশ্রু ত্যাগ করিল।

—খাইয়েছিলি ?

—দু'বার খোয়াইছি।

উহারই দুশ্চিন্তার ছোঁয়াচ সুন্দরীর মুখেও লাগিল, বলিল,—বেঁধেছে কেউ নিশ্চয়ই।

—কে বাঁধবেক, মা ; শত্তুর অমন কেউ নাই।

ঔষধ ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে, যাহাকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উপর, সুন্দরী রাগিয়া উঠিল,—তোরা ছোটলোক ত' ছোটলোকই, ছোটলোকের হদ্দ—ডোম কিনা ! নড়ে ?

মাথা নাড়িয়া রমণী বলিল,—হ্যাঁ, মা, লড়ে।

—সেঁকেছিলি ?

—না।

—তবে বেরো আমার বাড়ী থেকে !

স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু টুকীর মনে হইল, এতক্ষণ যে উৎকণ্ঠায় তার মুখ কালো হইয়াছিল, তাহার যেন কিছু লাঘব হইয়াছে। টুকী অবাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উভয়ের এই ইঙ্গিতসর্ব্বস্ব কথোপকথন কান পাতিয়া শুনিতেছিল।

বিস্ময়ই বড় হইয়া ছেলেমানুষ ভুলিয়া গেল যে, এতক্ষণ কষ্টে তার বুক ফাটিতেছিল ; জিজ্ঞাসা করিল,—কি, দিদি ? ও কি বললে, তুমিই বা কি বললে ?

শুনিয়া সুন্দরী হাসিয়া গলিয়া পড়িল ; বলিল,—শুনে তোর কাজ নেই।—বলিয়া পরক্ষণেই টুকীর শ্রুতির অযোগ্য গোপন কথাটাই বলিয়া দিল,—মাগীর বিধবা ভাজ পোয়াতি হয়েছে, তাই—

—ইস্।

টুকীর ঐ আর্তনাদে সুন্দরী থামিয়া গেল।

টুকীর মনে হইতে লাগিল, যেন একটি অগ্নিশলাকা তাহার দেহের অভ্যন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তার এ যন্ত্রণার উপশম কোনোদিন হইবে না।

কিন্তু টুকীর ছল্‌ছল্ আর্দ্র নয়ন পল্লবের দিকে চাহিয়া সুন্দরী হাসিতে হাসিতে ঘামিয়া উঠিল—তার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এখনই ছুটিয়া যাইয়া ঘরে ঘরে এই গল্পটা করিয়া আসে।

টুকী সামলাইয়া লইল ; বলিল,—দিদি, তুমি কেন মহাপাপের কাছে নিজেকে জড়াচ্ছ ?

সুন্দরী বলিল,—তুই এখনো মহা কাঁচা—কত ব্যাপার দেখাবি পরে—

টুকীর মনে হইল, এই কথা বলিবার সময় দিদির কণ্ঠস্বর যেন একটা অপূর্ব স্পৃহায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সুন্দরীরও মনে পড়িয়া গেল, টুকী তাহাকে নোংরা বলিয়াছে—সুন্দরী অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া নিজেকে যেন গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টুকী যেন নির্বাক অথচ দুর্নিবার একটা হাওয়ার সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া দৌর্বল্যের ভারে স্থানচ্যুত হইয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিল—কাহারো বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই—সব কাজেরই কৈফিয়ৎ, দায়িত্ব, ব্যাখ্যা, কোথাও না কোথাও আছেই—কেবল তাহারই তাহার সন্ধান জানা নাই, আর সবাই তাহা জানে—কেবল সে-ই নিরালম্ব প্রেতের মত আকাশ-পাতাল হাতড়াইয়া তৃণাঙ্কুরের মত ক্ষুদ্রমত একটা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে—দাঁড়াইয়া নিশ্বাস লইবার স্থান তার নাই !

যে একটা সংগ্রামস্পৃহা নিরন্তর তাহার বুকে জাগিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিয়া অপার শূন্যতার মাঝে একসময় সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গেল।

এদিকে টুকীর দিদি সুন্দরীর প্রাণে গোপনে গোপনে তুষানলের প্রদহন সুরু হইয়া গেছে—তার আক্রোশের সীমা-পরিসীমা নাই—টুকী তাহাকে নোংরা বলিয়াছে—ঘৃণার পাত্রীকে যথেচ্ছ ঘৃণা করিয়া নোংরা বলিয়াছে—জীবনে অনেক কটূক্তি তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে ; তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া সে শত্রুকে দংশন করিয়াছে ; কিন্তু টুকীর এই একটি কথার মত তীক্ষ্ণ হইয়া আর কোনো কটূক্তি তাহাকে বিদ্ধ করে নাই।

জীবনের চির-সঞ্চিত আবদ্ধ গ্লানি আর কলুষ যেন সৃষ্টিছাড়া বিসদৃশ একটা

তাড়নায় জ্বালাময় গতিশীল হইয়া সুন্দরীর দেহের সকল স্পন্দনের উপর দিয়া ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে লাগিল। চোখে এক ফোঁটা জলও আসিল।

কত দুঃখ পাইয়াছে সে তাহা ত কেউ জানে না ; বুকে যে ভগবান আছেন একমাত্র তিনিই তাহা জানেন ; অতীতের কথা না হয় থাক—এখনকার দুঃখই কি কম ! আহার্য এমন পরিমাণে মেলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে ঠিক পেট ভরে—

পুরা পেট মানে 'চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়', এই চারি প্রকারের খাদ্যই পুরাদস্তুর জুটিতেছে না মনে হইতেই সুন্দরীর এমন দুর্বল বোধ হইতে লাগিল যেন তার অষ্টাঙ্গে সার পদার্থ কিছুই নাই—কেহ একটু ঠেলিয়া দিলেই সে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

সুন্দরী একবার হাই তুলিল—তারপর একবার টুকীকে দেখবার তার ইচ্ছা হইল ; ডাকিল,—টুকী ?

টুকী আসিল।

এবং সুন্দরী মুগ্ধ হইয়া তাহার নিটোল যৌবনের দিকে চাহিয়া রহিল—কেমন একটা লালসা সুন্দরীর মনে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, যেন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সহস্র লম্পটের রিরংসা-দাহ তৃপ্ত করিতে দু'হাতে বিলাইয়া দেয়—সুন্দরীর যৌবনোল্লাসের সুপ্ত প্রেতমূর্তি একবার দাঁড়াইয়া উঠিল—যেন অতৃপ্তির ঢেউ এখনো বহিতেছে—প্লাবনের আকাঙ্ক্ষা বুকে বহিতেছে।

অগ্নি যেমন জিহ্বা বাড়াইয়া আহুতি গ্রহণ করে তেমনি করিয়া আগ বাড়াইয়া সুন্দরী হাসিয়া বলিল,—বোস্ আমার কাছে।

—কথা আছে, দিদি ?—বলিয়া টুকী বসিল।

—আছে। তোকে আমি ভালবাসি ; আমায় তুই ঘেন্না করিস নে।

টুকী লজ্জিত হইল ; বলিল,—না, দিদি, তুমি আমায় মাপ করো।

—না, আমি রাগ করিনি ; মাপ চাইতে হবে না।

তারপর কথা বন্ধ করিয়া সুন্দরী সূর্যাস্ত দেখিতে লাগিল—দুটি আম-গাছ সূর্যকে আড়াল করিয়া আছে ; কিন্তু তাহাদের পত্রাবসরে যতটুকু দেখা যায়, পৃথিবী আর আকাশের ততটুকু যেন রক্তে ভাসিয়া গেছে—সংকীর্ণ পথে দৃষ্টি চলিয়া রক্তসাগর বড় কাছে দেখাইতেছে—আর বড় জলন্ত।

সুন্দরী বলিল,—তুই যে পুজো-আর্চা করিস, তাতে কিছু পুণ্যি হয় ?

এই আজগুবি প্রশ্ন শুনিয়া টুকী না হাসিয়া পারিল না ; বলিল,—হয় বৈ কি।

—আমি ত' বলি, পাপ-পুণ্যি বলতে কিছু নেই ; শরীরের স্থখই সুখ—মনের সুখও শরীরের স্থখ দিয়েই আসে—

টুকী বলিল,—তা' জানিনে।

—জানবি কি তুই ! জানাবার লোক চাই যে ! তোর সোয়ামীটির বয়েস যে প্রায় ষাট।—বলিয়া টুকীর গাল টিপিয়া দিয়া সুন্দরী সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহের দিকে আবার চাহিয়া রহিল—রক্তলেখা এখন পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

সুন্দরীর কথার কতক টুকী বুঝিল, কতক বুঝিল না। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হিসাবে ঠাট্টা গ্রহণ করিয়া সে বলিল,—হোক বুড়ো, উমার বর শিব ত' একেবারেই—

হঠাৎ বিরক্ত হইয়া সুন্দরী তাহাকে থামাইয়া দিল ; বলিল,—আচ্ছা, পরে শুনবো,

এখন উঠি। উঠোন ঝাট দিতে হবে,—তুই এসে উঠোনটা মানুষের মত হয়েছে।—বলিয়া সুন্দরী টুকীর চিবুক ধরিয়া দু'বার নাড়া দিয়া আগে তাহাকে তুলিয়া দিল; তারপর ধীরে ধীরে নিজেও গাত্রোত্থান করিল।

## ॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

পরিতোষের কীর্তনসভা এখন আখড়া নাম ধারণ করিয়া লোকবল আর গতিবেগ সঞ্চয় করিয়া মধুলোভীদের তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে—ভক্তবৃন্দ এখন তাহার খড়ের ঘরখানাকে বলে ধাম। পরিতোষ এখন কদাচিৎ চোখ মেলে।

বন্ধু প্রভুর কীর্তনাবর্তে আর ভক্তমণ্ডলীর ভিতর লুপ্ত হইয়া গেছে—তার জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি নাই।

কিন্তু সুন্দরীর অসহিষ্ণুতা আর ক্লেশের সীমা নাই—টুকীর রূপ আর যৌবন তার চোখের সম্মুখেই অনুপভুক্ত হইয়া অস্পৃশ্য আবর্জনার মত অপচয়িত হইতেছে দেখিয়া সুন্দরীর গণিকাচিত্ত যেন নিজেই সর্বস্ব লুণ্ঠনের যন্ত্রণা অহরহ সহ্য করে—তার বিরাম নাই। তার বিশ্বভুক উত্তীর্ণ যৌবন সুখ-দুঃখের অনুভূতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকে আছড়াইতে চায়।

পরিতোষের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাকে ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া তাহার ভিতরটিকে বাহিরে আনিয়া সুন্দরীর দেখিতে ইচ্ছা করে, সেটা ঠাণ্ডা না গরম।

কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিবার নয়—সুন্দরী টাকার অভাবের কথাটা তুলিয়া যখন তখন দুর্বল মনকে হাল্কা করে; বলে,—খাওয়াতে পারবি না ত' বুড়ো বয়সে বিয়ে করলি কেন?

পরিতোষের গোলাকার মুখখানায় কোনোই ভাবান্তর আসে না।

সুন্দরী বলিতে থাকে,—কচি মেয়েটাকে এনে এমন হাল করবার তোর কি দরকার পড়েছিল? বেহায়া মিনসে—কোন্ কাজটা তোর আটকেছিল শুনি? খেয়ে পরে' বেশ থাকত—তুই কেন ওকে নিয়ে এলি না খাইয়ে মারতে?

তাহারই কথা লইয়া ঝগড়া করে বলিয়া টুকী বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এমনি কুণ্ঠিত হইয়া সে একদিন দাঁড়াইয়াছিল—সুন্দরী বকিতে বকিতে বকুনি থামাইয়া টুকীর দিকে চাহিয়া রহিল—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—টুকী, কি আনাবি বলছিলি—দে পয়সা, এনে দেবে।

টুকী পয়সা আনিতে ঘরে গেল।

হঠাৎ যেন সুড়সুড়ি লাগিয়া সুন্দরী পরিতোষের প্রকাণ্ড মুখের দিকে চাহিয়া আর মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল।

টুকী পয়সা আনিয়া সুন্দরীর হাতে দিল; বলিল,—চারটে ক্রোচেট, এই রঙের।—বলিয়া নমুনার সুতার টুকরা সুন্দরীর হাতে দিল—কিন্তু পরিতোষ তখন এক পা দু পা করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সুন্দরী ব্যাকুলভাবে হাঁকিয়া বলিল,—নে' যাও পয়সা ক' আনা; এনো বেচারীর ক্রোটেচ।

টুকী হাসিয়া ফেলিল ; বলিল,—ক্রোটেচ নয়, ক্রোচেট।

—আচ্ছা তাই হ'ল।—বলিয়া সুন্দরী দৌড়াইয়া যাইয়া পরিতোষের হাতে পয়সা দিতেই যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল সে আশঙ্কা কেহই করে নাই।

পরিতোষ পয়সা হাতে লইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—খেতে পায় না তার ক্রোচেট। —যেমন মুখ করিয়া সে কথাগুলি বলিল সে নিষ্ঠুরতার বর্ণনা নাই—টুকীর মুখ শুকাইয়া গেল।

পরিতোষ তারপর পয়সাগুলি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া টুকীর প্রতি একটা বিদ্যুৎ দৃষ্টি হানিয়া বাহির হইয়া গেল।

—আমার হয়েছে এই কাজ ! তোমরা টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর আমি তাই কুড়িয়ে বেড়াব।—বলিয়া পয়সাগুলি কুড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কত ছিল রে ?

টুকী কথা কহিল না।

সুন্দরী সস্নেহে তার হাত ধরিয়া বলিল,—কাঁদিস নে।—তারপর অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল,—কাঁদিস নে বলিই বা কি করে ! এই ত কেবল কলির সুরু।—বলিয়া টুকীকে চূড়ান্ত ভয় দেখাইয়া গৃহকর্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।

টুকীর সর্বদাই মায়ের কথা মনে পড়ে।

দু'জনাকে পাশাপাশি রাখিয়া তার কাজের দিকে হাত ওঠে না—আকাশ এমন ঘোলা মনে হয়, যেন পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া পৃথিবীর কোন পদার্থই আর চোখে পড়িবে না। মনে মনে সে আর কাহাকেও ডাকে না, কেবল ডাকে মা-কে, যেন সমস্ত আধারে ঢাকিয়া দিতে পারিলেই বুক জুড়াইবে—আর কোথাও বুকের এই অগ্নি রাখিবার স্থান নাই !

টুকী রাঁধে ভালো। সামান্য শাকপাতা রকমারি করিয়া চমৎকার রাঁধিতে পারে ; তাহাতে তেল-মসলার খরচ যেমন কম, খাইতেও তা সুস্বাদু কম নয়। কিন্তু পরিতোষ তার পরদিন খাইতে বসিয়া তরকারীর "নিকুচি" করিল—তারপর তরকারী পাতের উপর হইতে মাটিতে নামাইয়া দিয়া কেবল তেঁতুল চটকাইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া ভাত খাইয়া গেল—এবং যাইবার সময় সে যে ব্যবহার করিয়া গেল তাহা আরও আশ্চর্য, আরও কষ্টদায়ক।

টুকী পরিতোষের সৌখীন যৌবনকালের ফটোখানা বেড়ার সঙ্গে লটকাইয়া, তাহাকে কাপড়ের ফুলের মালায় বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল।

পরিতোষ সেই মালাগাছা টানিয়া লইস—এবং তারপর তার যে হাল সে করিল তাহার তুল্য নৃশংস ব্যাপার জগতে কিছু ঘটিতে পারে না—সেটিকে পরিতোষ আগে ছিঁড়িয়া তার মালা নামটাই নষ্ট করিয়া দিল—তারপর মাটিতে ফেলিয়া সেই ফুলগুলিকে পা দিয়া ঘষিতে লাগিল—ধপধপে ফুল মাটি লাগিয়া কালো হইয়া গেল—ফুলের আর ফুলের আকৃতি রহিল না।

এবং সর্বশেষে মালাটির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি লাথি মারিয়া মারিয়া এক কোণে ঠেলিয়া দিয়া এমন সুস্থিরভাবে প্রস্থান করিল যেন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে এমন কিছু সংসারে আর নাই—কেবল ছিল ঐটি।

টুকী আর সুন্দরী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই হত্যালীলা দেখিল।

এতক্ষণ সুন্দরীর মন অন্যদিকে নিযুক্ত ছিল ; পরিতোষ চলিয়া যাইতেই সে টুকীর দিকে চাহিল—টুকী থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল।

সুন্দরী তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল ; মুখ বক্র করিয়া যে দরজা দিয়া পরিতোষ বাহির হইয়া গেছে সেই দরজার দিকে চাহিয়া বলিল,—আপদ।

টুকীর বুক ফাট্‌ফাট্‌ করিতে লাগিল। সে ভাবিয়া পাইল না, এমন কঠিন আঘাত উনি কেন করিলেন! টুকী বুঝিল, তাহাকে আঘাত করা ছাড়া নিজেরই মূর্তিপূজাকে এমন করিয়া লাঞ্ছিত করিবার কোনো কারণই নাই। জিজ্ঞাসা করিল,—এমন উনি কেন করলেন, দিদি ?

টুকীর সকাতর প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী তার পিঠে দু'বার হাত বুলাইয়া দিল ; তারপর ব্যাজার মুখে উত্তর করিল,—ওঁর মর্ম উনিই জানেন। আমরা পাপী-তাপী মানুষ, মহাপুরুষদের মর্ম কি বুঝব ! গাঁজা-ভাং খেয়ে এসেছিল বুঝি !

—খান নাকি ?

—না, খায় না, ছাড়ে ! এক-একদিন হাই মাই খাই ক'রে এসে বাড়ীতে পড়ে, কাকে কাটবে খুন করবে তাই খুঁজে বেড়ায়। আমি খাক হয়ে গেছি; এবার তোর পালা পড়ল।

সুন্দরী নিঃশব্দ হইল।

টুকী প্রাণপণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, যেন ইহকালকে আড়ালে রাখিয়া, ধ্যান করিতে লাগিল মা-কে—সুশীতল স্নিগ্ধ সে আশ্রয়পুট—যেমন উদার তেমনি নিরঙ্কুশ।

ধ্যানে মায়ের সম্মুখে টুকী রাগ করিতে পারিল না—মা তাহাকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে মুহূর্তের জন্য তাহা বিস্মৃত হইলে ঐ স্থির মূর্তিটি বিচলিত হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

মায়ের রোষ কেমন তাহা কখনও সে দেখে নাই, কিন্তু তার রুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিতেও তার ভয় করে।

বলিল,—ওঁর যা ইচ্ছে তাই করুন—তবু আমি ত' ভুলতে পারব না উনি আমার স্বামী।

সুন্দরী বলিল,—তোর মাথা খাওয়া গেছে।

রাত্রে সুন্দরী বলিল,—ও ত' আসবে না ; একলা ঘরে শুয়ে কাজ নেই—আমার কাছে শুবি—ঘেন্না করবে না ত' নোংরা বলে' ?—জিজ্ঞাসা করিয়া সুন্দরী টুকীর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখিল।

টুকী পরম দুঃখিতভাবে বলিল,—তোমাকে ত' আমি ঘেন্না করিনি, দিদি ! তোমরা এনেছ ; আমি কি ঘেন্না করতে পারি ! আমাকে তুমি বুঝতে পারনি।

—খুব পেরেছি।—বলিয়া যেন সতৃষ্ণ দুই বাহু বাড়াইয়া সুন্দরী তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল ; বলিল,—তুই ঘেন্না করলেও সার্থক—তুই যে মন টিঁকিয়ে রয়েছিস এই আমাদের ভাগ্যি। অন্য মেয়ে হ'লে এতদিন অমন পুরুষের মুখে লাথি মেরে কবে—

টুকী চোখ নামাইয়া বলিল,—ছি, দিদি।

সুন্দরী হাসিয়া বলিল,—ছি বৈ কি ! আমি যদি এখন তোর বয়েস পাই তবে কি করি তা কেমন করে' দেখাব তোকে। তুই যে কেমন সুখের ঘরে মানুষ তা আমি কি জানিনে ভেবেছিস ! যেমন অঢেল টাকা, তেমনি অঢেল খরচ দু'হাতে—এখানে এসে অবধি—কে ?

পরিতোষ মাতালের মত উচ্ছৃঙ্খল স্বরে বলিল,—আমি পরিতোষ। দরজা খোলো।

তারপর বাহিরে দরজার উপর ভীষণ শব্দে করাঘাত পড়িতে লাগিল।

সুন্দরী ধড়ফড় করিতে লাগিল। শশব্যস্ত হইয়া বলিল,—এই রে মাতাল হ'য়ে এসেছে—তোকে কোথায় লুকুই এখন! নড়িস নে, চুপটি করে শুয়ে থাক—আমি এখুনি আসছি বিদেয় করে দিয়ে—একি হাঙ্গামা বাবু—? ইচ্ছে করে ঝেঁটিয়ে—

বলিতে বলিতে সুন্দরী চট্ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

এবং অনতিবিলম্বেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—আপনিই গেছে।—বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। টুকীর আয়ত চক্ষু দুটির ভীতি-বিহ্বলতার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল, —ভয় পেয়েছিস খুব? আমার হাড় ক'খানা আস্ত থাকতে তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না—যতই মাতাল হয়ে আসুক, যত বড়ই ষণ্ডামার্কা হোক!

সুন্দরী ফুঁ দিয়া দীপ নিবাইয়া দিল—টুকীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দটা তার কানে গেল না।

এক বালিশেই মাথা দিয়া দু'জনে শুইয়া পড়িল।

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,—চা করতে পারিস, টুকী?

—পারি।

—খাবার-টাবার?

—পারি। মা পাক-প্রণালী দেখে ক'রে ক'রে আমায় অনেক রকম খাবার করতে শিখিয়েছে।

—একদিন চা আর খাবার করিস দেখি।

—করবো।

—তোর খুব বড় ঘরে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, টুকী; নয়?

এ প্রশ্নের জবাব নাই—টুকী কথা কহিল না।

বড় ঘরেই বিবাহ হবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হয় নাই। তার মনের কথাটাই যেন টানিয়া লইয়া সুন্দরী বলিল,—হয়নি; না? তোর মা সত্যিকার মা নয় বলেই হয়নি বুঝি?

টুকী বলিল,—হুঁ।—বলিয়া পাশ ফিরিল।

—আমাদের দিন আর চলে না, টুকী।

—দেখছি ত, দিদি; কিন্তু উপায় কি! বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে।

—তা ত' করবেই; বাবা যে এখন পর।—তুই কিন্তু পারিস কিছু টাকা আনতে।

—কোত্থেকে, দিদি?

—যা বলি তাই যদি করিস তবে হয়।

—করবো।

—করবি?

—হ্যাঁ।

সুন্দরীর উত্তেজনা ক্রমশ বাড়িতেছিল।

টুকীর গায়ের উপর দুই হাতের সম্পূর্ণ থাবা তুলিয়া দিয়া সে বলিল,—আমার গা ছুঁয়ে বল—

যেন স্পৃষ্ট স্থান যত বৃহৎ হয় শপথ তত শক্ত হয়।

সুন্দরীর নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল।

টুকী বলিল,—তাই বলছি।

কিন্তু টুকীকে এই অনতিক্রম্য শপথে বাঁধিয়াও সুন্দরীর চিত্ত নিঃসন্দেহ সুস্থির হইল না। সুন্দরীর মাতামহী মরিয়াছিল পালঙ্কে শুইয়া, তার মা মরিয়াছিল পালঙ্কে শুইয়া, কিন্তু তার মত হতভাগীর সে অদৃষ্ট নয়।

পরদিন বেলা এগারটার সময় পরিতোষ আবার দেখা দিল—চুল উস্কোখুস্কো, যেন মাথার উপর দিয়া ঘূর্ণি বায়ু বহিয়া গেছে। গায়ের জামাটায় ধুলো—পায়ের জুতো কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে তার ঠিক নাই। দরজা খোলাই ছিল—সটান বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পরিতোষ দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল ; হাঁকিল,—কই সব ?

টুকী চমকাইয়া উঠিল।

রান্নাঘর হইতে সুন্দরী ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল। ময়লা ছেঁড়া গামছার আধখানা পরা ডোমেদের একটি ছোট্ট মেয়ে কি দরকারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

সুন্দরী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—গিলে এসেছ উৎপাত করতে ? বেরোও বলছি বাড়ী থেকে—ডোমের বেহদ্দ তুমি আর তোমার আচরণ—ছি, ছি,—যাও, সুঁড়িপাড়ায় গিয়ে মাতলামি করগে।—বলিয়া সে দূর হইতেই ঝাঁটার ভয় দেখাইতে লাগিল।

কিন্তু সুন্দরীর আস্ফালন আর বিক্রম পরিতোষের নজরেই পড়িল না।

বলিল,—কই ? এই ঘরে বুঝি ?—বলিয়া পরিতোষ ঘরের দিকে ধাইয়া যাইতেই টুকী দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

পরিতোষ থামিল ; বলিতে লাগিল,—আমি এই বসলাম এখানে—ঐ ছুঁড়িকে বাড়ীর বের ক'রে দিয়ে তবে আমি উঠব—এই আমি বসলাম—যার সাধ্য থাকে এসে তুলুক আমায়।—বলিয়া কিন্তু বসিল না, দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে দুই হাতের ঘুষি ছুঁড়িয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।

সুন্দরী এইবার নির্ভয়ে নামিয়া আসিল।

পরিতোষের হাত ধরিয়া বলিল,—ক্ষ্যাপামি ক'রো না, লক্ষ্মীটি, স্থির হয়ে বসো এখানে—দু'ঘটি জল ঢেলে দি'মাথায়—ভাল ঠেকবে।

পরিতোষ ঝটকা মারিয়া সুন্দরীর হাত ছাড়াইয়া দিয়া বলিল,—চাইনে আমি তোর জল ; তোর জলে আমি—

বলিয়া অশ্রাব্য একটা শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরিতোষ ঘাড় গুঁজিয়া রহিল।

এবং তখনই সুন্দরীর চোখের দিকে ভয়ংকর কিন্তু বিদ্যুতের মত একটা দৃষ্টি হানিয়া পরিতোষ ধীরে ধীরে ফিরিল।

তাহাদের চোখে চোখে কি কথা হইল, কি, কথা হইল কিনা, তাহা তাহারাই জানে।

কিন্তু পরিতোষ সে যাত্রা টুকীকে ক্ষমা করিল, বলিল,—আচ্ছা, আজ থাক—কাল আবার আসব ঠিক এমনি সময় ; কাল আমি ওকে না তাড়িয়ে ছাড়ব না।

বলিয়া পরিতোষ দাঁড়াইয়া বারকতক শরীরটাকে দক্ষিণে-বামে দুলাইল—বেঠিক করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া অন্তঃপুরের লোক দুটির দৃষ্টির বাহিরে আসিয়াই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

তারপর, শুনিতে তাজ্জব, পরিতোষ আগাছার ঝোপের ভিতর হইতে জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিল ; জামার উপরকার আলগা ধুলো ঝাড়িয়া ফেলিল—চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচড়াইয়া বসাইয়া দিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের মত চলিতে লাগিল।

সুন্দরী খানিক অবাক নিশ্চেষ্ট থাকিয়া টুকীর উদ্দেশে বলিল,—খোল দরজা, টুকী ; শত্রুর গেছে—

কথাগুলি টুকীর কানে গেল।

দরজা খুলিয়া যখন বাহির হইয়া আসিল তখন কোথা হইতে কে জানে সুন্দরীর বুকেই হঠাৎ ঠক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল—এমন করিয়া নিঃশেষে পাণ্ডুর হইয়া যাইতে মুমূর্ষুকেও দেখে নাই—চোখে তার জল নাই, কিন্তু জল থাকিলেই যেন ভাল হইত, এমন চরম দুঃখের মূর্তিটা চোখের জলে বোধ হয় একটু সংশয় জাগাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারিত।

সুন্দরী যখন কথা কহিল তখন বোধ হয় জীবনে এই প্রথমবার তাহার কণ্ঠে অকপট সুর বাজিল, বলিল,—বোস্, একটু জিরো।—বলিয়া সুন্দরী উঠিয়া যাইয়া নিজেও বসিল।

টুকী তার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

শত্রু হোক, মিত্র হোক, ঘৃণ্য হোক, পবিত্র হোক, মানুষের গাত্রের স্পর্শ পাইয়া টুকীর শরবিদ্ধ পক্ষীর মত আহত রক্তাক্ত প্রাণ ধড়ফড় করিতে করিতে কাঁদিয়া উঠিল ; বলিল,—কি উপায় হবে, দিদি ?

টুকীর কপালের উপর কয়েকগাছা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল—সুন্দরী সযত্নে চুলকটি সীঁথির উপর তুলিয়া দিয়া বলিল,—টাকার জন্যে ভেবে ভেবে অমন হয়েছে ; আমি ত' আকাঠ মেরে গেছি। হায় হায় একি হ'ল!—বলিয়া সুন্দরী টুকীর অদৃষ্টের সংগে নিজেকে জড়াইয়া লইয়া আরো এলাইয়া পড়িল।

—বাবার কাছে লিখে দি টাকা পাঠাতে ?

—এখনই লিখিস নে—তিনিই বা কত দেবেন! দিয়েছিলেন ত' ঢের, কিন্তু কপলে টিকল না—

সুন্দরী এইখানে চোখে আঁচল দিল।

বলিতে লাগিল,—তোর বাবা বড় ভাল মানুষ, অমন সজ্জন লোক আর হয় না—চাইলেই তিনি তখুনি পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু আমাদের নিত্যি খরচ, নিত্যি টানাটানি—যত দেবেন, ততই অভাবে তলিয়ে যাবে—পেটই যে কি বস্তু দিয়েছিলেন বিধি, সর্বস্ব গেল ঐ পেটে—

টুকীর নিঃশ্বাসের দীর্ঘ শব্দটা সুন্দরী চুপ করিয়া শুনিল।

তারপর বলিতে লাগিল—তাঁকে টাকা পাঠাতে চিঠি লেখা মানে, আমাদের তিনটি মানুষকে চিরদিন পুষতে বলা। তা তিনি পারেন, না, আমরাই কি তা বলতে পারি! উপায় আমাদেরই করতে হবে।

টুকীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। বলিল,—আমাকে কি করতে হবে বলছিলে, দিদি ?

—পারবি তা ?

—পারব, ওঁর ভালর জন্যে তুমি যা বলবে তাই আমি করব!

—আর দু'দিন পরে বলব।

—তাতে উনি ভাল হবেন ?

—হবে।

—তবে আমি করব।

দু'দিন গেছে।

ইতিমধ্যে পরিতোষ রাত্রে বাড়ীতে আসে নাই ; কিন্তু দুপুরবেলা একবার করিয়া বাড়ীর ওপর চড়াও হইয়া মারধোরের উপক্রম করিয়া গেছে।

তৃতীয় দিনে সে দ্বিপ্রহরেও আসিল না।

আসিল বঙ্কু ; বঙ্কু আসিয়া ঘি, ময়দা, চা, চিনি দিয়া গেল আর খবর দিয়া গেল,—প্রভু আদেশ করেছেন, খাবার যেন ঠিক ক'রে রাখা হয়, সন্ধ্যে সাতটায় তিনি আসবেন।

তাড়াতাড়ি গৃহকার্য সমাপ্ত করিয়া দু'জনে কোমর বাঁধিয়া খাবার তৈরীর কাজে লাগিয়া গেল ; স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে সুন্দরী টুকীর অধীনে শিক্ষানবীশ হইয়া আসিল—কাজ দুই ভাগে ভাগ করিয়া সুন্দরী লইল মোটাগুলি, টুকী লইল সূক্ষ্মগুলি।

খাবার তৈরী টপ্‌টপ্ অগ্রসর হইতে লাগিল—এবং টুকীর তখনকার স্বকীয় আবহাওয়ার উল্লাস সুন্দরীর কঠিন প্রাণেও সংক্রামিত হইয়া গেল।

কিন্তু টুকীর হরিষে বিষাদ ঘটাইল, যার জন্যে এত শ্রম, সেই—

বিকালের দিকে বঙ্কু অদৃষ্টাকাশের ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়া খবর দিয়া গেল,—প্রভু আজ কীর্ত্তনানন্দে ভরপুর ; সারারাত ধুলোট চলবে—প্রভুর ইচ্ছে—তিনি এ বাড়ীতে রাত্তিরে আসবেন না।

শুনিয়া টুকী যেন সহসা আশ্রয়চ্যুত হইয়া নিবিয়া গেল—শিথিল হাত কোলের দিকে গুটাইয়া লইয়া বলিল,—তবে আর কার জন্যে করলাম, দিদি!—টুকীর চোখের জল এক ফোঁটা টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

সুন্দরী নির্বিকারভাবে বলিয়া দিল,—আমরাই খাব। রেখে দেব তার জন্যে, কাল যখন আসবে বাসিই খাবে।

কিন্তু টুকীর সর্বান্তঃকরণের সে লিপ্ততা আর ফিরিল না। অনিচ্ছার সহিত সে মিষ্টান্ন প্রস্তুত তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া দিল।

সব ঢাকা দিয়া রাখিয়া সুন্দরী বলিল,—এইবার হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বস—যাকে যাকে দীপ দেখান রেওয়াজ হয়েছে তাদের তা দেখা।—বলিয়া হাসিয়া বিগলিতচিত্তে টুকীর অগ্নিতাপে লাল মুখখানি দু'টি করতল দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বিশ্রাম করিতে করিতে টুকী বলিল,—ওঁকে একবার—

সুন্দরী তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—কি বলছিস?

—ওঁকে একবার ডাকলে হয় না?

সুন্দরী ভ্রূভঙ্গী করিল ; বলিল,—ওঁকেই তুই ভুলতে পারছিস নে। অমন আচরণ করলে যে তোর সঙ্গে, সে তোকে ভালবাসে এখনও তাই তুই মনে করিস ভালবাসার—

টুকী বাধা দিয়া বলিল,—আশা করে করলাম খাবারগুলো—

—তুই মর্ কি আমি মরি, আমার আর সয় না। কাকে পাঠাব?

—ডোমপাড়ার কাউকে।

—ডোমপাড়ার মাটি মাড়াতে এখন আমি পারব না—কিসের হাড়গোড় সব চারিদিকে

ছিটিয়ে রয়েছে—পারিস তুই ডেকে আন্‌গে যা। কিসের এত দরদ লা তোর ? পেট ভরাবার সোয়ামী নয় ; পিঠ পাতাবার কত্তা ! অমন সোয়ামীর মুখে আগুন—দুশোবার দুশোবার।—সুন্দরী যেন পরিতোষকে শব্দ শলাকায় গাঁথিয়া গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল।

টুকী ব্যথার উপর ব্যথা পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদূরে অন্ধকার-মগ্ন লেই ফলবান বৃক্ষটিতে তখন নিশাচর পক্ষীর আগমন সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে—তীক্ষ্ণকণ্ঠ একটা কীট কর্কশ সুর অবিশ্রান্ত টানিয়া চলিয়াছে—ছায়াপথ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, দুটি সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে মেশামিশি হইয়া গেছে—হাড়িদের কাঁচা কয়লার আগুনের আভায় গাছের উপরকার অন্ধকার একটি স্থান স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে এবং টুকীদের বাহিরের দুয়োরটা ঈষৎ আলোকিত হইয়াছে।

হঠাৎ সেই আলোকমণ্ডলীর মধ্যেই একটি মনুষ্য মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল।

টুকী দরজার দিকে চাহিয়া ছিল ; বলিল,—দিদি, দেখ কে।

সুন্দরী প্রশ্ন করিল,—কে ?

মূর্তি উত্তরের পরিবর্তে প্রশ্ন করিল,—পরিতোষ বাড়ীতে আছে ?

তিনি যে কে তাহা তিনি না বলিলেও গলার আওয়াজেই সুন্দরী তাঁকে চিনিল ; বলিল,—কে, দাদাবাবু ? সে ত' বাড়ীতে নেই—এস এস।

টুকী উঠিয়া দাঁড়াইয়া—

সুন্দরী বলিল,—যা টুকী, দাদাবাবুর চা করগে—উনি আবার যে চা-খোর—চা না পেলে আমাদের ভাববেন অভদ্দর. আর হাই তুলতে থাকবেন।—বলিতে বলিতে সুন্দরী উঠিয়া লণ্ঠন লইয়া আগাইয়া গেল—পথ দেখাইয়া দাদাবাবুকে ভিতরে আনিল—জলচৌকি পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল।

এবং কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকেই যে সর্ব্বব্যাপী কাণ্ড ঘটিয়া গেল তা' এই যে পুষ্পসারের উগ্রগন্ধে কাহারো সহজে নিঃশ্বাস টানিবার যো রহিল না।

সুন্দরী পা ছড়াইয়া দিয়া দাদাবাবুর সম্মুখে বসিল ; লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া বলিল,—তোমার কথাই ভাবছিলাম ; মনে করবে, মন-রাখা কথা বলছে—তা নয়, সত্যিই ভাবছিলাম—টুকী খাবার করেছে ; মনে হচ্ছিল, দাদাবাবু এলে দুটো খেয়ে যেতেন—আবার ভয়ও হচ্ছিল, টুকীর আর আমার কি সে সৌভাগ্য হবে। কিন্তু দাদাবাবু, ভগবানকে যে লোক অন্তরযামী বলে তা মিছে নয়,—ভেবেছি কি মনের খবর তিনি জেনে বসে আছেন। আহা সবাই যদি তা জানত তবে মানুষ হ'ত দেবতা আর পৃথিবী হ'ত স্বগ্‌গ।—বলিয়া আনন্দে চোখ কপালে তুলিয়া সুন্দরী হাসিতে লাগিল।

দাদাবাবু বলিলেন,—আমি ত' তা জেনেই এসেছি। তোমার টুকী করেছে খাবার—অমনি ভগবান তার খবর পাঠিয়েছেন আমার মনে—ভগবান মনে মনে যোগ ক'রে দেন।—বলিয়া তিনি দু'হাতের তর্জনী দু'টি বাঁকাইয়া শৃঙ্খলিত করিয়া মনের যোগাযোগ কেমন দুশ্ছেদ্য হইতে পারে তাহাই কার্যত দেখাইয়া দিলেন ; বলিলেন—কারণ তিনি সকলের মনে রয়েছেন।

সুন্দরী যেন বিপদে সহায় পাইয়া গেছে এমনি আশান্বিত হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—যা বলেছ, দাদাবাবু ; লাখ কথার এক কথা। কিন্তু টুকী আমাদের তা বোঝে না।

—সে কি বলে ?

—শুধোও তাকে ডেকে।

কিন্তু দাদাবাবু তাহাকে ডাকিয়া শুধাইলেন না; লাল হইয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

চায়ের জল চড়াইয়া টুকী চৌকাঠের ফাঁকে চোখ দিয়া দিদির দাদাবাবুকে দেখিল—রং অতিশয় ফর্সা—তেড়ি কাটা, গোঁফ ছাটা—গায়ের জামা চাদর লণ্ঠন আলো পড়িয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে—হাতের ছড়িটা মাটির সঙ্গে তিনি আস্তে আস্তে ঠুকিতেছেন।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমে অবতরণ করিয়া আলাপ চুপি চুপি হইতে লাগিল।

সুন্দরী এক সময়ে চেঁচাইয়া উঠিল, কিন্তু টুকীর উদ্দেশে আর রাগ করিয়া নয়; বলিল,—হ'ল রে? খাবার সাজিয়ে আন্‌ থালায়—

টুকী কপাট নাড়িয়া শব্দ করিল।

সুন্দরী দাদাবাবুর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া আলস্যভরে বলিল,—আমি আর উঠতে পারছিনে; তুই নিয়ে আয়।

তাহারাই কথা লইয়া নির্লজ্জের মত অত প্রগল্‌ভ আলোচনা করায় উহাদের সম্মুখে যাইতে টুকীর আরো লজ্জা করিতে লাগিল।

কিন্তু যাইতেই হইবে।

গাত্রবস্ত্র যথাসম্ভব সুসম্বৃত করিয়া লইয়া একহাতে চায়ের পেয়ালা আর এক হাতে খাবারের থালা লইয়া নামিতেই সুন্দরী লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল; বলিল,—দেখিস, ফেলিসনে।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন,—না, ফেলবে না, সাবধান আছে।—বলিয়া টুকীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

টুকী চা আর খাবার জল চৌকীর সম্মুখে মাটিতে রাখিতে যাইতেই সুন্দরী লাফাইয়া উঠিল,—হাতে দে, হাতে দে; আসনে ব'সে খাচ্ছে না কি যে, সামনে দিচ্ছিস!—তারপর আদরের একটি গাল ভরা কথা বলিল,—পাগ্‌লি!

টুকীর ডান হাতে থালা ছিল—বাবুর দিকে সে থালা বাড়াইয়া দিল; বাবু সেটা হাতে লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—চা মাটিতেই রাখ।—বলিয়া খাবারগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সুন্দরী বলিল,—নিজে হাতে করেছে।

—তাই নাকি! তবে ত' অমৃত।—বলিয়া একখানা নিম্‌কি ভাঙিয়া এক টুকরা মুখে দিলেন।

হঠাৎ টুন্‌ করিয়া একটা শব্দ হইতেই টুকী চাহিয়া দেখিল, দিদির হাতে কয়েকটি টাকা, যেন উঁকি মারিতেছে। কশাহত হইয়া টুকী ফিরিয়া গেল।

ঘরে বসিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন দুরন্ত রক্তের মুহুর্মুহুঃ আঘাতে ফুলিয়া বেদনায় ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল—কানের ভিতর একটা শব্দ উঠিল—তাহা যেমন তীব্র তেম্‌নি অবিরাম।

টুকী উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাগলের মত ঘরের ভিতর ঘুরিতে লাগিল।

মাকে মনে পড়িল—"মা" বলিয়া ডাকিতে যাইয়া মুখ একটু হা হইয়া বুকের খানিকটা হাওয়া কেবল নির্গত হইয়া গেল, স্বর ফুটিল না।

হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া গেল।

পরক্ষণেই জাগিয়া শুনিল, সুন্দরী ডাকিতেছে,—টুকী এদিকে আয়।

টুকী সঙ্কোচহীন অবাধ কণ্ঠে উত্তর দিল—যাই।

টুকী ধপ্ করিয়া নামিল ; সে শব্দটা সুন্দরীর কানে প্রবেশ করিল বিরহকাতরার কানে সমাগত প্রিয়ের প্রথম পদধ্বনির মত—সে যেমন আকুল তেমনি উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

পথটুকু অবনত মুখে অতিক্রম করিয়া যৌবনভিক্ষাথীর সম্মুখে যাইয়া টুকী মুখ সোজা করিয়া তুলিল ; বলিল,—আসুন।

অচিন্ত্য চমকিয়া বলিল,—কোথায় ?

—আমার সঙ্গে।

—সে কি ?

টুকী বলিতে লাগিল,—এ-কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে ?—বলিয়া আঙুল দিয়া বিস্ময়াবিষ্ট সুন্দরীকে দেখাইয়া দিল। সুন্দরী এত বিস্মিত জীবনে হয় নাই—ব্যাপার কি ঘটিতেছে, তাহাই যেন তাহার মাথায় ঢুকিতেছে না।

অচিন্ত্য হা করিয়া রহিল—মানুষের ভ্যাবাচ্যাকা খাইবার কথাই ত' !

টুকী বলিল,—আপনি বুঝি আসবেন না ? তবে আমি একাই যাই।—বলিয়া বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া ফিরিয়া দু'পা অগ্রসর হইয়াই আবার উহাদের দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—আমি যাব কেন ? আমার এ স্বামীর ভিটে—বেরোন আপনি —উঠুন।

অচিন্ত্য নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

কিন্তু সুন্দরী ততক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে—সে লাফাইয়া উঠিল—এবং বিস্ময়ে রুদ্ধবাক নারীর কণ্ঠ সহসা খুলিয়া যাইয়া যে শব্দ নির্গত হইল তাহা কেবল সুন্দরীর কণ্ঠেই সম্ভব ; সুন্দরী বলিতে লাগিল,—ওরে আমার সোয়ামী-উলি, বেরো বলছিস কাকে তুই ? কার ঘরে তুই আছিস জানিস ? যেতে যেতে দাঁড়িয়ে ফিরে স্বামীর স্বত্ব জাহির করলি তুই ? আমার সামনে দাঁড়িয়ে ?

বলিতে বলিতে সুন্দরী অগ্রসর হইতে লাগিল—যেন বাঘিনী শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবে।

অচিন্ত্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আহা, থাম।

কিন্তু তাহার পর সুন্দরী আরো কিছু বলিল কিনা তাহা টুকী জানিতে পারিল না।

সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।

# অসাধু সিদ্ধার্থ

## ॥ এক ॥

সিম্ধার্থ তার নামই নয়। নাম তার নটবর; নিরলঙ্কার নটবর—"ঘোষ বোস গুহ মিত্তির" ইত্যাদি কুলাধিকারীর পরিচয় একটিও তার নামের পশ্চাতে কখনো ছিল না।

কেবল নটবর; প্রয়োজন বোধ করিলে মাত্র দাস শব্দটা জুড়িয়া দিত—অতিশয় বিনয়বশত।

কিন্তু বহুদিন হইতে নটবর সিম্ধার্থ নামেই অবাধে চলিয়া আসিতেছে।

এই গোপনচারিতা কেউ টের পায় নাই; তাই অনুসন্ধিৎসু হইয়া আজ পর্যন্ত ঐ পরিবর্তন সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন করে নাই।

নিজের মনে তার বিবিধ প্রশ্ন জাগে—কিন্তু সে পরের কথা।

সিম্ধার্থের ঋজু বলিষ্ঠ দেহ; বর্ণ গৌর; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এম্‌নি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু-পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে। মানুষের সঙ্গ দিয়া, সাহচর্য দিয়া তার কোনো প্রয়োজন নাই; সহানুভূতির সে ধার ধারে না।

এই তার বাহ্যিক মূর্তি।

কিন্তু ভিতরটা তার অন্য রকম—কিছুদিন হইতে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন সুরু হইয়া গেছে। ভিতরে সে শ্রান্ত, অতিশয় পরমুখাপেক্ষী।

প্রাপ্ত সিম্ধার্থ নাম, তদুপরি প্রাপ্ত বসু উপাধিটি, এবং উহাদের সংযোগে প্রাপ্ত একটি জীবনধারার অতীত ইতিহাস ও সুবিধাগুলি সে প্রাণপণে খাটাইয়া দেখিয়াছে।

সুফল তেমন ফলে নাই; ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাকে কারবার তুলিতে হইয়াছে।

সহরের এক অনুন্নত অংশে তার বাস। কোনো প্রকারে দেহটাকে সজীব রাখিবার আয়োজন সেখানে আছে; আর কোনো সুখের বস্তু নাই।

সিম্ধার্থ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে।

ভাবনার আদিও নাই, অন্তও নাই; কি ভাবিতেছে তারও বিশেষ দিক্‌ দিশা নাই—তবে ভাবনাটা যেন মাঝে মাঝে থমকিয়া হা হা করিয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে—যেমন দীপের চঞ্চল শিখাগ্রটা ঊর্ধ্বের অন্ধকারের অঙ্গে সূক্ষ্মতম রেখায় বিদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—

কিন্তু দাহ তার থাকেই।

সিম্ধার্থের বড় অর্থাভাব। ঋণ মিলিতেছে না; মিলিতেছে কেবল ঋণ পরিশোধ করিবার অসহিষ্ণু কঠিন তাগিদ।

সিম্ধার্থ ক্ষুধার্ত।

চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে।

দরজার সম্মুখে হঠাৎ কে হাঁকিয়া উঠিল,—সিম্ধার্থ জেগে আছ?

সিম্ধার্থের ক্লান্ত চোখের ভারি পল্লব দ্রুতগতি উঠিয়া গেল—পরিচিত কণ্ঠ; বলিল,—আছি, এস।

যে আসিল সে যে সিদ্ধার্থের বন্ধু তাহাতে কোনো বিসম্বাদই নাই ; উপরন্তু সে পথে-পাওয়া লৌকিক বন্ধু নয়, সুখ-দুঃখের দরদী জন।

সিদ্ধার্থ বলিল,—ব'স ; বড় অন্ধকার, বন্ধু।

দেবরাজ হাসিয়া উঠিল।

ইদানীং সিদ্ধার্থের চালচলন দেখিয়া আর কথাবার্তা শুনিয়া বেচারীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাহাদের দারুণ একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে।

তাই দেবরাজ ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—অন্ধকার কোথায় ? দিব্যি দিনের মত ফুট্‌ফুটে জ্যোছনা।

—বাইরে নয়, ভাই, ভেতরে।—বলিয়া অনিচ্ছুক দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিল,—অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুনতে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে ; তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠছে পৃথিবীর ক্ষুধার গোঙানি।—বলিয়া দীর্ঘ বিষন্ন দৃষ্টিতে সে বন্ধুরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অনুভব করিতে লাগিল কেবল নিজেকে।

দেবরাজ গাম্ভীর্য্যের ভান করিতেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকাইতে পারিল না ; হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—বড় বেশী অন্ধকারই বটে। কিন্তু এ অন্ধকারের মানে কি ? অভাব ত ? আমি চাঁদ এনেছি— একেবারে পূর্ণচন্দ্র, ষোলকলা ; উঠি-উঠি করছে। দেখবে ?—বলিয়া চাঁদ দেখাইবার জন্যই যেন সে হাত টানিয়া লইল।

—দেখতে ত চাই। কিন্তু তোমার হাত দিয়ে যখন অযাচিতভাবে উঠে আসছে তখন সন্দেহ হয়, সে চাঁদে কলঙ্ক বিস্তর।

ভারি একটা তামাসার কথা যেন—

দেবরাজ ভারি দেহ দুলাইয়া দুলাইয়া অজস্র হাসিতে লাগিল ; বলিল,—হাসালে, সিদ্ধার্থ, এত দিন পরে। চাঁদের কলঙ্ক দেখে ডরাচ্ছ, তুমি। সে কলঙ্ক কি কলঙ্ক ! সে গল্পের বুড়ি, আর জ্যোতির্বিদের পাহাড়। যাক্ সে কথা—কাজের কথা মন দিয়ে শোনো। রাসবেহারী একখানা চিঠি দিয়েছে তোমায় দিতে ; কিন্তু চিঠি হস্তান্তর করবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি নেবার কথা আছে। প্রস্তাবে তুমি রাজি হলে, চিঠি দেবো না। চিঠি আগে চাও, না প্রস্তাবটাই আগে শুনবে ?

—প্রস্তাবটাই আগে শোনাও, তবে সংক্ষেপে।

—সংক্ষেপেই বলছি। রাসবেহারী স্যাক্‌রা এবং মহাজন তা জানো। তার একটা পুরানো শত্রু আছে, পারিবারিক শত্রু। এই শত্রুটার বাড় সে একটু দমিয়ে দিতে চায়, মানে একটু থেঁতলে দেওয়া আর কি—

—কিন্তু আমি ত' মুগুর চালাতে জানিনে।

—জানো যে তা-ও ত আমি বলিনি। মুগুর ত নির্বোধের অস্ত্র ; বুদ্ধিমানের যে অস্ত্র তাই ব্যবহার করতে হবে। তাতে তুমি দক্ষ। শত্রুটি গরীব কিন্তু জেদী আর দুষ্টু। —সে তার বাপের শ্রাদ্ধের সময় বসত-বাড়ী বাঁধা রেখে চারশো টাকার আবন্ধ তমশুক লিখে দিয়েছে—মানে, সেইটে তোমায় লিখতে হবে। তুমি বিশ্বাসী গুণী লোক। একশোখানি রূপচাঁদ, নিষ্কলঙ্ক, নগদ, হাতে হাতে। অন্ধকার—

দুইজনে পা ঝুলাইয়া তক্তপোষে বসিয়াছিল।

সিদ্ধার্থ তক্তপোষের কিনারাটা আঙুল বাঁকাইয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরের দিকে টানিতে লাগিল ; বলিল,—দাঁড়াও—

টানিতে টানিতে হাত দু'খানা তার টান্ টান্ হইয়া সমস্ত দেহটাই খাড়া হইয়া দেখিতে দেখিতে আড়ষ্ট শক্ত হইয়া উঠিল।

দেবরাজ তাহার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল—এবং তাহার মানসিক হাসির আর বিরাম রহিল না। তার বুঝিতে সে ইহাই বুঝিল যে, এটুকু সিদ্ধার্থর অভিনয়—যেন ভিতরে সুমতি আর কুমতির তুমুল একটা লড়াই বাধিয়াছে।

কিন্তু দেবরাজ ভুল বুঝিল।

পুরাতন বন্ধু, তবু সিদ্ধার্থের খানিকটা তার চোখের আড়ালেই ছিল।

সত্যই একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যতদূর অধঃপতিত এবং হীনতায় মগ্ন বলিয়া সিদ্ধার্থ পরিচিত তাহা একেবারেই ভুল না হইলেও, দুর্বিপাকের পাকের ভিতর পড়িয়াও তার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মনে দেবরাজের অনুমানের অতীত একটা স্থানে কু ও সু-এর কলহ এখনো ঘটে।

নিরতিশয় ক্লেশকর অপমানবোধের সহিত সিদ্ধার্থর মনে হইতে লাগিল, মানুষের মনে কতদূর গভীর ইতরতায় নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মিলে তবে সে এ-হেন প্রস্তাব লইয়া আর একজনের টাকার লোভ দেখাইতে আসিতে পারে। ভিখারীরও কাণ্ডজ্ঞান আছে—অভাবের তাড়নায় দেহ আর রূপ যার পণ্য তারও ধর্ম আছে ; তারও ঘৃণার বস্তু পৃথিবীতে আছে ; তার নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে ; পরলোক, পাপ-পুণ্য সে মানে ; শ্রদ্ধার দাবীও সে করে ; কিন্তু কোন্ নরকের অতল গহ্বরে নামিয়া গেলে মানুষ দুনিয়ার আর সবই একধারে ঠেলিয়া দিয়া কেবল অর্থকেই প্রাপ্তির চরম স্বর্গ মনে করে !

সিদ্ধার্থ এক নিমেষেই যেন একটা ঘুরপাক খাইয়া ভাসিয়া উঠিল।

চোখে পড়িল, জীবনের অতীত ইতিহাসের সমস্তটা—তার যত দুষ্কৃতি, যত অপকার্য, যত অধর্ম। কিন্তু সিদ্ধার্থর মনে হইল, তারাও যেন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে তাহাকে আনিতে পারে নাই—সমতল ভূমির উপর শিলাস্তূপের মত কঠিনতম আর উচ্চতম হইয়া উঠিল চোখের সম্মুখে এইটাই। কাহারও সর্বনাশ সে কখনো করে নাই ; নিরাশ্রয় অন্নের কাঙাল করিয়া কাহাকেও সে পথে বসায় নাই।

সিদ্ধার্থ হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—ভয় করে। আমি পারব না, ভাই।

হাসিয়া দেবরাজ বলিল,—জেলের ?

—না। যদি টাকা হাতের ওপর জ্বলে ওঠে।

—খাসা বলেছ। নতুন রকম কথা কইবার যোগ্যতা তোমার বেশ। চিঠিই তবে শোনো। বলিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রিয় বন্ধু সিদ্ধার্থ,

যদিও তুমি ইংরেজি ভাষা ঠিক ইংরেজের মতই বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছ, তথাপি এই চিঠিখানি বাংলাতেই লিখিলাম, আমারই সুবিধার খাতিরে—আমি ইংরেজি জানি না। অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, তোমার অনুরোধ আমি এ-যাত্রা রক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রথম কারণ, আমি বহুসংখ্যক সন্তানের পিতা, তদ্ধেতু অর্থের অভাব

অনুক্ষণ অনুভব করিয়া থাকি ; দ্বিতীয় কারণ, হিসাবে দেখিলাম, সুদ বাবদ তোমার নিকট হইতে এ পর্যন্ত একটি পাইও পাই নাই ; অথচ হ্যাণ্ড নোট দুইবার পরিবর্তন করিতে হইয়াছে।

সুস্থিরচিত্তে একটি সৎ পরামর্শ গ্রহণ করিবে কি ? তোমার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে আমি সন্দিহান নহি। তোমার বিচার বুদ্ধি, ভূয়োদর্শন, বাকচাতুর্য প্রভৃতি সবই আছে এবং ছিল ; কিন্তু ক্ষেত্রনির্বাচনে তোমার ভুল হইয়াছিল। ব্যবসা তোমার কাজ নহে, অতএব সে সংকল্প ত্যাগ কর। এই পতনের পর আবার যদি পড়ো, তাহা হইলে আর তোমাকে তোলা যাইবে না।

তোমার দেহে কান্তি আছে, সৌষ্ঠব আছে, সর্বাঙ্গে তোমার লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতেছে ; তোমার অশেষ গুণ ; তোমার বাক্য প্রাণস্পর্শী, তোমার গাম্ভীর্য শ্রদ্ধেয়, তোমার মাথা হেলাইবার ভঙ্গী চমৎকার, তোমার বাহ্যজ্ঞান অসাধারণ এবং সুদ জমিয়াছে ঢের। শেষোক্ত দ্রব্যটিকে পরিশোধ করিয়া অপরাপর সদ্‌গুণগুলি কাজে লাগাও। তুমি বিবাহ কর। আজকাল তোমার উপযুক্ত পাত্রী মিলিতেছে। এমন স্ত্রী গ্রহণ করিবে যে তোমাকে তুলিতে পারে। তোমার বয়স এখন ত্রিশ কিম্বা তার কিছু বেশী ; সুতরাং পাঁচ-সাতটি বৎসর তুমি অকারণে জলে নিক্ষেপ করিয়াছ। বয়সের অপব্যয়টা স্মরণ করিয়া তৎপর হও।

সুদাদি কিছু পরিশোধ করিবার সুবিধা হইবে কি ? তোমাকে তাগিদ দিতে বাধ্য হই, ইহাতে আমার প্রাণে যেমন ব্যথা বাজে, তেমন বোধ করি তোমারও বাজে না। কিন্তু কি করিব বল ! এই যে আমার জীবিকা, ভাই ! মাতৃ-অঙ্গের অলঙ্কার বলিয়া যে অনন্ত জোড়া বাঁধা রাখিয়াছ, তাহা ঠিক স্বর্ণের নহে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ জন্মিয়াছে। তখন অতটা দেখি নাই—বন্ধুকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ব্যাপার গুরুতর ; আশা করি, এরূপ ব্যবহারের ফলাফল সম্বন্ধে তুমি অন্ধ নহে—

ভাল আছি। সর্বদা তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, এবং যতদিন মনে রাখিবে তত-দিন পর্যন্ত—

তোমার বিশ্বস্ত
শ্রীরাসবিহারী রায়।

—সিদ্ধার্থবাবু আছ কি ?

বলিয়া ডাক দিয়া এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যে-ব্যক্তি ঘরে ঢুকিল তাহাকে সুপুরুষ বলা চলে না ; মুখ-চোখের অত্যন্ত নিষ্ঠুর চেহারা—যেন নরবলি দিয়া আসিল।

তাহার দিকে চাহিয়াই সিদ্ধার্থর ম্লান চক্ষু আরো নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল।

লোকটার নামে আমাদের প্রয়োজন নাই, তার প্রয়োজন দিয়াই প্রয়োজন।

সিদ্ধার্থ "আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেই সে ব্যক্তি শ্যেন-চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—থাক্, আর সমাদরে কাজ নেই। কত দিচ্ছ বল !

মুহূর্তের জন্য চক্ষু অবনত করিয়া সিদ্ধার্থ যখন চোখ তুলিল, তখন লোকটাকে ছাপাইয়া শুদ্ধমাত্র তার খরতাপ কণ্ঠই যেন সিদ্ধার্থর দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজ করিতেছে, এবং সেই কণ্ঠকে উদ্দেশ করিয়াই সিদ্ধার্থ বলিল,—আজ, দাদা, ফিরতে হবে ; কাল বিকালতক্—

বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি চক্ষু পুনরায় নত করিল ; মিথ্যা যে মিথ্যাই—এ জ্ঞানটা মিথ্যা কহিবার আজন্ম অভ্যাসেও লুপ্ত হয় না ; পাওনাদারের ভ্রূভঙ্গী তাই বেশীক্ষণ তার সহ্য হইল না।

—আমি নিজে এলে কখন ফিরি না ; আমার দস্তুর, গুরুর আদেশ। বিকালতক্ কি বলছিলে ? চম্পট দেবার মতলব বুঝি ? শুনেছি, চারিদিকে তোমার দেনা ; তিনবার তুমি কড়ার ভেঙেছ ; চতুর্থবারে আমি নিজে এসেছি ; সুদ সমেত সব টাকা উশুল না করে আমি উঠবো না। আমি নিজে কিছু করবো না ; বাইরে আমার লোক দাঁড়িয়ে আছে ; তারাই যা করবার তা করবে। কি বললাম শুনেছ সব ?

—শুনেছি ! কিন্তু উপায় নেই ; সারাদিন আমি অভুক্ত আছি।

—সুবিধের কথা, লড়তে পারবে কম।

বলিয়া সে-ই যেন লড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সিম্ধার্থ হাত জুড়িয়া বলিতে লাগিল,—আপনি ধনী, লক্ষ্মী আপনার ঘরে অচলা হয়ে আছেন। কত দীন, আতুর, পথের কুকুর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমি আপনার ধনসাগরের মাত্র একটি বিন্দু তুলে নিয়েছি ; হিসাবের অঙ্কে ছাড়া আর কোনো প্রকারেই আপনি সে ক্ষতি অনুভব করতে পারছেন না। দয়া করে এতদিন যদি সয়ে আছেন, তবে আর ঘণ্টা কতক সবুর করুন, তারপর আপনি আমাকে—

বলিতে বলিতে কিসে যে তার কণ্ঠ বুজিয়া আসিল তাহা সে নিজে ছাড়া আর কেহ গ্রাহ্য করা দূরে থাক লক্ষ্যও করিল না।

পাওনাদার তেমনি করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল,—তুমি যে-সব কথা বললে, গৃহে আমার লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন, তদ্রূপ অবস্থাতেই বরাবর থাকবেন, আমি মস্ত একটি ধনসাগর—এমনধারা কথা আমি দায়গ্রস্থের মুখে এত শুনেছি আর এত ঠকেছি যে, সে কথা শুনলে এখন আর প্রাণ গলে না। তুমি অভুক্ত আছ শুনে তোমার কথা আর একবার রাখলাম ; কিন্তু মনে রেখো, আমায় ফাঁকি দিয়ে কেউ পার পায়নি।

বলিয়া দম্ দম্ করিয়া পা ফেলিয়া পাওনাদার প্রস্থান করিল।

এবং তারই ক্রুদ্ধ আক্রোশের কথাগুলিকে কে যেন সিম্ধার্থকে দিয়া মনে মনে বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

সিম্ধার্থের আর কিছু না থাক্, একটা চাকর ছিল এবং কাছেই কোথায় দাঁড়াইয়া ছিল।

সে আসিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল,—মাইনে মিটিয়ে দেন মশাই ; আর কেন ?

সিম্ধার্থ আশা করিয়া যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল ; অঙ্গুরীটি খুলিয়া ভৃত্যের হাতে দিয়া বলিল,—এস—

দেবরাজ এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া কেবল মুচকি মুচকি হাসিতেছিল ; এইবার ফুরসৎ পাইয়া বলিল,—অন্ধকার দেখে ভয় খাচ্ছিলে ; কিন্তু তার ওপরেও ঢের কিছু বাকি ছিল দেখছি।

—ছিল, ওরা দিয়ে গেল কিছু, তুমি দিতে এসেছ কিছু। আমি রাজি। রাসবেহারীর প্রস্তাব অতি সাধু প্রস্তাব। কাল সকালে যাবো।

—নিশ্চয় ?

—নিশ্চয়।

—তবে এখন আমি উঠি। মূল কথা, অন্ধকার কেটে গেলে যেন চাঁদের ভাগ পাই।

বলিয়া সিদ্ধার্থের পিঠে আদরের দু'টি করাঘাত করিয়া দেবরাজ বিদায় নিল।

তাহারই পদশব্দ কানে লইয়া সিদ্ধার্থ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহাকে যেন সবাই কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়া বিসর্জন দিয়া গেল—চিরবিদায় দিয়া যাহারা ফেলিয়া গেল, যাওয়াই তাদের কাজ।

সিদ্ধার্থ খানিক কান পাতিয়া রহিল।

যেন স্পষ্ট কানে আসে, দূরের অন্ধকারে কাহার পায়ের ধ্বনি মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে।

সকলের আগে গিয়াছেন লক্ষ্মী।

তখন দেহটা বিবর্ণ শীতল হইয়া উঠিয়াছিল—বহির্মুখী মন ভিতরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল—তাঁহার অঞ্চলচ্যুত হইয়া যেখানে সে পড়িয়াছিল সেটি দুস্তর নিঃশ্বাসভূমি।

সেইদিন হইতে তার উদরে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই—কিন্তু দোষ কার!

আশা ফলিত, ছিল সবই, কিন্তু ছিল না কেবল সেইটি—যার সংজ্ঞা নাই, যার স্বরূপ বলিয়া বুঝান যায় না ; যাহাতে উদ্যম সফল হয়, বড় আরো বড় হয়, ছোট উঠিতে থাকে, ছিল না তাই।—সে অদৃষ্ট নয়, দৈব নয়, পুরুষকার নয়—এই সকলের মিলিত সে নিরুপাধিক অজ্ঞাত একটা বস্তু—ছিল না তার তাই।

পালাইয়াছে সবাই। সঙ্গে আছে কেবল সয়তান।

বহু দিনের প্রিয় ইচ্ছাটিকে আড়াল করিয়া সয়তান আজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রলোভন দুর্বার।

হাতের কাছেই একখানা আয়না পড়িয়াছিল ; হঠাৎ সেইখানা তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের সম্মুখে সে বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিল ; নিজের ছায়াটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, এ মুখ ত' লক্ষ্মীছাড়ার মুখ নয়, সৌভাগ্যবানেরই মুখ। কিন্তু এই মুখখানা লুকাইবার স্থান তার নাই।

—আবর্ত রচনা করিয়া কালের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতের বেগ ক্ষিপ্ত, প্রখর ; কিন্তু ঐ স্রোত আর আবর্তই ত' মানুষের অদ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র। স্রোতের বাহিরে পল্বল আর পঙ্ক।

পল্বলের পঙ্কেই আজ সে আবদ্ধ।

ঊর্ধ্বে নিস্তরঙ্গ নীলিমা—নিম্নে তরঙ্গায়িত শ্যামলিমা—দু'টিতে চুম্বনে মেশামেশি।

তাহার অন্তরও ত ঐ দুর্নিরীক্ষ্য দিক্‌রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া মিলন-চুম্বনের স্থানটিতে যাইতে চায়।

কিন্তু জীবনের হিল্লোল কেবল অতীতের দিকে উজান বহিতেছে।

উজান দিকের একটি ঠিকানায় তার জীবন বাঁধা পড়িয়া আছে! সে দৃঢ়বন্ধন সে কাটিবে কি করিয়া!

পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর।

একটি ঘরের বাসিন্দা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল। কণ্ঠ মধুর নহে, কিন্তু আনন্দ অনাবিল, উচ্ছল।

লোকটি শ্রমজীবী ; বাহির হইয়াছিল সকাল সাতটায়; ফিরিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। এই দিনব্যাপী কঠিন শ্রান্তি এক মুহূর্তেই কি করিয়া ভুলিয়া ঐ লোকটি প্রভাতের পাখীটির মত আনন্দে মাতাল হইয়া গান গাহিতেছে!

সিদ্ধার্থের বুভুক্ষু আত্মা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এ গান মুখের গান নয়—কেবল বুকের গানও নয়।

এ গান গৃহের ; চারিটি দেওয়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র একটু চতুষ্কোণ স্থানের ভিতর যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি, আরাম আর বিলাস সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহাই যেন লোকটির কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মহোল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থ গৃহী নয় ; গৃহ তার নাই।

বৈরাগী সে নহে ; বৈরাগ্য তার জন্মে নাই। মাঝখানে সে দুলিতেছে।

ইহা যে কত বড় ব্যর্থতা, বিরহ আর শূন্যতা তাহা কেবল সে-ই জানে যার ঘটিয়াছে।

॥ দুই ॥

ঋণ কিছু কিছু পরিশোধ করিয়া সিদ্ধার্থ পূর্বের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছে। পলায়ন ছাড়া তার আর উপায় ছিল না।

অধুনা সে এইখানে, একটা পার্বত্য জলপ্রপাতের খাদের ধারে।

পাওনাদার পর পর ক্ষুধিত নেকড়ের খড়গের মত অসহিষ্ণু শাণিত দৃষ্টি লইয়া অবিশ্রান্ত তাড়িয়া আসিতেছে না।

তবু সিদ্ধার্থের মরিতে ইচ্ছা করিতেছে। সে পলাতক।

সংসারের যে ধর্ম পালন করিলে মানুষের টিকিয়া থাকিবার বনিয়াদ প্রস্তুত হয়, মানুষে মানুষ বলিয়া মানে, সেই ধর্ম সে পালন করিতে না পারিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়াছে।

সিদ্ধার্থের মনে হইতে লাগিল, সে যেন গলিত কর্দমকুণ্ডের কৃমি, মানুষের পাদ-স্পর্শের যোগ্য সে নয়। কোথায় একটু দুর্বলতার ফাঁক ছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া দুনিয়া তাহাকে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া প্রবঞ্চক ইতর সাজাইয়াছে—তারপর তাহাকে গায়ের জোরে ভদ্রসীমার বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

সিদ্ধার্থ খাদের জলের টগবগ আলোড়নের দিকে আয়ত লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শেষ-উপার্জনের টাকা ক'টি সত্য সত্যই করতলের উপর জ্বলিয়া ওঠে নাই ; কিন্তু তার স্পর্শ যেন একটা দুরারোগ্য ব্রণ-ব্যাধির জ্বালার মত এখনো তার ভিতরে বাহিরে দপ্ দপ্ করিতেছে।

অস্থির জলের নীচে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিবেক-দংশনের পরম-শান্তি যেন মিলনাকুলা প্রেয়সীর মত তাহাকে গ্রহণ করিতে বাহু মেলিয়া বুক পাতিয়া বসিয়া আছে।

প্রপাতের খরস্রোত খাদের গর্ভে লাফাইয়া নামিতেছে।

একটা ক্রুদ্ধ আহ্বান-গর্জনের মত অবিরাম অনন্ত তার শব্দ; উৎক্ষিপ্ত চূর্ণ জলের প্রতি কণায় ইন্দ্রধনুর সবগুলি রং ফুটিয়া উঠিয়াই ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মরিতে হয় ত এইখানে। পিছন হইতে কে যেন দু'হাতে তাহাকে গহ্বরের দিকে ঠেলিতে লাগিল—নিষ্পলক চক্ষু তার ঠিক্‌রাইয়া উঠিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব নাই।

কিন্তু যেন আকাশ ছাপাইয়া পরলোকের প্রতিবিম্ব তাহার অন্তরে সজীব হইয়া উঠিয়া আকর্ষণ করিতেছে; কেবলি বলিতেছে, আয়! আয়!

হয়তো সিদ্ধার্থ মরিত। কিন্তু অনিশ্চিত সুনিশ্চিত হইবার পূর্বেই ঘটনাচক্র আর এক পাক ঘুরিয়া গেল।

জলের ডাকে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে শুনিতে কি মনে করিয়া হঠাৎ পিছন ফিরিয়াই সিদ্ধার্থ যেন থম্‌কিয়া আকাশ বাতাসের মাঝে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল—তার শীতল রক্ত দেখিতে দেখিতে জরাক্রান্তের নাড়ীর মত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু।

কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত—অসীম আঁধার-সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্মুখে কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নেই—স্তরের প্রান্তরেখায় তরল সোনার ঢেউ; পীত মেঘের গর্ভান্তরাল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম রশ্মির সূত্রগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশের মধ্যস্থল অমনি একটু স্পর্শ করিয়াই মিলাইয়া গেছে, রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর জননীর নিঃশ্বাসের মত বায়ু অতি সতর্ক; পুষ্পস্তর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিক্‌-সীমানায় লীন হইয়া গেছে। এই ছবিটা সিদ্ধার্থের আগে চোখে পড়ে নাই।

যাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ এই রূপবর্ণাঢ্য প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, অস্তোন্মুখ সূর্যের হিঙ্গলাভা তার মুখে পড়িয়াছিল।

চক্ষু দু'টি কৌতুকোজ্জ্বল—

সর্বাঙ্গে গতির লীলা-তরঙ্গ—

পা দু'খানির সাড়া পাইয়া মাটি যেন আগাইয়া আসিয়া বুক পাতিয়া দিতেছে। একটুখানি হাসি তার অধরে ছিল—যেন স্বর্গচ্যুত অমৃতের কণাটি, প্রাণের সব মধু যেন অধরপ্রান্তে উথলিয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থের মনে হইল, জীবনের অন্তহীন ধারা একটি মাত্র স্তবকে সীমাবদ্ধ হইয়া একটি রেখার সম্মুখে গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ রেখাটি উত্তীর্ণ হইতে সিদ্ধার্থের মন কিছুতেই চাহিল না।

সিদ্ধার্থের মরা হইল না।

## ॥ তিন ॥

যাহাকে দর্শনমাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগ্‌বাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্মণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বলা বাহুল্য সে একটি নারী। প্রপাতের অদূরে সে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহাকে দেখিয়াই সিদ্ধার্থের মরিবার সঙ্কল্প উল্টাইয়া সরাসরি একটা সহজবুদ্ধির উদয় হইল।

সঙ্গে পুরুষ আছে।

উহারা কে তাহা জানিবার দরকার আছে বলিয়াই সিদ্ধার্থের মনে হইল।

সিদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া গেল; এবং একটা বৃহৎ শিলাপিণ্ডের আড়ালে থাকিয়া অল্প একটু মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দু'জনায় ঘাসের উপর বসিয়াছে।

সিদ্ধার্থ চেনে না, কিন্তু উহারা দুই ভাইবোন; নাম রজত ও অজয়া—স্বাস্থ্যানুসন্ধানে এই নিরালা পার্বত্য প্রবাসে আসিয়াছে।

সিদ্ধার্থ শুনিতে লাগিল—

অজয়া বলিতেছে,—কি সুন্দর! সামনে দেখো একটি ছোট্ট ফুল, ছোট্ট মুখখানি বের ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে। ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাইরে এসেছে—মানুষের সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেই যেন চুপ ক'রে ভেতরে পালিয়ে যাবে।

রজত বলিল,—তুলে আনি ফুলটা?

বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল।

অজয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—না, না। তুমি কি! ফুলটা ত একফোঁটা চোখের জল নয় যে দেখতে হবে তাতে লবণের ভাগ কতটা!

প্রকাশ যে, রজত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া চোখের জলে লবণের অংশ শতকরা কত এবং সেই লবণসঞ্চয় সে কোথা হইতে করে তাহাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আছে। চোখের জলের মত সুলভ অথচ যুগপৎ সুকোমল ও সুকঠিন জিনিষ বস্তুজগতে আর কিছু নাই বলিলেও চলে।

এবং এক সঙ্গেই ব্যাখ্যাত ও অব্যাখ্যাত বলিয়া ওটা বড় আশ্চর্য জিনিষ।

মানুষের মনের গভীরতম বার্তাটি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে প্রকাশ করে ঐ স্বচ্ছ একবিন্দু জল।

কিন্তু কোথায় তার সৃষ্টি-কৌশলের সূক্ষ্ম যন্ত্রটি এবং কোথায় তার ভাবনিবিড়তা। এই প্রশ্নটিকে বাদ দিয়া রজত তার উপাদান লইয়া নিপুণ চর্চা সুরু করিয়া দিয়াছে।

লবণের কথাটি উল্লেখের সময় অজয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির উদয় হইয়াছিল, কিন্তু রজত যেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না; বলিল,—বাস্তবিক, ফুল দেখবে ত এসো পাহাড়ে। ভুঁইচাঁপা আর স্থল-পদ্মই ফুটেছে কত! কিন্তু আমি তারিফ করছি ঝুলানো ঐ রাস্তাটার। উঃ, কত লোক যে ওটা তৈরীর সময় পড়েছে আর মরেছে তার ইয়ত্তাই নেই! আমাদের সুরেন—

—ওগুলো কি ফুল, দাদা, প্রকাণ্ড একটা গাছে থোপা থোপা ফুটেছে, থেকে থেকে এক একটা খ'সে পড়ছে?

—ইয়ে ফুল; নামটা কি ভুলে যাচ্ছি।

অজয়া হাসিল। বলিল,—জানো না তাই বল।

—ঝুলানো রাস্তাটার ওপর একটা মানুষ আমাদের দিকে সুমুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যেন আকাশের গায়ে ঠেস্ দিয়ে—আরো দূর থেকে দেখলে মনে হবে, আকাশের গায়ে আঁকা। মানুষের স্বচক্ষে দেখাটাও অনেক সময় মিথ্যে হয়ে যায় এক দূরত্বের বিভ্রমের দরুণ।

অজয়া কিছু বলিল না।

সেই রাস্তাটার দিকে চাহিয়াই রজত বলিতে লাগিল,—এ পাহাড়ের মাথা থেকে ও পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত শূন্যের ওপর দিয়ে প্রায় মাইলটাক্ লম্বা ঐ রাস্তাটা গড়তে যেমন বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে, টাকা ঢালতে হয়েছেও তেমনি। এই রাস্তা তৈরীর কাজে আমাদের সুরেনেরও না কি হাত আছে।

অজয়া ভ্রূভঙ্গী করিল। এবং রজত বক্রনয়নে অজয়ার মুখের উপর একটা কৌতুক-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল,—সুরেনটা চিরকাল অকালপক্ব আর কাজ-পাগল। বড়লোকের ছেলে—অথচ দিনরাত কি পরিশ্রমটাই করে—মৌলিকতায় বড় বড় ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারকে হার মানিয়ে দিয়েছে। ব'সে খেলে যার নিন্দে নেই, লোকসানও নেই, সে যদি খাটে তাহ'লে বুঝতে হবে দারিদ্র্যকে সে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেয়। কি বল ?

কথিত কারণে দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়া হয় কি না সে বিষয়ে অজয়ার কোনো লিপ্ততাই দেখা গেল না। একখানা পাথর দেখাইয়া বলিল,—এটা কি পাথর, দাদা ? ইয়ে পাথর নয় ত ?

—একরকম স্ফটিক পাথর, আভ্-মেশানো ব'লে চিক্চিক্ করছে। কিন্তু আমি বলছিলাম, ঐ রকম স্বেচ্ছাদারিদ্র্যকে আমি খুব প্রশংসা করি। তুমি—

অজয়া হাসিয়া বলিল,—তুমি প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছ। তোমারও ত না খাটলে চলে ; তুমি খাট কেন ?

এমন কথা অজয়ার মুখে! বলিল,—আমার কথা বলছ! খুব কম সুরেনের তুলনায়—সে কাজ কাজ ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছুটে বেড়াচ্ছে, আমি টেবিলের ধারে ব'সে সৌখীন একটু রসায়ন শাস্ত্র আলোচনা করি। সুরেনের সংগে আমার তুলনা ! বাপরে !

বলিয়া, অজয়ার অযৌক্তিকতায় অবাক হইবার জন্য চোখ এবং হাঁ যতটা বড় করা যুক্তিযুক্ত ততখানিই বড় করিয়া রজত অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অজয়ার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চোখের জলে লবণের ভাগ যত থাক, দাদার এই অবাক হইবার মধ্যে কাতরতাই পনর আনা।

দাদার চোখে-মুখে এই কাতরতা দেখা অজয়ার অভ্যাস হইয়া গেছে।

সুরেন রজতের বন্ধু।

রজতের ইচ্ছা, বন্ধুকে সে আরো আপনার করিয়া লাভ করে ; তাহার উপায় অজয়া—

দু'টিতে যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায় তবে—

রজত ভাবে, সে সুখ অনির্বচনীয়।

কিন্তু অজয়া তাহাতে বারম্বার আপত্তি করিয়াছে, অথচ নির্দিষ্ট কোনো কারণ সে দেখায় নাই। তাই রজত যখন-তখন ভগিনীর মন বুঝিতে বসে।

এখনো রজতের হাঁ-টা আর চোখ দু'টি প্রার্থনায় পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল।

কিন্তু সে প্রার্থনার আবেদন বড় দুর্বল—আপাতত কোনো কাজে আসিল না।

অজয়া খানিক ভাবিয়া বলিল,—সুরেনবাবুর নামটি আমায় বারবার কেন শোনাচ্ছ, দাদা?

প্রশ্নের সুর শুনিয়াই রজত উস্‌পিস্‌ করিতে লাগিল; বলিল,—বিশেষ কোনো হেতু তার নেই, তবে তার কথা সর্বদাই আমার মনে পড়ে—সময় সময় না ব'লে পারিনে। তার হাতের এই রাস্তাটা দেখে আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে গেছে—দু'দিন আগে তার চিঠিও পেয়েছি; আমরা কেমন আছি, মহা ব্যস্তভাবে তাই জানতে চেয়েছে।

—ঠিকানা দিয়ে বুঝি চিঠি লিখে এসেছিলে?

—তাকে এখানে আসতে নিমন্ত্রণ ক'রেই এসেছি। খেটে খেটে তারও শরীর ভাল নেই। তুমি মুখে কিছু বল না বটে, কিন্তু তুমি যে আমার শরীর দেখে সুস্থ বোধ করছ তা আমি তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারি। তার শরীর ভাল দেখলেও কি তোমার আনন্দ হবে না?

প্রশ্নটি ভবিষ্যতে মানসিক অনিশ্চিত একটু পরিবর্তন সম্পর্কে।

কিন্তু তাহাতেই এমন একটা কঠিন দ্বিধার সুর বাজিল—যেন রজত নিশ্চয় জানে, তার এই অন্তরগত অকপটতা যেমন খাঁটি তেমনি নিষ্ফল।

এবং তাহার দুঃখ এইখানেই।

কিন্তু দাদার এই দুঃখটুকুই কেবল অজয়াকে বিচলিত করিতে পারে না—ঐ স্থানটিতে কঠোর হইতে তাহার বাধে না।

মাটির দিকে চোখ করিয়া বলিল,—কবে তুমি শোধরাবে, দাদা?

—প্রয়োজন হয় শীগ্‌গিরই; কিন্তু আমার কি সংশোধন তুমি চাও, অজয়া?

—নিজের চোখ দিয়ে আমার সুখ খুঁজে বেড়ান—ঐটের সংশোধন চাই।

—তাহ'লে তাকে আসতে বারণ ক'রে দি?

—আমার সুখ খোঁজাখুঁজির কথায় তাঁকে আসতে বারণ করার কথা কি ক'রে আসে তা' জানিনে। কিন্তু তার দরকার নেই। তিনি আসুন; তাঁর সংগে কথাবার্তায় তুমি থাকবে ভাল। তবে তোমার মনে কোনো অভিসন্ধি আছে যদি বুঝতে পারি তবে তার সামনেই আমি বেরুবো না; তখন বারণ করতে পারবে না যে অভদ্রতা হচ্ছে। চক্ষু-লজ্জার দোহাই দিয়ে তখন আমায় নিয়ে টানাটানি করতে আমি দেব না তা এখনই ব'লে রাখছি কিন্তু।

রজত অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

সুরেনকে মাঝে রাখিয়া ভ্রাতা-ভগিনীর বাক্‌যুদ্ধ এই নূতন নহে; তবু চিন্তাটা বড় মধুর বলিয়াই কোনোদিন তার নূতনত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আলোচনাটি রজতের কাছে ক্লান্তিকর নীরস হইয়া ওঠে নাই।

বলিল,—সুরেনের প্রতি তোমার মন কেন এমন বিমুখ, সত্যি বলছি তোমায়, সেটা আমার বড় হেঁয়ালির মত ঠেকে। সে ত' সব দিক দিয়েই তোমার যোগ্য! তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, এমন কি—

রজত জানে না যে, এ-ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের দায়িত্ব তাহার নহে, এমন কি তাহাতে তাহার অধিকার আছে কি-না সন্দেহ।

অজয়া তাহা জানে।

তাই সে হাসিয়া বলিল,—তুমি সুরেনবাবুকে খুব ভালবাস, না ?

যেন আশার আলোক দেখা গেল—

রজত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; বলিল,—তোমাকে যার হাতে দিতে চাই, তাকে কেমন ভালবাসি সেটা অনুমান করা ত' শক্ত নয় !

—তবে আদেশ করো না কেন ?

রজত মনে মনে আরো খানিকটা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—যদি করি তবে আদেশের মান রাখবে ?

—রাখতে পারি, উদ্ভটত্বের খাতিরে।—বলিয়া অজয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু রজতের মুখের দিকে চাহিয়াই তার হাসি যেন আহত হইয়া নিবিয়া গেল ; বলিল,—রাগ ক'রো না, দাদা, ক্ষমা করো। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারলে আমি করতুম।—বলিয়া হাত বাড়াইয়া রজতের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

এইখানেই এ আলোচনার সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল ; কিন্তু রজত ঘটিতে দিল না। বলিল,—তোমার আপত্তি কি বলো, দেখি আমি খণ্ডন করতে পারি কি না।

—তুমি কি জজের সামনে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের দলিল নাকচ্ আর আপত্তি খণ্ডন করছো, দাদা ! এ ব্যাপারটা যে তার চাইতে ঢের বেশী জটিল ! বড় দুঃখ হচ্ছে, তোমায় অসুখী করলুম।

—অসুখ একটু বোধ করছি বই কি।

—তবে এই অপ্রীতিকর কথাটা এখন থাক ?

—অপার দুর্ভাগ্য যে পৃথিবীর এত লোকের ভেতর অপ্রীতিকর সেই লোকটির কথাই আমার মনে পড়েছিল।

—অপ্রীতিকর সেই লোকটি নয়, আমাকে নুইয়ে নিয়ে তাঁর সংগে বেঁধে দেবার গোপন ঐ চেষ্টাটিই অপ্রীতিকর।

অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া রজত অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করিল,—টাকার লোভে যা তা একটা ভবঘুরে জুটে তোমার খেয়ালের সামনে প'ড়ে গেলেই ব্যাপার জটিল থেকে সঙ্কট-জনক হয়ে দাঁড়াবে। তোমার মতামতের একটা মূল্য আছে তা স্বীকার করতে আমরা নিশ্চয়ই বাধ্য ; কিন্তু এটাও যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমায় তুমি দুঃখ দেবে।

—যেটুকু দুঃখ তোমায় বাধ্য হয়ে দিচ্ছি তার চেয়ে বেশী দুঃখ তোমায় আমি দেব না। বেলা নেই, চল এইবার ফিরি।—বলিয়া অজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত ও অজয়া উঠিয়া গেল।

এবং সিদ্ধার্থ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া লাফাইয়া সেখানে পড়িল। উভয়ের কথোপকথনের সবটাই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিলিয়াছে ; কিন্তু ভিতরে যাইয়া সব চেয়ে পরিপাক পাইয়াছে রজতের ভবিষ্যদ্বাণীটি। কি ক্ষণে কথা উচ্চারিত হইয়াছে কে জানে —গ্রহের কল্যাণে কথা ফলিয়া যাইতেও পারে। রজত বলিয়া গেল, "ভবঘুরে জুটে তোমার খেয়ালের সামনে প'ড়ে গেলেই—"

ঐ সামনেই তাকে পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায় এই—যথার্থরূপে রূপদর্শন সিদ্ধার্থের ভাগ্যে এই প্রথম। জীবনে

সে সংগ্রাম করিয়াছে বটে, কিন্তু বিচিত্র জীবনের দশদিকেই যে মানুষের রথচক্র ধাবিত হইতেছে তাহা তাহার যেমন অজ্ঞাত, তেমনি অজ্ঞাত ছিল নারী।

নারীর রূপ যে ছায়া নয়, তাহা রস-আবেদনে পরিপূর্ণ একটি সজীব গভীর সত্য বস্তু সে জ্ঞান তার জন্মে নাই। অজয়াকে দেখিয়া তাহার পরমাত্মা যেন সহসালব্ধ সেই জ্ঞানের অমৃতলোকে আজ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, একটি প্রাণের অবরুদ্ধ স্পন্দন নিঃশ্বাসে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্তির আনন্দে এই বাতাসেই উল্লসিত হইয়া আছে।

পা দু'খানি দীর্ঘকাল এইখানে রক্ত-কমলের মত ফুটিয়া ছিল।

সর্বাঙ্গের স্পর্শ মাটির দেহে বাতাসের গায়ে জড়াইয়া আছে—হাসিটি যেন বোঁটার উপর ফুলের দেহ ধারণ করিয়া এখনো হাসিতেছে।

হঠাৎ ছুটিয়া যাইয়া সে সেই ছোট ফুলটি তুলিয়া আনিল।

টানে পুট্ করিয়া বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেল।

ফুলের মুখ দিয়া আর্তনাদ বাহির হইল না, একটি নিঃশ্বাসও বোধ হয় পড়িল না।

কিন্তু এমনি ব্যাপারে যে-ব্যথা অশ্রুর জন্মকোষে ঘা দিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করে তাহা সিদ্ধার্থর ভাবানুগতিকতার কোনো স্তরেই নাই।

রজতেরও নাই।

কিন্তু অজয়ার আছে। তাই রজত তাহাকে ছিঁড়িতে পায় নাই। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহাকে ছিঁড়িয়া চোখের সামনে ধরিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল,—কেন হাসছিলি তুই ছোট্ট ফুলটি? তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, না তার পায়ের তলায় স্থান পেয়ে? তুই জানিসনে, তোর ফুলজন্ম সার্থক ক'রে দিয়ে কি মমতার চোখে সে তোকে দেখে গেছে। তোর প্রাণ থাকলে তুই আনন্দে মাতাল হয়ে লুটিয়ে পড়তিস। এই ফুলের রাজ্যে এত ফুল থাকতে তোকেই কে তার পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছে! তুই আমার সাথী হয়ে থাক। আজ থেকে আমি বিরহী; তবু তোকে আমি হিংসা করবো না।—বলিয়া অক্লেশে সে ফুলটিকে পকেটের ভিতর গুঁজিয়া দিল।

তারপর কাজের কথা।

জানা গেল, নাম অজয়া; অবিবাহিতা। সুরেন নাম-ধারী এক ব্যক্তি উমেদার আছে—তবে সে আমল পায়নি।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তার চিন্তা চপলতা ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ব্যূহ রচনা করিতে হইবে। এই নারী পৃথিবীর উপর মাত্র পা দু'খানি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে—অন্তর তার গূঢ়ান্বেষী—কল্পলোকে সে ফুল ফুটাইতেছে। চোখে তার স্বপ্ন-কুহেলিকা; মনে অহমিকা। তাহার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

যে সুখ-দুঃখ এতদিন তাহাকে আলোড়িত করিয়াছে তাহা সিদ্ধার্থর কাছে আজ অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ হইয়া গেল। যার নাম আজ সে বহন করিতেছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার প্রাণে যে ব্যথা নিরতিশয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সীমাহীনতার আলেখ্যই এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।

সিদ্ধার্থ মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আগে চিন্তা, পরে কাজ।

## ॥ চার ॥

জলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ইহা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথাটি যে, রোগের বীজের মত অভ্যাসও যেন রক্তের আশ্রয়েই চিরজীবী হইয়া থাকিতে চায়।

এই কথাটি সিদ্ধার্থ সময় সময় ভুলিয়া যায়; সে ভাবে, তার মস্তিষ্কের বিচ্যুতি, আত্মবিস্মৃতি। মনে করে, যা করিতেছে তা ছাড়া উপায়ান্তর নাই; কিন্তু অনতি-বিলম্বেই চেতনার মূর্ছা কাটিয়া সহস্র দিকে সহস্র পথ দেখিতে পাইয়া তার মর্মদাহের অন্ত থাকে না। যে পথে সে হঠাৎ এ সময় চলিতে থাকে সে পথে তাহাকে লইয়া যায় তার বিভ্রান্ত আত্মবিস্মৃতি নহে, তার বিগত এবং বিস্মৃত অভ্যাস।

অতিশয় হীন সংস্রবে জীবনের দীর্ঘদিন সে কাটাইয়াছে। তাই তার আহরিত শিক্ষার ফলটিকে আবৃত করিয়া মাঝে মাঝে পাঁকের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে থাকে।

—মদনের আজ কি কান্না, দিদিমণি!—বলিয়া হাসিমুখে ননী আসিয়া দাঁড়াইল।

ননীর পরিচয়টা দি—

কিন্তু ননী অজয়ার কে তাহা সংক্ষেপে ঠিক করিয়া বলা কঠিন; অন্য কোথাও হয় তো এরূপ অবস্থায় প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই দাঁড়াইত।

কিন্তু অজয়া তাহাকে নিম্নস্তরের ভিতর কুড়াইয়া পাইয়াও সখীর আসন দিয়াছে।

ননীকে খাটাইতে অজয়ার বাধে না। ননীও, যেন নিজেরই সব, এমনি করিয়া আগ্‌লায়।

অজয়া সেলাই করিতেছিল। মদনের কান্নার সংবাদে মুখ তুলিয়া বলিল,—তোর ধারা পেয়েছে বুঝি! আমার গান শুনে নিশ্চয়ই।

—না গো না; তাহ'লে ত' বুঝতাম, লোকটা কেবল রাঁধে না, কাঁদতেও জানে।

—তবে?

—শোনো মজা। আমি ব'সে কি একটা করছি, মদ্‌না কোথা থেকে ছুটে এসে আমার সামনে ব'সে পড়েই হু হু ক'রে চোখের জল ছেড়ে দিল। জল কি দু'এক ফোঁটা! ঘড়া ঘড়া গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি বলি, কাঁদিস কেন? কাঁদিস কেন? মদ্‌না কেবল বলে, আমি ম'রে যাব। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ী থেকে খারাপ খবর এসেছে? বললে, না। তারপর কায়ক্লেশে কান্নার কারণ যা বললে তা তোমাকে বলতে বারণ ক'রে দিয়েছে। বলব কি না ভাবছি।

ননী বলিতেই আসিয়াছিল। "বলব কিনা ভাবছি" বলিয়া সে অনর্থক অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অজয়া বলিল,—আমি শুনতে চাইনে। কিন্তু কান্না থেমেছে ত'?

—আপাতত মুলতুবী আছে, কিন্তু জল কখন আবার নাববে তার কিছু ঠিক নেই। তোমাদের খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ঘটনা এম্‌নি সাংঘাতিক। সে বলতে বলেছে দাদাবাবুকে, কিন্তু তোমাকেই বলি; তুমিই না হয় তাঁকে ব'লো। ছেলেবেলা থেকেই নেশাটা আস্‌টা করে, গাঁজা খায়। এখন, কলকাতা থেকে সম্বল যা এনেছিল তা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। এ মুল্লুকে আব্‌গারী দোকান বোধ হয় নেই; ফুরিয়ে গেলে কি হবে তাই ভেবে সে ক্ষেপে উঠেছে। তোমরা যদি পরিচিত কাউকে চিঠি লিখে

ভারিটাকু আনিয়ে দিতে পারো তবেই বাঁচবে, নতুবা সে লাফিয়ে বেড়াবে কি বিছানা নেবে তা সে জানে না।

অজয়া হাসিতে লাগিল ; বলিল,—মিলেছে সব ভালই। বলিস তাকে, আনিয়ে দে'য়া যাবে।

—তুমি শুনেছ সে যেন জানতে না পারে। জানতে পেলে আমায় মাছের কাঁটা খাইয়ে মারবে।

মদন অজয়াদের পাচক। অজয়া বলিল,—তুই ম'লে ত' আমি বাঁচি, হাড় জুড়োয়।

—তাই ব'লে কি আজই বিদায় করতে চাও ? তা আমি যাচ্ছিনে। তোমার চেয়েও আমার যে আপনার তাকে তুমি এনে দেবে, তাকে দেখে তবে আমি মরব—অবিশ্যি যদি তখন মনে পড়িয়ে দাও।

—তবেই তুমি এ জন্মে মরেছ। তালগাছ—

দরজার বাহির হইতে হঠাৎ একটা ফুলের তোড়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল—এবং দুপ্‌দাপ্‌ পায়ের শব্দ মাত্র কয়েক মুহূর্ত শোনা গেল—

—কে রে ?

ননী বলিল,—আর কে রে ! সে পালিয়েছে।

—দেখত ননী, কে !

ননী বাহিরটা দেখিয়া আসিল—কিন্তু রাস্তা জনশূন্য। বলিল,—কেউ কোথাও নেই ত' !

ইতিমধ্যে অজয়া তোড়াটি তুলিয়া লইয়াছে। সেটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—সুন্দর তোড়াটি ত ! সাজিয়েছেও বেশ—সাতভাই চম্পার মত সাতটি ফুল, মাঝখানে একটি স্থলপদ্ম। এ কি !

স্থলপদ্মের মৃণালের সংগে ছোট একখানা কাগজ জড়ান রহিয়াছে।

অজয়া সেখানা টানিয়া বাহির করিল—পরিষ্কার হস্তাক্ষরে তাহারই নাম লেখা—আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া সে নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল—অল্প অল্প হাসিতে লাগিল —যেন গল্প লিখিতেছে।

কিন্তু হাসিতে হাসিতে অজয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; এবং এমনি সময় রজত বেড়াইয়া ফিরিল।

অজয়ার ও ননীর মুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তোমরা যেন আকাশ থেকে প'ড়ে হাঁ ক'রে ব'সে আছ ! ব্যাপারখানা কি ? তোমার হাতে ও কাগজ কিসের ? কোনো দুঃসংবাদ আসেনি ত ?

—না। প'ড়ে দেখ।

—তবু ভাল।—বলিয়া কাগজখানা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়া রজত পা ছড়াইয়া দিল। এবং আলোর সম্মুখে কাগজখানা ধরিয়া টিপ্পনী জুড়িয়া জুড়িয়া পড়িতে লাগিল—

"নিরানন্দস্থানে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ ; তারি একটি ডালে দড়ি বেঁধে এক ব্যক্তি তার ধিক্কৃত অসহ্য জীবন শেষ করতে এসেছিল। ( সর্বনাশ ! )—দড়ি বাঁধছে এমন সময় একটা পাখী এসে সেই গাছেরই ডালে ব'সে গান সুরু ক'রে দিলে। ( হতভাগা পাখী। ) —যে মরতে এসেছিল সে ভাবলে, যখন পৃথিবীতে এত নিরানন্দ স্থান কোথাও নেই যেখানে পাখী গান করে না তখন আমি বাঁচব। ( উত্তম প্রস্তাব। )

এই পাহাড়ে আমি এসেছিলাম জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে মরতে। ( ঠিক )—ইতিমধ্যে তোমায় দেখলাম—"

এইখানে রজত কাগজখানা উল্টাইয়া শিরোনামাটি পড়িল। অজয়া তাহাতে অকারণেই লজ্জা পাইয়া মাথা নোয়াইল।

—তারপর মহাশয় লিখছেন,—বলিয়া আরম্ভ করিয়া রজত পড়িতে লাগিল—

"কে যেন আমায় বাঁচতে বললে। ( পাখী-টাখী হবে। )—আমি বাঁচব। ( খাসা কথা! )

আমি বাঁচি কি মরি তোমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি! ( কিছুই না। )—আমি আজই এ স্থান ত্যাগ ক'রে যাবো; তুমি জানতে পারবে না, কাকে তুমি বাঁচিয়েছ; কে তাই তোমায় এমন হঠাৎ জানিয়ে গেল।"—কাগজের দিকে চাহিয়াই রজত বলিতে লাগিল,—সমাপ্তির ইতি নেই, স্বাক্ষর নেই, তথাপি ধন্যবাদ তোমায়, হে অজ্ঞাতনামা। আত্মহত্যা মহাপাপ—তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে সে, দৃশ্যটাও উপভোগ্য হ'ত না। এত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়, পাগলের মত চেহারা ত' কারো দেখিনি! ননী, চা। আমি তার স্বাস্থ্য পান করবো।—বলিয়া রজত তেমনি নিঃস্পৃহ আলগা সুরেই শেষ করিল।

কিন্তু ঐ কাগজ উল্টাইয়া ঠিকানাটা দেখিবার পর হইতেই যে তাহার হাল্‌কা কণ্ঠের সরসতায় ঘুণাক্ষরের মত একটা দ্বিধার দৌর্বল্য মিশিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় নিজেও সে অনুভব করিতে পারে নাই; পারিয়াছে কেবল নারী দু'টি।

ননী নিঃশব্দে চা আনিতে চলিয়া গেল। এবং অজয়া যখন দাদার দিকে চোখ ফিরাইল তখন তাহাতে তাহার হৃদয়ের সুকোমল প্রসন্নতার ছায়ামাত্রও নাই।

ব্যাপারটা যে বড় অস্বাভাবিক।

কিন্তু অজয়া স্বাভাবিক সুরেই বলিল,—পাগলের কর্ম এটা নয়। নানারকম খোঁজ নিয়েছে—আমাদের দেখেছে, বাড়ী চিনে গেছে। কাগজখানা দাও ত' রেখে দি।

রজত বলিল,—এ-পাহাড় ও-পাহাড় ক'রে বড্ড বেড়িয়েছি আজ। বেড়াতে বেড়াতে এম্‌নি তন্ময় হয়ে পড়ি যে ক্ষিদে ভুলে যাই।

—তুমিই একদিন বিপত্তি ঘটাবে দেখছি; গহ্বরে পড়ে তলিয়ে যাবে, কি গড়িয়ে প'ড়ে মাথা গুঁড়ো ক'রে আসবে।

—পাগল! তন্ময় হয়ে পড়ি ব'লে কি চোখ বুঁজে চলি? হাত-পা-মাথাকে আমি যথেষ্ট ভালবাসি, তাদের মঙ্গল অমঙ্গল বিষয়ে আমি খুব সজাগ—দেহে জোর পেয়েছি কত! মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথাটা ধরতে পারলে তাকে নুইয়ে এনে ধনুকের মত গুণ পরাতে পারি।

—তা পার কি না জানিনে, কিন্তু একটা কথা রাখবে?

—কি কথা? খুব ভারি কি?

—কথা দাও, এই কথাটা আর কখনো তুলবে না।

—কোন্ কথাটা?

—এই চিঠির কথাটা।

—দায় পড়েছে। আমি ত' ছেলেমানুষ নই যে ঐ খেল্‌না পেয়ে দিনরাত খেলা করব।

—তা জানি; কিন্তু এই ঘটনার সংস্রবে আমার লজ্জাটা কোথায় তা তুমি বুঝেও

হয় তো বুঝবে না ; তোমার তাই সতর্কতার অন্ত থাকবে না, পদে পদে আমায় লজ্জা দেবে।

শুনিয়া রজত হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিল,—তা দেব না। তবে সাবধান থাকা দরকার বৈ কি ! যদি পাগল না হয়ে চোর হ'ত ?—মদন-মাণিক করছিল কি ? ডাকো তাদের।

মদন হাত জুড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মাণিক তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল।

অজয়া বলিল,—মদনের আট আনা জরিমানা ; মাণিকের এক টাকা। তোরা কি ঘুমুচ্ছিলি ?

চোখ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সে ঘুমায় নাই—ইহাই মনে করিয়া মাণিক মদনকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া স্পষ্ট প্রকট হইল।

হাজার হোক সে বাঙালী। বলিল,—না, দিদিমণি, সন্ধ্যেবেলাই ঘুমুবো কেন !

—তবে কি কাজে তন্ময় ছিলে যে একটা বাজে লোক বাড়ীতে ঢুকে বেরিয়ে গেল ; তোমরা কেউ তার আওয়াজ পেলে না—কেন ?

অপরাধ সত্যই ঘটিয়াছে—তর্ক বৃথা, কান্নাকাটি, প্রতিবাদ, কৈফিয়ৎ সবই এখানে এবং এখন বৃথা, মাণিক তাহা জানে। শাস্তি মানিয়া লইয়া নিঃশব্দে একটা সেলাম বাজাইয়া মদনকে টানিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল।

ননী চা দিয়া গেল।

লম্বা করিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া রজত বলিল,—এদিক্‌কার ত' সব একরকম মিটল। এখন আমার চায়ের কি হবে তাই হয়েছে ভাবনা।

অজয়া বলিল,—আমারও সেই ভাবনাই হয়েছে।

—আমি তোমার দাদা হই। আমি খালি ভাবি না, কাজও করি। আমার ইচ্ছে যে, আমার বোনটিও ঠিক তেম্‌নি হয়।

—একটি দাদা থাকা মন্দ নয়, সব বিষয়েই ভাল ; কেবল যদি—

—গান গাইতে না বলে তবেই ষোল-আনা ভাল হয়—এই না কথার শেষ কথা তোমার ? কি করবো দিদি ! ভগবান সব দিয়েছেন, শুধু কণ্ঠে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু সে-ক্ষতি পূরণ ক'রে দিয়েছেন তোমায় আমার বোন ক'রে—চা-টা মাটি করেই দিলে। ননী, দিদি আমার, আর এক পেয়ালা—যদি পারো, যদি অসুবিধে না হয়, যদি—

অজয়া জোগাইয়া দিল,—না ঘুমিয়ে থাকো।

ননী পাশের ঘর হইতে বলিল,—ঘুমুইনি, আনছি।

এতগুলি কথার খরচ হইল শুধু এই কারণে যে, রজত সন্ধ্যাবেলায় চায়ের সঙ্গে একটি করিয়া অজয়ার গান শোনে। তার নাকি মনে হয়, চায়ের সঙ্গে ঐ গানটি না শুনিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া এমন কি তার ক্রোধের উৎপত্তিও ঘটিতে পারে।

কিন্তু আজকার মত রাগের কারণ ঘটিল না।

## ॥ পাঁচ ॥

ফুলের তোড়াটি অজয়ার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া আসা অবধি সিদ্ধার্থের মন ভাল নাই। কাজটি করিয়া ফেলিয়াই তার মনে টিস্‌টিস্‌ করিতে লাগিল, কোনই প্রয়োজন ছিল না, ঘটনা তাহাতে কিছুমাত্র অনুকূল বা অগ্রসর হয় নাই। কেন যে ঐ বুদ্ধিটা হঠাৎ ঘটে আসিল, ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া সেইটাই তাহার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

যাই হোক, সিদ্ধার্থ সিদ্ধিদাতা গণেশের পাঁচসিকে ভোগ মানত করিয়াছে।

উল্টাইয়া না পড়া পর্যন্ত গণেশ ঠাকুরকে কেহ বড় স্মরণ করে না ; সিদ্ধিপ্রদানের প্রার্থনাসহ কিঞ্চিৎ ভোগের আশা গণেশ বোধ করি এই প্রথম পাইলেন।

ডাকাতরা কালী পূজা করিয়া লুঠতরাজে বাহির হয়—কিন্তু তাহাতে খরচ বেশী, শব্দও বেশী। সিদ্ধার্থ তাই নিঃশব্দে নিরীহ গণেশের শরণাপন্ন হইয়াছে।

সঙ্কল্প তাহার সাধু সন্দেহ নাই।

রজতের সে পিছু লইয়াছে। রজত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায় ; যদি দৈবাৎ সে পা পিছ্‌লাইয়া পড়ে, পা একখানা মচ্‌কাইয়া—

রজত নিজে না পড়ুক, পাথরই একখানা গড়াইয়া পড়ুক না তার পায়ের উপর—কাঁধে করিয়া রজতকে সে বাড়ী পেঁাছাইয়া দিবে। তখন—

ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থের মনে হইল, সে যেন রজতকে কাঁধে করিয়াই চলিয়াছে।

প্রথমেই একটি চমকিতার চঞ্চল ব্যাকুলতা। তারপর ধন্যবাদ ; দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির প্রথম মিলন। তারপর দু'চারিটি কথা, পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপর হয়তো নিমন্ত্রণ। তারপর—

কিন্তু নিশ্চিন্ত গণেশের উপর অবিশ্বাস আর বিরক্তিতেই তারপর যে কি ঘটিবে তাহা সিদ্ধার্থের চিন্তা করা ঘটিয়া উঠিল না।

সিদ্ধার্থ মনে মনে মনে একটু হাসিল।

যে কাজের সূচনাই হয় নাই, তাহাকে বাষ্পীয় কল্পনার বলে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অতদূর লইয়া যাওয়া অনর্থক ! তবু ছবিটা ভাল—মনে মনে সাজাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

স্থান কাল উভয়ই মনোরম।

বায়ুমণ্ডল একেবারে নিঃশব্দ—মনে হয়, কোথাও একটু শব্দ হইলেই সে শব্দের আর শেষ হইবে না—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি আসিবে আর যাইবে।

অন্ধকার কোথায় যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া গহ্বরে নিদ্রিত ছিল ; বাহিরে আসিয়া ক্রমাগত সে দেহ বিস্তৃত করিতেছে। গাছের মাথায় মাথায় আলোর স্পর্শ দিল—তাহাও সর্বোচ্চ বিন্দুতে মুহূর্তেক দাঁড়াইয়াই সরিয়া গেল।

কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটিতে আসে। তাহারা ঘরে গেছে।

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিল, রজত এই দিকে উঠিয়া গেছে ; এখনো তার নামিবার তাড়া নাই কেন !

কিন্তু তাড়া তার ছিল ; এবং তখনি তার প্রমাণ আসিল—একটি আর্ত চীৎকার।

সিদ্ধার্থ কান পাতিয়া রহিল। পর্বতমালার গায়ে গায়ে আছাড় খাইয়া খাইয়া সুগম্ভীর শব্দটার মৃত্যু ঘটিতে বহু বিলম্ব হইল।

শব্দটা শেষ হইলে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—গণেশের কৃপা হইয়াছে। সিদ্ধার্থের অন্তরটাই যেন আবর্তিত হইয়া অতীব ক্রূর একটি হাসির আকারে দেখা দিল।

চমৎকার। ঘেমে উঠেছে; ভয়ার্ত ব্যাকুল চক্ষু দিগ্বিদিকে দৃষ্টি হেনে বেড়াচ্ছে। আতঙ্কের আতপে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে; পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে চক্ষু দু'টি এক একবার নিষ্পলক হয়ে বুকের স্পন্দন থর্ থর্ করছে। পৃথিবীময় সে মনে মনে হাতড়ে বেড়াচ্ছে মানুষের একখানি মুখ; বাঘের থাবার নীচে মৃগীর মত তার কাঁপুনি—চমৎকার ছবি!

বিপন্ন রজতের এই চমৎকার ছবিখানি কল্পনা করিতে করিতে সিদ্ধার্থ উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া শব্দের দিকে উঠিয়া গেল।

রজত উপরে। সিদ্ধার্থ নীচে; উঠিয়া আসিতেছে।

সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই রজতের মনে হইল, সে যেন মানুষের আর্তরক্ষার সহজ আগ্রহ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ঠ্যাঙাড়ে নয় ত'!

সিদ্ধার্থের হাতে ছিল অতিকায় এক লাঠি, আর কাঁধে ছিল ব্যাগ।

ঠ্যাঙাড়ে সন্দেহ করিয়া ভয় পাইবার অবস্থা রজতের তখন নয়—সিদ্ধার্থ যে মানুষ তখনকার মত সেই তার যথেষ্ট। নির্নিমেষ চক্ষে সে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধার্থ উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াতেই রজত তাহাকে মহা ব্যগ্রভাবে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—বাঁচালেন।

সিদ্ধার্থ বলিল,—ছাড়ুন আর বসুন। আমি শ্রান্ত।

রজত বলিল,—বাঁচালেন যে সে ত' মিথ্যে নয়। কি ক'রে যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবে পাচ্ছিনে।

—ভেবে যখন পাচ্ছেন না তখন ত' নিরুপায়। আর কৃতজ্ঞতা একটা কুসংস্কার।

—সে তর্কের সময় এখন নেই। তবে আমি যে মরতাম সে বিষয়ে বোধ হয় আপনারও সন্দেহ নেই।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—শুনেছি, এই পাহাড়ে বালখিল্য মুনিগণের প্রেতাত্মারা সব বাস করেন; মানুষকে একা আর দুর্বল পেলেই তাঁরা তার পথ ভুলিয়ে দিয়ে অনিষ্ট ক'রে থাকেন।

—বালখিল্য মুনিরাই ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ; তাঁদের প্রেতাত্মারা আর কত ভয়ঙ্করই হবেন! ভয়ের কারণ ঠিক ওদিক দিয়ে নয়—বাঘ, ভালুক চ'রে বেড়ায় না কি?

—বেড়ায় ব'লেই জনরব। কিন্তু হিংস্র জন্তু যাকে মারে সে না কি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে না—মৃত্যু আসছে দেখেই তার চেতনা যেমন নিশ্চেষ্ট তেম্নি অসাড় হয়ে যায়। সে বড় সুখের মৃত্যু। সে কথা যাক—আপনি বোধ হয় ক্ষুধার্ত। আমার সঙ্গে খাবার আছে।—বলিয়া ব্যাগ্ খুলিয়া গরম দুধের বোতল, পাঁউরুটি, জেলি প্রভৃতি বাহির করিতে লাগিল।

রজত বলিল,—ক্ষিদেটা এতক্ষণ অনুভব করবার অবসরই পাইনি—তৃষ্ণাটাই মারাত্মক

হয়ে উঠেছিল। এখন বুঝতে পারছি আমি মনঃসংযোগ না করলেও ক্ষিদেটা আপন মনেই বেড়ে উঠেছে!

—আসুন, তবে খাবারগুলোকে কাজে লাগান যাক। ক্ষিদেটাকে স্থায়ী হ'তে দিলেই শেষ পর্যন্ত পীড়ন করে কম, কিন্তু ক্ষয় ক'রে দুর্বল করে বেশী। দুর্বল হ'লে আপনার চলবে না; পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামা কঠিন।

—সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। কিন্তু আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আমার এগুলি দরকার হবে তা আপনি যেন জানতেন।

সিদ্ধার্থ একটু হাসিল মাত্র।

রজত বলিল,—আপনি এসে না পড়লে আমাকে বাঘে খেত; তাকে ফাঁকি দিয়ে আমি নির্বিবাদে দুধ-রুটি খাচ্ছি।—বলিয়া রজত হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল।

চাকা কেবলি ঘুরিতেছে।

বলসঞ্চয় করিয়া লইয়া রজত বলিল,—এইবার বেশ মজবুত বোধ করছি। আপনাকে দেখবার পরও ত্রাসভোগের যে গ্লানিটুকু ছিল তা দুধ-রুটি খেয়েই গেছে। কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছি যে, অন্ধকার যত ঘনাচ্ছে, আমার বোনটি তত উতলা হচ্ছে।

—উঠুন।—বলিয়া সিদ্ধার্থ হাতে লাঠি আর কাঁধে ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত বলিল,—উঠেছিলাম অনেক হাংগামা পুইয়ে, শিকড় আর গাছগাছড়া ধ'রে ধ'রে, নামব কি ধ'রে?

—আমার কাঁধ ধ'রে। পা যেন টলে না; সমস্ত শরীরের ভার আমার ওপর এলিয়ে দিন। দু'জনের ভার রাখবে এই লাঠি। তাড়াতাড়ি করবেন না, পা ফেলবেন খুব সাবধানে—আল্‌গা পাথর এড়িয়ে। আসুন!

রজত ভাবিল, এই রকম বলিষ্ঠ দেহ তাহার হইলে তবু কিছু নিশ্চিন্ত থাকা যাইত, বিশেষ করিয়া এই আসুরিক শক্তি প্রতিযোগিতার যুগে।

সিদ্ধার্থ ভাবিল—লুকাইয়া নয়, চোখের সম্মুখে তাহাকে দেখিব।

অজয়া পেন্সিলে ছবি আঁকিতেছিল।

পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি পল্লী; তার পশ্চিম প্রান্তে রৌপ্য-প্রবাহের মত নদীটি। নদীর ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র; ক্ষেত্রের সীমান্ত ব্যাপিয়া দিক্‌-চক্ররেখা—তারি নীচে সূর্য অর্দ্ধেক ডুবিয়া গেছে। এদিকে রাখাল বালকেরা গরু ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে; মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা; কোনোটি নিজের বাড়ীর কাছে আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনোটি ঘাড় ফিরাইয়া পিছাইয়া-পড়া বাছুরের দিকে চাহিয়া আছে।

দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ননীর মনে হইল, চিত্রাঙ্কন ভালই হইতেছে। বলিল,—ভারি সুন্দর! এটা কিসের ছবি, দিদিমণি?

অজয়া বলিল,—দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না, তবু "ভারি সুন্দর" কি ক'রে বললি?

—আমি যা বুঝেছি তাতে এ গোষ্ঠ। কিন্তু গোপীরা কই, মা যশোদা?

—তাঁরা একটু বিলম্বে আসবেন; হেঁসেলে আছেন।—বলিয়া অজয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু ননী গম্ভীর হইয়া গেল। "গোষ্ঠ" প্রভৃতি লইয়া ঠাট্টা ননী ভালবাসে না।

—আলো দিয়েছে, ঘরে চল্। বলিয়া অজয়া ননীর মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল,—ক্ষমা কর্, ননী; আমার মনে ছিল না।

ননী হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—আমার কাছে তোমার অত ভণিতা নকুতা করতে হবে না ত'!

—আলবত হবে!—বলিয়া অজয়াও হাসিতে লাগিল। সমগ্র ব্যাপারটি দু' একটি কথা উচ্চারিত হইয়াই শেষ হইয়া গেল; কিন্তু উভয়ের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতির মধু ছিল তাহা অতিশয় নিবিড় হইয়া দু'জনাকেই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক করিয়া রাখিল।

ননী ল্যাম্পটার দিকে চাহিয়া ভ্রূভংগী করিয়া বলিল,—আলোয় এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, দিদিমণি।

—তোর হবার ত' কথা নয়। জানতাম যে, চোর আর পঁ্যাচারই কেবল আলো সয় না।

—তুমি ছবি আঁকো বটে, কিন্তু বাইরের সংগে মনের মিলের কথা তুমি ধরতে পারো না। অন্ধকার যত গাঢ় হয় তত সে স্পষ্ট; আলো যত উজ্জ্বল তত সে ধাঁধা লাগায়। আমার মনে হয়, আলোয় যত অকল্যাণ অন্ধকারে তত নয়—মানুষ উল্টোদিকে যতই চলুক না।

—তা হবে। কিন্তু আমার বাঁ চোখটা নাচছে কেন বল্ ত—এটাও ত' বাইরের সংগে মনের মিলের কথা।

—দাঁড়াও মনে করি—"সীতা আর রাবণের কাঁপে বাম অংগ।"

—তার মানে?

—বাম অংগের কাঁপুনি আমাদের পক্ষে শুভ আর পুরুষের পক্ষে অশুভ সূচনা করে। তোমার সু-খবর বুঝি দাদাবাবুই আনছে।

—দাদার এতক্ষণ ত' ফেরা উচিত ছিল, ননী। আমাকে ফাঁকি দিয়ে রেখে গেল, সংগে নিলে না; বলে গেল, সন্ধ্যার আগেই ফিরবো।

—কেউ হয়তো নতুন রকম চায়ের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেছে; গিয়ে গল্পে ডুবে গেছেন।

—না, ননী; আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। এই পাহাড়ে' দেশে বিপদ পদে পদে। পথ ভুলেই হয়তো ঘুরে মরছে। মাণিককে ডাক্, সে একটা লণ্ঠন নিয়ে—

বলিতে বলিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া অজয়া থামিয়া গেল।

•

—বেশ লোক তুমি। সন্ধ্যার—

অজয়াকে দ্বিতীয়বার কথার মাঝখানেই থামিয়া যাইতে হইল। রজতকে দরজার সম্মুখে দেখিয়াই সে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই সে থম্‌কিয়া গেল।

সিদ্ধার্থকে বসাইয়া রজত বলিল,—ইনি আমার ভগিনী অজয়া, অজয়া—

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমার নাম সিদ্ধার্থ বসু।

উভয়কে নমস্কার বিনিময়ের অবসর দিয়া রজত বলিল,—আমার নূতনতম বন্ধু।

প্রধান কথাটি পরে বলছি তোমাকে। সন্ধ্যার আগেই ফেরবার কথা ছিল বটে, কিন্তু এ সন্ধ্যা ত' দুর্বাসার সেই সন্ধ্যা নয় যে ভস্ম হবার ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে! কাজেই অন্ধকার অকুতোভয়ে বেড়ে গেল। তারপর বলব সবটা?—বলিয়া সিদ্ধার্থের দিকে চাহিয়া সে প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ কেমন ভয়ে ভয়ে অজয়ার দিকে একবার চাহিয়া লইল—বুক তাহার অকারণেই দুরু দুরু করিতেছিল। কথা যখন সে কহিল তখন নিজেরই কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন এখানে খাপছাড়া।

এবং তাহার কণ্ঠ যে একটি দুর্বোধ্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ফুটিবার পথ পাইল তাহা যেমন তাহার তেমনি আর দু'জনেরও বুঝিতে বাকি রহিল না।

বলিল,—অনাগত ভয়কে উপেক্ষা করবে, ভয় এসে পড়লে উদ্ধারের উপায় দেখবে, এই নীতি শাস্ত্রে আছে। উদ্ধারের পরে বাড়ীতে এসে গল্প করা উচিত কি-না তার কোনো উপদেশ দেওয়া নেই।

রজত বলিল,—কারো অজয়ার মত ভগিনী আছে জানলে শাস্ত্রকার চারিদিকে যেমন দিয়ে গেছেন, তেমনি এদিকেও একটা দাগ কেটে দিয়ে যেতেন; সম্ভবত নিষেধ করেই যেতেন। তাঁদের নিষেধের হাত খুব দরাজ ছিল।

অজয়া বলিল,—কেন শুনি?

—কারণ আজকার গল্পটা যদি করি তবে কাল থেকে আমাকে বাড়ীতে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে, কিম্বা খবরদারী করতে সঙ্গে একটা পাইক তুমি জুড়ে দেবে।

অজয়া এতক্ষণে সিদ্ধার্থের দিকে ফিরিল।

সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—দাদা এখন বলবে না, ঝোঁক আসেনি। আপনি বলুন; সঙ্গে পাইক জুড়ে দেবার ভয় বোধ হয় আপনার নেই।

অজয়ার এই দ্বিধাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টি সিদ্ধার্থের একটি স্থানে একটি নিমিষের জন্য অতর্কিত একটা ধাক্কা দিয়া গেল।

ঠিক এমনি সজীব অথচ নির্লিপ্ত স্পষ্টতা তার সম্মুখে লোকাতীত হইয়া আজ এই প্রথম দেখা দিল—তার কোথাও ক্লেশ নাই, ক্লেদ নাই, আধ-আধ ভাব নাই, প্রয়াস নাই।

সিদ্ধার্থ একটু নড়িয়া বসিয়া রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; রজত চোখের ইসারায় সম্মতি দিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সিদ্ধার্থ অজয়ার মুখের দিকে অকাতরে চাহিয়া থাকিবার একটুখানি সংগত শোভন কারণের সন্ধানে মনে মনে দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিলেও, কারণটি হাতে আসিয়া পড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটি অতিশয় সঙ্কুচিত দুর্বল হইয়া পড়িল।

একবার টেবিলের দিকে চোখ নামাইয়া, একবার অন্যদিকে চাহিয়া, একবার অজয়ার দিকে চোখ ফিরাইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—আপনার দাদা উঠেছিলেন পাহাড়ে সকলের শেষটায়, যেটার নাম শিবজটা। খানিকটা দূর উঠলেই শান-বাঁধানো মেঝের মত সমতল খানিকটা জায়গা আছে—তার পেছন দিকে শিবজটা নিজে, একেবারে খাড়া। দক্ষিণে জঙ্গল, উত্তরে ঝরনার নদী। পূর্বদিকে পায়ে পায়ে পথ পড়ে গেছে, তাই বেয়ে উঠেছিলেন বোধ হয় গাছের ডালপালা ধ'রে—ওঠা তেমন কঠিন নয়—কিন্তু নামবার

উপক্রমেই বুঝতে পারলেন কাজটি দুরূহ—চোখ বুজে পা ফেলতে হয়, কোনো অবলম্বন নেই—কাজেই, হঠাৎ পা আল্‌গা পাথরের উপর কি পিছল জায়গায় পড়লেই—

রজত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু থামুন। এইবার আমি বলি—আমার ঝোঁক এসেছে। আটকা প'ড়ে আমার মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল তা উনি জানেন না। নতুন রকমের অভিজ্ঞতা। এখন হাসি পাচ্ছে, কিন্তু তখন সমস্ত পৃথিবী চোখের সামনে, ঢিলটি যেমন জলের নীচে নেমে যায়, তেমনি ক'রে অন্ধকারের ভেতর ডুবে যাচ্ছিল—বেশ আস্তে আস্তে, জানিয়ে জানিয়ে। সেই অন্ধকারের ভেতর জেগে ঝক্‌ঝক্ করছিল শুধু নরকঙ্কাল—আর প্রেতের দল সার বেঁধে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিল—তাদের অট্টহাসির শব্দ যেন কানের গা ঘেঁসে করতালি বাজাচ্ছিল। একটু অত্যুক্তি হ'ল—কিন্তু যে কল্পনা নয়, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমার চোখের তারার উপর একটা সাদা পর্দা নেমে এসেছিল কি না জানিনে ; তবে অন্তিম তৃষ্ণা আর অন্তিম ঘর্মের ব্যাপারটা সুখের আর সখের ব'লে কখনো আমার ভুল হবে না।—বলিয়া রজতও অতিশয় আমোদ বোধ করিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু অজয়ার মুখ শুকোইয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—আপনি যে অবস্থাটার বর্ণনা করলেন, তারপরই ত' মূর্ছা অনিবার্য।

—আপনার সাড়া না পেলে অজ্ঞান হয়ে যেতাম বৈ কি ! আমার যে চীৎকার আপনি শুনতে পেয়েছিলেন, সে স্বর কিন্তু আমারও অপরিচিত—যেন আমারই নয়—

অজয়াকে বলিল,—বুঝলে না ?

—না।

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমিও বুঝলাম না ঠিক।

—প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মানুষ যে আর্তনাদ করে, সে স্বর তার কণ্ঠের পরিচিত স্বর কখনই নয়—সে স্বরের মধ্যে যে তার বিসর্জনের ঢাক বাজে—পরে শুনলে সে চিনতেই পারবে না, এমন ক'রে সে চেঁচিয়েছিল। সাপে-ধরা ব্যাঙের আওয়াজ কি তার নিত্যকার ব্যবহারের শব্দ ?

বলিয়া রজত প্রসন্নমুখে নিঃশব্দ হইল।

কিন্তু অজয়া যেন চোখের সম্মুখেই অপমৃত্যুর একটা বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছে এম্‌নি আতঙ্কে চম্‌কিয়া তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। বলিল,—দাদা—

—আমার বেড়ানো বন্ধ, এই ত' ? স্নেহে অন্ধ হয়ে মানব চরিত্র ভুল বুঝো না। ন্যাড়া বেলতলায় যদি দু'বার না যায়, তবে আমিই বা কেন দ্বিতীয়বার পাহাড়ে উঠবো ! ননী, চা।

ননী চা আনিতে গেল।

এবং "আমি আসি" বলিয়াই সিদ্ধার্থ আচম্‌কা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সিদ্ধার্থ ইহাদের সম্মুখে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল—যেন সে একখানি ঘূর্ণায়মান চক্রের উপর বসিয়া আছে।

বিঘূর্ণিত চক্র যেমন তার পৃষ্ঠের উপর কোনো বস্তুকেই তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে দেয় না—তেম্‌নি একটি কাণ্ড ঘটিতেছিল সিদ্ধার্থর জ্ঞান-জগতে—তার জ্ঞান-জগৎটাই যেন অবিশ্রান্ত পাকের উপর পাক খাইয়া খাইয়া প্রতি মুহূর্তে তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছিল।

অতীতের অপর কোনো মূল্য থাক আর নাই থাক, একেবারে নিরুপায় হইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলে সেই অবলম্বন সহ্য করিবার মত দৃঢ়তা তার থাকিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সিদ্ধার্থর তাহা নাই। অতীত তার একেবারে শূন্য, তৃণের অঙ্কুরটি পর্যন্ত তার কোথাও নাই।

বর্তমান তাই অকস্মাৎ অসহ্য প্রখর হইয়া নিজের কাছে বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তার অযোগ্যতা একেবারে দুস্তর।

—সে কি ? চা খেয়ে যান।—বলিয়া রজত টেবিলের উপর করাঘাত করিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—চা আমি খাইনে।

—অন্য ওজর দেখালে জোর করতাম। কিন্তু চায়ের সংগে আমি চোখ বুজে গান শুনে থাকি, তাতে আপনার আপত্তি আছে ?

সিদ্ধার্থ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—আজ থাক, আনন্দটা আর একদিন এসে সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ে যাব।—বলিয়া ফেলিয়াই সিদ্ধার্থর মনে হইল, আর একটু বসিয়া গেলে ক্ষতি কি !

অজয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনি যে আনন্দ আজ আমাকে দিয়েছেন তার তুলনা নেই।

এমন প্রাঞ্জল গদগদ কণ্ঠ সিদ্ধার্থ আগে কখন শোনে নাই।

তার আশার মুকুল মুখ খুলিতেছে।

বলিল,—কাজের গুরুত্ব যদি ফলের হিসাবে ধরা হয়, তা হ'লে আপনার দাদাকে পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে গুরুতর কাজই করেছি—যার ফলে আমার মত নির্বান্ধবের আপনাদের বন্ধুত্ব লাভ হ'ল।

রজত বলিল,—সে বন্ধুত্বের মূল্য বিচার করবার সুযোগ কখনো পাবেন কি-না জানিনে ; কিন্তু আমরা আপনার বন্ধুত্ব লাভ করবার আগেই আপনাকে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে নিয়েছি। বন্ধু ব'লে যখন সম্মানিত করলেন, তখন বোধ হয় সমতল ক্ষেত্রেও আমাদের হিতের জন্য আপনাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে—তখন তাকে দুর্দৈব মনে করবেন না ত' ?

—ঈশ্বর না করুন। যেদিন আপনাদের বন্ধুত্ব দুর্দৈব মনে করবো সেইদিন বুঝবো আমার দুরদৃষ্ট চরম সীমায় পৌঁছেচে। নমস্কার।

—নমস্কার, মাঝে মাঝে এলে বড় সুখী হবো।

অজয়া বলিল,—আসবেন।

তাহাকেও নমস্কার করিয়া সিদ্ধার্থ বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধার্থর শেষ কথা ক'টির অকপট আন্তরিকতা অজয়ার বড় মিষ্ট লাগিল।

কিন্তু মানুষের অন্তর্যামীই জানিলেন, সিদ্ধার্থ তাদের বন্ধুত্বই চরম আনন্দের বিষয়বস্তু বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে করে নাই।

তার ভয় কাটিতেছিল—সে নিজেকে ভুলিতেছিল—তার এই আন্তরিকতার জন্ম সেইখানে।

ননী চা আনিল।

অজয়া বলিল,—আমাদের পাশের বাড়ীতে একবার এক ভাড়াটে এসে আট-দশমাস ছিল। তাদের শক্তিধর ব'লে একটা ছেলে ছিল—তাকে তোমার মনে পড়ে, দাদা ?

—পড়ে। বড় দুর্দান্ত ছিল ছেলেটা। তার কথা হঠাৎ তোমার মনে প'ড়ে গেল কেন?

—এই এঁকে দেখে। দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল—ভুরু থেকে চিবুক পর্যন্ত অবিকল এক রকম।

—তোমার এতও মনে থাকে; তখন ত' তুমি আট-নয় বছরের।

—তার কারণ আছে। অত মার আমি কারু কাছে খাইনি—পদার্পণ ক'রেই সে একদণ্ডেই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ক'রে নিয়েছিল। বেশ মনে পড়ে; আর তার তেজের তারিফ মনে মনে এখনো করি আমি।

—সেও হতে পারে, বৃহত্তর সংস্করণ।

—না, সে নয়। নাম বললে সিম্ধার্থ বসু; আর তার ভুরুর কোণে কাটার একটা দাগ ছিল, এঁর তা নেই। সন্দেহ হতেই আমি সেটা লক্ষ্য করেছি।

চায়ের সংগে অজয়ার গানের কথা রজতের মনেই রহিল না—বাহিরে অকাতর ভাব দেখাইলেও, ভিতরে তার দুর্দশার অবধি ছিল না। মৃত্যুমুখে সত্যই সে পতিত হইত কি-না বলা যায় না; কিন্তু তার চরম ত্রাস আর অশেষ বিভীষিকা তার অন্তর-পুরুষটিকে বহুক্ষণ মুহুর্মুহুঃ ঝাঁকি দিয়া দিয়া একেবারে শীর্ণ ধরাশায়ী করিয়া রাখিয়া গেছে।

নিঃশব্দে চা শেষ করিয়া রজত উঠিয়া পড়িল। বলিল,—শরীর আর মনটা বড্ড ঝাঁকানি খেয়েছে; বিশ্রাম করিগে।

সিম্ধার্থ তার লাঠিখানা হঠাৎ ফেলিয়া গিয়াছিল। ননী সেটা দুই হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিল,—যেমন বাহার তেম্‌নি বহর। সৌখীন বটে। আধ মণের কম নয়!—সিম্ধার্থ বসু।

অজয়া বলিল—কোথায়?

—তিনি বোধ হয় অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেছেন এতক্ষণ—আমি বলছি নামের কথা—এই লাঠির মাথায় রুপোর গায়ে লেখা রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ননী হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—উঃ, কি চেহারা, যেন দ্বিতীয় বৃকোদর! চোখ দুটো দেখেছ দিদিমণি, যেন জ্বলছিল।

—জ্বলছিল নাকি? তা ত' দেখিনি—বাতির মত, না কয়লার মত?

—অন্ধকারে শিকারী বেড়ালের চোখের মত।

অজয়া রজতের পরিত্রাণের কথাটাই ভাবিতেছিল। মিনিটখানেক অন্যমনস্কের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ননী হাসিতে লাগিল। বলিল,—দেবারই কথা। ঐ চোখ, তার ওপর গোঁফের গোছা—ইয়া!

কিন্তু অজয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল,—অন্তত আজকার দিনটা তাঁর উপকার স্মরণ কর; তা না পারিস, চুপ ক'রে থাক। মানুষের চেহারা নিয়ে ইতরের মত বিদ্রূপ করিসনে।

ননী ধমক খাইয়া নির্বিকারে চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয়, তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলিল,—আমি ত' বিদ্রূপ করিনি দিদিমণি; তুমি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বললে। আমি ভুল ক'রে ভেবেছি, ঐ বুঝি তার কারণ। কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি—কসুর মাপ করো।

এবার অজয়াও হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—তবু হাসছিস যে?

—আমার হাসি তুমি দেখো না; আমার হাসির কোনো মানে নেই।

—আমায় একটি কথায় ভুলোতে চাসনে, ননী। তোর মনের কথা আমি বুঝেছি।

—তুমি কথা ফেনাচ্ছ দিদিমণি ; সরল হাসির বড় জটিল অর্থ করছো। কিন্তু পুরুষের প্রতিপত্তিটা ঠিক বজায় আছে দেখছি—আদিকালে যেমন ছিল।

—মানে ?

—কবে কে তেজ দেখিয়েছিল, তুমি তাই মনে ক'রে আজ সিদ্ধার্থবাবুর দিকে ভালো ক'রে চাইতেই পারলে না।

—তোমার সন্দেহ অমূলক।—কি, মাণিক ?

মাণিক বলিল,—খাবার দিয়েছে। দাদাবাবু নামতে বললেন।

মাণিক চলিয়া গেলে ননী বলিল,—দেখলে মাণিকের চেহারাখানা ! সেই জরিমানার দিন থেকে হাসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে ; মদন ত' ক্রমাগত কাঁদছে।

—আর পারিনে। ব'লে দিস, এবারকার মত জরিমানা মাপ করা গেল।

## ॥ সাত ॥

সিদ্ধার্থের রূপদর্শন ঘটিয়াছে।

সে মানেই তার রূপ ; রূপের অসীমতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ভাবিতেই পারা যায় না।

পৃথিবীর অন্তরভূমির স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জলধারা যেমন প্রস্রবণের আকারে নির্গত হয় তেমনি সে রূপ—যেন অকাল-শুষ্ক ধরিত্রীর বিস্তৃত বুকের উপর দিয়া সেই অপরিমেয় রূপের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে—জীবনের মূলে সে প্রাণময় রসাঞ্জলি।

কিন্তু সে প্রবাহের উৎস যেন তাহার ঐ দেহে নয়।

আকাশের নীল রংটা যেমন আকাশের গায়ে নয় ; গিরির ধূসর গাম্ভীর্য যেমন গিরির অংগে নয় ; তেমনি তার রূপ যেন বহুদূর হইতে বিচ্ছুরিত একটি অপরূপ মসৃণ লাবণ্যের বর্ণশী।

অতি নিকটে, তবু অজানার গভীরতায় সে রহস্যময়—শুধু অনুভবের বস্তু।

সিদ্ধার্থ অতিশয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে করিতে রজতদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু পথে আসিয়াই তার আহ্লাদের অন্ত রহিল না।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে পা দিয়াছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ, চোখে চোখে চাহিয়া বাক্য বিনিময় ঘটিয়াছে। যাওয়া-আসার নিমন্ত্রণও পাইয়াছে।

এ-পর্যন্ত কল্পনার চরিতার্থতার কিছু বাকি নাই। কিন্তু পরক্ষণেই খচ্ করিয়া কোথায় যেন বিঁধিল।

সে অপবিত্র। মনে হইতেই তাহার সমগ্র চিত্ত একাগ্রতা ভাঙিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। যে মন্দিরে সে প্রবেশ করিতে চায় অশুচি অন্তর লইয়া তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া তার কিছুতেই মনে হইল না—তার জন্মের উপর দেবতার আশীর্বাদ, মানুষের শুভ ইচ্ছা বর্ষিত হয় নাই।

কিন্তু সে অপরাধ তাহার নয়।

যে অপরাধ তার স্বকৃত তার ওজনও ত' কম নয়; এবং তাহারই ভারে তাহার মন যেন কেবলই নুইয়া পড়িতে লাগিল—পাপের কলঙ্ক ইচ্ছামত ঝাড়িয়া ফেলিয়া অম্লানমুখে সুখী সাজা যায় না—প্রাণান্তকর এই কুণ্ঠাই বুঝি তাহার মত পাপীর তীব্রতম শাস্তি।

অসংখ্যপদ সরীসৃপের মত অতীতের স্মৃতি তাহার বুকে বুকের চাপ দিয়া জড়াইয়া আছে—তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসে শরীর অবশ হইয়া আসে—তথাপি সাধ্য নাই যে, সেটাকে টানিয়া তুলিয়া সে আড়ালে কোথাও ফেলিয়া দেয়। নিজের লজ্জা চিরদিন নিজেকেই বহন করিতে হইবে এই কঠিন নিয়মটাকে কোন প্রকারে উল্টাইয়া দিবার উপায় একেবারেই নাই।

একদিকে সিদ্ধার্থের শিক্ষিত মন, অন্যদিকে তার বর্বরতার প্রগতি। একদিকে ভাবোন্মাদনা, অন্যদিকে বস্তুমোহ। একদিকে কি করা যায় তৎসম্বন্ধে অসাধারণ দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে প্রয়োজনের দুর্নিবার চাহিদা।

এইসব বিপরীতধর্মী প্রেরণার সঙ্কোচ ও প্রসারের মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধার্থ অবিরাম হাঁপাইতে লাগিল—দাবিদার সকলেই—কিন্তু মানুষের ব্যবস্থাতন্ত্র তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয় না।

*　　*　　*　　*

পরদিন।

সবিনয়ে নিজের পরাজয় সহস্রবার স্বীকার করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া চলিতে চলিতে সিদ্ধার্থ যেখানে যাইয়া উঠিল সেটা রজতের বৈঠকখানা। সিদ্ধার্থ ঘাড় তুলিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল—এখানে সে কেমন করিয়া আসিল! তারপর দেয়ালের দিকে চাহিল।

চার দেয়ালে আটখানা ছবি।

একখানার নীচে লেখা রহিয়াছে—অজয়া। দেখিবামাত্র নির্জন ঘরের ভিতর সিদ্ধার্থের কল্পনা ছুটিতে লাগিল,—চাঁপার কলির মত অঙ্গুলিগুলি লীলায়িত হইয়া এই ছবিখানি আঁকিয়াছে, সমস্ত কল্পনাশক্তি প্রাণপণে জাগ্রত আর সূচ্যগ্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়া এই ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, চোখের দৃষ্টি নত হইয়া ইহার উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল—সেই প্রাণ কেমন মধুর, দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম, আঙুলগুলি কত কোমল।

আরো কত তথ্য সে আবিষ্কার করিতে পারিত কে জানে; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমনেই তার কল্পনার বিন্যাস হঠাৎ এলোমেলো হইয়া গেল।

যে আসিল সে ভৃত্য মাণিক।

সাধারণ ভদ্রলোক এরূপ অবস্থায় যেরূপ আচরণ করে, মাণিককে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া সিদ্ধার্থের আচরণে সেই স্বাভাবিকতা ছাড়া আর সবই দেখা গেল।

থতমত খাইবার তার কথা নয়।

জবাবদিহিরও প্রয়োজন ছিল না।

অথচ অপরাধীর মত অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া সিদ্ধার্থ যে কি বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল, মাণিক তাহার চোদ্দ আনাই বুঝিতে পারিল না। খানিক অবাক হইয়া থাকিয়া সে উপরে সেই খবরটাই দিতে গেল।

## ॥ আট ॥

রজত ও অজয়ার পিসতুত ভাই বিমল আসিয়াছে এবং তাহার আসা লইয়া অজয়া উঠিতে বসিতে এমন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছে যে, বিমলের নাকে কান্না, অশান্তি আর অভিযোগের অন্ত নাই।

বিমল বলিতেছিল—দাদা শুনে ত' কিছু বললে না। কিন্তু তুমি শাসন করছ যেন আমি ফেরারী আসামী।

অজয়া বলিল—পিসিমা কত ভাবছেন বল তো! হয়তো তিনি নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে ব'সে আছেন, যারা তোকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা একে একে এসে খবর দিচ্ছে পাওয়া গেল না—তাঁর তখনকার কষ্টটা তুই ভাবছিস না?

—ভাবছি বই কি! তবে এতক্ষণে তাঁর ছটফটানি থেমে গেছে, টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে।

—এক কাপড়ে বেরিয়ে এলি, যদি পুলিসে ধরতো?

—ধরতো ধরতোই, কিন্তু রাখতে পারতো না বেশীক্ষণ।

—কেন?

—আমার নাম করলেই ছেড়ে দিতে পথ পেত না!

—গাড়ীভাড়া কোথায় পেলি?

—ঐটে বাদে দিদি; ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করো না।

—বই বেচে?

—সে মতলবটাও যে মাথায় না এসেছিল এমন নয়; কিন্তু সাহস হ'ল না—গেলাম এক বন্ধুর কাছে। সে বললে, দিতে পারি যদি গিয়েই পাঠিয়ে দাও। আমি তখন পেলে বাঁচ; তাতেই রাজি হয়ে টাকা নিয়ে কিছুদূর এসেই কি মনে ক'রে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি টাকা নেই! আমার ত' বোঁ ক'রে মাথা ঘুরে গেল—গলির ভেতর নিশ্চয় কেউ পকেট মেরেছে! ছুটতে ছুটতে গেলাম ফের যে টাকা দিয়েছিল তার কাছে; সে বললে—কি হে, ফিরে এলে যে? আমি ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লাম, বললাম—টাকা ভাই, হারিয়ে গেছে; কে পকেট মেরেছে।—বলেই কেঁদে ফেললাম। সে বললে—টাকা তুমি নিয়েই যাওনি, তা হারাবে কি? আমি বললাম—নিয়েই যাইনি কি রকম? স্পষ্ট মনে আছে—সে বললে,—না হে, না। টাকা তোমার হাতে দিলাম, তুমি ফরাসের ওপর নামিয়ে রেখে গল্প জুড়ে দিলে—তারপর 'আসি ভাই' ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে গেলে, টাকা প'ড়ে রইলো। ভাবলাম, ফিরতে হবে বাছাধনকে; তাই ব'সে ভাবছি আর মনে মনে হাসছি—এমন সময় তুমি এসে হাজির!—তখন দু'জনে খুব খানিকটা হেসে নিলাম। তারপর টাকা আবার গুণে, পকেটে রেখে, পকেটে ঠিক রাখলাম কি না দু'চারবার ভাল ক'রে দেখে চ'লে এলাম।

বিমলের মুখচোখ নাড়া দেখিয়া অজয়ার হাসি পাইতেছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল গম্ভীরভাবেই,—তারপর?

—তারপর, তার পরদিন কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। তোমাকে বেশীদিন না দেখে থাকতে পারিনে যে, দিদি।

—বন্ধুর ঋণ পরিশোধের কি হবে?

—সে দায় তোমার, আমি এসে খালাস।

রজতের চায়ের তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাতের কাজ চাপা দিয়া এই ঘরে আসিয়া দাঁড়াতেই অজয়া বলিল,—শোনো, দাদা, বিমলের কথা—ও এসে খালাস, ওর ঋণ পরিশোধের দায় আমার।

বিমল বলিল,—দাদা, তুমিই বলো, দিদিকে না দেখে যে আমি বেশীদিন থাকতে পারিনে সে কি আমার দোষ ?

—না অজয়া, তোমার ঐ দোষটা তুমি অস্বীকার করতে পারছো না। কিন্তু ঋণ পরিশোধের দামটা কোত্থেকে এল ?—বলিয়া রজত আসন লইলো।

—পুরোনো বইয়ের দোকানে পিসেমশায়ের বই বাঁধা রেখে বিমল গাড়ীভাড়া যোগাড় করেছে, তাই—

বিমল লাফাইয়া উঠিল—মিছে কথা, দাদা। দিদি আমায় রাগাচ্ছে। এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার নিয়ে এসেছি। সে টাকা দিদি দেবে বলেছে।

—দেব বলেছি ?

—কথায় বলনি, হেসে বলেছ। তুমি না দিলে আমি কোথায় পাবো ? শেষে কি বন্ধুর কাছে চোর ব'নবো ?

রজত বলিল,—সেইটেই আগে ভাবা উচিত ছিল। তা যাক—বড় একটা কাজে তোমাদের চুক হয়ে গেছে—কেউ বোধ লক্ষ্য করনি যে আজ আমি ভাল ক'রে চা খাইনি—একবার নিয়ে এলো—একেবারে ঠাণ্ডা। আর একবার নিয়ে এলো এত মিষ্টি দিয়ে যে, ননীর সংগে সংগে পিঁপড়ের সা'র আমার পায়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত। ননী ক্ষুণ্ণ হবে ব'লে খেলাম বটে, কিন্তু তৃপ্তি আদৌ পাইনি। বিমল বুঝি চা খাসনি ?

—ছেড়ে দিয়েছি।

—অদৃষ্ট মন্দ। যে চা খায় না সে সংসারের অর্ধেক সুখে বঞ্চিত। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে অমন জিনিস আর নেই।

—মাষ্টার মশায় বলেন চায়ের কাজ গরম দুধেই হয়।

—কিছুই হয় না। দুধ শিশু বৃদ্ধ আর রোগীর পথ্য। ননী, দিদিটি, পিঁপড়ের সা'র ইত্যাদি বলে যে মিথ্যে গল্পটা বলেছি তা যদি না শুনে থাকো—

ননী পাশের ঘর হইতে বলিল,—শুনিনি। হয়ে গেছে ; আনছি।

—ননী, চায়ে কি আফিঙ দিয়ে থাকো ?—বলিয়া রজত সম্মুখের চায়ের কাপের দিকে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যেন তাহার ভিতর আফিঙেরই সন্ধান সে করিতেছে।

ননীর বুকটা হঠাৎ ধড়াস করিয়া উঠিল।

ভয় ত' পাইবারই কথা। আফিঙ জিনিসটার গুণাগুণের সংগে ননীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। তবে দুর্বশ্য জানোয়ারকে নেশা ধরাইয়া বশীভূত করিতে আফিঙের ব্যবহার হয়, তাহা সে শুনিয়াছে। এবং যে কথাটা আরো সাংঘাতিক তাহা এই যে—আফিঙ বিষ।

ননীর ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। বিবর্ণমুখে বলিল,—সে কি ! চায়ে আফিঙ—

—না, তাই বলছি। চা দেখলেই আমার চোখ অবসন্ন হয়ে আসে কি না, তাই—

বলিয়া রজত হাসিতে লাগিল। কিন্তু ননীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সন্দেহ নাই, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করিয়া ননীকে অতি অকস্মাৎ নিদারুণ একটা মানসিক পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছে।

তাহার প্রতিক্রিয়া একেবারেই নিষ্ফলে গেল না। "দাদাবাবুর কথাবার্তা ভাল নয়" বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রজত একটু অপ্রস্তুতই হইল।

কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া বেশীক্ষণ কর্তব্যে অবহেলা করা তার অভ্যাস নাই; বলিল,—বিমল, তোর দিদির গান কতদিন শুনিসনি তা মনে আছে?

বিমল বলিল—অনেক দিন।

—অজয়া, শোনো বিমলের কথাটা। ননী বুঝলে না, আমি ঠিক জানি, চোখ বুজলে যে কান সজাগ হয় তার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল ভগবানের রাজ্যে শক্তির একটা সামঞ্জস্য রাখা। অজয়া, ওঠো।

অজয়া হাসিয়া বলিল,—তবু ভাল, ঘুরিয়ে এনে ফেলেছ ঠিক।

—বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি যে!—বলিয়া রজত গানের আশায় দেহ শ্লথ করিয়া তুলিল।

অজয়ার গান অর্ধেক অগ্রসর হয় নাই—এমন সময় সিদ্ধার্থ হঠাৎ প্রবেশ করিল। কিন্তু সে ব্যতীত আর কেহ জানে না যে, এইমাত্র সে জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। দরজার বাহিরেই সে দাঁড়াইয়া ছিল—অন্ধকারে। কিন্তু এত নিকটে থাকিয়াও গানের সুর বোধগম্য হওয়া দূরে থাক, গানের একটি বর্ণও তার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

কেবলি পিছন ফিরিয়া সে সভয়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, কেহ আসিয়া পড়িল কি-না।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে পা উঠিয়া উঠিয়া থামিয়া পিছাইয়া গেছে।

তারপর হঠাৎ একসময় অসাড়-মস্তিষ্ক আচ্ছন্নের মত ভিতরে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন তাহার এই জ্ঞানটুকু মাত্র সজীব আছে যে, সময়োপযোগী কিছু বলিতেই হইবে।

এবং সে সুযোগ তার মিলিল।

তাহাকে দেখিয়াই অজয়ার গান থামিয়া গেল। এবং সেই বিরামে বিস্মিত হইয়া রজত চোখ খুলিয়া বলিয়া উঠিল,—আসুন, আসুন।

সকলে নীরব থাকিলে সিদ্ধার্থ বোধ হয় যেমন আসিয়াছিল তেমনই পলায়ন করিত; কিন্তু রজতের অভ্যর্থনায় নয়, শুধু তার কণ্ঠস্বর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল, তাহারই মধ্যে সিদ্ধার্থের মন শঙ্কায় চঞ্চল বিকৃতি কাটিয়া একটা আশ্রয় পাইয়া স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইল। বলিল,—তা আসছি। কিন্তু এসে হঠাৎ কাঁটার মত বিঁধে পড়েছি যে! আনন্দে তদ্গত হয়েছিলেন, আমি এসে তা ভূমিসাৎ ক'রে দিয়েছি। ইস্, যেন তপোবনে ব্যাধের উৎপাত!—বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থ মূর্তিমান অপরাধের মত যেন কুণ্ঠায় লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

রজত বলিল,—আপনার অনুমান দু'টিই অমূলক। আনন্দে ছিলাম বটে; কিন্তু আপনাকে দেখে তার কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। যদি অনুমতি করেন ত' নিমন্ত্রণ করি—আপনিও তপোবনের একজন অধিবাসী হয়ে বসুন।

সিদ্ধার্থ মাথা নাড়িতে লাগিল,—আর হয় না। যে শান্তি ভেঙে দিয়েছি তাকে আবার তেমনি ক'রে গ'ড়ে তোলা কঠিন হবে।—বলিয়া সে এমনি ম্লান হইয়া বসিয়া রহিল যেন শান্তিভঙ্গের দরুণ তার জরিমানা কি জেল হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। তারপরই সিদ্ধার্থ বলিল,—এ বালকটি কে?

—আমাদের পিসতুত ভাই, নাম বিমল। বাড়ীতে না ব'লে চ'লে এসেছে। দিদির বড় ভক্ত—দিদিকে না দেখে থাকতে পারে না নাকি!

ইহাতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব কাহারো নাই—যে না দেখিয়া থাকিতে পারে না তাহারও নাই, যাহাকে না দেখিয়া আর একজন থাকিতে পারে না তাহারও নাই। তবু ইহার কোথায় যেন একটু লজ্জা আছে।

বিমল হাসিয়া মুখ ফিরাইয়াছিল।

অজয়া চোখ নত করিয়াছিল। কিন্তু চোখ তুলিয়া সে দেখিল, সিদ্ধার্থর মুখমণ্ডল অসাধারণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলের দিকে চাহিয়া সে বলিতেছে,—উপভোগ্য জিনিস! ভক্তির টানে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা—খাসা! এসো ত' ভাই, হাতের ভেতর তোমার হাতখানা একটিবার অনুভব ক'রে নিই।—বলিয়া অতিশয় মনোজ্ঞ ভংগীতে হাত বাড়াইয়া দিলো।

বিমল লজ্জিত মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

সিদ্ধার্থ দুই হাতের মুষ্টির মধ্যে বিমলের হাত জড়ো করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—দিদির চেয়েও বড় মা—সাতকোটি সন্তানের যিনি জননী। দিদির টানে এক ঘর ছেড়ে এসে আর এক ঘরে ঢুকেছ—কিন্তু মায়ের টানে জীবনভোর যে পথে পথে বেড়াতে হবে। পারবে ত'?

বিমল বলিল,—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।

সিদ্ধার্থ একটু হাসিল। বলিল—নিজের মন বোঝোনি। সে কি আকর্ষণ! উপড়ে তুলে উড়িয়ে নিয়ে কোথায় ফেলবে, পড়বার আগে তা কেউ জানতে পারে না।—বলিয়া সিদ্ধার্থ বিমলের হাত ছাড়িয়া দিয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল যেন তার আনত দৃষ্টি পৃথিবীর স্থূল-পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গেছে এবং কোথায় গেছে তাহা তার জানা নাই।

রজত মনে মনে হাসিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু, আপনি বুঝি বিরক্ত-সন্ন্যাসী?

প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—বিদায় চাইছি। আজকার মত আসি।

এবং কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই ইজমালি একটা নমস্কার করিয়া সে চট্‌পট্ বাহির হইয়া গেল।

বিরক্ত-সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, আর তার লক্ষণ কি—এবং তাহার বিপরীত আসক্ত-সন্ন্যাসীর আচার-ব্যবহার কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিবার উপায় এখন নাই।

কাজেই রজতের মনে হইল, লোকটার মাথায় স্ক্রু কোথাও ঢিলে আছে—এত বিরাগ আর আবেগ অবিকৃত মস্তিষ্কে দেখা যায় না।

কিন্তু অজয়ার মনে হইল, সাতকোটি সন্তানের যিনি জননী তিনিই সিদ্ধার্থবাবুকে গৃহত্যাগী করিয়াছেন। জননীর ভাষাতীত আহ্বান, আর তাঁরই দেওয়া নিঃশব্দ গভীর বেদনা তাঁহাকে মুহূর্তমাত্র সুস্থির হইতে দিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে অজয়া একটু সহানুভূতি অনুভব করিল।

রজত বলিল,—অজয়া, বুঝলে কিছু?

অজয়া কথা কহিল না।

সিদ্ধার্থর সর্বাঙ্গের মূর্তিটা সে স্মরণ করিতেছিল—সিদ্ধার্থর চিন্তাস্রোতটাও যেন সম-অনুভূতির সূত্র ধরিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল।

বিমল বলিল,—আমার ভয় করছিল দাদা, তার গোল গোল চাউনি দেখে, আর কথা শুনে। মনে হচ্ছিল, যেন আমায় হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

—তা জানিনে, তবে ভদ্রতা ক'রে বাড়িয়ে বলেনি। আজকার চা-টা সত্যিই মাটি ক'রে দিয়ে গেল। হচ্ছিল গান—নিয়ে এলো তার মধ্যে কে উড়তে পারে, আর—

কিন্তু রজতকে থামিতে হইল।

অজয়া তাহার কথায় রাগ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া সে বলিল,—রাগ ক'রে যেতে হবে না। আমি শপথ করছি পরনিন্দা আর কখনো করব না।

তারপর মনে মনে বলিল,—তোমার সামনে।

অজয়া বলিল,—কতবার এই শপথ করেছ তা বোধ হয় তোমার মনেও নেই। তা থাক আর না থাক, এখন ওঠো, মাণিক এসে একবার উঁকি মেরে গেছে।

॥ নয় ॥

অজয়াকে নাম ধরিয়া ডাকিতে সিদ্ধার্থর একটা অসম্বরণীয় লোলুপতা আসিয়াছে। তার মনে হয়, নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জীবনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া নূতন জগতের সুপ্রসর উদার শ্রীক্ষেত্রে সে মহোল্লাসে ভূমিষ্ট হইবে। মনে মনে অনুক্ষণ নামটি জপ করিয়া সিদ্ধার্থ তার সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রী আর প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুকে পিপাসাতুর করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু সে-দিনের দেরী আছে।

সিদ্ধার্থ বলিতেছিল,—অতি সুন্দর! প্রকৃতির প্রকৃত মুখচ্ছবি—বিস্তৃত প্রান্তর—ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রসারিত হয়ে দৃষ্টি যেখানে হারিয়ে যায়, সেইখানেই মেঘের গায়ে শেষ হয়েছে। গাছগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রতম হয়ে বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র হয়ে গেছে—তাদের মাথায় মাথায় পল্লবের মুকুট। এতদূরে—বিন্দুটির মত, তবু কেমন স্পষ্ট, আকাশ যেন গতিশীল হয়ে বয়ে চলেছে—সচল মেঘ, তার কোলে সচল একটি পাখীর ঝাঁক।—বলিয়া ছবিখানার দিকে অতিশয় উৎফুল্ল দৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া থাকিয়া সিদ্ধার্থ পুনরায় বলিল,—অতুলনীয়! বিমলবাবুর কি মত?

দিদির আঁকা ছবির প্রশংসায় বিমল গর্বে গদগদ হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল,—দিদির কোন কাজই অসুন্দর নয়। জানেন না বুঝি—দিদি যে প্রাইজ-হোল্ডার; ছবি এঁকে প্রাইজ পেয়েছে। সে ছবিখানা কোথাকার এক মহারাজা কিনে নিতে চেয়েছিল কত টাকা দিয়ে যেন, দিদি?

অজয়া বলিল,—মনে নেই, তুই থাম।—বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া সে তৃপ্তিভরে হাসিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—না না, বলতে দিন। মনের ভক্তিকে বাধা দিলে মানুষের হানি করা হয়। তারপর কি হ'ল বিমলবাবু?

—কি আর হবে ? আমরা দিলাম না !

কিন্তু সিদ্ধার্থের বড় গোল বাধিয়া গেল—সে সেই মহারাজার স্পর্ধার দিকেই চোখ রাঙাইবে, কি এদের নির্লোভ আত্মসম্মানের তারিফ করিবে, কি অজয়ার পুরস্কার লাভে আনন্দ করিবে—সংগে সংগেই তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যখন বিমলের তেড়ী কাটার নিন্দা করিতে যাইবে, এমন সময় সুন্দর একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল ; বলিল —আপনি নিজেই ভাবের একটা স্ফূর্তি, তাই ভাবকে অনায়াসেই মূর্তি দিয়ে সামনে এনে দাঁড় করাতে পারেন—আজকালকার ছবিতে কেবল পরের মস্তিষ্কের ছন্দোময়ী ভাবকে নির্জীব একটা আকার দে'য়া হচ্ছে। —বলিয়া সিদ্ধার্থ চিত্রশিল্পের অধোগতিতে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অজয়ার কিছু বলিবার ছিল না।

সিদ্ধার্থই প্রশ্ন করিল,—আপনার সে ছবিখানার পরিকল্পনা কি ?

—ঈর্ষা আর লোভ। নির্বিকার ভোগ আর অনাবিল সুখশান্তির মাঝখানে এরা দু'টিই স্ফীত হয়ে আছে—এদেরই আত্মপ্রসার দুর্বার হয়ে মানুষকে রসাতলের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ বলিল,—বাঃ !

—কিন্তু দাদা বলে—

হঠাৎ অকথিত কথারই প্রতিবাদ আসিয়া পড়িল।

রজত প্রবেশ করিয়া বলিল,—দাদা কি বলে ? তোমার ছবি অতি যাচ্ছে-তাই—অপ্রকৃতিস্থ মনের নির্বাক প্রলাপ, নিষ্কর্মা বৃদ্ধার অসমাপ্ত কাঁথা—এইসব বলে ?

অজয়া হাসিল,—না, ঠিক তা বলে না।

—তবে ?

—রজতবাবু যা-ই বলুন, সেটা ওঁর মনের আসল কথা নয়।—বলিয়া সিদ্ধার্থ একটা আপোষের চেষ্টা করিল।

কিন্তু রজত বলিল,—অর্থাৎ অসদুদ্দেশ্যহীন অসত্য। কিন্তু অসত্যকে সদুদ্দেশ্যের অলঙ্কার পরালেই সে নির্দোষ হয় না। তবে আসল কথা এই যে, আমার মন্তব্যের কোন মূল্য নেই।

—যদি মূল্য থাকে, তবে ?

—তবে ধ'রে নিতে পারো যে, তোমার ছবি বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল নয়, অসুস্থ—ভাল কথা, তোমার একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, চিঠি এসেছে।

হঠাৎ একটা ধাঁধা লাগিয়া সিদ্ধার্থ স্পষ্টই চমকিয়া উঠিল,—কার ছেলে ?

—অজয়ার। ছেলে কি একটি-দু'টি ! আটগণ্ডার কাছাকাছি।

ছেলের সংখ্যা শুনিয়া সিদ্ধার্থের "ধড়ে প্রাণ" আসিলেও অন্য দিক দিয়া একটা অশান্তির উদয় হইল। তাহার ঐ চমকিয়া ওঠার আর ব্যগ্র প্রশ্নটার একটা অর্থ উহারা নিশ্চয়ই করিয়া লইয়াছে।

সে অর্থটা কি !

অজয়ার ছেলে আছে শুনিয়া যে আঁতকাইয়া ওঠে সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা দাবী সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, ইহা বুঝিয়া ফেলা ত' কাহারো পক্ষেই অসম্ভব নহে। তাহার তরফের উদ্দেশ্যটা যদি একেবারে সোজা যাইয়া উহাদের সম্মুখে সত্যই দাঁড়াইয়া

থাকে, তবে আজ হইতে এই আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা। নিজেকে সে ধিক্কার দিলো—মনের উপর যার এতটুকু আধিপত্য নাই, তার ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাওয়া ক্ষ্যাপামি। সিদ্ধার্থ রজতের দিকে চাহিয়া নিজেকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অজয়া বলিল,—কি অসুখ ? কোন্‌টির ?

—যার নাম রেখেছিলে দুঃখু, তারি। সামান্য অসুখ, সর্দি-জ্বর। তোমার জন্যে বড় উতলা হয়েছে।—বলিয়া রজত সিদ্ধার্থর দিকে ফিরিল, বলিল,—আপনি হয় ত' ভাবছেন, এরা বলে কি! অজয়ার অনেকগুলি পালিত পুত্রকন্যা আছে। রাস্তা থেকে অনাথ ছেলেমেয়ে কুড়িয়ে এনে—তা সে যে জাতেরই হোক, যেভাবেই তাদের জন্ম হয়ে থাক—কুড়িয়ে এনে, এক ডিপো করেছে, সেখানে নিয়ে তুলবে। ছ'মাসেই ছাব্বিশ-সাতাশটি সংগ্রহ হয়েছে।—বলিয়া রজত নিজেও অতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সকলের চেয়ে সুবিধা হইয়া গেল সিদ্ধার্থর—এইটিই তার নিজস্ব বিভাগ।

চোখ-মুখ-হাত-পা ভাবাবেগে বিস্ফারিত করিয়া সে বলিতে লাগিল,—আ—এই ত' মায়ের জাতির কাজ—মমতা উৎসের অর্গল খুলে দিয়ে অনাথের হাহাকারের নিবৃত্তি ক'রে দে'য়া। আপনাদের সংগে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছিলাম, আজ ধন্য হলাম।—বলিয়া সে এমন করিয়া অজয়ার দিকে চাহিল যেন সেখান হইতেও একটা ধন্য ধন্য রবই সে আশা করিতেছে।

অজয়া মুখ নত করিয়াছিল। সিদ্ধার্থর আশা পূর্ণ হইল না।

রজত বলিল,—আপনারও কি ঐ মত ?

সিদ্ধার্থ মনে মনে বলিল,—তুমিও ধন্য হে বাক্যবাগীশ। চলবার পথ আরো বাড়িয়ে দাও।—প্রকাশ্যে বলিল,—ভিন্নমতের লোক আছে এই ত' আমার পরম দুঃখ। পতিতকে ত্যাগ না ক'রে তাকে তুলে আনার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে জানিনে—আমরা আত্মাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করি, কিন্তু কাজে বাহিরের অশুচির বিরুদ্ধে আমাদের দেহের সতর্কতার সীমা নাই ; যেন—

—কিন্তু তাই ব'লে চোর-চামার-জারজ।

একটি পলকের জন্য সিদ্ধার্থর মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল। পরক্ষণেই, রজতের কথাটা যেন কানে যায় নাই, এমনিভাবে সে বলিতে লাগিল,—নিজের সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য—এইটি মনে করিয়ে দিয়ে যাদের আমরা উঠতে দিই না, উঠতে চেষ্টা করলে ধর্মের রব তুলে যাদের মাথার উপর দেবতার নামে লাঠি উদ্যত করি, তাদের প্রশান্ত বাহ্য অবয়বের নীচে কত বড় একটা বিক্ষোভ অহর্নিশ আলোড়িত হচ্ছে তা বুঝি আমরা কল্পনাও করতে পারিনে।—বলিয়া সিদ্ধার্থ একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল,—তাদের ধমনীতে জল না রক্ত বইছে ?

এবং নিজেই তার উত্তর দিল,—রক্তই বইছে। আর সে-রক্ত ফুটছে। ধর্মের গ্লানির ভয়ে কল্পিত বড়-র পা চিরদিন তারা কণ্ঠের উপর রাখবে না।—বলিয়া সিদ্ধার্থ অনাগত সেই নির্মুক্তির আনন্দে ঐখানে বসিয়াই বিভোর হইয়া গেল।

রজত বলিল,—কি করবে ?

—"তোমার মাথা চিবিয়ে খাব।" কিন্তু এটা সিদ্ধার্থর মন যা বলিল তা-ই। মুখে সে বলিল,—ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠবে তার আয়োজন সুরু হয়ে গেছে—তা না পারে সর্বশুদ্ধ রসাতলে নামিয়ে দেবে। বসুধার সংগে কুটুম্বিতা পাতিয়ে অস্পৃশ্য ব'লে যে

পাশের বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না, তার যে দুর্গতি অনিবার্য তাই ঘটবে—ভগ্নাংশ তার ঘটেই গেছে। বিপদে বসুধা মুখ ফিরিয়ে থাকবে, ডাকতে হবে অস্পৃশ্যকে। কিন্তু চরম বিপদ দুয়ারে, বসুধাও টিপে টিপে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—তবু আমাদের মনে পড়ছে না যে বিপদ-বারণ পাশের বাড়ীতে। ভগবান আমাদের নিজেকে দিয়ে যেদিন নিজেকে চূড়ান্ত অপমান করাবেন সেই দিনটাকে আমি প্রাণপণে ডাকছি।—বলিয়া সিদ্ধার্থ একবার চোখ বুজিল—যেন ভগবানকে ডাকিবার এটাও একটা অবসর।

রজত বলিল,—অজয়াও আপনার মত বিপ্লববাদী। সে বলে, দেশের যারা যথার্থ শক্তি, যথার্থ মর্ম, আমরা চাষের ভুঁই, বাসের বাড়ী থেকে পূজার মন্দির পর্যন্ত সর্বত্র সর্ব অধিকারে বঞ্চিত ক'রে তাদের এমন কোণঠাসা করে রেখেছি যে—

—তাদের মানসিক মৃত্যু ঘটেছে।—বলিয়া রজতের মুখের কথা যেন থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—কোনো ব্যষ্টি কি সমষ্টিকে এমন অধিকার দে'য়া যেতে পারে না, যার বলে সে অপরের মানসিক মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করতে পারে। যে শাসনের যথেচ্ছাচারিতা মানুষের আত্মার সর্বনাশ করে, তার মূলোচ্ছেদ যত শীঘ্র ঘটে ততই মঙ্গল। উনি ঠিক বলেন।—বলিয়া সিদ্ধার্থ চোখ বড় করিয়া অজয়ার দিকে চাহিল।

দেখিল, অজয়ার মুখ প্রজ্ঞায় সংযমে যেমন গম্ভীর ঠিক তেমনিই আছে, কেবল গাম্ভীর্যের উপর অতুল শ্রীসম্পন্ন একটি দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থ "শ্রম সার্থক জ্ঞান" করিল।

আসরের গরম কাটিয়া যায় অথচ কেহ কিছু বলে না দেখিয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল, —ভগবান জাত দেখেন না, দেখেন মানুষের মনটি, তার সূক্ষ্ম গতিটি, তার নিগূঢ়তম অনাসক্তি। আমরা অকারণে বিস্মিত হয়ে যাই—যখন দেখি, ঘৃণ্যতম পতিতাও এক নিমেষে ভগবানের কৃপা লাভ করে। আমাদের কাজ যেমন স্থূল আর ইতর, মনটাও তেমনি নিশ্চল আর মলিন—ভগবান তাই তাঁর দৃষ্টি আমাদের ওপর থেকে তুলে নিয়েছেন।

রজত বলিল,—অনেকেই ত' আজকাল অনাবশ্যক সংস্কারের প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছে। বলতে সুরু করেছে, সবাই স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। ধর্মের ক্ষেত্র তোমার-আমার সকলের। অন্ধ অনুকরণের মত অন্ধ অনুসরণও বিপজ্জনক। যুক্তিই গণ্য। ধর্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই নিবদ্ধ নহে—তার প্রাণ আরো গভীর স্থানে। কাজেই অনুষ্ঠানের বাহুল্য বর্জন ক'রে ধর্মের যে মূল শক্তি তাকেই প্রসারিত করো, ইত্যাদি। ছুঁৎমার্গ পরিহার ত' হয়ে এলো ব'লে!

—শুধু মত প্রচার করছে, কাজে কেউ করছে না। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কেবল (অজয়ার প্রতি) আপনাকে দেখলাম। ঋষির তপোসিদ্ধি আর সত্যানুভূতির চেয়েও আপনার কাজ বরণীয়। লজ্জিত হবেন না, মিথ্যা স্তুতিবাদ করছিনে।—বলিয়া নিজেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া সিদ্ধার্থ মুখ ফিরাইল।

তার কারণ আছে। স্তুতিবাদ নহে বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও কথাগুলির একটা পিঠ যেমন মার্জিত ঝকঝকে, উল্টা পিঠটা তেমনি কলঙ্কিত—মলিন দিকটা রহিয়াছে কেবল তাহারি গোচরে।

কথাগুলির পরিষ্কার অর্থ সে করিতে পারে।

যে প্রয়োজনে সেগুলিকে সে লাগাইতে বসিয়াছে তাহার অর্থও পরিষ্কার।

কেবল পরিষ্কার নহে সে নিজে। নিজেরই দূষিত নিঃশ্বাসে মলিন দিকটা তাহার

চোখের সম্মুখেই ছিল—স্তুতিবাদের কথাটায় যেন এক ঝলক অতিরিক্ত ফুৎকার পাইয়া তাহা চতুর্গুণ কালো হইয়া উঠিল।

অজয়া বলিল,—ধর্মের সংগে সম্বন্ধ হিসাবে আমি সে কাজ করিনি, অনুগ্রহ হিসাবেই করেছি, কিন্তু আপনি তার যে অর্থ করেছেন—

—তা কষ্টকল্পনা নয়। আপনি নিজের অজ্ঞাতসারেই এই হতভাগ্য দেশের বড় ব্যথার স্থানটিতে প্রলেপ দিচ্ছেন।—চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—একটি মানুষকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে শিক্ষিত ভদ্র ক'রে তুললে দেশের যথার্থ জনসংখ্যা আর চরিত্রবল বাড়ে। অস্পৃশ্য ব'লে কেউ ঘৃণা না করলে বোঝা যায় না, সেই ঘৃণার আঘাত কত বড় আঘাত। বুঝেছি—বাইরে থেকে সে আঘাত হাতুড়ির ঘায়ের মত বুকে এসে পড়ছে, আর্তনাদ করছি ; আবার নিজেরই ঘরের লোকের বুকে সেই আঘাতই করতে আমাদের বাধছে না।

অজয়া এই সময় হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

কি কারণে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল কে জানে ; কিন্তু তাহাকে নিজের অনুকূলে টানিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল,—আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাসটি শুধু ফুসফুসের বায়ু নয়—বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথার ইতিহাস। (রজতের প্রতি) আপনারা অর্থশালী ; অর্থের সাহায্যে যতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব—

ধনস্থানে স্পর্শ সহে না জানিয়া শুনিয়াও কি উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থ অর্থশালীর অর্থ-সাহায্যের কথাটা বলিয়াছিল তাহা নিজেই সে জানে না। বোধ হয় আবেগে—

কিন্তু তাহাকে থামিয়া ঢোক গিলিতে হইল। অর্থশালীর অর্থসাহায্যে কতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব তাহা তখনকার মত অনির্দিষ্টই রহিয়া গেল।

রজত গা মোড়া দিয়া তুড়ি বাজাইয়া হাই তুলিয়া বলিল,—হরি, হরি।

সিদ্ধার্থ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সকৌতুকে বলিল,—রজতবাবু হাই তুলছেন, মানে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। চা খান, আমি আসি।

কিন্তু যথার্থ বিরক্ত হইয়াছিল অজয়া। সিদ্ধার্থের উচ্চারিত কথাগুলি তার মন্দ লাগিতেছিল না। নূতন নয়, কিন্তু বেশ পরিপুষ্ট কথাগুলি ; কণ্ঠ সবল—

দুটিতে মিলিয়া তাহার সম্মুখে যেন একটা মনের আশ্রয়ভূমি প্রসারিত করিয়া দিতেছিল।

তার উপর হাই তোলাটাও ঠিক সময়োচিত হয় নাই।

অজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—যাবেন না, বসুন। চা না খান, সরবৎ ক'রে দিচ্ছি।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ একটু হাসিল—বড় করুণ হাসি। বলিল,—বড়ই লজ্জা বোধ করছি। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমার রূঢ় ব্যবহার মার্জনা করুন।—বলিয়া উভয়কে সে নমস্কার করিল ; এবং অজয়ার নির্বন্ধ-অনুরোধের মধ্যে যে সুধারস ছিল তাহাতেই অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিল।

সিদ্ধার্থের পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষে শেষ হইল।

রজত বলিল,—বক্তা ভাল, বক্তৃতার বিষয় ভাল, বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী, বলবার ভংগীও চমৎকার ; কিন্তু একটা জিনিস আমার ভাল লাগল না।

সিদ্ধার্থের পায়ের শব্দ শুনিতে শুনিতে অজয়া একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল।

মানুষ একটি মুহূর্ত বসিয়াও যেমন করিয়া বিদায় লইয়া যায়, যাঁহার পায়ের শব্দ সিঁড়ি ছাড়াইয়া ঐ মিলাইয়া গেল তাঁহার যাওয়ায় তেমনটি ত' ঘটে নাই—করুণ একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বিদায়ের মধ্যেও সমগ্রতার মাধুর্য থাকে।

সিদ্ধার্থ চলিয়া গেলে বিদায়ের সেই অপরিপূর্ণতাই অজয়াকে দুঃখ দিতেছিল।

রজতের কথার প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্টভাবে মুখ তুলিয়া সে বলিল,—কি সে জিনিষটা?

—ঐ নাটকীয় প্রস্থানটি। ভাবটা যেন, তোমাদের মানসিক খোরাক দিয়ে গেলাম, ব'সে চর্বিত চর্বণ করো।

—সঙ্গীর অপ্রীতিকর হয়ে ব'সে থাকার চেয়ে স্থানত্যাগ করাই ভাল, তা তিনি জানেন। এখন নিজেকে বাঁচিয়ে একটা অর্থ ক'রে তাঁর প্রতি তুমি অবিচার করছো।

—অবিচার না থাকলে দাক্ষিণ্যের সুযোগই যে মেলে না। যাই হোক, সিদ্ধার্থবাবু যে ব'লে গেলেন—"বাইরে থেকে আঘাত পাচ্ছি, আর্তনাদ করছি"—তাৎপর্য কিছু বুঝলে এর?

—রঙের পার্থক্য বোধ হয়। সাদা—

রজত হাত তুলিয়া দাঁতে জিব কাটিয়া বলিল,—চুপ, চুপ। শেষে কি দেশের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তুমি! ননী? চা।

—সে ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। সিদ্ধার্থবাবুকেও ব'লে দেব ঐ রকম সব দুঃসাহসিক কথা বাংলা ভাষায় তিনি যেন প্রকাশ না করেন।

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে রজতের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল। মুখ তুলিয়া বলিল—একটা গান লিখেছি দাদা, শুনবে না?

—শুনব। শোনবার জন্যেই ত' হাই উঠছিল, সিদ্ধার্থবাবুও তাকে ভুল বুঝলেন, তুমিও ভুল বুঝলে। মৌতাত যে কি ব্যাপার তা তোমরা জানো না।

ননী চা আনিয়া দিল।

বলিল,—উঃ, যেন কামারে লোহা পিটছিল। এমন বোদা আওয়াজে কথা কওয়া কারো উচিত নয়, শুনে শুনে যেন বুকের ভেতর গুর্‌গুর্‌ করে। দাদাবাবু, আমার কিন্তু একট সন্দেহ হয়।

—বলো, এবং শীগ্‌গির বলো।

—ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি?

—নির্ভয়ে বলো।

—ফুলের তোড়া আর বেনামী চিঠি পাঠিয়েছিলেন উনি।

রজত তাড়াতাড়ি পেয়ালার ভিতর নজর দিল।

অজয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—অনুপস্থিত ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে তোমার এই সন্দেহ এমন কুৎসিত যে ধৈর্য রাখা কঠিন। হঠাৎ সন্দেহটা এসে গেল কি কারণে শুনি?

হাতে হাতে প্রমাণ দেখাইয়া দিতে পারিলে সন্দেহ আর সন্দেহ থাকে না।

সেই কথাটাই ননী বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু রজতের চায়ের তৃষ্ণা তখন সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে; সে চাপা দিয়া দিলো,—ননী, সে পরে হবে। অজয়া, দিদি, আমার কিন্তু কোনো অপরাধ নেই।

—নেই তা জানি।

তারপর মুহূর্তেক নিঃশব্দ থাকিয়া অজয়া বলিয়া উঠিল—কোনো দেবতা যদি দয়া ক'রে বর দিতে আসেন তাহলে আমি কি বর চাই জানো, দাদা ?

—না, তা জানিনে, তবে চায়ের মাথায় বজ্র পড়ুক ব'লে—

—এ-ই চাই, তুমি যেমন আমার দাদা তেম্নি দাদা যেন সবারই হয়, আর সেই দাদাকে যেন কোনোদিন অসহায় ক'রে ছেড়ে যেতে না হয়।

—দেবতা তেত্রিশ কোটি হলেও তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে মনে হয়। মানুষকে বর দেবার কাজ কারো আছে বলে নরলোকে জানা নেই ; সেদিকে তাঁদের কাউকে টানতে হলে বিস্তর তপস্যার দরকার। তোমার সে সম্বল—হঠাৎ ছেড়ে যাবার দ্ব্যর্থক কথাটা কেন বললে, অজয়া ? ছেড়ে যাবে কোথায় ?

—কোথাও না। চোখ বুজে গান শোনো।—বলিয়া অজয়া উঠিল।

## ॥ দশ ॥

—বিমল, কোথায় কোথায় বেড়াস তুই ? খুব দূরে দূরে যাস, না ভয়ে ভয়ে বাড়ীর কাছাকাছি ঘুরিস ফিরিস ?

—কাছাকাছি বেড়াব আমি ? দিগিদিকে ঘুরে আসি—রাস্তাঘাট সব নখদর্পণে।

বলিয়া বিমল চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া দিক এবং বিদিকের বিস্তীর্ণতা দেখাইয়া দিলো।

—সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না ?—বলিয়াই অজয়া ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থ কয়েকদিন আসে না—তাই অজয়ার এই তল্লাস। কিন্তু তার নির্বিকার সকৌতুক প্রশ্নের সুরটা নিজেরই কানে যাইয়া তাহার মনে হইল, তল্লাসে যেন উদ্বেগ সুপ্রকট উৎকীর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনে সিদ্ধার্থর সম্বন্ধে আদৌ উদ্বেগ ছিল কি-না সহসা তাহা সে মনে করিতে পারিল না। কিন্তু প্রশ্নটা করিয়া এই যে সে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে—এই দৃষ্টিও যেন অনুকূল উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ ! অজয়া অনুভব করিল, তার এই দৃষ্টি আর যাই হোক, স্বাভাবিক কিছুতেই নয়।

বিমল বলিল,—কই, না ! আর দেখা হলেই বা কে কাকে চেনে !

শুনিয়া অজয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিমলকে যাচ্ছে-তাই ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিলো। বলিল,—লেখাপড়া শিখে বুঝি তোমার এই জ্ঞান হচ্ছে, মানুষকে তুচ্ছ করতে শিখছ ! তিনি তোর দাদার বয়সী—দেখা হলে নমস্কার করবি, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবি।

ননী আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—কাকে ?

অজয়া বলিল,—যাকেই হোক। বয়সে যিনি বড় তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে এই শিষ্টাচারটাও অত বড় ছেলেকে শেখাতে হচ্ছে এই আশ্চর্য !

বিমল পলায়ন করিল।

কিন্তু তাহার পালা হাতে নিলো ননী, বলিল,—অনুমানে বুঝেছি ব্যাপারটা। নির্বান্ধব বিদেশে একটা বন্ধু জুটেছিল—এম্নি হাড়-মোটা বলিষ্ঠ চেহারা যে দেখলে সাহস জন্মে। মনে হয়, বিপদে-আপদে তার ওপর নির্ভর করলে সে বুক দিয়ে বাঁচাবে। তাকেও তোমরা ষড়যন্ত্র ক'রে তাড়ালে। এখন বিমলকে—

অজয়া অবাক হইয়া গেল। বলিল—আমরা তাড়ালাম কি রে?

—তা বৈ কি! ভদ্রলোককে কার্যোধারের গরুর মতো মনে করলে সে সেখানে আর দাঁড়ায়? দাবা খেলতে হবে—আসুন, সিদ্ধার্থবাবু। পাহাড়ে উঠে ফুল তুলতে হবে—এগোন, সিদ্ধার্থবাবু। ঝরণার জলে নাইতে হবে—আগুলে থাকুন, সিদ্ধার্থবাবু। তারপর সেদিন তাঁর কথা বন্ধ ক'রে দিয়ে চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে দিলে! রাগ ক'রো না দিদিমণি, আমরা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি।—বলিয়া সে অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুখখানা কি কারণে কে জানে বড় বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। সিদ্ধার্থ তখন কাছাকাছি কোথাও ছিল না। ননীর কথাগুলি সে শুনিতে পাইল না। কিন্তু শুনিতে পাইলে সে যে কি করিত তাহা নিঃশেষ করিয়া অনুমান করাও যায় না।

অজয়া বলিল,—তাঁর অসুখও ত' করতে পারে!

—সেইজন্যেই আমাদের আরো উচিত, যে ক'রে হোক তাঁর একবার খোঁজ নেয়া।

—কাকে দিয়ে নিই বল ত'? কোথায় থাকেন তিনি তাই বা কে জানে! আমার ভয় হচ্ছে ননী, তাঁর অসুখই করেছে। বিদেশে—

বলিতে বলিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া তার মুখের শব্দ থামিয়া গেল বটে; কিন্তু কথায় কথায় যে উৎকণ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তার চোখ-মুখ দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না। সেইদিকে চাহিয়া কৌতুকের বিস্তৃত হাসিতে ননীর মুখ ভরিয়া উঠিল।

রজত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তার পশ্চাতেই যে ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে-ই অজয়া-ননীর আলোচনাধীন সিদ্ধার্থ।

ননীর সম্মুখে উৎকণ্ঠা যে কি অর্থ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অজয়া এতক্ষণ তাহা ঘুণাক্ষরেও অনুভব করিতে পারে নাই।

কিন্তু সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই তার সম্বিৎ ফিরিল। অজয়া চোখ নত করিল।

রজত লক্ষ্যও করিল না যে, অজয়ার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের আবেগেই সে বলিতে লাগিল,—সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে রীতিমতো মল্লযুদ্ধে ক'রে তাঁকে পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'রে নিয়ে এলাম। কতই যেন কাজে ব্যস্ত এম্নি ভাবে হন্‌হন্‌ ক'রে ছুটছিলেন। আমাদের ওপরের দিকে চোখ তুলে নামিয়ে আনতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তারপর তাঁকে ওপরে তুলতে আমাকে এম্নি টানাটানি করতে হয়েছে যেন পাঁকের ভেতর থেকে হাতী টেনে তুলছি। তুমি আমাদের বসতে বললে না যে, অজয়া?

কিন্তু বসিতে বলিবার যে প্রয়োজন আছে, রজতের ত্রুটি নির্দেশেও অজয়ার তাহা মনেও হইল না। যাহা মনে হইল তাহাই সে বলিয়া গেল,—কেন ধ'রে আনলে কাজের ক্ষতি ক'রে! যে যা ভালবাসে না—

অজয়ার রাগ হইয়াছিল—কতক নিজের উপর, কতক সিদ্ধার্থের উপর। সিদ্ধার্থের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা অনুভব করিবার হেতু ছিল বলিয়া এখন তাহার মনেই হইল না। কিন্তু মুহূর্ত-পূর্বের সেই উৎকণ্ঠাবোধটি ত' সত্য—অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তার নাই। অহেতুকী যন্ত্রণা-সৃষ্টির কারণটাকে সে অমান্য করিতে কেন চাহিতেছে, তাহার কাছে তাহাও ঠিক স্পষ্ট নয়।

নিজের ভিতরকার এই অস্পষ্টতার ধোঁয়া এবং নিজেকে বুঝিতে না পারার অসহিষ্ণুতাই

হঠাৎ তাহার কণ্ঠে ক্রোধের আকারে দেখা দিলো। কিন্তু ক্রোধবশে আত্মবিস্মৃতির প্রান্তে আসিয়াই সে নিজের দুর্বলতা এবং ভুল বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।

রজত বলিল,—ছুটিতে আবার মানুষের কাজ কি? আট-দশদিন আসেননি কেন, রাগ করেছেন কি-না জিজ্ঞাসা করবো, রাগ ক'রে থাকলে ক্ষমা চাইব—এই-সব ভেবে ধ'রে নিয়ে এলাম। অন্যায় করেছি?—বলিয়া সে সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বসাইল।

সিদ্ধার্থর কাছে এ সবই নূতন। সহসা উদ্ঘাটিত বিশ্বরহস্যের মত নূতন—আর কেমন মনোরম তাহা না বলিলেও চলে।

সিদ্ধার্থ নির্বাক হইয়া রজতের আড়াল হইতে বিমূঢ়ের মত চাহিয়া অজয়াকেই লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু রজত তাহাকে বসাইয়া দিতেই দৃশ্য-সংস্থানের পরিবর্তনেই যেন তাহার মনের সুবিন্যস্ত সম্ভোগটিও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কোনদিকে না চাহিয়া রজতের প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল,—অন্যায় দিকটা দেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছেন। বলুন ত', এ ক'দিন আসেন নি কেন? ননী, চা।

মনে খট্‌কা লাগিয়া সিদ্ধার্থ কষ্টকর একটা কম্পন অনুভব করিতেছিল।

অজয়া তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে নাই। খট্‌কা এই যে, কেন? অজয়ার রাগটা সে ধরিতে পারে নাই; তাহারই কথা কহিতে কহিতে কেন সে অমন করিয়া থামিয়া গিয়াছিল তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। কেবল বুঝিতে পারিয়াছে, অজয়া তাহার দিকে চোখ ফিরায় নাই।

সিদ্ধার্থর দৌর্বল্য সর্বত্র।

সেই সর্বব্যাপী দুর্বলতাকে অহরহ আবৃত করিয়া আঘাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়া চলা যেমন অসম্ভব, আঘাতের ভয়ে সে অনুক্ষণ তেমনি কাতর। তার শশঙ্ক সতর্কতার অন্ত নাই যে, কোথায় একটু অসাবধানতা ঘটিবে—অমনি সেই ছিদ্রপথে দেহে কলি প্রবেশ করিয়া তার সকল আশা আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে নিরস্ত্র নিঃসহায় করিয়া রাখিয়া যাইবে।

সর্বদাই তাহার মনে হয়, কখন সে আনমনে গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াইয়া দিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্থানচ্যুত হইয়া তার নিষ্কৃতির রন্ধ্র আর কোনোদিকেই রহিবে না।

তাই অজয়া তাহার দিকে না চাওয়ায় হঠাৎ অবলম্বনের অভাবেই তার মনে যে কত বিষাদ আর শঙ্কা জমিয়া উঠিল তাহার ইয়ত্তা নাই। অজয়ার মনে বুঝি তাহার জন্য একটুও স্থান নাই।

রজতের প্রশ্নের জবাব তবু সে অবিলম্বেই দিলো। বলিল,—ছিলাম না এখানে।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমাদের মণ্ডলীর কাজে।

—কোথায়?

—পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে গিয়েছেন কখন?

—না; হ্যাঁ, গিয়েছিলাম একবার, কিন্তু ফিরে এসেছিলাম কেঁদে। প্রথম রাত্রেই যেখানে মাথা রেখে শুয়েছিলাম তারই ঠিক সিকি ইঞ্চি তফাতে অর্থাৎ বেড়ার ঠিক ও-পিঠেই আচম্‌কা এমন একটা বিকট আওয়াজ হয়ে উঠল যে আমি ভয়ে কেঁপে কেঁদে যাই আর কি! মা বলতে লাগলেন—ভয় নেই, ভয় নেই—শেয়াল।—বাড়ীর সবাই মিলে,

'শেয়ালকে মেরে দেবো' ব'লে তর্জন ক'রে আমায় সাহস দিলেন বটে, কিন্তু মা আমায় নিয়ে তার পরদিনই পালিয়ে এলেন। শেয়ালের ডাক ছাড়া সেখানে উপলব্ধি করবার মত কি আছে জানিনে। তবে আজকাল মশকের উৎপাতের কথা কাগজে বেরোয় দেখতে পাই।

সিদ্ধার্থ চমৎকার একটি ভ্রূভঙ্গী করিল। রজতের এই অজ্ঞতা যেন তাহারই উপর নির্যাতন!

বলিল,—মাত্র এই? শেয়াল আর মশার উৎপাত ছাড়া সেখানকার অনেক খবর অনেকেই জানেন না। কিন্তু বিশেষ খবরটিও রওনা হয়েছে—একদিন এসে সে পেঁছিবেই—তখন চমকে উঠে দেখবেন, রসাতলের তলদেশে এসে পা ঠেকেছে—কোথাও ছিদ্র নেই, অবলম্বন নেই।

—সর্বনাশ, এমনি দুরদৃষ্ট আমাদের হবে!

—হবে বৈকি!

—খবরটি কবে পাবো ব'লে আন্দাজ করেন?

—এখনো সাবধান না হলে অচিরেই পাবেন। আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি যে-অঙ্গ আশ্রয় ক'রে সে-ই শুকিয়ে উঠেছে—ভেঙে-চুরে পড়লাম ব'লে। কিন্তু ভরসার কথা—

—বাঁচা গেল। ভরসার কথাও আছে তাহলে?

—আছে। এই জ্ঞানটা ফিরিয়ে আনতে হবে যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, পুণ্য—এর কোনোটাই হাত-ধরা নয়। আত্মদানের প্রেরণা যখন দুর্বল হয়ে আসে তখনই অধঃপতিতের মনে হয়, পরিত্রাণ সাধনা-নিরপেক্ষ এবং সুলভ। একটু হরিনাম ক'রেই, গঙ্গায় একটি ডুব দিয়ে উঠে, হাত-পা ছুঁড়ে একটু আস্ফালন ক'রেই তার মনে হয়, যথেষ্ট করা হচ্ছে। সভ্যজগৎ তাই দেখে হাসে। পৃথিবীকে আমাদের দেবার কিছু আছে কিনা জানিনে, থাকে ত' ভালই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। অথচ ঐ জিজ্ঞাসারই তত্ত্বটুকু সভ্যতার নিদর্শন—আগেও ছিল, এখনো আছে।

রজত কষ্টবোধ করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিল,—কিন্তু হচ্ছিল পল্লীর কথা।

—আমার তা মনে আছে। পল্লীকে ভিত্তি ক'রে যাঁরা দেশকে গ'ড়ে তুলতে চান, ঐগুলি তাঁদের সম্বন্ধে। পল্লীর দিক দিয়ে ভরসার কথা এই যে, সে শিক্ষাপটু। উপকার কিসে হয়, বুঝিয়ে বললে সে তা বুঝতে পারে কিন্তু শেখাবার লোক নেই।

—অশিক্ষিতকে শিক্ষিত ক'রে তাকে বর্ধিষ্ণু, বৈজ্ঞানিক ক'রে তোলবার সহিষ্ণুতা আর অপর্যাপ্ত সময় মানুষের কই?

—আপনার নেই, কিন্তু আমার আছে। আর, তারা অশিক্ষিত নয়, নিরক্ষর। তাদের মধ্যে জন্মার্জিত শিক্ষার একটা ধারা বইছে। অরা সভ্য এবং সাধক—জগতের সম্মুখে নিজস্ব প্রশ্ন নিয়ে যে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, সে আমাদের পল্লী। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে—গা তুলে অগ্রসর হলে বীজ বপন করতে পাথরে লাঙল বসাতে হবে না—অবশ্য যদি সহিষ্ণুতা আর অপর্যাপ্ত সময় মানুষের থাকে।

সিদ্ধার্থর বাগ্মিতা শুনিতে শুনিতে অজয়া একটি আত্মনিপীড়িত তপোশীর্ণ সাধকের মূর্তি সম্মুখে দেখিতেছিল।

মূর্তিটা সিদ্ধার্থ নয়, কাহারোই নয়—

তবু সে একটা মূর্তি—অক্ষয়, আর তেজে গর্বে এবং প্রতিষ্ঠার আনন্দে দুঃসহ চঞ্চল।

সিদ্ধার্থ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অজয়া আগুনে ঘৃতাঞ্জলি নিক্ষেপ করিল ; বলিল,—সময় আছে, নেই ইচ্ছা।

—ঠিক, নেই ইচ্ছা, ব্যাপক অর্থে। অনেকে ওজর দেখান, আমরা অসহায় ; কিন্তু ইচ্ছার অভাব ছাড়া অন্য কোনো কারণই স্বীকার করা কঠিন। বড় বড় ক্ষেত্রে আমরা যত বড় অনাথই হই না কেন, নিতান্তই এই ঘরের কথাটিতে তত নিরুপায় আমরা নই।—বলিয়া সিদ্ধার্থ মাথা নত করিল—যেন, অজয়ার মুখ দিয়া যে সত্যটা নির্গত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে।

রজত বলিল,—কিন্তু একটি দু'টি লোক এতবড় বিরাট একটা কাজে হাত দিলে নিজেকে একা আর অসহায় মনে করা ত' স্বাভাবিক। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবারও ভয় আছে।

—কাল্পনিক ভয়। একটি পল্লীর সুখ-দুঃখ সর্বসাধারণের সুখ-দুঃখ বোধে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবে না—সার্থকই করবে। আপনার কাজের মাঙ্গল্য তাকে আকর্ষণ করবে, মুগ্ধ করবে, উন্নত করবে—কারণ সে শিক্ষিত এবং সভ্য। একটুখানি এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন, যাদের সাহায্য করতে এসেছেন তারাই আপনার সহায়।

রজতের দৈবাৎ মনে পড়িয়া গেল, কি একখানা গল্পের বহিতে যেন সে পড়িয়াছিল, পল্লী-সমাজপতিরা বড় দুর্দান্ত, চক্ষু-লজ্জা আর কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত। বলিল,—যদি আমি কখনও যাই ও-কাজে তবে বোধ হয় সমাজপতিদের অতিবুদ্ধির দৌরাত্ম্যেই আমায় পালিয়ে আসতে হবে।

—সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে যুঝতে হবে স্বীকার করি। যারা মতলব ছাড়া কথা কয় না, তারা মতলব খুঁজবেই ঠিক অমানুষের মত। কিন্তু কর্মের সম্মুখে যদি নির্বোধ প্রতিকূল শক্তি না রইল তবে অসাড়তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবেন কি করে! নেশা ধরিয়ে দেবে তারাই, যারা আপনাকে চাইবে না।

অজয়া বলিল,—কিন্তু নিজের কল্যাণের দিকে নিশ্চেষ্টতার ফলে যে কলুষ জ'মে উঠেছে, কতদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় তা দূর হবে!

সিদ্ধার্থ কৃতার্থ বোধ করিয়া অজয়ার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—বহুদিনের আবর্জনা দেখতে দেখতে ছাই হয়ে যেতে পারে যদি আলস্য ত্যাগ ক'রে কেউ আগুন 'লাগিয়ে দেয়। গতির এমন একটি নিজস্ব শক্তি আছে যা আনন্দ দেয়। ঝড় ছোটে—মানুষ ভয় পায় ; কিন্তু অনন্ত আতঙ্কের মধ্যেও অদ্ভুত একটা আনন্দের সঙ্গে সে ঝড়ের গতির দিকে চেয়ে থাকে। এই আনন্দটা দিতে পারলেই মানুষ অন্ধ হয়ে অনুসরণ করে ; যেমন—

—আপনি কি করেন?

প্রশ্ন শুনিয়া সিদ্ধার্থ রজতের দিকে ফিরিল।

বেশ ভাবটা আসিয়াছিল। বাধা পাইয়া তার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রজতকে দুই হাতে চড়াইয়া দেয়। বলিল,—যা পারি তা করি।—বলিয়া সিদ্ধার্থ যখন পুনরায় অজয়ার দিকে চোখ ফিরাইল তখন অজয়ার চোখের সেই তীব্র দৃষ্টিবিচ্ছুরণ ক্ষান্ত হইয়া গেছে।

রজত বলিল,—সে কাজটা কি?

—নিরূপিত কাজ কিছু নেই। আর্তরক্ষা, পল্লীতে পল্লীতে দেশাত্মবোধ জাগরিত করা, সংস্কারকে মোহনির্মুক্ত করা।

অজয়া বলিল,—শিক্ষাবিস্তার?

—তাও করি। আমরা জানি যে, যারা নিম্নস্তরে আছে তাদের উচ্চস্তরে তুলে আনবার একমাত্র বাহন শিক্ষা। জল-চল হলেই কেউ স্তর পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে না—শিক্ষায়তনেই সব একাকার হয়ে যাবে—জলে আর দুধে যেমন। মেশবার একটা আধার চাই। সেটা ফরাস নয়, শিক্ষা।

শুনিয়া অজয়া সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল—যেন সিদ্ধার্থর কথাগুলির সমগ্র অর্থ অতিশয় ধীরে ধীরে সে গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু রজত আজ আর হাই তুলিল না।

সেদিন সবাই তাকে ভুল বুঝিয়াছিল। আজ সে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে চার-পাঁচবার গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিয়াও উঠিল না—তারপর এখন সংগত অবসর লাভ করিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবুর কাছে আমার একটি কৃপাভিক্ষা আছে। আপনার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে তবে বলি।

সিদ্ধার্থ বলিল,—কথার শেষ নেই, তবু বলুন; কিন্তু বিনয়ের বহর দেখে ভয় হচ্ছে, কাজটা হয়তো দুঃসাধ্য।

—দুঃসাধ্য হলে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করবেন।

—অসাধ্য হলে?

—অস্বীকার করবেন।

—এখন কাজটা কি শুনি?

—একটি গান শোনাতে হবে।

— শোনাবো। আপনাদের শেষ অনুরোধটা না রাখলে নিজের কাছেই আমরণ অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।—বলিয়া সিদ্ধার্থ কঠিন পরীক্ষকের মত মুখ করিয়া কোনোদিকেই চাহিল না।

চির-বিচ্ছেদের এই ইংগিতটা যতদূর নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রদান করা সম্ভব তাহা সে করিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা সফল হইল কি না তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বিদায়ের বেলা একেবারে আসন্ন—অকস্মাৎ এই ঘোষণায় অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া অজয়া যদি ভালবাসিয়া থাকে—তবে নিশ্চয়ই প্রামাণিক এমন কিছু করিয়া ফেলিবে যাহা আত্মসম্বরণে সচেষ্ট, বেদনায় কাতর, অথবা রুদ্ধবাষ্পে অস্থির। কিন্তু, যেখানে সার্থকতা ফলরূপে দেখা দিবার কথা, সেখানে দুটি একটি মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটিয়া গেল তাহা তাহাকে দেখিতে দিলো না ঐ রজত।

রজত তাহার দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু এমন করিয়া চাহিয়া আছে যেন সে একটা কি! রজতের সেই হাভাতে দৃষ্টি ঠেলিয়া অজয়ার দিকে চাহিতে সিদ্ধার্থর সাহস হইল না।

কিন্তু অজয়ারই প্রশ্নে যখন তাহার সাহসিকতার প্রয়োজনই রহিল না, তখন অজয়ার মুখে কোনো মানসিক বিকারের বাঞ্ছিত রেখালিপির চিহ্নও নাই।

অজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—শেষ অনুরোধ মানে?

— আমি আজ শেষ রাত্রেই যাচ্ছি।

রজত বলিল,—কোথায় যাবেন মনস্থ করেছেন? অবশ্য বলতে যদি রাষ্ট্রীয় আপত্তি না থাকে।

—কলকাতায় আপাতত, তারপর ভগবান যেদিকে নিয়ে যান।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কিন্তু পরিচয় সম্পূর্ণ হ'ল না।—বলিয়া অজয়া উঠিল।

অজয়ার কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থের মন সির্‌সির্ করিতে লাগিল—মনে হইল, এ যেন সুদূরাগত একটি আহ্বান। কে জানে কোথায় বাঁশী বাজিয়াছে—রব কানে যাইয়া আত্মার সম্বিৎ সচকিত হইয়া উঠিয়াছে—অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট সুর—তবু মন সুরের স্রোত বাহিয়া ছুটিয়া যাইতে চায় যাহার অধরে বাঁশী, তাহারই সন্নিকটে। কাহারো নাম ধরিয়া সে ডাকে নাই, তবু সে-সুর সবারই আপন-নামে ভরা।

যে নাম জানে না—কেবল চেনে উন্মুখ প্রাণটিকে—সে ত' ঐ সুরেই ডাকে।

সিদ্ধার্থের মনে হইল, বাহিরে নিঃস্পৃহ; কিন্তু ভিতরে অর্থের অমৃতরসে কূলে-কূলে পরিপূর্ণ হইয়া অজয়ার মুখ-নিঃসৃত কথা ক'টি চতুর্দিক হইতে যেন তাহার ত্বক-মর্মকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। দৈবদত্ত কৃতজ্ঞতাসূত্রে যে পরিচয়ের উদ্ভব, তাহার পরিণতি কোথায় তাহা অনুমান করা ত' মানুষের পক্ষে শক্ত কাজ নয়।

তাহা জানিয়া শুনিয়াও যে আরো বেশী করিয়া পরিচয় পাইতে অভিলাষ করে, সিদ্ধার্থের মনে হইল, তাহার মনের ধারাটি ত' ঊর্দ্ধের ঐ আকাশ আর নিম্নের এই মৃত্তিকার মত চোখের একেবারে সম্মুখবর্তী জিনিস।

পরিচয় সম্পূর্ণ হইল না, ইহার জন্য বন্ধুভাবে ভদ্রোচিত একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সিদ্ধার্থের যথেষ্টই ছিল; কিন্তু হঠাৎ উল্লাসে আত্মহারা হইয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

রজত অজয়াকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায়?

—সিদ্ধার্থবাবুর পণ ভাঙতে। উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের জলগ্রহণ করবেন না। দেখি, টলাতে পারি কি না।

অজয়ার সুরে শ্লেষ ছিল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার হেতুটা সঠিক নির্ণয় করিতে পারিল না—হইতে পারে আক্রোশ, কিম্বা নারীসুলভ অতিথিবাৎসল্য, অথবা জিতিবার ঝোঁক। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল,—মাপ করবেন; বৃথা—

অজয়া যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; বলিতে লাগিল,—আপনি কি মনে করেন, আপনাকে জলগ্রহণ করাতে না পারলে আমরাও জলগ্রহণ ত্যাগ করবো! তা নয়—এটা শুধু বাঙালীর ঘরের শিষ্টাচার। বারবার শিষ্টাচার প্রত্যাখ্যান করা কোন্ দেশী শিষ্টাচার তাই আমি শুনতে চাই। আপনি বনের মানুষ নন, নিশ্চয়ই জানেন, আপনি যে ব্যবহার করছেন,তাতে মানুষ অপমান বোধ করে।

—আমি—

—কৈফিয়ৎ আমি চাচ্ছিনে। আপনি বেকার অবস্থায় এখানে দিন কাটিয়েছেন। আমাদের সময় কাটাবার উপলক্ষ ক'রে নিয়ে নিজেকে প্রচার ক'রে গেলেন—আসল কথা এই নয়?—বলিয়া অজয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ যথার্থই বিস্মিত হইয়াছিল।

স্বল্পভাষিণী অনস্থির·ঐ নারী যে এমন তীব্র উক্তি করিতে পারে তাহা সে স্বকর্ণে না শুনিলে কখনো বিশ্বাস করিতে পারিত না। নিরুদ্যমের মত মুখ ছোট করিয়া ঐ কথাগুলিকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—আমার সামান্য

কথার উপর এতবড় একটা অভিযোগ যে খাড়া করা যেতে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।—বলিয়া সিদ্ধার্থ একটু হাসি ফুটাইল।

হাসিটি কারুকার্যে চমৎকার। ওষ্ঠদ্বয়ের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদিত হইয়া মধ্যপথে খানিক ঢেউ খেলিয়া বাম প্রান্তে মিলাইয়া গেল। যেন বলিয়া গেল, এ কি অবাক কাণ্ড!

কিন্তু ভিতরের বার্তা বড় গভীর।

এমনি করিয়া অনাচার দেখাইয়াই ত' সে নিজেকে অদ্ভুত করিয়া তুলিতে চায়! অসাধারণ না হইলে সে ত' লক্ষ-লক্ষের আসা-যাওয়ার স্রোতে ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া দৃষ্টি-পরিধির বাহিরে চলিয়া যাইবে। মনে দাগ কাটিবার উপায়ই ত' ঐ।

অজয়ার রাগ দেখিয়া তাই সে খুশীই হইল।

রজত বলিল,—বিস্ময়ের কথা বটে। কিন্তু স্বপ্নেরও অগোচরে এমন সব ব্যাপার ঘ'টে থাকে যা নিতান্তই সাধারণ। আজ যখন জাগ্রত অবস্থাতেই গোচরে এসেছে তখন আর অলীক ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

সিদ্ধার্থর খেদ নানাদিক দিয়া বাহির হইতে লাগিল; বলিল,—মানুষ কেমন ক'রে আর কেন যে নিজেকে এমন পরবশ ক'রে তোলে তা বোধ হয় কখনো সে ভেবে দেখতে চায়নি। আমার এই সূত্রপাত।

—অর্থাৎ?

—কোনোদিন আমি আশা করিনি যে বন্ধুত্বের সম্মান রাখতে পরবশ হতে হবে। অথচ দেখুন, এক মুহূর্তেই আমি চিরদিনের অভ্যাস, সঙ্কল্প আর আদর্শ ত্যাগ ক'রে প্রস্তুত হয়ে বসেছি, কেবল একটি মানুষকে তৃপ্ত করতে।—বলিয়া সেই একটি মানুষের উল্লেখ করিতে সক্ষম হইয়া সে-ও অসামান্য তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল।

রজত বলিল,—আপনার উদারতা খুব।

অজয়া এবং ননী উভয়ে মিলিয়া জলখাবার ও চা লইয়া আসিল। কিন্তু ননী সেখানে দাঁড়াইল না—দিদিমণির বাড়াবাড়ি আগ্রহ দেখিয়া তাহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেছে।

একবার কোথায় ভোজে সিদ্ধার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করিয়াছিল। তারপর দোকানে সাজানো মেঠাইয়ের পর্বত সে প্রায় প্রত্যহই দেখে।

কিন্তু অজয়াদের নিজের হাতে প্রস্তুত ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া বমনোদ্বেগে তাহার পাকস্থলী যেন তোলপাড় করিতেছে এমনি করিয়া সেগুলির দিকে চাহিয়া এবং রজত সে চাহনিটা দেখিল তাহা লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধার্থ বলিল,—কৈফিয়ৎ আপনি শুনতে চাননি; কিন্তু শুনলে এতগুলি উত্তপ্ত কথার সৃষ্টি হ'ত না। আমি দরিদ্র—

—আমরা ধনী। ধনীর সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব করেছেন তখন ধনের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।—বলিয়া অজয়া খাবার সাজাইতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বড় কাতর হইয়া বলিতে লাগিল,—যা নিতান্তই না হ'লে চলে না, খোরাক-পোষাক সম্বন্ধে আমি সেই যৎকিঞ্চিতেই অভ্যস্ত। তার বেশী আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে।

কেহ কথা কহিল না।

রজত মনে মনে বলিল, ন্যাকা।

অজয়া ভাবিল, মহাশয়ের কাতরতা নিষ্ফল।

কিন্তু সঙ্কট দেখা দিলো।

সিদ্ধার্থও চা খাইতে বসিয়া গেছে। সুতরাং প্রথম পেয়ালাটি মাটি হয় দেখিয়া রজত বলিল,—অজয়া বোধ হয় জানে না যে, অতিশয় শারীরিক আলস্যের প্রশ্রয় দেয় ব'লেই বৈরাগ্যসাধনে যে মুক্তি তা একরকম অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে এবং জাতি হিসাবে সেটা আমাদের পক্ষে এখন অনধিকার-চর্চা। কি বলো?

অজয়া বলিল,—পৃথিবীর লোক কিন্তু তাই চাইছে আজকাল।

—এদিকে ভারতবর্ষের গুরুগিরির দাবি যাঁরা অকাট্য ক'রে তুলেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু আমাদের অন্তরের ভাববস্তুটি যতদিন পরের পদানত থাকবে, ততদিন সে সফল হবার আশা বৃথা।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

সংসর্গ হিসাব সে নিজেকে অপাংক্তেয় অচল মনে করে। মনে মনে তার কুণ্ঠার অবধি নাই। সৎ-সাহচর্যের ফলে যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন ঘটে, তা তার ঘটে নাই এবং তাহা সে জানে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার সম্বিৎ অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া সূক্ষ্মতম আঘাতেই বাজিয়া উঠিতে যেন অনুক্ষণ উদ্যত হইয়াই থাকে।

অতি অল্পদিনেই এই পরিবর্তনটা ঘটিয়াছে।

সে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠার ভান করিতেছে—তাই রজতের কথাগুলি সে তাহারই বিরুদ্ধে উচ্চারিত মনে করিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ভাববস্তু কোনোদিন পরাধীন হয়ে যেতে পারে ব'লে আমি মনে করিনে।

কিন্তু তর্ক উঠিল না।

রজত হাসিতে লাগিল; বলিল,—আপনি শুনে ফেলেছেন আমার কথা? ননী, আমার কোনো অপরাধ নেই দিদি—

অজয়া প্রথমে ধরিতে পারে নাই। কিন্তু রজতকে চপলকণ্ঠে হাসিতে দেখিয়া এবং তার কথার সুরে সে অনুভব করিল যে, রজত ক্রুর একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া তুলিয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরম মমতার সহিত তাহার ইহাও মনে হইল যে, এইপ্রকার মানসিক সংঘর্ষ-ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবু নিতান্তই অক্ষম প্রতিপক্ষ। ওরা কেবল পশ্চাতে সর্ববিধ আকর্ষণ অক্লেশে অতিক্রম করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিতে জানে। ওদের প্রধান সম্বল তেজস্বিতা, একনিষ্ঠ উগ অনুরাগ। তীক্ষ্ণধার গুপ্ত অস্ত্র লইয়া কে কোথায় উহাদের মনের কায়াক্ষেত্র রক্তাক্ত করিতে বসিয়া গেছে, তাহা ওরা ধরিতেই পারে না—এমনি ওরা অসহায়। ভাবিতে ভাবিতে যখন সে সিদ্ধার্থর দিকে চোখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার সেই সুকোমল দৃষ্টি-পাত্রে করুণা যেন ধরে না।

চারি চক্ষুর মিলন হইল। সিদ্ধার্থ শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তার অষ্টাঙ্গ আর পঞ্চেন্দ্রিয় অপূর্ব একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণে একটি কোষের আকার ধারণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই দৃষ্টির অমৃত-দানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহা অচিন্ত্যনীয় সুখের মাঝে চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল।

রজত দ্বিতীয় পেয়ালাটি সম্মুখে করিয়া সিদ্ধার্থর গান শুনিল এবং গান শেষ হইলে বলিল,—সঙ্গীতকে সুধা কেন বলে আজ তা হৃদয়ঙ্গম হ'ল। সমগ্র মনটা ডানা মেলে সুরের ভেতর হুল ফুটিয়ে স্থির হয়ে ব'সে রস শোষণ ক'রে নিচ্ছিল, আর রসের মাধুর্যে

তার অভ্যন্তরটা তোলপাড় করছিল। আজ আমার চা খাওয়া বৃথা আর সার্থক এক-সঙ্গে হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—পরস্পর-বিরোধী দু'টি শব্দের একত্র প্রয়োগ—

—ন্যায়শাস্ত্রে চলে না সত্য। কিন্তু চেয়ে দেখুন—দ্বিতীয় পেয়ালার চা এক চুমুকও খাইনি, সুতরাং বৃথা হয়েছে। এদিকে চা-পান উপলক্ষ ক'রে এমন গান শোনা গেল যাতে আসাম পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অজয়ার মন ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সিদ্ধার্থের গানের 'মা' আহ্বানগুলিতে।

তাহার মনে হইল, অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাকে আর কেহ ডাকিতে পারে না।

বলিল,—আপনার মা কি বেঁচে নেই?

স্বদেশের হিতকল্পনা সিদ্ধার্থের প্রথম বিভাগ।

মাতৃপিতৃ-বিষয়ক আলোচনা তার দ্বিতীয় বিভাগ।

কাজেই অজয়ার প্রশ্নে সে মুখ-চোখ কাঁদো-কাঁদো করিয়া বলিল,—না। তিনি এ-হতভাগ্যের মুখ দেখেননি, আমিও তাঁর মুখ দেখিনি। তাঁর মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমি ভূমিষ্ঠ হই—তাঁর সে মূর্চ্ছা ভাঙেনি।

অজয়া বলিল,—আমাদেরও মা বেঁচে নেই।

—তবু আপনাদের সম্মুখে স্বর্গীয়ার মুখের মায়াটুকু ছবিতে অমর হয়ে আছে। আমার সে সম্বলও নেই।

বলিয়া সিদ্ধার্থ থামিল। নিঃসম্বল অবস্থা যেন সর্বদা তার সহ্য হয় না।

আবার বলিল,—আর পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতে যে দুর্দশা অনিবার্য, আমারও তাই হয়েছে—কৃত্রিম অসার হয়ে উঠেছি। আমি যখন মাতৃগর্ভে, পিতা তখনই—

মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই যে অভাগা পিতৃহারা হয়, পিতাকে স্মরণ করিয়া মানুষের সম্মুখে তার কান্না পাওয়ারই কথা। উদ্‌গত অশ্রু রোধ করিতেই সিদ্ধার্থ চুপ করিতে বাধ্য হইল।

ব্যাপার শোচনীয় হইয়া অজয়ার আপশোষের সীমা রহিল না; বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু, আমায় মাপ করুন। আমি না জেনে আপনার ব্যথার স্থানটি স্পর্শ করেছি।

সিদ্ধার্থ অজয়ার ব্যাকুলতাটুকু উপভোগ করিল—কিন্তু কথা তেমন কানে তুলিল না—ঢের বড় বড় ব্যথার কথা সে এখনো বলিয়া শেষ করে নাই। কণ্ঠে বেদনা ঘনীভূত করিয়া লইয়া সে বলিল,—ব্যথাটা বড় বেশী আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেইদিন, যেদিন শুনলাম আপনি বাপ-মা-হারা অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা। মায়ের অভাব মানুষ ইহজন্মে ভুলতে পারে না। আজন্ম যে মাতৃস্নেহ পায়নি তার তৃষ্ণাটা সেদিন বুকে হাহাকার ক'রে উঠেছিল। একটি মাতৃমূর্তির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া যে জীবনের কত বড় সার্থকতা—তা-ই সেদিন দিব্যচক্ষে প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম।—বলিয়া সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ চক্ষে দরজার দিকে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল তাহা সে-ই জানে।

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, সিদ্ধার্থের সুচিন্তিত বিলাপের পরই সভাস্থ তিনজনেরই নিঃশব্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস একসঙ্গেই পড়িল।

রজত বলিল,—গান শুধু আনন্দ দেয় না, ব্যথাও দেয়। আমি আনন্দের আতিশয্য যাকে মনে করেছিলাম সে ব্যথা। নিজের মন বুঝতেও বাহিরের সাহায্য চাই, আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম।—বলিয়া সে ভোজন-কক্ষের উদ্দেশে উঠিয়া পড়িল।

॥ এগার ॥

সবাই কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

সিদ্ধার্থ নিজের ঘরটিতে দিব্য চৌকা হইয়া বসিয়া আপনমনেই আনন্দ করিতেছিল।

কন্দর্প পুষ্প-শরাসনে শরযোজনা করিয়াছেন; কিন্তু ধ্যানভঙ্গে ললাটনেত্রের বহ্নি ছুটাইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে সে উদ্যত নহে।

নিজে সে মহাদেব নয়—ভাবিয়া সিদ্ধার্থ মনে-মনেই একটু হাসিল।

তারপর কল্পনা করিতে লাগিল,—সর্বাঙ্গে মুহুর্মুহুঃ শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে—নবোদ্‌গত কদম্বকেশরের মত—দৃষ্টিতে অনন্ত আবেশ—আনন্দ, ব্যথা আর করুণার তিনটি স্রোত পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে—দু'ধারে চির-বসন্তের পুষ্পিত স্ফূর্তি—আকাশে আলোক-বন্যা, ত্রিস্রোতার বক্ষে তাহারই প্রতিবিম্ব ঢলঢল করিতেছে।

সে ভালবাসিয়াছে।

কিন্তু সিদ্ধার্থ ষোল আনাই বর্বর নয়।

অজয়ার অন্তর-বাহির তাহাকে এক হাতে কাছে টানিতেছে, অন্য হাতে দূরে ঠেলিতেছে। অজয়া তাহাকে ভালবাসিলে কত দিক দিয়া কত সুবিধা হইবে তাহা সে তেমনি জানে, যেমন জানে সে নিজের চির-অপরাধী অপরাধকে।

আনন্দ তার ভাটার টানে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। আবার জোয়ার আসিতেও বিলম্ব হইল না।

পৃথিবী ত' আমারই প্রতিরূপে পরিপূর্ণ। আমি কি একা দোষী? নিজে যা নয়, ছদ্ম আচরণে নিজেকে তা-ই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস ত' প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ। কে কবে নিজেকে অকপটে প্রচার করেছে? অধর্মের পরাজয় হবেই ব'লে বিভীষিকা দেখাবার একটা আয়োজন আছে বটে; কিন্তু সে বৃথা—পরাজয়ের ভয়ে অধর্ম বিলুপ্ত হয়নি। অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে যে-পরাজয় ঘোষিত হচ্ছে সে-পরাজয় অসম্পূর্ণ—সে-পরাজয়ের গরিমা জয়লক্ষ্মীকে অশ্রুমুখী ক'রে তুলেছে।

এইখানে একটু সবল বোধ করিয়া সিদ্ধার্থ হাসিয়া উঠিল।

আমি দেশভক্ত। দেশের দুর্দশা দেখে আমার আহার নিদ্রা পালিয়েছে। আমার মা নেই, বাপ নেই, আমি অনাথ—এত গল্পও জানতাম! মা না থাকার গল্পটা বেশ কাজে লেগেছে—তাকে কাঁদিয়েছি।

শুনতে পাই, জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে, উদ্ভিদেও আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না?—মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল—আলবৎ চাইব। কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ রং বদলায়। আমি একটু নাম বদলেছি; কিন্তু মানুষ ত' আমি সে-ই আছি। ধরণী সব সুখ কৃপণের মত লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার এক অঞ্জলি তপস্যার ফলের মত আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে। কেন আমি তা' দু'মুঠো ভ'রে কুড়িয়ে নেব না! দেবতা পূজান্তে আমায় বাঞ্ছিত বর দিয়েছে; আমি কেন তা প্রত্যাখ্যান করবো। কেউ কখনো তা করেনি। আচার্য সেদিন বক্তৃতায় বলছিল, পাপ একবার প্রবেশ করলে সে ক্ষত খনন করেই চলে—সে-ক্ষতের ধন্বন্তরি প্রেম। প্রেমই বটে। আজ আমার মনে হচ্ছে—অতীত আর বর্তমানের মাঝখানে একটা পূর্ণচ্ছেদের রেখা টেনে দিয়ে আমি—

—"সিদ্ধার্থবাবু, প্রাতঃপ্রণাম"।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ পূর্ণচ্ছেদের অসমাপ্ত রেখার উপর একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। তার সুখস্বপ্ন এক মুহূর্তেই যেন অসংখ্য হিংস্র নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। কালো দু'খানি হাত অক্লান্ত আগ্রহে মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে, মানুষের সাধ্য নাই সেই হাতের গতি সে বন্ধ করিয়া দেয়।

সিদ্ধার্থ হতাশ্বাস শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু রাসবিহারী যেন তামাসা পাইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—এতদিন পরে দেখা, প্রতি-নমস্কারটাও করলে না!

—শিথিল হয়ে গেছি, বন্ধু।

—তাই দেখছি। তোমায় আমি সর্বত্র খুঁজেছি তা বোধ হয় জানো না।—বলিয়া রাসবিহারী অনাহূতই বসিল। তার কাজ ছিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমার সৌভাগ্য যে আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ। কারণটা কি শুনি?

—সাক্ষ্য দিতে হবে যে!

—কিসের?

—ভুলে গেলে? সেই খত-এর। তুমি যে ভাই, লেখক-সাক্ষী; উভয়পক্ষের হিতৈষী।

শ্লেষের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এবং তাহা সিদ্ধার্থকে স্পর্শ করিল না।

কিন্তু সে হঠাৎ আহত জন্তুর মত বিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—আমায় মেরে ফেলো রাসবিহারী—আমি তোমার কি করেছি যে তুমি আমায়—

বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থ হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিদারুণ একটা দ্বন্দ্বের আর বিবেকবুদ্ধির লাঞ্ছনার মাতামাতির মধ্যে সিদ্ধার্থর দিন কাটিতেছে—বড় কষ্টের দিনগুলি। তার আত্মগ্লানির সীমা নাই।

থাকিয়া থাকিয়া আনন্দে আশায় সে পরিপূর্ণ হইয়াও উঠিতেছে। তবু ক্লান্তি আসিয়াছে, আর বলক্ষয়কর কেমন একটা আতঙ্ক। সিদ্ধার্থ প্রাণপণে যাহা ভুলিতে চায়, রাসবিহারী যেন তাহার নিষ্ঠুর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জোঁক যেমন শিকারের রক্তে পূর্ণ হইয়া আপনি খসিয়া পড়ে, সিদ্ধার্থর মনে হইতে শুরু হইয়াছিল, তার অতীত তার বুকের রক্তে স্থূল ভারাক্রান্ত হইয়া তাহার জীবনের অংগ হইতে তেমনি বিচ্যুত হইয়া গেছে।

কিন্তু তা হয় নাই। তাহার ঐ অনুভূতি যে সর্বৈব মিথ্যা, আর সে যে আত্মপ্রবঞ্চক, রাসবিহারী তাহাই যেন তাহার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলো। সত্তা যাহাকে প্রাণের ব্যগ্রতায় আড়ালে রাখিতে চায় তাহাকেই যে-কপট সম্মুখে টানিয়া আনে সে ত' মানুষকে কাঁদাবেই।

সিদ্ধার্থর কান্না দেখিয়া রাসবিহারী হাসিল না। বলিল,—ও হোঃ। আচ্ছা, আজ থাক। আজ তোমার মন ভাল নেই।

কিন্তু এ দরদে সিদ্ধার্থর যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। গলদশ্রুলোচনে বলিতে লাগিল,—আমার মন! আমার মন আমার নেই, সে তোমার ক্রীতদাস। তার গলায় শিকল বেঁধে ছেড়ে দিয়েছ। যখন ইচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছ। আমার সর্বস্ব নিয়ে আমায় মুক্তি দাও, রাসবিহারী!—বলিয়া বড় ব্যাকুলনেত্রে সে রাসবিহারীর মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল। যেন রাসবিহারী দয়া করিয়া তার সর্বস্ব গ্রহণ করিলেই বানপ্রস্থ অবলম্বনের পথে তার আর কোনো বিঘ্নই থাকে না।

কিন্তু সিদ্ধার্থর সর্বস্ব বলিতে কি বুঝায়, তাহা রাসবিহারীর চোখের উপরেই আছে। তাই সে হাসিয়া বলিল,—তোমার সর্বস্ব নিয়ে ত' আমি রাতারাতি রাজা হয়ে যাব; সে কোন কাজের কথাই নয়। আমার এই দায়ে উদ্ধার ক'রে দাও—তারপর তুমি মুক্ত।

এটা যে দায় নয়, তাহা সিদ্ধার্থর মনেও পড়িল না। সে যেন ডুবিতে ডুবিতে মুক্তির কথায় পায়ের তলায় মাটি পাইয়া গেল। আকুল হইয়া বলিল,—দেবে মুক্তি?

—নিশ্চয়ই।

—আর কখনো আমায় সিদ্ধার্থ ব'লে সম্বোধন করবে না? দেখা হ'লে—

—এমন ভাব দেখাবো যেন তোমায় আমি চিনিও না।—বলিতে বলিতে রাসবিহারী ক্রোধ অনুভব করিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—শপথ করছো?

রাসবিহারী ভ্রূভংগী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—তোমার অকৃতজ্ঞতায় আমি অবাক হচ্ছি। যখন লিখেছিলে তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিল, এ কাজের শেষ এইখানেই নয়। একগাল হেসে হাত ভ'রে টাকা নিয়েছিলে—তখন ত' আমায় চক্ষুঃশূল মনে হয়নি; টাকার দিকে চেয়ে তখন ত' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাওনি। তখন বুঝি পাওনাদার গলা টিপে ধরেছিল?—বলিয়া রাসবিহারী রাগের ধমকে যেন ধুঁকিতে লাগিল।

কথাগুলি মিথ্যা নয়।

সিদ্ধার্থ তাহা স্বীকার করিল; বলিল,—অপরাধ হয়েছিল, আমায় ক্ষমা করো। এখনকার মত আমায় ছেড়ে দাও—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—তা আসুক। শেষ কথাটা ব'লে যাই। তখন নিজের গরজে নগদ টাকা দিয়ে ফেলেছিলাম, হ্যান্ডনোটে উশুল দেওয়া হয়নি। আমি ছা-পোষা মানুষ; টাকা ত' বেশীদিন ফেলে রাখতে পারিনে। সুদটা কবে দিয়ে দেবে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তর সে পাইল না। সিদ্ধার্থ তখন অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

মানুষের প্রাণে এত সয়! বসুমতীর বুকের ভিতর দ্রবীভূত অগ্নি যেমন আছে, তেমনি সুশীতল জলস্রোতও বহিতেছে। কিন্তু তার বুকে কেবল আগুন। যদি কোনো ভগীরথের শঙ্খধ্বনির পিছু পিছু যদি কোন সুরধুনী তাহার বুকের দিকে নামিয়া আসে, তবে সে ত' এই অগ্নির তাপে বাষ্প হইয়া যাইবে।

ত্রাস সিদ্ধার্থর মুখে-চোখে মূর্তিমান হইয়া উঠিল।

অজয়ার ভালবাসাই ত' সুরধুনী; তাহার পানে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু—

সিদ্ধার্থর মনে হইতে লাগিল, আত্মহত্যা করিয়া এই যন্ত্রণার সে শেষ করিয়া দেয়।

রাসবিহারী বলিল,—আমার শেষ কথাটার উত্তর পাইনি।

সিদ্ধার্থ এমন দু'টি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল যেন সর্পের যাদুদৃষ্টির সম্মুখে পক্ষীশিশুর মূর্ছিত প্রাণটুকু ভিতরে কেবল ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে।

সিদ্ধার্থর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

নিঃশব্দে আঙুল তুলিয়া নির্গমের পথটা সে রাসবিহারীকে দেখাইয়া দিলো।

চূড়ান্ত অপমান বোধ করিয়া রাসবিহারী দুপদাপ শব্দ করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থর মনে হইতে লাগিল,—সে যেন পরকালের ফেরতা মানুষ। জীবিতের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর মৃতের শীতল স্পর্শ—এই দুটির ধাক্কায় দক্ষিণে-বামে সে অবিরাম দোল খাইতেছে।

পুরাতন বন্ধুরা শত্রু হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ যার জন্য এত ক্লেশ, তার সম্মুখীন হইলেই জিহ্বা শুকাইয়া ওঠে। হঠাৎ একদিন সে এমন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, যার কোন অর্থ করাই যায় না। তাহার দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে। সবাই চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল,—সিদ্ধার্থবাবু কি ভূত দেখে এলেন?—শুনিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। তারপর আর সেখানে সে যায় নাই। সেইদিন হইতে সে মনের চোখ দিয়া প্রাণপণে কেবলই নিজের বাহিরের চোখ দুটিকে দেখিতেছে।

সেখানে যেন ভয় থমথম করিতেছে। শূন্যতা তার ভয়ঙ্কর।

দু'দিন পরে বিমল রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়াছিল।

সিদ্ধার্থকে দূরে আসিতে দেখিয়া সে আপনমনেই বলিতে লাগিল,—সিদ্ধার্থবাবু আসছেন। বেচারা রোগা হয়ে গেছে। গরীব হওয়া কি আপদ বাবা, না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যেতে হয়। কাজের লোক ছিল আমার বাবা; গরীব হবার ভয় রেখে যায়নি। দাদা কথায় কথায় বলে, না পড়লে খাবি কি ক'রে? মনে হয়, মুখের ওপর বলে দি' তুমি যা ক'রে খাচ্ছো, আমিও তা-ই ক'রে খাবো। ওঁরা ভাবেন, আমি কিছু জানিনে, শর্মা সব জানে।—সিদ্ধার্থবাবু?

সিদ্ধার্থ ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতেছিল। এইমাত্র একটি পাওনাদার তাহাকে বড় অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; পাঠান কেবল ঘাড়ে হাত দেয় নাই।

বিমলের ডাকে ভাবনার মাঝে সে চমকিয়া উঠিল। বলিল,—হ্যাঁ, আমি। আমার নামটা মনে আছে দেখছি।

—না থাকাই বিচিত্র। যে-সব হাসির গল্প ক'রে গেছেন আপনি, তা নিয়ে এখনো আমাদের হাসাহাসি চলে। আসুন, দিদি ডাকছে।

—রজতবাবু কোথায়?

—গবেষণা করছেন।

—দিদি ডাকছেন, কে বললে?

—দিদি নিজে। জানালায় দাঁড়িয়েছিল; আপনাকে আসতে দেখে বললে,—সিদ্ধার্থ-বাবু আসছেন, ধরে নিয়ে আয়।

—চলো।

—আপনি উঠুন; আমি আসছি।

সিদ্ধার্থ থামিয়া থামিয়া উঠিতে লাগিল।

সিঁড়ির এক ধাপ যে ওঠে, আর একটু করিয়া দাঁড়ায়।

সংশয়াকুল অন্তরে তার তিলার্ধ স্বস্তি নাই।

নিজেকে মুহুর্মুহুঃ লক্ষ্য করিয়া মনটা তার যেমন অস্থির, দেহ তার তেমনি বিবশ।

•

অজয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াই ছিল।

সিদ্ধার্থ শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াই সম্মুখে যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া অপার বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

রৌদ্রে ঘরে ঢুকিতেই অজয়ার চুলের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহার পায়ের নীচে দীর্ঘ ছায়া ব্যথিত হৃদয়ের একটি ম্লান নিঃশব্দ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত লুটাইতেছে।

সিদ্ধার্থর মনে হইল, সাগর-গর্ভ হইতে উঠিবার সময় লক্ষ্মীর বরাঙ্গের উত্থিত অর্ধ সূর্যালোকে ঠিক এমনি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দেবতাগণ উল্লাসে বিস্ময়ে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁর একহস্তে ছিল সুধার কলসী, অন্য হস্তে—

অজয়া হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইল; বলিল,—এসেছেন? আপনার কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি। বসুন, আসছি।—বলিয়া সে অন্যঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু সিদ্ধার্থর বসিবার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই রহিল না। অজয়ার এই ভাবটি একেবারে নূতন—যেন শাসাইয়া রাখিয়া গেল।

তার কল্পনা-পক্ষী উড়িতেছিল, ত্রেতার সমুদ্র-মন্থনের উপর।

কিন্তু অজয়ার কথায় সে পাখা গুটাইয়া বর্তমানের সঙ্কীর্ণতম কোটরে প্রবেশ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অজয়া কি তার দাদাকে ডাকিতে গেল! সব কি ফাঁস হইয়া গেছে!

সিদ্ধার্থর মনোরথ এক মুহূর্তে পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া আসিল—কোথাকার বাতাস আসিয়া ধর্মের কল নড়াইয়া দিতে পারে। কিছুই ভাল করিয়া চোখে পড়িল না; তবু সিদ্ধার্থর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো।

কিন্তু অজয়া তার দাদাকে ডাকিতে যায় নাই। সে একখানা বই লইয়া আসিল। বইখানা সিদ্ধার্থরই।

বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া অজয়া বলিল,—আপনারই জিনিস। একদিন দৈবাৎ ফেলে গিয়েছিলেন। এর সঙ্গে আর একটা জিনিষও আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি।—বলিয়া অজয়া বইয়ের উপর যে জিনিষটি রাখিয়া দিলো, সিদ্ধার্থ তাহাকে খুব চেনে।

হৃদ্‌পিণ্ড ধড়ফড় করিয়া সে সেইদিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া রহিল।

অজয়া বলিল,—চেনেন নিশ্চয়ই কাগজখানাকে—আপনারই বেনামী হৃদয়োচ্ছ্বাস।

ভয়ে সিদ্ধার্থর মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

অজয়া বলিতে লাগিল,—এই গুপ্ত কথাটি অপরিচিতার কাছে ঘৃণ্য উপায়ে ব্যক্ত না ক'রে গোপন রাখলে দু'পক্ষেরই সম্ভ্রম রক্ষা হ'ত।

সিদ্ধার্থ কি বলিতে যাইতেছিল।

কিন্তু অজয়া তাহাকে পথ দিলো না। বলিল,—অস্বীকার করবেন না। অস্বীকার করলে কুকার্যের কটুত্ব বাড়ে বই কমে না।

অজয়ার কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনা নিশ্চয়ই ছিল—এবং তাহার সঙ্গে আরো কি একটা পদার্থ মিশিয়া ছিল, এত ভয় ছাপাইয়াও যাহা সিদ্ধার্থর কানে বড় মিষ্ট লাগিল। সিদ্ধার্থর বুক দুরুদুরু করিতেছিল—এত আয়োজন বুঝি ধর্মের সূক্ষ্মগতির কারচুপিতেই পণ্ড

হইয়া যায়। কিন্তু অজয়া ত' অপমানে রাগিয়া আগুন হইয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে আদেশ করিল না।

উপরন্তু এমন একটু স্বর যেন বাজিল—যাহা কৌতুকে স্নিগ্ধ, গোপন আনন্দে মধুময়। তখনই সিদ্ধার্থের ভয় কাটিয়া মনে হাসি ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু স্পষ্ট সে হাসিল না—হাসাটা উচিতও হয় না।

বলিল,—অস্বীকার আমি করছিনে, স্বীকারই করছি।—তারপর চোখ নামাইয়া বলিল,—কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, তখন আমি প্রকৃতই উন্মাদ, আর মৃত্যুকামী। আমিও মর্মপীড়া কম ভোগ করিনি।

—উন্মত্ত অবস্থাটা কতদিন স্থায়ী হয়েছিল তা আপনিই জানেন। সুস্থ হলে কেন স্বীকার করেননি ? ধরা প'ড়ে মর্মপীড়া দেখালে তাকে মেনে নিতে পারিনে।

—কিন্তু যা লিখেছিলাম তা অনাবিল সত্য। মরতে উদ্যত হয়েও আপনাকে দেখেই আমি মরতে পারিনি।—বলিয়াই নিজেকে অতিশয় সঙ্কটে পতিত মনে করিয়া সিদ্ধার্থ অস্থির হইয়া উঠিল—না জানি অদৃষ্টে কি আছে! তার কথাগুলি যেন প্রণয়োক্তি—আর, সুস্পষ্ট প্রণয়-নিবেদনের প্রান্তে আনিয়া যেন তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

ইহার পর মাত্র দু'টি কি তিনটি প্রশ্ন—এবং তারপরই একেবারেই খোলাখুলি বলা—আমি তোমায় তখনই ভালবেসেছিলাম। কিন্তু অজয়ার ঠিক চোখের সম্মুখে বসিয়া সিদ্ধার্থের ক্ষুদ্র হৃদয় সহসা অতটা ভরিয়া উঠিতে ভয়ে দিশেহারা হইয়া গেল।

অজয়া তাহার বিপন্ন মূর্তির দিকে যেন কেমন করিয়া চাহিয়া ছিল।

সিদ্ধার্থ খানিক নীরব থাকিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল,—আমি বড় কদর্য আর নির্বোধ ; অপ্রয়োজনের কাজেই আমি চিরদিন কাটিয়ে এসেছি। আমায় মাপ করুন। মুহূর্তের ভুলে—

অজয়াও বিপদে পড়িয়াছিল। সমগ্র ব্যাপারটা সিদ্ধার্থের কাতরতার জন্যেই হঠাৎ একটি কথায় তুচ্ছ করিয়া তোলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তার ইচ্ছা নয় সে আর কষ্ট পায়।

সিদ্ধার্থ আর অজয়া উভয়কেই আসান দিলো ননী ; সে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া দাঁড়াইল, —কি হচ্ছে দু'টিতে ?

অজয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাসিয়া বলিল,—ননি, তোর কথাই ঠিক। তোড়া সিদ্ধার্থবাবুই পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য মুহূর্তের ভুলে। তারপর মর্মপীড়ায় খুব ভুগেছেন। বসুন, চা ক'রে আনি।

অজয়া ও ননী চলিয়া যাইতেই সিদ্ধার্থের যে অবস্থা ঘটিল তাহার সংক্ষিপ্ত কোনো বর্ণনা নাই।

তাহার মনে হইতে লাগিল, আকাশ নিংড়াইয়া সে এখন তার নিবিড়তম জ্যোতিঃ-বিন্দুটির মালিক ; আর, সমুদ্র নিংড়াইয়া সে এখন তার গাঢ়তম সুধানির্যাসের অধি-কারী। মোট কথা, ব্রহ্মাণ্ডের সারাংশ এখন তার।

সঙ্কটে আশাতীতভাবে উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধার্থের যতটা উল্লাস ঘটিয়াছে, ননীর প্রশ্নে ঘটিয়াছে তার চতুর্গুণ। তিনটি শব্দে তৈরী একটি প্রশ্নে ননী সারাপ্রাণে এ কি অনির্বচনীয় অমৃত-স্রোত বইয়ে দিয়ে গেল—আর দু'টি নরনারীকে চিরন্তন মিলনের

কোলে তুলে দিয়ে গেল তিনটি শব্দের মালায় গেঁথে। দু'টি প্রাণ যে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কেবল একটিমাত্র সাক্ষী একটি নারী।

সে পুলকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে,—কি হচ্ছে দুটিতে ?

সিদ্ধার্থ প্রাণসংশয়কর জবাবদিহির মধ্যে পড়িয়াছিল ; ঐ প্রশ্নটি বিষঘ্ন মন্ত্রের কাজ করিয়াছে ; কিন্তু অকৃতজ্ঞ সিদ্ধার্থর মনে হইল,—ফুলটিকে কেন ফুটেছিস জিজ্ঞাসা করার মত এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। তার অর্থ নেই—শুধু চোখে চোখে চেয়ে দু'জনারই মুখে ফুটে উঠবে ধ্রুবতারার মত দীপ্ত, বুকে আর ধরে না এমনি উদ্বেলিত প্রেমের ঢ'লে-পড়া উৎসের মত একটুখানি হাসি। প্রেমবিহ্বল দু'টি নরনারীর অশ্রান্ত অফুরন্ত কূজনের মাঝখানে সেই একই সুরে বাঁধা কৌতুকময়ী সখীর স্মিত প্রশ্ন—কি হচ্ছে দুটিতে ?

সিদ্ধার্থ ভাবিল, প্রশ্নটি আশু ভবিষ্যতের শুভ-সূচনা—আত্মায় আত্মায় আলিংগনের উপর কল্যাণীর আশিস-স্পর্শ।

সেইদিনই—কিন্তু স্থানান্তরে, রজত বিরক্ত বোধ করিতেছিল ; বলিল,—আজ বারান্দায় চায়ের আয়োজন হ'ল কি সুবিধে ভেবে, আমি সেই কথাটা খুব ভাবছি, অজয়া।

—অসুবিধে কি হয়েছে তা বলো।

—আমার অসুবিধেটা তোমার চোখে পড়ল না এটা একটা নতুন কথা বটে, কিন্তু এ নতুনে মনোহারিত্ব নেই।—বলিয়া রজত মুখ কটু করিল।

—তুমিই ব'লে থাকো, রোজকার বাঁধা-কাজের অতিরিক্ত কাজ মাঝে মাঝে করা উচিত, তাতে মানুষ কর্মঠ আর সপ্রতিভ হয়। কিন্তু আমরা কাজ করিনে, আমরা করি সেবা ; তোমাদের অভ্যাসগুলোকে আদর দিয়ে চলি। অভ্যাসের বাইরে গিয়ে পড়লে কেমন লাগে তার আস্বাদ মাঝে মাঝে পেলে উপকার হয়—তাতে পুরুষের ধৈর্য বাড়ে।

—কিন্তু ধৈর্য জিনিসটা স্থিতিস্থাপক, বাড়ালে সে বাড়ে, কিন্তু প্রাণপণ টান থাকে তার ভেতরের যে অবস্থান-কেন্দ্রটিকে সে ছেড়ে এসেছে তারই দিকে। বেশী বাড়ালে ছিঁড়ে যায় তারও দৃষ্টান্ত আছে।

অজয়া হাসিয়া বলিল,—একটা গানের জন্যে এত কথা ! বড় সৃষ্টিছাড়া বদ্-অভ্যাস করেছি কিন্তু।

—তা মানি। কে যেন বলেছেন, দুষ্মন্ত প্রথমটা বুঝতেই পারেন নি, তিনি একা শকুন্তলাকে ভালোবেসেছেন, কি সখি দুটি সমেত যে শকুন্তলা, তাকে ভালবেসেছেন। আমিও জানিনে, আমি শুধু চা ভালবাসি, কি সুরের আর স্বাদের সম্মিলনের ফলে যে আরামটি উৎপন্ন হয় তাকে ভালবাসি। কিন্তু তোমরা তা বোঝো না—ভাবো, সবই বুঝি ভারতছাড়া কাণ্ড ! মহাভারতেও—

সিদ্ধার্থ বলিল,—এ-সবের উল্লেখ নেই।

—ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর কোনো কবির প্রক্ষিপ্ত বাক্য ব'লে সে-অংশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

—কিন্তু অনিষ্টের মূল আমি।

—কারণ ?

—স্থান-নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়েছিল আমার ওপর।—বলিয়া সিদ্ধার্থ পুলক অনুভব করিতে লাগিল। কথা-কাটাকাটিতে সে আর অজয়া একদিকে।

রজত বলিল,—অবিলম্বে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

—চলুন।

সবাই উঠিয়া পড়িল। সর্বাগ্রে রজত, তার পশ্চাতে অজয়া এবং তার পশ্চাতে সিদ্ধার্থ।

কিন্তু দু'তিন পা অগ্রসর না হইতেই সিদ্ধার্থ অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূপাতিত হইল। এবং পরক্ষণেই ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিল।

অজয়া "দাদা" বলিয়া যে ডাকটা দিলো তাহাকে আর্তনাদ বলা চলে। ননী কাছাকাছি ছিল; সে পাখা আনিতে ছুটিয়া গেল। এবং সে মানিক ও মদনকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া সিদ্ধার্থর নিকটবর্তী হইতেই অজয়া তাহার হাত হইতে পাখা টানিয়া লইয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতে লাগিয়া গেল।

কিন্তু সিদ্ধার্থর অচৈতন্য অত ত্বরিতে ভাঙিল না।

স্মেলিং সল্টের শিশি আনিতে ননী পুনরায় ছুটিয়া গেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না। মদন আর মাণিক কি করিবে আদেশের অভাবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া দিশেহারা হইয়া আছে। বরফের কথাটা রজতের মনে আসিয়াও আসিতেছে না।

এমন সময় সিদ্ধার্থর মাথায় হাওয়া লাগিতে সে ধীরে ধীরে চোখ খুলিল, এবং তখনই আবার চোখ বুজিয়া চরম ক্লান্তস্বরে বলিল,—আমি কোথায়? অজয়া—

বলিয়া দ্বিতীয়বার চোখ খুলিয়া সিদ্ধার্থ একটু উঠিবার চেষ্টা করিল।

অজয়া পাখা থামাইয়া বলিল,—উঠবেন না; যেমন আছেন তেমনি থাকুন। একটু সুস্থ বোধ করছেন?

সিদ্ধার্থ যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া বলিল,—করছি।

রজত বলিল,—কথা বলিও না। স্নায়বিক-দৌর্বল্য; একটু বিশ্রাম করলেই ভাল হয়ে উঠবেন। ধরে উঠিয়ে চেয়ারে নিয়ে বসাও। (মাণিকের প্রতি) দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিস?

অকারণে ধমক খাইয়া মাণিক তাড়াতাড়ি যাইয়া সিদ্ধার্থর এক ডানা ধরিল। সিদ্ধার্থ চোখ আবার বন্ধ করিয়াছিল। রজত তার অপর ডানা ধরিল; বলিল,—আপনাকে নিয়ে চেয়ারে বসাবো; উঠুন ত' আস্তে আস্তে।—বলিয়া মানিকের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে সিদ্ধার্থকে তুলিয়া লইয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলো।

ননী স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু স্মেলিং সল্ট কাহারো নাকে লাগাইবার দরকার হইল না।

অজয়া বলিল,—ননি, খানিকটা দুধ গরম করে নিয়ে আয়, শীগ্‌গির। দেরী করিস নে।—তারপর সিদ্ধার্থকে বলিল,—মাথা এখনো ঘুরছে?

সিদ্ধার্থর তখনকার লজ্জা আর সঙ্কোচ দেখিবার জিনিষ; বলিল,—সামান্য। আপনারা আর ব্যস্ত হবেন না—ক্রমশ কমে আসছে।—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আমি যাই, আপনাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছি, উপদ্রব করেছি, আর নয়।—তারপর সিদ্ধার্থ ঠোঁটের কোণ মুচড়াইয়া একটু হাসিল—এমনি করিয়া যেন তার সর্বান্তঃকরণ ক্ষমা চাহিয়া চাহিয়া উহাদের পায়ে লুটাইতেছে।

কিন্তু অজয়া রাগিয়া একেবারে খুন হইয়া গেল; বলিল,—আপনি আমাদের রক্ত-মাংসের মানুষ মনে করেন, না রাক্ষস মনে করেন? যাই ব'লে উঠে দাঁড়ালেই যেতে পারবেন ভেবেছেন?—বলিতে বলিতে রাগে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অজয়া দুধের তাগিদ দিতে গেছে।

রজত বলিল,—দুধটুকু অক্লেশেই খেয়ে ফেলতে পারবেন ; গরম গরম পেটে গেলে সংগে সংগে উপকার হবে। তারপর আপনি কিঞ্চিৎ সবল বোধ করলে গুটিকতক কথা জানতে চাইবো, দয়া ক'রে আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ আবার আসনগ্রহণ করিল।

দিব্য ঝকঝকে কাচের গ্লাসে করিয়া অজয়া আধসের-টাক্ ধূমায়মান দুগ্ধ লইয়া আসিল।

কিন্তু তৎপূর্বেই সিদ্ধার্থ পনের আনা সবল হইয়া উঠিয়াছে। রজতের গুটিকতক কথা কিসের সম্পর্কে হঠাৎ এখন জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান-সূত্রে সিদ্ধার্থর জানা হইয়া গেছে, এবং তাহাতেই রক্ত উষ্ণ হইয়া ধমনীর বেগ বাড়িয়াও যেটুকু দুর্বলতার আভাস ছিল তাহাও দূর হইয়া গেল অজয়ার আসায়।

রজতের জিজ্ঞাসার উত্তর সে অজয়ার সম্মুখেই দিতে পারিবে।

বলিল,—গুটিকতক কথা বলবার মত জোর আমি পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করুন।

বলিয়া দুধটুকু সে চোঁ চোঁ করিয়া প্রায় এক চুমুকে শেষ করিয়া আনিল।

রজত বলিল,—আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়টি জানবার প্রয়োজন হয়েছে। অশিষ্টতা মার্জনা করবেন।

—আমার নাম কি তা জানেন। পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। নিবাস হেমন্তপুর, জেলা হুগলি। পিতৃদেব লাহোরে চাকরী করতেন—সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ; আমি তখন মাতৃগর্ভে। পিতা উপার্জন করতেন যথেষ্ট ; কিন্তু পরে শুনেছি তাঁর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হ'ত দানে। শৈশবটা কিভাবে কেটেছিল জানিনে। যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেবার মত বয়স হ'ল, তখন আমি ইস্কুলের অবৈতনিক ছাত্র। বৃত্তির টাকার জোরে এম. এ. পর্যন্ত উঠে হঠাৎ একদিন মনে হ'ল—কিসের আশায় এই পণ্ডশ্রম ক'রে মরছি ? পিতা নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব ক'রে দান ক'রে গেছেন—আমার দান করবার মত আছে শুধু বলিষ্ঠ এই দেহখানা। দেশের আর দশের কাজে দেহপাত করবো ব'লে বেরিয়ে এসে দেখি—

কি দেখিয়াছিল কে জানে ; কিন্তু বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। এবং রজতদের মনে হইল, তাহার দৃষ্টি যেন তাহাদের ডিঙাইয়া, ঘর ডিঙাইয়া, বাড়ি ডিঙাইয়া, সহর ডিঙাইয়া সর্বহারা কাঙালের মত পৃথিবীর দুয়ারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

দৃষ্টি এমনি করুণ।

অজয়া বলিল,—কি দেখলেন ?

—দেখলাম ভুল করিনি। দেশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত—এমন একটি ক্ষেত্র নাই যেখানে খণ্ডগুলি একত্র হয়ে সংহতি লাভ করতে পারে। মুসলমানদের দেশ নাই, কিন্তু ধর্ম আছে। খৃষ্টানের ধর্ম নাই, কিন্তু দেশ আছে। তারা তারই ওপর সঙ্ঘবদ্ধ। কিন্তু আমাদের না আছে ধর্মের ক্ষেত্র, না আছে দেশপ্রীতি—তাই আমরা শতধা-বিচ্ছিন্ন। আর প্রত্যেকটি বিভিন্ন অংশ ব্যাধি আর দৈন্যের জঠরে জীর্ণ হচ্ছে। কাজে লাগলাম। কিন্তু ব্যথা দু'হাতে কাজের দিকে ঠেলতে থাকলেও শ্রান্তি আসবেই। তখনই মনে হ'ত গৃহের কথা। আমার গৃহ নেই, কিন্তু গৃহেই মানুষের বন্ধনদশা আর মুক্তিসাধনা একসংগেই ঘটে। কর্মের মাধুর্যের সেইখানেই বিকাশ। গৃহ থেকেই শ্রান্ত দেহ-মনকে সুস্থ ক'রে

নিয়ে মানুষ আবার বাইরে আসে। দেনা-পাওনার এই দাবী যার কাছে আসে না, সে হয় দেবতা, না হয় পাষাণ। মনের এম্‌নি আতুর অবসন্ন অবস্থায় আপনাদের সংগে পাহাড়ে দেখা।

—আপনাদের দেশের বাড়ী ?

—শূন্য। মন জুড়োবার স্থান সে নয়।—বলিয়া সিদ্ধার্থ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিজের উপর সিদ্ধার্থের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধাও নাই। এইদিক দিয়া সে অত্যন্ত দুর্বল। এই সব অনুসন্ধানের অবতারণা যে কিসের সূত্রপাত, কোন্ দিকে ইহার লক্ষ্য, তাহা সে বুঝিয়াছে। ভাই-বোনে কি কথা হইয়াছে, কিম্বা আদৌ হইয়াছে কি না তাহা সে জানে না। কিন্তু একটা গুরুতর ভাগ্য-বিপর্যয় যে আসন্ন তাহা নিঃসংশয়ে জানিয়া অন্তরের উদ্বেলিত উল্লাস পাছে ইহাদের সম্মুখেই তাহার মুখে-চোখে উথলিয়া উঠিয়া তাহাকে বিপদে ফেলে এই ভয়েই সে যাই-যাই করিতেছিল—এটা পরীক্ষাও বটে।

সিদ্ধার্থের হঠাৎ মনে হইল, তাহাকেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া কে যেন জাল ফেলিয়া বেড়াইতেছে। সুবিমল হ্রদে তার বাস, কি পঙ্ক-কুণ্ডে। জালে জড়াইয়া উঠিলেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বলিল,—আজকের মত আমায় ছুটি দিন।

রজত বলিল,—দিলাম ছুটি। কিন্তু আমার চা মাটি করেছেন, ভুলে যাবেন না যেন।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—আপনিও যেন ভুলে যাবেন না, আমি আপনার চা মাটি করেছি।—বলিয়া স্মিতমুখে উভয়কে নমস্কার করিয়া সিদ্ধার্থ বাহির হইয়া আসিল।

এবং রাস্তায় চলিতে চলিতে তার মনে হইতে লাগিল, যে সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় তার সর্বংসহা প্রকৃতি এতদিন আহার-নিদ্রা-প্রীতি-গৃহ-বঞ্চিত হইয়াও একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে নাই, তাহারই আভাস যেন পথচারী প্রত্যেকটি নরনারীর মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এদিকে যা ঘটিতে লাগিল তাহাও সিদ্ধার্থ-সম্পর্কীয়।

অজয়া খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—দাদা—

বলিয়াই সে চুপ করিল; কিন্তু তার সলজ্জ সম্বোধনটি অর্থালঙ্কারে এমন সুসজ্জিত, আর এমন অনুরোধে প্রার্থনায় পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিলো যে, স্থূলদর্শী রজত তাহাতে কেবল বিস্মিতই হইল না, শব্দাতিরিক্ত অর্থটারই সে জবাব দিলো; বলিল,—বুঝেছি, কিন্তু সব জিনিষেরই ত' নকল আছে, দিদি! সোনা যে এমন ধাতু তাকেও মানুষ নকল ক'রে চালাচ্ছে—ধরবার যো-টি নেই।

—তুমি কি বলতে চাও সিদ্ধার্থবাবু নকল মানুষ!

—বলতে চাইনে কিছুই; যাচাই ক'রে নিতে চাই। টাকাটা হাতে নিয়ে বাজিয়ে তবে পকেটে ফেলি; যে তা করে না সে ঠকে। শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ বসু সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি!

শুনিয়া অজয়া আশ্চর্য নয়, হতাশ নয়, ক্ষুণ্ণ হইল—দাদার স্থূলদৃষ্টি কেবল স্থূল-বস্তুর চাকচিক্য দেখে, তাহাকে অংগুলির আঘাতে শূন্যে আবর্তিত করিয়া সে সম্ভোগ করিতে চায়—আত্মার অনুভূতির নিগূঢ় সম্বন্ধ সে মানিতে জানে না।

বলিল,—পরিচয় ত' দিয়েছেন; ভেতরকার মানুষটিকে ত' চিনেছ।

রজত ঘাড় নাড়িতে লাগিল,—চিনিনি। তাঁর কথা শুনেছি, গান-গল্প-বিলাপ

শুনেছি, বক্তৃতা শুনেছি—এই পর্যন্ত। কিন্তু মানুষ ত' কথার সমষ্টি নয়। আর, যে বেশী কথা বলে তার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়—যেন ধুলো উড়িয়ে সে আসল জিনিষটাকে ঢাকছে।

অজয়া হাসিল ; বলিল,—বাইরে তোমার চরিত্রের খ্যাতিটা কি রকম ?

—আমি কি বেশী কথা বলি ? সেটা তোমার ভুল ধারণা। যা-ই হোক, তোমার সংগে এ বিষয়ে আলোচনা চলতেই পারে না ; পিসিমাকে ডাকতে হবে অথবা সুরেনকে।

—এখনই তাদের ডেকো না ; একেবারে খবরটা দিও।—বলিয়া অজয়া বাহির হইয়া গেল।

রজত চোখ বড় করিয়া মনে মনে বলিল,—বাপ্‌রে, একেবারে এতদূর !

এবং দুর্ভাবনায় তার এমন অস্থির বোধ হইতে লাগিল যেন একটা অতিশয় দুরূহ আত্ম-বলিদানের দিকে তাহাকে কে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু যাইতে তার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই।

সিদ্ধার্থকে রজত যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহাতে সন্দেহই নাই ; কিন্তু তার কারণটা ঠিক স্পষ্ট হইয়া ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নাই। রজতের মনে হয়, যেদিক দিয়াই দেখা যাক, সিদ্ধার্থের আত্মপ্রকাশ যেন অতিরঞ্জনে দূষিত ; আর, একটা তীক্ষ্ন চক্ষু এবং বক্রচঞ্চু অভিসন্ধি যেন সাবধানে ওৎ পাতিয়া আছে !

সিদ্ধার্থকে সে পরস্ব-লোলুপ মার্জার বলিয়া মনে মনে গাল দিয়া ভাবিতে লাগিল—এখন উপায় ? যে-রকম অজয়ার রকম, আর যে-রকম করিয়া "একেবারে খবরটা দিও" বলিয়া নির্ভয়ে গা-ঝাড়া দিয়া গেল তাহাতে যুক্তিতর্ক প্রভৃতি কোনো কাজে লাগিবে বলিয়া ভরসা নাই। অথচ আপ্‌শোষ এই যে, ভবিষ্যতে ফল খারাপ দাঁড়াইয়া গেলে তাহাকেও ভুগিতে হইবে। কাজেই রজতের মনে হইল, যাদের ভগিনী নাই তারা আছে ভাল।

## ॥ বার ॥

সিদ্ধার্থের চোখের সম্মুখে দিবারাত্র জ্বলজ্বল করে সন্ধ্যাকাশের যুগল তারকার মত অজয়ার চক্ষু দুটি। মূর্ছাভংগে চোখ মেলিয়াই সে দেখিয়াছিল, অজয়ার উৎকণ্ঠিত চক্ষু-দুটি যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তার চেতনাসঞ্চার নিরীক্ষণ করিতেছে।

চোখে চোখে মিলন হইয়াছিল। অজয়ার চোখের অতলে ছিল একটা বিন্দুবাসিনী দ্যুতি।

তারপর সিদ্ধার্থ চোখ বুজিয়াছিল, দৌর্বল্যবশত নহে, পুলকে। তার অবশ জিহ্বা জড়িতস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিল,—আমি কোথায় ? অজয়া—

কিন্তু আগাগোড়া তার অভিনয়। সিদ্ধার্থ ভাবে, মূর্ছা যাওয়া নিখুঁত হইয়াছিল, বেশ পড়িয়াছিলাম।

কিন্তু তার বিবেক যেন তপ্তস্পর্শে চম্‌কিয়া পিছাইয়া দাঁড়ায়। দেবতার শুচি-শুভ্র মন্দির—সেখানে শুধু পুষ্পচন্দনের স্থান—শোভা আর সৌরভ। সিদ্ধার্থের মনে হয়, সেখানে সে পায়ের কাদা ছিটাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

একে একে মনে পড়ে জীবনের কথা।

সে চোর, জারজ ; বেশ্যার দাসত্ব সে করিয়াছে।

যে-রত্ন আহরণ করিতে সে সিঁদকাঠি লইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার মত কুক্কুটের জন্য সে অপরূপ রত্নের সৃষ্টি হয় নাই।

জীবনের আরম্ভ মুদিখানায়। তার পূর্বে সে কোথায় ছিল কে জানে—

মুদিখানাটাই স্পষ্ট মনে পড়ে। সেখানে সে মুদির ভৃত্য ছিল। তামাক সাজিত, বাটখারা ধুইত, সকালে সন্ধ্যায় ঘরে ধুনা আর চৌকাঠে জলের ছিটা দিত ; ঝগড়া বিদ্রোহ করিত।

আর ভালো করিয়া মনে পড়ে, থিয়েটারের কথাটা।

মুদিখানা হইতে প্রোমোশন পাইয়া সে সখের থিয়েটারে আসে—একটি বাবুর অনুগ্রহে। তাহার কণ্ঠের সুরসম্বলিত শ্রীমতীর বিরহ-সংগীত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু তাহাকে মুদির নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যান।

মফঃস্বলের থিয়েটার। রাজকন্যার সখী সাজিয়া তাহাকে ঘাগ্‌রা ঘুরাইয়া নাচিতে হইত ; এবং প্রণয়াস্পদের জন্য ব্যাকুলা নায়িকাকে নাকি-সুরে প্রবোধ দিতে হইত, 'সখি, ভেবো না, সে আসবে, আসবে, আসবে।'

থিয়েটারের লোকগুলি নিজেদের গরজেই তাহার একটি মহদুপকার করিয়া ছাড়িয়া দিলো। তাহার উচ্চারণে গ্রাম্যদোষ থাকিত ; এবং সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য, অর্থাৎ ফুলকে যাহাতে ফুল্‌লো আর সে না বলে সেইজন্যই তাহাকে একটু 'তৈরী' করিয়া লইতে একখানি বর্ণ-পরিচয় কিনিয়া দিয়া তাহাকে পাঠ দিতে লাগিয়া গেল।

মেধা ছিল, আগ্রহও ছিল। খুশী হইয়া ম্যানেজারবাবু তাহাকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

লেখা-পড়ায় উন্নতি হইল ঢের, কিন্তু মনের ইতরতা ঘুচিল না।

অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বারাংগনার—

সিদ্ধার্থ এইখানে ব্যথায় মুখ বিকৃত করিয়া 'উঃ' বলিয়া একটা আর্তনাদই করিল।

সেই নরক !

তারপর সেই বৃদ্ধাকে হাসপাতালের ডোমের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাহারই পরিত্যক্ত অর্থ মূলধন করিয়া সে শুরু করিল ব্যবসা।

পাপের কড়ি প্রায়শ্চিত্তে গেল। নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত হইয়া সে হাটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সাক্ষাৎ হইয়া গেল সেই আসল সিদ্ধার্থ বসুর সংগে।

* * * সর্বত্যাগী মহাপুরুষ আর্তরক্ষায় একদিন জীবন দান করিল তাহারই চোখের সম্মুখে।

এখন তাহারই লাঠি আর নাম গ্রহণ করিয়া তাহারই কথা উচ্চারণ করিয়া সে বেড়াইতেছে। সিদ্ধার্থের ব্রতপরিচয় সহ জীবনের আদ্যন্ত কথা নটবরের জীবনকথায় রূপান্তরিত হইয়া গেছে। তারই ভূমিকা অভিনয় করিয়া সে মুগ্ধ করিয়াছে একটি নারীকে।

আর একবার আর একটি নারীকে সে মুগ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে প্রাণ জুড়ায় নাই—সেই ক্ষিপ্ততার স্মৃতি এখন কটু হইয়া উঠিয়াছে।

ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপাতকের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

কিন্তু আজ অবৈধতার বাধা নাই। সে আজ বৈকুণ্ঠের অধিবাসী।

মন খোলসা হইয়া সিদ্ধার্থ ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিতে লাগিল।

মনে হইল, পৃথিবীর স্পর্শপ্রভাবের সে অতীত।

মূর্ছাভঙ্গে অজয়ার চোখে যে-নির্নিমেষ চাহনিটা দেখিয়াছিল, সিদ্ধার্থর মনে হইল, সেই চাহনির ভিতরেই অনঙ্গ দেবতার অরুণ নেত্র ফুটিয়া ছিল, এবং তাহারই রক্তরশ্মি যেন তাহাকে রথে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই পৃথিবীর সাধারণ লোকের মত নিজেকে এতক্ষণ অতিশয় বিবেক-বিব্রত মনে করায় সিদ্ধার্থ মনে মনে খুব হাসিতেছে, এমন সময় তাহার বন্ধ দুয়ারের উপর ভীষণ শব্দে করাঘাত পড়িল।

—কে ?

প্রশ্নটা যেন একটা ঝটিকাবর্ত। এমনি করিয়া সে সিদ্ধার্থর সুখের চূর্ণ প্রাসাদটিকে মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাহির হইতে আওয়াজ আসিল,—পাওনাদার।

সিদ্ধার্থর কানের ভিতর ঝমঝম করিতেছিল, বলিল,—ভেতরে আসুন।

আসিল রাসবিহারী। এবং আসিয়াই খলখল করিয়া হাসিতে লাগিল ; বলিল,—আমি গো, মাত্তর রাসবিহারী, তোমার বন্ধু আর অনুগ্রহপ্রার্থী।

কিন্তু সিদ্ধার্থর মনে হইল, তাহার বন্ধু এবং অনুগ্রহপ্রার্থী রাসবিহারী বর্শায় বিদ্ধ করিয়া তাহাকে তাহার নিজের বায়ু আকাশ হইতে নামাইয়া, যেখানে সে বাঁচিতে পারে না, সেই উষ্ণ বাষ্পের ভিতর টানিয়া আনিয়াছে।

সিদ্ধার্থ কথা কহে না দেখিয়া রাসবিহারী বলিল,—বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি এখনো ? দেবরাজও আসছে—

সিদ্ধার্থ বলিল,—সেদিন তোমায় আমি অপমান ক'রেই বিদায় করেছিলাম। তুমি রাগ ক'রেও আমায় ত্যাগ করছ না কেন, রাসবিহারী ?

—কমলি, কমলি—সে কি অল্পে ছাড়ে ? সেদিন বড় দুঃখিত মনেই ফিরেছিলাম, কিন্তু তুমি যে আমার পুরাতন বন্ধু, ভাই ? তোমায় কি আমি একটি দিনের একটি কথায় ত্যাগ করতে পারি ?

দেবরাজ রাসবিহারীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; বলিল,—যে জন্য আসা সে কথাটা—

—বলছি, আগে বসি।

রাসবিহারী বসিয়া বলিতে লাগিল,—মামলা রুজু করতে চাই, সিদ্ধার্থবাবু। এখন তোমার সহৃদয় অনুমতি পেলেই শুভ দেখে একটা দিন ঠিক ক'রে ফেলি।

—আমি যদি দাসখতের টাকা দিতে অঙ্গীকার করি—

শুনিয়া রাসবিহারীর চোখ কপালে উঠিয়া গেল না—একটু বড় হইল। বলিল,—এক মিনিট সময় দাও ! সেদিন ভেবেছিলাম তোমার মন খারাপ ; এখন দেখছি, তোমার মন ওলট-পালট হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থবাবু, তুমি বলছ কি !

—বলছি এই, যদি টাকাটা দিয়ে দিতে অঙ্গীকার করি, তাহলে তাকে ক্ষমা করবে ?

—কাকে ?

—যার সর্বনাশ করবে ব'লে কোমর বেঁধেছ !

—সর্বনাশ করবো ব'লে কোমর বেঁধেছি যদি জানো তবে টাকা দেখাচ্ছ কেন ? টাকা আমার ঢের আছে—ব'য়ে ব'য়ে টাক পড়ে গেছে। আর তুমি যে টাকার কথা শোনাচ্ছ সে-টাকা কাকে রাজা ক'রে দিয়ে বখ্শিস পেয়েছ, শুনি ?

দেবরাজ বলিল,—সুর এক লম্ফেই যে সপ্তমে চ'ড়ে গেল !

সিদ্ধার্থর কাতর মুখ দেখিয়া তাহার মমতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু রাসবিহারী মর্মাহত হইয়া গলা চড়াইয়া দিলো,—দেখো লোকটার কৃতঘ্নতা !—তারপর সে সিদ্ধার্থর দিকে ফিরিল,—অনাহারে শুকিয়ে যখন মরছিলে তখন ধর্ম তোমায় রাখেনি, ধর্মাবতার। এই পাপাত্মার অধর্মের পয়সাই তখন তোমায় বাঁচিয়েছিল।

—নিজের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। তবু সেই দানের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ছাড়া মনের আরো অনেক বৃত্তি আছে যা আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

রাসবিহারী ঘাড় বাঁকাইল,—চাইওনে বুঝতে। যা পারো তাই তোমায় করতে বলছি।

সিদ্ধার্থর প্রাণ ছলছল করিতে লাগিল। সে কায়মনোবাক্যে সংশোধিত হইয়া খোলস ছাড়িতে চায়, সেইক্ষণটি তার এখন উপস্থিত—যে-ক্ষণটি মানুষের জীবনে বিদ্যুতের মত একবার চকিতে দেখা দেয়—তাহারই আলোক যে ধরিয়া রাখিতে পারে জীবনে তার আলোর অভাব ঘটে না। কিন্তু তাহার সংগে গ্রথিত রহিয়াছে দুষ্কৃতির সূত্রে আর স্মৃতিতে আরো বহু লোক, আর এই রাসবিহারী।

স্মৃতিকে সে সরাইয়া রাখিয়াছে। অনুভূতির পরিধি তার সুসংস্কৃত হইয়া ব্যাপক হইয়া গেছে। কেবল রাসবিহারীই পুনঃপুনঃ দেখা দিয়া তাহাকে মনে করাইয়া দিতেছে যে, পৃথিবীর কোনো রূপান্তর ঘটে নাই। কণ্টকবনের পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ পথে সে সেই মানুষই আছে।

সিদ্ধার্থ হঠাৎ যেন অজ্ঞান হইয়া গেল।

হেঁট হইয়া রাসবিহারীর পা সে ছুঁইয়া ফেলিল। বলিল,—তোমার পায়ে ধ'রে কিছু-দিনের সময় চাইছি ; অন্তত দুটি মাস আর অপেক্ষা করো।

রাসবিহারী সিদ্ধার্থর হাতের নাগালের বাহিরে সরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাগে তার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতেছিল ; বলিল,—না হয় করা গেল, কিন্তু তার পরে ?

—ঋণ পরিশোধ করবো।

—কিন্তু ঋণ পরিশোধের তাগিদ এ ত' নয়।

—নয় নয়, তা-ই। কৃতজ্ঞতার ঋণ। ঐ কথাটা শোনাতে না পারলে সাধ্য কি তোমার যে আমার গলায় হাত দাও ! সময় দিলে ত' ?

—দিলাম, বড় অনিচ্ছার সংগেই দিলাম। কিন্তু উড়ো না যেন। একবার কিছুদিন তোমায় খুঁজে পাইনি।

—আমার ঐ সঙ্কোচটুকু আছে ব'লেই টাকা তোমার নিরাপদ, তা তুমি জানো।

—জানি। একটা কথা মনে রাখতে তোমায় ব'লে যাই—কলিতে ধর্ম নাই। নিজের কাজ বাজিয়ে নাও—এই কলির একমাত্র ধর্ম।

রাসবিহারীরা চলিয়া গেলে সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ভাবিতে পারিল না—

ভাবনা যেন দানাই বাঁধিল না। তারপর অল্পে অল্পে কাজ সুরু হইল—রাসবিহারীর সদুপদেশটা সে ভাবিয়া দেখিল, এবং বুঝিল ঠিকই। শূন্য উদরে ধর্মের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়ানো নির্বোধের কাজ, আত্মঘাতীর কাজ। আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবারও অধিকার কাহারও নাই—তাহারও নাই। কে কবে পরের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের প্রাপ্য কপর্দক ত্যাগ করিয়াছে! কথকের মুখে শোনা গেছে, শত্রুভাবেও ভগবানকে লাভ করা যায়। সে-ও অধর্ম; তবে অধর্ম ঘৃণ্য কিসে? ভগবানকে সে চায় না—সে চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে—একটি সুমধুর সুস্থ নারী-হৃদয় জয় ক'রে সেখানে নির্বিঘ্নে সিংহাসন স্থাপিত করতে। রাসবিহারীই যথার্থ বন্ধু—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একটি কথায় বিবেকের বিদ্রোহ দমন করিয়া দিয়া গেছে।

সুতরাং রাসবিহারীর ঋণ সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

দু'-দশ মিনিট পূর্বেই যে রাসবিহারীকে সিদ্ধার্থ পরম শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে নাই, সে-ই এখন তার পরম মিত্র হইয়া উঠিল।

মানুষ কেবল নিজের ব্যগ্রতায় ডিগ্‌বাজি খাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে তা জানে না। মনে করে, পৃথিবীরই রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। বিস্ময়ে সে অবাক হইয়া যায়।

## ॥ তের ॥

স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে দিশা না পাইয়া রজত তাহার পিসিমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

আলোচনা-বৈঠকে বসিয়া রজত প্রথমেই বলিল,—পাহাড়ে বাঘ-ভালুক আছে—সুখে থাক তারা, মানুষের সামনে এসে পড়লে তারাও বিপদ গণে, তাদের ওপর গুলি-চালানো যায়। আর একটা মস্ত সুবিধে, তারা এসে জাঁকিয়ে বসে আত্মকাহিনী মুখস্থ বলে না। যারা তা বলে, তাদের ওপর গুলি চালানো যায় না, এ-হিসাবে বাঘ-ভালুকই বেশী নিরাপদ দেখছি। কি করা যায়, পিসীমা?

বিমলের মা বলিলেন,—যা-ই করো, গুলি চালালে গোল মিটবে না।

—আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে। অজয়ার সুখের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যাপার বড় জটিল হয়েই উঠেছে—যে আকর্ষণের প্রভাবের মধ্যে গিয়ে সে পড়েছে, সেখান থেকে টেনে আনলে সে ছিঁড়ে আসবে।

—এতদূর এগিয়ে গেছে?

—সম্ভবত এক নিমেষেই, প্রথম দর্শনেই।

ঐ 'প্রথম দর্শন' কথাটা পিসিমার বড় বিস্বাদ লাগিল। তাঁহার বিবাহের প্রাক্কালে বরপক্ষীয় প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষের এক গুরুজন যাইয়া পাত্রকে একেবারেই আশীর্বাদ করিয়া কথা পাকা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের 'প্রথম দর্শন' ঘটিয়াছিল শুভদৃষ্টির সময়—কিন্তু তখন যে কি ঘটিয়াছিল তাহা তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠানটি বিবাহের অপরিহার্য অংগ বলিয়া হইয়াছিল নিশ্চয়ই—এইরূপ একটা অ-স্বচ্ছ ধারণা তাঁর আছে।

কাজেই প্রথম দর্শনেই মূল হইতে ডগা পর্যন্ত প্রেমে পড়িবার দৃষ্টান্ত চোখের

সম্মুখে দেখিয়া তিনি মনে মনে চটিয়া গেলেন। ভাবিলেন, সবাই বাড়াবাড়ি। শিক্ষাপ্রাপ্তা বলিয়া আধুনিক সুন্দরীরা যত আড়ম্বরই করুক, হৃদয় সম্পর্কে সেই আদি নারীর চাইতে তিলমাত্র উন্নতি তাদের হয় নাই। একবার টলিলেই গড়াইতে সুরু করিয়া দিবে। বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইয়া এমন হুঁশটুকু রহিবে না যে, পড়াইয়া সে রসাতলেও পড়িতে পারে।

প্রকাশ্যে বলিলেন,—অজয়াকে বুঝিয়ে বলেছ ?

—কে ? আমি ? তর্কে আমি তার সংগে কোনোদিন পারিনে। আর, বোঝাবই বা কি ! তারপর দেখো দৈবের সূক্ষ্মগতি—ক্রমশ দেখা গেল, দু'জনার আশ্চর্য রকম মতের মিল, দেশোদ্ধারের পতিতপাবনী নেশা ! তারপর চূড়ান্ত হয়ে গেল মূর্ছায়।

—কি রকম ?

—চা খেয়ে তিনজনে চ'লে আসছি—আগে আমি, তারপরে অজয়া, সকলের পিছনে সিদ্ধার্থবাবু। দু'-এক পা এসেই সিদ্ধার্থবাবু ছিন্নমূল কদলী-কাণ্ডের মত হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল তখন তিনি চোখ মেলেই বললেন,—আমি কোথায় ? অজয়া— ব'লেই তিনি এমনভাবে চোখ বুজে ফেললেন যেন তাঁর বুকের বোঝা নেমে গেছে।

শুনিয়া পিসিমার মনে, রজতের কথার বক্রসুরের সূত্র ধরিয়া, আশ্চর্য একটা অন্তর্দৃষ্টির উদয় হইয়া গেল। বলিলেন,—ঐ মূর্ছার ব্যাপারটা আমার সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, রজত। তার পরই মনের আর অন্তরাল রইল না। যদি মূর্ছা ভান হয় তবে সে ধূর্ত বটে।

—ভান না হয়ে যায় না—কোথাও কিছু নেই, পরিষ্কার সুস্থ মানুষ, বারাণসীর ষাঁড়ের মত ষণ্ডা বপুখানা ; তার মূর্ছা কি খামকাই হয় ! মানে এই যে, জ্ঞান হয়েই ধোঁয়াটে মাথায় তোমার নামটি সর্বাগ্রে এসেছে, অতএব জানো যে, আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত। তোমার দাদাও অকুস্থলে উপস্থিত—তাঁকেও সে-খবরটা এই সংগেই দিয়ে গেলাম। আপত্তি থাকে ত', সেটাও স্পষ্ট করে জানাবারও এই-ই সুযোগ।

পিসিমা খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—প্রথমত অর্থ ঐ। দ্বিতীয় অর্থ, সে যথার্থ ভালবাসে না। বাসলেও, যে কারণেই হোক, নিজেকে সে অযোগ্য মনে করে ; অথবা দুনিয়ার সংগে তার পরিচয় ডুবে ডুবে। কাজেই মুখোমুখি নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার সাহস তার নেই। কিন্তু একথাও বলতে হবে, তার মূর্ছা ভান ব'লে আমরা অনুমান ক'রে নিয়েছি। যদি লোক ভাল হ'ত—

অজয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কথোপকথনের কতটা তার কানে গিয়াছে তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তার মুখখানা যেন থম্‌থম্‌ করিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া মন্ত্রণাসভার উভয় সদস্যই থমকিয়া গেলেন। মুখে বলা না হইলেও, পিসিমা ও রজত দু'জনেই মনে মনে জানিতেন যে, তাঁহাদের এই কথাবার্তা গোপন কথাই। অজয়াকে লুকাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরে তাহাকে অনুরোধ করিয়া নিরস্ত করিতে হইবে, অথবা সম্মতি দিয়া উৎসবে ব্যাপৃত হইতে হইবে। কিন্তু একটা অনুমানকে ভিত্তি করিয়া এত বড় সত্যকার গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে যাওয়া যে শুধু অশোভন নয় অসংগতও, সেই কথাটাই অজয়াকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে পড়িয়া গেল।

অজয়া বলিল,—পিসিমা, রায় ত' দিয়ে বসলে ; কিন্তু তার আগে অপর পক্ষের বক্তব্যটা তোমার শোনা উচিত ছিল। বিচারে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটছে যে !

কিন্তু পিসিমা মেয়েমানুষ।

কথার মোড় ঘুরাইয়া লইয়া মেয়েলি ছন্দেই তিনি বলিলেন,—শোনো মেয়ের কথা! আমরা কি তোমার শত্রু? তোমারই সুখ আমাদের দেখবার জিনিষ—তা ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাবছিনে। কিন্তু তাই ব'লে সামাজিক সম্মানের দিকটাও না ভাবলে ত' চলবে না।—বলিয়া পিসিমা যেন ভাবনার উত্তাপেই হাল্কা হইয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে লাগিলেন।

—কিন্তু এত ভাবনা তোমাদের আমায় লুকিয়ে কেন?

লুকানোটা ঠিক এই ক্ষেত্রে হীনতা না হোক দুর্বলতা নিশ্চয়ই—তাহা রজত বেশ জানে। বলিয়া উঠিল,—তুমি এ কথার মধ্যে এসো না। বিষয়টি বড় জটিল—

—বিপদসঙ্কুল নয়?

—বিপদসঙ্কুল বৈ কি! এ যে জীবন-মরণ সমস্যা! একদিকে তোমার চিরসুখ, সার্থকতা; অন্যদিকে—

—থামলে যে?

—কি আর বলি বলো!

কিন্তু পিসিমার বলিবার কিছু ছিল। বলিলেন,—আমাদের আগেকার অনুমানগুলি যদি নির্ভুল হয় তবে, অজয়া, রাগ করো না, সে লোক ভাল নয়।

অনুমান! ক্রোধে অজয়ার মন দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল; বলিল,—পিসিমা, তুমি জানো যে তোমরা যে অপরাধ করছো এখন, তা আমি সইতে পারিনে। তোমাদের অনুমানগুলি কি তা আমি জানিনে, কি যাঁকে তোমরা অনুমানে বিচার করতে বসেছ তিনি এখানে উপস্থিত নেই; শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে অনুপস্থিত একটি লোককে অমানুষ সাব্যস্ত করা ঠিক সামাজিক ব্যবহার নয়।

কিন্তু অনুমান ছাড়া উপায় কি? চক্ষুলজ্জা আছে যে—তারপর, অনুমানকে একেবারে অকেজো মনে করিলে মানুষের বার আনা কাজের যে সূত্রপাতই হয় না। কিন্তু রজত এই কথাগুলি প্রকাশ্যে না বলিয়া বলিল,—এমন কতকগুলি অনুমান আছে যা প্রত্যক্ষবৎ সত্য হ'তে বাধ্য। নাড়ী দেখে জ্বর আছে কি নেই বলাটাও বৈদ্যের অনুমান। কিন্তু—

—তর্ক করতে আমি চাইনে; কিন্তু এটাও তোমাদের সামনেই আমি বলে যাচ্ছি যে, আমিও তোমাদের চেয়ে অনুমানে কম পটু নই।—বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—মানুষ দেবতা নয়, তাই তার দোষের ভাগটাও ব্যাখ্যার পাণ্ডিত্যে গুণ হয়ে দাঁড়ায় না। আর খাঁটি মানুষ কেবল অনুমানের টানে নেমে অবাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে না। বৈদ্য অনুমান করেন জ্বর থাকা না থাকা—মানব-চরিত্র নয়।

অজয়া চলিয়া গেলে সদস্যদ্বয় পরস্পরের দিকে খানিক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

উভয়েরই কর্তৃত্ববোধ ধাক্কা খাইয়া মুখ মলিন করিলেও ন্যায়বোধটা চোখ মেলিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। অজয়া যদি তাহাদের পন্থাকে অন্যায় এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার মনে করিয়া থাকে তা করুক।

রজত গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—থামলে চলবে না, পিসিমা। দায়িত্ব যে সর্বথা আমাদের! আমি একবার ঘুরে আসি সেই হেমন্তপুর আর লাহোর।

পিসিমা বলিলেন,—আমিও ইত্যবসরে একবার দেখে নিই সেই অদ্বিতীয় লোকটিকে।

## ॥ চোদ্দ ॥

রজত হেমন্তপুর অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিস্তর ক্লেশ পাইয়া যখন সে হেমন্তপুর গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতেছে।

সাধুচরণ দাস গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার দলপতি। এবং তাহার গৃহে যাহারা সমবেত হইয়াছে তাহারা তাহারই অনুগত। একটি মামলা সাজানো হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছে।

উত্তর পাড়ার ছমির সেখ তাহাদের লক্ষ্য।

সাক্ষী তালিম দিয়া সাধুচরণ সুখ পাইয়াছে—সবাই প্রস্তুত—জেরার প্রত্যুত্তরে কি বলিতে হইবে তা পর্যন্ত সাধুচরণের শিক্ষায় সাক্ষীগণের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় হামিদ হঠাৎ কি যে বলিয়া বসিল তাহার মাথামুণ্ডু কিছুই নাই। শুনিয়া সাধুচরণ হাসিবে কি কাঁদিবে তাহাই ঠিক করিতে পারিল না।

হামিদ বলিল,—আমায় মাপ করো, দাসমশাই ; আমি পারবো না। দারোগা ধমক দিলেই আমার সব গুলিয়ে যাবে। শেষে কি উল্টো ফ্যাসাদে পড়বো ?—বলিয়া হামিদ এখনই যেন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল।

কিন্তু সাধুচরণের হামিদকেও চাই।

খানিক সে অবাক হইয়া হামিদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন হামিদ যে এমন কথা বলিতে পারে তাহার স্বকর্ণে শুনিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তারপর সে রাগিয়া উঠিল। বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—দারোগা ধমক দেবে আমি থাকতে ! হামিদ, তুই বলছিস কি ! হুঃ, আশু বিশ্বেস আবার দারোগা—তাকে আবার ভয় ! আরশোলাও পাখী, আশু বিশ্বেসও দারোগা ! কত বড় বড় জাঁদরেল দারোগা, যার চোখ দেখলে তোরা কুঁকড়ে আধখানা হয়ে যাবি, লাটসাহেবের খাস দারোগা—তাদের পর্যন্ত আমি এই—

বলিয়া লাটসাহেবের খাস দারোগাগুলিকে একত্র করিয়া সাধু ট্যাঁকে গুঁজিতে যাইতেছিল, এমন সময় স্থানাভাবে নহে, অন্য কারণে কাজটা তার শেষ করা হইল না।

সাধুচরণের ছোট ছেলেটা কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিয়া গেল,—বাবা, দারোগা।—বলিয়াই সে পোঁ করিয়া সিটি বাজাইয়া যেন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

—এ্যাঁ, দারোগা ? কোথায় দেখলি ?

কিন্তু ছেলে তখন বহুদূরে ; লাটসাহেবের খাস দারোগা-গ্রাসকারীর ত্রাস দেখিবার জন্য সে দাঁড়াইয়া নাই।

—নিতাই, দেখ ত' এগিয়ে কে।

কিন্তু নিতাই দেখিতে সুপুরুষ হইলেও ভিতরে কাপুরুষ। এতগুলি লোক উপস্থিত থাকিতে স্বয়ং তাহাকেই অগ্রসর হইতে বলায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বলিল,—আমি একা যাবো ?

কাপুরুষতা সাধুচরণের একেবারে অসহ্য ; ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—এ কি বুনো শুয়োর মারতে যাচ্ছো যে লোক-লস্কর-হাতিয়ার সঙ্গে না নিলে ফেঁড়ে ফেলবে ? যা এরফান, নিতাইয়ের সঙ্গে যা।

সাধুর মন নক্ষত্রবেগে একবার ঘুরিয়া আসিল—কিন্তু দারোগার সরজমিনে এই গ্রামে আসিবার কোনো কারণই সে দেখিতে পাইল না।

—দারোগা নাকি সত্যি ?

নিতাই বলিল,—না বোধ হয়, সঙ্গে সেপাই নেই। একা একাই আসছে। পেন্টুলান পরা আছে, টুপি আছে মাথায়।

—তবু সাবধানের মার নেই। তোরা একটু ওদিক পানে স'রে থাক।

নিতাই সরিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—ট্যাঁক খালি আছে ত' দাসমশাই ?

কিন্তু যে আসিল সে দারোগা নয়।

—সাধুচরণ দাস কার নাম ? —বলিয়া রজত আসিয়া দাঁড়াইল।

সাধুচরণ বলিল,—আজ্ঞে, আমারই নাম সাধুচরণ দাস, আপনার দাসানুদাস।

সাধুচরণ মাথা চুলকাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তুমিই এ গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু লোক, তাই শুনে তোমার কাছেই এলাম।

—হুজুরের অনুগ্রহ। হুজুর বসলে কৃতার্থ হতাম।—বলিয়া জলচৌকিখানা কোঁচার খুঁট দিয়া পরিপাটি করিয়া মুছিয়া দিলো।

রজত বসিয়া বলিল,—তুমি চিরকাল এই গাঁয়েই বাস করছ ?

—হুজুরের আশীর্বাদে এই গাঁয়েই বার-চোদ্দ পুরুষের বাস। আমিও এই গাঁয়েই চিরকাল আছি ; গাঁ ছেড়ে এক পা-ও কোথাও যাইনি কোনো দিন।

সাধুচরণের বুকের ভিতরটা গুরগুর করিতেই লাগিল। কোনো বিশেষ দিনে এই গ্রামে থাকাটা ঠিক উচিত কিনা তাহা জানা নাই, প্রশ্ন করিয়া পেন্টুলধারী কোন্ ঘটনার সংস্রবে কি জানিতে চাহিতেছে—আর, গ্রামে পুরুষানুক্রমে থাকারই বা কি ফলাফল দাঁড়াইতে পারে।

জিজ্ঞাসা করিল,—হুজুর বুঝি আমাদের মহকুমার নতুন হাকিম ?—বলিয়া হাত জুড়িয়া রহিল।

রজত হাসিয়া ফেলিল ; বলিল—হাকিম-টাকিম আমি নই ; তোমাদেরই মত সাধারণ একজন।

শুনিয়া সাধুচরণের উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল।

এবং ওদিক হইতে নিতাই প্রভৃতি একে একে নির্গত হইয়া দেখা দিলো। রজত তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—এ গ্রামে ত্রৈলোক্য বসু নামে কেউ বাস করতেন ব'লে তোমার মনে পড়ে ?

—পড়বে না কেন, বাবু, খুব পড়ে। নিতাই, তোরা বোধ হয় জানিসনে, গ্রামের উত্তর সীমানায় তাঁদের বাড়ী ছিল। কিন্তু সে বাড়ীতে ত' কেউ নেই বাবু, এখন। চারটে ভিটে প'ড়ে আছে। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন তাঁরা। স্বামী-স্ত্রীতে থাকত—এই মহাদেবের মত দেহ। তাঁর স্ত্রীও ছিল তেমনি ভগবতীর মত সুশ্রী।

—কোথায় গেছেন তাঁরা ? সন্তানাদি কিছু ছিল তাঁদের ?

—না, মনে ত' পড়ে না। উঁহু, ছিল না। আমি তখন ছোট—তের-চোদ্দ বছরের। তখন শুনেছিলাম, পশ্চিম মুলুকে কোথায় বড় চাকরী পেয়ে যাচ্ছে। বাবু বুঝি তাঁদের কেউ আপনার লোক ?

—না, তবে তাঁদের ছেলের সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ-পরিচয় হয়েছে। গ্রামের জমিদার কে ?

—জমিদারের কথা আর শুধোবেন না, বাবু। একটিবার চোখে দেখতে পেলাম না তাঁর চেহারাখানা কি রকম। তিনি বার-মাস কলকাতাতেই থাকেন। এখানে নায়েব-গোমস্তারা থাকে, হাংগামা-হুজ্জৎ যা করবার তা তারাই করে।

রজতের মনে হইল, সিদ্ধার্থবাবু গ্রামে কখনো পদার্পণ করেন নাই দেখিতেছি।

সেই সম্পর্কে দু'টি একটি প্রশ্ন চলিতে পারে। কিন্তু আর বেশী সময় নাই। বলিল, —তবে এখন উঠি, সাধুচরণ। পাঁচ মাইল হেঁটে আবার গাড়ী ধরতে হবে।—বলিয়া পকেটে হাত দিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত শহরের মানুষ। কাজ করাইয়া লইয়া পয়সা দেওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু সাধুচরণের লওয়ার অভ্যাস নাই। টাকাটা রজত দিতে গেলেই সাধুচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল,—টাকা কেন, বাবু!

—তোমাদের কষ্ট দিলাম, মিষ্টি খেও।

—না, বাবু, দুটো কথা ক'য়ে মিষ্টি খেতে টাকা আমি নিতে পারবো না—আপনি ও রাখুন। বরঞ্চ যদি অনুমতি করেন ত' একটা কথা বলি।

এবং অনুমতির জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়াই সে বলিতে লাগিল,—আপনার আহারাদির যোগাড় ক'রে দিই। এ-বেলা স্বপাকে সেবা ক'রে ও-বেলা গাড়ী ধরবেন।

—এ-যাত্রা আর সে সুবিধে হ'ল না, সাধুচরণ। আবার যদি আসি তবে খেয়ে যাবো, তবে স্বপাকে নয়, তোমাদের পাকেই। আর জমিদার যাতে গাঁয়ে আসেন তার বন্দোবস্ত ত্রৈলোক্যবাবুর ছেলেকে দিয়ে করিয়ে দেবো।

টাকাটা পকেটে ফেলিয়া রজত পুনর্যাত্রা করিল।

## ॥ পনের ॥

লাহোর হইতে রজত ফিরিয়াছে।

বলিতেছিল,—সিদ্ধার্থবাবু যা যা বলেছেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, পিসিমা। হেমন্তপুরে তাঁদের ভিটে প'ড়ে আছে। লাহোরে তাঁর পিতৃবন্ধু অনেকের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছে—তাঁরা এক-একজন দিক্‌পাল লোক। তাঁরা সবাই ত্রৈলোক্যবাবুর অকালমৃত্যু স্মরণ ক'রে তাঁর অশেষ গুণগান আর সিদ্ধার্থবাবুর জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ ক'রে বললেন,—অমন গুণবান ছেলে দুটি দেখা যায় না। কিন্তু একটি মহাদোষ তাঁদের সমুদয় আশা আর সিদ্ধার্থবাবুর জীবন মাটি ক'রে দিয়েছে।

—কি মহাদোষ?

—নিজের স্বার্থ চিন্তা না-করা। যতদিন তাঁদের মধ্যে সিদ্ধার্থবাবু ছিলেন, ততদিন একা একা বিষণ্ণমুখে সর্বদাই কি ভাবতেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত। আমার মুখে তাঁর কুশল-সংবাদ পেয়ে সকলেই মহা আহ্লাদিত হলেন। এখন তোমার পরীক্ষার ফল কি বলো।

পিসিমা হঠাৎ একটু হাসিলেন। বলিলেন,—প্রথম যেদিন দেখা হ'ল সেদিন আমি একা ছিলাম। সিদ্ধার্থ ঘরে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল তার চোরের দৃষ্টি।

—চোরের দৃষ্টি? মানে?

—অভ্যস্ত চতুর দৃষ্টি—যা একপলকেই দেখে নেয়, কোথায় কোন্ জিনিষটা রাখা আছে, কোন্‌টা ভারি, কোন্‌টা হাল্‌কা—প্রত্যেকটির মূল্য কত !

প্রথমটা চম্‌কিয়া উঠিলেও রজত ইহার একটি অক্ষরও বিশ্বাস করিল না।

নৃ-চরিত্রে এই সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ আদৌ সম্ভব নহে—পিসিমা নিজের কষ্ট-কল্পনাকে সাজাইয়া একটা চমকপ্রদ আকার দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। রজত মনে মনে একটু হাসিয়া তাঁহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিলো। সিদ্ধার্থ দরিদ্র বটে, পিতার দানাতিরিক্ততার ফলে, কিন্তু চোর সে হইতেই পারে না। পিসিমা নিজেকে বড় চক্ষুষ্মান মনে করিতেছেন। ছিঃ !

বলিল,—তারপর ?

—তারপর গল্প। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম—সে নির্বিকারে উত্তর দিতে লাগল। কোন্‌টা অশিষ্ট, কোন্‌টা অনাবশ্যক, কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা লজ্জাকর সে-বিষয়ে তার কোন চেতনাই দেখা গেল না।

—কি বুঝলে তাতে ?

—এমন সমাজে সে মিশেছে যেখানে কথার শিষ্ট-শোভনতা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা হয় না।

—তা তিনি মিশেছেন সত্যিই। চিরকাল ছোটলোককে আস্কারা দিয়ে বেড়িয়েছেন। কথার অপরাধ নেয়াটা অভ্যাসের বাইরে চ'লে গেছে।

—কিম্বা মনের ওপর দখল খুব। তার গান শুনেছ ?

—শুনেছি। মধুর।

—চোখ দুটি বড় বিষণ্ণ। অজয়া যে তাকে ভালবেসেছে তাতে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি।

—কেন ?

—অজয়া তখন দশ বছরের। তার পড়বার বইয়ে একটা গল্প ছিল যে, এক পর্যটক হঠাৎ একদিন দেখলে একপাল নেক্‌ড়ে তার তাঁবুর চারিদিকে জিব বার ক'রে ঘুরছে। অন্য উপায় না দেখে তাঁবুর চারিদিক্‌কার ঘন জংগলে সে আগুন লাগিয়ে দিলে। নেক্‌ড়ের দল সেই বেড়া-আগুনে একটি একটি ক'রে পুড়ে ম'লো। অজয়া তাই প'ড়ে কেঁদে আকুল। আমি ছিলাম কাছে ব'সে—ভাবলাম, বুঝি সেই ভদ্রলোকের কষ্ট দেখেই সে কাঁদছে। শুনে দেখি, আদৌ তা নয়। বেচারা নেক্‌ড়েগুলো যে পুড়ে ম'লো, কাঁদছে সে তারই দুঃখে। নেক্‌ড়ের হয়ে অজয়া চিরকাল লড়বে যদি তারা অনাহারে শীর্ণ হয়।—একটু হাসিয়া পিসিমা আবার বলিলেন,—অজয়ার মুখে সিদ্ধার্থর কথা ধরে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ আমার সামনে অজয়ার নামটিও একবার উচ্চারণ করেনি।

—সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি কেবল মায়ের নামে কেঁদে ফেলেন, দেশের নামে জ্ব'লে ওঠেন। শুনে এলাম, উৎসাহের বাড়াবাড়ি নিয়ে তাঁকে কেউ বিদ্রূপ করলে তিনি বলতেন, অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে যাত্রা করাই শ্রেয় ; কারণ পথে তার এত ক্ষয় আছে যে, তা নইলে ঠিকানায় পেঁছিবার আগেই বুক খালি হয়ে যায়।

—সকলের চেয়ে ভারি কথাটা এখনো বাকি আছে, রজত। সিদ্ধার্থ বিয়ে করবে না।

—করবে না ?—বলিয়া রজত যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থর প্রতি তাহার মনে মনে যে অভক্তির ভাবটা ছিল, লাহোর এবং হেমন্তপুরে

ঘুরিয়া আসার পরও তাহা সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই এই হিসাবে যে, সিদ্ধার্থ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হইলেও সে দরিদ্র। ধনী গৃহস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ বরণীয় বটে—কুলমর্যাদা তার প্রাপ্য। কিন্তু সে ধন ত্যাগ করিয়া আসে নাই। কেবল অতীত-গৌরবের একটা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে—বর্তমানে তুলনাগত লৌকিক দাবী তার কতটা! নাই বলিলেও বোধ হয় চলে।

অথচ, সিদ্ধার্থ বিবাহ করিবে না শুনিয়া রজত নিষ্কৃতির আনন্দ পাইল না।

সিদ্ধার্থ নিজেই কর্তা সাজিয়া তাহাদের উপর স্বেচ্ছাচারীর মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া যাইবে ইহাও অসহ্য। সিদ্ধার্থ বিবাহ করিবে না শুনিয়া তাহার মনে হইল, সগোষ্ঠী তাহাদের একটা শোচনীয় পরাজয় ঘটিতেছে।

পিসিমা বলিলেন,—কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, বে-থা ক'রে সংসারী হবার কথা কখনো সে ভেবেছে কি না। শুনে সে হেসে বললে,—ভিক্ষুক দেশে যথেষ্ট আছে—তাদের সংখ্যা বাড়াবার আগ্রহ আমার নেই।—তারপর বললে,—আমার মা নেই, মাতৃজ্ঞানে আপনার সম্মুখে বলছি, পরকাল আমি মানিনে। কিন্তু মানি যে ইহকালের সুখ নিশ্চেষ্ট ত্যাগে নয়, নিরঙ্কুশ ভোগে নয়, নিরলস কাজে।

রজতের রাগ হইল; বলিল,—জ্যাঠা ছেলে! অজয়া শুনেছে?

—না।

—তুমি কেন বললে না, এমন বিয়েও ত' মানুষে করে যাতে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ে না।

পিসিমা তাহা বলিয়াছিলেন। উপরন্তু ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ করিয়া উপার্জনে মন দিলেও ত' চলিতে পারে।

সিদ্ধার্থর গৃহ নাই—সেই দুঃখে সে একদিন রজত ও অজয়ার সম্মুখে অশ্রুমোচন করিয়াছিল। কিন্তু পিসিমার কাছে সে বলিয়া গিয়াছিল, সে যে-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, বন্ধন মানিলেই তাহার চ্যুতি ঘটে। বন্ধননির্মুক্ত অখণ্ড প্রাণই দেশের জন্য আবশ্যক।

দেশের এই প্রয়োজনটির উল্লেখে রজতের মুখ বিদ্বেষে বিকৃত হইয়া উঠিল। বলিল,—দেশের গয়ায় পিণ্ডি দিতে। আবার উভয়সঙ্কট উপস্থিত। সিদ্ধার্থবাবু এখন মুখ বুজে চ'লে গেলে অজয়া ভেঙে পড়বে। আমাদের পক্ষ থেকে নির্লজ্জের মত কথাটা তুললে তিনি ভাববেন, গছিয়ে দিচ্ছি।

—কি দেখে? ও-রকম ভাবনার দিক দিয়ে সে যাবে না।—বলিয়া পিসিমা মনে মনেই একটু হাসিলেন।

রজত জানে না। কিন্তু পিসিমা জানেন, পুরুষের পক্ষে এই লোভটা কত উগ্র। তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, মানুষের ভিতরকার সর্বাগ্রবর্তী সান্দ্র ছায়াটি।

ছায়াপাত হয়। ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসে। তারপর শুরু হয়, আলো-ছায়ার খেলা। মুহুর্মুহুঃ পট পরিবর্তন।

তারপরই সেই যবনিকাখানি নামিয়া আসে যাহা নিষ্কম্প আর আলোকে উজ্জ্বল।

রজত ছাড়া আর যে কেহ ইহা দেখিতে পাইত, কিন্তু মহা একটা উৎপাতের বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া নিজেরই দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। সে দেখিল, সিদ্ধার্থ যাহা বলিয়া গেছে কেবল তাই। বলিল,—আমি নিজের হাতে এই সঙ্কট গ'ড়ে তুলেছি। সিদ্ধার্থবাবুর প্রতি অজয়ার ব্যথার ব্যথীর ভাবটা যদি বাড়তে না দিতাম!—

বলিয়া, কোন্ পর্যন্ত আসিলেই সে সিদ্ধার্থকে তাড়াইতে পারিত তাহাই গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

অজয়া চা লইয়া আসিল।

এবং তাহার দিকে চাহিয়া রজতের এমন একটা মমতা জন্মিল যাহা নিতান্তই অভিনব এবং যাহা অকস্মাৎ উদ্‌গত একটা প্রস্রবণের মত—চতুর্দিকের ধু ধু কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে তার কোনো সংস্পর্শই নাই। যেন বাতাসের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মনের কোথাও দুশ্চিন্তার ম্লান রেখাটি পর্যন্ত নাই। সে কি নির্মম কাজই হইবে, যদি বিভোর সুখের এই লালিমা আঘাত পাইয়া বিবর্ণ হইয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রজত সিদ্ধার্থকেও ক্ষমা করিল। হোক তার মূর্ছা ভান, থাক তার চোখে চোরের দৃষ্টি।

অজয়ার দিকে চাহিয়াই, সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে সমুদয় অ-ক্ষম্য অনিচ্ছার বাষ্প কাটিয়া তার মনের আকাশ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অজয়া বলিল,—দাদা, চা।

রজত বলিল,—দিদি, গান। ননী কোথায় ?

—তার অসুখ করেছে। (পিসিমার প্রতি) পিসিমা, এবারকার মন্ত্রণাসভা কাকে ডিস্‌মিস্ করল ? তোমাদের আমি দোষ দিইনে। ধারণার যা বাইরে ছিল, তাকে চোখের সামনে দেখলে তাকে অসংগত অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব'লে কষ্টিপাথরের ওপর উদ্যত করা মানুষের স্বধর্ম—মানুষ তাকে সন্দেহ ক'রে বর্জন করতেই চায়।

রজত বলিল,—মানুষ জাতটার ওপরেই খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছ দেখছি। রত্ন কুড়িয়ে পেলেই তাকে মহার্ঘ জ্ঞানে ঘরে তুলতে হবে এমনধারা বাঁধা নিয়ম নেই, রত্নের মধ্যে ঝুটা আছে ব'লেই। তা যাই হোক, ডিস্‌মিস্ আমরা কাউকে করিনি—সবাই স্ব স্ব স্থানে বজায় আছে, এবং যাতে আরো থাকে তারই আয়োজন চলছে। তোমার বর্তমান স্থান—

বলিয়া হার্মোনিয়মটা দেখাইয়া দিলো।

—যাই। কিন্তু তোমরা আমায় ভুল বুঝলে কেন ? তোমরা ভেবেছিলে, আমি তোমাদের বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াব—

—ঘুণাক্ষরেও তা ভাবিনি।

—ভেবেছ। তা নইলে আমায় গোপন ক'রে দেশ-দেশান্তর ঘুরে এলে কেন ? আর দিবা-রাত্র এই গোপন আলোচনাই বা কিসের ? তোমরা সিদ্ধার্থবাবুকেও চেননি, আমাকেও চেননি। তিনি ভদ্রলোক—তিনি তা নন জানা গেলে আমি অক্লেশেই তাঁকে ত্যাগ করবো। অতএব পরামর্শ-মজলিসে আমাকেও ডেকো। দাদার চা কি মাটি হ'ল ?

—না হয়ে আর করে কি ! যে-রকম তলোয়ার ঘুরিয়ে এসে দাঁড়ালে তুমি—পিসিমা ত' একেবারে থম্‌কে গেছেন। আমি ভাবছিলাম, এ-যাত্রা যদি বেঁচে যাই তবে চায়ের নামটি আর মুখে আনব না।

অজয়া হাসিমুখে যন্ত্রটার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

## ॥ ষোল ॥

অজয়ার পালিত সন্তানদের উপনিবেশে আজ উৎসব—কর্ত্রী তাহাদের দেখিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সিদ্ধার্থ। ছেলেমেয়েগুলি মিলিত-কণ্ঠে একটি গান গাহিয়া শুনাইল—লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্যরাজ্যে কমলচরণ অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার চক্ষে জগদ্ধাত্রীর করুণা, হস্তে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র—অন্ন বণ্টন করিয়া জননীর ক্লান্তি নাই—জননীর কৃপাশীর্বাদে পৃথিবীতে অক্ষয় হেমন্ত ধান্যশীর্ষে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে—তাঁহাকে প্রণাম।

গান শেষ করিয়া সকলে উভয়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—গান তোমাদের কে শিখিয়েছেন?

একজন বলিল,—গুরু-মা।

—গুরু-মা তোমাদের খুব ভালবাসেন?

—খুব।

একটি বালিকা হঠাৎ সিদ্ধার্থকে দেখাইয়া অজয়াকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—ইনি আমাদের কে, মা?

শুনিয়া সিদ্ধার্থ মুখ টিপিয়া হাসিল।

কিন্তু অজয়া লজ্জা পাইল; বলিল,—ইনিও তোমাদের অভিভাবক। তোমাদের ভালবাসেন, তোমাদের যাতে ভাল হয় তাই ইনি চান। তোমরাও এঁর কুশল প্রার্থনা করবে।

—তোমার বর?

বালিকার মুখনিঃসৃত প্রশ্নটি এতগুলি লোকের সম্মুখে উচ্চারিত হইল বলিয়াই যেন প্রাঞ্জল সত্যের মত শুনাইল।

এবং তাহার কৌতুকের দিক্‌টা হঠাৎ চোখে পড়িয়া সিদ্ধার্থ আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজয়া বালিকার গাল টিপিয়া দিলো; বলিল,—যাও, আজ তোমাদের দিনভোর ছুটি।

সিদ্ধার্থ যেন সেই সঙ্গে ছুটি পাইয়া গেল।

তাহার মনে হইল আর ভয় নাই। মনে মনের প্রায়শ্চিত্তেই তার পাপ সমূলে ক্ষয় হইয়া গেছে—ছোটরা ভবিষ্যতের ছায়া দেখিতে পায়; সহজজ্ঞানেই ভালমন্দ টের পায়।

বালিকার প্রশ্নে অজয়ার মুখে বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা যায় নাই—যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারের সম্পর্কেই কেহ অপ্রাসঙ্গিক নহে, প্রাসঙ্গিকই কিন্তু অতিরিক্ত একটা উক্তি করিয়াছে।

সিদ্ধার্থ মনে মনে ডানা মেলিয়া যেন বসন্তের পুষ্পশাখে যাইয়া বসিল।

অজয়া সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—একেবারে মগ্ন হয়ে কি চিন্তা হচ্ছে?

সিদ্ধার্থ বলিল,—ভাবছি, প্রবাদ আছে, ভগবান মন বুঝে ধন দেন—কথাটা সর্বদাই ঠিক কি মাঝে মাঝে বেঠিক হয়েও থাকে।

অজয়া টেরও পাইল না যে সিদ্ধার্থ নিজের কথাই বলিতেছে।

বালিকার মুখখানি সিদ্ধার্থ মনে মনে পুষ্প-চন্দনে অর্চিত করিয়াছিল। তারপর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভগবানের দানে মন-বিচারের কথাটা তার মনে পড়িয়া গেছে।

অজয়া বলিল,—দানেই যদি ধনের সার্থকতা ধ'রে নেয়া যায় তবে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঠিক। কথাটা জন্মগ্রহণ করেছে সেকালের অভিজ্ঞতা থেকে। তখন ধনী মনে করতো সে কেবল হিসাবনবিশ তহবিলদার—চাহিদা মত দিয়ে দেবার ভার তার ওপর। কাজে লাগবে, তার যা দরকার। এখন সব উল্টে গেছে।

—কারণ কি অনুমান করেন ?

—আত্মপর বোধটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। যে নিতে চায় তাকে নিতান্তই আপনার জন না ভাবতে পারলে দেওয়া পাওয়ার আনন্দ কোনো তরফেই পূর্ণ হয় না—ভেতরে ফাঁক থেকে যায়। আপনার জন এখন কেউ কারো নয় ; সঙ্কীর্ণতার সঙ্কোচের ফলেই এখন যথার্থ দাতা প্রার্থী দুই-ই কম।

কিন্তু সিদ্ধার্থর কানে অজয়ার কথাগুলি গেল কিনা সন্দেহ।

সে পরবর্তী কথাটাই প্রাণপণে ভাবিতেছিল।

অজয়ার গলার আওয়াজটা থামিতেই সে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আমার দান বৃথা হয়নি। এই দেহ তার সংগে সামান্য জ্ঞান উর্বর ভূমিকেই দান করেছি। ফসল যখন ফলবে, তখন সেই সীমান্তবিস্তৃত হরিৎ-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখবো দানের উদার সার্থকতা। দানে গর্ব নেই—গর্ব তার ফলে।—বলিতে বলিতে সহসা সে অজয়ার দিকে ফিরিল—অজয়া তাহার চোখের দিকে চাহিল না। চাহিলে সে বিস্মিত হইত—দেখিতে পাইত, সিদ্ধার্থর দৃষ্টি যেন সেই মুহূর্তেই মরিয়া হইয়া সাগর-গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে—সে দৃষ্টি যুগপৎ এমনি শঙ্কিত এবং স্থির।

সিদ্ধার্থর গায়ে তখন একবার কাঁটা দিয়া গেছে। একটি কথা তার জিহ্বাগ্রে কাঁপিতেছে—আকর্ষিত জ্যা-লগ্ন তীরের মত লক্ষ্যে পেঁছিবার তার স্পন্দহীন অব্যক্ত অধীরতা।

সিদ্ধার্থর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। বলিল,—আপনি দান করেছেন আপনার করুণায় ছলছল বিপুল স্নেহ—তার ফল দেখে গর্বে ভ'রে উঠছে আমার বুক। কেন ?—বলিয়াই সিদ্ধার্থ শুনিতে পাইল গুরুগুরু শব্দে কোথায় যেন মেঘ ডাকিতেছে। কিন্তু সেটা তারই বুকের শব্দ।

অজয়া ধীরে ধীরে বলিল,—তা ত' জানিনে।

—সহানুভূতি। দুটি প্রাণ করুণায় বিগলিত হয়ে ঢেলে পড়ছে একই পাত্রে। তারা একত্র হ'লে স্রোতের বেগ দুর্জয় হবে। অজয়া—

বলিয়াই সে অজয়ার হাত ধরিয়া ফেলিল।

এবং তারপর কথা বলিবার পূর্বে যে একটি মুহূর্ত অতিবাহিত হইল তাহারই মধ্যে জীবনের অনন্ত সুখ তার অনুভূতির প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। অজয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া, হস্তবন্ধনের স্পর্শটুকু উপলব্ধি করিতে করিতে সিদ্ধার্থ গদগদস্বরে বলিল,—আমার জীবনের একান্ত আকাঙক্ষা তোমাতেই মূর্তিগ্রহণ ক'রে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—বলো, এসেই সে ফিরে যাবে না ?

—না।

—চলো যাই।

—চলুন।

॥ সতের ॥

সিদ্ধার্থ ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তার যন্ত্রণার অবধি নাই।

আগে অজয়ার সম্মুখে আসিলে তার অস্বস্তি লাগিত, এখন সেটা নাই। এখন সে বেশ থাকে যতক্ষণ অজয়ার কাছাকাছি থাকে—একটা আশ্রয় পায়। অজয়ার রূপ নয়—তার সুদৃঢ় অন্তরের প্রভাবেই সিদ্ধার্থ নিজের ভিতর ফুটিতে পাইয়া বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইলেই এখন তার মনে হয়, যেন অতিশয় গুরুভার একটা দৈব-নির্যাতন গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—তারই জ্বালা বহুদূর হইতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত কুশাঙ্কুরের মত আসিয়া অস্থি-মজ্জায় ফুটিতেছে। একটা কালো পর্দা বাদুড়ের দুটো পাখার মত পৃথিবীকে দু'ভাগ করিয়া উঠিয়া আসে।

মধ্যস্থলে দুটি নিষ্পলক চক্ষু। পর্দার ও-দিকে কুঞ্জে কুঞ্জে আলোর মধু-উৎসব—এদিকে অনন্ত অন্ধকার। রূপলালসার সঙ্গে প্রয়োজন, তারপর জয়াকাঙ্ক্ষা যতদিন মিশিয়াছিল ততদিন তার মনের বেগ দুর্দমনীয় ছিল; কিন্তু জিত-রাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া আসিয়াই সে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

সেই দৃশ্যটা সিদ্ধার্থের অনুক্ষণ মনে পড়ে।

অজয়াকে পাশে লইয়া সে রজতের সম্মুখীন হইতেই রজত অজয়ার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিল।

পিসিমা উভয়ের অক্ষয় সুখের কামনা করিয়াছিলেন।

অজয়ার মুখের উপর সুন্দর আলো আসিয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু সে-ছবিটা সিদ্ধার্থের সহ্য হয় নাই। সরিয়া যাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আর্শিতে সে মুখ দেখে। মুখের সে উজ্জ্বলতা নাই, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে।

এখনও সে আর্শিতে নিজের মুখখানা দেখিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আর্শি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুলাইয়া উঠিল—পৃথিবীর কোথায় কোন্ প্রান্তে কি দৃশ্য অভিনীত হইতেছে তার কিছুই যেন তার ঠাহর হইতেছে না।

সে পলাইবে। এই ধাঁধা আর ঘোলার পাকের ভিতর হইতে সে পলাইয়া বাঁচিবে। ধূমকেতুর যেমন উদয়ের তেমনি অস্তে যাওয়ার খেয়াল—দু'দিনের জন্য উঠিয়া মানুষের মনে অশেষ অকল্যাণের আশংকা জাগাইয়া তুলিয়া দূষিত বাষ্প ছড়াইয়া দিয়া আবার অন্য আকাশে দেখা দেয়। সে পলাইলে কাহারও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সে হাঁফ লইয়া বাঁচিবে। কেবল একখানি বুক ক্রন্দনবেগে দুই-চারিবার দুলিয়া উঠিবে, দু'চার ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িবে, দু'চারিটি রাত্রি অনিদ্রায় কাটিবে।

কিন্তু যে দূষিত বাষ্প সে ছড়াইয়া দিয়াছে তাহার বিষে সে যদি শুকাইয়া ওঠে! অমন সোনার রং নীল হইয়া যাইবে, অমন দৃঢ় অটল মন সহসা স্থানচ্যুত হইয়া এলাইয়া পড়িবে, অমন দৃষ্টি অন্ধকার পথে পাইবে না।

এ ত' গেল ভাবের কথা। অভাবের কথাটিও ভাবা চাই।

টাকা নাই, কিন্তু দেনা আছে, আর ক্ষুধা আছে। এই যুগলমূর্তি প্রভুভক্ত কুকুরের মত এক মুহূর্ত তার সঙ্গ ছাড়িবে না। তাদের অশ্রান্ত চীৎকার তাকে কেবলই নরকের দিকে ঠেলিতে থাকিবে।

কাজেই পলায়ন স্থগিত রাখিয়া সিদ্ধার্থ মাথা ঠান্ডা করিতে বসিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে সিদ্ধার্থ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

স্বপ্ন দেখিয়া ধড়ফড় করিয়া সে ঘর্মাক্ত দেহে উঠিয়া বসিল।

লণ্ঠনের কাচটা কেরোসিনের কালিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া আলোর শিখাটা অস্বাভাবিক লাল দেখাইতেছে।

সিদ্ধার্থ ত্রস্তনেত্রে চারিদিকটা একবার চাহিয়া দেখিল।

স্বপ্নই বটে। এবং তাহার বিবরণ এই :—

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে। চিতার আগুনে ধোঁয়া নাই ; কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ নিবিড় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন তরল একটা স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাইতেছে।

পুড়িতে পুড়িতে দেহটা কাষ্ঠশয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে মাটির উপর পা রাখিয়া নামিয়া দাঁড়াইল—আগুনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল।

চক্ষু তার নির্নিমেষ। আসিয়া সে সিদ্ধার্থরই সম্মুখে দাঁড়াইল ; বলিল,—চিনতে পারছ ?

—না, কে তুমি ?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্তন আশা করনি বুঝি ?

—তুমি ত' মৃত।

—না, আমি জীবিত। বিবাহ করতে যাচ্ছি। আমার পরিচয় চুরি ক'রে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ, সে ত' আমার। তুমি তার কে ?

এমনি সময়ে অজয়া আসিল। কপালে তার প্রথম অভিসারের প্রগাঢ় লজ্জা।

হাতে তার সদ্যস্ফুট শুভ্র মল্লিকার একগাছি মালা। অজয়া হাসিমুখে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। শবদেহ হাত তুলিয়া নিষেধ করিল ; বলিল,—তুমি ওকে ভালবাসো না ; তুমি ভালবাসো আমার গল্পটিকে। জানো না লোকটা জারজ, অর্থলোভে কুরূপা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবা করতো। তুমি তার গলায় এসেছ মালা দিতে !—বলিয়া দেহ হাত বাড়াইয়া দিলো।

অজয়ার শান্ত স্বপ্নালস চোখে হাসির দীপ্তি ঝলকিয়া উঠিল। সে সেই হাতের হাড় জড়াইয়া ধরিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থ শবদেহকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেই পিছন হইতে কে মার মার করিয়া উঠিল—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তোর। চমকিয়া পিছন ফিরিয়া সিদ্ধার্থ দেখিল, যার দোকানে সে বালকভৃত্য ছিল, সেই বুড়ি—লাঠি তুলিয়া তাড়িয়া আসিতেছে। পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিবার উপক্রম করিতেই সিদ্ধার্থ মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া চলিল—ঘোরা শেষ হইলে লাটিম যেমন করিয়া গড়াইয়া ছোটে। অজয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেই হাসির শব্দ কানে লইয়া সিদ্ধার্থ ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

মৃতদেহের সেই পলকহীন চক্ষু। সেই চক্ষু দুটি সিদ্ধার্থর সম্মুখে অনির্বাণ হইয়া জাগিয়া রহিল।

কিন্তু গলদঘর্মকর এত ক্লেশের মধ্যেও সিদ্ধার্থর তৃপ্তি এইটুকু যে, পরম দুঃখের ভিতরেও যে সুখের অমৃতবিন্দু লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহারই আস্বাদ তার মিলিয়াছে। অজয়াকে ছিনাইয়া লইতে যে আসিয়াছিল, সে পরলোকের লোক।

তবু তাহাতেই বড় ব্যথা বাজিয়াছিল।

সেই অপার ব্যথার তাড়নে তার শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী এখনো টনটন্ করিতেছে। কিন্তু সেই ব্যথার পশ্চাতেই যে আনন্দ হাসিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই। সে-আনন্দ বিশল্যকরণীর অমোঘ রসে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

স্বপ্ন মিথ্যা, কিন্তু আনন্দটি ত' পরম সত্য।

আজ সিদ্ধার্থ যেখানে, সেখানে প্রাণের ফোয়ারা সহস্র ধারায় উৎসারিত—এই প্রাণের নির্ঝরে অবগাহন করিয়া সে বাঁচিবে, অমর হইবে। রিক্তা প্রকৃতির বুকের উপর যে-দিন আদি প্রাণমুকুলটি শুক্তিকোষে মুক্তাটির মত প্রথম সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইদিন হইতে এই বাঁচিবার প্রয়াস-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—একমাত্র রব—বাঁচো, বাঁচো। অমোঘ আদেশ, অনন্ত তাগিদ—ক্লীব দুর্বলতার দোহাই দিয়া পরিহার করিবার উপায় নাই। প্রেমে পশুত্ব যে দিয়াছে সে-ও ধন্য। প্রেমে স্বর্গীয় দেহাতীত পবিত্রতা কল্পনা করিয়া মানুষের এই অতিষ্ঠকর কলরব কতদিনের? দেহ স্বল্পজীবি, আত্মা অমর কিন্তু দেহ কি মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছার বিগ্রহ নয়? শিবের পূজা শুধুমাত্র তাঁর মাঙ্গল্যের পূজা নয়—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষয় রাখিবার তাঁর যে শক্তি তাহারও পূজা।

তারপর হাতে-খড়ির দিনটাকে সিদ্ধার্থর খুব শুভদিন মনে হইতে লাগিল।

সে-দিনটা বিদ্যারম্ভের পক্ষে শুভদিন ছিল কি-না, পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা কেহ দেখে নাই। কোনো দেবতাকে স্মরণ করা হয় নাই; পুরোহিতের পদধূলি অস্পৃশ্যের বিদ্যারম্ভ পবিত্র করেনি।

এতগুলি ত্রুটি-অনিয়ম সত্ত্বেও সেই কাজটি আজ সর্বাঙ্গসাধক সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। মা সরস্বতীর হাস্যচ্ছটা নিকষের উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণরেখাটির মত, কঠিন অজ্ঞানান্ধকারের কোন্ স্থানটি প্রথম আলোকিত করিয়াছিল তাহার উদ্দেশ নাই। কিন্তু তাহারই বিস্তৃতিতে আজ ত্রিলোক উদ্ভাসিত।

আশা জন্ম নিলো। তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

সিদ্ধার্থ দেখিতে দেখিতে চলিল, সে এক আশ্চর্য মায়াপুরী—সেখানে কর্কশ শব্দ নাই, দুর্নীতির গণিকাবৃত্তি নাই, অভাবের প্রেমনৃত্য নাই।

সে যেন মেঘরাজ্যের অপর পারের দুষ্প্রবেশ্য কল্পলোক—তাহার মূর্তি দেখিয়া আসিয়া সিদ্ধার্থের প্রলুব্ধ মন নিত্যকার জীবনের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া দিলো।

বন্দী অতি গোপনে শৃঙ্খল কাটিতে লাগিল। তারপর সে সুকৌশলে পথ কাটিয়া কাটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শৈলশৃঙ্গে।

সেখানে একটিমাত্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। গোলাপের দলে দলে অফুরন্ত সৌরভ, সদ্যোত্থিত সূর্যের মত তার রঙ। তার মুখের উপর কখনো মেঘের ছায়া, কখনো আকাশের আলো।

কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ। অপরদিকে অতল অন্ধকার, তার নীচে পাথর। পড়িলে অন্ধকারের উদরে দেহ চূর্ণ হইয়া মিলাইয়া যাইবে।

সিদ্ধার্থ শিহরিয়া চোখ বুজিল। কিন্তু সে রাত্রি তার পায়চারি করিয়াই কাটিল, চোখে ঘুম আসিল না।

॥ আঠার ॥

অজয়া তাহার বাবার ও মায়ের তৈলচিত্রের সম্মুখে নতশির হইয়া বসিয়াছিল।

মনে মনে বলিতেছিল,—হৃদয় আসনস্থ দেবতা, আমার প্রণাম গ্রহণ করো। আমার স্বর্গত জনক-জননীর আত্মা তোমাতে বিলীন হয়ে বিরাজ করছেন। তোমার কণ্ঠে তাঁদের স্বর চিরমুখর হয়ে ফুটে আছে। তাঁরা তোমার কণ্ঠে আমার কুশল প্রার্থনা করেছেন—তাঁদের আশীর্বাদ সার্থক হোক।

তারপর মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মা, তোমার গভীর স্নেহার্দ্র চক্ষু আমার পানে চেয়ে হাসছে। পিতার হস্তের কল্যাণস্পর্শ আমার মাথার উপর নেমে এসেছে। আশীর্বাদ করো মা, যেন তাঁর বলিষ্ঠ উদার হৃদয়ের যোগ্যা হই। তোমার মত পুণ্যবতী হই। আশীর্বাদ করুন পিতা, যেন আপনার পুরুষকার, নিষ্ঠা এবং শক্তি আমাদের দু'জনাতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। আপনার অসমাপ্ত কর্ম যেন আমরা দু'জনায় সমাপ্ত করতে পারি ; যেন জীবনে শান্তিলাভ করি, যেন আপনার নামটিকে কখনো লজ্জা না দিই।—বলিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া অজয়া প্রোজ্জ্বলস্মিত বদনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলা বাহুল্য, এ বিবাহ হইবেই। অজয়ার এই প্রার্থনা সেই সম্পর্কে।

নিজেরই প্রার্থনার সুরের রেশ অজয়ার দ্বিধা-চিন্তাহীন অন্তরে তৃপ্তির মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল।

ননী আসিয়া খবর দিল,—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তোমাদের চেনেন।

—বুড়ো মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস বুঝি? শীগ্‌গির ওপরে নিয়ে আয়। দাদাকে খবর দিস।

কিন্তু দরজার সম্মুখেই ননীর সঙ্গে আগন্তুকের দেখা হইয়া গেল।

—তোমার নামটি কি অজয়া? তা হ'লে তুমি আমার দিদি। আমি সিদ্ধার্থর মাতামহ।

অজয়া সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল।

অজয়ার মাথার উপর হাত রাখিয়া কাশীনাথ আশীর্বাদ করিলেন,—সৌভাগ্যবতী হও, ধন্য পুরুষ তোমাদের বংশধর হোক। রজতবাবু কোথায়?

—বসুন, তিনি আসছেন।

—বসি। কিন্তু এই যে বসলাম, কবে যে উঠবো তার কিন্তু ঠিক নেই। কাগজে পড়লাম সিদ্ধার্থকে তুমি বেঁধেছ। ভাবলাম, সিদ্ধার্থকে যে বেঁধেছে, সে কেমন মেয়ে একটিবার তা দেখে আসি। তাই এলাম—তোমাকে আর সিদ্ধার্থকে নিয়ে যাবো ব'লে। দিদিমা বুড়িকে একটা প্রণাম ক'রে আসবে না? বুড়িও সঙ্গে আসবে ব'লে কোমর বেঁধে ছিল। সঙ্গে ক'রে তোমাদের নিয়ে যাবো শপথ করে তাকে থামিয়ে রেখে এসেছি।

অজয়া নতুন একটা আবেগ অনুভব করিতেছিল।

অচেনা এক নিমেষেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। মানুষকে আপন করিবার সহজ বুভুক্ষা তৃপ্ত হইয়া সেই তৃপ্তির আনন্দ-হিল্লোল অজয়াকে যেন আকুল করিয়া তুলিল।

কতদিক হইতে আনন্দ আসিতেছে তাহার ঠিক নাই।

পৃথিবী পরম সুন্দর। মানুষ পরম মিত্র।

অভিমানের সুরে বলিল,—তাঁকেও কেন নিয়ে এলেন না, দাদামশাই। বেশ হ'ত।

—সে অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক কথা। ক্রমশ শুনবে।

রজত তার সেই পুরাতন চোখের জলের নলটা হাতে করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইল।

অজয়া বলিল,—দাদা, ইনি সিদ্ধার্থবাবুর মাতামহ।

নমস্কারাদির পর রজত বলিল,—এসেছেন বেশ হয়েছে; একটা মাথা পাওয়া গেল—বন্দোবস্ত দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—রাজনগর থেকে।

—সিদ্ধার্থবাবু ত' আপনার কথা কখনো বলেননি!

—কেন বলবে? আমরা যে তার বন্ধন! আমাদের কথা ত' সে মুখে আনবে না। কিন্তু এইবার—

বলিয়া কাশীনাথ অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন।

রজত বলিল,—এবার তাঁর অনেক পরিবর্তন দেখবেন।

—স্পর্শমণি ছুঁয়েছে যে, পরিবর্তন ত' হবেই।

—আপনি কোথায় পেলেন এ-খবর?

খবরের কাগজে। আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি—শুধু তাকে কেন—ফাঁদ-শিকার দু'টিকেই। সিদ্ধার্থ আমাদের বড় আদরের পাত্র। আমাদের পুত্রসন্তান নেই; দু'টি কন্যা। তার একটি স্বর্গে, একটি বিধবা। রক্তের ধারা পুরুষের মধ্যে কেবল সিদ্ধার্থের দেহে বইছে; সেই ধারা বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে আসছিল—এমন সময় এই খবরটি পেয়ে বড় আনন্দে ছুটে এসেছি। তোমাদের দুটিকে দেখে আমার আসা সার্থক হয়েছে।—বলিয়া তিনি অজয়ার মাথার উপর পুনর্বার হাত রাখিলেন।

অজয়া বলিল,—দাদা, উঁনি দিদিমাকে কেন সঙ্গে আনেননি জিজ্ঞাসা করো। দিদিমা এলে কেমন আমোদ হ'ত।

যে যেখানে আছে সবাইকে সে আজ একান্ত নিকটে চাহিতেছে।

কাশীনাথ বলিলেন,—তা হ'ত। সে কথা থাক। তোমাদের কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে—মনে থাকতে ব'লে রাখি। ভেবো না যেন, বুড়ো গাছে না উঠতেই এক কাঁদির স্বপ্ন দেখছে।

রজত বলিল,—বলুন। আপনি আমাদের গুরুজন।

—বেঁচে থাকো, সুখী হও। আমি জীবনে অনেক শোক পেয়েছি; ছেলে-মেয়ে-জামাতায় আমার পাঁচটি চিতায় উঠেছে।—বলিয়া একটু থামিয়া কাশীনাথ বলিতে লাগিলেন,—আমার কেউ ছিল না। তোমরা আমার পরমাত্মীয় হ'লে। সিদ্ধার্থ আমার উত্তরাধিকারী—আমার স্থাবর-অস্থাবর যে সম্পত্তি আছে তার মুনাফায় একটি পরিবারের রাজার হালে চলে। তোমাদের হাতে সম্পত্তি তুলে দিয়ে বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে আমরা কাশীবাসী হ'তে চাই। বলো দিদি, সিদ্ধার্থকে সঙ্গে নিয়ে সম্পত্তি দখল ক'রে বসবে?

অজয়া বলিল,—বসবো, আপনাকে ছুটি দেব ; কিন্তু সে-কথা এখন কেন দাদামশাই !

—বলিয়ে নিলাম, যদি পরে সময় না পাই। মনে হচ্ছে এই কথা ক'টি কারো কানে ব'লে যাবার জন্যেই বেঁচেছিলাম।

—বলেছেন ভালই করেছেন। কিন্তু আমায় আপনার ক্ষমা করতে হবে।—বলিয়া রজত অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাব ধারণ করিল।

কাশীনাথ কহিলেন,—অপরাধ ?

—অপরাধ আমি করেছি। সিদ্ধার্থবাবু গৃহহীন—নিঃসম্বল ব'লে এ বিবাহে আন্তরিক মত আমার ছিল না।

অজয়া বলিল,—আমাকে ত' তা বলনি, দাদা !

—না বলেছিলেন, ভালই করেছিলেন, বৃথা একটা অশান্তির সৃষ্টি হ'ত। এখন যদি মত হয়েছে তবে আয়োজন শেষ ক'রে ফেলো—আমার তর সইছে না।

বিমল রাস্তার দিককার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সুরেনের আসিবার কথা আছে, তাহারই প্রতীক্ষায়।

সে সেখানে হইতে বলিয়া উঠিল,—দিদি, সিদ্ধার্থবাবু আসছেন।

শুনিয়া কাশীনাথ আকুল হইয়া উঠিলেন—"কই, কই" করিতে করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন, রজতও গেল।

কাশীনাথ রাস্তার দু'দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কই ?

রজত বলিল,— ঐ যে তিনি আসছেন। আপনি চেনেন না তাঁকে ? অমন করছেন কেন ?

কাশীনাথ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। মুখাবয়ব এমনই শুষ্ক যেন তাঁর আয়ুষ্কাল দুঃসহ ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে—তাঁর লোমচর্মের উপর দিয়া নিদারুণ একটা কণ্টকতরঙ্গ বহিয়া গেল।

অজয়াও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাশীনাথের কণ্ঠে হিক্কার মত দু'বার কঠিন দুটি শব্দ হইয়া স্বর যখন বাহির হইল, তখন তাঁহার মন যেন বিকৃত।

হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—আমি পালাই।

পরক্ষণেই বলিলেন,—না পালাব না।—বলিতে বলিতে যে-রকম তিনি করিতে লাগিলেন সে ছটফটানির বর্ণনা নাই।

অজয়া ও রজত অপার বিস্ময়ে অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কাশীনাথ বলিলেন,—সিদ্ধার্থকে তুমি খুব ভালবাসো ? বলো, লজ্জা কি ! আমি যে তোমার দাদামশাই !

বৃদ্ধের যেন কিছুরই দিশা নাই। অজয়া নিরুত্তরে মাথা নত করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু সিদ্ধার্থের যে আর একদণ্ড পরমায়ু ; সে যে বাঁচবে না।

অজয় চমকিয়া উঠিল,—সে কি ? কি বলছেন আপনি ?

হঠাৎ অজয়া বৃদ্ধকে পাগল ঠাওরাইয়া বসিল।

—অদৃষ্ট আমার, বলতে হচ্ছে, কিন্তু মিথ্যে বলছিনে। ভগবান, দুষ্টের দমন কি

তুমি এইভাবে করছ ! দিদি, আমার আরো কাছে এসো—তোমার মুখখানি ভাল ক'রে দেখি। বিধাতা, এত বড় আঘাতটা এই ফুলের বুকে নিক্ষেপ না করলে কি তোমার রাজত্ব অচল হয়ে যেত !—বলিতে বলিতে কাশীনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এইসব উচ্ছ্বাসে রজতের খুব বিরক্ত বোধ হইতেছিল—সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অজয়া বলিল,—শান্ত হোন। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিনে। কি হয়েছে বলুন।

—বলবো বই কি ; বলাতেই ত' ভগবান আমায় সময় উত্তীর্ণ না হ'তে দিয়ে টেনে এনে তোমাদের মধ্যে ফেলেছেন।

সিদ্ধার্থের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল।

কাশীনাথ একেবারে আলুথালু হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন—তোমরা থাকো—আমিই এগিয়ে যাই।

সিদ্ধার্থের চোখের জ্যোতিঃটা ফিরিতেছিল। বৃদ্ধ কাশীনাথকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া সেইটাই আগে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল।

তারপর ত্রাসে কি কিসে কে জানে তাহার মূর্তি এমন বেপথমান বিবর্ণ হইয়া উঠিল যেন সে রোগশয্যা ছাড়িয়া এইমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে ভিতরকার যে পশুটাকে এতদিন সে সযত্নে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল সেইটাই জাগিয়া উঠিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।

এত কাণ্ড ঘটিতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় গেল।

রজত বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু, চিনতে পারছেন না ? ইনি আপনার মাতামহ।

বৃদ্ধ সিদ্ধার্থর মাতামহ নন। কিন্তু তাহাকে সে চিনিয়াছে। এবং তন্মুহূর্তেই সে বুঝিয়াছে যে, তাহার এখানকার লীলার উপর শেষ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে।

সে মরিয়া হইয়া উঠিল ; বলিল,—চিনেছি। চিঠিগুলি সব আমার কাছেই আছে।

শুনিয়া কাশীনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মানুষ কদাচিৎ নিঃশেষে রিক্ত হয়। মনের নিভৃততম কোণে এতটুকু ভাগ্য পরিবর্তনের আশা তার বুঝি থাকেই।

কিন্তু যে নিঃশেষে রিক্ত হয় তার উল্লাসের বীভৎসতা এত কঠোর যে, অপরে তার আকস্মিক প্রকাশ সহ্য করিতে পারে না। বৃদ্ধের হাসির শব্দে রজত আর অজয়া উভয়েরই বুক কাঁপিতে লাগিল।

খানিক হাসিয়া কাশীনাথ যখন থামিলেন, তখন তাঁহার শ্লথচর্ম দৃঢ় আর চোখের দৃষ্টি শানিত হইয়া উঠিয়াছে ; বলিলেন,—তোমরা সিদ্ধার্থ বলছ কাকে ? ওর নাম নটবর। বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের জারজপুত্র ও।

অজয়া আতর্নাদ করিয়া উঠিল,—কি ? কি ?

—পরিচয় দেয়া এখনো শেষ হয়নি। এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাচর ছিল, অর্থলোভে ও তার পরিচর্যা করতো।

অজয়া বলিল,—উত্তেজিত হবেন না। ইনিই কি সেই লোক ? ভুল করেননি ত' ?

কিন্তু ভুল তিনি করেন নাই। আদ্যন্ত ইতিহাস তিনি বলিয়া গেলেন।

আপন বিধবা কন্যার প্রেমপাত্র ছিল যে ও, সে কথাটিও বাদ দিলেন না। বলিলেন,

—কেবল ভালোবেসেছিল সে, দেখা হয়নি। তারই চিঠি ওর কাছেই আছে, সেই ভয় দেখাচ্ছিল—ধরো ধরো, অজয়া প'ড়ে যাচ্ছে।

রজত অজয়াকে ধরিয়া চৌকিতে বসাইয়া দিলো।

বলিল,—আর কোনো প্রমাণ আছে ?

—আছে। ওর জামার আস্তিন তুলে দেখ, ওর নামের আর সেই বেশ্যার নামের আদ্যক্ষর দু'টি হাতের চামড়ায় লেখা আছে।

রজত নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল,—সত্য ?

নটবর বলিল,—সত্য।

কাশীনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—তুই কেন এ কাজ করলি ? কেন তুই মানুষের সর্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছিস ? বল্ সিদ্ধার্থ কোথায় ? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি ?

নটবর সে-কথা কানেও তুলিল না। রজতের দিকে চাহিয়া অসঙ্কোচে বলিল,—ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত' সেই মানুষ !

রজত বলিল,—তুমি এত বড় অভ্যস্ত পাষণ্ড যে কোথায় তোমার অপরাধ তা তোমার চোখে পড়ছে না। যাও !

—কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই !

অজয়ার বুকের ভিতর কি ঘটিতেছিল তাহা তার অন্তর্যামীই জানেন। সে মুখ ফিরাইয়া চোখ বন্ধ করিয়াছিল, বলিল,—দাদা, ও'কে যেতে বলো।

—যাই।—বলিয়া নটবর প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাশীনাথ লাফাইয়া উঠিলেন।

—ব'লে যা শয়তান, আমার সিদ্ধার্থ কোথায় ?

—কোথায় তা জানিনে, স্বর্গে কি নরকে ; তবে সে বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই ?

নটবর যাইতে যাইতে মুখ না ফিরাইয়াই বলিয়া গেল, —না।

---

মহিষী

## উৎসর্গ

ওঁ

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।

**ক্ষীরোদচন্দ্র রায়**
চিরজীবিষু

## ॥ এক ॥

পিতৃবিয়োগ যদি ঘটে তবে ষাট বিঘা লাখরাজ ভূমির মালিকানা স্বত্ব বর্তিবে, তৎসহ অন্দরের চার ভিটায় চারখানি ছোট বড় মাটির ঘর, কোঠা সমেত আরো একখানা ঘর আর উঠান, উঠানের মধ্যস্থলে একটি তুলসীমঞ্চ, বাহিরের একখানা ঘর ও অঙ্গন—

অশোক এই সম্পত্তির মালিক হইবে ; কিন্তু সে যুবরাজ।

কিনু সরকারের তিন পুত্র, তন্মধ্যে অনন্ত জ্যেষ্ঠ—

ক্ষেত্রনাথের চার পুত্র, তন্মধ্যে জ্ঞানবিকাশ জ্যেষ্ঠ—

কমল চক্রবর্তীর পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে অনঙ্গ জ্যেষ্ঠ—এমনি আরো ঢের আছে। কিন্তু তারা কেউ যুবরাজ নয়। যুবরাজ কেবল ব্রজকিশোরের পুত্র অশোক। ব্রজকিশোর রাজা নন এবং কদাচ ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ কেহ রাজা ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতিও নাই ; কিন্তু এটা সত্যই যে তাঁর পুত্র অশোক যুবরাজ।

ব্রজকিশোর নকড়ি ঘোষের তেজারতি সেরেস্তার হেড মোহরের ; কিন্তু তাঁর এমনি কৌশল যে, নকড়ি তাঁর টাকার কাঁড়ির ও-পিঠে বসিয়া টাকাগুলি ব্রজকিশোরের দিকে ক্রমাগত আগাইয়া দিয়া সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, সৎসঙ্গ ও অনিত্যতায় মগ্ন হইয়া গেছেন—যা করেন ব্রজকিশোর। তিনি যা করেন তাই মঞ্জুর—খাতকের সুদ মকুব করিতে ব্রজকিশোর, মামলা সোলে করিতেও তিনি, আবার নকড়ির পুত্রের বিবাহে পণ স্থির করিতেও তিনি। ভাগ লইয়া, বখরা লইয়া, দস্তুরী লইয়া, ঘুষ লইয়া ব্রজকিশোর আজ টাকার মানুষ ; তবে টাকার পরিমাণ গোপন আছে। ব্রজকিশোর ইচ্ছা করিলেই বাসের নিমিত্ত অট্টালিকা তুলিতে পারেন, কিন্তু তোলেন নাই।

বাবুর মেচেতাপড়া একতালা দালানটির সন্নিকটেই ভৃত্যের অট্টালিকা বড় বিসদৃশ ; অধর্মের সাক্ষী আর লোকের চক্ষুঃশূল হইবে মনে করিয়া সেদিকে ব্রজকিশোর হাত দেন নাই। বাবু অনিত্য সংসারের সহিত নির্লিপ্ত রহিতে লালায়িত বলিয়াই তাঁহারই টাকায় ভূসম্পত্তি স্বীয় নামে ক্রয় করা ব্রজকিশোরের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের যুবরাজ ঐ ব্রজকিশোরের পুত্র—

অশোক সুপুরুষ, বর্ণ গৌর, দেহ সুগঠিত সবল ; মোটের উপর এমন একটা অভিজাতশ্রী আর গাম্ভীর্য তার আছে যা সুলভ নয়। অশোকের যুবরাজ নাম পাইবার ঐ একটা কারণ।

আর একটি কারণ—লোকে জানিত যে নকড়ি ঘোষ এই অনিত্য সংসারে আরও কিছুদিন টিকিয়া গেলে নকড়ির রাজ-ভাণ্ডার অশোকের বাপ ব্রজকিশোরের নিত্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। এ-পারের মাটি ভাঙ্গিয়া ও-পারের কেউ রাজা হইয়া যায় ইহা কেবল জনরব নহে।

প্রকাশযোগ্য যে কারণটা তাহাই—অর্থাৎ অশোকের "চেহারাখানা" ধরিয়াই কে একদিন দৈবাৎ বলিয়াছিল, অশোকের চেহারা ঠিক রাজপুত্রের মত। রাজপুত্রগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই যুবরাজ—তাই অশোক যুবরাজ। অশোকের নামটা চাপা পড়িয়া তাহার যুবরাজ নামটিই বন্ধুমহলে ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে।

অশোক বিবাহযোগ্য ছেলে।

ভূসম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি ব্রজকিশোরের রক্তেই আছে। রক্তের চাহিদা অমান্য করিতে না পারিয়া ব্রজকিশোর চারদিকে চর রাখিয়া দিলেন। অপুত্রক কিন্তু সকন্যা কোনো ভূসম্পত্তিশালী "ঘরের" সন্ধান পাইলেই তাহারা জানাইবে।

প্রচারকার্যের দিক দিয়া কোনো খুঁত রহিল না। লোকমুখে দিগ্বিদিকে রটিতে লাগিল, ব্রজকিশোর পুত্রের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছেন।

দেশে হা-অন্ন হাহাকারের উপর হা-পাত্র রবটাও দিন দিন ক্রমোচ্চ পর্দায় আগাইয়া চলিয়াছে ; কাজেই দেখিতে দেখিতে ব্রজকিশোরের দুয়ারে তীর্থের কাকের মত পাত্রান্বেষীর ভিড় জমিয়া গেল ; এবং ব্রজকিশোর এই সুবর্ণসুযোগে কেমন "এক হাত" মারিয়া লন তাহা দেখিবার আশায় দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা হাঁ করিয়া ঘাড় তুলিয়া রহিল।

'ল' বলিতে আইনবিদ্যার উচ্চস্তরই বুঝায়—জিজ্ঞাসার উত্তরে অশোক বলে,—'ল' পড়ি। কিন্তু পড়ে সে মোক্তারি।

পাত্রীর অভিভাবকগণ একে একে 'ল'-পড়া ছেলে-শিকারে আসিতে লাগিলেন।

যে দেশের নাম পর্যন্ত এ দেশে অজ্ঞাত, যেখানে ছেলের খবর পেঁৗছিতে পারে বলিয়া কল্পনা করাও শক্ত সেখান হইতেও—

নন্দলালপুর সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে অবস্থিত ; একশো আঠার মাইল রেলপথ, তারপর গো-যান, তারপর নৌকায় নদীপার, তারপর পদব্রজে ছত্রিশ মাইল ; নক্ষত্রলোক নিকটবর্তী না হইলেও বোধ হয় ইহার চেয়ে সুগম—

কিন্তু সেখান হইতেও এক ব্যক্তি আশা করিয়া আসিলেন।

বিনীত দৃষ্টি, শান্ত কথা, কুণ্ঠিত আকার তাঁহাদের সবারই ; যেন বিবাহযোগ্যা মেয়েটি যে ঘরে আছে, আত্মকৃত সেই মহা অপরাধটা যত সবিনয়ে আর ক্ষমার্হ মূর্তিতে উচ্চারিত হয় ততই শুভ।

ল-পড়া ছেলেকে দেখিয়া তাঁহারা বিদায় লইয়া যান—আর বলিয়া যান ঘরের কথা ; সম্পত্তির মুনাফা কত, সম্পত্তি আবদ্ধ কি না, বেনামদার তাঁহারা কি না, বিঘা প্রতি কত বিশ ফসল ফলে···ইত্যাদি ইত্যাদি কত।

অনেককেই ব্রজকিশোরের পছন্দ হয় না—কোনোটা দূরের বলিয়া, কোনোটা পরিমাণে কম বলিয়া, কোনোটা একেবারে নিষ্কণ্টক নহে সন্দেহ হওয়ায়, কোনোটা মেয়ের বয়স কম বলিয়া, কোনোটা মেয়ের বয়স বেশী বলিয়া।

খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে বাতাসপুরনিবাসী মন্মথ চৌধুরীকে ব্রজকিশোরের পছন্দ হইয়া গেল। মন্মথনাথের কন্যাটি কেমন সে বিচার পরে হইবে ; মন্মথনাথের আর্থিক অবস্থা এবং তার নিষ্কণ্টকত্ব মুনাসিফ হইয়া এবং এই স্থানেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন সংকল্প করিয়া ব্রজকিশোর কন্যাকে দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

"আমি ক'রব বিয়ে, যাকে বিয়ে ক'রব তাকে আমি স্বচক্ষে দেখে নেব"—এই সব অপ্রচলিত এবং পিতৃবিচারের প্রতি অবিশ্বাসের কথাবার্তা কহিয়া যে যুবকগণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় অশোক তাহাদের দলে।

যুবরাজকে পাইয়া যুবকদলের বলবৃদ্ধি হইয়াছে। অশোক তাহার বন্ধুদের দিয়া বন্ধুদেরই জবানী বলিয়া পাঠাইল,—অশোক নিজে দেখলেই ভাল হয়, কাকাবাবু।

ব্রজকিশোর ভাবিলেন, এটা হিতোপদেশ—এবং প্রার্থনাটার অন্তরে বৃদ্ধকে তার অভিজ্ঞতাসহ বাতিল করিয়া দিবার চেষ্টা রহিয়াছে। বলিলেন,—আমি ত' চোখে ঝাপসা দেখিনে, বাপু!

অশোকের প্রতিনিধি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—আজ্ঞে আমি তা বলছিনে। সে চিরকাল যাকে নিয়ে বাস করবে তাকে নিজে দেখে নে'য়াই কি ভাল নয়?

—ভালই; কিন্তু তোমরা চেনো ফুল, মানুষ চেনো না। চেহারাটা সে চোখে দেখে আসতে পারে বটে, কিন্তু মনটা? সেটা তোমাদের কাছে যেমন অন্ধকার, আমাদের কাছে তেমন অন্ধকার নয়।—বলিয়া মানুষের মন জানিয়া ফেলিবার যে অভিজ্ঞতাটা তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, ব্রজকিশোর তাহারই একটা দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন; উপসংহারে বলিলেন,—মানুষের মুখ দেখতে দেখতে অভ্যাসে ওটা টের পাওয়া যায়। আমাদের এক ঝি রাখা হ'ল, বছর তিনেক আগেকার কথা; তোমার খুড়িমা রেখেছিলেন। মেয়েটির বয়স অল্প, বেশ লাজলজ্জা, কাজে-কর্মে কথাবার্তায় আপন-আপন ভাব। দেখে শুনে তোমার খুড়িমা দিব্যি নিশ্চিন্দ হ'য়ে গেলেন। আমি কিন্তু তাকে দেখেই বললাম, শীগ্‌গির ছাড়িয়ে দাও ঝিকে; ও চোর। তোমার খুড়িমা তখন রাগই করেছিলেন। কিন্তু করলে হবে কি—আমার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল—হাঁড়ি থেকে চাল চুরি করবার সময়েই একদিন সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

ব্রজকিশোরের এ গল্পটি সত্য, কিন্তু বোধ হয় "কাকতালীয়"।

ছেলেটির অবাক মুখের দিকে চাহিয়া ব্রজকিশোর পুনরায় বলিলেন,—আমাদের যত সেকেলে ঠাওরাও তোমরা, তত সেকেলে আমরা নই। বুঝলে কথাটা?

ছেলেটি বলিল,—আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি।

সেকেলে লোক বলিতে ছেলেরা কোটি চারেক বেকার সমষ্টি মনে করে, ব্রজকিশোর ঘুরাইয়া সেইটাই অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ছেলেটি তা বোঝে নাই।

বাতাসপুরের মন্মথ চৌধুরীর কন্যাটিকে ব্রজকিশোর দেখিয়া আসিয়াছেন—পছন্দ হইয়াছে। তিনি মেয়ের রং, চুল, হাতের লেখা, রুমাল সেলাই, মোজা-বোনা ইত্যাদি দেখিতে যান নাই—কানা কালা বোবা খোঁড়া কি না তাহাই দেখিতে গিয়াছিলেন; তা কিছু নয়।

ব্রজকিশোরের স্ত্রী রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন দেখলে?

—ভাল।

—রং কেমন?

—কেমন মানে?

—ফর্সা না কালো?

ব্রজকিশোর কস্মিনকালে জেরা সহ্য করিতে পারেন না; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিপক্ষের উকিলকে তাঁর চড়াইতে ইচ্ছা করে। একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,—তোমাদের ফর্সা-কালোর দিশে আমি পাইনে। তোমরা কালো কাকে বলো আর ফর্সা কাকে বলো?

রত্নময়ী বলিলেন,—ফর্সা বলি তাকে যে ময়লা নয়, আর কালো বলি তাকে যে ময়লা। তা যাক; মেয়ের রং আমাদের এখানকার কার মত?

ব্রজকিশোর খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—অণুর মত।

রত্নময়ী চমকিয়া উঠিলেন, অণুর মায়ের, অণু?—বলিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন; এবং তাঁহার নির্বাক মুখের দিকে চাহিয়া ব্রজকিশোরের হাসি পাইতে লাগিল।

হাসি পাইবারই কথা—

মন্মথনাথের বাস্তুভিটায়, গোলায়, খামারে, আর হিসাবের অঙ্কে যে অত্যুজ্জল লক্ষ্মীশ্রী ব্রজকিশোর প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই প্রভায় মুগ্ধ হইয়া অবশিষ্ট দিক কয়টি চাহিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তাই তিনি এখন পর্যন্ত অনুভব করেন নাই। মন্মথনাথের অত সম্পত্তির এককণাও দায়সংযুক্ত নহে—তাঁর বাড়ীর মাটির প্রত্যেকটি ধূলিকণা হইতে যেন ভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে।

মেয়ের রং কালো বলিয়া এ-সব ভোলা যায় না।

রত্নময়ী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—ছেলের মুখের দিকে একবার চাও। টাকাই কি বড় হ'ল!

তাঁর অন্তরের আরো অনেক কথা অনুক্ত রহিয়া গেল…

ব্রজকিশোর চাদর দিয়া পত্নীর অশ্রুবারি মুছিয়া দিলেন না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করিয়া কথাটা বিতং করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—ছেলের আমার রক্তেই জন্ম; টাকার দাম সে জানে। তুমি দয়া ক'রে তাকে ক্ষেপিও না; দেখো সে ঠিক পথেই চলবে। আর ভগবানের ইচ্ছায় তোমার ছেলের রং ধপ্‌ধপে আছে; ছেলে-মেয়েগুলো একেবারে মেঘবর্ণ হবে না আশা করা যায়। কালো মেয়ের যদি গুণ থাকে আর ভাগ্য-জোর থাকে তবে ত' সোনায় সোহাগা।

একটু বিশ্রাম লইয়া ব্রজকিশোর বলিতে লাগিলেন, আর ইসারার মত করিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিতে লাগিলেন—যেন বলিতে চান তোমাকেও ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিলাম, বর্তমান কথাটি কেবল তোমার আর আমার মধ্যে,—তুমি চুপচাপ থাকো, যেন কিছুই জানো না; আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

রত্নময়ী বলিলেন,—এখন ঠিক করে নিচ্ছ, কিন্তু পরে? পরে যদি বেঠিক হ'য়ে দাঁড়ায়?

ব্রজকিশোর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—তর্ক করলে আমি বলতে বাধ্য যে, স্ত্রীর গায়ের ফর্সা আর কালো রঙের উপর যে ছেলের সুখদুঃখ নির্ভর করে, সে ছেলের পরকাল সুবিধের নয়। মেয়েটির রং কালো হলেও মুখশ্রী ভাল, লাবণ্য আছে, গড়নও বেশ। আর যে রকম শুনলাম, তাতে সে কাজের লোকই।

বলিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিয়া ব্রজকিশোর নকড়ি ঘোষের তেজারতির হিসাব দেখিতে লাগিলেন।

অশোকের সেই প্রতিনিধি সুবোধ আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজকিশোর খাতার উপর হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন,—ব'সো। ভাবিলেন, বড় কষ্টেই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিতে হইতেছে।

সুবোধ বলিল,—বাতাসপুর থেকে কখন এলেন?

ব্রজকিশোর বলিলেন,—মেয়েটির রং কালোই, বাপু; কিন্তু কাজ আট্‌কাবার মত নয়।

বলিয়া সুবোধের মনের কথার উত্তরে নিজের সংকল্প জানাইয়া ব্রজকিশোর বলিলেন,—তোমরা ত' পদ্য গদ্য ঢের পড়েছ, জীবন যে পাশাখেলা নয়, দৈবাৎ তার জংগেই দান পড়ে না, তা বোধ হয় জানো।

সুবোধ বলিল,—তা জানি, কাকাবাবু; কিন্তু পুরুষকার ত' আছে। আপনি যা রেখে যাচ্ছেন, পুরুষানুক্রমে অশোক তার ফলভোগ করবে; পরের—

—ভয়ঙ্কর ভুল করছ। আমি যা রেখে যাচ্ছি, এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কেউ যা কিছু রেখে গেছে সব পরের কাছ থেকে নিয়ে। ঐ নেওয়ার নামই পুরুষকার।

—মাপ করবেন, আমি আর একটা কথা বলতে চাই।

—বলো।

—কর্মের পুরস্কার কি পারিশ্রমিক হিসেবে যে পাওয়া, সে পাওয়া আর এ পাওয়া কি এক?

—আংশিক একই বটে। কর্মের সঙ্গে সুবিবেচনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বধ। আচ্ছা, এখন এসো। অশোককে তোমরা বুঝিয়ে বলো যে তার অনিষ্ট কি অ-সুখ চিন্তা আমি করিনে।

—আজ্ঞে না না; তা কি কেউ ভাবতে পারে?—বলিতে বলিতে সুবোধ যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা বলিবার ফুরসৎ না পাইয়াই চলিয়া গেল।

অশোক 'ল' পড়ে বটে, কিন্তু মন তার, স্থূল পদার্থের মত, ভারকেন্দ্রের বাহিরে এ-পাশ ও-পাশ হইয়া চলিতে শেখে নাই। ধনবানের পুত্র বলিয়া তার দেমাক আছে, 'ল' পড়ে বলিয়া বড়াই আছে, গায়ে জোর আছে বলিয়া হুংকার আছে—

আর স্ত্রী রূপবতী হইবে বলিয়া আশা আছে। সুন্দরী স্ত্রী আর কোনো হিসাবে না হোক সামগ্রীসংগ্রহ হিসাবে মস্ত একটা জয়ের কথা।

কিন্তু শনির নজর পড়িয়া তার আশা-দেবতার মুণ্ডু উড়িয়া গেছে, তাহা আদৌ তার জানা নাই। বাপের সঙ্গে এই সূত্রে তার দু-একটি কথাই হইয়া গেল।

নিজের কেমন আড়ষ্ট লাগে বলিয়া অশোক দূত মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, কালো মেয়ে সে বিবাহ করিবে না।

শুনিয়া ব্রজকিশোর তাহাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, —তোমার মতের বিরুদ্ধে আমি কাজ করতে চাইনে। তোমার ইচ্ছে না থাকে, সে মেয়েকে বিয়ে ক'রো না।

অশোক বলিল,—যে আজ্ঞে।—বলিয়া অশোক উঠিতেছিল—

ব্রজকিশোর বলিলেন,—কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমার সন্ধানে আছে কি?

বাপকে ডিঙাইয়া নিজে কর্তা সাজিবার ধৃষ্টতা অশোকের ছিল না,—কিন্তু বাপের প্রশ্ন সেইদিকেই বক্র ইঙ্গিত করিতেছে মনে করিয়া অশোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; "আজ্ঞে না" বলিয়াই বাপের সম্মুখ হইতে সে পালাইয়া বাঁচিল। ব্রজকিশোর সেটি লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কিন্তু অশোককে বাতাসপুরের মন্মথ চৌধুরীর সেই মেয়েটিকেই বিবাহ করিতে হইল; বাপের সেকেলে বুদ্ধির কাছে অশোকের আধুনিক ল-পড়া বুদ্ধি হঠাৎ ফেল করিয়া গেল।···মোক্তারি পাশ করিয়া বড়লোক, এমন কি নিশ্চিন্ত হইবার আশা তার নাই; বৃক্ষতলবর্তী মোক্তার মহলের চারিদিকে চাহিয়া লক্ষ্মীশ্রী তার চোখে পড়ে না।···অশোক নিঃসন্দেহ যে, ব্যাপার সুবিধার নয়; তাই বাপের টাকার দিকেই সে দৃষ্টি হানিয়া ফিরিতেছে, যেমন ফিরিতে হয়।

মান্নষের মনের এই দ্নর্বলতাটুকু রজকিশোরও জানেন ; বিশেষ অশোক তাঁর আত্মজ।

অশোকের অনিচ্ছা ব্নঝিয়া বাতাসপ্নরের সম্বন্ধটা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং অন্যত্র স্নন্দরী পাত্রীর সন্ধানে ব্যস্ত আছেন, প্রকাশ্যে এই ভাব দেখাইয়া তিনি একটা গল্প রচনা করিয়া চালিত করিয়া দিলেন। গল্পটি এই—

তিনি একখণ্ড দানপত্র সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, শীঘ্রই করিবেন ; স্নন্দরী একটি পাত্রী পাইলেই প্নত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া তিনি ব্রজবাসী হইবেন। আজন্ম সংসারের সেবা করিয়া তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে বাতাসপ্নরে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, বিবাহ হইবেই ; তাঁরা যেন ব্যস্ত না হন। সম্প্রতি একটি জটিল বিষয়-কর্মে তিনি নিতান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ; সেই গোলটা মিটিলেই···ইত্যাদি।

ব্রজকিশোর আরও বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, লেখাপড়া শিখিয়া ছেলে যথেষ্ট মান্নষ হইয়াছে ; এখন শ্নধ্ন তাহাকে আগ্নলাইবার মায়ায় ধর্মকর্মাদি স্থগিত রাখিয়া সংসারে বসিয়া থাকিতে তাঁর আর ইচ্ছা হয় না। সাধ্নসজ্জনের আশ্রয় এক ধর্মশালাতেই টাকা ক'টি অর্পণ করিয়া যাইবেন—কাহারো নিষেধ মানিবেন না ; ম্নলচাঁদ আগরওয়ালার সহিত তাঁর কথা-বার্তা চ্নড়ান্ত হইয়া গেছে। ছেলে পাশ-টাশ দিয়া সম্প্নর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে এইটি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেই সম্প্নর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন ; কিন্তু সে যখন মোক্তারি পড়িতেছে তখন তার ভবিষ্যৎলক্ষ্মী নিশ্চয়ই স্নপ্রসন্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।···টাকা বওয়া তাঁর বংশের রীতি ; অতএব তিনি কিছ্ন না দিয়া গেলেও ছেলে আপন ক্ষমতাতেই যশ অর্থ প্রভৃতি অর্জন করিয়া, তিনি যেমন রাখিতেছেন ততোধিক স্নখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

ব্রজকিশোরের কণ্ঠ বেড়িয়া দ্ন'নর তুলসী-কাঠের মালা থাকিত। সেইটাকেই ত্যাগমধ্নর বৈরাগ্যের অঙ্কুর মনে করিয়া কেহ কেহ গ্নজবটা বিশ্বাস করিল।

হরিনাম শ্ননাইয়া এক ভিখারী একদিন একটা সিকিই লইয়া গেল—এমনটি আর কোনোদিন ঘটে নাই। তাঁর দরাজ দানটা আর চোখের জল অনেকে দেখিল ; এবং কথাটা অশোকের কানে উঠিতে দেরী হইল না। লোকে যেন ভয় পাইয়া সংবাদটা তাড়াতাড়ি তার কানে তুলিয়া দিলো।

শ্ননিয়া অশোক মনে মনে একটা তুলাদণ্ড বসাইয়া তার একদিকে চাপাইল কাল্পনিক স্নন্দরী স্ত্রীকে, অপরদিকে চাপাইল বাপের টাকাগ্নলিকে।·· প্রথমটা তুলাদণ্ড সমতালে দ্নলিতে লাগিল, কোন্নদিকে ওজন বেশী তাহা ধরা গেল না। তারপর এক-একবার মনে হইতে লাগিল, টাকার দিকটাই যেন বেশী ভারি ; আর-একবার মনে হইতে লাগিল—না, ওইদিকটাই, যেদিকে স্নন্দরী স্ত্রী।···তারপর একদিন টাকার দিকটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝ্নঁকিয়া পড়িয়া একেবারে অনড় হইয়া রহিল—আর তার উঠিবার গতিক দেখা গেল না।

কথাটা এই—স্নন্দরী স্ত্রী অনেকেরই আছে ; তাদের কেউ ভাল, কেউ ম্নখরা, কেউ কুড়ে, কেউ অবাধ্য, কেউ বাব্ন ; স্নতরাং স্ত্রী স্নন্দরী হইলেই যে একেবারে কণ্টকশ্নন্য ছাঁকা স্নখ পাওয়া যাইবে তাহার স্থির নিশ্চয়তা কিছ্নই নাই।

এখানকার মাখনবাব্ন ত' স্নন্দরী স্ত্রীর স্বামী ; কিন্তু তাঁর ম্নখের পানে তাকাইলে লোকের কান্না পায়। তিনি স্ত্রীর আটপৌরে কথার ঝাঁঝেই ঘরে তিষ্ঠিতে পারেন না ;

তের ঘণ্টা আপিসে, আর একার ঘণ্টা ফটিকবাবুর বৈঠকখানায় কাটান ; বাড়ীর উপরকো যখন তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়া পোষাকী আলাপ বাহির হইতে থাকে তখন ও...

যাক। কাজেই দৈব, নিগ্রহ অনুগ্রহ দুটি দিকের যে কোনোটাকে অবলম্বন করিতে পারে। কালো স্ত্রী প্রীতিময়ী, সেবাশুশ্রূষাপরায়ণা হইয়া এবং অন্যান্য বিবিধ গুণে সুন্দরী স্ত্রীর উপর টেক্কা মারিতেও পারে...সম্পূর্ণ দৈবের হাত সেটা—

কিন্তু টাকা একেবারে নির্দ্বন্দ্ব, জাজ্জ্বল্যমান।

...আরো অনেক দার্শনিক তত্ত্ব অশোকের মস্তিষ্কে আলোড়িত হইতে লাগিল।

ইহকালের সুখচর্চার উদ্দেশ্যে ভার্যা সংগ্রহ করা আমাদের শাস্ত্রনিন্দিত ব্যাপার ; তাহার তুল্য পাতক আর নাই ; কৃষ্ণকায়া স্ত্রী যদি সুশীলা ও সাধ্বী হইয়া স্বামীর সহধর্মিণী হন, আর দরদ বোঝেন, তবে তার চেয়ে সৌভাগ্য বাঙালী হিন্দুর আর কি হইতে পারে ? ...ইত্যাদি আরো কত।

স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

ব্রজকিশোর বলিলেন,—বিষ্টুপুরে একটি সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। দেখতে যাব।

—বাতাসপুরেরটা ?

—কালো ব'লে যে তোমার ছেলের মন সরছে না।

—বিষ্টুপুরের ওরা দেবে-থোবে ত' ?

—আগে দেখে-শুনে আসি।...আর দেনা-পাওনার দিকটা দেখতে তেমন রুচি আর আমার নেই—অনর্থক অর্থবিলাস সেটা। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি ; সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, উপার্জন করবে, খাবে ; আমার কিঞ্চিৎ আর শ্বশুরের কিঞ্চিৎ কুড়িয়ে সে তাল বানাবে এটা সত্যিই ভাল নয়। আজকালকার ছেলেদের আর কিছু না হোক স্বতন্ত্রজ্ঞানটা বেশ জন্মেছে।—বলিয়া ব্রজকিশোর গাম্ভীর্যের উপর চোখ মট্‌কাইতে লাগিলেন ; কিন্তু রত্নময়ী তিমিরেই রহিয়া গেলেন।...

অশোককে ডাকা হইয়াছিল—সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজকিশোর বলিলেন,—বিষ্টুপুরে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। যে রকম শুনছি তাতে সে মেয়ে অপরূপ সুন্দরী হবে ব'লেই মনে করি। এবার কিন্তু আপত্তি ক'রো না।... প্রভাসবাবু উকিলের কাছ থেকে আমার দানপত্রের খসড়াটা এখনি গিয়ে নিয়ে এসো ; অদল-বদল কিছু যদি করবার থাকে তবে ক'রে যাব।

তুলাদণ্ডে টাকার দিকটা ভারি হইয়াছিল।

অশোক মাথা নীচু করিয়া বলিল,—এত তাড়াতাড়ি কি !

—তাড়াতাড়ি কিছুই নয় ; তবে আসছে মাসের মধ্যেই তোমার বিয়েটা দিয়ে ফেলে আমরা তীর্থে যেতে চাই।

বলিয়া ব্রজকিশোর থামিলেন। কিন্তু তাঁর তীর্থগামী কণ্ঠস্বর যেন খড়ের চালের আর মাটির দেয়ালের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অশোকের কানের কাছেই মধুপগুঞ্জনের মত ঘুরিতে লাগিল।...ঐ তীর্থে যাওয়ার কথাটা বড় সাংঘাতিক। অশোক গুজব শুনিয়াছে, পিতা তীর্থে যাইবার পূর্বেই দানপত্রে সহি করিয়া যাইবেন।

রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যি যাবে না কি তীর্থে ?

—অশোক গেছে ?

—হ্যাঁ এই বেরিয়ে গেল।

ব্রজকিশোর তখন তার্থ এবং দানপত্রের যথাবিহিত অর্থটা পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। রত্নময়ীর এ বিষয়ে বক্তব্য কিছু আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্রজকিশোরের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখা গেল না—জানাইবার সময়ই তিনি দিলেন না।

পথেই অশোক দানপত্রের খস্‌ড়া পড়িয়া দেখিল—

তাহার জন্য আড়াই হাজার টাকা।

অর্থাৎ সে 'ল' পরীক্ষায় পাশ করিবার পর পশার জমাইয়া লইতে আনুমানিক যতদিন লাগিতে পারে মাস হিসাবে ততদিনের সংসার-খরচটা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে …মাত্র এই।…অবশিষ্ট টাকায় অনেকগুলি সৎকর্ম সংসাধিত হইবে—দানপত্রের খস্‌ড়ায় তাহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দানপত্রের খস্‌ড়া লইয়া অশোক যখন ফিরিল, ব্রজকিশোর তখন বাড়ীতে ছিলেন না, আর অশোকের মুখ শুষ্ক এবং অন্ধকার।

রত্নময়ী ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—হাতে ও কাগজ কিসের তোর?

—বাবার সেই দানপত্তর।…সব টাকা দান করেছেন; আমায় দিয়েছেন মাত্র আড়াই হাজার টাকা।

শুনিয়া রত্নময়ী চমকাইলেন না—তিনি ষড়যন্ত্রের ভিতর আছেন, ইহা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে ব্রজকিশোরের কঠিন নিষেধ ছিল।

রত্নময়ী পরিষ্কার নির্লিপ্তভাবে বলিলেন,—তাতে এত ভাবনা কিসের তোর? তুই ত' অমনি নোস্। —বলিতে বলিতে কপ্‌ করিয়া চুপ করিয়া তিনি ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

ছেলের হতাশ মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একটা ব্যথা বাজিয়াছিল।

অশোক যতই সক্ষম হোক, ক্ষমতার সীমা অর্থাৎ মোক্তারির মেক্‌দার সে দেখায় জানে।… ল-বুক সম্মুখে লইয়া সজল চক্ষে অশোক সেইদিকে চাহিয়া রহিল, আর তার কৌমার্য জ্বলিতে লাগিল তাহাদের স্মরণ করিয়া যাহারা কেবল পরোপকার করিতে তার দৌত্য গ্রহণ করিয়া পিতার কাছে ওকালতি করিতে গিয়াছিল—ভারি আমার ইয়েরা সব, হিতৈষী!

ব্রজকিশোর একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—কাগজ এনেছিস?

—এনেছি।—বলিয়া অশোক আগাইয়া দিলো। ব্রজকিশোর চাহিয়াও দেখিলেন না যে, ছেলের মুখ বেঁকিয়া কতখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বলিলেন,—দেখব'খন।…বাতাস-পুরের চিঠি পেলাম; তাঁরাও একবার যেতে লিখেছেন। কোন্‌দিকে আগে যাই তাই ভাবছি। তোর মাকে শুধিয়ে আয় যে, দু'জায়গা থেকেই চিঠি এসেছে—বাবা জানতে চাইছেন, কোথায় আগে তিনি যাবেন। আমি ততক্ষণ কাগজটা প'ড়ে ফেলি। সময় কম।

অশোক উঠিয়া গেল এবং ব্রজকিশোর সেই মূল্যবান কাগজের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

অশোক খবর লইয়া ফিরিল না। কি আসিয়া খবর দিলো,—মা ডাকছেন।

হাসিতে হাসিতে ব্রজকিশোর উঠানে নামিয়া দেখিলেন, রত্নময়ী চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

—কি খবর ?
রঙ্গময়ী বলিলেন,—রাজি হয়েছে।
—হবেই ত', বংশটাই স্বয়ং চিকিৎসক।

## ॥ দুই ॥

অশোকের বিবাহ হইল বাতাসপুরের মেয়েটির সঙ্গেই—তালের সঙ্গে তালের মিলের মত বাতাসপুরের সঙ্গে উচ্‌করণের মিল হইয়া সন্ধিস্থলে উল্লাসের তুফান বহিতে লাগিল।

বরযাত্রিগণের অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন যাহা হইয়াছিল, তাহাকে রাজকীয় বলা চলে—প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র শয্যা, স্বতন্ত্র চেয়ার, টেবিল, সাবান, তোয়ালে, পানের ডিবে, বাতিদান, পিক্‌দানী, সিগারেট কেস্‌ প্রভৃতি।

সম্প্রদানের সময় দুই পক্ষের পুরোহিত মন্ত্রের পূর্বাপরতা আর শুদ্ধি-অশুদ্ধি লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিতণ্ডা চালাইয়াছিলেন—

উভয়েই জানিতেন পণ্ডশ্রম করিতেছি—তবু সহসা নিরস্ত হইতে চান নাই।

কিন্তু পক্ষদ্বয়কে তাহা স্পর্শও করে নাই, একটু আমোদ দিয়াছিল মাত্র।

মন্মথনাথের সম্পত্তি গয়রহ'র সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিয়া রেজেষ্টারী আপিসে ফিস্‌ দিয়া ব্রজকিশোর জানিয়া লইয়াছিলেন, সেগুলি সম্পূর্ণ দায়নির্মুক্ত, কোথাও তার এক কাঠা আট্‌কা পড়িয়া নাই।

পণ লইয়াছেন ঢের—দানসামগ্রী উপঢৌকন যৌতুক আর অলংকারও প্রচুর ও প্রথম শ্রেণীর। কাজেই তাঁর ডাক-হাঁকের দাপে তাঁর গলার মালা ফাট্‌ফাট্‌ করিতে লাগিল।

বউ দেখিয়া উচ্‌করণের কেহ ছিছি-ও করিল না ; "আহা বেশ"—এমন কথাও কেহ বলিল না। ভালই হয়েছে—এই মতটা খুব প্রকটকণ্ঠে উচ্চারিত না হইলেও ব্যাপকভাবেই দেখা দিলো। রঙ্গময়ীর চোখেও মন্দ লাগিল না, চেহারা শ্রীসম্পন্ন ; এবং জনমত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হইলেও অননুকূল নহে।

উচ্‌করণেরই ভবেন ধরের ছেলের বৌ দেখিয়া ভবেন ধরের স্ত্রী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া যাঁতি তুলিয়া নিজেরই কপালে মারিয়াছিল এক ঘা।

নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তপাতের ফলে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা বলিবার নয়। সাতদিন না যাইতেই সেই বউটি তিনদিনের জ্বরে মারা গিয়াছিল।

এই মৃত্যুটিকে সীতার পাতাল-প্রবেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া গ্রাম্য কবি একটা গানই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, সে গান এখনও লোকে গায় ··

সেই কথাটা মনে পড়িয়া রঙ্গময়ীর বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল, এবং ক্ষোভের যে যৎসামান্য ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা সরিয়া গেল, ভাবিলেন—অশোক আমার বড় ছেলে নয়। তবু বউকে যদি সে ভাল না বাসে তবে তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

অশোক স্ত্রীকে পছন্দ করিয়াছে—অন্ততঃ বাহ্যিক লক্ষণ যাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, তাহা সেই সুখকর সুলক্ষণেরই অবয়ব।

অশোকের স্ত্রীর নাম জ্যোতির্ময়ী।

অশোক গোপনে তার একটি নামকরণ করিয়াছে। সেটা কেবল তারই সম্পত্তি, সেই নামটা মনে পড়িয়া যখন তখন, এমন কি 'ল'-বুকের দিকে চাহিয়াই সে সময়-সময় ফিক্ করিয়া একটু হাসে।...আহারে বসিয়া মায়ের সম্মুখে সে ত' একদিন অপ্রস্তুতেই পড়িয়া গেল—

ঘটনার মধ্যে, রত্নময়ী বলিয়াছিলেন,—তুই নুন বড় বেশী খাস।

অশোক স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিল 'নুন'। ঝোল বলো, অম্বল বলো, ডাল, তরকারী বলো, নুন বিনা সব বিস্বাদ। জ্যোতির্ময়ী তার জীবনে স্বাদস্বরূপিণী—এই ছিল কল্পনা।

মায়ের কথা শুনিয়া অশোক তাই হাসিয়া ফেলিল, সে হাসির রকম আলাদা।

রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাসছিস যে?

—অমনি। নুন বেশী আমি কই খাই? তুমি চিরকাল ব'লে আসছ, কিন্তু আমার ত' তা মনে হয় না।—বলিয়া অশোক প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

রত্নময়ী বিস্মিত হইয়া তার অকারণ চপল হাসির দিকে চাহিয়া রহিলেন।...

॥ তিন ॥

—যুবরাজ আছ হে?—বলিয়া হাঁক দিয়া বন্ধু গগনচন্দ্র বাহিরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। অশোক পুলকিত লজ্জিত মুখে বাহিরে আসিল; একেবারে পিছন ফিরিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

—এত কি কথা হে দিনরাত? দেখাই পাই না যে!—বলিয়া গগন তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে গগনের বকুনি আর বুকুনি ভাল করিয়া তার কানে যায় না। নুনের সঙ্গে যে কথা চলিতেছিল তাহারই ঝঙ্কার অশোকের অন্তর আর কর্ণ-কুহর ভরিয়া কুহরিত হইতে থাকে। তার ক্ষীণতম হাসিটুকু, মৃদুতম স্পর্শটুকু মর্মের সঙ্গে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া তার মনে হয়, এ স্মৃতি চিরদিনের মত অক্ষয় হইয়া রহিয়া গেল। তার চরণক্ষেপটি পর্যন্ত কত অপূর্ব, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন অশোকেরই অনুভূতির তরঙ্গশীর্ষ বাহিয়া ওঠানামা করিতে থাকে...

তার যে-কথায় নুন হাসিয়াছিল, সেই কথাটি আনন্দরসে টস্‌টসে হইয়া বারবার আনাগোনা করিতে থাকে।

...চলিতে চলিতে দশকথার মাঝখানে গগন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, -তোর বাবা তোকে ফাঁকি দিয়েছে রে।

সুখচিন্তার স্রোতের মাঝে অশোকও চম্‌কিয়া উঠিল,—কি রকম?

—হ্যাঁ রে। পরামর্শের ভেতর আমার মধুকাকা ছিলেন, মহেশ্বর ঘোষাল ছিল, শ্রীধর চাটুয্যে ছিল—এই ত্রিমূর্তি, তোর বাবা ত' ছিলেনই। - দানপত্তর-টত্তর সব মিছে কথা; তোকে ভয় দেখাতে করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের সুন্দরী মেয়ের কথা উনি বলেছিলেন না?

—হুঁ।

—সেটাও মিছে কথা। ঐ বাতাসপুরেই ঠিক ছিল, মাঝখানে তোমায় একটু খেলিয়ে নিয়েছেন।—বলিয়া গগন খুব হাসিতে লাগিল।

কিন্তু অশোকের প্রাণের রং মুছিয়া গেল।

বিবাহ এবং স্ত্রীলাভ এই দু'টি ব্যাপারকে সে একটা দুর্লভ লাভের সমাদর এবং মূল্য দিয়াছিল ; কিন্তু তাহার মূলে যে জুয়াচুরি আছে শুনিয়াই সেই মূল্যটির অঙ্ক গোলাকার একটি শূন্যে পরিণত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল।

ক্রোধও জন্মিল। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে তার ক্রোধ একেবারেই ক্লীব ; তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তিই নির্জীব —ঐ বিবাহ সম্পর্কেই তাহা জানা গেছে। কিন্তু অশোক অনুভব করতে লাগিল, গগনের মধুকাকা, মহেশ্বর ঘোষাল এবং শ্রীধর চাটুয্যের দর্শন পাইলে তাঁহাদের পূজ্যপাদে সে দু'চারিটি মনের কথা নিবেদন করিতে পারে।

বলিল—মধুকাকা আছেন বাড়িতে ?

—আছেন বোধ হয়।

—চল্, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

—ঝগড়া করবি নাকি ?—বলিয়া গগন অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ খুব গম্ভীর বটে।

অশোক বলিল,—না। ঝগড়া আমার কারু সঙ্গে করবার নাই।

…মধুকাকা বলিলেন,—অশোক এসো। সমাচার কি ?

অশোক সকাতরে বলিল,—সমাচার কিছুই নেই, কাকা। তবে একটা কথা বলি আপনাকে—আমাব বিয়েটা আপনারা ওভাবে না দিলেও পারতেন।

মধুসূদন কথাটা শুনিবার জন্য গলা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন ; গলা টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি ভাবে দে'য়া হয়েছে ?

—ভয় দেখিয়ে।

মধুসূদন হাসিতে লাগিলেন। অশোকের বিবাহ আর শুষ্কমুখে তার এই নালিশ করিতে আসা তাঁর রসজ্ঞানে বড় হাস্যকর মনে হইল।

অশোক বলিতে লাগিল,—আমাকে এমন হাস্যাস্পদ করা আপনাদের উচিত হয়নি বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে, কিন্তু অন্য উপায়ও বোধ হয় ছিল।

হাস্যাস্পদ হওয়ার কথায় মধুসূদন হাসি থামাইয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—বাপু, বুঝিয়ে বললে তোমরা যদি কথা শোনো তবেই একটা উপায় থাকে ; কিন্তু তোমরা ত' সেদিক দিয়ে যাবে না। কাজেই গত্যন্তর না দেখে তোমায় ফাঁকি দে'না গেছে।

ঐ ফাঁকি দিবার কথাটা মধুসূদন বড় অশুভক্ষণে উচ্চারণ করিয়া বসিলেন। ফাঁকি কথাটাই যেন ভদ্র নয়—ফাঁকির ভিতর সখত্ব ও সুহর্ষ আদান-প্রদানের হৃদয় নাই ; ফাঁকি দিয়া রাজা করিয়া দিলেও মানুষ ফাঁকিটা ধরিতে পারিলে বোধ হয় সুখানুভব করে না।

অশোকের অসুখী মুখের দিকে চাহিয়া মধুসূদন বলিতে লাগিলেন,—তাতে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান ত' হয়নি কিছু। বৌমার শ্রী-সৌষ্ঠব আছে শুনেছি। আর তোমার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আছে তার সিকি পেলে আমিই এই বয়সে—

যে কোনো কালো কুশ্রী মেয়েকে বিবাহ করিতে রাজি আছেন তাহা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভৃত্যের উদ্দেশে মধুসূদন বলিলেন,—ওরে, তামাক দে।

মধুসূদন অশোকের কেউ নয়, "গ্রাম সম্পর্কে" কাকা। তবু তাঁরই এই ঘৃণিত ব্যবহারে অশোক তার শ্বশুরের সেই সম্পত্তির উপরেই কায়মনে বীতস্পৃহ হইয়া গেল যার সিকি পাইলেই মধুসূদন এই বয়সেও বিবাহ করিতে রাজি হইয়া যান।

অশোক মনে মনে বলিল,—ক্যাডাভ্যারাস্।

পথে আসিতে আসিতে অশোকের মনে হইল, সে নিজেও ছোট, ইতর, লোভী—নিজের মনের স্বার্থচিন্তাগুলি যাহা আগে একভাবে ফুটিয়াছিল, সেইগুলির এখন আরশোলার কাঁচপোকায় পরিবর্তনের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে দেখা দিতে লাগিল।…বাবা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছেন সত্য ; দানপত্র জাল—ইহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু সে নিজেও ত' সম্পূর্ণ সাধু নহে—পুরুষোচিত ও বয়সোচিত ও ব্যক্তিত্বোচিত সহিষ্ণুতা সামর্থ্য সে দেখাইতে পারে নাই।…শ্বশুরের সম্পত্তি অগাধ হোক, অল্প হোক, তার প্রতি তার লুব্ধ দৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু পিতৃধনে বঞ্চিত হইবার শংকায় তার বুক শুকাইয়া উঠিয়াছিল ইহাও মিথ্যা নহে। সুন্দরী কন্যার সন্ধান করিতেছেন—ব্রজকিশোর ইহাও মিথ্যা করিয়াই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীর বিনিময়ে সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিতে ত' তাহার সাহস হয় নাই। বাপ ছেলের প্রকৃতি অধ্যয়ন না করুন অনুমান করিয়াছিলেন, এবং তাঁর অনুমানটি তার মনের বাস্তব মূর্তির সঙ্গে খাপে খাপে এমন মিলিয়া গেছে যে আর অস্বীকার করিবার পথই নাই।

নিজে আগ বাড়াইয়া সে ষড়যন্ত্রকে জয়ী করিয়া দিয়াছে। টাকা হারাইবার ভয়ে কালো মেয়েকে বিবাহ করিতে সে রাজি হইয়া গেলে মধুর বৈঠকখানায় নিজেদের চালাকির তারিফ করিতে করিতে বোধ হয় ঐ চারজনের মুখে হাসির অট্টরোল উঠিয়াছিল

এমনি করিয়া নিজের মনের আগুনে ধূপ ছিটাইতে ছিটাইতে এবং নিজেকে ভীরু, কাপুরুষ, নির্বোধ প্রভৃতি কুবাক্যে ধিক্কৃত করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিয়াই সর্বপ্রথম যাহার সঙ্গে অশোকের চোখোচোখি হইয়া গেল সে-ই জ্যোতির্ময়ী, ওরফে নুন—

চোখের উপর চোখ পড়িতেই জ্যোতি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একটি পলক পড়িতে যে সময় লাগে তাহারই ভিতর একটা ব্যর্থতার বেদনা জ্যোতির বুকে বিদ্ধ হইয়া গেল। এমন হাসিটি তার কখনো ব্যর্থ হয় নাই—নিঃশব্দ সম্ভাষণের নিঃশব্দ প্রত্যুত্তর সে সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে। এই প্রথম ব্যর্থতা।

অশোক নিজের ঘরে যাইয়া উঠিল, ডাকিল,—মা, শোনো।

রত্নময়ী বলিলেন,—বৌমা, শুনে এসো ত' অশোক কি চায়।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ী নড়িল না ; বলিল,— তোমাকে ডাকছেন।

রত্নময়ীর এই ধরণের আদেশ ইতিপূর্বে লংঘিত হয় নাই ; আজ তার ব্যতিক্রম দেখিয়া রত্নময়ী যেন অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন,—তা শুনেছি। তুমি জেনে এসো কি চায় ; তারপর কড়াইটে নামিয়ে রেখে আমি যাচ্ছি।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া অশোক বসিয়াছিল ; পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া বলিল, —তোমাকে ত' ডাকিনি। মাকে পাঠিয়ে দাও গে।

এ প্রত্যাখ্যানও একেবারে অপ্রত্যাশিত —তার কাছে আসাটাই অশোক যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহা অতি নিদারুণ—যেন "চাহি না" বলিয়া দু'হাতে ঠেলিয়া দিলো… দুইবার বঞ্চিত হইয়া জ্যোতির্ময়ীর উন্মুখ তরুণ তন্ময় মনটি নিবিড় বেদনায় অশ্রুমুখী হইয়া উঠিল। বলিল,—মা, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

অশোক কথা কহিল না। নুন ফিরিয়া গেল ; রত্নময়ীকে বলিল,—আমায় কিছু বললেন না, তোমাকেই ডাকছেন।

…রত্নময়ী বলিলেন,—কি বলছিস ? আমার কড়াই উনুনে।

অশোক ঘুরিয়া বসিল ; বলিল,—আমার বিয়ের আগের কথা তুমি সব, জানো মা ?

বিবাহের আগে অনেক কথাই হইয়াছিল—কি কথা জানা সম্পর্কে ছেলের এই প্রশ্ন তাহা কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়াও রত্নময়ী বলিয়া দিলেন,—জানি ।

—তা হ'লে পরামর্শের ভেতর তুমিও ছিলে ?

—পরামর্শ কিসের ?

—আমাকে ঠকাবার ।

—তোকে ঠকাবার কি পরামর্শ হয়েছিল, তা ত' আমি জানিনে ।

—তবে যে বললে, জানি ?

—বিয়ের আগের কথা জানিই ত'—

—কি কথা ?

—এই দেখাদেখির কথা—

—আর কিছু জানো না ?

কোনোদিকেই জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া রত্নময়ী চুপ করিয়া রহিলেন ।

অশোক বলিতে লাগিল,—দানপত্র তৈরী, বিষ্ণুপুরের পাত্রী দেখার আয়োজন, এ-সব ত' মিছে— আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যে বাবা করেছিলেন ।...আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখিয়ে টাকার লোভে কালো মেয়ে গছিয়ে দে'য়া তোমাদের উচিত হয়নি ।

রত্নময়ী এই চাতুরীর বিষয় সবই জানিতেন— পুত্রের মুখে তাহাই উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়া তিনি তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন । নানাবিধ শঙ্কায় মনে মনে তাঁর ভারি গোলমাল বাধিয়া গেল—এ কি অঘটন !...পিতাপুত্রের এই কারণে মনোমালিন্য না ঘটে—বধূর প্রতি পুত্রের অনাসক্তি না জন্মে...ইত্যাদি ।

অশোক বক্তব্য শেষ করিয়া তার বাঁধান ল-বুকগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ।

রত্নময়ী খানিক তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্নাঘরে আসিয়া দেখিলেন, বউমা বসিয়া কাঁদিতেছে ।

বৌমার কাঁদিবার কারণটি কেবল বৌমার কাছেই প্রকট, অন্যের তাহা জানা নাই—তাহা জানাইবার সাধ্যও তার নাই—কিন্তু তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াই রত্নময়ীর বুক ধক্ করিয়া উঠিল , ভাবিলেন—হয়েছে কাজ !

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন,—বউমা, কাঁদছ যে ?

রত্নময়ীর ভয় হইয়াছিল, এইমাত্র মাতাপুত্রে যে কথোপকথন হইয়া গেল তাহা বউ শুনিয়াছে—ফাঁকি দিয়া তাহাকে আনা হইয়াছে, ছেলে তজ্জন্য অসন্তুষ্ট ; সে-কথা কানে যাইয়া ব্যথা পাইয়া বধূর কাঁদিয়া ফেলা কিছু আশ্চর্য নয় ।

রত্নময়ীর প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ময়ী কান্নার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং ভয় আরো বাড়িয়া রত্নময়ীর বুক আরো ধড়ফড় করিতে লাগিল ।

চুপ করিয়া থাকিলেই চলিত—কিন্তু বধূকে সান্ত্বনা দিবার দুর্মতি ঘটিয়া রত্নময়ী যে বিপত্তি বাধাইয়া তুলিলেন তার জের মিটিল বহু বিলম্বে । বলিলেন,—ছেলের কথা তুমি কানে তুলো না—ওটা চিরকেলে পাগল ।

শুনিয়াই জ্যোতির্ময়ী চকিত হইয়া উঠিল । প্রশ্ন করিল,—কি কথা, মা ? কি বলছিলেন ?

রত্নময়ী নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন—বৌ ত' শোনে নাই, তবে কাঁদিছিল কেন। কিন্তু তখন দেরী হইয়া গেছে ; চাপা দিবার উপায় বুঝি নাই।

শাশুড়ীকে বিপন্ন নীরব দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী পুনশ্চ বলিল,—আমি শুনে কাঁদতে পারি এমন কথা তিনি কি বলছিলেন ?

প্রত্যাখ্যানের সহিত রত্নময়ীর কথা আর এই দোষ-বিব্রত চেহারার মিল ঘটিয়া যাওয়ায় জ্যোতির্ময়ী নিঃসংশয় হইয়াছে যে, কথাটা সামান্য নয়।

রত্নময়ী মূর্তির মত দাঁড়াইয়া না থাকিয়া তখনই যদি কথার ক্রুর দিকটি ঘুরাইয়া দিতেন, ওটা পিতাপুত্রে কলহ, তোমার সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই, তাহা হইলে মিথ্যা ভাষণের অপরাধ ঘটিলেও হাঙ্গামার ভয়টা নিশ্চয় দূর হইত। কিন্তু রত্নময়ী বুঝিলেন, বধূই মূল পক্ষ—তাহার কাছে নিঃশব্দ থাকাই বেশী নিরাপদ।

জ্যোতি কালো—

এই ভয়টা তরে সর্বদা চতুর্দিকে সজাগ চক্ষু মেলিয়া আছে যে, কালো রংটা তাহাকে দুঃখ না দিক, কবে যেন অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী করিয়া তোলে। আজকের এই ঘটনায়—রত্নময়ীর দায় এড়ানো নীরবতায় আর স্বামীর প্রত্যাখ্যানে—জ্যোতির্ময়ীর এহ বোধটাই হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল, কোথাকার একটা বায়ুরাশি অসম উত্তাপে তাহার জীবনের পক্ষে অননুকুল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে…ঝড় যদি ওঠে তবে তাহাকে একা দাঁড়াইয়া লড়িতে হইবে। কিছুক্ষণ আগেই অশোক তাহার মনের আকাশে আদরের যে দীপ্তি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, আশাভঙ্গের বেদনার উপর কল্পিত ঐ আঘাতটা পড়িতেই তার উপর জলগর্ভ মেঘ ছাইয়া আসিল।

বলিল,—মা, আমি কালো ব'লে কি তোমাদেব দুঃখ হয় ?

রত্নময়ী ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,—সে কি কথা বলছে, বৌমা!—বলিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া বধূর মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। কালো বলিয়া জ্যোতির মনে যে একটা ভীতি আছে এবং সেটা যে স্পর্শমাত্রেই বিস্তৃত হইয়া সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে তাহা রত্নময়ী জানেন না।

জ্যোতি বলিল,—তা-ই, মা। আমি শুনে কাঁদতে পাবি ব'লে যে কথাটাকে তোমার মনে হয়েছে তা গুরুতর কথাই।

রত্নময়ী বলিলেন,—অশোকের কাছেই শুনো।

—আচ্ছা।

জ্যোতির 'আচ্ছা'র পোষমানা সুর শুনিয়া রত্নময়ী যেন রাহুর গ্রাসের বাহিরে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

নকড়ি ঘোষের মামলার তদ্বির করিতে ব্রজকিশোর সদরে গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে থাকিলে ঘটনা এতদূর গড়াইত না—কাহারো মনে অস্পষ্টতা তিনি থাকিতে দিতেন না ; এক পক্ষকে ধমকাইয়া, অন্য পক্ষকে সমঝাইয়া, এক পক্ষের বাড়াবাড়ি অন্য পক্ষের ক্ষোভ থামাইয়া দিতেন। রত্নময়ী কতকটা বুঝিবার ভুলে, কতকটা অকারণ ভয়ে দিশেহারা হইয়া কেবল খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেন—সেই ধূম্রমণ্ডলের মধ্যে বসিয়া জ্যোতির দু'চোখ জ্বালা করিতে লাগিল।

"আচ্ছা" বলিয়া জ্যোতি কাজে বসিয়াছিল—সংশয়াবেগ সহসা অসহ্য হইয়া সে উঠিয়া গেল।

দেখিল, অশোক ল-বুক খুলিয়া যেন উদাস বিমনা হইয়া শূন্যবিহারে বাহির হইয়াছে···অশোকের ভাবনা আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, সে ঠকিয়া গেছে—চক্রান্ত করিয়া লোকে তাহাকে ঠকাইয়াছে। বাবা তাহাতে অগ্রণী ; শ্বশুরও একজন আসামী। তবে তার রাগের বহু ঊর্ধ্বে বাবা, পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক যতদূর প্রায় ততদূরে—শ্বশুর কোথায় তার ঠিক নাই। শ্বশুরকন্যাটিকে অপরাধী করিতে তার শিক্ষায় বাধিলেও, নিরুপায়ের দুঃখে রাগটা তাহারই উপর পড়িতে চাহিল। লোক ঠাট্টা করিতেছে—তাহাকে ঠকাইয়া কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে—বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে তাদের মুখে কেবল ঐ আলোচনা—তারা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে আর বলিতেছে যুবরাজটা নির্বোধ। এই নিদারুণ পরাজয়-জ্বালা সর্বদা জাগরূক রাখিয়া দিবে ঐ কালো মেয়েটিই—

সুতরাং অশোক তার মানসিক ব্যাধির এই ব্যবস্থা করিল যে, লজ্জা ঢাকিতে নয়, আত্ম-সম্মান বজায় রাখিতে, বাহিরের লোকের কাছে এই ভাবটাই দেখাইতে হইবে, সম্পত্তির লোভে বাবা কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিকে 'নস্যাৎ' করিতে যদি স্ত্রীকে অসমাদর করিতে হয় তবে তাহাতেও সে পশ্চাদপদ হইবে না।···

একটু সুগন্ধ নাকে যাইয়া অশোক মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নূন—পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মানুষের সুপ্তি-চেতনার দিশে পাওয়া ভার—অর্ধেক মন জাগ্রত হইয়া যা ভাবে, তার সুপ্ত অর্ধেকে তার চেতনার অজ্ঞাতে তারই বিপরীত দিকে স্রোত বহিতে থাকে।

নূনকে দেখিয়াই আর ঐ গন্ধটুকু নাকে যাইয়াই অশোকের তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের অর্ধেকে নূনের কথাটা আর এক ভাবে জ্বলিয়া উঠিল···তার যৌবন, তার দেহ, তার অধর···

চট্ করিয়া অশোকের বিপথের মন যৌবনের সহজ পথে পা দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। নূন তার চোখ চাপিয়া ধরে নাই, যেমন হামেশা ধরে ; নূন তার হাসির জবাব পায় নাই, তাহাও অশোকের মনে পড়িয়া গেল।

বলিল,—রাগ করেছ মনে হচ্ছে। এসো।—বলিয়া অশোক হাত বাড়াইতেই জ্যোতি পিছাইয়া গেল ; বলিল,—তুমি তখন অমন ক'রে ঘরে উঠে গেলে কেন, আর মাকে ডেকে কি বললে তাই আগে বলো আমাকে।

—বলছি। আগে একটা···বলিয়া ঠোঁটদুটি উন্মুখ করিয়া তুলিল—

কিন্তু স্বামীর লালসা-খর তদ্‌গত চক্ষুর দিকে চাহিয়াও জ্যোতি তখনই তরল আবহাওয়ায় পৌঁছিতে পারিল না ; দূর হইতেই বলিল,—আমি কালো ব'লে তোমার কষ্ট হয় খুব ?

—না, না!—বলিয়া অশোক প্রবলকণ্ঠে অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু সেটা সহজ মনের সহজ কথার মত অসংকোচ স্বচ্ছ হইয়া দেখা দিলো না—অশোক যে একটা সত্য গোপন করিতেছে তাহা ধরাইয়া দিলো তার মুখের সলজ্জ ভাবটা—চোখটিও একবার মুহূর্তের জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেখিয়া জ্যোতি একটু হাসিল , বলিল,—আমার কিন্তু সত্যিই সন্দেহ হয়েছিল যে কালো মেয়ে তোমরা পছন্দ করলে কেন ! অনেকে ফিরে গেছে—টাকার লোভেও দয়া করেনি। তোমাদের দয়া হ'ল দেখে ভয় হয়েছিল যে, কামিনী ছোট হয়ে কাঞ্চন বড় হয়ে না ওঠে।

কথাটা শুনিবার পর অশোক স্ত্রীর সম্মুখে খুব দুর্বল বোধ করিতে লাগিল ; আগে কখনো এমন হয় নাই। বলিল,—তা ত' হয়নি।

—তবে কি হয়েছে ?

অশোকের বিপদ বাধিল ভারি—কথার কেন্দ্রেই যে নুনু ! বাপের উপর সে রাগ করিয়াছে, তাহা বলিতে গেলেও নুনুর নামটাই আগে করিতে হয়। কিন্তু একটা কিছু কৈফিয়ৎ এখনই চাই—আর তা যা-তা হইলে চলিবে না—

হঠাৎ অশোক দিশা পাইয়া গেল ; বলিল,—গগনের মধুখুড়ো আমায় বড় অপমান করেছে।

—কী করেছিলে তুমি ?

—আমি কিছু করিনি।

—তবে অমনি অমনি ?

অশোকের পিঠ আসিয়া দেয়ালে ঠেকিয়া গেল—আর পথ নাই। অশোক থমকিয়া রহিল।

স্বামীর কপট আদরের ব্যথা আর বিরক্তি লইয়া জ্যোতি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

তাহার সম্বন্ধে যে গোপন একটা আন্দোলন সহসা অঙ্কুরিত হইয়া বহিঃপৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে জ্যোতির সন্দেহ রহিল না। শ্বাশুড়ী চাপিয়া গেলেন, স্বামী প্রফুল্লতার ভান করিয়া ছেলে-ভুলানো একটা গল্প রচনা করিয়া তাহাকে এড়াইয়া গেলেন।

···রাত্রে অশোক স্ত্রীর রাগ ভাঙাইতে বসিয়া বলিল,—তুমি মিছিমিছি রাগ ক'রে আছো, তোমায় নিয়ে কোনো কথা হয়নি।

জ্যোতি অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

তার ললাটে ভ্রূভঙ্গী নাই, রোষের চিহ্নমাত্র তার কোথাও নাই—কিন্তু তার স্থির দৃষ্টিটা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি তীক্ষ্ণ। অশোক অনুভব করিতে লাগিল, সেই দৃষ্টি একটা শরীরী রশ্মির মত তার গোপনচারিতা আর দূরবর্তিতা ভেদ করিয়া গেছে—চেষ্টা করিয়াও লুকাইবার কিছু নাই।

এ অবস্থাটা মানুষের তেমন সুখকর নয় এবং এই অবস্থায় পড়িলে আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়া রাগ না হয় এমন লোকও বিরল। অশোক উষ্ণ হইয়া উঠিল ; বলিল,—অমন ক'রে কি দেখছ ?

জ্যোতি অতিশয় নির্লিপ্তস্বরে বলিল,—কিছুই না ; কেবল ভাবছি, সত্যি কথাটা বলতে তোমাদের এত সংকোচ হচ্ছে কেন ! তুমি জানো না যে, আমি সকল রকম অযত্ন, কৃপা আর বিতৃষ্ণা সহ্য করতে বাধ্য, আর তৈরী হয়েই এসেছি।

—মানে ?

—আমি যে কালো।

—সেটা কি মিছে ?

—মিছে নয় ব'লেই ত' চোখের সুখটা তুমি ষোল আনাই পাচ্ছ না। তোমরা আমাদের কাছে কি চাও তা আমার জানা আছে।

—বই প'ড়ে ?

—আক্কেলই যথেষ্ট।

—তোমার ইয়ে বড় বেশী।

—কি বড় বেশী ?

দেমাক,অহংকার, গর্ব, তেজ, স্পর্ধা, ধৃষ্টতা, দম্ভ, বাচালতা—ইহাদের কোনটাই প্রকৃত ভাব-ব্যঞ্জক নহে বলিয়া মনে হওয়ায় অশোকের কিছু বলা হইল না।…

সে-রাত্রি দম্পতির অভিমানে কাটিল।

ধরিতে গেলে অশোক জ্যোতির প্রতি প্রত্যক্ষভাবে অমার্জনীয় কিছু করে নাই ; তবু বিচ্ছেদ ঘটিল।…যাহা হইতে এ কথার উৎপত্তি এবং সচলতা তাহা অশোকের মনের বিকার ও বিকৃতি মাত্র ; অস্থায়ী হইয়া তাহা কাটিয়া যাইতেও পারিত। কিন্তু কাটে কি না সে পরীক্ষারসময় না আসিতেই রত্নময়ী আর অশোকের কূটচালে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কূটচালের অভাবে একটা ছায়া জীবন্ত হইয়া উঠিল। জ্যোতির মনে হইতে লাগিল, কেবল কৃপার পক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে কাছে চাহিলেই সে নির্বিরোধে অমনি যাইয়া ধরা দিবে এমন তুচ্ছ সুলভ জিনিস সে নহে।

বাহিরের যাবতীয় স্বার্থনিরপেক্ষ নিষ্কলুষ স্বাধীন স্থানটি তাহাকে সসম্মানে ছাড়িয়া দিতে হইবে—তাহা দিতে যে নারাজ তাহার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই।

জ্যোতি বলিল,—মা, আমাকে একবার বাপের বাড়ী যেতে দাও।

—যাবে বৈকি, মা। আসুন তিনি।

বলিয়া রত্নময়ী তখনকার মত পাশ কাটাইতে চাহিলেন। পুত্রের মুখ এবং বধূর মুখ দেখিয়া এবং পরস্পরের প্রতি উভয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, দু'জনার মনের গরমিল ঘটিয়াছে—

"তিনি" আসিলেই সব মিটিয়া যাইবে।…গার্হস্থ্যব্যাপার যেদিক দিয়াই হোক অপ্রীতিকর হইয়া উঠিলে নিজে কর্ণধার হইয়া তার গতি পরিবর্তিত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক হিতপথে চালিত করিবার সাধ্য রত্নময়ীর নাই, তাঁর মস্তিষ্কেই কুলায় না—হস্তক্ষেপ করিতে তাঁর কেমন যেন ভয় ভয় করে—উল্টা বিপত্তি ঘটাইয়া তুলিলে স্বামী তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না।

—তুমি মত দাও, মা। বাবার অমত হবে না আমি জানি।…চিঠি লিখে দি ?—বলিয়া জ্যোতি অতিশয় প্রত্যাশী চক্ষে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু সেদিকে একটা অসহায় চাহনি ছাড়া কিছু দেখা গেল না।

রাগ ভাঙানো যায়—কঠিন হইয়া থাকিলে দ্রব করা যায়—কিন্তু ভয় ভাঙানো শক্ত—রত্নময়ীর ছেলেকেও ভয়, স্বামীকেও ভয় ; ভয় নাই কেবল বধূকে। তাই তিনি নিরুত্তর রহিয়া গেলেন।

…নকড়ি ঘোষের মামলার তদ্বিরের কাজ সারিয়া ব্রজকিশোর সেইদিনই বাড়ি ফিরিলেন ; কিন্তু তিনি বধূমাতাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিতে যাইয়া রত্নময়ীর নিকট হইতেই বাধা পাইলেন। রত্নময়ীর সাহস না থাক, স্ত্রীবুদ্ধির একটা দিক সহজ ছিল ; বলিলেন,—ছেলের সঙ্গে বৌয়ের মন-কষাকষি হয়েছে ; মিটে যাক সেটা, তার পর পাঠিও।

—মন-কষাকষি ? কেন ?

রত্নময়ী কথা কহিলেন না ; ব্রজকিশোর বলিলেন—ঝি, ডাকো ত' অশোককে।

অশোক লুবুক বুকের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া অতিশয় ক্লান্তভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৌমাকে তুই কি বলেছিস?

—আমি? আমি ত কিছু বলিনি।

ব্রজকিশোর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন – অর্থাৎ কার কথা সত্য?

স্বামীর দৃষ্টির দিকে চাহিয়া রত্নময়ী আত্মরক্ষার্থে বলিয়া দিলেন,—হয়েইছে কিছু,—

ব্রজকিশোর চোখ আরো লাল করিয়া ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঝগড়া করেছিস?

অশোকও আত্মরক্ষার্থে বলিয়া দিলো,—ঝগড়া হয়েছে; কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই।

—বৌয়ের সব দোষ, নয়? সরে যা সামনে থেকে…বেহায়া!

চক্ষের নিমেষে একটা বিপ্লব কাণ্ড ঘটিয়া গেল।…সংসারের কর্তাস্বরূপে ছেলেকে ও বৌমাকে শাসন করিয়া এবং স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া ব্রজকিশোর চলিয়া গেলেন।

এবং অশোকের মনে দুঃসহ একটা অগ্ন্যুৎপাত সুরু হইয়া গেল…

সে এখন বয়ঃপ্রাপ্ত; ধমক খাইবার বয়স সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই তার বিশ্বাস…তার এই লাঞ্ছনার জন্য আর কেহ দায়ী নহে—বাবা নন, গগন নয়, মধুখুড়ো নন, মা নন, দায়ী ঐ স্ত্রীটি…

লুবুক পাশে করিয়া বসিয়া অকারণ এই অপমানের জ্বালা অশোকের রক্তে জ্বলিয়া জ্বলিয়া বহিতে লাগিল।

এদিকে জ্যোতির মনে হইতে লাগিল, অতিশয় কাপুরুষ মিথ্যাবাদীর স্ত্রী সে—মিথ্যা কহিয়া স্ত্রীকে গুরুজনের সম্মুখে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতে তাঁর জিহ্বায় একটু জড়তা আসিল না!…কেবল কালো বলিয়াই তাহাকে এই বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইতেছে—সে কালো বলিয়াই তাহাকে এত "হেনস্তা"।

তারপর যে কথাগুলি জ্যোতির মনে হইতে লাগিল তাহা সাক্ষাতঃ এবং সর্বতোভাবে তাহার আলোচনার বিষয় না হইলেও, তাহা শ্বশুরকুলের স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে জড়িত।

·· সে উপলক্ষ্য মাত্র, টাকাই মুখ্য…সে যেন উচ্চে উঠিবার সোপানমাত্র—তাহাকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা আর্থিক অবস্থা খানিকটা উন্নত করিয়া লইয়াছেন—

এখন তাহাকে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা—আর কাহারো সে ইচ্ছাটি না থাক স্বামীর আছে।

জ্যোতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া এই অপমান হজম করিতে লাগিল।

…রত্নময়ী গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন; জ্যোতি তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, —মা, তুমি একটু বসো। আমি থাকতে সব কাজই তুমি কেন করবে!

রত্নময়ী একটু-আধটু ফাই-ফরমাস করিতেন; কিন্তু ঐ ঘটনার পরদিনই তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন—রাগ করিয়া নয়, কাজে বলা উচিত হইবে কি না তাহা বুঝিতে না পারিয়া—যদি হাঙ্গামা বাড়িয়া যায়!

রত্নময়ী বধূর ঐ এককথাতেই গলিয়া গেলেন; তাঁর মনে হইল—যাক, সব মিটিয়া গেছে। হাতের কাজ যেন দু'হাত তুলিয়া আশীর্বাদ সহ তিনি বধূর হাতে অর্পণ করিলেন; বলিলেন,—নেও, বাঁচ্‌লাম। আমি তাহলে হেঁসেলে যাই; বসবার সময় কি আমাদের আছে, মা!

জ্যোতি বলিল,—আমি চ'লে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে, মা!

চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া রত্নময়ী বলিলেন,—চ'লে যাবে কেন ?

—আমি একবার যাবই।

—তা যেও।—বলিয়া ভালবাসিয়া রত্নময়ী যাওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

...এবং এই কথাটাই খাওয়ার সময় উঠিয়া পড়িল। অশোক খাইতে বসিয়াছে—

"দইটে আজ বসেছে ভাল ; কাল পরশু জল উঠে ছিল"—বলিয়া ছেলের দইয়ের বাটিতে একটু মিষ্টি ছাড়িয়া দিয়া রত্নময়ী বলিলেন,—বৌমা ত' বাপের বাড়ী না যেয়ে ছাড়বে না রে। কি বলিস তুই ?

—যাক। —বলিয়া অশোক প্রচণ্ড একটা ঢেউই যেন যে যাইতে চায় তাহার বরাবর চালাইয়া দিলো। তারপর বলিল,—আগেই পাঠিয়ে দে'য়া উচিত ছিল ; তা হ'লে আমার এই অপমানটা হ'তে হ'ত না।...আসল কথা কি জানো, মা ?

—কি ?—বলিয়া রত্নময়ী আসল কথাটা শুনিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

অশোক বলিল,—তোমাদের গরীবের ঘরের মেয়ে আনা উচিত ছিল, গরীবের ঘরের মেয়ে দু'দিক থেকেই বাঁধা পড়ে--স্বামীর ঘরের দায় তার থাক না থাক, পেটের দায় বড় দায় এ কথা সে ভুলতে বসে না।...তোমরা দেখলে খালি টাকা।—বলিয়া অশোক রুচিপূর্বক দধি ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। টেরও পাইল না যে, ঐ আসল কথাটা বলিয়া সে আর একজনের জীবনের স্বাদ পর্যন্ত তিক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

একবার ধমক দিয়া ফল পান নাই, ব্রজকিশোরের তাহা মনে ছিল।

রত্নময়ী বলিলেন,—কি করবে ?

—বৌমাকে রেখে আসব।

—তা-ই করো। ছেলে ত' আজ থেকে গগনের বাড়ীতে শোবে ব'লে গেল।...

তারপরই অশোক-কথিত সেই আসল কথাটা রত্নময়ীর মনে পড়িয়া গেল ; একটু রঞ্জিত করিয়া বলিলেন,—অশোক বলছিল, পেটের দায় যে বৌয়ের নেই সে স্বামীর কাছে থাকতে চাইবে কেন! ব'লে কত দুঃখু করলে। আমিও তখন ঐ কথাই বলে-ছিলাম, তোমার তা কানে গেল না।—বলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে রত্নময়ী একটু রাগ দেখাইতে গেলেন।...রত্নময়ীর কাছে ছেলেই সকলের বড় ; কিন্তু ব্রজকিশোরের কাছে তা নয়, তাঁর কাছে টাকা বড়। ছেলে হারাইবার ভয় তাঁর নাই ; তাই ব্রজকিশোরের মনে রত্নময়ীর রাগের আঁচ লাগিল না—রত্নময়ীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে কি হয় নাই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মতিও তাঁর জন্মিল না। মোটের উপর তিনি লাভবান.. এ বিপর্যয় যেমন অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, তেমনি অকস্মাৎ কাটিয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে তিনি অনিশ্চিত আছেন। বলিলেন,—তোমার ছেলের মন বড় ইতর ; আগে তা জানতাম না। বৌমাকে বাপের বাড়ীতে রেখে এলে যদি তার দুঃখ ঘোচে তবে তাই হবে।

বলিয়া ব্রজকিশোর উঠিয়া গেলেন।

দুদিন গেছে—

এবং ইত্যবসরে অশোকের মনে কাঞ্চনসম্বন্ধে চরম নিঃস্পৃহার উদয় হইয়াছে।

লুব্ধক সামনে খুলিয়া রাখিয়া সে ভাবে, আর কিছু নয়, এত বেপরোয়া দম্ভের মূলে আছে টাকার জোরটা।···পৃথিবী স্বার্থপর, স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়টা বেদের ভোজবাজি··· যার যত হাতসাফাই সে তত সাফ্ ওৎরায়, প্রেমিক প্রেমিকা ব'লে নাম কেনে, আর ভালবাসার ভান ক'রে ভুলিয়ে রাখতে পারে।···এ পর্যন্ত ত' এমন একটা মেয়ে দেখা গেল না, স্বামী খাইতে দিতে না পারিলেও যে স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে—

গরীবের ঘরের দাম্পত্য কচ্‌কচির দৃষ্টান্ত অনেকগুলি তার মনে পড়িল—সাধু বৈরাগী, মিতু ঘোষ, মহাপাত মোড়ল ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই পরিণীতা পত্নী পেটের দায়ে প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছে।

ইহাও তার স্মরণ হইল, স্বামী-বিয়োগে স্ত্রী কেবল নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা আর অন্নসমস্যার দিনগুলির উল্লেখ করিয়া বিলাপ করে; এমন কথাটা একবার ভুলিয়াও বলে না যে, তোমা বিনা আমার জীবন শূন্য দুর্বহ হইয়া গেল!

···এই সব সুসার চিন্তার ফলে অশোক স্থির করিয়া ফেলিল, অত্যন্ত স্থূলে অসার জিনিস ঐ ভালবাসাটা; দিল্লীর লাড্ডুর চেয়েও স্ত্রী নিকৃষ্ট পদার্থ।

···তারপর অশোক আশ্চর্য হইতে লাগিল ইহাই ভাবিয়া যে, কালো বলিয়া একটু সংকোচ নাই! কেবল টাকার জোরেই, বাপের টাকা আছে বলিয়াই যেন জবরদস্তি চাপিয়া বসিতে চায়!···কিন্তু ঠেলিয়া দিতেও সে জানে। যদি—

হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া অশোক দেখিল, জ্যোতি তার পায়ের ধূলা লইতেছে। বলিল,—থাক্ থাক্।

অর্থাৎ আর অভিনয়ে প্রয়োজন কি! জ্যোতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—যাচ্ছি।

—যাও; কিন্তু কেবল টাকায় সুখ নেই।

—আমিও সেই কথাটাই বলতে এসেছি। তুমি টাকা চেয়েছিলে, পেয়েছ, আমায় চাও না, তাই আমি যাচ্ছি। আশা করি, তোমার ভুল একদিন ভাঙবে যে স্ত্রী খেয়ালের সামগ্রী নয়।—বলিয়া জ্যোতি চলিয়া গেল।

অশোক যেন অকারণেই বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

···রত্নময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন; দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বধূর হাতে ধরিয়া বলিলেন,—যখনই আনতে চাইব তখনই এসো, বৌমা।

বৌমা বলিল,—আনতে তোমরা চাইবে, মা!

—অবাক করলে, বৌমা; ঘরের লক্ষ্মী কি ফেলে দেবো!

শুনিয়া জ্যোতি একটু হাসিল—বাড়ীর বৌয়ের সম্বন্ধে ঐ মামুলি রচনাটির নির্ভরযোগ্য কোনো অর্থ আছে বলিয়া তার মনে হইল না।

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া জ্যোতি গাড়ীতে উঠিল।

ব্রজকিশোরই বৌমাকে বাতাসপুরে পৌঁছিয়া দিয়া ঐ পথেই মহকুমায় যাইবেন; নকড়ি ঘোষের গোটাতিনেক মামলার শুনানির দিন পরদিনই ধার্য আছে।

## ॥ চার ॥

অশোকের শ্বশুর মন্মথনাথের বয়স মোটে চল্লিশ। পৃথিবীর ক্রমোন্নত চিন্তার ধারা বাতাসপুরের ঘরে ঘরে প্রবেশ না করিলেও মন্মথনাথের অন্তর ও অন্তঃপুর পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, সে পরিচয় ব্রজকিশোর পাইয়াছেন। মন্মথনাথ বয়সে নবীনতর হইলেও ব্রজকিশোর সেই জন্যই তাঁহার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে না হোক, সতর্কতার সহিত ব্যবহার করেন। তাই বৌমাকে নামাইয়া দিয়া নকড়ি ঘোষের কাজের অজুহাত আর তাঁর মামলার কাগজপত্রের বাণ্ডিল দেখাইয়া সেই পায়েই প্রস্থান অর্থাৎ পলায়ন করিবেন, এই ছিল ব্রজকিশোরের সংকল্প—

এবং করিলেনও তাই—

গাড়ীর ভিতর হইতে প্রথমটা নামিতেই চাহিলেন না—নামিলেই দেরী হইয়া যাইবে।

"বৌমাকে লইয়া যাইতেছি"—বলিয়া সংবাদ দেওয়াই ছিল, এবং আর যাহা জানাইবার ছিল তাহা তিনি গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন; বলিলেন—মামলার কাজে বড় ব্যস্ত, বেয়াই; নামতে পারলাম না, ক্ষুণ্ণ হবেন না। বৌমা বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলেন; দিনকতক তাঁর এখানে থেকে আসাই ভাল মনে ক'রে নিজেই রেখে গেলাম।

তারপর তাঁর সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল এক ছিলিম তামাক খাইবার জন্য তাঁহাকে নামানো হইলে, বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে তিনি যেন মামলার সেই অর্থের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বেয়াই বাড়ীতে একটা দিনও থাকিতে পারিলেন না, ইহার দরুণ আক্ষেপটাও চিন্তার অবসরে এক সময় বাহির হইয়া পড়িল; বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—যে পরের চাকর বেয়াই, সে কুকুরের অধম; আবার সেই চাকর যদি মামলার তদ্বিরকারক হয়, তবে সে যে কি তা বলতে পারিনে।

মন্মথনাথ বলিলেন,—তা, আর কি করা যাবে বলুন; পেটের দায়েই ত' পৃথিবী ঘুরছে।

—তা ঠিক।—বলিয়া ব্রজকিশোর হুঁকা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দেশের সবাই কুশলে আছেন কি না শত তাড়াতাড়ির মধ্যে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও ব্রজকিশোর ভুলিলেন না; এবং তারপর তাঁরাও সবাই ভাল আছেন, ঘাড় ফিরাইয়া এই খবরটা দিয়া ব্রজকিশোর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—আসি, বেয়াই; যদি সময় পাই ফেরবার পথে হ'য়ে যাব। ···ওরে, চ।

ব্রজকিশোরের গাড়ী চলিয়া গেলে মন্মথনাথ অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, সেখানকার হাওয়া যেন তেমন খোলসা নয়—মায়ে-ঝিয়ে কথা হইতেছে।

মন্মথনাথ বৈবাহিককে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন—জ্যোতি তখন তাঁহাকে প্রণাম করিবার সুবিধা পায় নাই; এখন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মন্মথনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাল আছিস?

—হ্যাঁ।

—শ্বশুর-বাড়ীর গল্প বল্ শুনি।

—গল্প কিছু নেই, বাবা।

কন্যার হতাশ কণ্ঠস্বরটা কানে বাজিয়া মন্মথনাথ তার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন ; বলিলেন,—তোরা ভার হয়ে আছিস। ব্যাপারটা কি ?

—ব্যাপার কিছু নয়। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে।

—কি সেটা ?

—আমি কালো ব'লে বোধ করি ও'রা তেমন পছন্দ করলেন না।

—ও'রা মানে কি ? অশোক না শ্বশুর-শাশুড়ী ?

—শ্বশুর-শাশুড়ী নয়।

—ও।—বলিয়া মন্মথ ভুরু তুলিয়া রহিলেন। বলিলেন—তারপর ?

—বলবার বিশেষ কিছু নেই, বাবা।

বলিবার কিছু না থাকার মর্মার্থটা মন্মথনাথ ঠিকই বুঝিলেন। বলিবার কিছু থাকে না কেবল এই কারণে যে, ব্যথা পাইয়াছি, হতাশ হইয়াছি, এ কথাটা এক নিঃশ্বাসেই বলা হইয়া যায়—যদিই মুখে বলার দরকার হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতম অবহেলাটি, ভ্রূভঙ্গীর ভৎ'সনা, দৃষ্টির অপ্রীতি, ঠোঁটের ঘৃণা ত' বলিয়া বুঝাইবার নয় ; কিন্তু বেদনা দিবার শক্তি তাদেব অপরিমেয। বাক্য যেখানে স্পষ্ট নয়, কেবল আচরণ সুদূর ইঙ্গিত দ্বারা বিদ্ধ করিয়া যায়, তাহার ব্যথা যত গভীরই হোক, তাহাকে পরিহার করা যেমন কঠিন, রোধ করাও তেমনি কঠিন, কথায় তাহা বুঝানোও ঠিক তেমনি কঠিন।

মন্মথনাথ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—তাই বুঝি তোর শ্বশুর অমন ক'রে পালিয়ে গেল। আগে জানলে আটকাতাম।

—কি করতে ?

—মনের কথাটি শুনিয়ে দিতাম।

—তাতে কোনো ফল হ'ত না। ছেলেব মন বাপের হাতে ত' নয়।

—বিয়ে দেবার হাত ছিল, বর্জন করবার হাত আছে, কেবল ছেলেকে বুদ্ধি দেবার হাত নেই। তাদের স্পষ্ট কথাটা কি তাই বল্ দেখি আমাকে।

ব্রজকিশোব পলায়ন না করিয়া যদি বুঝাইয়া বলিয়া যাইতেন যে, ছেলে-বৌয়ে গরমিল হইয়াছে, তাই কিছুদিন উভয়ের ছাড়া-ছাড়ি হইয়া থাকা দরকার ; তাহাতে বিষটা থিতাইয়া পড়িতে পারে।···জ্যোতি কালো বলিয়া এখন তাঁহাদের আক্ষেপ হইতেই পারে না ; কারণ, সে অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং গুণবতী মেয়ে।

এই কথাগুলি বলিয়া গেলে ব্রজকিশোরকে কেহ অপরাধী করিতে পারিত না ; কিন্তু তিনি ভয় এবং চক্ষুলজ্জার দাস হইয়া নিজের একটা গুরুতর অপরাধসৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়া গেলেন।

জ্যোতি প্রত্যক্ষভাবে যাহা জানে তাহা অতি সামান্য—

স্বামী একদিন গম্ভীর হইয়া ঘরে গিয়াছিলেন ; শাশুড়ীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন···শাশুড়ী আসিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন ; এবং শাশুড়ীর ব্যবহারে তার প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, মাতাপুত্রে এমন কথা হইয়াছে যাহা শুনিয়া তাহার কান্না আসিতে পারে। সে কালো—ইহা ব্যতীত তাহার সম্পর্কে আর কোনো কথা হইতে পারে না।

তারপর কলহ। তাহাকেই বধূ করিবার পূর্বে ব্রজকিশোর যে অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সে জানে না।

অশোকের তখনকার অসন্তোষ স্ত্রী কালো বলিয়া নয়, তার কারণ বাপের চাতুরী—তার সঙ্গে কালো স্ত্রী অতিশয় গৌণভাবে সংলিপ্ত—সব চেয়ে প্রবল, জনসমাজে ঠকিবার লজ্জাটা।

জ্যোতি এ-সবের বিন্দু-বিসর্গও জানে না…কাহারো পক্ষেই জানানো সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু তারই মন একটি নিমেষের জন্য ভুলিতে পারে নাই যে, সে কালো।

নিরন্তর সতর্ক হইয়া সে লক্ষ্য রাখিয়াছে, ঐ কথাটার উল্লেখ কেহ করে কি না।

জ্যোতির এই অসরল মনোভাবের জন্য দায়ী আর দশজনে, যাহারা তাহাকে দেখিয়া কেবল সে কালো বলিয়াই একে একে নামঞ্জুর করিয়া গেছে। তারপর, পিতাকে সে কখনও কন্যাদায়ে বিব্রত দেখে নাই। টাকা আছে—কাজেই লোভী কেহ খোঁজ লইয়া আসিয়া পড়িলেই, তাহাকে নয়, তাহার প্রতি প্রীত হইয়া নয়, গৃহলক্ষ্মী জ্ঞানে নিজেকে বা গৃহকে কৃতার্থ করিতে নয়, কেবল টাকার লোভে তাহাকে লইয়া যাইবে—সম্ভাবিত এমন একটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে প্রবল একটা বিতৃষ্ণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল—

এবং সেই কথাটাই সে এখন স্পষ্ট করিয়া বলিল,—আমাকে পরের ঘরে না দিলেই পারতে, বাবা। আমার বড় লজ্জা করে।

—কেন?

— আমায় ত' কেউ চায়নি।

ব্রজকিশোরের কানে এ কথাটা গেলে তার ঠিক অর্থটা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেন, এবং বোধ করি লজ্জিত হইতেন; কিন্তু মন্মথনাথ পারিলেন না।…পণ-সহ তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন যেমন সকলেই দেয়—মেয়ের রং কালো হইলে পণ বেশী করিয়া ঢালিতে হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম, দেশের রীতি; ইহার ভিতরকার হৃদয়হীন এবং অর্থলোলুপ স্বার্থপরতার দিকটা তেমন করিয়া তাঁর চোখে পড়ে নাই। বলিলেন, কি রকম?

—তুমি টাকা ঢালতে পেরেছ ব'লেই আমি পার হ'য়ে গেছি।

মন্মথনাথ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই তাই। তাঁহার কন্যার চেয়ে বয়স্থা কন্যা অনেক ঘরেই আছে; তাহারা এখনো অনূঢ়া আর কোনো কারণে নয়, কেবল বাপের টাকা নাই বলিয়া।

•

জ্যোতির মা বলিলেন,—তুই ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছিস?

জ্যোতি অস্বীকার করিতে পারিল না; বলিল,—ঝগড়া আমি করেছি। কিন্তু—

—কে কি বলেছিল?

সুষমা ভাবিয়াছিলেন, কাহারো একদিনের একটা রূঢ় কথা জ্যোতি সহ্য করিতে পারে নাই।

—সব কথা আমার মনে নেই, মা। তবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে তুমি যা শুনতে চাইছ, তা কেবল আমার মন জানে।

বলিতে বলিতে স্মৃতির আধার সম্বিৎ তার অতিশয় শাণিত হইয়া উঠিল…

সুষমা তীক্ষ্ণনেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—মন জানে !··· ভাল করোনি কাজটা। রাগ ক'রে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আমাদের দিনে ছিল না ; কাজটা ভাল নয়। ব্যবহারে মানুষকে বশ করা মেয়েছেলের প্রধান গুণ।—চিমটি কাটার মত করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া সুষমা মনে মনে ভাবিলেন, বাপের অত্যধিক প্রশ্রয়ের ফল হাতে হাতে মিলিতেছে।

জ্যোতি বলিল,—ব্যবহার এগিয়ে দিতে হয় তা জানি ; কিন্তু না নিলে তাকে কত ঠেলা যায়, মা ?

শুনিয়া সুষমা এমন ভাব ধারণ করিলেন যেন ইচ্ছা করিলে এইখানে দাঁড়াইয়াই আরো অনেক কথাই তিনি শুনাইয়া দিতে পারেন ; কিন্তু মেয়ের উপর তাঁর আর শ্রদ্ধা আস্থা নাই বলিয়াই হাল ছাড়িয়া দিলেন। স্বামীকে বলিলেন,—মেয়ের সঙ্গে তর্কে ত' হার মানলাম। তুমিও কি চুপচাপ ব'সে থাকবে, না বিহিত কিছু করবে ?

—অর্থাৎ আমার এখন উচিত তাদের পায়ে ধরা ? সেদিনের দেরী আছে ; দেখি দিনকতক, ওদিক থেকে কি খবর বার্তা আসে।

॥ পাঁচ ॥

নিরিবিলি বসিয়া মাঝে মাঝে জ্যোতির স্মৃতির জগত আলোড়িত হইতে থাকে—

মনে হয়, বাস্তবিক তিনি ত' কোনোদিন মুখ ফুটিয়া তাহাকে কালো বলেন নাই, ঠাট্টা করিয়াও বলেন নাই ; বরং আদরই করিতেন—এত আদর যে বুক ভরিয়া উঠিত। ···একদিন মুখ ভার করিয়া আসিয়াছিলেন, হাসিটির জবাব দেন নাই···তাহার কারণ অন্য কিছুও ত' হইতে পারে! শাশুড়ী গুরুতর কোনো বিষয় গোপন করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু বাড়ীর বউ, নিকটতম জন হইলেই কি সব কথা শুনিবার অধিকার তার আজই জন্মিয়াছে! কেবল নূতন বউ বলিয়াও ত' ওঁহাদের চক্ষুলজ্জা হইতে পারে।···তারপর, স্বামীর হৃদয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নিঃসংশয় পরিচয় হয় নাই—কেবল চিনিতে সুরু করিয়াছিল। তিনি আদর করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন ; কিন্তু কোন্ কথাটা তাঁর অপ্রিয়, কোথায় তাঁর ব্যথা, কোথায় তাঁর দুর্বলতা কিছুই ত' জানা হয় নাই। স্বামী তাঁহার ক্লেশের যে কারণটা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা না-ও হইতে পারে। পুরুষের নানা স্থানে গতিবিধি ; নানা সূত্রে সে বাহিরের সহিত আবদ্ধ। কোথায় কি বিভ্রাট ঘটিয়া মনে ঔদাস্য উত্তেজনা আসিতে পারে তাহার ঠিক কি! রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটা কি একেবারে নাচার হইয়া নয়।

ইত্যাদি অনুত্তেজিত সুস্থ মনের চিন্তাগুলি দিন দিন জ্যোতির বড় অসুখকর হইয়া উঠিতে লাগিল। এ সবের উপরে স্বামীর আহত অবসন্ন মুখখানা ভাসিয়া ওঠে··· একটা ব্যথা বাজে···

শাশুড়ীর মুখখানাও মনে পড়ে—স্নেহে কোমল, কিন্তু তিনি যেন সংসারের সংঘর্ষ আর আবর্তের মধ্যে একান্ত নিরুপায়, অতিশয় অক্ষম···তাঁর স্নেহের ঋণ পরিশোধ না করিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে।

…স্বামীর আদরগুলি একটা স্বচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের মত কোথা হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে—কাঙালীর মত কাতর চক্ষে চাহিয়া ক্ষণিকের তরে যেন তাহারই দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়।

বড়ই দুঃসহ হইয়া জ্যোতি মাকে একদিন বলিল—আমি চ'লে এসে বোধ হয় ভাল করিনি, মা।

সুষমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,—করোনি! আমি তা তখনি বলেছি।

কিন্তু জ্যোতির বলায় আর তাঁর বলায় পার্থক্য ঢের—তিনি বলিয়াছিলেন লৌকিক ব্যবহারের দিক দিয়া, সে যে বিবাহিতা স্ত্রী সেই দিক হিসাবে; জ্যোতি বলিতেছে হৃদয়ের দিক দিয়া হৃদয় যাহা বলিতেছে তাহাই মুখে ফুটাইয়া।

—আমায় পাঠিয়ে দাও।

স্বামীর উদ্দেশে খোঁটা দিয়া সুষমা বলিলেন,—তাদের চিঠি আসুক।

—যদি না আসে?—বলিয়াই জ্যোতি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু চিরজীবনের জন্য চক্ষুঃশূল হইয়া থাকিবার মত অপরাধ সে ত' করে নাই; মার্জনা চাহিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিমুখ করিবেন না…অনুতাপ নিষ্ফল হইবে না।

…মন্মথনাথ বলিলেন,—তোর শ্বশুরের চিঠি আসুক তবে তোকে পাঠাব। অমন ক'রে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কারণটা কি তা আমি জানতে চাই। আমি তাঁর ব্যবহারে অপমান বোধ করেছি।

—তুমিই চিঠি লেখো না!—বলিয়া জ্যোতি করুণ নেত্রে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মন্মথনাথ আর যাই হোন পদানত হইতে চান না। বিবাহের পূর্বে কালো মেয়েটিকে পাত্রস্থ করিবার তাগিদেও তিনি বরপক্ষীয় কাহারো হাতে ধরিয়া মনস্তুষ্টির সাধনা করেন নাই, আর সেটা কেবল টাকার জোরে নহে।

বলিলেন,—তাঁরা আগে আমায় বুঝিয়ে দেবেন যে তাঁদের ভুল হয়েছে, কি তাঁরা অনুতপ্ত, তখন আমি পাঠাব।

কিন্তু তাঁদের যে ছেলে! তাঁরা যদি তা না করেন?

—অতটা ভেবে আমি দেখিনি।…তখনকার ব্যবস্থা তখন হবে।

—আমারই যদি ভুল হ'য়ে থাকে?

—তাতেও তাঁদের দায়িত্ব যাচ্ছে না।

মন্মথনাথ স্পষ্ট দেখিলেন, জ্যোতি ভয় পাইয়াছে; তবু বলিলেন,—তোমায় অমন ক'রে ছুড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি চলে যাবার কারণটা পরিষ্কার হওয়াই চাই।…তোমার যদি ভুল হ'য়ে থাকে তবে তোমাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যেও আমার সেটা জানা চাই।

শুনিয়া জ্যোতি উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

—যুবরাজ, মহিষী ত বুড়ো আঙুল দেখালে।—বলিয়া গগন তার বুড়ো আঙুলটাই অশোকের সম্মুখে দ্রুতবেগে নাড়িতে লাগিল।

যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে যে স্বামীকে দুনিয়ার কাছে কতটা লজ্জিত হেয় 'খেলো' করিয়া রাখিয়া যায় তাহা অশোক হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে।

মানুষের প্রশ্নের যেন আর শেষ নাই—

লোকে যাহা শুনিয়াছে তাহার উপর তার শতগুণ অনুমান চড়াইয়া লইয়াছে; তাই আলোচনার অন্ত নাই, কৌতুক কৌতূহলের অন্ত নাই, অপ্রীতিরও অন্ত নাই—লজ্জার যন্ত্রণা ত' আছেই। ফাঁকি দিয়া লোকে যাহাকে সাতপাক ঘুরাইয়া বউ করিবা আনিয়া দিতেছে, সে আবার ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেছে—ইহার মত ঘৃণার কথা জগতে কি আছে তাহা বোধ হয় কেউ জানে না।

অশোক বলিল,—যার যেমন প্রবৃত্তি।

—ফিরিয়ে আনগে যা।

—দায়? আপুনি গেছে বেঁচেছি।

· না গেলে তাড়িয়ে দিতিস নাকি?

—একজনকে ঘর ছাড়তেই হ'ত; হয় তাকে, নয় আমাকে।

—কেন?

—কালো বউ আরো আছে; কালো বউ নিয়ে সুখ-শান্তিতে আছে, এমন মানুষও আছে। কিন্তু এ একেবারে—

বলিয়া অশোক বাধ্য হইয়া থামিল। যে অপরাধ আর যে অপবাদ সে স্ত্রীর প্রতি আরোপ করিতে যাইতেছে, সেটা নিজের স্ত্রী বলিয়া পরের কানে দেওয়া উচিত কিনা এ দ্বিধায় সে বাধা পাইল না। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গেছে—এটাকে সে পদাঘাতের তুল্য অপমানকর মনে করিয়া লইয়াছে। সমগ্র জগতের সম্মুখে পরাভূত এবং অপদস্থ হইবার জ্বালায় নিরন্তর তার অন্তর জ্বলিতেছিল· স্ত্রীর সম্মানহানিকর কোনো কথা উচ্চারণ করিতে তার বাধিবে না। কেবল এই কারণে সে থামিয়া গেল যে, অপরাধটা গুরুত্বে পর্যাপ্ত হইবে কি না; এবং সে-ই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করাইবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট বলবান হেতু হইবে কি না!

—একেবারে কি?—জিজ্ঞাসা করিয়া কুৎসার ঘ্রাণ পাইয়া গগনের মানবাত্মা ঔৎসুক্যে খাড়া হইয়া উঠিল।

—বোকা। শুধু বোকা হলেও চালিয়ে নেয়া যেতো।·· সে যা, তা বলা যায় না।

—এমন কি হ'তে পারে যা বলা যায় না?

গগন ছটফট্ করিতে লাগিল—যুবরাজের স্ত্রীর সম্বন্ধে ইতর একটা কল্পনা যেন উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া তার প্রাণের আবরণটাকেই ঝম্‌ঝম্ করিয়া নাচাইতে লাগিল। অশোককে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—বলো না হে কি সে?

অশোক সম্মুখের সূর্যাস্তের দিকে চাহিয়া বলিল,—প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না ব'লে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।

কুললক্ষ্মীর নামে এই জঘন্যতম অপবাদবাক্য উচ্চারণ করিয়া অশোক তেমনি নির্বিঘ্নে হাঁটিয়া চলিল। গগন দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিল।

গগন অলস নহে। বাড়ী বাড়ী বেড়াইবার উৎসাহ তার খুব ; কথা কহিবার আগ্রহও তার কম নয়···কাজেই অনতিবিলম্বেই গগনের বন্ধুবান্ধব কয়েকজন জানিল যে, যুবরাজের স্ত্রী ইত্যাদি—

তাহাদের মারফত আরো কয়েকজন —আরো কয়েকজনের মারফত আরো কয়েকজন—

এমনি করিয়া পরিধি বাড়িয়া দিন সাতেকের মধ্যেই জ্যোতির কথাটা সদরে-অন্দরে হাটে-বাটে বৈঠকখানায় আলোচিত হইতে লাগিল—

গার্হস্থ্য ব্যাপার সাধারণের ঠোঁটের উপর নাচিতে লাগিল, এবং ব্যক্তিগত ক্লেশ সামাজিক ক্লেশে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন আর দবদ পরিপাক করিবার শ্রমে অশোক গলদঘর্ম হইয়া উঠিতে লাগিল।

রত্নময়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেছেন—

খগেশবাবুর স্ত্রী রুক্মিণী প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁ গা, বউ কবে আসবে ?

রত্নময়ী বলিলেন,—যেদিন সে আসতে চাইবে সেই দিনই আনব···বেশী দূরে ত' নয়।

রত্নময়ী বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বধূকে তাঁহারা অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছেন, সে তাহার ইচ্ছামত পিত্রালয়ে যাওয়া আসা করিবে। কিন্তু রুক্মিণী বুঝিলেন অন্যরকম। তিনি বুঝিলেন, বউ রাগ করিয়া গেছে ; অনুতপ্ত হইয়া সে আসিতে চাহিলেই তাহাকে আনা হইবে। বলিলেন,—কথা লুকোচ্ছ, বোন। তাকে আর তোমরা আনবে না।

—আনব না কে বললে ?

—তাই ত' শুনছি। সে বৌ নাকি রাক্ষসী। ছেলের আবার বিয়ের কথাবার্তাও না কি হচ্ছে !

শুনিয়া রত্নময়ী আকাশ হইতে পড়িলেন,—সে কি কথা !

প্রবোধবাবুর স্ত্রী সুরমা সেখানে পূর্ব হইতেই ছিলেন, কিন্তু কথায় যোগ দেন নাই। তিনি রত্নময়ীকে আকাশ হইতে পড়িতে দেখিয়া অপ্রসন্নভাবেই বলিলেন—আমরা সে মেয়েকে না দেখেছি এমন নয় ; তোমরা যে অপবাদ দিয়ে তাকে ত্যাগ করেছ সে দোষ তার নেই।—বলিয়া সুরমা রুক্মিণীর দিকে চাহিয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া অদ্ভুত একটি ঘৃণার ভঙ্গী করিলেন।

রত্নময়ী অপবাদের কথা কিছুই জানেন না—কে রটাইয়াছে তাহা ত জানেনই না।

ঐ দুজনের অভিযোগে তাই অতিশয় মনোকষ্ট পাইয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন ; এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই নিমন্ত্রণবাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিলেন।

ব্রজকিশোরের অন্তঃপুরে মেয়ে মজলিশ বসে না -

তিনি সুদখোর ন'কড়ি ঘোষের দক্ষিণহস্ত বলিয়া এবং সুদ আদায় করেন বলিয়া ভদ্রমহলে কিছু অপ্রিয়···সকলেরই হাঁড়ির খবর জানেন—

আর উকিল আমলারা পুরা শিক্ষার অভিমানে ব্রজকিশোরকে অর্ধশিক্ষিত মনে করিয়া তাঁহাকে সমকক্ষ মনে করেন না—

করিলে রত্নময়ী কথাটা আগেই শুনিতে পাইতেন।

ন'কড়ি ঘোষের দামী একটা দোতর্ফা মোকদ্দমার আপীলের কাজে ব্রজকিশোর

জিলায় গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতেই এত কান্ড ঘটিয়া গেছে ।···তিনি জিলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গগনের মধু খুড়োকেই সর্বাগ্রে আপ্যায়িত করিতে যাইয়া আশ্চর্য গুজবটি শুনিয়া আসিলেন।

মধু বলিলেন,—দেখে শুনে অমন মেয়ে ঘরে আনতে হয় ! ছেলের চেয়ে তোমার টাকা হ'ল বড় হে !···ছেলের পরমায়ু যে সে তিনদিনেই শেষ ক'রে আনবে।···বুড়ো বয়সেও তোমার আক্কেল হ'ল না !

অবাক হইয়া ব্রজকিশোর বলিলেন,—না, না, সে ত' তেমন মেয়ে নয় !

—তবে শুনছি যে ?

—কোনো শত্রুর কাজ।

মধুসূদন এত অল্পবুদ্ধি নন যে বিশ্বাস করিবেন, শত্রুপক্ষীয় কাহারো কারচুপির দ্বারা কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে···তিনি ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

কথাটা কে তুলিয়াছে, পিছন হাঁটিয়া যাইয়া তাহা আবিষ্কার করা অসম্ভব।··· গগনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বন্ধুর নামোল্লেখ করিল না ; বলিল,—শুনেছি। কে বলেছে মনে নেই।— বলিয়া সরিয়া গেল।

ব্রজকিশোর যতই স্বার্থপর, অর্থলোলুপ আর মামলাবাজ হউন, ইহা সন্দেহ করিতেও তাঁর প্রবৃত্তি হইল না, যে এত বড় মিথ্যা সৃষ্টি তাঁর পুত্রেরই কাজ···

তবু ছেলেকেই তিনি কাছে ডাকিলেন।

বলিলেন,—বড় বিশ্রী কথা শুনছি বৌমার সম্বন্ধে। তুই ব'লে বেড়িয়েছিস ?

অশোক অম্লানবদনে বলিল,—না।

—তবে ? যা নয় তাই রটিয়ে আমার মাথা হেঁট ক'রে দেবে এমন শত্রু ত' আমার নেই।···সত্যি বলছিস, তোর মুখ থেকে এ কথা বেরোয়নি ?

—সত্যি বলছি বৈ কি।

···ব্রজকিশোর প্রাণপণে কথাটাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইবার পূর্বেই বড় বিষময় ফল ফলিয়া গেল।

## ॥ সাত ॥

গগনের মধুখুড়ো বৎসরের চাল, কলাই, ধনে, সর্ষে ক্ষেত হইতেই পান ; কিন্তু অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে কাপড়টাও কিনিতে হয়।

কাপড় কিনিতেই তিনি মহকুমার বাজারে আসিয়াছেন—

একজোড়া ধুতি পছন্দ করিয়া বাঁ-দিকে নামাইয়া রাখিয়াছেন ; আর এক জোড়ার পাড় পছন্দ হইয়াছে···ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তার জমি পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন ব্রজকিশোরের বৈবাহিক মন্মথনাথ—

"বেয়াই যে"—বলিয়া মধুসূদন লাফাইয়া উঠিয়া যাইয়া বেয়াইয়ের সম্মুখে পড়িলেন—কাপড় আর তার জমি পড়িয়া রহিল।

বলিলেন,—নমস্কার। সব কুশল ত' ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কুশল। আপনাদের সব ভাল ?

—ভাল।···একটা কথা আছে। আমি কাপড়ের দামটা চুকিয়ে দিয়ে খালাস হ'য়ে আসি···এক মিনিট।

বলিয়া মধুসূদন এক মিনিটের জন্য পুনরায় দোকানে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামের কেহ মধুসূদনের এখনকার তৎপরতা দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইত।

অশোকের বিবাহে মধুসূদন বরযাত্রী গিয়াছিলেন ; তখন উভয়ের আলাপ-পরিচয়ের আদান-প্রদান হইয়াছিল ; এবং বরের বাপ ব্রজকিশোরের গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হিসাবে মধুসূদন তখনই বেয়াই পাতাইয়া আসিয়াছিলেন—

সেই নৈকট্য এইবার মধুসূদনের জুৎসই কাজে লাগিয়া গেল।

কাপড়ের পুঁটুলিটা বগলে করিয়া আসিয়া মধুসূদন মন্মথনাথের সহিত মিলিত হইলেন ; বলিলেন,—কোন্ দিকে যাবেন ?

—কোনোদিকে যাব ব'লে বেরোইনি। যেদিকে খুসি চলুন।

চলিতে চলিতে মধুসূদন প্রশ্ন করিলেন,—উকিলের কাছে এসেছিলেন বুঝি ? কাজ হ'ল ?

—উপস্থিত হ'ল। তবে আবার বোধ করি আসতে হবে।

—মামলার ত' ঐ হায়রানি আছেই ; কবে মিটবে তার ঠিক নেই—কেবল আসো আর যাও।

মন্মথনাথ বলিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

···তারপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলিল।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে মধুসূদন বলিলেন,—কন্যাটিকে কাছেই রাখবেন, না শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাবেন ?

প্রশ্নটি স্বাভাবিকও নহে, সরলও নহে।

বিবাহিতা কন্যা চিরকাল বাপের কাছেই থাকিবে কি না, ইহা আবার অকারণে কেহ জিজ্ঞাসা করে না কি !···কিন্তু মন্মথনাথ সিধা মানুষ ; প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না, অসরলতার দিক দিয়াও তিনি গেলেন না ; সরল ভাবেই বলিলেন,—আমার কাছে চিরকাল কি থাকতে পারে ! পাঠাতে হবে বই কি।

মন্মথনাথের সারল্যে মধুসূদন নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন ; বলিলেন,—তা যা বোঝেন করবেন ; কিন্তু সত্যি বলতে কি, ও'রা লোক তেমন সুবিধের নয়।

—কি রকম লোক ?

—অন্য দিকে ভালই, স্বভাব-চরিত্রও ভাল, নেহাৎ দুর্মুখও নয় ; কিন্তু—

বলিয়া মধুসূদন মুখ বন্ধ আর ভার করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

মন্মথনাথ গল্প হিসাবেই মধুসূদনের মুখের কথায় কর্ণপাত করিয়া যাইতেছিলেন, সংবাদের গুরুত্ব তা'কে দেন নাই ; কিন্তু "কিন্তু" বলিয়া মধুসূদন অকস্মাৎ থামিয়া যাইতেই রহস্যের সন্ধান পাইয়া তাঁর মনঃসংযোগ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল ; মধুসূদনের মুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিলেন,—তারপর ?

মধুসূদন নম্রকণ্ঠে বলিলেন,—আমার নামটি যদি প্রকাশ না করেন তবেই কথাটা বলি।

—বলুন। আপনার নাম গোপন থাকবে।

—তবে বলি। আপনার কন্যাকে ও'রা আর নেবেন না বোধ হয়।

মন্মথনাথের বুকের ভিতর গুর্‌গুর্‌ করিতে লাগিল, দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

—তা আমি বলতে পারব না।

—জানেন?

—জানি।

—তবে আপনাকে বলতেই হবে।

এতক্ষণ যত কথা উচ্চারিত হইয়াছে তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা; কিন্তু মন্মথনাথের শেষ কথাটা যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে অটুট একটা কাঠিন্যে পরিপূর্ণ হইয়া মধুসূদনের কর্ণে প্রবেশ করিল; শঙ্কিত মধুসূদন থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া মন্মথনাথের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দৃষ্টি যেন সাকার হইয়া উত্তপ্ত বায়ুর মত কাঁপিতেছে।

কাতর হইয়া মধুসূদন বলিলেন,—বলব না কেন, বলব।—মুখে ঐ কথাটা বলিয়া তিনি মনে মনে যারপরনাই ভড়্‌কাইয়া নিজেকেই ধম্‌কাইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, পরের কথায় লিপ্ত হইবার জন্য এত ব্যস্ততা তাঁর কেন হইয়াছিল!··· মন্মথনাথ দুর্ধর্ষ লোক বলিয়া একটা জনশ্রুতি বিবাহের পর ক্রমশঃ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। এবং ইহাও অবগত হওয়া গেছে যে, মুসলমান আমলের শেষভাগে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ জলে স্থলে দস্যুতা করিতেন; বর্তমানে সেই ধনেরই জের চলিতেছে। ধনের সঙ্গে নরহত্যাপ্রবণতাও বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে কি না কে জানে! যে রকম চাউনি···

মধুসূদনের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতে লাগিল।

মন্মথনাথ বলিলেন,—ভয় নেই, বলুন।

—বলি। কিন্তু কথাটা বড় গর্হিত; আমাকে মাপ করতে হবে।

মন্মথনাথ নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মধুসূদন বলিলেন,—আপনার কন্যা না কি অতিশয়—

ঐ পর্যন্ত বলার পরই যেন সূত্র ছিঁড়িয়া অবশিষ্ট কথাগুলি মধুসূদনের বুকের ভিতর জড় একটা স্তূপের মত পড়িয়া রহিল।

—অতিশয় কি?

ঠিক যে কথাটা বলিবেন বলিয়া মধুসূদনের মনে ছিল তাহা গোলমালে মুখে আসিল না; বলিলেন—প্রচণ্ডা, হস্তিনী নারীর দুর্লক্ষণ তাঁতে আছে।

—হস্তিনী নারীর কি দোষ?

—প্রধান দোষ সে স্বামীর আয়ুঃনাশ করে।

মন্মথনাথ বলিলেন,—আচ্ছা, শুনলাম। আসুন আপনি।

মধুসূদন দাঁত মেলিয়া বলিলেন,—আসি এখন।—বলিয়াই পিছাইয়া পড়িলেন।

মন্মথনাথ তাঁহার দিকে আর চাহিয়াও দেখিলেন না।

জ্যোতির অনুতাপ জন্মিয়াছিল--

তাহারি উত্তাপে তাহার মন দ্রব হইয়া সেই স্থিতিস্থাপক মনের উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্বপ্নের আর স্মৃতির পদচিহ্ন পড়িতেছিল।

সর্বান্তঃকরণ দিয়া ধ্যান করিয়া সে ভবিষ্যতের একটি সুরঞ্জিত মনোরম ছায়াচিত্র

গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা হাসিতে উজ্জ্বল, অর্চনায় পবিত্র, প্রেমে মধুর—যাহাতে কপটতা নাই, তিক্ততা নাই, ব্যসন নাই।…

মন তার আরো দূরে ভ্রমণ করে যেখানে সে সন্তানের জননী—পুত্র-কন্যায় ভেদ-জ্ঞান নাই…কেবল প্রাণ-মুকুলটি কোলে ন্যস্ত—শৈশবের সেই অভিনয়টুকু যেন নিত্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—পুতুলটি প্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে জানে না সে-ই তার মা…

বেশী সময়ই ঘুমে কাটে চোখ বুজিয়াই স্তন্য-সুধা পান করে…

নতনেত্রে ক্ষুদ্রতম অবয়বটির দিকে সর্বাঙ্গ দিয়া চাহিয়া থাকা—জ্যোতি শিহরিয়া ওঠে।

উঠিয়া মায়ের কাছে যায়; ভূমিকা করিয়া বলে,—আমি কাছে নেই ব'লে শাশুড়ীর খুব কষ্ট হচ্ছে, মা।

—তিনি ত' চিরকালই একা; তুই ত' কেবল দু'দিন গিয়ে ছিলি।

—তা হোক, তবু আমি জানি তাঁর বড় কষ্ট হ'চ্ছে। তিনি বড় নিরীহ।

—উনি আসুন, চিঠি লিখে দিতে বলব!

—তাই ব'লো। রাগ ক'রে থাকা ভাল হ'চ্ছে না।

মন্মথনাথ আসিয়া উঠিলেন—

এবং তাঁর মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল, তিনি কাহারো উপর রাগই করিয়াছেন।… প্রথমে তিনি কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপই করিলেন না—নীরবে হাত মুখ ধুইয়া এবং নিঃশব্দে জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

জ্যোতি ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁর কাছে বসিল; বলিল,—তোমার কি হয়েছে, বাবা?

মন্মথনাথ বলিলেন,—আমার কিছু হয়নি; হয়েছে তোমার।

—কি হয়েছে?

—তোমাকে ওরা ত্যাগ করেছে।

শুনিয়া জ্যোতির মুখাবয়বের একটি পেশীও স্পন্দিত হইল না। বলিল,—কারণটা শুনেছ?

মন্মথনাথ কন্যার স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; বলিলেন,—শুনেছি। তুমি না কি তোমার স্বামীর আয়ুঃনাশ করবে। হস্তিনী-নারীর যে যে লক্ষণ তা সবই তোমাতে না কি আছে।

রাখিয়া ঢাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া কথা বলার অভ্যাস মন্মথনাথের নাই; সোজাভাবে সহজ কথায় শ্বশুরকুল হইতে নির্বাসনের এতবড় সংবাদটা কন্যাকে দিতে তাঁর বাধিল না—

কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়াই তাঁর হঠাৎ হুঁশ হইল—ভীত-চক্ষে তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন…

কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য জ্যোতির চোখে পলকপাতের বিরাম ঘটিল না. মুখ দিয়া একটা নিঃশ্বাসও পড়িল না—বলিল,—কোথাও ভুল হয়েছে, বাবা। আমায় শীগ্‌গির তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দাও; আমি ছাড়া এ ভুল ভাঙতে কেউ পারবে না।… তুমি কার কাছে শুনলে?

—তাদের দেশের লোকের কাছে।

—তিনি শত্রু না মিত্র ?

—তা জানিনে, তবে বিয়েতে এসেছিলেন।

—আমায় কালই পাঠিয়ে দাও।

স্বরমাও অশ্রু গোপন করিয়া কন্যার মতই সমর্থন করিলেন ; বলিলেন,—ও যখন যেতে চাইছে, তখন আমাদের মাঝে প'ড়ে ওকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। উপলক্ষ্য ও, ওর তরফ পরিষ্কার থাক।

মন্মথনাথও ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁর কন্যা নির্বোধ নয়—নিজের গ্লানি নিজে মোচন করিবার ক্ষমতা তার আছে।

॥ আট ॥

জ্যোতি গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শাশুড়ী শিল-নোড়া লইয়া ব্যস্ত, বাসি কাপড়গুলি একত্র করিয়া ঝি পুকুর-ঘাটে যাইবার পথে দাঁড়াইয়া আছে।

সে-ই আগে জ্যোতিকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—ও মা, বৌ যে !

—হ্যাঁ, এলাম।—বলিয়া জ্যোতি অগ্রসর হইয়া গেল।

রত্নময়ী ততক্ষণে নোড়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—জ্যোতি তাঁর পদধূলি লইল ; রত্নময়ী তাঁর মুখচুম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্যজগৎ যেন অন্ধকারে অচল হইয়া রহিল। বধূর মুখের দিকে তিনি একদৃষ্টে কেমন অবোধের মত চাহিয়া রহিলেন।

জ্যোতি বলিল,—মা, কথা বলছ না যে ?—বলিয়া একটু হাসিল।

এতক্ষণে যেন রত্নময়ীর তন্দ্রা ভাঙিল। কিন্তু তন্দ্রা ভাঙিয়া তাঁর মুখে কথা ফুটিল না, চোখে জল আসিল।

জ্যোতি নিজের সংকল্পকে অটুট করিয়া তুলিয়াছিল—গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করিয়া পথ অতিক্রম করিতে করিতে অন্তরায়ের সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া পড়িবে না।

জ্যোতি পুনরায় বলিল,—দুঃসংবাদ যদি কিছু থাকে, মা, তবে তা ভেবে তুমি কেঁদো না ; যদি আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়ে থাকে তবে তা-ও ভুলে যাও ; আর যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তবে আমায় ক্ষমা করো।

রত্নময়ীর অন্তর টগবগ করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন,—তোকে যে আর পাবো তা ভাবিনি।—বলিয়াই জ্যোতিকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে একেবারে ছাইয়া দিলেন।···বলিলেন,—বোস্।

জ্যোতি বসিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে বলো ত' মা ?

রত্নময়ী বলিলেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না, ছেলেও জানে না বলিতেছে ; কিন্তু গুজব রটিয়াছে বড় বিশ্রী, লোকের বিশ্বাস, তাঁহারাই রটাইয়াছেন।···লোকের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় তাঁহাদের নাই ; লোকে তাঁহাদিগকে ফাঁকিবাজ, অর্থপিশাচ প্রভৃতি অনেক কুকথাই বলিতেছে।···তারপর বলিলেন,—যখন এসে পড়েছ, মা, তখন আমরা বেঁচে গেছি।—বলিতে বলিতে যেন মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রত্নময়ী হাঁফ ছাড়িয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতি নিশ্চিন্ত হইল। সে যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাই ঠিক ; ঈর্ষাপরায়ণ শত্রু অকথা অপবাদ রটাইয়া ইঁহাদিগকেই অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

অশোক 'ল' মুখস্থ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া মাথা জুড়াইতে বাহিরে গিয়াছিল ; বাড়ি ঢুকিয়া রান্নাঘরের ভিতর কথার আওয়াজ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে, মা ?

রত্নময়ী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া হাসিমুখে খবর দিলেন, বৌমা এসেছে।

— আবার যে ?

পুত্রের মুখের ধ্বনিটা কানে যাইয়া রত্নময়ীর মুখের হাসি এক নিমেষেই দেহত্যাগ করিল ; এবং ঘরের ভিতর জ্যোতি মাথা হেলাইয়া উৎকর্ণ হইল।

অশোক বলিতে লাগিল—টাকায় বুঝি সুখ হ'ল না !···আচ্ছা, এসেছেন, থাকুন।—বলিয়া সে চটি বাজাইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল···সে যে ইঙ্গিতটি স্বরভঙ্গীতে ফুটাইয়া রাখিয়া গেল তাহা রত্নময়ী না বুঝিলেও জ্যোতির বুঝিতে দেরী হইল না।

আসিয়াছে, থাক, তাড়াব না—

তবে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে ব্যবহার করা আর চলিবে না।

রত্নময়ী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ইহাই ভাবিয়া যে, ছেলের কথায় মনে হইতেছে সেই যেন ষোল আনা কর্তা, তাঁরা যেন কেউ নন।

ঝিয়ের মুখে বার্তা পাইয়া ন'কড়ি ঘোষের তেজারতি রেজেস্টারী বহি ফেলিয়া রাখিয়া ব্রজকিশোর বাড়ী পেঁাছিয়া যখন রত্নময়ীকে দেখিতে পাইলেন, তখনও রত্নময়ী তদবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছেন।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৌমা এসেছে ?

রত্নময়ী কেবল মাথা নাড়িলেন।

জ্যোতি বাহিরে আসিয়া ব্রজকিশোরকে প্রণাম করিল।

—ভাল ছিলে ?

—ভালই ছিলাম, বাবা।

—বাড়ীর সবাই ?

—ভালই আছেন।

—তোমাকে আনতে যাব-যাব করছিলাম। বেয়াইকে সেদিন বড় ক্ষুণ্ণ ক'রেএসেছি। দু'দিন সেখানে থেকে তাঁর খাওয়াবার আশ মিটিয়ে দিতাম। যাই হোক, তুমি নিজে হ'তেই এসেছ, ভালই হয়েছে ; বড় সুখী হ'লাম।···তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছো যে ? —বলিয়া ব্রজকিশোর সকৌতুকে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু ছেলের ব্যবহারে রত্নময়ী নিদারুণ অবাক হইয়া গিয়াছিলেন ; প্রত্যুত্তর না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

ব্রজকিশোর বলিলেন—তোমার সঙ্গে কে এসেছে ?

—মামা।

—কোথায় তিনি ?

—তিনি চ'লে গেছেন।

মন্মথনাথের আদেশই ছিল ঐরকম।

ব্রজকিশোর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমি সেদিন নামিনি ; বেয়াই বুঝি তারই প্রতিশোধ নিলেন ! বেশ, বেশ—

বলিতে বলিতে তিনি ন'কড়ি ঘোষের সেরেস্তার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

—বৌমা, কোথায় যাচ্ছো ?

জ্যোতি পা বাড়াইয়াছিল ; থামিয়া বলিল,—ও ঘরে।

রত্নময়ী বলিলেন,—একটু পরে যে'ও ; পিছু ডেকে ফেললাম।

পিছু ডাকার বাধাটা অমান্য করিয়াছে বলিয়াই ঘোরতর একটা বিপাকের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হইবে ইহা বিশ্বাস না করিলেও জ্যোতি ফিরিয়া আসিয়া বসিল। শাশুড়ীর মনের কথাটা সে টের পাইয়াছে। পুত্র যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়া গেছে তাহা মিলনোৎকণ্ঠার মত শোনায় নাই ; তাই শাশুড়ী সময় লইতে চান—ছেলের মনটা শান্ত সুস্থ হোক।

বসিয়া জ্যোতি বলিল,—আমি ও'র মনের কথা বুঝেছি, মা ; উনি যদি আমায় না নিতে চান তবু আমি এখানেই থাকব। তুমি কিন্তু আমায় তাড়িও না, মা।

বলিয়া রত্নময়ীর জড়তা ভাঙিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই সে উঠিয়া পড়িল।

ল-বুক আর তার নোটবুক আর তার প্রশ্নোত্তরমালা এবং তদুপরি একটা লাল-নীল পেন্সিল লইয়া অশোক আইন-সমস্যায় নিমগ্ন ছিল।

জ্যোতি আসিয়া দাঁড়াইলে সে চোখ ফিরাইয়াও দেখিল না যে নূতন আসিয়াছে।

জ্যোতি গললগ্নকৃতবাস হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ; তারপর বলিল,—আমি তোমার ক্ষমা চাই।

অশোক ল-বুকের একটা প্যারা পেন্সিলের লাল দিকটা দিয়া প্রচণ্ডভাবে চিহ্নিত করিয়া বলিল,—দিলাম।

—আমার চোখের দিকে চাও।

অশোক চাহিতে পারিল না ; বলিল,—কামাখ্যার মন্তর পড়বে নাকি ?

—না। তুমি সত্যি কি মিথ্যে বলছ তাই দেখব।

—মিছে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই।

—গুজব রটিয়েছে কে, তুমি না আর কেউ ?

জ্যোতির মনে এই সন্দেহটা এই মুহূর্তে হঠাৎ দেখা দিলো।

প্রশ্ন শুনিয়া অশোকের হিতাহিতজ্ঞানটা এক নিমেষেই নিলুপ্ত হইয়া গেল,—যা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহারই আবরণ উন্মোচিত করিয়া দিলো ; জ্যোতির হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রহরণ নিক্ষেপের দানবীয় উল্লাসে সে অন্ধ হইয়া উঠিল ; বলিল,—আমিই, কিন্তু সেটা মিথ্যে নয়।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জ্যোতির চোখের দৃষ্টি স্থির হইয়া রহিল, কিন্তু সে অনুভব করিতে লাগিল যেন দুঃসহ দুর্বলতার ভারে পতনোন্মুখ হইয়া তার সর্বদেহ কাঁপিতেছে—মনে যা ভাষা ছিল, আশা ছিল, ভাব ছিল, বাণ ছিল, সব নিঃশেষে নিংড়াইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের দারুমূর্তিটাকেই সে যেন দু'হাতে ঠেলিয়া তুলিল ; বলিল,—সত্যি বলছ সেটা মিথ্যে নয় ? আমার দিকে চেয়ে দেখো, মিথ্যে নয় ?

—না।

—আমায় তুমি আর নেবে না ?

—আপাততঃ ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু আমিও তোমায় ত্যাগ করেছি, এখন তা বললে আমার অপরাধ হবে না। তোমার আয়ুঃনাশ করব এ তপস্যা ক'রে আমি আসিনি। মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে তা তুমি বোঝনি। তোমার মুখে শুনে উত্তরটা তোমার কাছেই দিয়ে গেলাম—এই ভাল হ'ল।

বলিয়া জ্যোতি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যাইতে পারিল না, রত্নময়ী আসিয়া বাধা দিয়া দাঁড়াইলেন। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তিনি সব কথাই শুনিয়াছেন এবং ইত্যবসরে ব্রজকিশোরকেও ডাকিয়া আনিতে ঝি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

যে নিরীহ মানুষটি সাধারণ দুটি কথা গুছাইয়া বলিতে যাইয়া দিশেহারা হইয়া যান, তিনি অকস্মাৎ গোছালো কাজের লোক হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর চোখের দিকে চাহিয়া জ্যোতি বড় বিস্মিত হইয়া গেল—তাঁর সব আশা যেন অতল পঙ্কের গর্ভে ডুবিয়া গেছে; কিন্তু তাহাতে তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। যে অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর তাহা ঘটাইয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রুখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

—ডেকেছ কেন গো?—বলিয়া ব্রজকিশোর তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রত্নময়ী বলিয়া উঠিলেন,—তোমার ছেলে তোমায় আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি; তার সঙ্গে আমার মা-সম্পর্ক আর নেই।

ব্রজকিশোর হঠাৎ থতমত খাইয়া গেলেন।

এমন দৃশ্য তিনি আগে কখনো দেখেন নাই—পুত্রের জননীর আহত অন্তরের সত্যটি যেন সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত জ্বলন্ত একটা বিগ্রহের মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলিলেন,—কি হ'ল? কি বলেছে সে তোমায়?—বলিতে বলিতে ব্রজকিশোর বারান্দায় উঠিয়া আসিলেন; রত্নময়ী বলিতে লাগিলেন, তাঁর মুখে কথাগুলি দিব্যি ফুটিতে লাগিল,—তোমার উপর রাগ করেছিল ছেলে; তার শোধ নিয়েছে সে ঘরের বউয়ের নামে ঘেন্নার কথা রটিয়ে; তুমি যে পাপ করেছ তার ফলভোগ করছে বউ এসে …বলিতে বলিতে রত্নময়ী হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্রজকিশোর বধূর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া অপরাধীর মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কান্না সম্বরণ করিয়া লইয়া রত্নময়ী বলিতে লাগিলেন,—টাকা হয়েছিল তোমার বড়, এতটা তুমি ভাবনি। কেন তুমি ছেলেকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলে, আর কেন তুমি ওকে বুঝিয়ে দাওনি যে বউয়ের কোনো অপরাধ নেই?

আত্মাপরাধের লজ্জায় কি পুত্রের ব্যবহারের দরুণ ঘৃণায় তাহা জানি না, কিন্তু যে কারণেই হোক ব্রজকিশোরের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল—উচ্চারণ করিলেন,—কি বলেছে সে?

—বউকে ত্যাগ করেছে।

—কোথায় সে?

—এই ঘরে।

ব্রজকিশোর অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন—

পিনাল কোডের সমুদয় অপরাধকেই তিনি এই দণ্ডেই সায়েস্তা করিয়া দিবেন এমনি তাঁর মারমুখী ভাব।

জ্যোতি ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরকে দেখিয়া আর একটু সরিয়া গেল।

শুনিতে বিস্ময় লাগে, ব্রজকিশোরের এই ক্রোধাভিব্যক্তির বারো আনাই ভাণ। স্ত্রীর কথায় তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করেন নাই যে পুত্র পত্নীত্যাগ করিয়াছে; তবে বধূর প্রতি যতটা অপরাধ সে করিয়াছে বলিয়া বধূরই বিশ্বাস, সেই অপরাধটাকেই হাল্কা করিয়া দিবার জন্য, অর্থাৎ বধূকে সন্তুষ্ট করিতে, রাগটা বাড়াইয়া দেখানো দরকার; তারপর, এই সূত্রে নিজের অপরাধটা আবৃত করিবার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিলেন—এইরূপ বিবিধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াঘরে ঢুকিয়াব্রজকিশোর হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—তোর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে নিশ্চয়, তুই এমন নির্লজ্জ! আমার সামনে ক্ষমা চা বউমার কাছে।

বলিয়া তিনি গরম হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সেইটাই বা কি করিয়া সম্ভব!

অশোক লম্বুকের উপরকার রক্তরেখাটার দিকে চাহিয়াছিল; বলিল,—ক্ষমা চাইবার মত অপরাধ আমি করিনি।

দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অশোকের মুখ ফুটিয়াছে।

—করিসনি?—বলিয়া রত্নময়ী যেন গর্জন করিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন,—করিসনি? আমি তোর মা, বল আমার সামনে, অপরাধ তুই করিসনি? তোর অপরাধে তোর বাপ-মায়ের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তা জানিস?

অশোক বলিল,—যদি কিছু ব'লে থাকি তবে ঠিক বলেছি। আমার সর্বনাশ করতেই ও এসেছে—তার সূত্রপাত দেখা গেছে।

জ্যোতি আগাইয়া আসিয়া রত্নময়ীর হাত ধরিল; বলিল,—মা, এসো; বাবাকেও ডাকো; আমার ব্যবস্থা আপনি হবে।—বলিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আর ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নহে মনে করিয়া ব্রজকিশোরও আস্তে আস্তে নকড়ি ঘোষের দপ্তরখানায় যাইয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন,—ছি! ছি!!

—আমার অদৃষ্টের লেখা ফলবেই, মা। উনি যা বলেছেন তা-ই ঠিক—আমার দ্বারা তোমাদের সংসারের অমঙ্গল বই আর কিছু হবে না। আর একটা বউ তুমি আনো মা।—বলিয়া হঠাৎ কেমন একটা দুর্দমনীয় ব্যাকুলতায় আত্মহারা হইয়া জ্যোতি দু'হাত দিয়া রত্নময়ীর পা জড়াইয়া ধরিল।

রত্নময়ীর সাধ্যও নাই যে প্রত্যক্ষবস্তুপরিচ্ছিন্ন এই আবেগটির হেতু তিনি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করেন। জ্যোতির এই কাকুতির মূলে ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, পারিবারিক ইষ্টকামনা নাই···সপত্নী-সংগ্রহে তার আকুলতা স্বামীর তৃপ্তির জন্যও নহে—সে চায় কেবল নিজেকে যত শীঘ্র সম্ভব বিচ্যুত করিয়া লইতে। মাঝখানে পর্বতের অন্তরাল তুলিয়া স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব সে দুরতিক্রম্য করিয়া তুলিতে চায়।

রত্নময়ী তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—দেখি আরো কিছুদিন।

জ্যোতি হাসিল; বলিল,—আর দেখবার কিছু নেই, মা, ও'র মন আর ফিরবে না।

কিন্তু জ্যোতির মুখে অনুক্ত যাহা রহিয়া গেল তাহা এই যে, আমি ম'রে গেছি; তোমার ছেলের মন যখন ফিরবে ব'লে ভাবছ, তখনো যদি আমি বেঁচে উঠতে না পারি!

॥ নয় ॥

তামাদি আসন্ন—

ন'কড়ি ঘোষের সেরেস্তায় কাজের বড় ভিড়। ব্রজকিশোরের অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবার তিলার্ধ অবসর নাই। আর্জিগুলি দাখিল করিয়া দিয়া তবে তাঁর ছুটি।

অশোকের লম্বুক তাকে উঠিয়া ধুলো খাইতেছে—অধ্যয়নে অশোকের আর ইচ্ছা নাই; তার মন সর্বদাই উড়ু-উড়ু করে। সৃষ্টি নিরর্থক আর মানুষের সঙ্গ বিষবৎ মনে হয়।…নিজের যৌবনের দিকে তার দৃষ্টি যায়—যৌবন স্বপ্ন দিয়াই ভরা থাকে—যৌবনের ভিতরকার বস্তু আর মধু ঐ স্বপ্ন। কিন্তু তার যৌবনের কোষ ছাড়িয়া সেই স্বপ্ন বাহির হইয়া গেছে…তার যৌবন এবং জীবন তাই গজভুক্তকপিত্থবৎ একেবারে ফাঁপা, বস্তুহীন, অসার, নীরস।

রত্নময়ী হাসেন কাঁদেন যেন কলে চ'লে; নিজের এক্তিয়ারে তাঁর কিছুই কোনে না।

জ্যোতি কেমন আছে, তার মনের ভাব কি, তাহা কিন্তু বুঝিবার যো নাই; বাহিরটা তার তেমনি মসৃণ, জীবন্ত, সচল—হাসির কথা সে বলে, নিজেও হাসে—ঝিয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝি পাতাইয়া তার হাসি-কৌতুকের বিরাম নাই।

স্বামীবঞ্চিত হইয়াও সে হাসে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রত্নময়ী এক এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া যান; বলেন,—পাগলী মেয়ে!

জ্যোতি তা বোঝে।

কিন্তু রত্নময়ী জানেন না যা, জ্যোতির ঐ হাসি তাঁহাকেই ভুলাইবার কৌশল… শাশুড়ীকে জ্যোতি চিনিয়াছে। তাহাকে বিমর্ষ দেখিলে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া রত্নময়ীর ক্ষোভ ও দুঃখ চতুর্গুণ বেগে আবর্তিত হইতে থাকিবে—আপশোষের আর অন্ত থাকিবে না…ছেলেকে সুমতি দিবার অক্ষমতার দরুণ বিলাপ করিয়া সর্বশক্তিমান ভগবানকে সাহায্যার্থে আহ্বান করা তার কানের কাছে কেবল চলিবে আর চলিবে। তাঁহাকে ঠাণ্ডা রাখিবার একমাত্র উপায় জ্যোতির বাহিক ঐ হাসিটি।

কিন্তু জ্যোতির ঐ হাসিতে ভুলিয়া রত্নময়ী তাহাকে অশোকের ঘরে পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া দুই বার বিফল মনোরথ হইয়াছেন। জ্যোতি যাইতে চাহে নাই, ইহাই বলিয়া শাশুড়ীকে বুঝাইয়াছেন যে, এখন ওঁর মন ভাল নাই, অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া আছে; এখন কাছে গেলে হয়তো সহ্য করিতে পারিবেন না…হিতে বিপরীত ঘটিয়া ফল আরো সাংঘাতিক দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

রত্নময়ী তাহা শুনিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাই সত্যি।

কিন্তু একদিন বড় তাজ্জব কাণ্ড ঘটিয়া গেল—যা একেবারে স্বপ্নাতীত—যা রত্নময়ী আকুল হইয়া কেবলি কামনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া আশা করিতে পারেন নাই।

অশোক আসিয়া ঝিকে দিয়া জ্যোতিকে ডাকিয়া পাঠাইল।

রত্নময়ী একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—কাপড়খানা বদলে ফেল্ দেখি, চুলগুলো বাগিয়ে দি'... ক্ষেপি, চুলগুলোকে কাগের বাসা ক'রে রেখেছে।—বলিয়া নিজের আঁচল দিয়া তাড়াতাড়ি জ্যোতির মুখ মুছিয়া দিলেন আর চুলগুলি বাগাইয়া বসাইয়া দিলেন এবং আর কি করলে আরো ভাল হয় তাহারই দিশা না পাইয়া এমন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, যেন বোকে কোলে করিয়া লইয়া পেঁছাইয়া দিতে পারিলে এই সৌভাগ্যের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হয়।

অতটার দরকার হইল না। অতিশয় নির্লিপ্ত শান্তভাবে শাশুড়ীর অত্যাচার গ্রহণ করিয়া জ্যোতি নিজেই গেল। বলিল,—ডেকেছ?

অশোক তার মুখের দিকে চাহিল কিন্তু তেমন উৎসাহ পাইল না; বলিল,—হ্যাঁ, ব'সো।

জ্যোতি বসিল, অশোক বলিল,—আর একটু এগিয়ে এসো।

জ্যোতি অসঙ্কোচে আগাইয়া গেল, কিন্তু গাত্রে গাত্র স্পর্শ হইল না; তাহার দেহ হঠাৎ স্পর্শ করিতে অশোকের সাহসই হইল না।

অশোক বলিল,—এমনি ক'রে কি আমাদের দিন কাটবে?

জ্যোতি বলিল,—ক্ষতি কি।

—ক্ষতি কিছু নয়; তবে ভাবতে গেলে ক্ষতি আছে বৈ কি।

—কি ক্ষতি আছে জানিনে; কিন্তু দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না, আমরা তা পারিনে।

—তার মানে?

তার মানে, শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা।—বলিয়াই জ্যোতি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—তুমি যে ত্যাগ করেছিলে, সেইটেই সত্য। মাকে বলেছি ক'নে দেখতে।—বলিয়া চলিয়া গেল, এবং অশোক তাকের উপর সাজানো রং-বুকের দিকে চাহিয়া বেকুবের মত বসিয়া রহিল।

তার মনের একান্ত কথাটারই জবাব জ্যোতি দিয়া গেছে। সে স্ত্রী বটে, ভরণপোষণের দাবি লইয়া চিরদিন বাধ্য হইয়া থাকিবে, মুখাপেক্ষী থাকিবে, শপথ করিয়া আসিয়াছে: কিন্তু স্ত্রী নয়—যেন কোথাকার একটা নিঃসম্পর্কিত অচেনা মানুষ সহসা আবির্ভূত হইয়া শাস্ত্রকারের বন্ধনপাশ আর স্বামীর দাবী একটি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া গেল।

অশোকের নির্বাপিত রাগ দ্রুতবেগে ফিরিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, অশোকের এই পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা নীতি কর্তব্য ধর্ম হিত প্রভৃতি জ্ঞানবর্গের একটি জ্ঞানের দ্বারাও উজ্জীবিত হয় নাই।

জনরব বন্ধ হইয়া বাহির হইতে উত্তেজনার অভাবে ইন্ধন না পাইয়া তার খেয়ালী রাগ নিবিয়া গিয়াছিল। এবং দৃষ্টি পড়িয়াছিল নিজের উপর। জীবনটা ক্ষণস্থায়ী, যৌবন বৃথায় যায়,—ভাগ্য সবারই সমান নয়, তার যেমন ধনভাগ্য তেমন আর কার? স্ত্রীভাগ্য না হয় একটু মলিন। তাই এই আপোষের চেষ্টা এবং এই নির্বোধ ভাবের উদ্ভব হইয়াছে—পুরুষ নারীর সন্ধান করিতেছে। কিন্তু জ্যোতি আমল দিলো না; অতিশয় শান্তকণ্ঠে যাহা সে বলিয়া গেল তাহার অর্থ যেমন পরিষ্কার তাহাতে জ্বালাও তেমনি যথেষ্ট।

রত্নময়ী আগ্ বাড়াইয়া ছিলেন। জ্যোতি ঘর হইতে বাহির হইতেই তাহাকে যেন লুফিয়া লইলেন; অস্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বললে?

জ্যোতি একটু হাসিল। বলিল,—আমায় দিয়ে প্রয়োজন আছে তাই বললেন।

শুনিয়া রত্নময়ী নাচিয়া উঠিলেন: বৌমার মুখচুম্বন করিলেন। তারপর বৌমার মুখের দিকে চাহিয়া উল্লাসে এলাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—আয় বাঘ গলায় লাগ্—সতীন ডেকে আনবি বলেছিলি বড়! আমার কথা কি ভগবান না শুনে পারেন!—বলিয়া তাঁহার প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্বে অতিশয় পুলকিত হইয়া, পাঁচসিকের মানত যেটা ঠাকুরের নামে করিয়াছিলেন, দেবতার সেই ধারটা কবে পরিশোধ করিবেন, আজই কি কাল, তাহাই রত্নময়ী ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁর এই আনন্দ দেখিয়া গভীর দুঃখে জ্যোতি যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

রত্নময়ী কলস্বরে কত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন; যেন চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তিনি আরাধ্য চতুর্ভুজ নারায়ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছেন এমনি তাঁর হর্ষ—এই মুহূর্তের একটি মাত্র সার্থকতায় জীবনের অনন্ত ভবিষ্যৎ সুখ তিনি জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু সব পণ্ড করিয়া দিলো অশোক। অশোক উঠান হইতে ডাকিয়া বলিল,—মা, শোনো।

রত্নময়ী একলাফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—কি বলছিস?

অশোক বলিল,—তোমরা আমাকে চাও, না বউকে চাও?

রত্নময়ী অবাক হইয়া গেলেন—বলে কি ক্ষ্যাপাটা! বলিলেন,—ও কি কথার ঢং?

—বউকে চাও ত' আমাকে ত্যাগ করতে হবে, এই আমার শেষ কথা।—বলিয়া অশোক এমনভাবে পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল শেষ কথাটার সঙ্গে যেন প্রথম যাওয়াটা খাপ খায়।

রত্নময়ী ফিরিয়া আসিলেন; বহুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি পুত্রকেই দোষী এবং বিদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া তাহারই খোশখেয়ালের দিকে প্রাণপণে চাহিয়া ছিলেন। তবে কি বউই গোল মিটাইতে চাহে নাই! · হঠাৎ আশাভঙ্গে আনন্দের উত্তাল ঢেউটা যেন পাষাণে প্রহত হইয়া আসিয়া তাঁহার বুকে পড়িল।

কিন্তু বুকে বাজিয়া বেদনায় তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন না। দুঃসহ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া তাঁহার মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল; কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—তবে আর আমার ছেলের দোষ কি! মিছে এতদিন তাকে দোষী ক'রে মনে মনে কাৎরেছি!···তোমার পেটে পেটে এত কথা! কেন তুমি আমায় ছল ক'রে ভুলিয়েছ?—বলিয়া রত্নময়ী মনে মনে নিজের গাল দু'হাতে চড়াইতে লাগিলেন।

জ্যোতি বলিল,—আমি ত' বলেইছি, মা, আবার তুমি বৌ আনো।

—তা তুমি বলেছ সত্যি, কিন্তু এ কথা ত' বলোনি যে আমার ছেলে তোমার কেউ নয়! তুমি নিজে ভালমানুষ সেজেছ, মিছে কথা ক'য়ে আমায় ঠকিয়েছ।

—তা সত্যি, মা; ঠিক মনের কথাটা তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারিনি।—বলিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া জ্যোতি শাশুড়ীর পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল,—বিয়ে দাও, মা, বউ আনো; আমায় তোমরা ত্যাগ করো।

—তাই করবো।—বলিয়া রত্নময়ী পা ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

## ॥ দশ ॥

ব্রজকিশোর রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ন'কড়ি ঘোষের তামাদি আর্জির রচনা-কার্য শেষ করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার অবসর হইয়াছে দেখিয়া বাড়ীর খবরটা তাঁহাকে জানানো হইল। পুত্র নির্দোষ, দু'দিনের জন্য সে ঘাড় বাঁকাইয়া বাগ না মানিলেও তার সুমতি আসিয়াছিল, কিন্তু বউই আবার তাহাকে ক্ষ্যাপাইয়া দিয়াছে। বধূকে যেমন সহজ মানুষ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল তেমন সে ত' নহেই, উপরন্তু এমন ক্রূর অন্তর, প্যাঁচালো বুদ্ধি, একগুঁয়ে মেয়ে দেখা যায় না। বউ বলিতেছে, ছেলের আবার বিবাহ দাও; তা-ই দাও, টাকার গরম ঘুচুক, জব্দ হোক। "অন্যায় আমি দেখতে পারিনে, ছেলের বিয়ে আমি দেবোই।"—বলিয়া শপথ করিয়া বরময়ী বিলাপ এবং বক্তব্য শেষ করিলেন।

এবং তখনই বাহিরের দরজা হইতে আওয়াজ আসিল,—ভায়া, আছো না কি?

গগনের মধুখুড়ো। নালিশী আর্জির বিবাদীর তালিকার ভিতর তিনিও আছেন কিনা সেই সংবাদটা জানিতে আসিয়াছেন। বরময়ী সরিয়া গেলেন। ব্রজকিশোর সাড়া দিলেন,—এসো।

—কি কথা হচ্ছিল? আওয়াজ পেলাম।

ব্রজকিশোর দুঃখিতভাবে বলিলেন,—যে-কথা আর কোথাও হয় না—ছেলে-বৌয়ের কথা। দুনিয়ার লোকে বেটার বিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত—ঘর সংসার করছে, দিব্যি আছে, কিন্তু আমার বরাতে সবাই বিপরীত—ছেলে বউকে চায় ত' বউ ছেলেকে চায় না। গিন্নি ধ'রে বসেছেন ছেলের আবার বিয়ে দাও।

কেলেঙ্কারীর গন্ধ পাইয়া মধুসূদনের মন যেন টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতে লাগিল, বলিলেন,—দাও। পছন্দ না হ'লে একটাকে ছেড়ে আর একটাকে নেবে এ-বিধান আমাদের শাস্ত্রেই আছে, শাস্ত্র সে দিকে খোলসা। ব্যাপার তা' হলো কি?

ব্যাপারটা ছেলে আর বউয়ের মধ্যে, আমি বিশেষ কিছু জানিনে। তবে উনি বলছেন, তোমরা ছেলের আবার বিয়ে দাও—ছেলে বলছেন, এ স্ত্রী আমি চাইনে। এতেই ভেতরে ভেতরে একটা ঝগড়া চলছে তা বোঝাই যাচ্ছে।

—বড় অশান্তির কথা, ভাই।—বলিয়া তামাদি আর্জির দুশ্চিন্তার উপর সিদ্ধুর অশান্তির কথায় মধুসূদন আরো বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন,—বোঝ একটা অপ্রীতি আর বিরক্তি নিয়ে চলা বড় কঠিন। কাজেই ছেলের আবার বিয়ে দেওয়াতে আমি অন্যায় কিছু দেখিনে।

—কিন্তু পরিণাম ভাবতে হয় ত'। এটা রইলই, আর একটা আসবে, তখন হুলোচুলি হ'তে পারে, ছেলেপিলেও হ'তে পারে দু'জনারই—তখন?

মধুসূদনেরও হঠাৎ ধোঁকা লাগিয়া গেল। এখানেই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছেন তারাপ্রসন্ন সেন। সেন মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর দুই স্ত্রীর হস্তচালনায় ভীত হইয়া বঁটি কাটারি প্রভৃতি অস্ত্র ভোঁতা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাঁরও দুইটি স্ত্রী—সন্তান কামনায় নয়, এক রকম সখ করিয়াই কানের তৃষ্ণা মিটাইতে তারাপ্রসন্ন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন—প্রথমা পত্নী বোবা, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর ক্রোধ ঈর্ষা আক্রোশ কাহারো চেয়ে কম নয়।···মধুসূদন ভাবিয়া বলিলেন,—কিন্তু তার উপায় আছে। আমার হাতে ছেড়ে দাও ত' চারিদিক বজায় রেখে কার্য চালিয়ে দিতে পারি।

ব্রজকিশোর তখনই সম্মত হইতে পারিলেন না; বলিলেন,—ভেবে দেখি।

—আমার ভাবনাটা ঘোচাও দেখি। নালিশ করলে নাকি?

—হ্যাঁ। সে ঠিক ক'রে দেবো।

মধুসূদনেরও বিশ্বাস তা-ই।

॥ এগারো ॥

ব্রজকিশোর ভাবিতে লাগিলেন : এবং ভাবিয়া দেখিলেন, বিবাহ দিলে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে না। মন্মথনাথের যেমন হ্যাট্-ম্যাট্-ক্যাট্ অর্থাৎ ইংরিজি ধরণের চালচলন আর বুলি, আর 'রোঁয়াখাড়া' বুদ্ধি এবং মেজাজ, তাহাতে ব্যাপার যা ইতিপূর্বেই ঘটিয়া গেছে তাহাতেই তাঁহাকে ঘূর্ণিত করিয়া তুলিবে নিশ্চয়, এবং জামাতাকে সর্বস্ব অর্পণ করিবার সংকল্প তিনি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিবেন। মেয়েকে সুবুদ্ধি দিতে তাঁহাকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলে হয় : কিন্তু ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে তাহা জানা নাই···মেয়ে বাপকে আভ্যন্তরিক গূঢ় সংবাদগুলি এখনো জানায় নাই ; কাছে পাইলে একেবারে বুক খালি করিয়া নামাইয়া দিবে—আত্মপক্ষ সমর্থন সবাই করিতে চায়।

মধুখুড়ো কাপড় কিনিতে যাইয়া যে বিষ ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছেন তাহা জানা থাকিলে ব্রজকিশোরকে কষ্ট করিয়া এত কথা ভাবিতে হইত না।

ব্রজকিশোর আইনের কথাটাও ভাবিয়া দেখিলেন। আইন মন্মথনাথেরই অনুকূলে বলিয়াই তাঁর মনে হইল···তিনি বাচনিক অঙ্গীকার মাত্র করিয়াছিলেন। পুত্র ও বধূর মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা, যদিও সেইটাই সবার বড় কথা, কিন্তু দুজনায় আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পুত্রকে ও স্ত্রীকে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত করিয়া কেবল সম্পত্তির দিকেই হাত বাড়ানো আর শোভন হয় না···অশান্তির এইটুকু আঁচেই তাঁরই প্রাণ যেন আইঢাই করিতেছিল। দেশের দেনা অটুট থাক। আর রসনার গঞ্জনা দিবার শক্তি চিরজীবী হোক, পাত্রীর অভাব হইবে না। মধু চালাক লোক : আর চালাক লোক মানেই যার মনে ভালমন্দের দ্বিধা নাই ; মান অপমানে অবিচল নির্দ্বন্দ্ব অকাতর পুরুষ।···ব্রজকিশোর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, মধুর উপর তিনি নির্ভয়ে নির্ভর করিতে পারেন। দ্বিতীয় কথা, জনমত। কিন্তু ন'কড়ি ঘোষের অর্থসচিব হইয়াও যদি তত্রস্থ জনমতকে ডরাইতে হয় তবে আর বাকি রহিল কি!

শ্বশুর-শাশুড়ীতে পরামর্শ হয়। জ্যোতি চাহিয়া চাহিয়া দেখে, আর তার মুখে হাসি ফুটিতে থাকে।··স্বর্গধামে যে সুখের তৃপ্তির আনন্দের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই বুকের নিঃশ্বাসে আর মনের বস্তুতে গড়া···যাহা হারাইয়াছি, যাহা পাই নাই, যাহা অখণ্ড অক্ষয় অব্যয়—সব আমাদেরই বঞ্চিত অন্দরের অপেক্ষায় স্বর্গে রহিয়াছে—এইটুকু ভাবিতে পারে বলিয়াই মানুষ সহিতে পারে। জ্যোতি যেন সেই স্বর্গেই আরোহণ করিতেছে। দিন-দিন স্বর্গের সঙ্গে নৈকট্য বাড়িয়া সর্বোচ্চ সোপানটি ঐ দেখা যাইতেছে। জ্যোতি তৃষিতনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া থাকে—চোখের পলক পড়ে না।

মধুসূদন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন, কোন কথার বিরাম নাই।

···রত্নময়ী একদিন বলিলেন,—বৌমা, একবার বাপের বাড়ী হ'য়ে এসো।

জ্যোতি বলিল,—না। বিয়ের ভোজটা খেয়ে যাবো, মা।—বলিয়া শাশুড়ীর অবাক মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে লাগিল। বলিল,—তাড়িও না, মা। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করছিনে ত'!

কিন্তু রত্নময়ী আর কিছু না জানুন এটা জানেন যে, ক্ষতি সে করিতে পারে।

বিবাহের সবই একরকম ঠিক। মধুসূদন ঘটকের কার্যে দক্ষ ; তিনি শুভকার্যটিকে দ্রুতবেগে সাফল্যের দিকে আগাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। পাত্রীপক্ষ দরিদ্র ; হরীতকী ব্যতীত পাত্রীসহ দান করিবার সম্বল তাঁহাদের কিছু নাই।

তাঁহারা প্রশ্ন করিতে সাহসই পাইলেন না যে, এক স্ত্রী বিদ্যমানে আবার কেন ছেলের বিবাহ দিতেছেন! একজন প্রতিবেশী কথাটা একটু তুলিয়াছিলেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে মধুসূদন এমন সুকৌশলে বাক্যযোজনা করিয়াছিলেন যে, তাহার অর্থ যেদিকে ইচ্ছা লওয়া যাইতে পারে ; বলিয়াছিলেন,—তার কথা শুনলে, মশাই, কানে আঙুল দিতে হবে।

শুনিয়া সভাস্থ লোকের চোখ বড় হইয়া উঠিয়াছিল—শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্নকর্তা বলিয়াছিলেন,—এমনি '

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইহার পর কানে আঙুল দিবার ভয়েই সে কথাটির পুনরুল্লেখ আর কেহ করেন নাই।

এই সব রিপোর্ট পাইয়া বিবাহের উদ্যোগ-পর্বেই সর্বাগ্রে কণ্টকটিকে বিতাড়িত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।···কিন্তু জ্যোতি নড়িতে চাহে না ; অথচ সে ক্ষতির কারণ অবশ্য হইতে পারে। তাহারই সম্মুখে আবার বিবাহ, ইহা দৃষ্টিকটু ঘটনা—ভাবিতেই যেন থতমত খাইয়া যাইতে হয়···সে সশরীরে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করাই বা কই হইল ? আর সে-মেয়েটিই বা কি মনে করিবে ? তার উপর পরচিত্ত অন্ধকার···এই বউ যদি সেই বউয়ের 'কানে মন্ত্র' গুঁজিয়া দিয়া যায়! ঐ সব ঘটিতে থাকিলে তখন সামলানো দায় হইবে ; পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া দরকার।

কিন্তু রত্নময়ী হার মানিয়া গেলেন।···ব্রজকিশোর তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ; বলিলেন,—বৌমা, একটা কথা বলি। তুমি একবার বাপের বাড়ী যাও এটা আমার ইচ্ছে।

ব্রজকিশোরের বিশুদ্ধ ইচ্ছাটি জ্যোতি কান পাতিয়া শুনিল ; বলিল,—মা-ও তাই বলছিলেন। কিন্তু এখন আমি যাবো না।

—তা হ'লে বলিই। অশোকের আবার বিয়ে ঠিক করেছি।

—আমিই ত' সে কথা তুলেছিলাম, বাবা।

—তা তুলেছিলে ; কিন্তু তোলায় আর ঘটায় বিস্তর প্রভেদ।

—প্রভেদ আমার কাছে নেই। আপনারা যা ভাবছেন, তা কতক আমি বুঝেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোনো বিঘ্ন আমি ঘটাব না। না হয় আমায় একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দেবেন। তবু আমি এখন বাপের বাড়ী যাবো না।

ব্রজকিশোর অনেক তাজ্জব কাহিনী আজ পর্যন্ত শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন তাজ্জব তার কোনোটাই নয়। বলিলেন,—কেন ? যাবে না কেন ?

জ্যোতির মনে হয়, এখন চলিয়া গেলে অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে ; এবং সে অতৃপ্তি সহ্য করা যাইবে না। গ্রীবার উপর খড়্গাঘাত পড়িয়া বলির দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া না গেলে ত' পূজা সার্থক হয় না! দাম্পত্য বন্ধনের উপর যে চরম প্রহরণ উদ্যত হইয়াছে সে তার চোখের সম্মুখেই নামিয়া আসুক—চিরদিনের মত সূত্রটিকে ছিন্ন করিয়া দিক—যূপের চরণমূলে প্রণত হইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিবে। মুখে বলিল,—আমার আপনারাই ত' আপন।

—এই কথা! কিন্তু আমরা ত' বলছিনে যে চিরদিন তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে। চুকে যাক ব্যাপারটা, তার পর এসো।

—বেরিয়ে আর আমি ঢুকতে পারব না। আমায় থাকতে দিন, বাবা, আপনার পায়ে ধরি।

বৌমার সঙ্গে ইতিপূর্বে ব্রজকিশোরের দু' চারিটি অবান্তর কথা হইয়াছে মাত্র—অতিশয় সাধারণ হাঁ, না, আছে, নেই ; কিন্তু আজ একসঙ্গে এতগুলি কথা তার সঙ্গে কহিয়া ব্রজকিশোরের তাক লাগিয়া গেল। মৃণালের মত দেখিতে, কিন্তু হরধনুর মত দৃঢ়, কিছুতেই নোয়ানো যায় না—বিছুমাত্র প্রগলভতা প্রকাশ না করিয়া নিজের আসনে, সে অটল হইয়া বসিয়া আছে !

বলিলেন,—থাকতে না হয় দিলাম। কিন্তু লোকের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াই কি ক'রে ?

জ্যোতি বলিল, চক্ষুলজ্জা আছে সত্যি, কিন্তু সেটা কি আমি এখানে না থাকলেই সম্পূর্ণ যাবে ?

ব্রজকিশোর নিরুত্তর হইয়া রহিলেন

## বারো

উনিশে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।...অশোক বাড়ীতে ছিল না, মামার বাড়ী পালাইয়াছিল। আঠারই সন্ধ্যার সময় সে আসিয়া হাজির হইল। অশোকের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল—যেন বহিতেও পারে না, সহিতেও পারে না। সেই ক্লেশটা সহ্য করিতে না পারিয়া সে ঘটনার গতির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই জ্যোতির সঙ্গে তার চোখোচোখি হইয়া গেল, অশোক চোখ নামাইল ; জ্যোতি হাসিল, সকৌতুকে। মাতুলালয়ে কিছুদিন অবস্থান করিয়া নির্বিরোধ আবহাওয়ায় অশোকের মন দ্বিধা ও গ্লানি-মুক্ত হইয়া গিয়াছে। যে স্ত্রী তাহাকে চাহে না এবং সে-কথা স্পষ্ট বলে, তাহার "পশ্চাতে তপ্ত আঁখিজল" লইয়া ফিরিতে হইবে, অশোকের পৌরুষ ইহা অনুমোদন করে না। সে যদি অপরাধ করিয়াই থাকে, তবে তাহাকেই পর্বতের গুরুত্ব আর কাঠিন্য দিয়া তার উপর কপাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া যে আত্মঘাতিনী হইতে চায়, আত্মঘাত তার দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্টলিপি। এখনও জবরদস্তি চাপিয়া বসিয়া আছে বটে, কিন্তু অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে কতক্ষণ ! শেষ পর্যন্ত আপনিই পলাইবে। যে নিজের কষ্ট নিজেই ডাকিয়া আনে তাহাকে সুখী রাখিবে এমন গুণী ভূ-ভারতে নাই। ভগবানের দরবারে নৈতিক দায়িত্বের জবাব দিবার যদি আবশ্যক হয় তবে সে জবাব তার আছে ; সে ত' ভালবাসিতেই গিয়াছিল। তারপর, লোকে কি বলে না বলে তাহা সে গ্রাহ্য করে না। অশোক তাই এখন বনের পাখীটির মত মুক্ত আর সুখী।

•

বর যাত্রা করিয়া গেছে।

এ বিবাহে মধুখুড়ো কর্তা ; তিনি হাঁকডাক করিয়া বেড়াইতেছেন—পাঞ্চজন্য তাঁরই হাতে, ব্রজকিশোর নামে মাত্র রথী। খরচের ফর্দ, নিমন্ত্রিতের তালিকা মধুখুড়োই প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; ব্রজকিশোর সুশিষ্ট শিষ্যের মত নিঃশব্দে তাঁর সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

বরের যাত্রাকালে জ্যোতি মাটির কোঠার উপরে ছিল ; তাহাকে কেহ ডাকে নাই, ডাকিতে পারে নাই। বাজনা বাজাইয়া বর চলিয়া যাইতেই জ্যোতি নামিয়া আসিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যাহার উপমা মেলে না। যেন তার দশখানা হাত বাহির হইয়াছে, রত্নময়ীর সাহায্যার্থে আসিয়া এমনি আশ্চর্য তৎপরতার সহিত সে অভ্যাগত

আগন্তুককে বসাইতে লাগিল, খাওয়াইতে লাগিল, গুয়া পান দিয়া বিদায় করিতে লাগিল—কোথাও বাধিল না, কোথাও ভুল হইল না।

সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া রত্নময়ী ভুলিয়া গেলেন, অশোকের এই দ্বিতীয়বার বিবাহে তাঁর নিজের লিপ্ততা কতখানি, আর একবিন্দু অশ্রুমোচন করিলেন। এই অসময়ে তাঁর মনে হইতে লাগিল, এখনো যদি ছেলেকে কেউ ফিরাইয়া আনে!...এই আমার লক্ষ্মী—ইহার নিঃশ্বাস পড়িলে সংসারের নিস্তার থাকিবে না।...কিন্তু কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া বুক-ফাটা যন্ত্রণার কথাটা তিনি বলিতে পারিলেন না।

অপ্রীতিকর হইবে মনে করিয়া তাঁহাকেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাত্রে শুইয়া রত্নময়ী বলিলেন,—তুই এমনটা কেন করলি, মা? তোকে আমি বুঝতে পারলাম না।

জ্যোতির কিন্তু মনেও পড়িল না, সে একা এ-কাজ করে নাই; বলিল,—তোমার পায়ে একটু তেল বুলিয়ে দেবো, মা? সারাদিন ঘুরেছ।

—না, মা, কাজ নেই। তুই আগে বল্—কেন তুই এমনটি হ'তে দিলি?

—সে-কথা আমি তোমায় বলতে পারব না, মা, আমি খারাপ কিছু করিনি। পরে দেখবে, ভালই হয়েছে। তখন তুমিই আমায় আশীর্বাদ করবে।

এই বীভৎস কথা শুনিয়া রত্নময়ীর বুকের ভিতর মুচড়াইতে লাগিল; বলিলেন,—তোর সংগে আমি পারব না। আমার মাথায় বাড়ি মেরে মরতে ইচ্ছে করছে।—বলিয়া তিনি চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিলেন।

জ্যোতি হাসিতে লাগিল। বলিল,—এখন ঘুমোও। আমি ততক্ষণ তোমার পায়ে একটু তেল দিয়ে দি'।

## ॥ তেরো ॥

মধুখুড়োর বিশ্বাস, তিনি মাথায় চাদর জড়াইয়াছেন বলিয়াই বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁর প্রাপ্য কৌলিন্য মর্যাদা গ্রহণই করিলেন না; নগদ পাঁচটি টাকা দাঁতে জিব কাটিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন।

মধুখুড়োকেই পুরোভাগে লইয়া অশোক নবপরিণীতা পত্নীসহ দেশে আসিয়া পৌঁছিল। দিবাভাগে নাকি বধূকে শ্বশুরালয়ে প্রথম পদার্পণ করিতে নাই, এবং শাশুড়ীকে দেখা দিতে নাই; কিন্তু প্রতিবেশীর গৃহ হইতেই নূতন বউয়ের রূপের খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছুটিবার পথে রত্নময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিল।

নন্দরাণী বাস্তবিকই সুন্দরী। পা হইতে মাথা পর্যন্ত কোনো অংগে তার খুঁত নাই। তার পায়ের আঙুলগুলিই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

জ্যোতি প্রকাশ্যেই ছিল; কেবল তাহারই কানে পৌঁছিয়া রূপের খ্যাতিটা সাড়া না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। রত্নময়ী জ্যোতির দিকে একটিবার মাত্র চাহিয়া দেখিলেন, যে উদ্দেশ্য লইয়া তাহার দিকে আর কোনদিন চাহেন নাই। তাঁর মনে মনে অতর্কিতে একটা অনুভূতি বহিয়া গেল—দ্বিতীয়ার পাশে প্রথমা একেবারে ম্লান হইয়া গেছে...লোকসান বিশেষ হয় নাই। অথচ, যে কেউ বড় বউয়ের কথা ভুলিয়া দু'কথা বলিতে আসিল, রত্নময়ী তাহাকেই চুপি চুপি বলিলেন,—চুপ।—আর সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যেন বড় বউয়ের কানে গেলে আর রক্ষা থাকিবে না।

সন্ধ্যার পর নূতন বউ এ বাড়ীতে আসিবে।

জ্যোতি গিয়া উপরে লুকাইয়াছে, মানুষের সম্মুখে তার বাহির হইবার সার্থকতা নাই, আর বাহির না হইবার প্রতিশ্রুতি সে দিয়াই রাখিয়াছে। বউ পরের বাড়িতে প্রবাস সারিয়া এই বাড়ীতে আসিল ··বৌ-পরিচয় আর বধূবরণের উল্লাস-শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল —কিন্তু তাহার একটি বর্ণরেশও জ্যোতির কানে গেল না—তার সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া আনন্দ জাগিয়াছে—দীর্ঘ তপস্যার পর সজ্ঞান মোক্ষ নিকটবর্তী।

যুগপৎ মহাজন, গ্রাম্যনেতা এবং ব্যাঘ্রতুল্য ন'কড়ি ঘোষ স্বয়ং ভোজের আসরে উপস্থিত আছেন– ব্রজকিশোরের অনুরোধ ছিল তাই। "বাবু" উপস্থিত থাকিলে অপ্রিয় কোনো আলোচনা উঠিতে পারিবে না। ভাল মন্দ দ্বিবিধ লোক আছেই, ভালর মধ্যেও আবার এমন লোক আছে যারা 'ঠোঁটকাটা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাজেই ন'কড়ি ঘোষ হুঁকাহস্তে পুলিশ ডিউটি করিতেছেন। ··ওপাড়ার অচ্যুত সান্যাল মহাশয় একবার বলিয়া উঠিয়াছিলেন, —ব্রজকিশোর একই কারণে দু'বার খাওয়ালে; পদ্ধতিটা সবাই গ্রহণ করলে—

বলিতে বলিতে শুনিতে পাইলেন, পার্শ্ববর্তী রাধিকা ঘোষাল 'উঁহু' বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, এবং মুখ তুলিয়াই সান্যাল দেখিতে পাইলেন, ন'কড়ি ঘোষ হুঁকার ওপার হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন।

—ঘোষ মহাশয়কে একটু দুর্বল দেখছি।—বলিয়া অচ্যুত সান্যাল মুখ নামাইয়া শুচির ডেলাটা তাড়াতাড়ি মুখ-গহ্বরে প্রেরণ করিলেন।

ভোক্তাগণের নতমুখের উপর দিয়া একটা হাস্যচ্ছটা খেলিয়া গেল, কিন্তু ঘোষ মহাশয় তাঁর দৌর্বল্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার কোনো প্রত্যুত্তর না করিয়া অন্যদিকে চোখ ফিরাইলেন, এবং ইহার পর চর্বণের আওয়াজ ছাড়া অপর কোন 'অপ্রিয়' আওয়াজ শোনা গেল না।

## ॥ চৌদ্দ ॥

নন্দরাণী জাঁকাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে পাড়ার চার-পাঁচটি মেয়ে, তাদের বউ দেখা আর ফুরায় না। কাহার সঙ্গে ক'টি কথা নূতন বউ কহিয়াছে মনে মনে তাহারা তার হিসাব রাখিতেছে; পরে তাহা লইয়া নিদারুণ ভাব-আড়ি চলিবে।

জ্যোতির কথা তারা সবাই মিলিয়া বলিয়াছে; শুনিতে শুনিতে কৌতূহল অদম্য হইয়া তাহাদেরই একজনকে নন্দরাণী বলিল,—বড়বৌকে একটি বার ডেকে দিতে পারো, ভাই?

'ভাই'টি বলিল,—আমি তোমার ভাই হই নে, ভাসুর-ঝি হই: তুমি আমার খুড়িমা। নয়, ভাই আশা?

আশা মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—কি জানি, কে কার কি হও তা আমি জানিনে।

—বুঝলে খুড়িমা, আমায় তুমি বড়বৌকে ডাকতে বলছ, ওকে বলোনি, তাইতে ও রাগ করেছে। বাইরে গিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

আশা বলিল,—হ্যাঁ, করবে।

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল,—তা হ'লে তোমরা দু'জনাই যাও।

—আয়, আশা।—বলিয়া সে মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল: কিন্তু আশা উচ্ছিষ্ট অনুগ্রহ স্পর্শও করিল না।

বাপের বাড়ীর লোকে কথাবার্তায় সতীন সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিলেও, নন্দরাণী শুনিয়াছে যে, বড় বউ এখানেই আছে ; তাহাকে দেখিতে নন্দর বড় ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু বড় বৌ কি মনে করিবে এই দ্বিধায় সে এ পর্যন্ত ইচ্ছাটা প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই মেয়েগুলি জড় হইয়া তাহাকে যাহা শুনাইয়াছে তাহাতেও জ্যোতির প্রতি তার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং সে-ই আগ্রহ করিয়া এই বিবাহ দেওয়াইয়াছে শুনিয়া মানুষটিকে দেখিবার কৌতূহল তার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কেন দেওয়াইয়াছে তাহা অবশ্য সে জানে না। কিন্তু সে কথা এখনই বিবেচ্য নহে ; ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকিলেই পরে অবশ্য প্রকাশ পাইবে।

যে মেয়েটি বড় বউকে ডাকিতে গিয়াছিল সে আসিয়া খবর দিলো, আসছে!

শুনিয়াই নন্দরাণীর বুক কাঁপিতে লাগিল ; মনে হইল, সতীন! কোন্ মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে তার কিছুই ঠিক নাই...আসিয়াই যদি চুল ধরিয়া বসে! নন্দরাণী ঘন-ঘন দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।

কিন্তু জ্যোতি আসিয়া দাঁড়াইল হাস্যময়ী মূর্তিতে। নন্দরাণী চাহিয়া দেখিল, সতীনের হাতে শঙ্খ আছে, খাঁড়া নাই।

নন্দর কাছে বসিয়া পড়িয়া তার ডান হাতখানা হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া জ্যোতি বলিল,—কাজে ছিলাম ভাই, আসতে পারিনি। এসো, ব'সে গল্প করি।

নন্দ জ্যোতির পায়ের ধূলা নিলো। বলিল,—আমার ওপর তুমি রাগ করেছ দিদি?

—রাগ? তোমার ওপর আমার রাগ কেন হবে? আমিই ত' তোমায় এনেছি।

—তা শুনেছি।

—তবে? সতীনের উপর সতীনের রাগ যা নিয়ে, তার ওপর আমার লোভ নেই। —বলিয়া জ্যোতি হাসিল। এই হাসিটি জ্যোতির নিজস্ব। তার মনের যেমন কূল নাই, তেমনি এই হাসিটি তার অন্তহীন অনধিগম্য হইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়—ইহার প্রত্যুত্তর নাই, ব্যাখ্যা নাই ; যেন নতমস্তকে ইহার কাছে পরাজয় মানিতে হয় ; ঐ স্বচ্ছ হাসিটি না-জানায় দুঃসহ ভয় জাগায়। নন্দরাণীর মনে হইতে লাগিল : এখন গেলে বাঁচি। সতীনকে দেখার প্রয়োজন তার ফুরাইয়াছে।

জ্যোতির হাসির দিকে চাহিয়া নন্দ বলিল,—হাসছ কেন?

এবং স্পষ্টই বোঝা গেল, সে অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

জ্যোতি বলিল,—স্বামী তোমার, আমার নয়, তাই হাসলাম।

কিন্তু এটা যে কোন্ কারণে হাসির কথা হইতে পারে ইহা বুঝিতে না পারিয়া নন্দরাণী অবাক হইয়া রহিল ; তার ভয় করিতে লাগিল।

—বিশ্বাস হচ্ছে না'?—বলিয়া জ্যোতি উঠিয়া পড়িল। নন্দ ভাবিল, পাগল নাকি!

অশোকের মন রূপসাগরে ডুবিয়া গেছে। এ জ্ঞানটাই যেন তার নাই যে সে এই মাটিরই মানুষ···বিমানে সে বিহার করিতেছে ; পৃথিবীর কলরব উৎকণ্ঠা স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্যহানিকর বিষয়বস্তু তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না ; ল-বুক এবং প্রথমা স্ত্রী বলিয়া চিন্তার বিষয় বিধাতার সৃষ্টিতে যেন নাই।

জ্যোতি তাহাকে লুকাইয়া আড়াল হইতে দেখে। দেখে, স্বামীর চেহারাই বদলাইয়া গেছে, রং আরো উজ্জ্বল হইয়াছে, চোখে কণ্ঠে ললাটে অধরে পুলক যেন প্রাণ পাইয়া

বাঁচিতেছে। দেখিয়া সে তৃপ্ত হয়···বিধাতা তাহাকে ছুটি দিয়াছেন...স্বামী তাঁহার ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াছেন।

* * *

—মা, আমি যাবো।

—কোথায় ?

—বাপের বাড়ী।—বলিয়া জ্যোতি রত্নময়ীর বিব্রত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বর্তমান ব্যবস্থায় সংসার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে।

ব্রজকিশোর ন'কড়ি ঘোষের সেরেস্তায়, অশোক স্ত্রীকে লইয়া এবং রত্নময়ী বড়-বউ আর গৃহস্থালী লইয়া মগ্ন হইয়া আছেন। মাঝখান হইতে বড় বউ সরিয়া গেলেই সংসার এক-পায়া-ভাঙা চৌকির দশা প্রাপ্ত হইবে; একদিকে কাৎ হইয়া পড়িবে; তাহাকে খাড়া রাখিতে ডাকিতে হইবে ছোট বউকে।···রত্নময়ীর বাতের কনকনানিটা আবার জানাইতেছে—সঙ্গে একটি লোক তাঁর চাই-ই।···রত্নময়ীর ভয় হইল, বড় বউয়ের যাওয়া হইতেই আবার নূতন একটা সংঘর্ষের উৎপত্তি না হয়। ছেলে বউকে লইয়া যেমন উন্মত্ত হইয়া আছে তাহাতে বৌকে সংসারের কাজে অষ্টপ্রহর আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ছেলে যদি সহ্য না করে! হয়তো এমন কিছু বলিয়া বসিবে যাহা অপমানজনক না হোক, মায়ের পক্ষে ঘৃণাজনক হইবেই।·· এক মুহূর্তে এতগুলি স্বার্থচিন্তা করিয়া লইয়া রত্নময়ী বলিলেন, —আর কিছুদিন থেকে যা, মা, আমার বাতের ব্যথাটা আবার বাড়ছে।

জ্যোতি রত্নময়ীর মুখের দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রত্নময়ী তাহার করুণার উদ্রেক করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন; জ্যোতির দৃষ্টিতে এতটুকু প্রশ্রয়ের আভাস পর্যন্ত আছে বলিয়া তাঁর মনে হইল না। জ্যোতি বলিল,—আমার কাজ শেষ হয়েছে মা, আমি যাবোই।

বাতের ব্যথাটাকে এমন করিয়া অবজ্ঞা করায় রত্নময়ীর রাগ হইয়াছিল; বলিলেন,—কি কার্য করবার ছিল যে এতদিন ব'সে শেষ করলে ?

মুহূর্তেক নিঃশব্দ থাকিয়া জ্যোতি বলিল,—আমাকে যে তোমাদের আর কোনোদিন স্মরণ করতে না হয়, সেই বন্দোবস্তটা করবার ছিল, তা করেছি।

কেবল কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দের মত জ্যোতির কথাগুলি রত্নময়ীর কানে গেল; অর্থ কিছুই হৃদয়ংগম হইল না। বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে ডাকিবার দরকার হইবে না —সে দরকারটা কি!

কিন্তু ব্রজকিশোরের অমত হইল না। ন'কড়ি ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া বড় বউকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন। স্ত্রীকে ব্রজকিশোর বুঝাইলেন যে, বাতের অব্যর্থ তৈল আনিয়া দেওয়া হইবে, এবং "বাহিরের" সেই ঝিটকে ছাড়াইয়া "ঘরের" ঝি রাখিয়া দিলেই তেল মালিশ আর ঘরের কাজ দুইই সুসম্পন্ন হইতে থাকিবে। অযথা একটা অশান্তির শঙ্কা দিবারাত্র সহ্য করিয়া লাভ কি!···বড় বউ যাক। যদিও বিদায় দিতে কষ্ট হইতেছে, তবু উপায় নাই, ইত্যাদি।

জ্যোতি যাইবে। ঝি খুব কাঁদিতে লাগিল; দেখিয়া জ্যোতির চোখেও এক ঝলক জল আসিয়া পড়িল; বলিল,—আবার আসতেও পারি, ঠাকুরঝি।

ঝি তা বিশ্বাস করিল না, ঘাড় নাড়িতে লাগিল।···অত বড়লোকের মেয়ে, আর অতবড়

লোকের বৌ তাহাকে ঠাকুরঝি বলে—ঝিয়ের মায়ার কারণ তাই। আচম্‌কা ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম জ্যোতির পায়ের গোড়ায় রাখিয়া ঝি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার মেঘের রঙের মত রত্নময়ীর মনের পরিধি ও ভাব মুহুর্মুহুঃ বদলায়; জ্যোতির যাত্রাকালে তাঁর সর্বান্তঃকরণ অজ্ঞাত পীড়ায় টাটাইতে লাগিল...যাইতেছে ভালই হইতেছে, যাওয়ার ফল কল্যাণ, ইহা বুঝিয়াও রত্নময়ী অস্থির হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, —তোমাকে থাকতে বলার মুখ আমাদের নেই, বৌমা। আর কাউকে না পারো, আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো।

—সে কি কথা, মা। অমন কথা ব'লো না, আমার অকল্যাণ হবে যে! আমি ত' দুঃখ নিয়ে যাচ্ছিনে, হাসতে হাসতে যাচ্ছি।

কিন্তু রত্নময়ীর মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না—এ বিদায় যেন চির-বিদায়ের সামিল।

## ॥ পনেরো ॥

দরজার দিকে মুখ করিয়াই অশোক বসিয়াছিল; নন্দ তার অদূরে; স্বামী-স্ত্রীতে বোধ হয় হাসাহাসি চলিতেছিল। জ্যোতিকে দরজার সম্মুখে দেখিয়া অশোক হাসিতে হাসিতেই বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল,—অই! তুমি আছো এখানেই?

এই নির্মম প্রশ্নে যত বেদনা ছিল, জ্যোতির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিল। তার চোখের সম্মুখে একটি মুহূর্তের জন্য একটা কালো পর্দা দুলিয়া গেল; ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হইয়া একটা থরথর কাঁপুনি বহিয়া গেল।

পরক্ষণেই সে বলিল,—আছি ত' এখানেই, নন্দ জানে। তবে আজ যাবো।

অশোক বলিল,—নন্দর সংগে আলাপ হ'ল?

অশোক তার সংগে নন্দকে মিশিতে দেয় নাই, প্রশ্নের ভিতর সেই কৃতিত্বের আনন্দ ছিল; কিন্তু উত্তরের জন্য বিলম্ব করিতে তার কোথায় যেন বাধিল। বলিল,—কেমন থাকো, জানিও।

—জানাব বই কি। নন্দর কাছে চিঠি চিঠি লিখব। জবাব দিবি ত'?—বলিয়া জ্যোতি নন্দের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে হাত-পা আড়ষ্ট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে। জ্যোতি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—শুনতে পার্সনি? চিঠির জবাব দিবি ত'?

নন্দ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দেবো।

জ্যোতি প্রণাম করিতে গেলে অশোক লাফাইয়া উঠিল,—থাক, থাক।

—না, না, থাকবে কেন!

...আয়, আমায় তুলে দিবি।—বলিয়া নন্দর হাত ধরিয়া জ্যোতি যখন বাহিরে আসিল, তখন উঠানের এক কোণে দর্শকের ভিড় জমিয়া গেছে।

...জ্যোতি গাড়ীতে উঠিবার সময় রত্নময়ী কাঁদিতেছিলেন। 'এসো', কি 'থাকো', কি 'চিঠি লিখো', কি 'এসো আবার'—ইত্যাদি কোনো কথাই, কি একটা আশীর্বচনও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না; চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

নন্দ বলিল,—দিদি, এসো আবার।

জ্যোতির জবাব ছিল না, কিংবা অশোকের সেই হাসিটা শেষ মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বলিয়া সে কথার জবাব দিতে পারিল না তাহা জানা নাই।

দুলালের দোলা

উৎসর্গ :

শ্রীচারু গুপ্তা—

কল্যাণীয়াসু।

॥ ভূমিকা ॥

এই লেখাটির ভিতরকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা ভূমিকা-স্বরূপ বলিতে চাই। ইহাতে 'প্লট' নাই—আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র ; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই। "রোমন্থন" লেখাটিতে তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখানো হইয়াছে। ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক আর না-ই থাক, পল্লীর সংগে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।

বোলপুর,
১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

## ॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

পিসিমা অনেকেরই আছেন ; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া কোনো পিসিমাই বোধ করি এমন করিয়া কাঁদেন না। কিন্তু আমার পিসিমার আমাকে দেখিয়া পুলকাশ্রু মোচন করিবার কারণ আছে। পিসিমা আমাকে দেখিয়া কেন কাঁদিলেন তাহার হেতু নির্দেশ করিতে আমাদের পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাস একটু বলা দরকার।

বলা অবশ্য বাহুল্য যে, দেশের অধিকাংশ লোকের মত আমাদেরও নিবাস পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে বাস বলিয়াই আমরা নিতান্ত তারকাটা আর একঘেয়ে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি ইহা সত্য নহে।

আমরা মানে আমার ঠাকুর্দ্দার কথা বলিতেছি। শুনিয়াছি, তিনি সংগতিপন্ন এবং চলতি ভাষায় দুঁদে লোক ছিলেন। বাহিরের লোকে তাঁহাকে না চিনুক, দেশের লোকের সাধ্য ছিল না তাঁহাকে আভাসে-ইংগিতে অমান্য করে। দেশে তিনি ভালই ছিলেন—লোকের শ্রদ্ধা আর ক্ষেতের ফসল তিনি ষোল আনাই পাইতেন। কিন্তু তাঁর পুরোহিত-বংশ নির্বংশ হইয়া যাওয়ায় হঠাৎ পল্লীবাস তাঁর অসহ্য হইয়া উঠে! কথাটা শুনিতে আশ্চর্য বটে, কিন্তু কৌলিন্যসম্পন্ন সৎব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়াকলাপ সমাধা করাইতে না পারিলে গার্হস্থ্যজীবনের রহিল কি! বোধ হয়, ইহাই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

তার উপর আর একটা কারণ বড় উৎকট হইয়া দেখা দিলো—গ্রামের সম্মুখ দিয়া যে ক্ষুদ্র নদীটি বহিত, মাতৃনদীর মুখে বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা জমিয়া তাহা মরিয়া আসিল। স্রোতের জলে স্নান করিয়া, স্রোতের জল পান করিয়া এবং স্রোতের জলে তর্পণের তিল ভাসাইয়া দিয়া যে তৃপ্তিলাভ হইত, স্রোতোহীন আবদ্ধ জলে দুর্গন্ধ আর ময়লা জমিয়া সে তৃপ্তি অপ্রাপ্য হইয়া গেল। মনে হয়, এ-ও একটা কারণ।

কিন্তু সেকেলে লোকের তুষ্টির আর সার্থকতার জ্ঞান সম্ভবতঃ, এখনকার সৌন্দর্য-বোধ এবং ভোজনোপকরণের মতই, বিভিন্ন ছিল। আজকাল সে রকম দেখা যায় না।

ভগবান এদিকে ঠাকুর্দ্দার গৃহ-নিষ্ঠার চাঞ্চল্য আর মনোকষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরদ্দার ইচ্ছা হইল, আমার অগ্রজকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিবেন—আনিয়া রাখিলেন—এবং কিছুদিন থাকিয়া পাঁচ দিনের জ্বরে সে মারা গেল।

ঠাকুদা বেহুঁস হইয়া উঠিলেন। পল্লীভবন পাকা করিবার জন্য ইঁট কাটানো হইয়াছিল—তাহা বিলাইয়া দিলেন—বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—আমিই আমার পৌত্রকে হত্যা করিয়াছি। তোমরা আমাকে হত্যা করো।

এই বহ্নিই তাঁহাকে শেষ করিয়া আনিল—অল্প দিন পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন—গ্রাম ত্যাগ করিয়া গংগাতীরে যাওয়া তাঁর হয় নাই।

পল্লীগৃহে অবশিষ্ট রহিলেন, বিধবা পিসিমা।

এ-সব ঘটিয়া গেছে আমার জন্মের পূর্বে।

আমরা অন্য কারণে বাধ্য হইয়া বহুদূরে বিদেশেই থাকি। ডাক্তারীর আয় কমিয়া খরচের ভয়ে, এবং অনুমান করি আলস্যবশতঃ, বাড়ীতে আসিবার কথা বাবা মুখেও আনেন না। থার্ড ক্লাশেরই গাড়ী ভাড়া জনপ্রতি সতেরো টাকা কয়েক আনা।

আসা-যাওয়া বন্ধই ছিল—

সুতরাং একেবারে এতবড় আমাকে দেখিয়া পিসিমা কাঁদিয়া ফেলিবেন ইহা বিচিত্র কি !

ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিবার পর পশ্চিমের গরম আর ধূলো ভাল লাগিল না।

এবং বাড়ীতে আসিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গাড়ীতে খোট্টাদের ঠেলাঠেলি, গরম, কুর্তার বোট্‌কা গন্ধ, নিজের ঘর্মাক্ত দেহ আর শ্বাসকষ্ট, কিছুই মনে রহিল না। ক্ষুধায় ক্লেশ পাইয়াছিলাম—তাহাও ভুলিয়া গেলাম। মাঝে মাঝে নিতান্ত অসহ্য হইয়া যে-কোনো ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল : এখন মনে হইল, ফিরিয়া যাই নাই ভালই করিয়াছি—সেটা চোরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার মত নির্বোধের কাজ হইত।

"অতগুলো টাকা কোথায় পাবো"—বলিয়া বাবা পুনঃ পুনঃ আপত্তি করিয়াছিলেন।

আমি একবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিলাম,—"বেশ, তবে যাবো না। মা, বাবাকে বলো, সে যাবে না।" এখন মনে হইল, ভাগ্যিস মা আমার কথা রাখেন নাই।

দেখিলাম, আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াই আমাদের বাড়ীর সীমানা পার হইয়া নদীর তীর পর্যন্ত, নদী পার হইয়া একটি খর্জুর-কুঞ্জের পাশ দিয়া সমতল ক্ষেত্রের যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে বনানী-শ্রেণী নয়নের পল্লবপ্রান্তে কজ্জলরেখার মত কালো আর নিবিড়। মাঝে মাঝে কর্ষিত ভূমি। স্থানে স্থানে হরিৎ আভা কেবল দেখা দিয়াছে।

অন্তর্বত্নী সীতাসহ উদ্‌ঘাতিনী ভূমির উপর দিয়া রথচালনা করিতে শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—শ্রান্ত অলসদেহের কষ্ট হইবে।

কিন্তু সম্মুখে এই কর্ষিত কর্কশ ভূমি দেখিয়া আমার মনে হইল, জনক-তনয়ার মতই মাতা বসুন্ধরা প্রসব-সম্ভাবনায় হর্ষে পুলকে স্থির হইয়া রহিয়াছেন।

তৃণাঙ্কুরদাম তাঁহারই কম্র-অঙ্গে রোমাঞ্চবর্ষণ !

সে যাহাই হউক, পিসিমা বাড়ীখানাকে—তার উঠান, ঘরের দাওয়া, ঘরের মেঝে ঘরের চাল চমৎকার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন দেখিলাম।

দেখিয়াই মনে হইল, আমার নিজের শরীরের কোথাও যেন ময়লা নাই !

ঢেঁকির ললাটে সিঁদুর মাখানো। ঢেঁকি যে খুঁটি দু'টির উপর বুক দিয়া পড়িয়া আছে তাহা অমর জিউলী গাছের : খুঁটির গা দিয়া শাখা বাহির হইয়া ঢেঁকির পৃষ্ঠ পল্লবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সামান্য কুলা আর ধামার অঙ্গে লক্ষ্মীর পদচিহ্নের আলপনা—কবে অঙ্কিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহার মোচনাবশিষ্ট অস্পষ্ট রেখা কয়টির উপরেই যেন একটা স্বচ্ছল প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে।

আরো একটা উপভোগ্য আনন্দ সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল। "সময় গেল, ছোট্‌ ছোট্‌"—বলিয়া অবিরাম তাগিদ দিবার কেহ এখানে নাই।—মনে হইল, বিলম্বে এখানে কাজ পণ্ড হয় না।—সম্মুখে পাথরে বাঁধানো রাজপথ নাই ; অসংখ্য লোক এখানে অসংখ্য কারণে, ক্ষতির ভয়ে অন্ধ হইয়া অসংখ্য দিকে প্রাণপণে ছুটিতেছে না।

যে-দেশ হইতে আসিয়াছি, সেটা রাজধানী তুল্য একটা বৃহৎ স্থান—বিপুলতা, স্ফীতি আর প্রবাহ তার সম্পদ না হোক, আকর্ষণ বটে—তার গতি যেন মন্থরতাকে চাবুক মারে—চল্‌, চল্‌ ! মনে একটা প্রদাহ জন্মে যেন—

কিন্তু এখানে দু'ধারে ঘাসের স্তর—মাঝখানে সরু একটি পথের রেখা—শুষ্ক পল্লবে

আচ্ছন্ন ; রৌদ্রে উত্তপ্ত সে কখনই হয় না—মানুষের পায়ের উত্তাপ কখন আসে, কখন আসে না—স্পর্শ করিয়াই সরিয়া যায়। এখানে গড়িবার কিছু নাই। সমাপ্ত মূর্তির দিকে কেবল চাহিয়া থাকা।

পরের কথা আগে কিছু বলা হইয়া গেল।

আমাকে দেখিয়া পিসিমা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ; এবং তাঁহার কান্না যে অকারণ নহে তাহাও বলিয়াছি।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুশলবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন এবং উত্তর বিনিময়ের পর পিসিমা পিঁড়ি পাতিয়া আমাকে বসিতে দিলেন ; প্রকাণ্ড পিঁড়িখানা টানিয়া নড়াইতে তাঁর কষ্ট হইল দেখিলাম। আমি বসিলে পিসিমা বলিলেন,—তোর ঠাকুদ্দার এই পিঁড়ি ; তিনি এই পিঁড়িতে বসতে ভালবাসতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তিনি খুব ভারি লোক ছিলেন, নয় পিসিমা ?

—হ্যাঁ, তেমন পুরুষ আজকাল দেখা যায় না। পিঁড়ি দেখেই তুই অবাক হ'য়ে গেছিস ; তাঁর দুধ খাবার খাগড়াই বাটিটা দেখলে তুই তাঁকে কি ভাববি কে জানে !

—তার মানে ?

—সেই বাটির দু'বাটি দুধ তিনি দু'বেলা খেতেন ; এখন দরকার হ'লে চার-ছ'জনের খাবার ডাল রেঁধে তাতে ঢালি—তা-ও ভরে না।

বলিতে বলিতে পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া গেলেন—এবং খাবার আনিয়া আমার সম্মুখে দিলেন। দেখিলাম, প্রচুর আয়োজন—মুড়কি এবং চিড়ে আর দই। দইটুকুই বড় লোভনীয় মনে হইল—পাথরের কালো বাটিতে জমিয়া আছে, উপরে লালচে রঙের সর ; সর ভাঙিতে যেন মন ওঠে না। তা ছাড়া নারিকেলের মিষ্টান্ন। ছাঁচে ফেলিয়া একই জিনিষের বিবিধ আকার দেওয়া হইয়াছে—কোনোটা পানের মত, কোনোটা চিড়িতনের টেক্কার মত, কোনোটা সমচতুর্ভুজ—তাতে লেখা "দীর্ঘজীবী হও"।

আশীর্বাদকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে ভাবিয়া হাসিয়া বলিলাম,—পিসিমা, দীর্ঘ-জীবন যদি হজম ক'রে ফেলি তবে আশীর্বাদ যে মিথ্যে হ'য়ে যাবে !

পিসিমা বলিলেন,—দূরে পাগল !—বলিয়া কাছেই বসিলেন।

আমি বলিলাম,—এত খাবার তুমি করেছ ! সংগ্রহ করলে কেমন ক'রে !

শুনিয়া পিসিমা পুনশ্চ অশ্রুমোচন করিলেন ; বলিলেন,—তোদের জিনিষই তোদের খাওয়াচ্ছি। আমার কেবল মেহনৎ।

আমি একটু দুঃখিত হইয়া গেলাম—কিন্তু সেটা বোধ হয় বুঝিবার ভুলে।

আমাদের জিনিষই অর্থাৎ আমাদেরই বৃক্ষ এবং ক্ষেত্রজাত ফল শস্যই তিনি খাদ্যাকারে প্রস্তুত করিয়া আমাকে ভোজন করিতে দিয়াছেন—তাহাতে আক্ষেপের দুইটি কারণ থাকিতে পারে। এক এই যে—আমাদের পূর্বপুরুষের রোপিত বৃক্ষের এবং অর্জিত ক্ষেত্রের ফলমূল আমরা বারো মাসই খাইতেছি না, কোন্ দিল্লী—দূরে প্রবাসে পড়িয়া আছি।

অথবা এ জিনিষ আমাদেরই, তাঁর নয় ; সামগ্রী, সম্পত্তি, সংসর্গ যা মানুষের বাঞ্ছনীয় আর উপভোগ্য, সবই তিনি নবম বৎসরে বৈধব্য লাভের সংগে সংগেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—তাঁর বলিতে কিছুই নাই।

পিসিমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি। মধ্যবর্তী ছাপান্ন বৎসর তিনি ঐ পরম দুঃখটিই ক্রমান্বয়ে বহন করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে আমার বিস্ময়ই জন্মিল।

যে ধানের ভাত খাইয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন, তাহা তাঁহার নয়, ইহা সত্য—সে দুঃখ নিশ্চয়ই তিনি সংগে করিয়া আনেন নাই ; তবু আজও তাঁর সেই গৃহই আপন গৃহ, এ গৃহ পরের—সেই গৃহেরই দিকে চাহিয়া তাঁর আত্মা কেবলই নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, ইহা মনে করিয়া আমার কষ্টও হইল, বলিলাম,—পিসিমা, তুমি ত' বাবার মায়ের পেটের বোন—

পিসিমা বুদ্ধিমতী বটে ; আমার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরেই বোধ করি আমার মনের ভাব অনুমান করিয়া লইলেন ; বলিলেন,—আমি ত' তা বলিনি রে ! আমার ত' তোরাই সব ; তোরা খেলিনে কোনোদিন তা-ই বলছি ।—বলিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন ; তাঁর কথা ভুল বুঝিয়াছি ইহা যেন তাঁহারই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব !

ততক্ষণে দইয়ের ভিতর চিড়ে আর মুড়কি দিয়া ভোজন-ব্যাপার অনেকটা অগ্রসর করিয়া আনিয়াছি । বলিলাম,—এমন মিষ্টি লাগছে, পিসিমা, তা আর কি বলব তোমাকে !

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—সে-ই আপশোষই ত' আমার দিনরাত ; এমন মিষ্টি জিনিষ তোরা খেলিনে—তোর বাবা, মা, ভাইয়েরা কেউ খেলে না । এমন জিনিষ নয় যে ডাকে পাঠিয়ে দেবো ; কাছে-কিনারায় নয় যে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো । কেবল আমার আর চোরের ভোগে লাগছে ।—বলিয়া পিসিমা কলরব করিয়া হাসিতে লাগিলেন—অর্থাৎ আবার যেন ভুল বুঝিসনে তুই ।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোরা সেখানে কি খাস ?

এই প্রশ্নে আমি লজ্জিতমুখে একটু হাসিলাম ।

ঘৃতপক্ব দ্রব্যের আর মর্যাদা নাই ; চতুষ্পদ জন্তু আর সরীসৃপ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়, এ-সংবাদ জানাজানি হইয়া গেছে ; এবং মুড়ির চেয়ে বিস্কুট নিকৃষ্ট, তাহাও অপ্রকাশ নাই । ঘৃণার সংগেই ঘিয়ে ভাজা খাবার খাই ।

বলিলাম,—সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না, পিসিমা ; সে অখাদ্য । অখাদ্য খেয়ে খেয়ে বাবার ত' বদহজমের অসুখই ধ'রে গেছে—রোজই তাঁর অম্বল হয় আর সোডা খান ।

পিসিমা বলিলেন,—এত শাস্তি তোদের ! একখানা চিঠি লিখে দে তোর বাবার কাছে ; তারা এসে থেকে যাক এখানে দিনকতক । এখানকার জল-হাওয়া ভাল ।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা ।

খাওয়া শেষ করিলাম । পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—পেট ভরেছে ত' রে ?

—খুব ।—বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম ।

বেলা তখন ন'টা ।

ভাবিলাম, একবার বাহিরের দিকটা দেখিয়া আসা যাক । আমাদের বাড়ীর বাহিরেই আমাদের নিজস্ব জমির উপর দিয়া একটা পা-পথ চলিয়া গেছে দক্ষিণ দিকে—তার দু পাশেই জংগল । তবু সে পথটিই ধরিলাম ।

পথের দু' ধারে জংগল ; নাম জানি না এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গাছ অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জন্মিয়াছে—কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে দেখিবার যে বস্তু আছে দেখিলাম তাহা বৃক্ষের শোভা নহে, রৌদ্রের শোভা । থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম ।

পূর্বদিকে সূর্য অনেকটা উঠিয়া আসিয়াছে, এবং সেই পল্লবারণ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে । রৌদ্রে আর ছায়ার অমন সমাবেশ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না—ছায়া

রৌদ্র ক্ষেত্র রচনা করে নাই, একটি সন্ধিস্থলে তাহারা সম্মিলিত হয় নাই—কালো জমির উপর কে যেন রোদে ফুল কাটিয়াছে। দু'টি দশটি পাতার এক পিঠে, একটি শাখার উপর, মাটিতে ঝরা পাতার উপর অসংখ্য স্থানে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—তার পাশেই উপরে-নীচে, ডাইনে-বামে, সমস্তটাই ছায়াময়—কোন্ পথে অবতরণ করিয়া রৌদ্র ঐটুকু স্থানগুলি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এম্‌নি সর্বত্র।

সে রৌদ্র আবার চঞ্চল—বাতাসে পাতা দোল খাইতেছে; মনে হয়, পাতার গায়ের আলো বুঝি খসিয়া পড়িবে! চঞ্চল-আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে—এবং এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখীর দিবা-বন্দনা তখনও শেষ হয় নাই; দিনোদয়ের পুলকে পাখী তখনও মুক্তকণ্ঠ!

খানিক দাঁড়াইয়া দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এই পথটা যে পথের সহিত মিলিত হইয়াছে সেটা প্রশস্ত—দু'খানা গো-যান পাশাপাশি যাইতে পারে। কিন্তু এ-পথেও লোক-চলাচল নাই দেখিলাম। দক্ষিণে মোড় ঘুরিয়া রাস্তাটা যেখানে অদৃশ্য হইয়াছে, সেইদিকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা গেল; কিন্তু কণ্ঠস্বর যাহারই হোক সে দেখা দিলো না।

কিছুদূরে একটা গাভী লম্বা দড়ি দিয়া খুঁটার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে—গাভীটা মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছুই করিতেছে না। যাইয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলাম।

গাভীটিকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার আনন্দ জন্মিল; দেখিয়াই মনে হইল, সে সুলক্ষণা এবং সযত্নপালিতা; কৃশতা তার কোথাও নাই—সুডৌল দেহ, সুকৃষ্ণ রোমাবলী মসৃণ।

আর মনে হইল, বিশাল চক্ষু স্থির করিয়া সে যেন আমারই দিকে চাহিয়া আছে গাভীর সঙ্গে যে মানুষের বন্ধুত্ব ঘটিতে পারে তাহা জানিতাম না; কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যে একটা রস আমার প্রাণে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল, তাহাকে প্রীতিরস বলা যাইতে পারে।

হঠাৎ একটা লালসা জন্মিল—তাহারই বশে ধীরে ধীরে গাভীটির পৃষ্ঠের উপর করতল স্থাপিত করিতেই স্পৃষ্টস্থান থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—হাত টানিয়া লইলাম; কিন্তু তাহার গায়ের গরমটা কি আরামপ্রদ! হাতের সঙ্গে সে উত্তাপ উঠিয়া আসিয়া লাগিয়া রহিল।

আবার তার পিঠের উপর হাত রাখিলাম; হাতের ত্বকে শিরায় অনুভূত হইল, চোখেও দেখিলাম, একটা প্রবল কম্পন তরঙ্গিত হইয়া মিলাইয়া গেল।

একটা ম্যাছি আসিয়া বসিল; মাছিটাকে আমি তাড়াইয়া দিলাম।

এবং কি ভাবিতেছিলাম জানি না, সহসা চম্‌কিয়া উঠিয়া শুনিলাম, এক ব্যক্তি আমারই পশ্চাদ্দিক হইতে বলিতেছে,—রোজ ছ'সের ক'রে দুধ দেয়, বাবু; গরু আমার।

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, গরুর স্বত্বাধিকারী আমার দিকে চাহিয়া নাই—পুলকিত-নেত্রে গরুর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। বলিলাম,—তোমার গরু! বেশ গরুটি!

—আমার নাম আরজান সেখ।—সেলাম।

—সেলাম।

—ভাল ব'লেই ত' বিপদ, বাবু! গরু-চোর ব্যাটারা ছোঁ পেতে আছে চারদিকে—একটু চোখ ফিরিয়েছি কি গরু নিয়ে লম্বা। পাঁচ বার একে চোরের কাছ থেকে কেড়ে এনেছি।—বলিয়া হৃতনিধি পুনঃপ্রাপ্তির আনন্দে সে পুনরায় বিগলিত হইয়া গেল।

আমি বলিলাম,—বটে !

—খদ্দেরও না আসে এমন নয়। বেচব না জানে, তবু এসে দর করবে, দু'শো দেড়শো হাঁকবে। টাকার আমার এমন আকাল পড়ে নাই যে লক্ষ্মী বেচতে যাব ! তা কি পারা যায় বাবু ?

সংবাদপত্রের মারফত অহিন্দুর দেব-দেবী-বিদ্বেষের কথা অবগত ছিলাম ; ইতস্ততঃ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—লক্ষ্মী ত' হিঁদুর দেবতা। তোমরা মানো ?

আরজান বলিল,—পুজো-আচ্চা করিনে, তবে হ্যাঁ, মানি বই কি ! আপনাদের মুখে শুনতে শুনতে মনে এসে গেছে, যিনি দেন তিনিই লক্ষ্মী। মা ব'লে ডাকিনে আপনাদের মত ; তবে হ্যাঁ, মুখে নামটা বলি।

অতঃপর লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা মনে আসিল ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—গরুর পেছনে তোমার দৈনিক খরচ কত ?

—খরচ আর কই ! ক্ষেতের খড়েই ওর একটা পেট চ'লে যায়। তবে হ্যাঁ—

বলিয়া আরজান গরুর পিঠে পেটে হাত বুলানো থামাইয়া বলিল,—খরচ হয় যেবার ক্ষেতের খড় যোল আনা পাইনে। কিন্তু খরচের হিসেব বড় রাখিনে—গিরিরাণীর পেট ভরলেই আমি তুষ্ট !

শুনিয়া আমার খুব বিস্ময় লাগিল। এ-ব্যক্তি স্বার্থচিন্তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল স্নেহপরবশ হইয়াই তাহার গিরিরাণীর সেবা করে ইহা ভুল নহে ; অথচ ইহাদের বিরুদ্ধে শত অভিযোগ নিত্যই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে—

কিন্তু সে কথা তুলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—গিরিরাণী নাম রেখেছে কে ?

—কবরেজ মশাই।

—নাম পছন্দ হয়েছে ?

আরজন হাসিতে লাগিল ; বলিল,—কবরেজ-মশার পরিবারের নামও গিরিরাণী ; তাঁকে আমি মা ব'লে ডাকি। কবরেজ মশায় একদিন ডেকে বললেন,—ওরে আরজান, তোর গরু নাকি ছ'সের দুধ দেয় ?—আমি বললাম দেয়ই ত'।—কবরেজ মশায় বললেন, আমার পরিবারের নাম গিরিরাণী, তাকে তুই মা ব'লে ডাকিস। তোর গরুর নামও আমি রাখলাম গিরিরাণী।—কারণটা বুঝলেন আপনি, বাবু ?

বুঝিতে পারি নাই ; বলিলাম,—না।

আরজান হাসিতে হাসিতে বলিল,—ঐ ক'রে তিনি আমায় বাঁধলেন যে ! এই গরু যদি আমি বেচি তবে আমার মা-বেচার পাপ হবে ; অযত্ন করলে, মায়ের অভিশাপ লাগবে।—যাই এখন, বাবু ; ওপার যাবো—সেলাম।

—সেলাম। গিরিরাণী এখানেই থাকবে ?

—থাক, ছেলেরা কাছেই আছে ; নজর রেখেছে।—বলিয়া আরজান পা বাড়াইল।

একটা নিরবচ্ছিন্ন নির্বিরোধ জীবন-যাত্রা এখানে অনায়াসে চলিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে প্রাপ্ত-সংবাদের কত গরমিল, অবাক হইয়া তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরলাম।

এবং পিসিমা আমাকে দেখিয়াই তাঁহার রান্নাঘরের বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—ওরে হাবা, তোকে দেখতে এসেছে।

বাল্যকালে যখন মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিবার কথা, তখনও নাকি বছর দেড়েক আমার মুখ দিয়া "বু বু" ছাড়া আর দ্বিতীয় শব্দ নির্গত হয় নাই।

বোবা হইয়াই জন্মিয়াছি বলিয়া যে আতঙ্কটা জন্মিয়াছিল তাহা অকারণ প্রমাণিত হইয়া গেলেও হাবা নামটা ঘুচে নাই। নাম এবং তার উৎপত্তির কারণ নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি শুনিয়াছে মনে করিয়া আমি অপ্রতিভ হইয়া গেলাম, কিন্তু সম্ভবতঃ অদৃশ্য ব্যক্তির কাছে,—কারণ, চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখা গেল না; জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে?

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—পালিয়েছে বুঝি! মেয়ে আমার লজ্জা পেয়েছে।

মনে পড়িয়া গেল, ঘটনার এইরূপ সংস্থানবশতঃ অসংখ্য প্রেমের কাহিনী ইতিপূর্বেই বিরচিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ একই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিষয়টির উপরেই একটা বিতৃষ্ণা ছিল—তাহাই এক্ষণে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—ওঃ—তারপর কেহ আমাকে গুপ্তস্থান হইতে দেখিয়া লইয়াছে কি না, এবং নামের সঙ্গে চেহারার কতক মিল দেখিয়াছে কি না, সে-বিষয়ে একটা সংশয় লইয়া আবার বাহিরে আসিলাম।

এদিক ওদিক একটু পায়চারি করিয়া আবার ভিতরে আসিলাম।

পিসিমা বঁটি পাতিয়া একটি কুষ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন; আমি উঠানে দাঁড়াইয়া ভ্রূভংগীপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে মেয়েটি গেছে, পিসিমা?

—গেছে।—বলিয়া পিসিমা হাসিয়া মুখ তুলিলেন; বলিলেন,—আয়, বোস।

পিসিমা আসন আগাইয়া দিলেন। আমি আসিয়া বসিলাম, বলিলাম,—বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে ব'সো না, পিসিমা। সে কাজের দেরী আছে।

—আমিও তাড়াতাড়ি করছিনে!—সে আমাদের স্বজাতিই নয় তা বিয়ের ঘটকালি করবো কি! বিদেশে থাকিস—না জানি কেমন ধারা মানুষই তুই, তাই ভেবে দেখতে এসেছিল। তুই 'কু' ভেবে নিয়ে খামখা অতদূর দৌড়েছিস।

শুনিয়া চক্ষু নত করিলাম—এই কারণে যে, ভাবিয়া আমি নিজে কিছুই লই নাই, পরের ভাবনা নিজস্ব হইয়া আমাকে একটা ক্রূর দৃষ্টি দিয়াছে। বলিলাম,—এমন হামেশা হয় ব'লেই ভয় ক'রে চলি।

—চলি মানে? কতবার দায়ে ঠেকেছিস আজ পর্যন্ত?

পিসিমা আমাকে আস্ত রাখিবেন না দেখিতেছি—তাঁর কথার উত্তর দিলাম না। পিসিমা পুনরায় বলিলেন,—ওর বাপের মামারা আর তাদের ছেলেরা তোদের গোমস্তা ছিল, তারা সেই সূত্রে অনেকখানি জমি নিষ্কর ভোগ করে।

—এখন গোমস্তা কে?

—আমি।—বলিয়া পিসিমা হাসিলেন।

—ওর বাবা আছে?

—আছে।

—সে কেন গোমস্তার কাজ করে না?

—সে ক্ষ্যাপা।

শুনিয়া মনে হইল, সেই রকম ক্ষ্যাপাই বুঝি, যাদের শিকল দিয়া বাঁধিয়া ঘরে আবদ্ধ রাখিতে হয়, নতুবা তাহারা মানুষের শরীরের এবং সম্পত্তি-সামগ্রীর অনিষ্টসাধন করে।

অথবা সেই রকম, যারা নিজের মনেই কাঁদে, হাসে, কত কি বকে, আর নিরর্থক কি করে তার ঠিক নাই।

আমি একটি পাগলকে জানিতাম। "অঘোর তোর কে হয়?" জিজ্ঞাসা করিলেই কুৎসিত গাল দিয়া সে মারিতে ছুটিত। এ ব্যক্তি তেমনও হইতে পারে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন ক্ষ্যাপা? কামড়ায়?

—না; দিব্যি এদিকে সাজগোছ, কথায় কাযে পরিপাটি; খায়-দায় বেড়ায় বেশ ভালমানুষের মত; কিন্তু ওর ধারণা ঐ মেয়ে ওর নয়।

—মানে?

পিসিমা কথা কহিলেন না।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তার বউ বুঝি কুড়িয়ে পেয়েছিল?

কিন্তু পিসিমা তদুত্তরে অন্য কথা বলিতে লাগিলেন,—সতীশ দাস সে লোকটার নাম। লেখাপড়া জানে, কিন্তু মেয়েটি বউয়ের পেটে আসা অবধি সে ব'লে বেড়াচ্ছে ঐ একই কথা—ব'লে ব'লে আজ পর্যন্তও তার আশ মেটেনি। আরো একটা বদ অভ্যাস আছে লোকটার—লোকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘোরে; বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কান পেতে মানুষের কথা শোনে—কতবার ধরা প'ড়ে গেছে। লোকে আগে ভাবত, বুঝি চুরি করতে আসে। কিন্তু তা নয়—ঐ ওর রোগ।—বলিতে বলিতে পিসিমার কণ্ঠস্বরে যেন ক্ষোভ দেখা দিলো; বলিতে লাগিলেন,—বউটি মরণ পর্যন্ত ঐ ঘেন্নার কথা শুনে শুনে গেছে; আর মেয়েটাও আজন্ম শুনছে। বউটা আমার কাছে এসে কাঁদত। সে মরেছে, বেঁচেছে। এখন মেয়েটা আমার কাছে এসে ব'সে ব'সে থাকে—তারও দুঃখের সীমা নেই।

এতক্ষণ পরে রহস্যটা হঠাৎ পরিষ্কার হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমরা তা বিশ্বেস করো?

—না; আমি ত' করিইনে; কেউই করে না।

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,—লোকটাকে পাগলা গারদে দে'য়া উচিত। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

—হবার যো নেই। সে-ই হয়েছে সব বিপদের বড় বিপদ। গ্রামের লোক চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে যদি খুঁজে পেতে কাউকে আনে ত' মেয়ের বাপই আগে বরপক্ষকে শুনিয়ে দেয়, ও মেয়ে কিন্তু আমার নয়। তারা বিদেশী লোক, অত কি জানে! শুনে তারা ছুটে পালায়। মেয়েটা ভাল—বাপের ত' ঐ মুখ, অহরহ ঐ গঞ্জনা—সব চুপটি ক'রে সয়—বাপের ওপর দরদ কত! সময়ে নাওয়ানো খাওয়ানো—

—চলে কিসে?

—ঐ যে বললাম, তোদের জমি ওরা নিষ্কর ভোগ করে।

—বাবাকে গিয়ে বলব, জমি ছাড়িয়ে নিতে।

পিসিমা অল্প একটু হাসিলেন; বলিলেন,—সে কাজ ত' আমিই পারি। কিন্তু বাপকে সাজা দিলে মেয়েটাও যে মরে।

ভাবিলাম, তাই ত!

—আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে, পিসিমা।

—তাড়াতাড়ি ত' করছি, বাবা; কিন্তু হ'য়ে ওঠে কই! তোর জন্যে সরু চাল আনতে পাঠিয়েছি—

—কি দরকার ছিল?

—মোটা লাল চাল কি সইবে তোর?

—আমাদের ক্ষেতের ধান ত'? খুব সইবে!—বলিয়া আনন্দ পাইলাম—ক্ষেতের অধিকার গর্বে নহে, ধান্যের আপন তৃষ্ণাপহারক লক্ষ্মীশ্রীর যে মনোহারিত্ব আছে তাহাই স্মরণ করিয়া। বাজারের চাল, মিহি হোক মোটা হোক, পয়সা দিলেই মেলে; কিন্তু এখন অনুভব করিলাম, সে চালের ধান যেন আমার মুখ চাহিয়া ভূমিলক্ষ্মী স্বহস্তে প্রেরণ করেন নাই—করিয়াছেন যাহা তাহা এই ধান্য—জননী-হৃদয়ের করুণার দুগ্ধ বাজারের চালে নাই—বলিলাম,—তুমি ভেবো না, পিসিমা; সহ্য করিয়ে নেবো আমি। তোমার জলখাবার যদি দু'ঘণ্টায় হজম হ'য়ে যেয়ে থাকে তবে ভাতও হবে।—বলিয়া উঠিলাম।

## ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

খানকতক বাংলা গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম; আহারাদির পর তাহারই একখানি খুলিয়া লইয়া পড়িবার উপক্রমেই ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিল।

তারপর জাগিয়া চোখ খুলিতেই দেখিলাম, কয়েকটি বালক-বালিকা চমকিয়া দরজার সম্মুখ হইতে পাশের দিকে সরিয়া গেল। ভাবিলাম, জননীরা নিকটেই আছেন, এবং আমি জাগ্রত হইয়াছি শুনিয়াই তাঁহারা পলায়ন করিবেন।

পিসিমা রাঁধেন ভাল, মেজাজ আমার প্রফুল্ল ছিল। মানুষের প্রতি মানুষের এ-হেন অসরল আচরণ কেন? সুপ্রচুর অবকাশ পাইয়া মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইল।

উত্তর যা মনে আসিল তাহার জন্য দায়ী, আমাদের নাড়ীনক্ষত্র বুঝিতে পারিয়া যাঁরা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গেছেন, তাঁরাই অর্থাৎ "বিবিক্ত আসনো ভবেৎ"—মাতা, সহোদরা এবং পুত্রীর সঙ্গেও একাসনে উপবিষ্ট হইবে না। এই নিষেধ যাঁরা করিয়াছিলেন, তাঁরা ফ্রয়েডের অগ্রজ ছিলেন, ইহা বুক ঠুকিয়া বলা যায়। শাস্ত্র রচনার ফাঁকে ফাঁকে, একাসনে উপবেশনের নহে, কেবল দর্শনজনিত যে বিপত্তি-সমূহের এবং নির্লজ্জতার যে সকল দৃষ্টান্ত তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গেছেন তাহা আরও মারাত্মক।

শিব উন্মত্ত। ঋষিরা অন্ধ। তপস্বীরা তপের ফল সেই অনলে আহুতি দিতে উদ্যত।

মানুষ তাই নিজেকে বিশ্বাস করে না। মনে হইল, দেবকল্প ব্যক্তিগণের এবং দেবাদিদেবের উদ্দেশে এই সব উপাখ্যান রচনা করিয়া মানুষকে দুর্বলতার চরম সীমায় তুলিয়া না দিলে ধর্মগ্রন্থের কি অঙ্গহানি ঘটিত!

মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন অনেকেই—রাক্ষস বিভীষণ পর্যন্ত অমর; কিন্তু রিপুর প্রেরণার কাছে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, এমন উদাহরণ দু'একটি! মানুষের এই দুর্বলতাকে অত্যন্ত অমার্জিত রুক্ষমূর্তি ধারণ করাইয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাঁহারা মানুষের অতিশয় এবং অনর্থক অনিষ্ট করিয়া গেছেন—মানুষ ভয় পাইয়া গেছে।

ও-কথা না তুলিলেই তাঁরা ভাল করিতেন—মানুষ সাহস পাইত; আত্মজয় করিবার চেষ্টা অন্ততঃ করিত।

আমার বন্ধু মনোরথকে দেখিয়াছি, সে তার দাদাদের সামনে নিজের কন্যাটিকে কোলে লয় না, আদর করে না—মেয়েটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলে কি হাত বাড়াইলে সে চমৎকার লজ্জা পায়—অলক্ষ্যে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসিয়া মেয়েটির দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়। তখন তাহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতাম।

এখন ঘৃণার সহিত মনে হইল, মেয়েদের পলায়ন আর মনোরথের লজ্জার কারণ

একই—মানুষের বর্বর মন এখনও নিতান্ত স্থূল আকর্ষণটা একটি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে না—এবং উভয়েই তাহা এত জানে যে, সেই জানাটাই তার সকল জানার শৃঙ্গ।···পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গলার সাড়া-শব্দ দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পিসিমা জলখাবারের আয়োজন করিতেছেন—এবার ঠাণ্ডা ফলমূল।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে দাওয়ার ধারে দাঁড়াইয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছিল, আমাকে দেখিয়াই একজন আর একজনের গা টিপিয়া দিলো, এবং সবাই চুপ হইয়া গেল।

বলিলাম,—তুমি কি মনে করো পিসিমা, আমার ক্ষিদের শেষ নেই! তা যাক, খাবো এখন; গরমের দিনে ভালই লাগবে। কিন্তু তুমি এত সংগ্রহ করছ কোত্থেকে?

ছেলেমেয়েরা আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

পিসিমা বললেন,—আমি কিছুই যোগাড় করছিনে; পাড়ার লোকেই ক'রে দিচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ত্যাগ করিয়া পিসিমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার কথাই শুনিতেছিল—আমি কথা বলিতে সুরু করিতেই আবার আমার দিকে চোখ ফিরাইল—ভাবিলাম, যে কথা কয়, তারই মুখের দিকে তাকাইয়া ওরা কি যেন দেখে!

বলিলাম,—তাদের গরজ!

—গরজের কি অন্ত আছে! তোদের বাড়ী বটে এটা; কিন্তু লোকে মনে করছে, তুই আমার অতিথ এসেছিস। আমি যদি যত্ন করতে না পারি তবে তোর বাপ-মায়ের কাছে দেশের লোকেরই দুর্নাম হবে।

কথাগুলির ভিতরের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—আদরও হইতে পারে, ভর্ৎসনাও হইতে পারে।···ছেলেমেয়েগুলি আমার দিকে ফিরিল।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—আমার সাধ্যি কি কিছু করি। ভাতের সংগে তরকারী যা খেয়েছ ও-বেলা তার বারো আনাই পাওয়া।

ছেলেমেয়েগুলি একে একে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান করিল এবং বেড়ার আড়ালে যাইয়াই তারা এমন উচ্চহাস্য জুড়িয়া দিলো, যাহার কারণ কেবল এই হইতে পারে যে, আমি ওদের সংগে পারিয়া উঠি নাই—ভয়ংকর ঠকিয়া গেছি।

হাসিতে হাসিতেই তারা একেবারে প্রস্থান করিল—বেড়ার ফাঁক দিয়া তাহাদের একেবারে যাওয়াটা দেখিতে দেখিতে বলিলাম,—বলো কি! ওঁরা গেলেন কোথায়?

পিসিমা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাদের কথা বলছিস?

—আমায় যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম!

পিসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কই, কেউ ত' আসেনি!

পিসিমার এই সবিস্ময় অস্বীকারে মনের একটা ভাবান্তর তৎক্ষণাৎ ঘটিল; এবং ভাবান্তর ঘটিল দেখিয়া আমি বিস্মিতই হইলাম। মনটা তিরতির করিতে লাগিল।

যেন কি একটা আয়োজন করিয়াছিলাম, তাহা পণ্ড হইয়া গেছে। যখন মুদিতনেত্রে শয়ন করিয়া শাস্ত্রকার, উপাখ্যান-রচয়িতা, দেবাদিদেব এবং মহর্ষিগণকে জড়াইয়া পৃথিবীকে ধিক্কার দিতেছিলাম, ঠিক তখনই ছেলেমেয়েগুলিকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া, দেখি না দেখি, দেখা দিবার একটা ইচ্ছা মনের কোথায় সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।···মন বড় ধূর্ত, আর মানুষের গৃহ-শত্রু সে।

চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম,—ও-বেলা তোর নেমন্তন্ন।

—কাদের বাড়ী ?

—তাদের কি চিনবি তুই ! আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।

আমি আপত্তি করিলাম ; বলিলাম,—কাজ কি, পিসিমা ? তুমিই যা হয় —

পিসিমা বলিলেন,—তা হয় না। নেমন্তন্ন আমি নিয়েছি। খেতে তোর আপত্তিটা কি শুনি ? তুই বুঝি মুখচোরা !

—কই, কাউকে ত' বলতে শুনিনি। তবে এখানে জানা-শোনা নেই, চুপ ক'রে গিয়ে খেতে বসা—

পিসিমা বুঝাইয়া দিলেন, এ আপত্তি বালকোচিত, এবং চুপ করিয়া যাইয়া খাইতে কেহ বসে না।...সে-কথা ঐখানেই মিটিল।

মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলাম,—পিসিমা, আমি চা খাই যে !

পিসিমা হাতের কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ঠকে গেছি ত' ! সে কথা ত' আমার মনে হয়নি ! এখন উপায় !—বলিয়া পিসিমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—একেবারে হাল ছেড়ে দেয়ার মত বিপদে তুমি পড়নি, পিসিমা ; আমার সঙ্গে সব সরঞ্জাম আছে, দুধ চিনি পর্যন্ত। তুমি উনুনটা ধরিয়ে দ্যাও।

—কিন্তু আমার ঘরে ত' তোমার ও দুধ, চিনি, চায়ের সরঞ্জাম নিতে দেবো না। ঢেঁকি-ঘরের উনুনটা ধরিয়ে দি'গে ; ক'রে খা।

সেই বন্দোবস্তই হইল। কেবল পিসিমা অন্যদিকে একটু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কি না খেলেই নয় ?

আমি বলিলাম,—শ্লেষ্মা বড় বেড়ে যায় যদি একটি বেলা চা না খাই—সেবার, ঝোঁক হ'লো, চা ছাড়তে হবে—দু'দিন খেলাম না—তিন দিনের দিন বুকে শ্লেষ্মা জ'মে আমি মরো মরো—আন্ ডাক্তার —

পিসিমাকে ভয় দেখাইতেই গল্পটি বানাইয়া দিলাম ; পিসিমা বলিলেন,—তবে খা যত পারিস।

পিসিমার পাকশালাকে বাঁচাইয়া ঢেঁকি-ঘরেই চা প্রস্তুত করিয়া লইলাম।

শাক-আলু, পেঁপে আর ডাবের জল আর তার নবনীর সঙ্গে চা ঠিক খাটিবে কিনা এই সংশয় লইয়াই চা খাইতে বসিয়া গেলাম সেই ঢেঁকির উপরেই পা তুলিয়া।

দু'টি চুমুক দিবার পরই হঠাৎ মনে হইল, ভাগ্যে ঢেঁকির জ্ঞান নাই—আমার স্বেচ্ছাচারে বিরক্ত হইয়া সে গা ঝাড়া দিলেই, আস্তাকুঁড় কাছেই, সেখানে যাইয়া পড়িতে হইত। নামাবলী পাতিয়া বসিয়া পাঁঠার মাংস ভোজনতুল্য একটা বিসদৃশ আচরণ করিতেছি—সেখানে যাইয়া বন্ধুমহলে এই গল্প করিলে কেমন মুখ টেপাটেপি চলিবে ভাবিয়া মনে মনেই হাসিতেছি, এমন সময় যে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাঁধে গামছা না থাকিয়া গায়ে শার্ট থাকিলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতাম বোধ হয়।

লোকটা পিসিমাকে 'পিসিমা' বলিয়া ডাক দিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল।

পিসিমা আমার কাছেই ঢেঁকি-ঘরের বাহিরে খুঁটিটা ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন ; বলিলেন,—এসো, পিরু, এই বরদা-র ছেলে।

পিরু আমাকে নমস্কার করিল। পিরুর অতিশয় গম্ভীর চেহারা—মাথার একটি চুলও কালো নাই,—চক্ষু এবং রং উজ্জ্বল—দাড়ি-গোঁফ কামানো—যৌবনে বলবান ছিল তাহা

অনুমান করা কঠিন নয়। অল্প কথায়, পিরুর বহিঃদৃশ্য সুন্দর, পৌরুষ-ব্যঞ্জক, এবং ভদ্র।

তাহার নমস্কারে প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম,—বসতে একটা আসন দাও, পিসিমা।

—থাক, থাক। উঠবেন না; আমি এই দুব্বোর উপরেই বসছি।—বলিয়া পিরু বসিয়া পড়িল।

পিসিমা আমাকে বলিলেন,—তুই ভেবে হয়তো অবাক হয়েছিস যে, পিসিমা একলা থাকে কেমন ক'রে! এই পিরুই আমাকে আগলে আছে তার সংসার দিয়ে—ওর বউ-ছেলের ত' আমি মাথা কিনে রেখেছি; আমি ওদের এম্নি দায়!

শুনিয়া পিরু হাসিল। দেখিলাম, তার দাঁত ঠিক আছে।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—নিত্যি আসে ছেলেটা সকালে-বিকালে দু'বেলা; শুধিয়ে যায়, কেমন আছো, দিদিমা? কিছু দরকার আছে? বড় ভাল ছেলে, বড় অনুগত।—বলিয়া পিসিমা নিঃশব্দ হইয়া মনে মনে তাহাকে অশেষ আশীর্বাদ করিলেন মনে হইল।

আরো মনে হইল, পিসিমার এই বিগলিত ভাবোচ্ছ্বাস অবিমিশ্র স্নেহজনিত নহে, তাহা ভয়পীড়িত অন্তরের অভয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও বটে। এই স্বল্পবসতি পল্লীর ভিতরে তিনি যে কত একা এবং অসহায়, আর এই পিরু সপরিবারে তাঁর কত বড় অবলম্বন, কৃতজ্ঞতার আবেগে পিসিমা তাহাই অজ্ঞাতে প্রকাশ করিলেন।

পিসিমা বলিলেন,—উঠি, কাজ আছে। পিরুর সঙ্গে গল্প কর; সেকেলে পুরনো লোক; দেশের খবর-বার্তা ও যেমন জানে, তেমন আর কেউ জানে না—পিরুর বয়েস আশী। কেমন, পিরু, আশী হয়েছে না?

পিরু হাসিয়া বলিল,—তা হলো বৈ কি পিসিমা, বেশীই হ'লো।

পিসিমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—তোর ঠাকুদ্দার সমান বয়সী ও, পড়ার সাথী।—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পিরু বলিল,—শুনলাম, বাবু এসেছেন; দেখা করতে এলাম। সাতপুরুষের নিমকদাতা আপনারা।—বলিয়া পিরু মস্তক অবনত করিল।

আমার মনে হইল, আমার উদ্দেশে কিছুতেই নয়, আমার পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে আর তার সপ্তপুরুষের পক্ষে। আরো মনে হইল, যাহারই উদ্দেশে হোক, পিরুর এই নমস্কার যেন অনুগ্রহেরই দান।

তার চক্ষু প্রদীপ্ত। চোখের যদি ভাষা থাকে তবে পিরুর চোখর ভাষা উদ্ধত অটল হইয়া এক নিমেষেই রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে; এবং ক্রুদ্ধ হইলে পিরু যা কিছু করিতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে পিরুর ব্যক্তিত্বকে যথাযোগ্য সম্মানের আসনে বসাইয়া কি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় আমরা দুর্মতি ঘটিয়া গেল।

পিরু সেকেলে লোক; দেশের খবর-বার্তা সবই সে জানে।

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি ত' দেশের সব খবরই জানো, পিসিমা বললেন; বলতে পারো, আমাদের এই গাঁয়ের নাম পোড়া-বৌ হ'লো কেন? এমন সব ভাল ভাল নাম থাকতে কিনা পোড়া-বৌ! কাঞ্চনপুর, সুবর্ণগ্রাম, রতনপুর, রামচন্দ্রপুর, হরিহরনগর—কেমন প্রাণভরা চমৎকার সব নাম; ভোরবেলা উঠে গ্রামের নাম করলেই কত পুণ্যি!

সব থাকতে কি না পোড়া-বৌ! আর লোকে গ্রামের নাম করে না, বলে—অযাত্রা, হাঁড়ি ফাটে।—বলিয়া হাসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, পিরুর প্রসন্নতা নিবিয়া গেছে—সে আমার দিকে আরো খানিকটা সরিয়া আসিয়া যেন 'থ' হইয়া বসিয়া আছে।

পিরু বলিল,—এ গাঁয়ের নাম পূর্বে পোড়া-বৌ ছিল না, বাবু। কেন হ'লো তা যদি শোনেন ত' নিবেদন করি।

আমার চায়ের পেয়ালা তখন মাত্র অর্ধেক খালি হইয়াছে; প্রায় ঠাণ্ডা চায়ে তিন চারিটা ঘন ঘন চুমুক দিয়া বলিলাম,—বলো পিরু, শুনি।

পিরু নতচক্ষে খানিক নিঃশব্দ থেকে, আমার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মানুষের মনের দিশে পেলাম না বাবু, এত বয়েস হ'লো। মানুষ যে কি চায় আর কি না চায় তা আজও আমার ঠাহর হ'লো না।

কাহাদের একটা বাছুর আসিয়া উঠানের ঘাসে মুখ লাগাইয়াছিল—পিরু নিঃশব্দ হইয়া সেইদিকে ম্লানচক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি শ্রোতা হিসাবে খুবই সহিষ্ণু—পিরুর কথায় একটা হুঁ দিয়া চায়ের পেয়ালা নামাইয়া বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—এই যে বাছুরটা চরছে দেখছেন, পেট-ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি। কিন্তুক, বাবু, মানুষের খাই-খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই-খাই, খালি পেটেও তেমুনি। একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা সে নিজেই জানে না। সে জ্ঞাতির সব্বস্ব খায়, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার খাওয়ার আশ মেটে না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি সংশয়ের সঙ্গে বলিলাম,—হ্যাঁ।

—কিন্তুক, আর একটা কথা ভাবুন, বাবু; পেটের ক্ষিদেয় মানুষ যত পাগল না হয়, চোখের ক্ষিদেয় আর মনের ক্ষিদেয় হয় তার চতুগ্গুণ। মানুষের এই মন নিয়েই ত' যত মারামারি, কাটাকাটি, পাপের কায্য। আবার এ কথাটাও ভাবুন বাবু, ভগমান চোখ আর মন দিয়েছেন—তাতে দিয়েছেন ক্ষিদে; তেমুনি আবার বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন যে, মানুষ যেন র'য়ে স'য়ে কাজ করে। কিন্তুক, ক'জনে তা করে, বাবু?

আমি বলিলাম,—খুব কম লোকেই তা করে।

—তাই। তা হ'লে দেখুন, মানুষ উঠতে বসতে ভগমানকে একরকম অপমানই করে; ভগমান তাতে নারাজ হ'য়ে যান—মানুষের তাতে ভাল হয় না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ।

পিরু বলিল,—ভাল যে হয় না তারই প্রমাণ পোড়া-বৌ গাঁ—বলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল।

কর্কশ জিহ্বা বাহির করিয়া বাছুরটা তার পিঠের ঘাম চাটিতে সুরু করিয়াছিল; বাছুরটাকে ঠেলিয়া দিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—মানুষের কথা আবারও বলি বাবু। আট আনা মণ ধান দেখেছি—তখনো মানুষ যেমন ছিল, ছয় টাকা মণ ধান এখন, এখনো মানুষ তেমুনি আছে—তখনো লোকের হাহাকার ছিল, এখনো আছে। তখনকার দর আর এখনকার টাকা হ'লে তবেই হ'ত সুখ। তখন জিনিষ ছিল বেশী, টাকা ছিল কম; তাই তখনো দেশে অকাল হ'ত, এখনো আছে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না।

এত বড় অর্থনৈতিক প্রশ্নে হাসিয়া বলিলাম,—হ্যাঁ। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে যে দুর্ভিক্ষের কথা পড়েছি তা যদি সত্যি হয় তবে সে-ও বড় কঠিন দিনই ছিল।

—ছিল বৈকি, কঠিনই ছিল। তখনো এমন লোক ছিল যে খেতে পেত না। আমি বলছি পঞ্চাশ পঁচ্‌পান্ন কি ষাট বছর পূর্বেকার কথা—এ গাঁয়ের নাম তখন ছিল লক্ষ্মীদিয়া। এ গাঁয়ের লোক তখনো ক্ষিদেয় কেলেশ পেয়েছে। কিন্তুক একটা কথা আমি ভুল বলেছি, বাবু; মাপ করবেন। তখন মানুষের কষ্ট ছিল সত্যি—কিন্তুক সে-কষ্ট সকলের না, আর রোজকার না—এখন যেন সকলেরই রোজই নাই নাই। আর তখনকার দিনে গণ্ডগাঁয়ের কেমন একটা ছিরি ছিল, এখন তা দেখতে পাইনে। তখনকার কেউ যদি আজ এ-গাঁয়ে আসে তবে গাঁয়ের চেহারা দেখে চিনতেই পারবে না যে, এই সেই লক্ষ্মীদিয়া কি পোড়া-বৌ, যা-ই বলুন। সে ছিরি আর নাই—বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্বের সঙ্গে তুলনায় এ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি এক্ষণে কিরূপ পরিবর্তিত বা অবনত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা তখনকার লোকই এখন আসিয়া বলিতে পারে। আমি মাত্র বাইশ বছর আগেকার মানুষ—তাই গ্রামের ষাট বছর আগেকার রূপটা চক্ষের নিমেষে ধ্যান করিয়া লইয়া আন্দাজের উপরেই বলিলাম,—হ্যাঁ, কই আর তেমন শ্রী! মাঠের, মানুষের, আর গরুর চেহারা ঠিক একরকম দাঁড়িয়েছে—সবই যেন পোড়া-পোড়া।

—পোড়া-পোড়া বৈকি, সে চেহারা আর নাই। তখনকার দিনে মানুষের বার-উঠোনে দুব্ব গজাত না ধান-মড়াইয়ের চোটে; এখন সব উঠোনেই জঙ্গল। যাক সে কথা। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন গাঁয়ের মানুষ বিদেশে বেরুতে কেবল লেগেছে। এখন যেমন সবাই বিদেশের, আর বিদেশ এসেছে কাছে, তখন ত' এমন ছিল না। তখন বিদেশ ছিল দূর—আর বেরুত লোকে কমই—একটা দু'টো কদাচিৎ ভবিষ্যৎ। তখন ত' রেল ছিল না যে, হু-হু শব্দে তিন দিনের পথ তিন দণ্ডে নিয়ে ফেলবে, একেবারে নিভ্‌ভয়ে! তখন নদী থাকত বারো মাস বওতা, খালে বিলেও জল থাকত বারো মাস—যাওয়া আসা সবই চলত নৌকোয়, আর ভয়ে প্রাণটা হাতে ক'রে—ঝড় তুফোন আর ডাকাত, এরাই ছিল নৌকোর যম। ডাকাতের ভয়ে নৌকো সব বহর বেঁধে চলত—দল ছাড়া একলা নৌকো পেলেই ডাকাতে তাকে মারত। তা যা হোক, বাবু, এ-কথা মিছে না যে, মানুষের পয়সা তখন ছিল কম। আমরাই মনে পড়ে, আস্ত একটা রূপোর টাকা দেখেছিলাম জোয়ান বয়েসে—তার আগে দেখি নাই। এখনকার মত লোকে রোজই ভাতে না ম'লেও, কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখতে পেত না। ঐ কাঁচা পয়সার লালসেই মানুষ তখন বিদেশে বেরুতে লেগেছে—দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, ঐ সব উত্তর অঞ্চলে।—আমাদের এই লক্ষ্মীদিয়ার হরিশ-ঠাকুর তা ধ'রে থেকে থেকে কাঁচা পয়সার লালসেই হঠাৎ নেচে উঠে একদিন বৌ-ছেলে নিয়ে যাত্রা ক'রে নৌকোয় উঠল।

তখন বর্ষাকাল—

এই নদী দেখছেন ময়না, শ্যাওলা আর ঘাসে ভরা, ছোঁড়ারা লাফ দিয়ে দিয়ে এ-পার ও-পার করে; তখন ময়নার এমন হাড়-চাটা চেহারা ছিল না। আপনাদের ঐ চরের জমির মোটটাই ময়নার পয়স্তি; ওপারের ঠিক অতখানি—নদী তা হ'লে কত চ্যাওড়া ছিল তা একবার ভেবে দেখুন, বাবু! বর্ষাকালে তার জলের ডাকে কান পাতা যেত না, এমনি হু-হু শব্দ। সে যাই হোক, কাঁচা পয়সার টানে হরিশ-ঠাকুর বৌ-ছেলে নিয়ে পান্সিতে

উঠল—বাড়ীতে রেখে গেল বিধবে মেয়ে যোগেশ্বরীকে, যোগেশ্বরীর বছর তিনেকের একটা মেয়ে মিশ্মই, আর যোগেশ্বরীর বছর দেড়েকের একট ছেলেকে।

হরিশ-ঠাকুরের যাওয়ার সময় যোগেশ্বরী কেঁদে বলল,—বাবা, আমাদের কি উপায় হবে?

হরিশ বলল,—তোমাদের উপায়? তোমাদের উপায় রেখে গেলাম ঐ গোলাবন্দী ক'রে, আর ঢেঁকি ত' নিয়ে যাচ্ছিনে, থাকল; ধান ভানবে, আর খাবে।—ব'লে সে মেয়েকে পায়ের ধুলো দিয়ে নিষ্কাতরে যেয়ে নৌকোয় উঠল। কিন্তুক, হরিশ-ঠাকুরের মত মানুষ বোঝে না, বাবু, যে যাবার সময় মানুষকে অমন ক'রে গোলা দেখিয়ে যাওয়া তাকে অপমান করা। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি বললাম,—হ্যাঁ।

—তা-ই। বিশেষ যখন কেবল যাচ্ছো ব'লেই কষ্টে আর একজনের বুক ফাটছে! এদিকে মা আর মেয়ের কান্না আর শেষ হয় না। নৌকো খুলবার সময় ব'য়ে যায়, দাঁড়ি বেটা কাছি খুলে ফেলেছে, কিন্তুক মেয়ে মাকে আর ছাড়ে না।

হরিশ-ঠাকুর নৌকোর উপর থেকে দাঁত খিঁচিয়ে তর্জ্জন করতে লাগল। মেয়েটি সম্প্রতি বিধবা হয়েছিল। বাপ তাকে ফেলে রেখে বিদেশ যাচ্ছে দেখে তার সোয়ামীর শোকই উথলে উঠল বেশী ক'রে। সোয়ামী যদি বেঁচে থাকত তবে ত' এমন ক'রে চোখে আঁধার দেখতে হ'ত না। হরিশ-ঠাকুর কেমন যেন দুর্মুখ চোয়াড় ধরণের লোক ছিল—

পিসিমা সবটা না হোক গল্পের কিছু বোধ করি শুনিয়াছিলেন—তিনি যাওয়া আসার সময় একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তাঁর মুখ শুষ্ক, এবং কিছু বলিবেন বুঝি! কিন্তু কিছু না বলিয়াই তিনি আপন কাজে গেলেন।

পিরু তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে বলিতে লাগিল,—চিরদিন একটা মিষ্টি কথা ভুলেও সে মেয়েকে বলে নাই; যাবার সময়ও দুখিনী মেয়েটাকে একটা মন-বোঝানো কথাও ব'লে গেল না। কাজটা কি তার উচিত হয়েছিল? বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—না, তার উচিত হয়নি।

—তা যা-ই হোক, হরিশের বাম্ভণী মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ছেলে ভারতকে নিয়ে নৌকোয় উঠল। নৌকো ছেড়ে দিলো: হরিশ-ঠাকুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা করতে লাগল—জলের টানে নৌকো তীরের মত ছুটে চলল; যোগেশ্বরী চোখের জল মুছে ছেলেটাকে কাঁখে ক'রে আর মেয়েটার হাত ধ'রে ফিরে এলো।

কিন্তুক, আমরা সেখানেই দাঁড়িয়েই থাকলাম সেই চলন্ত নৌকোর দিকে চেয়ে। মনটা কেমন খালি হ'য়ে গেল। চ'লে যাওয়ার একটা দুঃখু আছে, বাবু, যা নিতান্ত নিষ্পরেরও বাজে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—তা ত' বাজেই।

—বাজে বৈ কি! তারপর, বর্ষার ঐ ভরা নদী! আমরা যেন বুঝতে পারলাম, বাবু, নদীতে যেমন জল ধরছে না, বিধবে এই মেয়েটার বুকের চারপাশ তেমনি ভরা-জলের ধাক্কায় ভাঙছে! নদীর বাঁক ঘুরে নৌকো চ'লে গেল—যখন আর একেবারেই দেখা গেল না তখন আমরা ফিরে এলাম। খানিক এসেই একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, নদীর ঘাট যেন খাঁ খাঁ করছে।

হরিশ বিদেশ গেল কি করতে তা সে-ই জানে। মেয়েটা কিন্তুক ভাত-কাপড়ের দুঃখু

কোনদিনই পায় নাই। তখনকার দিনে মানুষে মানুষে একটা আপন আপন ভাব ছিল। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ, ছিল ব'লেই মনে হয়।

—ছিল বৈ কি, কিন্তুক, এখন তা নাই। নিজেরই মন দিয়ে বুঝতে পারি, বাবু, তেমন আপন আপন যেন আর কাউকে লাগে না! যা-ই হোক, যোগেশ্বরী ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে লাগল; গাঁয়ের দশজনই তাকে নিজের মা-বোনের মত চোখে চোখে রাখে, পাহারা দেয়, খোঁজ-তল্লাস করে, দরকার হ'লে বদ্যি ডেকে আনে, ক্ষেতের আকর ঘরে তুলে দেয়—এম্‌নি ক'রে গাঁয়ের লোকই তাকে আগলে রাখে।

হরিশ-ঠাকুর ইদিকে বর্ষার দিনে আসে, আবার বর্ষা থাকতে থাকতেই চ'লে যায়! হরিশ দুটো চাকর সংগে ক'রে আনে, রাঁধার বামুন আনে সংগে ক'রে—লোকে তা দেখে; তার পরিবারের গয়না আর ছেলের আর নিজের কাপড়-চোপড় জাঁক-জমক দেখে দেশের লোকের বিদেশের দিকে টান ধরে।

তা যা-ই হোক, আমরা হরিশের মুখে শুনি দেশ-বিদেশের গল্প, কবে কার নৌকো ডাকাতে তাড়া করেছিল তারই কথা, বিদেশী লোকের রীত-বেরীতের কথা—আর লোকের মুখে শুনি হরিশের টাকার কথা—হরিশের টাকার নাকি অন্ত নাই। শুনলাম, হরিশ সেই বিদেশেই উত্তরেই পাকা ঘর-বাড়ী করেছে, সেইখানেই সে থাকবে—এমনও নাকি হরিশ বলেছে শুনলাম যে, মেয়ের ছেলেটা যদি মানুষ হ'য়ে দেশের বাড়ী রাখতে পারে বাড়ী থাকবে, না পারে বাড়ী যাবে। শুনে, আমরা মনে বড় কষ্টই পেলাম। বাপ-ঠাকুদ্দার বাস্তুর মায়া কাটিয়ে হরিশ সেই মুলুকে থাকতে চায় কোন্ প্রাণে! কিন্তুক অবশেষকালে হ'লও তাই। প্রথম প্রথম সে বছর বছর আসত, তার পর দু'তিন বছর পর পর, তার পর একেবারেই আসা ছেড়ে দিলো। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, হরিশ ব'লেই এমন কাজটা পারল, আর কেউ পারত না। কিন্তুক, এখন দেখছি বাবু, সবাই তা পারে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ; এখন ত' বিদেশেই ঘর-বাড়ী ক'রে আছে অধিকাংশ।

—আছে বৈ কি, বাবু, আছে; তা না থাকলে আর গাঁয়ের এমন অরাজক হা-দশা হবে কেন! তা যাক, এখন হরিশের কথাই ব'লে শেষ করি। হরিশ আর গাঁয়ে আসে না—এম্‌নি ক'রেই দিন যায়—আমরা তাকে একরকম ভুলেই গেছি—লোক চ'লে গেলেই যে ফাঁক প'ড়ে যায় তা ভরতে বেশীদিন লাগে না, বাবু, এ আমি দেখেছি; মানুষের মন জুড়োবে ব'লেই ভগমানের এই নিয়ম করা আছে।

আমি বলিলাম,—তার পর ?

—হরিশ-ঠাকুর আর আসে না, হঠাৎ একদিন, এক পহোর বেলা আছে, এমন সময় যোগেশ্বরীর গলায় মড়া-কান্না শুনে আমরা দশে-বিশে দৌড়ে এলাম—বলি ব্যাপারটা কি হ'লো? এসে শুনলাম, হরিশ-ঠাকুর মারা গেছে—তার মরার একদিন পরই তার বাম্ভণীও মারা গেছে—দু'জনেই ঐ এক কলেরাতে। ছেলে ভারত ভালই আছে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকের আপিস ছিল না, এ গাঁয়েও ছিল না; উ-ই নিধিরামপুর থেকে, আড়াই কোশ দূর থেকে, মংগলবারে মংগলবারে হরকরা এসে ডাকের চিঠি দিয়ে যেত। আমরা চিঠি প'ড়ে হিসেব ক'রে দেখলাম, হরিশ-ঠাকুর মারা গেছে আজ দশ দিন।

যা হোক, সে-দিকে যা হবার তা হ'লো।

কিন্তুক, এর মধ্যে আর দুটো ঘটনা ঘ'টে গেছে—মিম্মই আর ভারতের বিয়ে। তখনকার দিনে বাবু, বিয়ের ছেলে ছিল সস্তা, মেয়ে ছিল আক্রা—টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হ'ত। কষ্টেসিষ্টে পাঁচ ভাইয়ের দু'ভাইয়ের বিয়ে যদি হ'ত, টাকার অভাবে আর তিন-ভাইয়ের হ'তই না—মানুষের বংশবৃদ্ধি তেমন হ'ত না—নির্বংশও হ'য়ে গেছে অনেক ভাল ভাল লোক।

—যাক, তারপর ?

—তার পর, এই টাকা চাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলতে চলতে মিম্মইর বয়েস দশ উৎরে এগারো হ'য়ে গেল। এখন ঘরে ঘরে সতরো আঠারো বছরের মেয়েরা বেশ স্বসছন্দে আছে—বড় হয়েছে ব'লে তাদের বাপ-মার কি তাদের নিজের কোনো ভাবনাই যেন নাই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ, তা ত' আছেই।

—আছে বৈ কি ! কিন্তুক তখন দশ উৎরে এগারোয় পড়লে মানুষের হাত মাথায় উঠে যেত—আর তার গঞ্জনা ছিল কি কম ! গঞ্জনার জ্বালায় লোকে গলায় দড়ি দিতে দৌড়ত। যোগেশ্বরী ছিল বোকা-সোকা আর বেজায় ঢিলে মানুষ। বিধবে আর একা হ'লেও যে-কাজটা সে পারত তা-ও যেন তার ভুল হ'য়ে যেত। ছেলের ঘর বাছতে বাছতে, মেয়ের দর কষতে কষতে, হবে হ'চ্ছে, এটা নয় ওটা করতে করতে মিম্মই এগারোয় পড়ল —তখন লেগে গেল হুড়োহুড়ি তাড়াতাড়ি ! লোকের গঞ্জনায় যেন পাগল হ'য়ে যোগেশ্বরী মিম্মইর বিয়ে দিয়ে দিলো এক তেকেলে বুড়োর সঙ্গে—তাতে দেশের লোকের মাথার পোকা মরল, কিন্তুক দেশের লোকের আশীর্বাদ পেয়েও বুড়ো বেশীদিন টিকল না— মিম্মই বিধবা হ'য়ে মায়ের কাছে এলো—তখন সে বারো উৎরে মাত্তর তেরোয় পড়েছে। আর একটা কথা, বাবু, আমি সময় সময় ভাবি ; তখনকার দিনে বিধবা হওয়াটা কেমন ধাত-সওয়া মত ছিল, কিন্তুক আজকাল সেটা যেন কারুরই ধাতে সয় না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

পূর্বে বৈধব্য সকলেরই ধাতে সহ্য হইত, এবং এখনও পূর্ববৎ সহ্য হয় কি না, তাহা সহসা অনুমান করিতে না পারিয়া পিরুর প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ নিরুত্তরই রহিলাম।

এবং সেই অবসরে চোখে পড়িল, দিবাবসানের আর দেরী নাই—কখন ছায়ার অবতরণ সুরু হইয়াছিল জানিতে পারি নাই—এখন দেখিলাম, উঠানের বারো-আনাই ছায়াময়— অবশিষ্ট রৌদ্রটুকুও নিস্তেজ।

পিরুর গল্প ভাল লাগিতেছিল। বলিলাম,—তা হবে।

পিরু বলিল,—তা-ই। বুড়ো বুড়ো বিধবেরও এখন বিয়ে হয় শুনি ; কিন্তুক তখনকার দিনে আঁতুড়ে মেয়ে বিধবা হ'লেও তার আবার বিয়ের কথা লোকে মনে আনতেও পারত না।

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র এবং সনাতন প্রথার প্রতি আমার মনের টান নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রোশও নাই ; বাহিরের জিনিষ বলিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে ঐগুলিকে বাহিরেই রাখিয়া দিয়াছি। শাস্ত্রে প্রথায় গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল—চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলক-ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরো দশজনের মত, আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই, ধর্মাধর্ম আচার-বিচার বিষয়ে একেবারে নিঃস্পৃহ। ধর্ম মনে, আর যাহাতে মানুষের দুঃখের হ্রাস হয়

তাহাই কর্তব্য—এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বসিয়া আছি। পিরুর কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার ছিল—বৈধব্য কেন সহিতেছে না তার হেতুর মর্মের কথাটা বলিতে পারিতাম ; সহিবার আবশ্যকতা নাই; সংখ্যায় লঘুতর হিন্দুর তাহাতে কি ক্ষতি ইত্যাদি অনেক কথা কহিয়া পিরুর চোখ ফুটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে গুরুভার অথচ অনাবশ্যক যে বস্তুটিকে অক্লেশে এড়ানো যায় তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া নির্বুদ্ধিতা। বলিলাম,—তারপর মৃন্ময়ীদের কি হ'লো ?

পিরু একটু নড়িয়া বসিল।

কাঁধের গামছাখানা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে আনিয়া বলিতে লাগিল,—তার পর অনেকদিন যোগেশ্বরী মন খুব খারাপ করে থাকল—মেয়ের দিকে তাকালে তার চোখ ছল্ছল্ করে। কেঁদে কেটে ভারতকে সে চিঠি লিখল,—বৌটিকে নিয়ে একবার আয়, ভাই। তাকে আমি দেখি নাই ; যদি তোদের মুখ দেখে আমার বুকের আগুন নেবে।

বোনের বুকের আগুন নেবাতে বৌ নিয়ে ভারত দেশের বাড়ীতে এলো। এসেই বলল, —মাস-ছয়েক থাকব, বেশীদিন থাকবার যো নাই, সেখানে কাজ বিস্তর—জোত, জমা, তেজারতি, কত কি !

দেখলাম, ছেলেটা বেশ সুপুরুষ ; তার বাপের মত কাঠখোট্টা হ্যাংগামে নয়। বৌটাও চমৎকার লক্ষ্মী, হাসি-খুশী কথা-বার্তা, যুবতী কালে যেমন হয়। বাড়ীতে শুনলাম, বৌটার সন্তান হবে—এই তিন মাস।

যোগেশ্বরী ভাই আর ভাজ পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল—মিন্মইও তাই। মায়ে-ঝিয়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগল—তাদের কি খাওয়াবে, কেমন ক'রে তুষ্টু করবে ! রক্তের টান ত' ছিলই, তার উপর তারা গরীবের বৌ-ঝি, ওরা বড়লোক ; ওদের অন্নেই মিন্মইর মা মানুষ—দয়া ক'রে ওরা এসেছে যদি, কষ্ট পেয়ে না যায়।

কিন্তুক, ভাইকে সুখী করতে ওদের কায়কষ্টের শেষ থাকল না। ওদের নাওয়া-খাওয়ার সময় কিছু ঠিক ছিল না—দু'টোয় খেতো, তিনটেয় খেতো, কোনোদিন রাত হয়েও যেতো ; কিন্তুক ভারতের ভাত দিতে হয় দশটার মধ্যে—ওরা খেতো সেদ্দ পোড়া, ভারতের জন্যে রাঁধে দশ তরকারী—তার জন্যে শেষ রাত্তিরে উঠে কাঠ-কুটো কুড়নো, ঝাটপাট বাসি-কাজ সারা—তারপর রান্না, মাছের হেঁসেলে দু'বেলা, নিরামিষ একবার—তারপর ধান সেদ্দ—ঢেঁকিতে কুটে তা চাল করা—তার আগে তা টেনে টেনে রোদে দে'য়া, টেনে টেনে তোলা—

কাজের আর অন্ত থাকল না, বাবু, ঐ দুটি লোকের জন্যে। একাদশীর পরদিন সকাল সকাল নেয়ে শুকনো গলায় একটু জল দেবে তাড়াতাড়ি, তারও সময় তারা পায় না।

কচি মেয়েটার একেবারে মরবার হাল হ'লো।

তবু বউকে তারা কাজের নাম করতে দেয় না—সে তোলা থাকে।

ভারত দশ-তরকারী-ভাত সময় মত খায়-দায় আর বৌকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকে।

গাঁয়ের লোকই দু'দশজন বলল,—করছ কি, যোগেশ্বরী ! মেয়েটা যে ম'লো।—আর তারাই একটা কাজের লোক জুটিয়ে এনে যোগেশ্বরীর জিম্মা ক'রে দিয়ে গেল—মিন্মই আর ভারতের বউয়ের সমবয়সী একটা মেয়ে—সৎজাতের অনাথা মেয়ে। মিন্মই আর ভারতের বউয়ে ভাব ছিলই—এ-র সঙ্গেও তাদের ভাব হ'য়ে গেল।

ভারতের ছ'মাসের দু'টো মাস এম্নি ক'রেই কাটল—ভারত যাই যাই করে, কিন্তু যায় না।···মিন্ময়ী একদিন তার মাকে বলল,—মামা কবে যাবে ?

শুনে যোগেশ্বরী তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে মেয়ের গালে এক ঠোনা মেরেই বসল—"নরম কাঠে ছুতোরের বল" ব'লে একটা কথা আছে বাবু, যোগেশ্বরীর হ'লো তাই ; মেয়েকে সে গাল-মন্দ ক'রে বলল,—তোর খাচ্ছে ওরা যে তুই তাড়াতে চাস ?—কিন্তুক একটিবার জিজ্ঞেসা করল না, মেয়ে এমন কথা বলে কেন ! মিন্ময়ী অন্যায় কিছু বুঝেছিল নিশ্চই—কিন্তুক মায়ের হাতে মার খেয়ে সে চুপ ক'রে রইল।

তারপরই এমন ক'টা কাণ্ড ঘটে গেল, বাবু, যার দুঃখু এখনো আমার যায় নাই। কাণ্ডটা ঘটল সত্যিই, কিন্তুক না ঘটলেও ত' কারু কিছু হানি হ'তো না। যদি বলেন, ঘটালেন ভগমান ; কিন্তুক সেটা বড় শক্ত কথা, বাবু ; সে-কথার ফয়সালা আমরা করতে পারিনে !

পিরু খানিক চোখের পলকপাত বন্ধ রাখিয়া আর নিঃশব্দ থাকিয়া বলিতে লাগিল,—যে-দিন ঘটনাটা ঘটল, বাবু, সে-দিন বড় বিষ্টি ; সন্ধ্যে রাত, অন্দকার, আর তেম্নি গলদধারে বিষ্টি। যোগেশ্বরী তার হবিষ্যি-ঘরে ব'সে জপ করছিল ; তার ছেলেটি এক ধারে ব'সে পড়া পড়ছিল ; মিন্ময়ী রান্নাঘরে মাছ-ভাত রাঁধছিল ; ভারতের বৌ গিরিবালা তার কাছেই ছিল—হঠাৎ কি দরকারে সে ভারতের শোবার ঘরে উঠে চৌকাঠে পা দিয়েই দেখল—

পিরু থামিল। আমি সোৎসুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—এবং পিরু আর কথা কহে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতের স্ত্রী কি দেখল ?

উত্তরে পিরু বলিল,—বাবু, আপনি আমার মনিব। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তুক গোখ্রোর বাচ্চা গোখ্রোই। মনিবের মুখের সামনে কথাটা উচ্চারণ করব কিনা তা-ই ভাবছি।

আমার তখন কৌতূহল প্রদীপ্ত। মুরুব্বির মতো সদয়কণ্ঠে অভয় দিয়া বলিলাম,—বলো।

পিরু সাবধানে এ-দিক ও-দিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল,—দেখল, ভারত সেই পা'ট্কুরুণী মেয়েটার মুখখানা তুলে ধ'রে হেসে হেসে—

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল। লাফাইয়া উঠিলাম,—বলো কি ?

পিরু কথা কহিল না।

বহুক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া যখন সে কথা কহিল, তখন তার কণ্ঠস্বর ক্লেশে যেন ভাঙা-ভাঙা। বলিল,—মানুষের মন কি যে চায় আজও তার দিশে পেলাম না, তা আগেই বলেছি। ভগমান ধম্ম দিয়েছেন, অধম্ম দিয়েছেন, আর মন দিয়েছেন বুঝে নেবার। কিন্তুক মানুষ তা বুঝল না বাবু ; সব ডুবিয়ে দিয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঐ কাজটাকে কেন বড় ক'রে তুলেছে তা অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নাই, বাবু। জিনিষটা আছে সত্যি, আর সে ছুটবেই, কিন্তুক তার ওজন নাই কেন তা জানিনে। মানুষ ইচ্ছে করলেই জিনিষটাকে বশে আনতে পারে—দুনিয়ার সব যদি মিছে হয় তবু এ-কথা মিছে নয়, বাবু, এ আপনাকে আমি বলছি। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

হ্যাঁ ছাড়া না বলিবার উপায়ই ছিল না। বলিলাম,—হ্যাঁ।

—আপনারা ত' তা বলবেনই, ভদ্দরলোক, ল্যাখাপড়া শিখেছেন ; আমরা মুখ্যু চাষা মানুষ—আমরাও তাই বলি।

—তারপর কি হ'ল ?

—বৌটি তাই দেখে যেমন গিয়েছিল তেম্নি শব্দটি না ক'রে ফিরে এলো। সে আসতেই মিণ্ময়ী বলল, মামী ভাত দেখ ত'—মা জল খেতে ডাকছে। ব'লে সে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ও-ঘরের বারান্দা থেকে যোগেশ্বরী ডেকে বলল,—ভাত পুড়ে যে ছাই হ'য়ে গেল, বৌ ; ঘুমুলি নাকি ?

অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে যোগেশ্বরী ভারতকে ডেকে রান্নাঘরে তদারকে পাঠিয়ে দিলো ; ভারত এসে দেখল, বৌ খালি খুঁটে ঠেস দিয়ে ঠায় ব'সে আছে—উনুনে হাঁড়ি চাপানো—ভারত বৌকে ধম্‌কে তুলে দিয়ে এলো।

মানুষের মনের ভাব আমরা ভাল বুঝিনি, বাবু ; বৌটার তখন মনের ভাব কি হ'ল তা-ও জানিনে ; আর কি ক'রে যে কি ঘটল তা-ও জানিনে—জানতে চাইওনে। কিন্তু ভারত তাকে গায়ে পড়ে টেনেছিল, এ নিশ্চয়। ছোঁয়া দিয়ে, ছুঁয়ে, চাউনি দিয়ে, হাসি কেড়ে সোমত্ত মেয়েকে পাগল ক'রে তোলা কিছু কঠিন ত' না ! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—যোগেশ্বরী বুঝসুঝের তাল-সামালী লোক ছিল না ; সে এম্নি ধারা আলগো মানুষ ছিল যে, যা সে চোখে দেখত তা-ও যেন তার মনের নাগাল পেত না—বাইরের হাবভাব আর লক্ষণ দেখে ভিতরের খবর পাওয়া ত' তার একেবারেই অসম্ভব। বৌয়ের ভাবগতিক দেখে ভারতের কেমন সন্দেহ হ'ল ; সে সাবধান হ'ল ; কিন্তু সকল দিকে সাবধান হ'লেই সব দিক বাচত।

স্বর্ণ সে মেয়েটার নাম—মিণ্ময়ীর মত ভারতকে সে মামা ব'লে ডাকত ; কিন্তু হঠাৎ একদিন সে মামা ব'লে ডাকা ছেড়ে দিলো। সে ত' তা দিলই—মিণ্ময়ীও ভারতের সামনে আসতে চায় না, ঠেলে পাঠাতে গেলেও ঘাড় গুঁজে গোঁ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে—তা-ই দেখে যোগেশ্বরী রেগে রুখে উঠে বলল,—মিনি, তোর হ'ল কি লো ? মামার সামনে বেরুতে চাসনে যে ?

যোগেশ্বরীর ভয় হ'ল, মিণ্ময়ীর হঠাৎ এই গুটিয়ে আসাতে অনাদর হ'ল মনে ক'রে ভারত যদি রাগ করে ! কিন্তু একেবারে ভুল, বাবু, আগাগোড়া সব একেবারে ভুল। মিণ্ময়ীর এ লজ্জা যে কিসের লজ্জা তা বোঝবার সাদ্যি যোগেশ্বরীর ছিল না।

স্বর্ণর লজ্জা আরো বেশী—সে ঘাড় ফিরিয়ে যাওয়া আসা করে, মামা বলে ত' ডাকেই না—যোগেশ্বরী কেবল তাড়না করে,—এদের হ'ল কি !—তোদের জ্বালায় কি ভাই আমার না খেয়ে চ'লে যাবে—তোরা দূর হ'য়ে যা—

বকতে বকতে হঠাৎ একদিন যোগেশরীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল, সেই আগুনে তার ভিতর-বার পুড়ে একেবারে ছার হ'য়ে গেল। পাপ আর পারা বেরুবেই, বাবু, মাস তিন-চার পরেই, সন্তান-হওয়া মানুষ ব'লেই যোগেশ্বরী ধ'রে ফেলল যে—

কথাটা স্পষ্ট ক'রে না-ই বললাম, বাবু। লোকে বলে মরার বাড়া বিপদ নাই ; কিন্তু এ-বিপদ যে মরার বাড়াও কত বড় বিপদ, তা যেন কারু শত্তুরকেও কখন না জানতে হয়, বাবু। যোগেশ্বরী কোণায় কোণায় কেঁদে বেড়াতে লাগল ; খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলো। নিজের মনেই ভেবে দেখুন, বাবু, এই পাপ আর লজ্জা গোপন করতে কত বড় একটা পাপ-কায্যের দরকার ! যোগেশ্বরী একেবারে পাগলের মত বেঠিক হ'য়ে উঠল ; কিন্তু ভাইকে দু'টো কথা বলবে এ সাহস তার হ'ল না।

বাবু, কথাটা ভাবতেও যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে;—সর্বনাশ যে এতদূর এগিয়ে গেছে বৌটা তখনই তা জানতে পারে নাই—কিন্তুক খুব বেশীদিন তার অজানা থাকল না।

ভারত ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়, ছিপ ফেলে মাছ ধরে, তাস পাশা খেলে—যেন সে কিছুর মধ্যেই নাই। কিন্তুক, ভাবুন বাবু, এইটে যদি ঠিক উল্টো হ'য়ে ঘটত? খুন একটা হোক না হোক, ভারত বৌকে ত্যাগ করত কি না? বলুন বাবু, ত্যাগ করত কি না?

—করত।—বলিয়া আমি বাধ্য হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। জোয়ান পুরুষ আমি, এবং সেই হিসাবে গল্পোক্ত ভারতের সমধর্মী—ইহারই অকারণ একটি লজ্জা যেন জোর করিয়া আমার মুখ ঠেলিয়া অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলো—পিরুর কণ্ঠস্বরে এমনি একটা ক্ষমাহীন আক্রোশের তেজ ছিল।

পিরু একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল। তারপর বলিতে লাগিল,—সোয়ামী এত বড় দাগাটা তাকে দিলো, এমন অবিশ্বাসের ইতর কাজটা সোয়ামী করল—বৌটা কেবল কেঁদে কেদে দুটি চক্ষু অন্ধ ক'রে ফেলল—একটি কথা বলল না যে, তুমি এ কাজ করলে কেন, কি আর কিছু।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা আমি বলব আপনাকে, কিন্তুক তার আগে সেই সতী-লক্ষ্মীর পায়ে দণ্ডবৎ ক'রে নেবো।—বলিয়া পিরু উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সতীর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার একটা প্রণাম নিবেদন করিল। যখন সে মুখ তুলিল তখন তার চোখ যেন ভিতরকার জলের ঝাপটায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

রক্তবর্ণ চক্ষে সোজা আমার দিকে চাহিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—বাড়ীতে অত লোক, কিন্তুক সব একেবারে চুপ—পোড়া-বাড়ীর মত বাড়ী অষ্টপহর খাঁ খাঁ করে। দু'তিনদিন চুপ ক'রে থেকে থেকে চোখের জল ফেলে ফেলে ছ-সাতমাস পোয়াতী বৌটা একদিন, ঠিক এমনি সময়, দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজের কাপড়ে দিলো আগুন লাগিয়ে। তখনই কারু নজরে পড়ে নাই, আগুন কিছুক্ষণ জ্বলবার পর, ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সংগে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে, কি হ'ল, কি হ'ল, দেখ্, দেখ্, করতে করতে এসে যখন দরজা ভেঙে লোকজন ঘরে ঢুকল তখন পোড়া শেষ—বৌটা খাবি খাচ্ছে।—সেই থেকে এ গাঁয়ের নাম পোড়া-বৌ।—বলিয়া পিরু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া বলিতে বলিতে গেল,—বেশ করে, লোকে এ-গাঁয়ের নাম করে না।

## ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পিরু দুস্ত্যাজ্য কঠিন একটা আবহাওয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। ঘটনার সূক্ষ্মাংশগুলি সে বলে নাই—কিন্তু তাহাতে ঘটনার বীভৎসতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ঘটনার স্থূলত্বই আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল বেশী। মন দিয়া বিচার করিয়া সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ করিয়া লইবার ইহাতে কিছু নাই—স্থূল-কলেবর নগ্ন ঘটনার পরিসমাপ্তি সেই ধূমায়িত বহ্নি যেন আমার সম্মুখে জ্বলিতে লাগিল—হাতের বিড়ি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া অবশচিত্তে গল্পের আবহাওয়ার ভিতরে খানিক আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল।

যখন উঠিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলাম, তখন বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যার ঘোর জমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাহিরটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার—চারিদিক একেবারে নিঃশব্দ—নিবিড়পল্লব গাছের ভিতর কি একটা পাখী হঠাৎ গুম্‌ গুম্‌ শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। চম্‌কিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—পিসিমা, ও কি ?

—কি রে ?—বলিয়া পিসিমা দীপ লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি বলিলাম,—ওই ডাকছে।

—প্যাঁচা। কেউ কেউ বলে হুতুম-পাখী।

শুনিয়া আমার ভয় গেল ; কিন্তু হুতুমের গলার আওয়াজ বড় ভারি !

দিনের বেলায় এত রৌদ্র আমরা পাই না বটে, কিন্তু এত প্রচুর অন্ধকারও প্লাবনের মত বেগে চারিদিক হইতে ছাইয়া আসে না ; মেঘলা দিনেই আমরা কল টিপিয়া বিজ্‌লি-বাতি জ্বালি, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট অলি-গলি গৃহ এবং চতুর্দিক আলোকিত হইয়া ওঠে।

তারপর এই নীরবতা। দিনে উন্মুক্ত আকাশ এবং ক্ষেত্র আর দূরদূরান্তের বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া যে নীরবতা শান্তিপ্রদ মনে হইয়াছিল, পৃথিবী গুটাইয়া এই গৃহের মাঝে একটিমাত্র প্রজ্বলিত দীপশিখার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেই সেই সৃষ্টিব্যাপী নীরবতা কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে পিসিমা হাসিবেন ; তিনি ইহারই মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। বলিলাম,—পিসিমা, তোমার হাতের কাজ ফুরলো ? রান্না-বান্না ত' নেই এ-বেলা ?

—না।

—চলো, ঘরে ব'সে গল্প করিগে।

—বাইরেই বোস্‌, ঠাণ্ডায়।—বলিয়া পিসিমা তাড়াতাড়ি 'সন্ধ্যাবাতি' দেখাইয়া এবং অন্যান্য মাংগলিক কাজ সারিয়া আসিয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া দিলেন ; আমি উঠিয়া বসিলাম। পিসিমা পা ধুইয়া আসিয়া বসিলেন ; এবং একেবারেই জিজ্ঞাসা করিলেন—পিরুর গল্প শুনলি ?

আমি বিমর্ষভাবে বলিলাম,—শুনলাম।

পিসিমা বলিলেন,—গল্পের আরো খানিক আছে।

—আরো আছে ? তুমি জানো আগাগোড়া ?

—জানি।

—তবে বলো শুনি।—বলিয়া হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম।

রাত্রের আকাশের রূপ কেমন তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ কখনো হয় নাই ; দেখিয়াছি নিশ্চয়ই, কিন্তু চোখের সম্মুখে প্রখর আলো জ্বলিত বলিয়া এমন করিয়া সে চোখে পড়ে নাই। এখানে দেখিলাম, অন্ধকার যেন ভূতল হইতেই উত্থিত হইয়া আকাশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে, এবং সেই অন্ধকারের প্রান্তে সূচ্যগ্র আলোকবিন্দুগুলি চক্ষু-তারকার মত নিম্নের দিকে চাহিয়া আছে—নক্ষত্রের কোনোটা সুপ্রভ, কোনোটা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, কোনোটা মুহুর্মুহুঃ টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছে, কোনোটা থাকিয়া থাকিয়া, কোনোটা একেবারে স্থির—

কল্পিত রেখা টানিয়া চারিটি নক্ষত্র যুক্ত করিয়া একটি চতুর্ভুজ অংকিত করিলাম।

তারপর একটা নিঃশ্বাস পড়িল ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি জানো ?—ও, বলেছ ত' জানো। বলো শুনি।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—তোর ঠাকুর্দ্দা তখন জানা লোক। বদমেজাজী ব'লে তাঁর বদনাম ছিল না, কিন্তু খাঁটি আর রাগী লোক ব'লে লোকে তাঁকে ভয় ভক্তি করত। তাঁর কানে কথাটা কে তুলে দিলো জানিনে ; তবে অত বড় কথাটা কানে না এসেই পারে না। শুনে তিনি ভারতকে ডেকে পাঠালেন। বাড়ীতেই সে ছেলের কথার বাজি আর কারসাজি—তোর ঠাকুর্দ্দার সামনে দাঁড়িয়ে সে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল। বা'র-বাড়ীর উঠোন তখন লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে। তোর ঠাকুর্দ্দা বললেন, তোকে দু'খণ্ড ক'রে কেটে এই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে আমার কিছু হয় না তা জানিস ? তুই হরিশের ছেলে ব'লে তোকে পেয়াদা দিয়ে জুতো মারলাম না—

লোকগুলো হৈ হৈ ক'রে উঠল ; বলল,—তা-ই করুন, বাবু ; দেন হুকুম ; আমরা ঠিক হ'য়ে আছি। শিক্ষে দিয়ে দিই।

কিন্তু তা আর করা হ'ল না ; তোর ঠাকুর্দ্দা বললেন,—তুমি সেই মেয়েটাকে তিনশো টাকা দেবে নগদ—বোন আর ভাগ্নিকে তোমাদের উত্তরে নিয়ে যাবে—ভাগ্নিকে তোমার হাতে দিয়ে অবিশ্যি বিশ্বাস নেই ; কিন্তু উপায় নাই। রাজি আছো ?

ভারত বললে,—টাকা আমি কোথায় পাবো ?

কর্ত্তা বললেন,—সেখান থেকে আনাও। যতদিন টাকা না আসে ততদিন তুমি নজরবন্দী থাকবে—আমার লোক তোমার পিছনে থাকল—পালাতে গেলেই তোমার সমস্তটা না পারুক মাথাটা এনে আমাকে সে দেখাবে।

লোকগুলো আবার হৈ হৈ ক'রে উঠল, কি না, উপযুক্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সদর সর্দার এগিয়ে এলো ; বলল,—কত্তা, এর উপর নজর রাখবার ভার আমাকে দেন।

কর্ত্তা ভারতের সংগে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন,—এই সদর সর্দার তোমার পাহারায় থাকবে—এ-র নাম সদর সর্দার, এই পরিচয়ই যথেষ্ট ; কিন্তু তুমি জানো না ব'লেই ব'লে দিই, তোমরা যেমন বাড়তি নখ কাটো অনায়াসে, মানুষের গলা ও তেমনি চোখ বুজে কাটে।—ব'লে তিনি ভারতকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু তার দিদির তার সাথে উত্তরে যাওয়া হ'ল না—সেই যে শয্যা সে নিলো, সে-শয্যা ছেড়ে সে-মেয়ে আর উঠল না—নিজেকে শুকিয়ে মারল। মৃণ্ময়ী ভাইকে নিয়ে তার শ্বশুরঘরে গেল—স্বর্ণকে তিনশো টাকা দিয়ে ভারত আবার গেল জন্মের মত সেই উত্তরে —রংপুর না কোথায়।

পিসিমা চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর কিছু আছে জের ?

পিসিমা বলিলেন,—আছে। সে মেয়েটি টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। এখন শোনা যাচ্ছে, সেই মেয়েটির পেটে যে ছেলে এসেছিল সেই ছেলেই সতীশ দাসের বাবা।

ঊর্ধ্বদিকে মুখ করিয়া আমি মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলাম—চট করিয়া উঠিয়া বসিয়াই দেখিলাম, বাহিরের দিক হইতে আলোকের আভাস আসিয়াছে ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—সতীশ তা জানে ?

—জানে ব'লেই মনে হয়।—বলিতে বলিতেই লণ্ঠনের আলো আরো বিস্তৃত হইয়া উঠানে পড়িল—সেই দিকে চাহিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম।

আলোক এইদিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল ; একটু দাঁড়াইল ; তারপর পিসিমার

নিরামিষ রান্নাঘরের চালের উপর উঠিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই যে ব্যক্তি লণ্ঠন লইয়া আসিয়া আমাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল, পিসিমা তাহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন করিলেন,—কে, সতীশ ?

—হ্যাঁ, মাসিমা, আমি সতীশ। বাবুকে আলো দেখিয়ে নিতে এসেছি।

—উঠে ব'সো। এত সকালেই হ'য়ে গেছে ?

—হয় নাই এখনো। তবে আরো চার পাঁচ-জন নিমন্ত্রিত আছেন কিনা, তাঁরা বাবুর সঙ্গে আলাপ করবেন, দু'দশটা ভাল ভাল কথা শুনবেন বাবুর মুখে, গান-বাজনাও হয়-তো হবে—তাই তাগাদাই নিতে পাঠিয়ে দিলেন।—বলিয়া সম্মুখে লণ্ঠন রাখিয়া সতীশ দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল।

পিরুর সেই গল্পের ট্র্যাজেডির এখনো পরিসমাপ্তি ঘটে নাই ; এই সতীশ আসিয়াই এখন তাহা অধোদিকে গতিশীল হইয়া আছে। সতীশকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া সমগ্র ব্যাপারের একটা পরিণত ছায়া যেন আমার মনে ঘনাইয়া আসিল—সতীশের কন্যাটি করুণনেত্রে মানুষের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সেই ঘনীভূত ছায়ার মাঝে বিচরণ করিতে লাগিল।

সতীশকে সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা হইলেও কথা জোয়াইল না। তাহার দিকে চাহিয়া অকারণেই বিলম্ব করিতেছি মনে করিয়া পিসিমা বলিলেন,—যা, আর রাত করিসনে। সকাল সকাল খাইয়ে দিও, সতীশ ; ছেলেমানুষ, রাত জাগার অভ্যাস নেই। তুমি আবার ওকে আলো ধ'রে পৌঁছে দিয়ে যেও।

সতীশ বলিল,—তা দেবো।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলাম। সাবধানে পা ফেলিয়া আর পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পল্লীপথে চলিতে লাগিলাম। আশে পাশে কি আছে তাকাইয়া দেখিবার সময় রহিল না—ছোট ছোট গাছের সরু সরু ডাল পথের উপর মেলিয়া আসিয়াছিল—পায়ের ধাক্কায় সেগুলি আপনিই সরিয়া যাইতে লাগিল। লণ্ঠন লইয়া আগে আগে সতীশ।

খানিক দূর নিঃশব্দে যাইয়া সতীশ হঠাৎ আমাকে বিপদে ফেলিয়া দিলো ; জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার পিসিমা আমার কথা কি বলছিলেন, বাবু ?

ন্যাকা সাজিতে হইল ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—কখন ?

—যখন আমি আপনাদের বাড়ী যাই ? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, সতীশ তা জানে ? আপনার পিসিমা বললেন, জানে বোধ হয় ! কথাটা কি ? না, বলবেন না ?

আমি বলিলাম,—বলতে বাধা নেই, ব'লে লাভও নেই। শুনে কি করবেন আপনি

বলিয়াই সতীশের উচ্চহাস্যে আমি চমকিয়া উঠিলাম ; বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—হাসলেন যে অমন ক'রে ?

সতীশ বলিল,—আমাকে 'আপনি আজ্ঞা' কিসের, বাবু ! আমাকে করুন তুই তুকারি —যার আমি হক্‌দার। আমি আপনাদের মত লোকের 'আপনি আজ্ঞার' মানুষ নই।—বলিয়া আমার দিকে একবার মুখ ঘুরাইয়া সতীশ নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। আমি তাহার পায়ের গতির এবং সম্ভবতঃ মনেরও গতির অনুসরণ করিতে লাগিলাম—সে জানিতে পারিয়াছে যে, আমি তাহার বংশ-পরিচয় জানি ; সুতরাং বেশীক্ষণ ধরিয়া মনে মনে লজ্জা পাইয়া লাভ নাই।

কিন্তু আপন কন্যার প্রতি এ ব্যক্তি যে মিথ্যা এবং কুৎসিত কটূক্তি করে তাহাতে

তাহার দ্বিধা নাই ; যাহার অধিক কলঙ্ক স্ত্রীলোকের হইতে পারে না, সেই কলঙ্ক আপন স্ত্রীর চরিত্রে কেবল আরোপ নয়, সর্বত্র প্রচার করিতে ইহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নাই। এই অস্বাভাবিক কুণ্ঠাহীনতা জন্মিল কেমন করিয়া ? যাহার জন্য লোকে তাহাকে পাগল বলে ! যে কারণেই হউক, উহার সজ্ঞান সম্মানজ্ঞান পরবশীভূত আর আচ্ছন্ন হইয়া আছে —সে কারণটি যে কত প্রবল তাহা অনুমান করাও শক্ত ; চোর অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সে কি শুনিতে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ! তার এই বাহিরে অকারণ কিন্তু অস্বাভাবিক দুর্নিবার তাগিদের কারণ অনুসন্ধানে আমি ব্যাপৃত হইলাম। সমাজের এবং নিজের ইষ্ট যাউক, ইহার সন্তান-স্নেহ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেছে—ইহার নির্লজ্জতার তুলনা নাই।

আমার করুণা জন্মিল ; মনে হইল, কি নিদারুণ উত্তপ্ত অন্তর্দাহে এই নিরপরাধ ব্যক্তির সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিনষ্ট হইয়া গেছে—আর সে বোধ হয় তা জানে। এই গুরুভার আত্মনির্যাতন বোধ হয় সে সজ্ঞানেই বহন করিতেছে ! কেবল অভিশপ্ত সেই ক্লেশই কন্যার প্রতি অশ্রাব্য অকাতর কটূক্তির আকারে উদ্‌গীরিত হইতেছে। পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে—তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছটফটানির অন্ত নাই। লোকের কথা যেখানে ফোটে সেখানেই সে কান পাতিয়া দাঁড়ায়—তার কথা কেউ বলে কিনা !

আমি মনে মনে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, অন্য কথা হইতেছে দেখিয়া সে খুশী হইয়া ওঠে, চলিয়া যায় ; কিন্তু তার যন্ত্রণার নিবৃত্তি নাই—পরক্ষণেই এই সন্দেহই জ্বলিয়া ওঠে—এখানে না হউক, আর কোথাও নিশ্চয়ই হইতেছে। এত বড় কথাটা মানুষ ভুলিয়া থাকিতে পারে না ! স্ত্রীকে সেযা-তা বলিত। মনে হইল, লোকটা একপ্রকার পাগলই।

—আমায় সবাই পাগল বলে তা আমি জানি, বাবু।

থমকিয়া দাঁড়াইয়াই আবার সতীশের পায় পায় চলিতে লাগিলাম। সতীশ বলিতে লাগিল,—কেন বলে তা-ও জানি। আমার মনের কথা আর কাকে বলব, বাবু ; আপনাকেই বলি। আমরা যেখান দিয়ে চলেছি, এইটেই ছিল হরিশ-ঠাকুরের বাড়ী—সেই হরিশ-ঠাকুরের বাড়ী—আমার বাবা মায়ের পেটে আসে এই বাড়ীতে।

শুনিয়া আমার গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়া উঠিল—একটি অগ্নিদগ্ধ নারীমূর্তি—সেই বীভৎস চেহারাটি খাবি খাইতেছে—সব ডিঙাইয়া কোন্ অতীতকালের সেই নারীমূর্তিই আমার চোখের সম্মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল। শুষ্ককণ্ঠে কথা আটকাইয়া রহিল ; সতীশ বলিতে লাগিল,—আপনি সব জানেনই, বাবু ; আপনাকে বলতে বাধা নাই। যদি ভালবাসার ফলে আমার বাপের জন্ম হ'ত তবে একটা প্রবোধ ছিল—অতিশয় ঘৃণ্য লালসার ফলে তাদের—

বলিয়া সতীশ দুই মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—আমি কেন ক্ষ্যাপামি করি, কি শুনতে চাই, কেন চাই, তার কারণ আমিই ভাল বুঝিনে—বুঝি যে, অন্যায় হচ্ছে তবু ভাবতে পারিনে যে, আমার স্ত্রী পরপুরুষের সেবা করে নাই। মাথা যেন সর্বদাই ঘোরে, আর মনে হয়, পিতামহী যার অসতী, তার স্ত্রী সতী হবে কেমন ক'রে ! আমি যে জারজের বংশধর তাতে আমার দুঃখু নাই ; কিন্তু সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লেই মনে হয়, শুনে আসি কেউ কুৎসো করছে কিনা।

বলিয়া সতীশ আবার চুপ করিল ; কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না—আমি এতদূর ভাবি নাই।

সতীশ বলিতে লাগিল,—স্ত্রীকে যখন বলতাম, তুই অসতী, তখন মনটা ঠাণ্ডা হ'ত ; এখন সে নাই—মেয়েটাকে তার মায়ের খোটা দিই, মনটা তখন ঠাণ্ডা হয়।

আমি বলিলাম,—এটা নেহাৎ অন্যায় করা হয়। মেয়ের বিয়ে হবে কেমন ক'রে ?

—হওয়ার দরকার নাই। বাবা আমার সতর বচ্ছর বয়সেই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন পনর বচ্ছরের এক মেয়ের সংগে, নানা কৌশল ক'রে ; তেমন ক'রে বিদেশ কোথাও নিয়ে আমিও মেয়ের বিয়ে দিতে পারি। এখানে আমরা কয়েক বৎসর হ'ল এসেছি—সেখানে মন টিকিয়ে থাকতে পারলাম না—মনে হ'ত আমি যদি এখানে না থাকি তবে আমার কথা লোকে টিট্‌কিরি দিয়ে ব'লে বেড়াবে—কেউ তা না বলতে পারে সেই জন্যেই মানুষের মুখ বন্ধ করতে এখানে এসেছি।

আমি ভাবিলাম, এরূপ কল্পনা করা তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ। সতীশ বলিল, —হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ের কথা আপনি বলছিলেন। মেয়ের বিয়ে না হয় ছলে-বলে দিলাম, কিন্তু আমার বংশ বাড়িয়ে লাভ কি হবে ! যে মনোকণ্টে আমি ভুগছি আর পাগলের মত বেড়াচ্ছি, মেয়ের দিয়ে দিলে দৌহিত্র-অংশ তেমনি ক'রে বেড়াক এ ইচ্ছে আমার নয়।

দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। সতীশ বলিল,—এসে পড়েছি, বাবু। এ-বাড়ীতে আপনার খাওয়ার নেমন্তন্ন কেন হয়েছে তা শুনুন। আপনার পিসিমা বলেছেন না ?

—না।

—আপনাদের একটা ভাই-সম্পর্ক চ'লে আসছে। আপনার ঠাকুদ্দা আর যার বাড়ীতে আমরা যাচ্ছি সেই মনীশ রায়ের ঠাকুদ্দা ছিলেন ধর্ম-ভাই—তাদের দু'জনের মায়ের নাম এক ছিল। আপনার পিসিমার মুখেই এ-সব আমার শোনা। আপনারাও তাই ধর্ম-ভাই। কত আদর করে তা দেখবেন।—বলিয়া সতীশ দাস স্পষ্ট শব্দ করিয়াই হাসিতে লাগিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই আলো দেখা গেল, এবং দেখিতে দেখিতে আমার ধর্ম-ভাই মনীশ রায়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

—এইখানেই বসুন।—বলিয়া সতীশ দাস আমাকে একখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া কোন্‌দিকে অন্তর্হিত হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ঘরে উঠিবার আগেই দেখিলাম, ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটা বাঁশের খুঁটির সংগে একটি ছাগল এবং একটা লণ্ঠন বাঁধা রহিয়াছে। লণ্ঠনের কাচের এক-চতুর্থাংশ ঝুল-কালিতে পরিপূর্ণ, এবং তার আলোতে প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর বসিয়া চারিজন যুবক তাস খেলিতেছে ! একখানা চেয়ার কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে ; বাঁয়া তব্‌লা আর হারমোনিয়ম একপাশে স্তূপীকৃত। সতরঞ্চির উপরেই বাবুদের পায়ের জুতা, বোধ হয় ধাক্কায় ধাক্কায় উঠিয়া আসিয়াছে—দু'পাটি উল্টাইয়া আছে দেখিলাম। যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহারা আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না—বোধহয় আমার আগমন জানিতে পারে নাই—এই ঘরখানা কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না—তার সামনের দিকে বেড়া নাই, এবং অন্য তিনদিকের বেড়ায় জানালা বা দরজা নাই। দুই ধারে দুইখানা করিয়া ইষ্টক পাতিয়া খানকতক তক্তা তার উপর ইতস্ততঃ ফেলা আছে।

আরো দ্রষ্টব্য আছে কিনা দেখিবার অভিপ্রায়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি এমন

সময় আমার পথপ্রদর্শক এবং লণ্ঠনধারী সতীশ যে-ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল সে-ই আমার পিতামহের ধর্ম-ভাইয়ের পৌত্র মনীশ রায়।

—এসো ভাই, দাদা এসো।—বলিয়া মনীশ হাত-পাঁচেক দূর হইতেই বল এবং বেগ সঞ্চয় করিয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল। সতীশ এই ভ্রাতৃ-প্রেমের দৃশ্য সে ছাড়া আরো পাঁচজনকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল।

আমি এ আবেগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; জানা থাকিলে, পরিহারের নয়, গ্রহণের উপায় চিন্তা করিয়া আসিতাম। কিন্তু জানা না থাকায় অতর্কিতে বাহুবেষ্টিত হইয়া প্রেমদানের কিছুমাত্র প্রতিদান দিতে না পারিয়া কেবল বেগ সম্বরণের চেষ্টায় মূঢ়ের মত আরও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—আমার মুখে না ফুটিল ধর্ম-ভাইয়ের মুখের কথার প্রতিধ্বনি, ধর্ম-ভায়ের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া না উঠিল আমার হাত, চক্ষুতে না ফুটিল তার চিত্তোল্লাসের প্রতিবিম্ব!

সতীশ বলিল,—বসুন উঠে বাবু!—তারপর তাস খেলোয়াড়দিগের দিকে চাহিয়া সে ধমকাইয়া উঠিল,—এই, তোরা কি করছিস? বাবুকে ডেকে বসাতেও পারিস নাই?

কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপও করিল না। মনীশ বোধ হয় আমাকে অবিচলিত দেখিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিল; হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আমাকে ঘরে তুলিল; বলিল,—তুমি আমার পর নও, ভাই। ব'সো।—বলিয়া সে চেয়ারখানা খাড়া করিয়া তুলিয়া আমার ডানা ধরিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসাইয়া দিলো। কিন্তু তবু আমার মুখে শব্দ নাই—হয়তো ধূলার উপরেই বসিয়াছি মনে করিয়া আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করিতে লাগিল।

মনীশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—তোমার পিসিমা আমারও পিসিমা হন। পিসিমা সেদিন—দিন তিনেক হ'ল—আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন; বললেন,—ওরে মনীশ, তোর ভাই আসছে যে!—আমি ভাবলাম, ভাই? কোন্‌ ভাই?—পিসিমা হাসতে লাগলেন—তোমাকে চিনতে পারলাম না কি না তাই। হাসতে হাসতে বললেন,—চিনতে পারলিনে? বরদা-র ছেলে—গঙ্গাচরণের নাতি রে!—শুনে আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। তুই আসছিস শুনে এমন আনন্দ হ'ল যে নাচতে ইচ্ছে করতে লাগল। তাই ব'লে তুই ভাবিসনে যেন আমি সত্যি সত্যিই নাচলাম! তখনই নেমন্তন্ন করলাম, সে যে-দিন আসবে সেদিন, দুপুরবেলা ত' হবেই না, রাত্রে আমার এখানে খাবে। ব্যস, আমার যে কথা সে-ই কাজ। কিন্তু সে নেমন্তন্ন ত' পাকা নেমন্তন্ন হ'ল না! আজ দুপুরে আবার পাঠিয়ে দিলাম খুকীকে, খুকী আমার ছোট বোন। তার সঙ্গে গেল পাড়ার আরো পাঁচটা ছেলে মেয়ে। তুমি তখন ভস্‌ ভস্‌ ক'রে ঘুমুচ্ছিলে।—বলিয়া মনীশ কৃতিত্বের সহিত হাসিতে লাগিল—যেন নিমন্ত্রণ করিবার এ-কৌশল সেই আবিষ্কার করিয়াছে, তার আগে কেহ জানিত না। আমার মনে পড়িল, ঘুম ভাঙিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দেখিয়াছিলাম, এবং তাদের হাসি শুনিয়া মনে হইয়াছিল, অসভ্য।

তারপর মনীশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি, ভাই?

এতক্ষণে আমি কথা কহিলাম, কারণ অবকাশ মিলিল এবং উত্তরটা জানি; কিন্তু তাহাতেও বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। আমাকে ডাকিবার সুবিধার জন্য আমার নাম জানিতে চাহিতেছে মনে করিয়া বলিলাম,—নীরদবরণ।

শুনিয়াই মনীশের দাঁত বাহির হইয়া পড়িল,—হি হি হি ! নাম কি ঐ রকম ক'রে বলতে হয় পাগল—বলিয়া আমায় ভুল ধরিয়া মনীশ সংগে সংগে ভুল সংশোধন করিয়া দিল ; বলিল,—বলতে হয়, আমার নাম শ্রীনীরদবরণ সরকার। তোমার নাম আমি জানতাম না ভেবেছ ? পিসিমার কাছে আগেই তা শুনে নিয়েছি। আজ-কালকার ইয়ংম্যান তোমরা ; নাম বলতে জানো কি না দেখলাম।—বলিয়া আমার ধর্ম-ভাই, যাহারা তাস খেলিতেছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া যেন অপরূপ আমাকে লক্ষ্য করিতে ইংগিত করিল ! কিন্তু তাসের ফোঁটার কমি-বেশী লইয়া তখন তাহারা উন্মত্ত—তাহাদের ডাকিয়া মনীশের হাসির জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

পরক্ষণেই মনীশ বলিতে লাগিল,—তুমি বড় না আমি বড় ? দাঁড়াও দেখি। আমার জন্ম—এটা হ'ল প'ইত্রিশ সাল—আমার জন্ম হয় এগারো সালের মাঘ মাসে—এটা হ'ল চত্তির—তুমি জন্মেছ কোন্ সালে ?

জানিতাম না ; বলিলাম,—তা আমি জানিনে।

—জানো না ? কোন্ সালে জন্মেছ তা জানিস নে ? দূর পাগল !—বলিয়া, যেন বালকের ক্ষমার্হ অজ্ঞানতার সস্নেহ তিরস্কার-স্বরূপ মনীশ-দা আমার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলো। তারপর মুখ ঘুরাইয়া তর্জন করিয়া বলিল,—তোরা কি তাস খেলবিই কেবল, না একটু গান-বাজনা করবি ?

একজন বলিল,—এই সেট্টা দিয়ে নি' কালোর ঘাড়ে, দাঁড়াও। তিনি এসেছেন ?

—তিনি কিনি ?

—তোমার সেই খোট্টা ভাই ?

আর একজন মৃদু মৃদু হাসিয়া ফিস্ফিস্ করিয়া বলিল,—চুপ, এসেছে। ঐ যে ব'সে আছে।

মনীশ-দা আমার মুখের দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল—আসিয়া বসিয়া আছি শুনিয়া ওরা সবাই আমার দিকে এক নজর চাহিয়া দেখিল। একজন বলিল,—ও এসেছেন ! আসুন না, আমাদের এক হাত নিয়ে ব'সে খেলুন না।

তাস খেলিতে আমার আপত্তি ছিল, কারণ খেলিতে জানি না ; জানিলেও ঐ মোটা আর ময়লা তাস হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আমি কিছুতেই পারিতাম না। কিন্তু মনীশ-দা-ই আমার প্রকাণ্ড সহায় ; আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিয়া উঠিল,—না, ও খেলবে না। বিদেশ থেকে হাজার কোশ ভুঁই ঠেঙিয়ে এসেছে কি তোদের সংগে তাস খেলতে ! নে, ওঠ।—বলিয়া মনীশ-দা যাইয়া একজনের হাতের তাস কাড়িয়া লইয়া ছাগলটার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিলো ; হারমোনিয়মের বাক্সের উপর হইতে বাঁয়া-তবলা নামাইয়া হারমোনিয়ম বাহির করিয়া দিলো এবং তবলায় এক চাঁটি মারিয়া বলিল,—শুনছ, ভায়া !—বলিয়া তবলার শব্দের দিকে চোখ ঠারিয়া পুনরায় বলিল,—এমন জিনিষ কি আর আছে ?—বলিয়াই আর এক চাঁটি—

—হয়েছে, থাম।—বলিয়া আর একজন তার হাত হইতে তবলা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একটু হেলাইয়া বসাইল।

একজন হারমোনিয়মে সুর দিলো—এবং অনেক কসরৎ আর গালিগালাজের পর হারমোনিয়মের সংগে তবলার সুর বাঁধিয়া যে সংগীত সুরু হইল, তাস-ক্রীড়ার পরিবর্তে সেই সংগীত শ্রবণ করিতে যদি আমি সহস্র ক্রোশ ভূমি ঠ্যাঙাইয়া এখানে আসিয়া থাকি,

তবে মনীশ-দা প্রভৃতি ইঁহারা ছাড়া আর সবাই স্বীকার করিবেন যে আমার মত আহাম্মক আর নাই।

"মলিন স্মৃতি কোণা বাসনে মাখা গো"—গান চলিতে লাগিল ; বসিয়া শুনিতে লাগিলাম, এবং কর্ণে আঙুল প্রবেশ করাইবার উপায় রহিল না। স্মৃতি কোণা বাসনে মাখামাখি এবং তদনুরূপ ও ততোধিক সাংঘাতিক আরো অসংখ্য প্রক্রিয়া ঘটিবার পর সে গান থামিল।

মনীশ-দা হারমোনিয়মের পাশে বসিয়াছিল ; তার চোখ কেবল আমার আর গায়কের মুখের উপর উপর্যুপরি বিচরণ করিতেছিল—দেখো ভাই, গুণীর গুণ—আর থাকিয়া থাকিয়া গুণীর গুণের আনন্দে বাহবা দিতেছিল ; গান থামিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন শুনলে ভায়া ?

নিজে সে তৃপ্তি পাইয়াছে—আমিও বলিলাম,—ভালই শুনলাম।

খুনের দায় এড়াইতেই যেন প্রাণপণ চেষ্টায় কথাটা বলিলাম ; কিন্তু কারো কানে বোধ হয় গেল না; তবলচির সবেগোচ্চারিত অসন্তোষের শব্দে আমার উত্তর ঢাকা পড়িয়া গেল।

—শুনবেন আর কি ! তালকানা গাইয়ে—

অশ্লীল শব্দগুলি উহ্য রাখিলাম। শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। একজন আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল,—ধেৎ।—কিন্তু তাহাতে ওদের হাসির বেগ বাড়িয়া গেল।

আমার মনে হইল, গাইয়ে তালকানা হোক, তার তাল কোথায় কাটিয়াছে জানি না, কিন্তু সংগীতের এই আসরে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণে তাহার তাল কাটে নাই। ইহাদের চুলের ধরণ, কথার ভংগী, বসার কায়দা, চাউনির চেহারা, সবই যেন ভিন্নরুচির লক্ষণযুক্ত।

গায়ক সুরযন্ত্রটা আমার দিকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—দাদার একটা হোক।

সতীশ লণ্ঠন নামাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল ; সে বলিল,—তোমরাই বাবুকে শোনাও ; বাবুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন !—তারপর সে সংগীতের নূতনত্বের অভাবের কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল,—এরা নতুন গান শিখতে তেমন পায় না। রসময় সিকদার ফরিদপুরে উকিলের মুহুরিগিরি করে—দু'পয়সা পায়—বেশ ফুর্তিবাজ লোক ; সে-ই কদাচিৎ কখনো দু'টো একটা নতুন গানের আমদানী করে—আর জামার ঝুল আর মাথার চুল কতটা রেখে কাটতে হবে তাই মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিয়ে যায় !

আমি বলিলাম,—সে-ই ভাল। আপনারাই গান।

—তথাস্তু।—বলিয়া পূর্ব গায়কই আবার গান ধরিতে যাইবে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল। বেড়ার ও-পিঠে একটা ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ উঠিল—তখনই একটি বালক আসিয়া মনীশকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এবং তারপর মনীশ আমার পাশে আসিয়া বলিল,—ওঠো ত', উঠে দাঁড়াও।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনীশ আমার চেয়ার সেই বেড়ার দিকে ঘুরাইয়া দিলো, বলিল,—ব'সো।

বসিলাম। সতীশ আমার মুখের উপর লণ্ঠনের আলো ফেলিল—বেড়ার ওদিকে একটা চাপা কণ্ঠের ধমক শোনা গেল,—এই সর্।—বুঝিলাম, আমাকে দেখিবার অতি আগ্রহবশতঃ অল্পবয়স্কা কেহ প্রবীণাকে অতিক্রম করিতে চাহিতেছে।

দু'মিনিট কি দশ মিনিট এইভাবে গেল জানি না—আমার মনে হইতে লাগিল, আমার মুখের স্বকরন্ধ্রে উত্তপ্ত রক্ত আসিয়া জমিতেছে। ঠাণ্ডা হইয়া যায় দেখিয়া ওদিককার গানের আসর হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—হয়েছে—কত দেখবে! বিয়ের বর ত' নয়।

কিন্তু আমার মনীশ-দা আমার কনুইয়ের ধারেই ছিলেন; বলিলেন,—এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে মেয়েরা তোমায় দেখতে এসেছে। বিয়ের বর তুমি না হ'লে কি হয়, নতুন মানুষ ত'! দেশের মানুষ তুমি—দেখে নাই কোনোদিন—তবু কত ভালবাসে দেখো।

দাদা তাহা দেখাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি দেখিলাম ইহা ঠিক নহে—আমি নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবেই দেখিতেছিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে বুক হিম হইয়া আসিতেছিল। সতীশ লণ্ঠন নামাইল, বোধ হয় হাত টাটাইয়া। মনীশ-দা আবার আমাকে ঘুরাইয়া বসাইল।

আসর হইতে প্রশ্ন আসিল,—এইবার সুরু করতে পারি?

মনীশ বলিল,—পারো।

গান আবার সুরু হইল। কিন্তু আমি ইহাদের সংগ-সেবার আর সংগীতের ভিতর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম তাহার ঠিক রহিল না। আমি মনে মনে ইহাদিগকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও মনের এ-লজ্জাটা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না যে, না জানি ইহারা আমাকে কি ভাবিতেছে।—দ্বিতীয়তঃ স্থূলে কথা আর ক্ষোভের কথা এই যে, পল্লীর সুপ্রসর এবং বাঙ্ময় প্রফুল্লতার যে প্রতিবিম্ব আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়া উপভোগ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া নির্যাতন বোধ করিবার পর তাহা, যাহার দোষেই হউক, নষ্ট হইয়া গেল—এবং সর্বান্তঃকরণ দিয়া আশা করিতে লাগিলাম যে, প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিব, আমার এই বিষণ্ণ বীতস্পৃহা রাত্রিব্যাপী নিদ্রার পর দূর হইয়া গেছে।

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে নয়, সতীশের কাছেই একটু সজীবতা দেখাইতে সতীশকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কত দেরী?

ভাবিয়াছিলাম, সতীশের সংগে পথে দু'চারটি কথার লেন-দেন হইয়া তাহার সংগে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে বেশী; এবং গানের গোলমালের মধ্যেই কথাবার্তা শেষ করিব; কিন্তু সতীশকে আমার কাছে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াই—"ভোমরা, কে তোমারে চায়" এই কলিটির যে ছেপ্‌কা চলিতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

সবাই মহা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—কি বলছেন উনি?

সতীশ আমার গোপন-কথা রাষ্ট্র করিয়া দিলো; বলিল,—জিজ্ঞাসা করছেন কত দেরী আর?—তারপর আমাকে বলিল,—দেরী আর বিশেষ নাই; পিঁড়ি পাতবার আওয়াজ পেয়েছি। অত-শতয় কাজ কি—হাতে পাঁজি মংগলবার—দেখেই আসি।—বলিয়া আমি নিষেধ করিবার পূর্বেই সতীশ দুই লাফে সতরঞ্চি ডিঙাইয়া প্রস্থান করিল।

নিজের নামটা বিশুদ্ধভাবে বলিতে পারি নাই। তার উপর লম্পট প্রকৃতি ভ্রমরের গানটা তৃপ্তিপূর্বক শেষ করিতে না দিবার অপরাধে আরো অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনীশ-দাও আমাকে বাদ দিয়া তাঁহারাই পরস্পর নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন...ছাগলটি পর্যন্ত চোয়াল নাড়িতেছে দেখিলাম, কেবল আমিই ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া আছি।

"মনীশ, ওঁদের নিয়ে এসো। ঠাঁই হয়েছে।" ডাক শুনিয়া ভাবিলাম, বাঁচা গেল—

কথা না হোক, চোয়াল নাড়িবার কাজ পাওয়া যাইবে। মনীশ-দা আমার হাত ধরিয়া বলিল,—এসো ভাই।—বলিয়া আমাকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া সে সর্বাগ্রবর্তী হইল।

ভিতরের উঠানে আসিতেই সতীশ বলিল,—বাবু, এদিকে আসুন—তোমরা ঐ বারান্দায় ওঠো হে।—বলিয়া ডান-হাত ডান দিকে তুলিল।

দেখিলাম, বাঁ দিকে ঢেঁকিশালা; সামনে আর ডানদিকে চৌরী ঘর; উঠানে একটা পেয়ারা গাছ। মনীশকে লইয়া পাঁচজনের আহারের স্থান হইয়াছে ডানদিকের বারান্দায়; আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া সেই বারান্দায় তাহাদের আসন হইতে দূরে নয়, একেবারে স্থানান্তরিত করিয়া ভিন্ন বারান্দায় দেওয়া হইয়াছে। বারান্দার অন্য দিকে ধানের ঢোল, এবং আসনের পাশেই জানালায় একখানা কালো ছাড়া-কাপড় রহিয়াছে। মনীশ বলিল,—তোমাকে বসিয়ে দিয়ে আসি, তুমি আবার লাজুক লোক।—বলিয়া আমাকে হাতীর মত প্রকাণ্ড আর ঢালু পিঠ এক পিঁড়ির উপর লইয়া বসাইয়া দিলো। ছাড়া-কাপড়ের দুর্গন্ধ নাকে গেল। চট্‌পট্ উঠিয়া ওঁরা ও-বারান্দায় বসিয়া গেলেন।

আমার পাশেই ছোট আর একখানা পিঁড়ি ছিল; মনীশ বলিল,—সতীশ, ব'সে যাও।

কিন্তু সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—ও-ঘরের বারান্দায় যাঁরা বসিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—ব'সে পড়ো, উনি অতশত জানে—

স্পষ্টই দেখিলাম, তাহার পাশের লোকটি সত্য সত্যই মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে কথাটা শেষ করিতে দিলেন না।

কিন্তু আমার অজানা কিছুই রহিল না—সতীশের কুল-পরিচয় উঁহারা জানেন, আমি জানি না; হয় তো স্থানাভাববশতঃই আমার না জানার সুযোগে সতীশকে আমার সংগে এক পংক্তিতে নয়, গা ঘেঁসিয়া বসাইয়া দিতে উঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই—অর্থাৎ ফাঁকিতে কাজ সারিবার ইচ্ছা—উহার জাতি নষ্ট হউক, আমাদের তাহাতে কি! কিন্তু উঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া,অব্রাহ্মণ তাঁহাদের আচ্ছাদনের তলদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

জাতিভেদ আর ছোঁয়াছুঁয়ির অপবিত্রতা আমি মানি না; এত মানি না আর সে-বিষয়ে আমি এত নিঃসংকোচ যে, কাহারো জাতি পরিচয় আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই; জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াই কখন মনে হয় না। কিন্তু এখানে প্রীতিভোজনে বসিবার উপক্রমেই এই শ্রেণীবিভাগের ভেদ-সংকট, আর ইহাদের চতুরতা, এমন বিসদৃশ, নির্লজ্জ আর তীক্ষ্ন হইয়া দেখা দিলো যে, সহিষ্ণুতা হারাইয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সতীশ, ক্ষ্যাপাই হউক আর যা-ই হউক, উদ্‌ঘাটিত হইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল—আমি যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া তাহার আসনে বসাইলাম। ও-বারান্দার ওঁরা এবং মনীশ-দা বোধ হয় আমার উত্তেজনা দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। মনীশ-দা ডাকিয়া বলিলেন,—সতীশ বসেছ?—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

যাহা হউক, পরিবেশন সুরু হইয়া গেল। পরিবেশনকারীর অনাবৃত দেহের ধর্ম এবং হাতের বড় বড় নখ ব্যতীত আরো লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, পরিবেশনকারী ঐ বারান্দার দিকেই আগে ছুটিতেছে।

বলিতে গেলে আমিই এই প্রীতি-ভোজের উদ্দেশ্য; বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত আমিই, এবং

আমি আগন্তুক। আমার পাশ দিয়াই পরিবেশনকারী যাতায়াত করিতেছে ; কিন্তু আমার পাত শূন্য এবং আমি হাত তুলিয়া বসিয়াছি দেখিয়া সে দাঁড়াইতেছে না। আমাকে এই পাশ কাটাইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমার দেরী হইল না ; আচারে কখনো পালন করিতে না দেখিলেও জানিতাম যে, ব্রাহ্মণ-ভোক্তা থাকিতে অব্রাহ্মণের পাতের সম্মুখে খাদ্যের পাত্র অবনত করিতে নাই – করিলে নাসিকায় ঘ্রাণ প্রবেশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টি পড়িয়া খাদ্যবস্তু উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়।

এই সূক্ষ্ম ভোগ-বিচার এবং দুস্তর তারতম্য অতি নিদারুণ আঘাত দিয়া আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এই আচরণ আর কোনো অনিষ্ট করিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের চক্ষুলজ্জা হরণ করিয়াছে নিশ্চয়। চক্ষুলজ্জাই নাকি শিষ্টতার এবং শিক্ষার ফলের মাপকাঠি !

আহার্য গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম—কিন্তু এত অরুচির সঙ্গে যে, শঙ্কা জন্মিল হজম হইবে কি না !

ও-বারান্দা হইতে মনীশ-দা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভায়া, চলছে কেমন ?

আমি একটু হাস্যপূর্বক কহিলাম,—চলছে ভালই।

—পাক-সাক কেমন হয়েছে ?

বলিলাম,—এমন আর খাই নাই।

শুনিয়া ওদেরই একজন চুপি চুপি বলিলেন,—রস আছে।—কথা দু'টি আমার কানে গেল।

ব্রাহ্মণগণের কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক বুক্‌নি, অযৌক্তিক তর্ক এবং অপ্রযোজ্য রসিকতা ছাড়া আহার নির্বিঘ্নে শেষ হইল ; কিন্তু আহারান্তে জলের গ্লাস তুলিয়া লইয়া এক চুমুক জল মুখে লইয়াই বিপদে পড়িয়া গেলাম—সে জল গিলিবার সাধ্য রহিল না, ফেলিবার স্থান দেখিলাম না ; কিন্তু গলাধঃকরণই সহজ এবং সদুপায়—জলের গ্লাস নামাইয়া মুখের জল গিলিলাম।

উদরে এই জল প্রেরণের ক্লেশ এবং বিলম্ব মনীশ-দা ওদিক হইতে লক্ষ্য করিতেছিল ; গিলিয়াছি দেখিয়া চতুরতার সহিত হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—কি হ'ল, নীরদবরণ, অমন করছ যে ?

বলিলাম,—জল খেলাম।

—তা ত' দেখলাম—মুখ অমন বেগুনব্যাচা করলে যে ?

যে ব্রাহ্মণতনয় গান গাহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—বেগুনব্যাচা—হি হি হি।

সতীশ বলিল,—জলটা ভাল নয়, কাদার গন্ধ।

—না, না ; ইনিন রোডের টিব্ উইলের পরিষ্কার জল। গন্ধ না ফন্ধ।

—গন্ধ না ফন্ধ।—বলিয়া, যিনি হি হি করিয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় হি হি করিয়া আর এক দফা মজা লুটিলেন।

মনীশ-দা বলিল,— তোমরা পেলে হে গন্ধ ?

ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিলেন,—নাঃ।—বলিয়া সবাই আর এক ঢোঁক জল পান করিয়া জল যে নির্গন্ধ তাহাতে আমারও আর সন্দেহের অবকাশ রাখিলেন না।

আবার আমাকে বাহিরে সেই চেয়ারে আনিয়া বসানো হইল ; কিন্তু তারপরই

কি একটা সমস্যা গুরুতর এবং তার আশু মীমাংসা অপরিহার্য হইয়া উঠিল বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে আর সতীশকে একঘরে করিয়া রাখিয়া, ব্রাহ্মণ সুতরাং ঘনিষ্ঠ পাঁচজন একত্র হইয়া দূরে দাঁড়াইয়াছেন দেখিলাম, এবং তাঁহারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না তাহাও দেখিলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা কি! গল্প শুনিয়াছিলাম, কোথায় তিনজন পথিক বহু অর্থ লইয়া পথ ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় ডাকাতের ভয়ে ডাকাতের বাড়ীতে যাইয়াই অতিথি হইয়াছিল; এবং তারপর সেই গৃহস্থ-ব্যক্তিগণের চোরা-চোরা ভাবগতিক দেখিয়া আর ফিস্‌ফিস্ কথার আওয়াজ শুনিয়া সন্দেহ হওয়ায় কৌশলপূর্বক পলায়ন করিয়া সে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা আর যাহাই হউন, ডাকাত নন এবং আমাকে হত্যা করিয়া আমার ধনরত্ন আত্মসাৎ করিবার পরামর্শ নিশ্চয়ই করিতেছেন না—

মনে হইতেই একটু হাসি পাইল। "মনীশ"—বলিয়া ভিতর হইতে কে ডাক দিতেই—"সতীশ, যেও' না"—বলিয়া মনীশ লাফাইয়া চলিয়া গেল—মনীশের মা বোধ হয় ডাকিয়া লইলেন।

সমগ্র ব্যাপারটা এতক্ষণে এত হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব জানি না। ইহাদের আমি অনিষ্ট ইচ্ছা করি না নিশ্চয়ই, কিন্তু ইহাদের এখনকার সমস্যাপীড়িত বিব্রত চেহারা দেখিয়া আমার কৌতুকের অন্ত রহিল না।

সতীশ বোধ হয় এতক্ষণ আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইবার চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—কৌতুকবশে মনে হইল, দেখি, সতীশের ভাবখানা কি! তাহার দিকে চোখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি উদ্‌গ্রীব—সে আমাকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া বোধ হয় বলিল, "চলুন, পালাই।"

সতীশ ইহাদের কাণ্ড-কারখানা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার ইঙ্গিত ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অব্যবস্থিতচিত্তে বসিয়াই রহিলাম—এবং মনীশ তখন আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল; বলিল,—না ব'লে আর পারলাম না, ভাই। আমাদের ঝি-টা বাইরের ঝি; সে সন্ধ্যে বেলাই চাল আঁচলে বেঁধে নিয়ে পালায়। মা বুড়ো মানুষ আর তাঁর শ্লেষ্মার ধাত; রাত্তিরে চান করলে তিনি রাত্তিরেই ম'রে যাবেন—আর এই দেশটায় এমন ছিঁচকে চোরের উপদ্রব যে, বললে তুমি বিশ্বেস যাবে না—

আমি বলিলাম,—কথাটা কি বলুন না।

—বলি, ভাই। তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ীতে এনেছি, তোমাকে কথাটা বলা আমার খুবই অন্যায্য হবে—বলিয়া মনীশ-দা মাথা চুলকাইয়া একটু হাসিল; কিন্তু চুলকানির সঙ্গে হাসির ভাবের গরমিল দেখা গেল—'

বুঝিলাম, সঙ্গীন কথাটা আসিতেছে। এবং আসিলও ঠিক। মনীশ-দা বলিল,—বাসন ক'খানা বাইরে প'ড়ে থাকলে চোর নিয়ে যাবে। তুমি ত' আমার পর নও, মায়ের পেটের ভাইয়ের মত একেবারে। যদি—

—এঁটো বাসন ধুয়ে যেতে হবে, এই ত' আপনার বক্তব্য? তা দিচ্ছি।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, মনীশের এতক্ষণকার দুশ্চিন্তার ক্লেশ এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া তার মুখের কালি সতীশের মুখে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ বান্ধব-চতুষ্টয় প্রস্থান করিয়াছে। এত দ্রুতবেগে মানুষকে নিশ্চিন্ত হইতে আমি দেখি নাই—দাদার,

পুলকটুকু উপভোগ করিতে করিতে বলিলাম,—এই সামান্য কথাটা বলতে আপনারা এত ইতস্ততঃ করছিলেন কেন! চলুন।

কিন্তু চলা হইল না—মনীশ-দা মুচকি হাসিয়া আমার হাত ধরিয়াছিল; সেই হস্তবন্ধন সজোরে ছিন্ন করিয়া দিয়া সতীশ দাস উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আপনি থাকুন বাবু; আমি যাচ্ছি।

—না, না; আপনি কেন! যার যার তার তার।—বলিয়া সহাস্য লঘুস্বরে প্রতিবাদ করিলাম।

সতীশ বলিল,—আমাকেই ক'রতে হ'ত—আপনাকে বাড়ীতে পেঁছে দিয়ে এসে আমার থালা আর আপনার থালা আমি ধুয়ে রেখে যেতাম; কিন্তু আপনাকে রাখতে গিয়ে আমি যদি আর না ফিরি, এই ভয়েই ওঁদের আর ধৈর্য থাকল না—

আমি অর্ধেক মনে কি ভাবিতে লাগিলাম জানি না; অপর অর্ধেক মন সতীশের কথার দিকে রহিল। সতীশ একটু বিশ্রাম লইয়া বলিতে লাগিল,—আমি ওঁদের সে-কথা বলেওছিলাম; কিন্তু ওঁরা আপনার সামনে আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লেন। তবে এঁটো বাসন ধুয়ে রেখে যাবার কথা ওঁরা আপনাকে বললেও আপনাকে বলেন নাই, বলেছেন আমাকেই। অন্যভাবেও কাজটা হাসিল করা যেত, কিন্তু খুড়োর আমার বুদ্ধি খুব!—বলিয়া সতীশ হাসিল না।

মনীশ কিন্তু সতীশের এত কথার প্রত্যুত্তর করিল না; বলিল,—যাঃ, তা-ই বুঝি! চারজনে তাস খেলছিল দেখলে ত'—ওদেরই একজন, যার বাবুগিরিটা বেশী দেখলে, সেই এক মস্ত চোর। রাত্তিরে বাড়ী বাড়ী বেড়ায়, থালা, ঘটি, বদনা, গাড়ু যা পায় নিয়ে যায়—গোয়ালন্দের হোটেলে বিক্রী ক'রে আসে। ওর ভয়েই ত' আমরা গেলাম। —থালা বাটি বাইরে প'ড়ে থাকলে আর পাবো না।

"তোমার বন্ধু ভাল"—জিহ্বাগ্রে ধিক্কারের কথা দুটি আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিলাম,—আমাদের এঁটো বাসন তখন ছোঁবেন উনি?

—এঁটো! এঁটো ত' সামান্য জিনিষ; কুকুরে বমি ক'রে রেখে গেলে তা ডান হাত দিয়ে নামিয়ে রেখে নিয়ে যাবে। এমন লোক ও!

শুনিয়া ও-বারান্দার ব্রাহ্মণ ক'জনার উদ্দেশে আমার মস্তক অবনত হইয়া গেল।

নিজের এবং আমার উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে সতীশ ভিতরে গেল, বলিতে বলিতে গেল,—ছি, ছি! আমরা থাকতে দিদিমা কেন আমাদের এঁটোয় হাত দেবেন!

মনীশের কথা বোধ হয় ফুরাইয়া গিয়াছিল; সে সতরঞ্চির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—কিন্তু আমার পক্ষ হইয়া সতীশের এই শূদ্রোচিত কষ্ট-বরণের জন্য আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইল না। তার আচরণে কোথায় যেন সুক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলাম; আশা তেমন করি নাই, তবু তাহার উপর রাগ হইতে লাগিল ইহাই মনে করিয়া যে, সে ইচ্ছা করিলেই, আমার আত্মসম্মানে এই আঘাতটা না লাগে সে উপায় সে করিতে পারিত।

উহাদের পরামর্শের বিষয় কি তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল—নতুবা চোখের ইশারায় আমাকে পলায়ন করিতে বলিবে কেন। ঘটনার চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করা তার উচিত হয় নাই। আমার হইয়া ভৃত্যের কাজ করিতে যাইতেছে ইহা আমাকে জানানোই তার একমাত্র অভিপ্রায়। মনে হইল আমার চাইতে এরাই সতীশকে বেশী চেনে, তাই তাহাকে

আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই। সে ফিরিত না নিশ্চয়ই। আমার হইয়া এঁটো বাসন মাজিতে যাওয়ার সঙ্গে তাহার পলায়নের সম্ভাবনা কেমন করিয়া মিলিয়া গেল জানিনা; কিন্তু মনে হইল, সতীশের সম্ভাবিত এবং অনুষ্ঠিত উভয়বিধ আচরণে সামঞ্জস্য আছে। আমার ক্লেশ বা দুঃখ বা সংকট নিবারণ করিতে তার শেষ আগ্রহ অন্য যে কারণেই হউক, আমার সম্মান রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না—ইহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল সতীশের আর একটি কথায়—

সতীশ বাড়ীর ভিতর যখন গেল তখন বলিতে বলিতে গেল,—"ছি, ছি; আমরা থাকতে দিদিমা কেন আমাদের এঁটো বাসনে হাত দেবেন!"

দিদিমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কথাটা বলা হইল—মনের সঙ্গে শেষ রফা ইহাই হইল যে, লোকটা ফন্দিবাজ আর খোসামুদে। ওদিকে তফাতে কুকুরে-কুকুরে কলহ বাধিবার শব্দ পাইয়া বুঝিলাম, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা সুরু হইয়া গেছে।

কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে সতীশ ফিরিয়া আসিল, আমি তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিলাম,—আসি, দাদা।

অন্য কেহ হইলে আমার এই উগ্র পলায়ন-চেষ্টা দেখিয়া আমকে হয় তো রূঢ় মনে করিত; কিন্তু মনীশ-দার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম। মনীশ-দা আমার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—এসো, দাদা; আবার এসো। আমি কাল সকালবেলাই তোমার কাছে যাবো—সে-দেশের গল্প শুনব।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা।

কিন্তু তাঁহার পদার্পণ বাড়ীতে ঘটিবে ভাবিয়া বিশেষ পুলক দেখানো আসিল না।

পুনরায় সতীশকে অগ্রবর্তী করিয়া দিয়া রওনা হইলাম—এবার অন্য রাস্তা। সতীশ বলিল,—নদীর ধার দিয়ে এবার আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি; একটু ঘুর হবে, তা হোক; জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গরমের দিনে আসা ঠিক নয়। এদিকেও পায়ের দিকে চেয়ে আসবেন। 'হাওয়া-খেতে' ওরা বেরোয়, মাঠে-ঘাটে শুয়ে থাকে।

আমি বলিলাম,—আপনার ওপর আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।—বলিয়াই মনে পড়িল, আমার অসন্তোষে উহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি!

কিন্তু সতীশ সে-কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আমার সম্মুখে আসিয়া আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—কেন বাবু, অসন্তুষ্ট হয়েছেন! আমি ত' অপরাধ করি নাই।

আমি তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিলাম,—আপনি তখন পালাতে চাচ্ছিলেন কেন?

—এঁটো বাসন কে ধোয় এখন!

—কিন্তু ধুলেন ত' পরে?

—না ধুয়ে কি করি!

—এ-সব আপনার গা এড়ানো কথা! ওদের পরামর্শ আপনি জানতেন?

—অনুমান করেছিলাম।

—তবে আমাকে না জানতে দিয়েও-ত' আপনি ধুয়ে দিয়ে আসতে পারতেন!

সতীশ বলিল,—সে কাজটা ভাল হ'ত না বাবু। আপনি অতিশয় ভদ্রলোক তা

আমি জানি ! আপনি আমার ঐ কাজটা করার কথা পরে শুনলে মনে মনে কত দুঃখিত হ'তেন আমি যে তা বুঝি—সেটা আমি হ'তে দিতে পারিনে বলেই ঐখানেই আপনার জানার কাজ চুকিয়ে দিয়েছি—আপনাকে গোলেমালে ফেলে এক-রকম বাধ্য ক'রেই বসিয়ে রেখেছিলাম। আপনি জানলেন, সতীশ জোর ক'রে গেল ; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ হ'ল—কষ্টের কারণ নাই। আর একটা কথা, বাবু। যদি বলেন, "প্রসংগটা আমার কাছে তুলতে কেন দিলে তুমি ?"—কিন্তু প্রসংগ তোলা না তোলার কর্ত্তা ত' আমি নই, ওরাই। যে কোনো কায়দায় ওরা আপনাকে জানিয়েই দিত যে, এঁটো বাসন ধুয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার।

—এত আক্রোশ কেন ?

—আক্রোশ কি না জানিনে ; তবে এ গাঁয়ের ধরণই ঐ—শুদ্দুর বামুন-বাড়ী খেলে সে পাতা ফেলে এঁটোয় গোবর দিয়ে আসবে। আমি আপনার থালা যদি আপনাকে গোপন ক'রে ধুয়ে দিয়ে আসতাম, তবে মনীশ সোজাসুজি এসে আপনাকে বলত,—ভাই, তোমার এঁটো বাসন ত' আমরা ধুতে পারিনে, বাসন বাইরে ফেলে রাখতেও পারিনে—সতীশ ধুয়ে দিয়ে গেল।—আপনি তাতে কি কম লজ্জা পেতেন !

—এতে অপমান করা হয় তা ওরা বোঝে না ?

—ওরা বোঝে, কিন্তু যারা ফেলে তারা বোঝে না। ওরা বোঝে বৈ কি ; নইলে এত সংকোচ কেন করবে আপনাকে কথাটা বলতে ! ওরা কি মনে করে জানেন, একবার কেউ যদি এই নিয়মটা ভেঙে দেয় তবে সর্বনাশ ঘ'টে যাবে—বামুন-বাড়ী খেতে এসেছি ব'লে শুদ্দুর সাধারণের হুঁশই থাকবে না, আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠে যাবে। আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন ব'লেই এত কথা বললাম, বাবু ! আরো একটা কথা বলবার আছে—আমার সমাজ আছে না জাত আছে যে, ওদের আমি মেনে চলব ? ওদের আমি কি ধার ধারি ! আমার এঁটো আমি ফেলতাম না, বাবু ; সত্যি কথা যে, ফাঁকি দিতাম। কিন্তু আপনি ছিলেন...তবু ওদের কথায় কেন ফেলব ? আপনি যদি আমাকে আপনার পাশে নিয়ে না বসতেন তবে আপনার খাতিরেও ফেলতাম না। আপনি আমাকে ত' বলতে পারতেন না মুখ ফুটে—এমন কি মনেও সে-কথা ভাবতে পারতেন না, এটা আমি বুঝি। কিন্তু আপনি সজ্জন ; আপনার মান রাখা আমার দরকার। তবে এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে জানতে দেওয়া আমার উচিত হয় নাই ; প্রাণপণ করা উচিত ছিল। শেষে জানলে আপনি দুঃখিত হতেন, কিন্তু এত অপমান-বোধ করতেন না। আপনি অপমানের কথা এখন বললেন, তাতেই আমার আপশোষ হচ্ছে।—আমাকে ক্ষমা করেছেন, বাবু ?

আমি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম,—করেছি।

সতীশ বলিল,—আপনাদের বাড়ীর আলো ঐ দেখা যাচ্ছে ; পিসিমা এখনো জেগে ব'সে আছেন।

আমি হাঁ হুঁ একটা উত্তর দিবার পূর্বেই সাইকেলের ঘণ্টা বাজিবার শব্দ পাইলাম ; এবং আমাদের সম্মুখের দিকে খানিকটা দূর হইতে চীৎকার করিয়া কে একজন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—আরে, যায় কারা ওদিকে লণ্ঠন নিয়ে ?

সতীশ সাড়া দিলো,—আমি সতীশ দাস।

—কথা কও কার সংগে ?

—বাবু আছেন আমার সংগে।

—আরে, বাবুটা কে ? বাবু ত' সকলেই—বাড়ীর বাইরে এলে সবাই বাবু; তুমিও এক বাবু—সেবার মিঞাজান মোল্লার ছেলেটাকে গাড়ীতে দেখে চিনতেই পারি নে, এমন বাবু সেজেছে ! কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে চোদ্দ সিকে খসাতে পারলেই বাবু ! হা হা হা —কথা কও না যে ? কোথাকার বাবু ?

—এখানকারই। নীরদবরণবাবু, বরদাবাবুর ছেলে।

—নীরদবরণ ? বরদাবাবু ? চিনলাম না ত' ! মরুক গে—মিঞাজান মোল্লার ছেলেও এক বাবু !—চলেছ কোথায় ?

সতীশ তার জবাব দিলো না।

—বললে না, চলেছ কোথায় ? দেখতে হচ্ছে ; দাঁড়াও আসি। কই, দাঁড়ালে না ? আমি অমল ডাক্তার।

অর্থাৎ ব্যক্তিটিকে ভুল করিও না ; অপর কাহারো ব্যক্তিত্বের খাতিরে যদি দাঁড়াইতে সম্মতি না থাকে তবু অমল ডাক্তারের কথা তুমি ঠেলিতে পারো না। সতীশ দাঁড়াইল। কাপুরুষতা হইবে মনে করিয়া আমি নিষেধ করিতে পারিলাম না।

সাইকেলের কেরোসিন ল্যাম্পের উপর আমাদের লণ্ঠনের আলো পড়িল—অমল ডাক্তার ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী হইলেন ; বলিলেন,—তাই ত' বাবুটিকে চিনলাম না ত' !

বুঝিলাম, অন্ধকারেই তিনি আমাকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন ; বলিলেন, তুলে ধরো ত' লণ্ঠনটা ; দেখি চিনতে পারি কি না।

কিন্তু ব্যক্তিটি অমল ডাক্তার হইলেও তাঁর এ-অনুরোধ সতীশ রক্ষা করিল না ; জিজ্ঞাসা করিল,—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—আরে, আমার যা কাজ—রুগী দেখতে ! মানী বোষ্টমীর ছেলেটা মরো মরো হ'য়ে উঠেছিল। চিকিৎসা করছিল হারাণ দত্ত। সে হাল ছেড়ে দিতেই আমার ডাক পড়ল—এক ফোঁটা ইপিকা দিয়ে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে রেখে এলাম।—আপনি কার বাড়ীতে এসেছেন ?

আমাকে তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। বলিলাম,—নিজের বাড়ীতেই এসেছি—আমাদের বাড়ী এখানেই।

—বাস ! আরে, এখানে যাদের বাড়ী তাদের চিনতে আমার বাকী নাই। আমি এখানকারই মানুষ—ডাক্তারী ব্যবসা করি। এখানেই বাড়ী ব'লে ফাকি দেবার কি দরকার !

ডাক্তার রাগিয়া গেছেন মনে হইল ; বলিলেন,—ভাববেন না, বুঝতে পারি নাই। ধানের ভাতই খাই। শুনবেন আপনি কে ? আপনি পুলিশের গোয়েন্দা—

সতীশ বলিল,—আসুন তবে ! উনি কিছুদিন আছেন এখানে।

বলিয়া সতীশ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইলাম, ডাক্তারবাবু বলিলেন,—ব'য়েই গেল।—তারপর বলিতে বলিতে গেলেন,—বরদাবাবুর ছেলে, নীরদবরণবাবু ! ফুসু…

## ॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

সতীশ আমাকে নিঃশব্দে দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, এবং আমি ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিলাম, পিসিমা এইমাত্র গ্রন্থপাঠ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আরো দেখিলাম, পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপের শিখা, ঈষৎ কাঁপিতেছে—দণ্ড, দীপ ও আধার, তিনই উজ্জ্বল। দীপশিখাটিকে অতিক্রম করিয়া জানালা দিয়া চোখে পড়িল, চন্দ্রোদয় হইতেছে…প্রদীপের কোলের অন্ধকারে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন খাওয়া হ'ল রে?

জামা জুতা খুলিতে খুলিতে বলিলাম,—এই ত' আমার বিছানা?

—হ্যাঁ।

—তবে আগে শুয়েনি; তারপর বলছি।…খাওয়া ভালই হ'ল—বলিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

—কি কি তরকারী রেঁধেছিল?

—তা মনে নেই, পিসিমা।

—বলিস কি! এই খেয়ে এলি এই মনে নেই! এতই না কি?

—কত যে তা-ও মনে নেই।

—অবাক করলি—

—অবাক হ'য়ে আমিও এসেছি। …এমন স্থানেও নেমন্তন্ন খেতে পাঠিয়েছিলে, পিসিমা; না জানে কথা কইতে, না জানে ব্যবহার!

পিসিমা বিমর্ষ হইলেন দেখিলাম। বলিতে বলিতে আমিও গরম হইয়া উঠিলেও, মোটেই বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না, কোথায় তাদের অপরাধের অসহ্য জঘন্যতা। তাদের ভাষা পরিমার্জিত নহে, ভঙ্গী বীভৎস, আদর অসহনীয়, ইত্যাদি উপলব্ধি, যাহা তখন উপর্যুপরি সংঘটিত হইয়া কেবল চিত্তকে নয়, মস্তিষ্ককেও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না। সেই সুরে কথা কহিয়া আর সেই ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া তাহাদের একটা ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারিতাম, কিন্তু রুচি আর শিষ্টতা আমি কিরূপ চাহি সে-শিক্ষা দিয়া পিসিমাকে আমার স্থানে বসাইব কেমন করিয়া। পিসিমা শুনিলে বোধ হয় আমাকেই ছিঁচকাঁদুনে আহ্লাদে ছেলে মনে করিয়া বসিবেন! তিনি ঐ ধরণের কথা শুনিতেই অভ্যস্ত যে!

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে বল্?

আমি বলিলাম,—তোমরা যে সতীশকে ক্ষ্যাপা বলো তা ভুল; ক্ষ্যাপা সে মোটেই নয়।

—তা হবে। কিন্তু নেমতন্ন খেতে গিয়ে তোর কি হয়েছে বল্।

উচ্ছিষ্ট বাসন মর্দন ও ধৌত করাইয়া লইবার যে প্রস্তাব উঁহারা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া পিসিমার সমক্ষে কিছু ক্রুদ্ধ আস্ফালন করা যাইত; কিন্তু নিজের অপমানের কথা নিজের পিসিমার কাছে বলিতেই লজ্জা করিতে লাগিল। বলিলাম,—সে সব হাসির কথা, পিসিমা!—বলিয়া আমারই মনে হইল, সত্যই উহা হাসির কথা। নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়াই আমার সম্মুখে মনে মনে খর্বতা অনুভব

করিয়া তাহারা কেহ আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে ; কেহ মনে করিয়াছে, সত্যই বুঝি রসিকতা করিতেছে—ইত্যাদি। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা আমার অবজ্ঞেয়।

বলিলাম—খাওয়া ভালই হ'ল, পিসিমা ; তবে ও'দের পাড়াগাঁয়ের কথাবার্তা আমাদের ঠিক পছন্দ নয়।—বলিয়া পিসিমার অম্লান মুখের দিকে চাহিয়া আমি অকপট প্রাণে হাসিতে লাগিলাম এবং হাসিতে হাসিতে হঠাৎ খচ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল আমার নিজের আচরণ। যতই যন্ত্রণাবোধ হউক, আমার অমন করিয়া চলিয়া আসা অশোভন হইয়াছে—মনীশ কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে ; একটি শিষ্টতার বিধি আমি লংঘন করিয়াছি।

পিসিমা বলিলেন,—আমি ত' ভেবে পাচ্ছিলাম না, ওরা তোকে অপ্রিয় কথা কেন বলবে !

—আলো নিভিয়ে দাও পিসিমা।

পিসিমা ও-ধারে কাঠের সিন্দুকের উপর নিজের বিছানা বিছাইতে গেলেন—আমি ইত্যবসরে শয়ন করিয়া এবং চক্ষু মুদিত করিয়া ঝিরঝিরে চৈতি-বাতাসে আরাম অনুভব করিতেছিলাম—দূরে একটা সোরগোলের শব্দে চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছে, পিসিমা শয়ন করিয়াছেন এবং আমার আর আমার শয্যার উপর অশেষ জ্যোৎস্না ঢেউ খেলিতেছে। পিসিমা বলিলেন,—ঘুমিয়েছিস ?

—না।

—চেঁচামেচি শুনছিস ! সতীশের গলা—মেয়ের উপর তম্বী হচ্ছে বোধ হয় !

আমি উঠিয়া বসিলাম ; বলিলাম,—চলো পিসিমা, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি, কি কথা হচ্ছে !

বলিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জ্যোৎস্না বেশ মানাইয়াছে ; পৃথিবীকে নিঃশব্দ আর নিদ্রাতুর করিতে ঠিক এমনি আলোই চাই—প্রখরতর আলো যেন সহিত না ; অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু আর অর্ধেক চাঁদের আলো—বেশ মোলায়েম।

দরজা খুলিয়া আমি আর পিসিমা ঘরের বাহিরে আসিয়া তারপর উঠানে নামিয়া দাঁড়াইলাম। চাঁদের আলো উঠানে তখনো নামে নাই—দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম, ওদিকটায় নিবিড় জঙ্গল। বাঁশের মাথাই সর্বোচ্চে উঠিয়াছে ; তার নিম্নে আম, জাম, নারিকেল, সুপারি গাছের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইয়া আকাশের গম্বুজার্ধ ঢাকিয়া

তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজ সেই জঙ্গলের মাথা পার হইয়া কানে আসিতে লাগিল—কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পিসিমা বোধ হয় বুঝিতেছিলেন ; বলিলেন,—সতীশ তার মেয়েকে শাসাচ্ছে !

—কি ব'লে ?

—শুনতে পাচ্ছিস নে ?

দু' একটা অশ্লীল কথা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহা গোপন করিয়া বলিলাম,—কথা বুঝতে পারছিনে।

—পেরেও কাজ নেই ; তুই আয়। আজ বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। মারছে নাকি মেয়েটাকে !—বলিয়া দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিলেন, এবং আমাকে ঘরে তুলিলেন।

কিন্তু শুইয়া সতীশের কথা ভাবিয়াই আমার চোখে ঘুম আসিল না। পিসিমা বলিয়াছেন, "আজ বড় বাড়াবাড়ি দেখছি"—নিত্য ও নিয়মিতভাবে কুকথা বলিয়া কন্যাকে ভৎর্সনা করিবার কারণ আমাকে সে নিজেই বলিয়াছে ; কিন্তু আজ অতিরিক্ত কারণ দেখা না দিলে সে স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে নাই—এবং সেই কারণটি অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মনীশের প্রতি ক্রোধে আমার রক্ত ফুটিতে লাগিল।

সতীশ বলিয়াছিল, সে যে জারজের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহার অন্তর্দাহ ঠাণ্ডা হয় তার মেয়েকে কুকথা বলিয়া—আজ মনীশের কার্যের ফলে সে নিজের অসহ্য অন্তর্দাহ শীতল করিতে বসিয়াছে এই অর্ধরাত্রে ! এমন করিয়া উদ্‌ঘাটিত আর কেহ বোধ হয় তাহাকে কখনও করে নাই—নিজের কাছে নিজেকে লুকাইবার চেষ্টা তার আর কখন এমন ব্যর্থ হয় নাই। আমার চোখের সম্মুখে সতীশের ক্ষিপ্তমূর্তি ছুটাছুটি করিতে লাগিল—স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম, ভূলুণ্ঠিত আর লম্বমান একটি নারীদেহের উপর সতীশের প্রহরণ মুহুর্মুহুঃ ওঠা-নামা করিতেছে, তার বিরাম নাই ; আঘাতে আঘাতে তার পৃষ্ঠের উপর সারি সারি মাংসরেখা উৎকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—কন্যাকে কন্যা বলিয়া জ্ঞান তার নাই—সে প্রহার করিতেছে নারীকে।

ডাকিলাম,—পিসিমা ?

—কেন রে ?

—একবার সতীশের বাড়ীর ওদিকে গেলে হয় না ?

পিসিমা বলিলেন,—না, দরকার নেই ; সতীশকে ধ'রে রাখবার লোক এসে জুটেছে এতক্ষণ।

কিন্তু মনীশ-দা আর তার সঙ্গীদের স্মরণ করিয়া আমার অসন্তোষ বাড়িয়া গেল ; মনে হইল, তাহারা যদি আসিয়াও থাকে, তবে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আর দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে !

কিন্তু পিসিমার সুর বক্র কেন ! অনিষ্টপরায়ণ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগ পূর্বক নিবৃত্ত করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; পিসিমা বক্রসুরে কথা কহিয়া আমার মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—পিসিমা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলবে ?

—কি কথা ?

—সতীশকে ধ'রে রাখবার লোক এসে জুটেছে তুমি বললে, জোটাই উচিত ; কিন্তু তুমি যেন কথাটা বেঁকিয়ে বললে—কেন ?

পিসিমা বললেন,—তোমার সঙ্গে সে-আলোচনা চলতে পারে না। তোমার গুরু-ভাই মনীশকে শুধিও।

—মনীশ কি করে ?

—ও পয়সার মানুষ ; টাকার কারবার করে। বাপ কিছু রেখে গিয়েছিল ; ও তাকে ঢের বাড়িয়েছে। একশো টাকা ওকে দিলে চার বছরে একশোকে পাঁচশো ক'রে তুলবে।—তা ছাড়া দশ টিন কেরোসিন এনে রেখেছে—খুচরো বেচে ; কাপড় গামছা দু'-দশ জোড়া রাখে ; টাকায় আট আনা গচ্ছা দিয়ে নেহাৎ দায়ে প'ড়ে লোকে নেয়। চাল ডাল মাছের খরচ নেই—ক্ষেতে আর পুকুরে তা হয়। নুন তেলটা কিনতে হয়—তার খরচ আর কত !

শুনিয়া মনীশের উপর আমার অরুচির অন্ত রহিল না। নিজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের ইতিহাস আরো অনেক মানুষের নিজের মুখেই শুনিয়াছি—সুনিপুণ আর অবিরাম শ্রম,

সংগ্রামের আর তপস্যার ভিতর দিয়া মানুষের সেই লক্ষ্মীর বরলাভের কাহিনী শুনিয়া পুলক জন্মে—আত্মোন্নতির সঙ্গে পদে পদে সেখানে আত্মায় কলুষ জমে নাই—কিন্তু এই জলৌকাবৃত্তিধারী লোকটির মনে কোনোদিন বোধ হয় ঘৃণাক্ষরেও দ্বিধা জাগে নাই ; একবার সে ভাবিয়া দেখিতে চাহে নাই, মানুষকে কি দিতেছি, তাহার নিকট হইতে কি লইতেছি ! পরিমাণ ও পরিণাম জ্ঞানহীন, নিরাবরণ এবং অচেতন এমন মানুষ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না।

পিসিমা বলিলেন,—মনীশ একটা আঙুল ছাড়িয়ে দিতে পারে, গায়ের মাংস যদি চাও তা-ও খানিকটে কেটে দিতে পারে, কিন্তু সুদ এক পাই ছাড়তে পারে না ; তার বুলিই এই—তা কি পারি ! ছেলের চেয়ে নাতির উপর টান বেশী যে !—আর একটা সুবিধে ক'রে নিয়েছে বুদ্ধি খরচ ক'রে—মুসলমানকে টাকা দেয় না, দেয় কেবল ছোট জাত হিন্দুকে ; তারা পায়ের ধুলো চেটে বেড়ায়—পারত-পক্ষে ব্রহ্মস্ব ফাঁকি দিয়ে খায় না।

ওদিককার গোলমাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল ; বলিলাম,—গোলমাল খুব বেড়ে উঠছে পিসিমা !

—তা বাড়ুক। তোর তাতে কি ?

—কি কাণ্ড করছে, কে জানে ! তুমি বলছিলে, সতীশ ক্ষ্যাপা ; আমি বলছিলাম, সে ক্ষ্যাপা নয়, কিন্তু—

বলিতে বলিতেই কে যেন ডাক দিলো,—নীরোদবাবু, জেগে আছেন ?

উঠিয়া বসিয়া বলিলাম,—আছি। কেন ?

—শীগ্‌গির আসুন, আমার সঙ্গে।

—কেন ?

—বলবার সময় নাই ; দেরী করবেন না—

—পিসিমা ?

পিসিমা বলিলেন,—যাও—

প্রশ্ন করিয়া লোকটির নিকট হইতে একটি মাত্র জবাব পাইলাম—"গিয়েই দেখবেন।"

তা-ই হোক। লোকটা মাঝে মাঝে দৌড়াইবার উপক্রম করিতেছে দেখিলাম, যেন ডাক্তার আমি—সংকটাপন্ন রোগীর কাছে আমাকে সে লইয়া যাইতেছে।

কোলাহল স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, এই স্ত্রীকণ্ঠের কান্নার শব্দ এবং পুরুষের ভীত চীৎকার স্বতন্ত্র হইয়া কানে আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠ কাঁদিয়া যাহা বলিতেছে এবং পুরুষের কণ্ঠ চীৎকার করিয়া যাহা বলিতেছে তাহার সারাংশ এই যে—খুন করিল ; রক্ষা করো।

পৌঁছিয়াই দেখিলাম, ব্যাপার গুরুতর, সমূহ বিপদ উপস্থিত, এবং যে কারণে আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। বারান্দায় একটা লণ্ঠন ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিতেছে ; তাহার আলোকে দেখিলাম, সেই ঘরের বারান্দায় একটা কাঠের খুঁটির সঙ্গে হাত-পা বাঁধা মনীশ-দা সতীশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, তার ঢেউ খেলানো চুলে ঢেউ নাই, এবং সতীশ তার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে—সতীশের ডান হাতে বেতের ছড়ি এবং বাঁ-হাতে

রাম-দা—চেহারা সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে, যেন নরবলি সে দিবেই—আর, তাহার ত্রিসীমানায় যাইতে সাহসী না হইয়া অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; এবং পূর্বোক্ত মর্মে চীৎকার করিতেছে।

আমাকে এখানে আনয়ন করার উদ্দেশ্য মনীশ-দাকে উদ্ধার করা। মনীশ সম্পর্কে আমার গুরু-ভাই; কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছি; সতীশ আমাকে খাতির করিয়াছে, তাহাও জনরবে জানা গেছে—সুতরাং সতীশ কর্তৃক সৃষ্ট মনীশের এই সংকটে সতীশকে শান্ত করিয়া মনীশকে বন্ধনমুক্ত করা আমারই কাজ। মনীশের অপরাধটা কি তাহা অনুমান করিয়া লইলাম। মনীশ-দার পৃষ্ঠদেশ ওদিকে অন্ধকারে ছিল বলিয়া বেতের চিহ্ন দেখিতে না পাওয়ায়, শাস্তি কতদূর প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না—কিন্তু সেখানে রক্তের চিহ্ন চোখে না পড়ায় অনুমান করিয়া লইলাম যে, রাম-দা হাতেই আছে, ব্যবহৃত হয় নাই।

সতীশকে দেখিলাম, সে যেন বেহুঁশ হইয়া মনীশের দিকে চাহিয়া আছে। লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া সতীশ যে পুরমহিলাবৃন্দকে আমার মুখাবলোকন করাইয়াছিল, মনীশের মা সেই দলের ভিতরে ছিলেন বোধ হয়, অথবা আহারে বসিলে দেখিয়া থাকিবেন; আমাকে চিনিতে তাঁর কষ্ট হইল না—আমাকে তিনি লজ্জাও করিলেন না—পুত্রের প্রাণভয়ে আলুথালু হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং পুত্রজ্ঞানে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাবা, আমার মনীশকে বাঁচাও।

কে একজন দূর হইতে বলিল,—সতীশ, ঐ দেখো, বাবু এসেছেন।

কিন্তু সে মন্ত্রে সতীশের হুঁশ ফিরিল না; আমি বলিলাম,—কি করেছেন উনি?

মনীশের মা বলিতে লাগিলেন,—তা আমি জানিনে, বাবা! তোমরা ত' সে-ই খেয়ে-দেয়ে গেলে; তারপর মনীশ খানিকক্ষণ হারমুনি বাজালো—তারপরেই শুনতে পেলাম, সতীশ চেঁচাচ্ছে তার বাড়ীতে, যাচ্ছেতাই মুখ খারাপ ক'রে।

ঘটনার এইটুকু বলিয়াই তিনি থামলেন। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার হইল না; এ-ব্যাপারের ব্যাখ্যা অতটুকু কিছুতেই নহে। আমি অগ্রসর হইয়া সতীশের কাঁধের উপর হাত রাখিলাম; দর্শকগণের কোলাহল থামিয়া গেল।

আমার স্পর্শে কাজ হইল দেখিলাম; সতীশ চকিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বাবু!—বলিয়া সে বাঁ-হাতের রাম-দা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপর পা দিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু হাতের বেত নামাইল না।

আমি বলিলাম,—কি করছ এ?

সতীশ বলিল,—কিছুই করছিনে! গুণে সাত-ঘা ওকে মেরেছি; আরো মারব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি; ইতিমধ্যে আপনি এসে হাজির হয়েছেন।

তার গলার আওয়াজ শুনিয়া আমার ভয় ভয় করিতে লাগিল—সে যেন আমাকেও হিংস্র চক্ষে দেখিতেছে। পরক্ষণেই সতীশ হাতের বেত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল,—বাবু, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, গরম হ'য়ে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি। ক্ষমা করুন।

আমি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম,—বেশ। ব্যাপারটা কি বলো দেখি।—বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মনীশ আমার দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া আছে—তার তখনকার চেহারার সদৃশ চেহারা অন্যত্র দেখিয়াছি মনে হইল, কিন্তু কোথায় কি অবস্থায়, এবং তাহা মানুষের কি ইতর প্রাণীর তাহা মনে করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, সে করুণনেত্রে চাহিয়া আছে, এবং তাহার মা তাহার দিকে গুটি গুটি অগ্রসর হইতেছেন দেখিলাম। সতীশও দেখিয়াছিল ; বলিল,—বাঁধা থাক, খুলে দিও না ; এগিয়ে যাচ্ছো কি ! বাবুর কাছে সব কথা বলি ; বাবু যদি বলেন, আরো সাত-ঘা মারা দরকার তবে মারব ; মেরে বাঁধন আমি নিজেই খুলে দেবো। সরে দাঁড়াও।

মনীশের মা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ; হুকুম শুনিয়া চমকিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। সতীশ বলিতে লাগিল,—ধীরে সুস্থে কথাটা বলতে পারলেই ভাল হ'ত ; কিন্তু সে সময় এখন নাই ; সমস্ত রাত তা হ'লে ঠাকুরকে দড়ি-বাঁধা থাকতে হয়।—বলিয়া সে মনীশের দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ একটি কটাক্ষ করিল।

বলিতে লাগিল,—বাবু, আপনার কাছে নানা দিক থেকে লজ্জায় একেবারে ম'রে গেলাম। আমার মেয়েকে আমি কটুকাটব্য করি, তাতে ওর কেন পোড়ে ওকে জিজ্ঞাসা করুন ত' !

জিজ্ঞাসা করিলাম না। দা আর বেত নামাইয়া সতীশকে শান্তকণ্ঠে কথা কহিতে শুনিয়া মনীশ বোধ হয় সাহস পাইয়াছিল ; সে বাঁশের খুঁটি আর দড়ির বাঁধনের ভিতর হইতে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল,—উঁঃ ; জিজ্ঞেসা করুন ত' ! করেছি কি হে আমি ?

সতীশ বেত তুলিয়া লইয়া চটাস করিয়া মাটিতেই মারিল ; প্রত্যুত্তর এবং ইঙ্গিত পাইয়া মনীশের হঠাৎ বিক্রম নিরস্ত হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—আমি আর কি জিজ্ঞাসা করবো কাকে। ও'র মা রয়েছেন, উনি নিজে রয়েছেন, আরো কে কে সব রয়েছেন—ও'দের সামনেই বলো তুমি।

সতীশ খানিক ঘাড় গুঁজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল,—বাবু আপনি বুঝেছেন—

আমি বলিলাম,—এ'চেছি কতকটা ; কিন্তু উনি কতদূরে পাপী তা আমার জানা নেই।

সতীশ চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যেন গা-ঝাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—আমার মেয়েকে ও নষ্ট করবার চেষ্টায় আছে।

ওদিকে কে হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া একটু হাসিল ; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিসে বুঝলে ?

—আমার মেয়েকে আমি ডেকে কথা বললেই ও এসে দাঁড়ায় ; আমাকে কি বলে তার ঠিক নাই—ঠাণ্ডা করেন আমাকে ! আর মেয়ের দিকে আড়ে আড়ে চান—আমি বুঝিনে কিছু ?—বলিয়া সতীশ মনীশের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন, সে বোঝে কি না দেখো।

পিসিমার ইঙ্গিত সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন আসিল,—এই মাত্র ?

কিন্তু মুখে বলিলাম,—তার সাজা যথেষ্ট হয়েছে—এখন ছেড়ে দাও।

সতীশ উঠিয়া ধীরে ধীরে তার হাতের বুকের বাঁধন খুলিয়া দিতে লাগিল। হুঁ হুঁ করিয়া যে ব্যক্তি হাসিয়াছিল সে-ই বোধ হয় বলিল,—গরুড়, গরুড়।

আর একজন বলিল,—"যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি।"

মনীশ বারান্দা হইতে লাফাইয়া নামিয়াই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং দেখিতে দেখিতে সতীশের আঙিনা নির্জন হইয়া কেবল আমি আর সতীশ রহিলাম।

চন্দ্রোদয় পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু সতীশের উঠানে তার আলো প্রবেশ করে নাই—আভা পড়িয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু লণ্ঠনের তীব্রতর আলোকে তাহা লক্ষ্য হইল না। মানুষকে বাঁধিয়া মারিবার উল্লিখিত হেতুটাকে অত্যন্ত দুর্বল এবং কাট্য মনে হইয়াছিল ;

কিন্তু অল্পে অল্পে আমার দৃষ্টি গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল। মনে হইয়াছিল, আপন কন্যাকে অযথা যথেচ্ছ ভাবায় ভর্ৎসনা করিবার অধিকার সতীশের নাই, এবং কেন সে তাহা করে তাহা জানা থাকিলেও সতীশের কার্যের প্রতিবাদ করিবার অধিকার মনীশের আছে—আমিই মনে মনে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছি। সতীশেরই অন্যায়—কিন্তু মনে মনে খুশী না হইয়াও পারিলাম না যে, তার ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন দিয়া মনীশ তাহার সম্মুখে না আসিয়া পড়িলে, মনীশকে সে যে-শাস্তি দিয়াছে, কন্যাটিকে সে তাহাই দিত।

চারিদিকে চাহিয়া মেয়েটিকে কোথাও দেখিলাম না; দেখিলাম, আমরা ছাড়া আর একটি লোক সেখানে আছে—ওদিকে একটা গাছের নীচে খুব অন্ধকার একটা স্থান খুঁজিয়া লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কি প্রয়োজনে তাহা বুঝিলাম না। লণ্ঠনের আলো চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়াছে—চৌকাঠের ও-পিঠে মানুষের যে আশ্রয়স্থলটি ছিল তাহা যেন অন্ধকারে বুঁজিয়া গেছে; যদি কেউ তাহার ভিতর থাকে তবে সে বোধ হয় নিঃশ্বাসের বাতাস পাইতেছে না।

মেয়েটি ওখানেই আছে—কিন্তু সে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, না মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে—হাসিতেছে, না কাঁদিতেছে!

বলিলাম,—সতীশ, আমি যাচ্ছি।

সতীশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো,—যাবেন! কার সঙ্গে যাবেন! ওখানে ব'সে কে রে?

—আমি।—বলিয়া লোকটি অন্ধকারের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল।

সতীশ বলিল,—তুই ব'সে রয়েছিস যে?

—দেখি, আর কি হয়।—বলিয়া লোকটি হাসিল।

—যা যা, বাবুকে বাড়ীতে পেঁছে দিয়ে আয়। চিনিস ত'?

—চিনি।

রওনা হইলাম। সতীশকে শাসন করিবার অধিকার আমার নাই; তাই বাধ্য হইয়া একটু হাসি ভাসাইয়া তুলিলাম—যার পিতামহী অসতী ছিল, তার স্ত্রী-কন্যা অসতী হইবেই—এমন কাণ্ডজ্ঞান অদ্ভুত বটে! আত্মগ্লানি নিয়ত প্রধূমিত হইতেছে, হউক; তাহাকে সর্বব্যাপী করিয়া তুলিতে লোকের প্রয়াসের শেষ আর শ্রান্তি নাই—এবং যে-নারীকে বিশ্বাস নাই তাহাকেই প্রলুব্ধ করিবার ইচ্ছায় লোকে ঘোরাফেরা করিতেছে এরূপ কল্পনা পাগলেরই যোগ্য। পিসিমা বলিয়াছিলেন, সতীশ ক্ষ্যাপা—আমি বলিয়াছিলাম, সতীশ ক্ষ্যাপা নয়—কিন্তু এখন মনে হইল, পিসিমাই ঠিক।

দেখিলাম, জ্যোৎস্না আরো ফুটিয়াছে; গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া ডাঙিয়া মাটিতে পড়িয়াছে—সাপের ভয়ে পায়ের দিকে তাকাইয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে বাড়ী ফিরিলাম।

পিসিমা জাগিয়া ছিলেন; দরজা খুলিয়া দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে?

—মনীশকে খুঁটিতে বেঁধে সতীশ চাবকেছে।

—কেন?

—মেয়েকে কি বলছিল, মনীশ গিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিল।···বড় ঘুম পাচ্ছে, পিসিমা; কাল সব বলব।

আমি ঘুমাইব, ইহাতে পিসিমার আপত্তি থাকিতেই পারে না।

## ॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

চোখের উপর দিনের আলো পড়িয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পিসিমার বাসি কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। "মুখ ধো"—বলিয়া পিসিমা যে-দিকে চাহিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এক টুকরা কাঠের কয়লা আর এক ঘটি জল বারান্দায় রাখা আছে।

মুখ ধুইতে বসিয়া গত দিনটা, সমগ্রভাবে নহে, ঘটনায় ঘটনায় দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া মনে পড়িতে লাগিল—তার কোনো কোনোটি স্থূল-সূক্ষ্ম স্নায়ুজালে পরস্পর বিজড়িত হইয়া এমন সজীব আর দুরূহ যে, মনে মনে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একদিনের অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষ চিরদিন চিন্তা করিতে পারে।

কিন্তু আজকার প্রভাতও সুপ্রভাত নহে। পিসিমা বলিলেন,—ঢেঁকি-ঘরের উনুন জ্বালাব রে?

হাসিয়া বলিলাম,—জ্বালো।

পূর্ববৎ ঢেঁকির উপর বসিয়া চা খাইতেছি এবং পিরুর কথা মনে আসিয়াছে, এমন সময়ে স্তোত্রাবৃত্তির সুরগুঞ্জন শোনা গেল—তারপরই যিনি অন্তঃপুরে দর্শন দিলেন তিনি ব্রাহ্মণ—হাতে তাঁর ফুলের সাজি; পূজার ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া এই পথেই বোধ হয় ফিরিতেছিলেন; ফিরিবার পথে সম্ভবতঃ বার্তা লইয়া যাইবেন—কিন্তু তিনি ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া আছেন কেন বুঝিলুম না।

—বৌমা কই গো?

—এই যে বাবা।—বলিয়া সাড়া দিয়া পিসিমা শশব্যস্তে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন; হাসিয়া বলিলেন,—কি খবর, বাবা? বহুদিন পরে বাড়ীতে পায়ের ধুলো পড়ল।—বলিয়া পিসিমা গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

—এতদিন ত' শীতের বেলা ছিল—পূজা-আহ্নিক সারতেই বেলা তিন প্রহর হ'য়ে যেত। তারপর খেয়ে-দেয়ে উঠতেই সন্ধ্যে—খবর নিই কখন। ভাল সব?

—ভালই, বাবা।

—শুনলাম, তোমার ভাইপো এসেছে; কই সে?

আমার চা পান শেষ হইতে তখনো ঢের দেরী; অর্ধসেবিত চায়ের দিকে চাহিয়া এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রসভঙ্গে আমার বিরক্তির সীমা রহিল না। পিসিমা বলিলেন—আছে ওদিকে। নীরোদ, এদিকে আয় রে।

পেয়ালা ঢেঁকির উপর নামাইয়া রাখিয়া মুখ মুছিয়া বাহির হইলাম।

পিসিমার বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওটা ঢেঁকি-ঘর না?

—হুঁ।

—ওখানে ও কি করছিল?

পিসিমা বলিলেন,—চা খাচ্ছিল।—বলিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, যেন নিতান্ত স্নেহের দায়ে পড়িয়াই তিনি আমার অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন!

আমার দিকে চাহিয়া ঠাকুর আমার রূপ এবং বোধ হয় সংকোচের মৃদুতা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন; বলিলেন—বেশ ছেলে। প্রণাম ঐ ওখানেই রাখো—ছুঁয়ো না।

ছুঁইয়া প্রণাম করিবই তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন জানি না—কিন্তু প্রণাম আমি ঐ ওখানেই রাখিলাম, অর্থাৎ ঠাকুরের পাদমূল হইতে আড়াই হস্ত দূরে! প্রণাম গ্রহণে স্পৃহা দেখাইয়াছিলেন: কিন্তু প্রণাম পাইয়া ঠাকুর হাত তুলিলেন না, মাথা নোয়াইলেন না, যেন ঋণী ছিলাম, ঋণ আদায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আশীর্বাদ তিনি করিলেন, ফলিলে একদিন রাজচক্রবর্তী এবং ভবিষ্যতে অমর হইব। ঠাকুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করো তুমি?

—এবার আই. এ. দিয়েছি।

—বেশ। আজ দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে তুমি প্রসাদ পাবে, বুঝলে?—বলিয়া ঠাকুর-মহাশয় মুখ স্মিত করিয়া তুলিতেছিলেন; কিন্তু আমার উত্তর শুনিয়া দ্যুতি নিবিয়া গেল; আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম,—প্রসাদ আমি পাবো না; যদি বলতেন, আমার বাড়ীতে তোমার আহারের নিমন্ত্রণ রইল, যেয়ো, তা হ'লেও বলতাম, যাবো না।

গত সন্ধ্যার সেই উচ্ছিষ্ট-মার্জনা লইয়া যে সংকটের উদ্ভব এবং যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, মনীশের প্রহারলাভে তাহার সমাপ্তি এবং সমাধান ঘটিয়াছে কি না তাহারই ঠিক নাই—আবার ব্রাহ্মণ-বাড়ী! আমার ভিতরে এত বাষ্প সঞ্চিত হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই—ঠাকুর "ছুঁয়ো না" বলিতেই তাহা ধূমায়িত হইয়া প্রসাদ পাইবার কুপ্রস্তাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ঠাকুর লাল হইয়া উঠিলেন। পিসিমা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—পাগল, বললি কি! ক্ষমা চা শীগ্‌গির।—বলিয়া তিনি, ঠাকুরের পা যেখানে মাটি স্পর্শ করিয়া ছিল, আঙুল দিয়া সেই স্থানটা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু ঠাকুরের পদতলে পতিত হইয়া আমি ক্ষমা চাহিলাম না। বলিলাম,—কাল রাত্তিরে বামুন-বাড়ীতে যে প্রসাদ পেয়েছিলাম সে পাওয়ার জের এসেছে মারামারি পর্যন্ত; মনীশকে খুঁটিতে বেঁধে সতীশ মেরেছে তার কারণ ঐ প্রসাদ পাওয়া।

বলিতে বলিতে আমি কেমন রুখিয়া উঠিতে লাগিলাম; না থামিয়াই বলিতে লাগিলাম,—আমার এঁটো-বাসন ওরা মাজাতে চেয়েছিল আমাকে দিয়েই। সতীশ ভদ্রলোক, আমাকে তা করতে দেয়নি; নিজের থালা আর আমার থালা মেজেছিল সেই, সেই আক্রোশেই মেরেছে তাকে। বামুনবাড়ী পেসাদ পেয়ে এঁটো-বাটন ধোবার ইচ্ছে আমার নেই।—বলিয়া পূর্ববৎ সেই আড়াই হস্ত দূরে একটি প্রণাম রাখিয়া ঢেঁকি-ঘরের দিকে চলিতে সুরু করিলাম।

শুনিলাম, পিসিমা বলিলেন,—জ্ঞান বুদ্ধি ত' পাকেনি তেমন! কাকে কি ব'লে গেল যা-তা!—শোন—শোন।

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। ঠাকুর বলিলেন,—যা-তা বলে নাই, মা, ঠিকই বলেছে। ব্রাহ্মণের আচরণ দেখে ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি রাখা কঠিন হ'য়েই উঠেছে! ডাকো ত' ওকে—বুঝিয়ে ব'লে যাই। নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে, তা আর করবো না। কিন্তু আমাদের বলবার ফরম্ ঐ; সত্যিই ওকে পাতের এঁটো দিতাম না; সেটা ওকে ব'লে ক্ষমা চেয়ে যাই।

আমি চোখের উপর থাকিতেও দ্বিতীয় বচনের পরিবর্তে ঘৃণাসূচক সর্বনাম শব্দ ব্যবহারকরতঃ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্য যেন ফুঁপাইয়া উঠিয়া শেষ করিলেন। মনে হইল, নিমন্ত্রণ করিবার ঐ ফরম্-এর প্রচলন সুষ্ঠু হয় নাই—এবং চির-যথেচ্ছাচারী প্রভুশক্তি অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইয়া শেষ সম্বল অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছে।

পিসিমার ডাকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় তাঁহারই সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম; ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি ক্ষমা চাইবে না জানি; তুমি একের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিলে অপাত্রের উপর।

আমার তখন উত্থিত ও জাগ্রত অবস্থা—ঠাকুরের সম্মুখে পিসিমার অস্বস্তি দেখিয়া আমার রাগ আরো বাড়িয়া গেছে; বলিলাম,—আমার দোষ নেই তাতে। আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে—আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কি না জানিনে—আপনি তা করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ-বাড়ী খেতে যাবো না। এক চালের নীচে আমি দূরে ব'সে খেলে আপনাদের জাত যায়! আপনি বললেন, একের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমি অপাত্রের উপর নিয়েছি—সে-কথা আমার দিক থেকেও সত্যি। কবে শূদ্র অপবিত্র ছিল জানিনে, কিন্তু আমি আপনাদের কারু চাইতে দেহে-মনে কম পবিত্র নই; আপনারা না জানলেও অন্তর্যামী তা জানেন।

বলিয়াই মনে হইল, কি বৃথা বকিতেছি! ঠাকুরের মুখে বিকারের লক্ষণ ত' কিছুই দেখিতেছি না! আমাকে চকিত করিয়া ঠাকুর হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেনো না।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের পাল্লায় তুমি পড়ো নাই; কিম্বা এখন পড়িয়াছ, কিন্তু তিনি অপরিসীম সহিষ্ণু বলিয়াই তাহার তাপ পাইলে না।

ব্রাহ্মণকে চিনিবার কথায় হঠাৎ মনে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হরিশ-ঠাকুরের ছেলে ভারতকে চেনেন?

দেখিলাম, ঠাকুরের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল; পিসিমা বলিলেন,—উনি ভারতের পিসতুতো ভাই!

ঠাকুর পিছন ফিরিলেন; খড়মের পটাস্ পটাস শব্দ উঠিল—ঠাকুর প্রস্থান করিলেন।

এমনি অপ্রীতির ভিতর দিয়া দিনের যাত্রা সুরু হইল।

পিসিমা অচল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; চিন্তিতমুখে বলিলেন,—দ্বারিক-ঠাকুর বড় দুঁদে লোক রে—কি করবে কে জানে!

—কিছুই করবেন না, পিসিমা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। "নির্বিষ খোলস"—বলিয়া দ্বারিক-ঠাকুরের চেহারাখানা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিলাম—মুখখানা গোল, নাক প্রকাণ্ড, চওড়া তেমন নয়, বেশী উঁচু; চোখ খুব বড়, কোণ লাল; যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময় দুই কানে যে ছিদ্র করা হইয়াছিল তাহা বুজিয়া যাইবে ভয়ে সেই ছিদ্রে দু'টি তামার অঙ্গুরী পরাইয়া রাখিয়াছেন; অধরোষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, বুকের মধ্যস্থলে লোম নাই, চুলগুলি খুব খাটো আর চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি নাই—এক কথায় ঠাকুরের চেহারা দেখিয়া আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই। পিসিমা চিন্তিত হইয়াছেন—লোকটা দুর্ধর্ষ, অনিষ্ট করিতে পারে। ধোপা, নাপিত আর হুঁকা বন্ধ করা ছাড়া উঁহারা মানুষের আর কি অনিষ্ট করিতে পারেন ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে ফাঁকা নদীর দিকে চাহিয়াই চমৎকৃত হইয়া গেলাম।

চৈত্র মাসেও এখানে শিশির পড়ে দেখিলাম; আকাশের প্রান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া

আছে, নিকটের ক্ষেত্রের তৃণ সিক্ত। কিন্তু আমি চমৎকৃত হইলাম, চৈত্রের শিশির বা কুয়াশা দেখিয়া নয়, তার উপর বালরৌদ্রের চাক্‌চিক্য দেখিয়াও নয়—দেখিলাম, এই সবের ভিতর দিয়া নদীতীরের আল-পথ ধরিয়া চলিয়াছে মনীশ-দা আর সতীশ দাস—মনীশ-দার ডান-হাত সতীশ দাসের ডান কাঁধের উপর।

সময়টা প্রাতঃকাল ; জাগিয়াই আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্দেহ হইল কল্যকার ঘটনায় ; কাল অর্ধরাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল, না খেলা ! আমাকে কি একটা তামাসা দেখাইয়াছিল !

যা-ই হোক, উভয়েরই পোষাকে একটু জাঁক দেখিলাম—চৈত্র মাস বলিয়া মনীশের পায়ের বিচিত্রবর্ণ মোজার বাহার আরো খুলিয়াছে। অত বড় কঠিন অভিযোগের আসামী-রূপে গ্রেপ্তার করিয়া যাহাকে বেত মারা হইয়াছিল, লজ্জায় না হোক, গায়ের ব্যথায় সে রাত্রে তার ঘুম হইবারই কথা নয় ; কিন্তু মনীশের রাত্রি অনিদ্রায় কাটে নাই তাহা তাহার এখনকার ফুর্তি দেখিয়া শপথ করিয়াই বলা যাইতে পারে—সুখ-স্বপ্নও দেখিয়াছিল বোধ হয়, এবং রাত্রের সুখে প্রাতঃকালেই সুখের সাথীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

ভাবিলাম, ডাকি—কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না ; কেবল চক্ষু দু'টি নিষ্পলক হইয়া মনীশের মোজা জোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃশ্য বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল—এবং সেইদিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, পিরু দাস সেইদিক হইতেই আসিতেছে। সে সেই বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে বাহির হইল।

মনীশ-দা আর সতীশ দাসের সঙ্গে পিরুর সাক্ষাৎ হইয়াছে নিশ্চয়ই—ডাকিয়া 'তত্ত্ব' লওয়া যাক, মনে করিয়া পিরুর আসিবার রাস্তার মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইলাম। পিরু আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়িই করিল—এবং সে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—মনীশ আর সতীশের সঙ্গে দেখা হ'ল তোমার ?

পিরু বলিল,—হ'লই ত'। আপনি ওদের চিনে ফেলেছেন।

—চেনা হ'য়ে গেছে ! ওরা গেল কোথায় জানো ?

—শুধোলাম, তা বলল, মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। মনীশের বিয়ে এই বৈশেখে ; একেবারে পাকা কথাবার্তা ক'য়ে আসতে গেল।

আমি আমোদ পাইয়া পিরুকে আহ্বান করিলাম,—এসো, ব'সে গল্প করিগে ! তুমি কাজে বেরোয়নি ত' ?

—না, বাবু ; আমি আর জরুরী কাজে বার হইনে—ছেলেরা উপযুক্ত হয়েছে। আপনার ইচ্ছে হয়েছে, চলুন—বসিগে।

পিরুকে আনিয়া বসাইলাম, বলিলাম,—পিরু, আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি !

—কেন, বাবু ?

—ওদের গলাগলি প্রণয় দে'খে।—বলিয়া আমার নিমন্ত্রণলাভ হইতে মনীশের বেত্রলাভ পর্যন্ত সমুদয় ঘটনা একে একে পিরুকে শুনাইলাম।

শুনিয়া পিরু চপলমতি বালকের মত খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—এটা সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে ?

পিরু বলিল,—অসম্ভব কিছু নাই, বাবু। এত বয়েস হ'ল—কত যে দেখলাম, বাবু, তার অন্ত নাই; যা কখনো হয় নাই, তা-ই হচ্ছে চিরটাকাল—কেমন ক'রে হ'চ্ছে তা জানিনে; তবে যা সম্ভব ব'লে ভেবে রাখি, উল্টে গিয়ে তার অসম্ভবই ঘটে যায়। কিন্তুক, আমি মনে মনে ভেবে দেখছি, বাবু, যা হবার নয় তা-ই হয় ব'লেই, আমরা শোক পাই, দুঃখ পাই, আবার সুখও পাই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা-ই।—ওদের কথা সুধোচ্ছিলেন, কিন্তু ওদের ভাব হয়েছে গরজে। মনীশ করে নাই, কিন্তুক তার কথায় তার মা এসে করেছে। ভিন্ গাঁয়ে মেয়ে দেখতে যাবার কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল; সতীশ চালাক-চতুর লোক—সে-ই সঙ্গে যাবে—এ পর্যন্ত আমি শুনেছিলাম। কিন্তুক তারপরই আপনি যা বললেন তা ঘ'টে গেল—কাজেই মনীশের আর মনীশের মায়ের বিপদ হ'ল ভারি! আর কারু উপর অদের বিশ্বাস নাই। সতীশ কথাবার্তার ভুল শুধরে দেবে, ওদিকে অল্প-বিস্তার খানসামার কাজও করিয়ে নেবে—বন্ধুভাবেই ধরুন, কিন্তুক এমন ধারা কাজের লোক সে ছাড়া গাঁয়ে আর নাই। মনীশের মা দেখলো, সতীশ না হ'লে বুঝি বিয়েই ফ'স্কে যায়, তখন মায়ে-পোয়ে পরামর্শ ক'রে মা গিয়ে সতীশের হাত ধ'রে বাপু-বাছা ব'লে রাজি করেছে। আবার সতীশের কথাও বলি—সে একটু পেটুক ধরনের লোক। সে-ও দেখল, মারধোর যা করবার তা করেছি; এখন যদি ওদের চেষ্টাতেই মিটে যায় তাতে অপমানী কিছু নাই; আর কুটুমবাড়ীর ভাল-মন্দ খাওয়াটা যদি উপরি পাওয়া যায় সে ত' ভালই।

—কিন্তু মনীশ?

—মনীশ কি!

—সে কেমন ক'রে একেবারে কাঁধের ওপর হাত তুলে দিলো!

পিরু একটু হাসিল; বলিল,—তারই যে বিয়ে, বাবু! কাঁধে হাত ত' অল্প কথা; সে সতীশের পায়ে ধরেছে কি না শুনোন! এদিকের লোক, বাবু, সেকাল থেকে বিয়ে-পাগল। বিয়ের লালসে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—এ ত' বেতের জ্বালা—সামান্য জিনিষ! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা সামান্য জিনিষ কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আমি বলিলাম,—হ্যাঁ, সামান্য জিনিষ বৈ কি!

—না, বাবু, সামান্য জিনিষ নয়—বিয়ের লালসে সামান্য হ'য়ে গেছে। ওদের মনে ঘেন্না নেই, বাবু। সুদ আদায় করতে যেয়ে চাষাভুষোর কাছে ঠাকুর যে-কথা শোনে তাতে ও-র দিনে তিনবার গলায় দড়ি নেবার কথা; কিন্তুক, ও তা নেয় না; বলে, বেড়ালে হেগেছে ব'লে ধান ফেলব? কিন্তুক আবার দেখুন, বাবু, বিয়ের মত শুভকম্ম আর নাই; সেই বিয়ে নিয়েই আজন্ম কত কেচ্ছা হ'য়ে আসছে তার ঠিক নাই। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি বলিলাম,—ঘটেছে বই কি।

পিরু বলিল,—ঘটছে, বাবু, হামেশাই ঘটছে। এমন একটা লোক পাবেন না যে বিয়ের একটা কেচ্ছা জানে না—বর কনে্য বদল পর্যন্ত। তা হ'লে শুনুন, বাবু, পুরানো এক বিয়ের গল্প।

পিরুর গল্প মনোমত হয়; বলিলাম,—বলো।—এবং ভূমিকার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—আগেই কাল বলেছি, বাবু, আমরা বয়সকালে দেখেছি, ছেলে বউ আনত টাকা দিয়ে, আর টাকা ছিল তখনকার দিনে একেবারে দুর্লভ। সোনা বলতে ছিল না। এখন দেখি, যার ভাত মেলে না ভাল ক'রে তারও পরিবারের নাকে-কানে সোনার ছিটে চিক্‌চিক্‌ করছে; কিন্তু, তখনকার দিনে অলংকার ছিল সব চাঁদির—মেয়েগুলো দেড়শ ভরির অলংকার গায়ে, হাতে, পায়ে, কোমরে দিয়ে অক্লেশে বেড়াত। আরো বলেছি, বাবু, টাকার অভাবে এক সংসারের পাঁচ ছেলের মেরে-কেটে, একটা কি দু'টোর বিয়ে হ'ত, তিনটের হ'ত না; কিন্তু বিয়ের লালস তাদের থেকেই যেত। সেই লালস আর না হবার ভয় আজও আছে। মনীশ ত' তাইতেই, বাবু, যে মারল খুঁটিতে বেঁধে বেত রাত্তিরে, তারই গলা ধ'রে সকাল-বেলা গেল মেয়ে দেখতে। আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল—তার দেহটাই আসল। সে যাই হোক, সে-কালের কথাই বলি। আর একটা কথা, বাবু, আমি সময় সময় ভাবি—গাঁয়ে লোক নাই ব'লে আমরা কাঁদি; কিন্তু না থাকবার ও-ও একটা কারণ; সবারই যদি বিয়ে হ'ত তবে দেশে হিঁদু বাড়ত কত! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি নিঃসন্দেহে বলিলাম,—হ্যাঁ।

পিরু খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—লোকে ব'লে দশটার বেশী দিক নাই; কিন্তু আমি বলি, বাবু, হাজার দিক আছে—পুণ্যের না থাক পাপের আছে—আর হাজার দিকে মানুষের মন ছুটছে; তার না আছে ধর্মজ্ঞান, না আছে নরকের ভয়; সে চায় কেবল নিজের ইষ্ট—টাকা আর স্ত্রী। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তারপর শুনুন, বাবু। মানুষের বিয়ে হয় না; কিন্তু লালস থাকে—যার তিন চার ছেলে তারও নির্বংশ হবার ভয় থাকে—সেই ভয়ই সকলের বড় ভয়। এমনি ক'রেই কিছুদিন যায়—সাত্যই মানুষ নির্বংশ হয়—কিন্তু দিনকে দিন দেখা যেতে লাগল, বিয়েটা যেন বাড়ছে, কম দামে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। এমনি ক'রে বিশ বাইশ কি তিরিশ বচ্ছরই গেল—যেতে যেতে এমন কথা বার হ'য়ে পড়ল যার মত বিষম কথা আর নাই—হয় না। কিন্তু কেমন ক'রে সর্বনেশে কথাটা লোক-জানাজানি হ'য়ে গেল তা বলবার আগে একটা গল্প বলতে হয়, বাবু।

আমি বলিলাম,—বলো গল্পটা।

—আরো দশ বিশটা পোড়াকপালের মত এই গাঁয়ের শ্রীদাম চক্কোত্তির বিয়ে হয়—না হয়—না ক'রেই ছিল; চক্কোত্তি মুখ ভার ক'রে থাকে। থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন এক ঘটক এলো তার বাড়ীতে; বলল, ছেলে আছে এ-বাড়ীতে? চক্কোত্তি নিজেই ছেলে; বলল, আছে; আমিই আছি। ঘটক বলল,—তুমি দিব্যি ছেলে। বয়স কত তোমার? চক্কোত্তি পোণে এক কুড়ি কমিয়ে বলল, বয়েস আমার তিরিশ। ঘটক বলল, আমার অনুমানও তাই!—যা-ই হোক, ওদের যা মিলিয়ে দেখবার, জানবার শোনাবার ছিল, তা সবই হ'ল—চক্কোত্তির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ঘটক বায়না আর দক্ষিণে আর রাহা-খরচ নিয়ে চ'লে গেল—ঘটক বাড়ীঘরের ঠিক-ঠিকানা দিয়ে গেল, অবিশ্বাসের কারণ

থাকল না—চক্কোত্তি হেসে খেলে বেড়াতে লাগল। গ্রামের বৌ-ঝিরা বলল, চক্কোত্তির ছিরি ফিরেছে শুনেছি। সে যা-ই হোক, বেশ রূপসী মেয়ে চক্কোত্তির বউ হ'য়ে এলো—মেয়ে পরিবেশন ক'রে খাইয়ে স্বজাতির ঘরে উঠল—দেশের লোক খুশী হয়ে বলল, চক্কোত্তির শেষ বয়সে কপাল খুলেছে। কিন্তুক খোলে নাই, বাবু! এখন দেখি মেয়ের উপর মানুষের হতশ্রদ্ধার ভাব, কিন্তুক তখনকার দিনে ছিল ছেলের উপর। মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, ভালবাসে যে দেয় কাকে—যে দেয় তারি আদর। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—সে যা-ই হোক, চক্কোত্তির বাম্ভণীর পেটে ছেলে হ'ল, তিনটি মেয়ে দু'টি ছেলে—খুব ঘন-ঘনই হ'ল। তারপর চক্কোত্তি মারাও গেল—ছেলেরা বড় হ'ল। এত কাণ্ড হ'ল, কিন্তুক এতকাল ধ'রে আর একটা কাণ্ড ঘটে আসছে তা কেউ চোখে দেখে নাই—দু'তিন বছর অন্তর অন্তর একটা লোক আসে, চক্কোত্তির ঘরে অতিথ্ হয়; খায় দায়, এক রাত্তির থাকে, তারপর সে চ'লে যায়। চক্কোত্তি যখন জীবিত ছিল এ তখনকার কথা; কিন্তুক চক্কোত্তি মারা গেলেও সে আসতেই লাগল।

আসতে আসতে হঠাৎ একদিন সক্কালবেলা হাউ-মাউ চীৎকার শুনে, তখন কেবল গরু-বাছুর বার করছি, গরু-বাছুর ফেলে রেখে দৌড়ে যেয়ে দেখলাম—কি আর বলব, বাবু—বড় কঠিন জিনিসই দেখলাম—চক্কোত্তির পরিবার তার শোবার ঘরে, আর সেই অতিথ্ বৈঠকখানা ঘরে গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে ম'রে ঝুলছে—

পিরু একটু থামিল।

—সে যা হবার তা হ'লো—দু'টো মিত্যু এক সঙ্গে ঘটল দেখে গাঁয়ের লোকে অবাক হ'য়ে গেল; কিন্তুক কারণ কিছু পাওয়া গেল না। গাঁয়ের লোক যে সন্দেহ করল তা বিচ্ছিরি, কিন্তুক সত্যি নয়। তাই যদি হবে তবে দু'জনেই গলায় ফাঁস নেবে কেন! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লেই দেখুন, বাবু, তা সত্য না। কিন্তুক সত্যি কথা বার হ'য়ে পড়ল মাস কতক পরে—কেমন ক'রে হ'ল তা জানিনে, বাবু; কিন্তুক এমন বার হয় দেখেছি—হাওয়ায় খবরাখবর ভেসে আসে। সে যা-ই হোক, আগেই বলেছি বাবু, মেয়ে মেলে না, কিন্তুক মানুষের বিষয়ে লালস থাকে, তা-ই থেকে ভরার মেয়ের চল হ'ল। এখন ভরার মেয়ে বললে কেউ বোঝে না, আপনি ত' বোঝেনই না; কিন্তু একদিন ভরার মেয়ে বললে লোকে দাঁতে জিব কাটত। সে যা-ই হোক, কেমন ক'রে তার উৎপত্তি হ'ল তা বলি। মানুষের বিয়ের লালস দেখে কোথাকার বদমাইসের দল এক দল পাকালো—তারা করতে লাগল এই কাজ। মানুষের ধম্মনষ্ট, জাতনষ্ট—গাঁয়ে গাঁয়ে তারা নৌকো নিয়ে বেড়ায়, ঘাটে একলা মেয়ে পেলেই তাকে ধ'রে নৌকোয় তুলে নৌকো ছেড়ে দিয়ে পালায়। ঘাটে কলস প'ড়ে থাকে, কিন্তুক মেয়ে ঘরে আসে না; লোকে বলে জলে ডুবে মরেছে—তারা লাশ খুঁজে বেড়ায়। সেদিকে সুবিধে না হ'লে তারা গাঁয়ের ভিতর ওঠে; আগে রকম ভাল ছিল না এখন বোষ্টমী হ'য়েছে এমনধারা মেয়েমানুষ খুঁজে নিয়ে তাকে করে হাত। কিন্তুক, বাবু, আমি একটা কথা সময় সময় ভাবি—এখনকার ছেলে বলুন, মেয়ে বলুন যেমন চালাক-চতুর আগে তেমন ছিল না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক এই বুদ্ধির দোষেই তাদের জাত যেতে লাগল ; ফুসলানিতে ভুলে ছোট জাতের মেয়েগুলো পালাতে লাগল। তারা তখন ভিন্ গাঁয়ে যেয়ে তাদের আড্ডায় ওঠে—ঘটক পাঠায়, মেয়ের বিয়ে দেয়, কেউ সাজে মেয়ের বাপ, কেউ সাজে খুড়ো—এমনিধারা। কিন্তুক এর বাড়া পাপ কি আর আছে বাবু! টাকার লালসে মানুষের জাত ধম্ম মেরে দেয়! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ বই কি। মানুষের জাত গেল ত' থাকল কি! সে যা-ই হোক, অমনি ক'রে চুরি করা মেয়ের নাম হ'ল ভরার মেয়ে। চক্কোত্তির পরিবার ছিল সেই ভরার মেয়েদের একজন—জাতিতে ধোপা।

শুনিয়া আমি দাঁতে জিব কাটিলাম ; পিরু বলিতে লাগিল,—এখন সেই অতিথের কথা বলি। অতিথ্ যিনি আসতেন তিনিই বাবা সেজে বিয়ে দিয়েছিলেন—ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন, আমি তোদের বাড়ী যাবো, তখন গোপনে আমায় কিছু দিবি, না দিবি ত' সব ব'লে দেবো। অতিথ্ আসে যায় ; কি কৌশলে চক্কোত্তির পরিবার তাকে বিদেয় করে তা জানিনে, বাবু। চক্কোত্তির বত্তমানে তার পরিবারের হাতে পয়সা-কড়ি আসত—অতিথ্ আসবে ভয়েই সে জুটিয়ে রাখত ; কিন্তুক সে মারা গেলে ছেলেরা নিলো তবিল কেড়ে, আর ভাঁড়ারে দিলো চাবি ; ধান বেচে যে দু'পয়সা ক'রে রাখবে সে যো-ও আর থাকল না। তখন একদিন সেই অতিথ্ এসে হাজির। চক্কোত্তির পরিবার পড়ল ফাঁপরে। সে যাই হোক, রাত্তিরে অতিথ্ শুয়েছে বাইরের বৈঠকখানায়, আর চক্কোত্তির পরিবার শুয়েছে বাড়ীর ভিতরে তার শোবার ঘরে। দুপুর রেতে উঠে চক্কোত্তির বড় ছেলে দেখে, মায়ের ঘরের দরজা খোলা, আর মা ঘরে বাইরে কোথাও নাই—খুঁজতে খুঁজতে দেখে, তার মা বৈঠকখানা ঘরের ভিতর থেকে বার হ'চ্ছে ; হ'তেই একেবারে পড়ে গেল ছেলের সামনে—মা আর ছেলে একেবারে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যে সন্দেহ ছেলে করল মাকে, তা সত্যি না—সে বোধ হয় বলতে গিয়েছিল, এবারে কিছু দিতে পারলাম না—গোল ক'রো না। সে যা-ই হোক, মা পালিয়ে গেল। গিয়ে দিলো গলায় দড়ি ; আর ছেলেরা করল গলা টিপে সেই অতিথ্কে খুন। খুন ক'রে ঝুলিয়ে রেখে দিলো।—বলিয়া পিরু হতাশভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গৃহে রজককন্যা গৃহিণী—আর তাহার দরুণ দু'টি অপমৃত্যু—মানুষের পাপের আর সীমা নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—চক্রবর্তীর ছেলেরা এখন কোথায়?

—তা জানিনে, বাবু, ছিট্‌কে গেছে কোথায় কোথায় জানিনে।

পিরু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল ; আমি বলিলাম,—দুঃখ ক'রে লাভ নাই, পিরু।

—দুঃখু মানুষের জন্যে করিনে বাবু ; করি ভগমানের জন্যে—তাঁর হাতে কি উপায় নাই?—বলিয়া পিরু গামছাখানা বাঁ-কাঁধ হইতে ডান-কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, -কিন্তুক, এ কথার আর কাজ নাই, বাবু, এখন যাই। কলিমদ্দি তিন কাঠা ধান চেয়েছিল কজ্জ—কালই নেবার কথা ; কিন্তুক নিতে এলো না কেন দেখে আসি। গরীবের বড় কষ্ট, বাবু ; কিন্তুক আমার মনে হয়, বাবু, মানুষের অদ্ধেক দুঃখু তার কম্মদোষে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

বলিলাম,—হ্যাঁ।

—কলিমদ্দির কথা বলি, বাবু। শালাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ক'রে আর একটা বিয়ে তুই করতে গেলি কেন? জব্দ করলি কাকে? এখন তোরই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে-মেয়ে আর গণ্ডায় গণ্ডায় উপোস—শালারা ভুগতে আসছে, না তুই ভুগছিস?—বলিয়া অনুপস্থিত কলিমদ্দিকে ভর্ৎসনা করিয়া পিরু অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিল,—সে আর-এক কেচ্ছা, বাবু; কিন্তুক সে-কথা বলব আর একদিন। যাই।—বলিয়া পিরু আমাকে বিদায়-নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিল,—আর একটা কথা, বাবু, আপনাকে জানিয়ে যাই, কলিমদ্দির কথাতেই কথাটা মনে পড়ল। দু'রকমের লোক দেখবেন এ-গাঁয়ে, আর তারা হদ্দ বেহায়া, আর কারুর উপর তাদের দরদ নাই। একদল তারা আছে—জন্মে ইস্তক খেতে পায় না, তারা বেহায়া হ'য়ে উঠেছে—লজ্জা তাদের নাই। আর একদল তারা আছে, সুদখোর, টাকার ময়লা চেটে চেটে খায়; এদেরও চক্ষুলজ্জা নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই। নিজের কথা বলতে নাই, বাবু, অধর্ম হয়; বললে আপনি ভাববেন, পিরু লোকটা কি রকম! কিন্তুক আমরা সেকেলে লোক ব'লেই চক্ষুলজ্জা আর মানুষের উপর ব্যথা আছে।—যাই এখন আসি, বাবু।

বলিলাম,—এসো।

পিরু প্রস্থান করিল।

শ্রীদাম চক্রবর্তী জ্ঞাতসারে জাতি বিসর্জন দেয় নাই—অতএব তাহার চিন্তা পরিত্যাজ্য; তার সঙ্গে তার পুত্রেরাও নিষ্পাপ। চক্রবর্তী প্রভৃতিকে একপাশে রাখিয়া দিয়া আমার মনের সম্মুখে বিভিন্ন বেশে বিচরণ করিতে লাগিল চক্রবর্তীর গৃহিণী, সেই রজক-কন্যা। বিবাহ যখন হইয়াছিল তখন সে বালিকা; কাহার সঙ্গে বিবাহ হইতেছে জানিলেও, সম্ভবতঃ মানুষের রক্তবর্ণ চক্ষু এবং হস্তধৃত দণ্ড দেখিয়া সে কেবল লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল।

আমার মনে হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অসত্য জীবনযাত্রার অবসান না হইয়াছিল সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনটাকে দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিবার ইচ্ছায় সে যা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। প্রতিপদে পাপের পরিমাণ বাড়িয়া পরকালের জন্য ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করিতেছে মনে করিয়া সে ভগবানকে ডাকিয়া ক্ষমা চাহিত, না কাহাকেও অভিসম্পাৎ দিত! জীবনের কোনো ক্ষেত্রের কোনো অংশের দিকে চাহিয়া কি সে শান্তি পাইত! সে গর্ভ ধারণ করিতেছে, পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে; গর্ভ-বহনের ক্লেশ, সন্তান-প্রসবের ক্লেশ সবই সহ্য করিতে হইতেছে—কিন্তু এত ক্লেশ একেবারে বৃথা মনে করিয়া তার কি বুক ফাটে নাই! বুক ফাট্‌ফাট্ করিয়া একবারও মনে হয় নাই, আর এ মিথ্যার ভার বহিতে পারি না, বলি—

কিন্তু তারপর? তারপর কি বিভীষিকা সে চক্ষে দেখিত তাহা কেহ জানে না। তারপর, পরম শত্রু পশ্চাতে ফিরিতেছে—সকল মিথ্যার মাঝে সেই কেবল সত্য, অব্যর্থ আর চিরজীবী। তাহার আগমন সম্ভাবনায় বধূ, গৃহিণী এবং মাতা সেই রজক-কন্যার উৎকণ্ঠার সেই অস্থিরতায় মানুষের পাগল হইয়া যাইবার কথা।

মনে মনে সে কি ততদিন ব্রাহ্মণ হইয়া যায় নাই—ব্রাহ্মণের ঔরসজ ভ্রূণের সঞ্চার অনুভব করিয়াই তার হয় তো মনে হইত, যে-সন্তান একদিন ভূমিষ্ঠ হইবে সে ব্রাহ্মণ হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে; মায়ের রক্ত তার দেহে প্রবেশ করিবে না—ব্রাহ্মণের রক্তের তেজে

তাহা ভস্ম হইয়া যাইবে। মন তার দুলিত বোধ হয়—একবার মনে হইত, তা-ই হয় ; আবার মনে হইত, না তা হয় না। কিন্তু জননী ত' গ্রহণের আধার মাত্র, তার আবার জাতি কি !

এইখানে আমারই মন সমতালাভ করিল—ক্ষুধা বোধ করিলাম ; কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ভয় করিতে লাগিল। দ্বারিক-ঠাকুর রুষ্ট হইয়া গেছেন—পিসিমা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয় আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, এবং আমাদের যত প্রকারের অনিষ্ট তিনি করিতে পারেন তাহার একটা ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়া পিসিমা নিজেও দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, আমাকেও না দেখান, তার বিবরণ শুনাইবেন।

একটা আতঙ্ক লইয়া বাড়ীর ভিতর আসিলাম। সম্মুখেই পিসিমাকে দেখিলাম না ; কিন্তু আর একজনকে দেখিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, খুঁটিতে পিঠ দিয়া আর এদিকে পিছন ফিরিয়া এলোখোঁপা বাঁধা একটি মেয়ে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে—তার বাঁ-দিকে ডালপালা সমেত শাকের গাছ স্তুপীকৃত করা রহিয়াছে। সে একটি শাকের গাছ বাঁ-হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া পটাপট তার পাতা বাছিয়া ডান-দিকে স্তূপীকৃত করিতেছে। মেয়েটির হাতের রং অতিশয় কালো, কিন্তু গড়ন ভাল ; হাতে একগাছা কাচের চুড়ি।

দেখিয়া মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল ; পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং হাত তিনেক ব্যবধান থাকিয়া হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলাম,—পিসিমা ?

আশা করিয়াছিলাম, মেয়েটি চমকিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইবে, কিন্তু সে ফিরাইল না—শাকের দিকে হাত বাড়ানো বন্ধ করিয়া দিলো।

পিসিমা সেই ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন,—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? তোর খাবার গুছিয়ে রেখেছি, দিই গে চল্, না এখানেই আনব ?

মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম—এখানে খাবার আনা হইলে আমাকে বারান্দায় উঠিয়া খাইতে হইবে ; এবং পিসিমা ও-ঘরে খাবার আনিতে গেলে আমি এখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব—

মনে করিয়াছিলাম, এই সম্ভাবনায় মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু সে দাঁড়াইল না। ভাবিলাম কতটা লম্বা হইয়াছে তাহা সে দেখাইতে চায় না—বড় হইয়া ওঠা মেয়েদের লজ্জার বিষয়। কিন্তু সংকোচ আসিল আমারই ; বলিলাম,—ও ঘরেই দেবে চলো।

—তাই চল্।—বলিয়া পিসিমা বাহিরে আসিয়াই হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—এই যে রে সতীশের মেয়ে নির্মলা—

যেন আমি সতীশের মেয়ে নির্মলাকে খুঁজিতেছিলাম। দেখিলাম মেয়েটির মাথা একটু নত হইল। কল্যকার এবং অদ্যকার স্মৃতি খুবই সতেজ ; বলিয়া বসিলাম—সতীশ আর মনীশকে দেখলাম, গলাগলি হ'য়ে—

বলিতে বলিতে আমি চমকিয়া থামিয়া গেলাম ; যে কারণে উভয়কে মনে পড়িয়া গেছে, ঠিক সেই কারণেই এই মেয়েটির সমক্ষে উভয়ের নাম একত্রে উল্লেখ করা শোভন হয় নাই। পিসিমা বলিলেন,—হ্যাঁ, ওদের দুজনায় ভাবও খুব—এ নইলে ও-র চলে না। চল্, খাবার দিই গে।

পিসিমার সঙ্গে এ-ঘরে চলিয়া আসিমাম—এবং জলযোগ সারিয়া আসিয়া নির্মলাকে সেখানে দেখিলাম না। দেখিলাম, পিসিমা তাহার স্থানে বসিয়া শাক বাছিতেছেন। একটা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের অস্বস্তি যেন থামিতে চাহিল না—মেয়েটিকে লজ্জা দিয়া

ক্লেশ দিয়াছি—এবং সে মুখ দেখায় নাই ; এ দু'টিতে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নাই ; কিন্তু ইহারই মধ্যে কোথায় একটা বিচ্ছেদ বোধ করিয়া আমার নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, সে আর আমি যদি চোখাচোখি হইয়া একবার দাঁড়াই তবেই আমার অন্তরের কথা পাঠ করিয়া সে আমাকে ক্ষমা করিবে।

পিসিমা বলিলেন,—তোরা সহুরে মানুষ ; শাক ভালবাসিস ত ?

পিসিমা আমাকে খাবার দিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন—খাওয়াইবার আগ্রহে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই ; বুঝিলাম, রান্না সুরু করিতে তাঁর ব্যস্ততা আছে। বলিলাম, —এ-বেলায় নেমতন্ন ত' ফুকলে গেল, পিসিমা ; তোমাকেই কষ্ট করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি ডাল, একটা তরকারী কি ভাজা আর ভাত ছাড়া কিছু করো তবে আমি খাবো না।

শুনিয়া পিসিমা সম্ভবতঃ দ্বারিক-ঠাকুরের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা স্মরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, কথা কহিলেন না। আমি বলিলাম,—খানকতক বই এনেছি, পিসিমা, সেগুলো প'ড়ে ফেলা চাই। আমি পড়িগে ; এ-বেলা আর বেরুবো না।—বলিয়া ঘরে আসিয়া উঠিলাম।

আসল কথা এই যে, আমার মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সহরের অস্থিরতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ; মরুভূমির প্রখরতা আর শুষ্কতার মত তার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক—তার প্রতিবাদ নাই, এমন হওয়া তার উচিত নহে বলিয়া কেহ অভিযোগ করে না। সহরের মানুষের স্বেচ্ছাস্বাতন্ত্র্য উগ্র হইলেও সহজ, তাহা লইয়া আক্ষেপ নিরর্থক ; মানুষ সেখানে পরস্পর ঘা ঘেঁষিয়া চলিতেছে, ঘর্ষণ আছে কিন্তু বিরোধ নাই। বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, মানুষ এমন কি পশু-পক্ষী পর্যন্ত সেই সীমাবদ্ধ উত্তপ্ত আবহের সঙ্গে আপন সত্তার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—তাহাতে তাহার অপরাধ ঘটিতেছে না ; প্রকৃতির প্রতি তার অসৌজন্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার অসহযোগ লোকের চোখে পড়ে না।

কিন্তু এখানে তার বিপরীত, সে ব্যবস্থা এখানে অচল।—প্রকৃতি মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিতেছে ; কিন্তু মনে হয়, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে পদদলিত করিতে পারে এমনি অবজ্ঞা দেখাইয়া মানুষ তাহার সে হাসিকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সহরে মানুষে মানুষে অসংখ্য সাক্ষাৎ ঘটিতেছে, কিন্তু তাদের চোখে চোখে চাওয়া নাই। চোখে চোখে চাহিয়াও এখানকার মানুষ কেমন করিয়া তার সহজ লজ্জাকে, দায়গ্রস্ত হইয়া নহে, অকারণ বর্বরতায় বিসর্জন দিয়াছে ! দুঃখ বোধ হইতে লাগিল ইহাই ভাবিয়া যে. মানসিক দুর্দশা চরম সীমায় না আসিলে মানুষ বাহিরে এত অনুদার এবং ভিতরে এত দুর্বল হইতে পারে না।

বই খুলিয়া লইলাম।

দ্বিপ্রহরের ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইহাই যে, দূরে একটা কলরব শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, আগুন লাগিয়াছে ; কিন্তু তাহা নহে। পিসিমা বলিলেন, আফাজদ্দির স্ত্রী তার প্রতিবেশিনী মেনাতুল্লার স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করিতেছে ; যাহারা কলহ মিটাইতে আসিয়াছে তাহারা কলহের উপরেও কোলাহল করিতেছে – উভয় পক্ষের হিতৈষীরা আস্তে কথা কহিতেছে না ; এবং আমি বুঝিলাম, কণ্ঠস্বরে সুরের ঐক্য না থাকায় ধ্বনির ব্রীড়া নষ্ট হইয়া গেছে।

বৈকালে বাড়ীর ভিতরেই পিসিমার পায় পায় ঘুরিতে লাগিলাম। পিসিমা পিল্‌সুজ আর জলের ঘটি মাজিলেন ; আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চক্ষে তাহা দেখিলাম। পিসিমা লণ্ঠনের কাচ ছাই দিয়া মাজিলেন ; তুলসীতলায় মৃৎপ্রদীপে সলিতা আর তেল দিয়া রাখিলেন—সন্ধ্যা লাগিলেই জ্বালিয়া দিবেন ; কূপের জল তুলিয়া বালতি পূর্ণ করিয়া রাখিলেন—দু'ঘটি জল সেই সঙ্গে তুলিয়া রাখিলেন—রাত্রে যদি দরকার হয়—

একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—শব্দ কিসের, পিসিমা ?

পিসিমা বলিলেন,—আকাশের দিকে চেয়ে থাক্, দেখতে পাবি !

দেখিলাম, এক ঝাঁক পাখী আধ মাইলটাক লম্বা আঁকা-বাঁকা সারি বাঁধিয়া পূবের দেশ হইতে পশ্চিমের দেশে উড়িয়া গেল। সহরকে দেখিয়া মনে হয় সে স্থূল—ভাবনিমগ্নতা তার নাই ; সহরের দুর্ভাগ্য যে তার স্থূলত্ব লইয়া কেহ কাব্যচর্চা করে নাই ; কিন্তু পল্লীর স্থূলত্বকে বিশ্লেষণ আর রঞ্জিত করিয়া মর্মের উপভোগ্য যে জিনিষে পরিণত করা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্ম। স্থূল হইলে সূক্ষ্মে এই প্রয়াণ মানুষের মনের প্রকাশোন্মুখতার অবতরণ না অধিরোহণ ! কল্পনাগত অনুবর্ণনায় আবেষ্টন আর মোহের সৃষ্টি করিয়া কবি ভুল করিয়াছেন—না বুঝিয়া তাঁরা তার সর্বাঙ্গে শব্দের চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন।

চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই পশ্চিমে একটু মেঘ দেখা দিলো ; বলিলাম,—পিসিমা, মেঘ করছে।

—তোর দেশলাইটে দে ত'।—বলিয়া পিসিমা বলিলেন,—এই ত' মেঘের সময় এলো। আর কিছুতেই ভয় নেই—মেঘ আর আগুন করেই ত' যত ভয়।

মেঘ বাড়িতেছে দেখা গেল। পিসিমা ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, এ-বেলা আর রেঁধো না, পিসিমা। তাড়াতাড়ি উনুন জেবলে দুধটা ঘন ক'রে আউটে নেও—চিঁড়ে দিয়ে দিব্যি হবে। যাও—আমি তোমার ডালা-কুলো ঘটিবাটি তুলছি।

—তোল্।—বলিয়া পিসিমা তাঁর রান্নাঘরের দিকে গেলেন ; বলিলেন,—কোথায় কোন্‌টা উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে ঝড়ে, আর খুঁজে পাবো না।

অল্পই জিনিষ। জিনিষগুলি ঘরে তুলিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানকার মেঘ-সঞ্চারও দেখিবার জিনিষ—মেঘ ধীরে ধীরে বাড়ে, অতি দ্রুত বাড়ে, ঝড় মুখে করিয়া বাড়ে ; আকাশে মেঘ থম্‌কিয়া থাকে। নিশ্চল বাতাসে গাত্রে দাহ জন্মে—শঙ্কা ঘনায়। এ-সব অনুভব করিতাম, চোখে দেখি নাই।

কিন্তু চৈত্রের এই অকাল মেঘ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—যেন তেমন ইচ্ছা নাই, কে ঠেলিয়া পাঠাইতেছে। পাখীরা তীরের মত ছুটিতেছে। পিসিমা আমার চায়ের জল নামাইয়া দিয়া ভাতের জল চাপাইয়া দিলেন। বাতাস মন্থর আর পাখীর কলরব নীরব হইয়া আসিতে লাগিল—সন্ধ্যার ছায়ার উপর অলক্ষ্যে আর একটা চঞ্চল অন্ধকার বাড়িতে লাগিল।

পিসিমা বলিলেন,—বিরক্ত কত ! খাওয়া-দাওয়া তোর ভাল হচ্ছে না রে নানা উৎপাতে।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—চা ত' ঠিকই হচ্ছে। আমার খুব ফূর্তি হচ্ছে, পিসিমা—মেঘ লাগা আগে দেখি নি ভাল ক'রে, আজ দেখলাম।

বিদ্যুৎস্ফুরণ তখনও সুরু হয় নাই ; কিন্তু যখন হইল তখন তাহার পশ্চাতে একটিমাত্র ধ্বনিতেই আকাশ ভরিয়া গেল—মাঠি কাঁপিয়া উঠিল।

বলিলাম,—পিসিমা, তোমার উনুনে জল ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এসো ; মেঘ আর আগুনকে তোমার ভয়—দু'টোকে এক সঙ্গে হ'তে দিও না।

কিন্তু পিসিমার উনুন তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে ; বলিলেন,—ঝড়ের দেরী আছে ; আমি মেঘ চিনি।

আমি গভীরভাবে বলিলাম,—এখানকার মানুষ মেঘ, বাতাস, আকাশ, মাটি কাউকে চেনে না। চেনা অবশ্য একদিনে যায় না, কিন্তু চিনতে তার চেষ্টা নাই—এত সমারোহ বৃথাই গেল।—বলিয়া চায়ের কাপ কি করিয়া শেষ করিলাম তাহা আমিই জানি।

পিসিমা বলিলেন,—আর দেরী নেই।—বুঝিলাম, পিসিমা যে-কোনো প্রকারে চাল ক'টি সিদ্ধ করিয়া নামাইবার চেষ্টায় হাঁস-ফাস করিতেছেন।

পশ্চিমের মেঘে লাল আভা ফুটিয়াছিল—তাহার উপর ধূসর একটা আবরণ দেখা দিলো। একটা ঝটাপটির শব্দ উঠিল—বোধ হইল বহু দূরে। পিসিমা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিলেন ; হাসিয়া বলিলেন,—ভাত খাওয়া তোর হ'ল না রে এ-বেলা, তোর কথাই ফললো—উনুনে জল ঢেলে দিয়ে এলাম।—বলিয়া পিসিমা সে-ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তুলসীতলার প্রদীপটা জ্বালিয়া দিলেন।

তারপর আমাকে লইয়া যখন "বড় ঘরে" আসিলেন, ঝড় তখন সুরু হইয়া গেছে। নিস্তব্ধ নির্বিরোধ পল্লীতে এক নিমেষেই আলোড়নের প্রচুর শব্দ উৎপন্ন হইল—পল্লীর অপবিত্রতা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেই যেন পবনদেব ঝাঁটাইতে সুরু করিয়া দিলেন।

ভাতের পরিবর্তে দুধ, চিঁড়ে, মিষ্টি আমার সম্মুখে দিয়া পিসিমার আপশোষ এবং তাহা আহার করিয়া আমার তৃপ্তির মাঝে সেদিনের দিনের কাজ শেষ হইল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, ঝড় নাই, পিসিমা উঠিয়া গেছেন, এবং তাঁহার শয্যার অর্থাৎ কাঠের সিন্দুকটার পার্শ্বস্থ একটি গহ্বরপথে প্রচুর দিবালোক প্রবেশ করিতেছে।

বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াই মনে পড়িল, এ গহ্বর পূর্বে ছিল না। "পিসিমা" বলিয়া ডাক দিয়া যখন সিঁদের মুখের কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম তখন ঘুমের আলস্য নাই ; দেখিলাম, মানুষ প্রবেশের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

পিসিমা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং সিঁদ দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—এ সেই দ্বারিক-ঠাকুরের কাজ, সে চোরের ভাঁড়ারী ! দেখো, কি নিয়েছে।

দেখিলাম, লইয়াছে আমারই জিনিষগুলি বাছিয়া বাছিয়া—অতিরিক্ত কাপড়-জামাসহ আমার ব্যাগটা, রাগখানা, ফর্সা ধুতিখানা, জুতা-জোড়া, সার্ট আর কোট এবং তার পকেটস্থ দ্রব্যগুলি ; ঘড়িটা, ফাউণ্টেন পেনটা ; কেবল আমার পরিধানের কাপড়খানা খুলিয়া লইয়া যায় নাই।

পিসিমা ললাটে করাঘাত করিলেন না, অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিয়া গিয়াছিলেন : বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেনো না—চিনিয়া আমিও অবাক হইয়া রহিলাম।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—তারই কাজ। আমি তাকে বাবা বাবা ক'রে এতদিন

বেঁচে গেছি—তুই তাকে চটিয়ে দিয়ে এই কাজ করালি! দুশো সিঁদেল তার হাতে। এখন উপায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—তোমার আর একবার তাঁকে বাবা ব'লে ডাকা; আর আমার আর একবার তাঁকে প্রণাম করা—আড়াই হাত দূরে থেকে।—থানা কোথায়?

—সে ভরসা ক'রো না; সব টাকার বশ।

হঠাৎ আমার কান্না পাইতে লাগিল—অর্থহানির জন্য নহে, স্থানত্যাগ করিবার উপায় রাখে নাই বলিয়া নহে, কিন্তু কি কারণে তাহাও ঠিক বলিতে পারি না—অন্ধকার সে-যন্ত্রণার পরিমাণ ব্যক্ত করিতেও আমি পারি না—কোথায় ঘা লাগিয়াছে তাহাও ঠিক জানি না।

তারপর যাহা ঘটিল তাহা ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত। বাড়ীর সমুদয় বাক্স হাতড়াইয়া পুরাতন ছাঁটের এবং ছিটের একটা কোট বাহির করিলাম—বোধ হয় বাবার গায়ের; তাহারই পিঠটা একটু মেরামত করিয়া লইয়া খালি পায়ে পাঁচ মাইল দূরে টেলিগ্রাম অফিসে যাইয়া দু'জনের যাইবার খরচ আনাইলাম।

কিন্তু পিসিমা দেশেই রহিলেন।

# তাতল সৈকতে

উৎসর্গ :

শ্রীমান ক্ষিতিশচন্দ্র গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু—

---

## ॥ নিবেদন ॥

এই গল্পটির রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। গল্পটিকে ঘটনাবহুল এবং দ্রুত গতিশীল করিয়াছি। পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে—গতি পুনঃ পুনঃ পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে; সমাপ্তির পূর্বে একটা সমগ্র মূর্তির আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না; তথাপি, যে-পাঠক রসতৃষ্ণা লইয়া যাত্রা করিবেন তাঁহাকে পথিমধ্যে বা প্রান্তে পেঁাছিয়া হয়তো নিরাশ হইতে হইবে না।

"বক্তব্য সংক্ষেপে বলো"—কথকের প্রতি মানুষের এই হুকুম চিরকাল আছে। রূপকে বিকল এবং রস-পুঞ্জকে পণ্ডতিক্তে পরিণত না করিয়া সে-দিক হইতে পাঠককে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তকখানিতে ছাপার ভুল নাই বলিলেই চলে। দুর্লভ যত্নসহকারে প্রকাশক বইখানি ছাপিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

বোলপুর,
১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

মুখোমুখি দু'খানা ঘর—

দু'খানা ঘরই ছোট এবং শরতের, কিন্তু নিজের সামগ্রী সরাইয়া লইয়া একখানা ঘরে তাহাকে ভাড়াটে বসাইতে হইয়াছে। ভাড়াটে যে বসিয়াছে সে-ও তাহারই মত অনাথা, তবু পরের দুয়ারে যাইয়া গতর খাটাইয়া পেট ভরাইবার পথ তার আছে, কিন্তু শরতের তা নাই। শ্বশুর মস্ত লোক ছিলেন; তাঁর দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকিত না বটে, কিন্তু দুয়ারে লোক সমাগম ছিল···লক্ষ্মীশ্রী ছিল; সম্ভ্রান্ত সজ্জন বলিয়া মান ছিল। তিনি উপার্জন করিতেন প্রচুর।

কিন্তু লক্ষ্মী একদিন বিমুখ হইলেন। যে-পথে টাকা আসিত, অতর্কিত দৈব দুর্ঘটনায় একদিন সেই পথেই তাঁর শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছু টাকা খাটিত, কিছু টাকা অসময়ের জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিত; নির্বংশের যেমন নাতি মরে আগে, তেমনি এই টাকাটাই তাঁর আগে গেল। ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ কি পদ্ধতিতে কার্য-পরিচালনা করিতেছিলেন তাহা আগেও মানুষের জানা ছিল না, পরেও ঠাহর হইল না···হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্কের দরজায় চাবি লাগাইয়া তাঁহারা চলিয়া আসিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল করিয়াছে। যাঁহারা আইন-চালক তাঁহাদের হস্তক্ষেপে আমানত-কারীরা কিছু কিছু পাইল বটে, কিন্তু সেটা গচ্ছিত অর্থের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।···বড় গোছের কর্তা একজন জেলে গেলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরিবারবর্গের কষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভ হইল না।

ইহার অল্পদিন পরেই, মালগাড়ীর তাঁহারই নামীয় গাড়ীখানা গোলমাল হইয়া কোন্ লাইনে কোন্ ঠিকানায় চলিয়া গেল তাহার আর উদ্দেশই মিলিল না। উকিলের চিঠি পাইয়া রেল কোম্পানী কিছু ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতির পূরণ কিছুই হইল না।

কলিকাতার বাজারে যাহাদের সঙ্গে তাঁর মালপত্রের লেনদেন চলিত তাহারাও ঠিক এই সময়টিতেই একদিন তল্পি গুটাইয়া আজমীর গেল কি ভোল বদলাইয়া অন্য স্থানে সরিয়া বসিল তাহা বুঝা গেল না। চালানী কাঁচা মালের দরুণ তাহাদের কাছে মোটা টাকাই পাওনা ছিল, সেটা গোটাই গেল···ফলে মোহিতের বিস্তৃত কারবার নষ্ট হইয়া লক্ষ্মীর পুলক চপলার দ্যুতির মত এক নিমেষে অন্তহীন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

তাঁর মৃত্যুর পর শরতের স্বামী বিদুর ভাঙা হাট জমাইয়া তুলিতে গিয়াছিল—পারে নাই। মহাজনেরা দ্বারস্থ বিদুরের দিকে চাহিয়া ম্লান মুখে বলিল,—আমরা কেবল ঠাট বজায় রেখেছি, বাপু; জাঁক দেখছ বাইরে, কিন্তু ভেতর ফাঁপা।···দেখো চেষ্টা ক'রে যদি পারো···কিন্তু আমরা? আমরা কিছু আগাম দিয়ে তোমাকে যে বসিয়ে দেবো সে সামর্থ্য আমাদের নেই—একরকম দেউলে হয়েই ব'সে আছি। · আচ্ছা, এসো।

চক্রধর দালালকে লোকে বলিত 'ছাগুলে' চক্কর···বয়স তাঁর চুয়াল্লিশের বেশী নয়, কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর চৌদ্দটি সন্তান; তিনবার একজোড়া করিয়া জন্মিয়া এই অল্প

সময়ের মধ্যেই তাঁর সন্তান সংখ্যা এতটা আগাইয়া গেছে। বিদুর সর্বশেষে যাইয়া তাঁর কাছেও দাঁড়াইল।

চক্রধর তাকিয়ার উপর পা তুলিয়া দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন; বিদুরকে দেখিয়া মিষ্টস্বরে সম্ভাষণ করিলেন,—বিদুর এসেছ, ব'সো; মহেশকে দিয়ে যা ব'লে পাঠিয়েছিলে তা শুনেছি···

বিদুর বসিল না। চক্রধর বলিতে লাগিলেন,—শুনে তুমি হয়তো ভাববে কি বলছ; কিন্তু সত্যি কথা—আমরা সব জুয়াড়ীর পাল্লায় প'ড়ে একেবারে নাজেহাল হ'য়ে গেছি ···যে ঘরে পয়সা ফেলি, সেই ঘরটি বাদে আর সবই লক্ষ্মীর আসন·· দিব্যি পয়সা কুড়িয়ে ঘরে তুলছে·· বলবার কিছু নেই তাতে।·· বুঝলে বিদুর, তোমার বাবা তা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে।

মোহিতের অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া কাতরস্বরে মহেশ বলিল,—আ হা হা···

চক্রধর বলিতে লাগিল,—তুমি দেশ ছেড়ে বিদেশটা একবার দেখো···গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না ·

বিদুর চলিয়া আসিতে পা বাড়াইল। চক্রধর থামিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদুরের একেবারে কানের কাছে মুখ লইয়া আসিলেন, যেন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়াই কথাটা গোপনে বলিতে হইবে; চুপি চুপি বলিলেন,—গোবিন্দ পাইনকে একবার ধরতে পারো? শুন্য বখ্রাদার খুঁজছিল

বিদুরও তাহা শুনিয়াছিল; কিন্তু সে যাইয়া উমেদার হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই পাইনের বখ্রাদার মিলিয়া গেছে। বিদুর বলিল,—তিনি লোক পেয়েছেন।

—তাই ত'।—বলিয়া ক্ষোভের সুর টানিতে টানিতে চক্রধর বসিয়া পড়িলেন।

সেদিকে আর না চাহিয়া বিদুর ফিরিয়া আসিল।

এই রকমই সর্বত্র। গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পাইল না···বাপের সুনামও বিদুরের কাজে লাগিল না; স্বাধীন ব্যবসা সে গড়িতে পারিল না।···অবশেষে, কারবার সূত্রে একদিন তাহারা যাদের সমকক্ষ ছিল বিদুর তাহাদেরই একজনের অনুগ্রহ মানিয়া লইল—মনোহর দত্ত তাহাকে কর্মচারী করিয়া রাখিলেন।···বিদুর এ-অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহার মন সেখানে স্থিতিলাভ করিতে পারে নাই—মন অহরহ বিষের জ্বালায় জ্বলিত।

শরৎ বিধবা হইল।

শরতের যখন বিবাহ হয় তখন বিদুরের বয়স দশ, তার বয়স পাঁচ।

সেদিনের কথা এখনো শরতের মনে আছে···বালিকা পুত্রবধূটিকে লইয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সে-উল্লাস এখনো যেন তার ধমনীতেই রহিয়াছে। শাশুড়ী নাম ধরিয়াই ডাকিতেন; রাগ হইলে বলিতেন, বোমা।.. এই কথাটা বিদুরের খুব প্রিয় ছিল.. কতবার যে সে এই কথাটা তুলিয়া হাসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।···শ্বশুরের বাড়ীতে আসিবার অবসরই খুব কম ছিল; কিন্তু আসিতেন বোমা বলিয়া ডাক দিয়া.. তারই খোঁজটি আগে লইতেন।

চারটি চাল মুখে ফেলিয়া এক গ্লাস জল খাওয়া মোহিতের অভ্যাস ছিল; সেটা দিবার ভার ছিল শরতের উপর। মোহিত বাড়ীতে আসিলেই, পাথরের ছোট্ট একখানা রেকাবীতে করিয়া চারটি ধোয়া বাছা চাল আর এক গ্লাস জল লইয়া শরৎ আসিয়া দাঁড়াইত। মোহিত হাত বাড়াইয়া বলিতেন,—দাও, মা।

বলিয়া চাল জল খাইয়া গ্লাস রেকাবী ফেরৎ দিতেন।…এই দু'টি পাত্র মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার রাখিত শরৎ…এই ক্ষুদ্র কাজটিতে তার ব্যস্ততা আর আত্মনিবেদন দেখিয়া শাশুড়ী খুসী হইয়া হাসিতেন।

প্রথম দিন চাল জল শ্বশুরের হাতে দিয়া শরৎ তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল…মোহিত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তোমার শাশুড়ী শিখিয়ে দিয়েছে, নয় ?

ভয়ংকর লজ্জা পাইয়া শরৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়াছিল, না তিনি শিখাইয়া দেন নাই।…তারপর বধূর মাথার উপর হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে মোহিতের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল…

সে কতদিনের কথা, তবু স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু সব সরঞ্জাম সুখ ঐশ্বর্য আনন্দ কে যেন কেবল কাঠি ছুঁয়াইয়া চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য করিয়া দিলো।

বিদুর নিঃশব্দ থাকিত—পিতৃগৌরব সে কীর্তন করিত বটে, কিন্তু বর্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া শরতের সম্মুখে সে কোন দিন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে নাই। তবু শরৎ বুঝিতে পারিত স্বামীর মনে ঘূণ আছে ; নিটোল সবল স-লীল মনটি লইয়া তিনি নাই ; অভাবের কথা উঠিতেই তাঁহার মুখে যে ছায়া পড়িত, শরৎ জানিত, তাহা বড় গুরুতর।…স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার পরিচিত…রেখার ইঙ্গিত সে কখনো ভুল বোঝে নাই—সেই পাঁচ বছর বয়স হইতে বিদুর তার খেলার সাথী… এক পলকে ভাব, এক পলকে আড়ি…মারামারি, কাড়াকাড়ি—মাছের মাথা খাবো ব'লে দু'জনার সেই জিদ…

শ্বশুর বলিতেন,—বৌকে দাও, ও ছোট।

শাশুড়ী মাছের মাথাটা তার পাতে দিলে বিদুর কেবল ছোঁ মারিবার ফাঁক খুঁজিত …শাশুড়ী বৌকে আড়াল করিয়া বসিতেন…বিদুর মরিয়া হইয়া একদিন এক আঁজলা ডাল তার মুখে মাখিয়া দিয়াছিল। এই সব চাঞ্চল্য শেষ হইয়া তারা যে স্বামী-স্ত্রী এই জ্ঞানটা একদিন ফুটিয়া উঠিল—লজ্জা দেখা দিলো…

তারপর বাইশটি বৎসর তার বিদুরকে লইয়া নিরন্তর সঙ্গ-সুখে কাটিয়াছিল… স্বামীর সর্বাঙ্গ যেমন তেমন তার অন্তরটিও শরতের একান্ত আপনার জিনিষ… নিজেরই হাত দু'খানার মত তার চোখের উপরকার জিনিষ।

শান্ত কোলে আসিল। বিদুর বলিত,—বাবা-মা থাকলে কত সুখী হতেন !

বিদুরের বড় ইচ্ছা ছিল, ছেলেকে সে মনের মত করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। তার অতি-ইচ্ছার আবেগ যেন বাতুলতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল…কোলের শিশুটিকেই সম্বোধন করিয়া বিদুর বলিত,—তোকে আমি চেয়েছি কেবল ছেলে ব'লে নয় ; তুই আমার ত্রাণ-কর্তা…আমায় ছাইয়ের স্তূপ থেকে তুলে আমার নিজের বৈকুণ্ঠে বসিয়ে দিবি তুই… পারবি ত' রে ?—জিজ্ঞাসা করিয়া বিদুর হাসিত না ; চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন ভবিষ্যতের চিত্র দেখিত।

শরৎ বুঝিতে পারিত, এই প্রশ্নে স্বামীর দুরাকাঙ্ক্ষা তেমন প্রকাশ পায় নাই, যেমন পাইয়াছে তাঁর গভীর নিহিত ব্যাকুলতা। ··পিতা পিতামহের লুপ্ত নাম উদ্ধার করিয়া দুনিয়ার সঙ্গে তেমন সহজ নির্ভীক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তিনি পারিলেন না …এই মহাদুঃখ রাখিবার ঠাঁই তার নাই · সংসারের সঙ্গে সংগ্রামে তারা পরাজিত হইয়া গেছে…অতল হইতে উঠিবার শেষ অবলম্বন ঐ পুত্র…ভগবান, ও যেন

পারে। শরৎ বলিত,—তুমি অমন ক'রে ভেবো না ; ভগবানে বিশ্বাস রাখো, তিনিই দেখবেন।

কথাটা দৈববাণীর মত শুনাইত···ক্ষণেকের জন্য দুঃখ ভুলিয়া একটা অহৈতুকী সান্ত্বনা পাইয়া বিদুর সোৎসুকে শরতের দিকে মুখ তুলিত—স্বামী-স্ত্রীর মনে মনে নিবিড় স্পর্শ ঘটিত।

কিন্তু ছেলেটিকে অতি-মানুষ নয়, মানুষ করিয়া তুলিবার পূর্বেই বিদুর মারা গেল।

তার মাহিনা ছিল পনর টাকা। মাহিনাদাতা মনোহর দত্ত বলিতেন,- যে বাজার আজকাল, আর তীর্থের কাকের মত বেকার লোকের যেমন ভিড়, আট-দশ টাকাতেই লোক অক্লেশেই পেতে পারি, কিন্তু—

বলিয়া মনোহর থামিতেন। মনোহরের পেটের উপর রাশীকৃত কোঁকড়া চুল গজাইয়াছিল ; সেই চুল মুঠা করিয়া ধরিয়া অল্প অল্প টানিতে টানিতে কথাটা তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া শেষ করিতেন,—কিন্তু বিদুর আমার বন্ধুর ছেলে ; তাকে আমি পনর টাকাই দিচ্ছি, দেবোও···লোকসান যাচ্ছে মাসে মাসে···যাক। মোহিত আমার বন্ধু ছিল, বুঝলে রামলাল !

রামলাল চতুর লোক।—আজ্ঞে।—বলিয়া সে খসড়ার উপর হইতে মুখ তুলিয়া মনোহরের দিকে চাহিত না, চারিদিকে চোখ ফিরাইত বিদুরের খোঁজে·· দেখিত, বিদুর বারান্দায় বসিয়া তার বাবার বন্ধুর জন্য তামাক সাজিতেছে···রামলালের মুখ কঠিন হইয়া উঠিত—প্রভু তার বন্ধুর ছেলের নিকট হইতে এম্‌নি করিয়া অগাধ করুণার মূল্য আদায় করিয়া লইতেছেন।

রামলালের অবনত আর রক্তবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতজ্ঞ মনোহর বলিতেন,—বিদুর তামাক সেজেছে ত' হয়েছে কি ! সে-ও ত'—

মনোহর তারপর কি বলিতেন কে জানে ; বোধ হয় বলিতেন,—ছেলের মত, যেমন তুমি··

কিন্তু রামলাল সোজা তাঁহার চোখে চোখে চাহিয়া বলিয়া ফেলিত,—ভৃত্য। কিন্তু ওর বাবা যে আপনার বন্ধু ছিলেন। ওর বদলে আপনার জামাইকে ডেকে তামাক সাজতে বললেই পারতেন !···ও নাচার, পনর টাকার খোঁটা দিয়ে তাই আপনি ওকে অপমান করছেন।

রামলালের মনে পড়িত, একবার বিদুরের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, নিমন্ত্রণ বাড়ির কর্তা, বউ ছেলেমানুষ বলিয়া তাহাকে গৃহে আনিতে পাল্কী না পাঠাইয়া ঝিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোহিত তখন জীবিত, তিনি বধূকে ঝিয়ের সঙ্গে পাঠান নাই··· পরে পাল্কী আসিলেও ফেরৎ দিয়াছিলেন ; বলিয়া দিয়াছিলেন,—মেরামৎ আমি চাইনে।

মনে পড়িয়া রামলালের কণ্ঠ হইত···কিন্তু মনোহর সেদিকে সেয়ানা, আর কথা কহিতেন না·· রামলাল গুণী লোক ; তার বে-আদপি অকস্মাৎ অন্যদিকে মন দিয়া তিনি হজম করিয়া ফেলিতেন।···একবার কি একটা অপরাধে রামলালের জরিমানা করা হইয়াছিল···মনোহর চটিয়া জরিমানা ঘোষণা করিয়াছিলেন প্রকাশ্যে, কিন্তু টাকাটা আদায় করেন নাই ; উপরন্তু গোপনে রামলালের ছেলেকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে মেঠাই খাইতে দু'টি টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু মনোহরের কৃপাপ্রদত্ত ঐ আট টাকার প্রায় ডবল পনর টাকাতেও বিদুরের বড়

কায়ক্লেশে দিন চলিত···একেবারে উঞ্ছবৃত্তিধারী ভবঘুরের মত যেমন তেমন করিয়া যা তা সাজে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে বিদুর পারিত না···টাকাকটি সবই খরচ হইয়া যাইত।

বিদুর অসুখে পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে অসুখ মারাত্মক দাঁড়াইয়া গেল। অসুখটা কি ডাক্তার তাহা চিনিতেই পারিলেন না।

যেদিন বিদুর অসুখে পড়ে সেদিন সকাল বেলা উঠিয়া দৈহিক বিকার সে অনুভব করে নাই। চা খাইয়া মনোহরের আড়তে যাইয়া হাত-বাক্সের সম্মুখে বসিবার সময় অতিশয় তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা যেন মস্তিষ্কের চারিপ্রান্তে শতমুখে বিদ্ধ করিয়া এক মুহূর্তের জন্য চিঁড়িক মারিয়া উঠিল···তারপর আর কিছুই নাই।

খাতা-লেখার কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে বিদুর তাহার হাতখাতায় বারোবার শ্রীদুর্গার নামটি লিখিয়া, খাতাখানা কপালে ছোঁয়াইয়া দিনের কাজ সুরু করিত। সেদিন "শ্রী" লিখিতে যাইয়াই বিদুর দেখিল, তার চোখ আর খাতাখানার মধ্যবর্তী বায়ু যেন স্বচ্ছ নয়; পূর্বের হস্তাক্ষরগুলি ঝাপসা দেখাইতেছে।···কলম আর কাগজের দিকে কষ্ট করিয়া চাহিয়া থাকিয়া "শ্রী"-এর প্রথম বক্ররেখাটি সে অতিশয় সাবধানে, কলমটা চিত্রকরের তুলির মত টানিয়া টানিয়া ধীরে ধীরে বহু বিলম্বে নিপুণতার সহিত শেষ করিল।·· শেষ করিয়া, দ্বিতীয় অক্ষরটি লিখিতে তার আলস্য বোধ হইতে লাগিল···এবং সেইটা শেষ করিয়াই তার মনে হইল, যেন বিরাট একটা কাণ্ড সে শেষ করিয়া তুলিয়াছে·· এ দু'টি অক্ষর যেন বিস্ময়কর পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দু'টি বৃহৎ জগৎ···সেই দু'টি জগৎ সে প্রাণান্ত পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে।···হাত কাঁপিয়া তৃতীয় অক্ষরটি বেঁকিয়া বিকৃত খাপছাড়া হইয়া গেল··· কলম দোয়াতের ভিতর ছাড়িয়া দিয়া বিদুর সেই অক্ষর তিনটির দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল···চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়া গেল···চোখের পাতা ভারি হইয়া আর উঠিতে চাহে না···

প্রত্যেকটি মুহূর্ত ঘর্ষণ খাইয়া কর্কশ একটা শব্দ করিতে করিতে দূরে-দূরান্তে অদৃশ্য হইতেছে···হাত যেন ঘুমাইতে চাহিতেছে—

ঢুলিতে ঢুলিতে দু'বার চমকিয়া উঠিয়াই হাত আবার এলাইয়া পড়িল কলমটি আর তুলিয়া লওয়া হইল না। রাস্তার উপর হইতে লোকের গলার শব্দ আসিতেছে— বিদুরের মনে হইতে লাগিল, সে শব্দ যেন মেঘলোক হইতে নির্গত হইতেছে, অস্ফুট অথচ অবিরাম।· চোখের সম্মুখে কতকগুলি মূর্তি নড়িতে লাগিল—তাহাদের কলরব পরস্পরকে পরাস্ত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছে···

বিদুরের আচ্ছন্ন এই ভ্রমটা হঠাৎ দূর হইয়া গেল রামলালের ডাকে—

—এ্যাঁ।—বলিয়া চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে উঠিতে যাইয়া পারিল না। কখন সে দেয়ালে পিঠ দিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাও সে জানে না।

## ॥ দুই ॥

পালকিতে করিয়া বিদুরকে বাড়ীতে আনা হইল।

রামলাল আর পানু ধরিয়া লইয়া যখন তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলো তখন তার চোখের রং রক্তজবার মত !···শুইয়া সে উর্ধ্বদিকে চাহিয়া রহিল, কাহারো ডাকে সাড়া

দিলো না, কাহারো প্রশ্নের জবাব দিলো না।…গায়ের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল · রামলালের সাহায্যে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা শুরু হইল…

কিন্তু ফল বিশেষ হইল না। ডাক্তার বিদুরকে প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু বিদুরের কানে ডাক্তারের প্রশ্ন গেছে কি না তাহাই বোঝা গেল না…বুকে কল বসাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কোথায় কোন্ যন্ত্র বিকল হইয়াছে, কোথাও মরিচা পড়িয়াছে কিনা।… তবু তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধ দিলেন।

রামলাল শরতের ধৈর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। রামলাল শুনিয়াছিল, বিদুরের স্ত্রী বুদ্ধিমতী; কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা তাহাকে যে এমন আত্মস্থ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে তাহা সে চক্ষে না দেখিলে শুনিয়া বোধ হয় অনুমান করিতে পারিত না। পাল্‌কিতে তুলিয়া বিদুরকে বাড়ীতে আনিবার সময় রামলাল শঙ্কিতচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, না জানি কান্নাকাটির আর অস্থিরতার কি তুমুল কাণ্ডটাই দেখিতে হইবে। …কিন্তু শরৎ কান্নাকাটি কিছুই করিল না, আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না · সে নিঃশব্দে বাহকদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর শয্যায় বসিল। সে বসিবা মাত্রই তার বসা দেখিয়াই রামলালের মনে হইল, সে আর উঠিবে না…ঐ শয্যার বাহিরে তার আর প্রয়োজন নাই…স্বামীর রোগশয্যা ছাড়া আর সব তার কাছে শূন্য হইয়া গেছে।

নূতন ধরনের ব্যাধি দেখিয়া শিক্ষানবীশ ডাক্তার একবার ডাকিতেই তিনবার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। পানু ঔষধ আনিতে লাগিল…ডাক্তার চার ঘণ্টায় তিনবার ঔষধ পরিবর্তন করিলেন…রামলালের ছেলে দু'টি রোগীর মাথায় বরফ দিয়া রাত জাগিল; কিন্তু বিদুরের চোখের লাল কাটিল না, মুখে শব্দ আসিল না, গায়ের উত্তাপ কমিল না।

* * * ভোর বেলা অকস্মাৎ জ্ঞান ফিরিয়া বিদুর চোখ মেলিয়াই দেখিল, শরৎ তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে…ইচ্ছা হইল, শরতের মাথার উপর হাত রাখে, কিন্তু হাত অতদূর উঠিল না; বলিল,—আমি চললাম, শরৎ।

শরৎ স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল; বিদুর বলিল,—মিথ্যে নয়, ; মনটাকে ক্ষয় ক'রে এনেছি…যে ইচ্ছার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে সে জোর আমার নেই, আমি তা বোধ করছি। এখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি…কিন্তু সে ইচ্ছাটা আমি এতদিন নিজের অজ্ঞাতেই প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘন ক'রে গেছি।… এখন দেরী হ'য়ে গেছে।

শরৎ বলিল—না, তুমি বাঁচবে, আমার ইচ্ছায় তুমি বাঁচবে।

কথাটা কানে যাইয়া বিদুরের মনে হইল, স্ত্রীর এ দৃঢ় প্রত্যয় বুঝি ব্যর্থ হইবার নয়; বলিল,—দেখো চেষ্টা ক'রে।… ডাক্তার এসেছিল ?

—হ্যাঁ।

—কি ব'লে গেল ?

—বলেনি কিছুই; ওষুধ দিচ্ছে।

—টাকা দিচ্ছো কোত্থেকে ?—বলিয়াই বিদুর স্ত্রীর হাতের দিকে চাহিল…ক্ষয়াবশিষ্ট ক'বেকার সেই দু'খানি স্বর্ণালঙ্কার—একদা হাতে উঠিয়াছিল…

কিন্তু তা আছে। শরৎ বলিল,—রামলালের স্ত্রী রাত্তিরে এসেছিল।…বাবা নাকি রামলালের কাছে একশো কুড়ি টাকা পেতেন; তাই সে দিয়ে গেছে।

শুনিয়া বিদুরের নিষ্প্রভ চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; বলিল,—মিছে কথা, শরৎ; সে আমাদের দিয়েছে।

দু'জনেই নিঃশব্দ হইয়া রহিল—দু'জনারই অন্তর বিগলিত হইয়া যেন দয়াময়ের পায়ের উপর লুটাইতে লাগিল। বিদুর জিজ্ঞাসা করিল,—শান্ত কই ?

—ঘুমুচ্ছে।

—তুমি তাকে মানুষ ক'রো…তাকে মানুষ হ'তে দিও।

শরৎ চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—আমি কাছে থাকলেই তুমি এমনি প্রলাপ বকবে।

বিদুর কাতর হইয়া বলিল,—আর বকবো না…কিন্তু তোমাদের আমি ভাসিয়ে চললাম।—বলিতে বলিতে এক ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

শরৎ তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া দাঁড়াইল…বিদুরের অশ্রু চোখের জল উপাধানে পড়িতে লাগিল।

বিদুরের শেষ কথাটি ঐ—অশ্রুর শেষ প্রবাহ ঐ—বুকের শেষ প্রদাহ ঐ—

পরক্ষণেই শরৎ যখন তার কাছে গেল তখন তার শ্বাস নাভিমূল হইতে উত্থিত হইতেছে…চোখের তারা স্থির হইয়া গেছে।…

## ॥ তিন ॥

ছেলে বড় হইয়াছে ; এখন সে সাত বছরের। কিন্তু তার শান্ত নাম সার্থক হয় নাই।

শরৎ মাঝে মাঝে বসিয়া তাই ভাবে…স্বামী তাহার জীবনে যে মাধুর্য ঢালিয়া দিয়া গেছেন তাহা মন্দাকিনীর স্রোতের মত অনন্ত…বাইশ বছরের অগাধ উদ্বেলিত আনন্দের অখণ্ড মূর্তি ঐ ছেলে…রক্ত, মজ্জা, মেদ, মর্ম, সম্বিৎ আশা—সব মিলিয়া সে যে নারী তাহাদেরই সে নিখিলব্যাপী সার বিন্দু—কিন্তু বড় দুরন্ত ; ঘর বাড়ী যেন দুহাতে আকাশে তুলিয়া সে ঘুরাইতে থাকে…সংসার ছন্নছত্র হইয়া যায়। তা যাক…কিন্তু ছেলে নিজের অকল্যাণ ঘটাইয়া না বসে।

শরতের বুক টাটায়…তার এত সতর্কতা যেন দুই পাশে অতল গহ্বর লইয়া সে সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছে…গা টলিলে, পা টলিলে, মাথা টলিলে আর বাঁচা যাইবে না…শরতের গা ঘামিতে থাকে।

তার নিজেরও মনে পড়ে—এবং আরও আগেকার কথা শাশুড়ী বলিতেন, বিদুরও অমনি দুর্দান্ত দুর্বশ্য ছিল…

শান্তও তেমনি অশান্ত, শরৎ আশা করে, বাপেরই মত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার এই দুর্দম ঝঞ্ঝার বেগ শান্ত হইয়া আসিবে…কিন্তু এখন যে বড় নিরুপায় মনে হয় !

শরৎ ভাবে।…শুধু সে মা নয়, সে অভিভাবিকা…মৃত্যুশয্যায় স্বামী তাহাকে ছেলের ভার অর্পণ করিয়া গেছেন…তাঁর মুখ দিয়া পিতৃকুলের আকাঙ্ক্ষার কথা নির্গত হইয়াছিল—তর্পণপিপাসু পরলোকগত আত্মা তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

শান্তর চেহারা তার বাপের মত নয়—কিন্তু শরৎ হঠাৎ চমকিয়া ওঠে—ছেলের ঠোঁট যেন ঠিক সেই রকম করিয়া মুচড়াইয়া ওঠে, হাসিটা যেন তেমনি ভঙ্গীতে ফোটে, চোখের চাহনিটা তেমনি সতেজ মনে হয়। পরক্ষণেই সে-বিভ্রম লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু অতীতের স্মৃতি উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে।

শরতের অভাব হয়তো আছে, কিন্তু চলিয়া যায়। মনোহর দত্ত বিদুরকে দিয়া তামাক সাজাইতেন বটে, কিন্তু বিদুরের স্ত্রীকে কেহ চাল কাঁড়াইতে ডাকিল না।

শরৎ ব্যবসা সুরু করিয়া দিলো। রামলালকে দিয়া আদালতের নীলামে এক ঢেঁকি কিনিয়া চিত্ত তার বারান্দায় পাতিয়া দিলো; ধান কিনিয়া শরৎ সেই ধান ঢেঁকিতে ফেলিয়া চাল করে; লাভে বিক্রয় হয়।

ভাড়াটে চিত্ত হোটেলে কাজ করে।...গাঙ্গুলীর হোটেলে লোক সমাগম খুব; আধ মণ তরকারী সে রোজ রাঁধে। চিত্ত সন্ধ্যাবেলা ফলমূল ঝাঁকায় ভরিয়া বহিয়া দিয়া যায়...অনেক রাত অবধি জাগিয়া শরৎ তরকারী বানাইয়া রাখে...ভোরে কাজে যাইবার সময় চিত্ত তরকারীর ঝাঁকা লইয়া যায়; গাঙ্গুলী পারিশ্রমিক দেয়।

ধানের লাভ, ঘরের ভাড়া, তরকারীর আজুরা—সবই কম, কিন্তু তাহাতেই শরতের পেট চলিয়া যায়। কেবল ছেলেটিকে লইয়া তার যত দুর্ভাবনা। বাড়ীর ভিতরে শান্তর যেন নিঃশ্বাস চলে না—ধরিয়া রাখিলে সে ক্ষেপিয়া মরিয়া হইয়া ওঠে।

## ॥ চার ॥

মাথায় টিকি। টিকিটা বেশ পরিচ্ছন্ন; কিন্তু আর-সব আগাগোড়া এমন অপরিষ্কার যে সেদিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে হয়। গোঁফ-দাড়ি কবে কামান হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদের উদ্গম-প্রাচুর্যে ঠাকুরের মুখখানা সশস্ত্র দুর্গের মত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে; পরিধানের কাপড়খানা, কাঁধের উড়ুনি (ঠাকুরের নিজ ভাষায় উত্তরীয়), যার বলে এত দর্প সেই যজ্ঞোপবীত এমন ময়লা যে সে পথে স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা করে না।

গা দিয়া ঘাম ঝরিয়াছিল; সেই ঘাম মরিয়া গায়ের ময়লা স্থানে স্থানে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।...হাত-পায়ের নখগুলি বড় বড়...ঠাকুর ডানা চুলকাইয়াছিলেন বলিয়া হাতের নখের ভিতর কাদা ঢুকিয়াছে, আর ডানার উপর আধ আঙুল ফাঁক ফাঁক গোটা তিনেক ময়লার আ'ল উঠিয়া আছে; পা মাটি ঘাঁটিয়া চলে, তার কথা আর না-ই বলিলাম।

ইঁহাকেই শরৎ ধরিয়া আনিয়াছে। পায়ের ধুলো ব্রহ্মবাক্য আশীর্বাদ এবং অজ্ঞাত যদি কোনো শক্তি থাকে তবে তাহাই প্রয়োগ করিয়া ইনি শান্তি, সান্ত্বনা, কল্যাণ দিবেন ...ছেলের হাত দেখিয়া ইনি তার ভবিষ্যৎ বলিবেন, ছেলের মানুষ হইবার অদৃষ্ট আছে কি না. না উড়োনচণ্ডীর মতই সে চিরকাল বেড়াইবে!...হাতের উপর বিধাতার লিপির লেখা পাঠ করিয়া ইনি সাবধান করিয়া দিবেন...আরও কত কি যে ইনি বলিতে পারেন, তুষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিলেই কত যে করিতে পারেন তাহা শরতের ধারণাতেই আসিল না...এই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্দৈব আর দুরদৃষ্টের স্পর্শাতীত স্থানে লইয়া তাহাকে চিরদিনের মত ছুটি করাইয়া দিতে পারেন...শরৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁর পদধূলি লইল।

ঠাকুর টুলে বসিয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া নিজের নাক বরাবর পা তুলিয়া পায়ের জল মুছিতেছেন, এমন সময় শান্ত দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিল। কপালে ঘাম ফুটিয়া তার মুখখানা আরো সুশ্রী বেপরোয়া দেখাইতেছিল; শরৎ বলিল,—এই ছেলে, বাবা; আমার চোখের মণি।

ঠাকুর বলিলেন,—তা ত' হবেই। বিধবার সন্তান…আহা!…কিছু ভাবিসনে; ছেলের মুখে-চোখে যে লক্ষণ দেখছি তাতে তোর ছেলে অত্যন্ত ভাগ্যমান।…হবেই ত', বাপ-ঠাকুদ্দার পৌরষ ছিল কত।

ঠাকুর ভূমিকায় যাহা শুনিয়াছেন তাহা হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, ইহাদের সুদিন কেবল সেদিন গেছে।…অনুমান না করিলেও, পূর্বপুরুষের প্রশংসার গর্বে আনন্দে গদগদ আর বেসামাল না হইয়া ওঠে এমন মানুষ ত' ঠাকুরের চোখে পড়ে নাই…বড় বড় রথীকেই তিনি ঐ অস্ত্রে ঘা'ল করিয়াছেন, এ ত' স্ত্রীলোক।

—শান্ত, এদিকে আয়; ঠাকুর মশাইকে গড় কর।—বলিয়া শরৎ শান্তকে হাত ধরিয়া আনিয়া ঠাকুরে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলো।

ঠাকুরের টিকি ছিল পিছনে—কিন্তু টাক আর নাক ছিল সম্মুখেই—শান্ত ঠাকুর মহাশয়কে গড় করিয়া সেই টাক আর নাকের বিপুলতার দিকে চাহিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। · ঠাকুর তাহার ডান হাতখানা তুলিয়া লইয়া এক নজর দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, —ইস্‌!

শরৎ আঁৎকাইয়া উঠিল,—কি বাবা?

শান্তর হাতের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—বিষুব-রেখা চক্রকেন্দ্র স্পর্শ ক'রে গেছে; ফলম্‌ ধনাগম্‌…তোর এ ছেলে দ্বাদশ বৎসর বয়সেই প্রচুর ধনের অধিকারী হবে, মা।

শরৎ ভাবিতে লাগিল। ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শরৎ বলিল,—বাবা, ওকে কি কেউ পুষ্যি-পুত্তুর নেবে?

—না। তবে হস্ত-রেখায় দেখছি, নিরন্নের অন্নদাতা, আয়ুষ্কালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত…দ্বাদশ বৎসর থেকে তার পত্তন…ধীরে ধীরে উন্নতি…রেখার সমাপ্তি…গুরু-কুণ্ডলী চক্রং…স্বর্গে শুভং কার্যং পাতালে ভদ্রা চ ধনাগমঃ…

বলিয়া ঠাকুর শরতের মুখের দিকে চাহিয়া পুলকিত নেত্রে হাসিতে লাগিলেন। শরৎ ব্যাকুল হইয়া বলিল,—বাবা, আমায় সব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলো। ছেলে লেখা-পড়া কেমন করবে…বে-থা ক'রে সুখী হবে কি না…বাপ-ঠাকুদ্দার নাম রাখতে পারবে কি না?

অতিশয় মোলায়েম কণ্ঠে ঠাকুর বলিলেন,—পারবে, আরো উজ্জ্বল করবে। ছেলে তোর দীর্ঘজীবী হবে।

—বড় দুরন্ত যে!

—তা হোক। এমন থাকবে না।

শরতের মনে পড়িল, স্বামীও অতিশয় একগুঁয়ে দৌরাত্ম্য-পরায়ণ ছিলেন। মিলিয়া গেছে দেখিয়া সে পুলকিত হইল। ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—লেখাপড়া তেমন শিখবে না।

ঠাকুর জানিতেন লেখাপড়া শিখাইবার ক্ষমতাই ছেলের মায়ের নাই। বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু যার বুদ্ধি খর সে কেটে বেরিয়ে যাবেই।…তোমাকে ও সর্বপ্রকারে সুখী করবে; নাতি-নাতনীতে ঘর ভ'রে যাবে।…দেখি মা, তোর বাঁ হাতখানা।

শরতের বাম করতলের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—মৃত্যু পঁচাশী বৎসর বয়সে, মহাতীর্থে…মা তোর ভাগ্য ভাল।…দেখতে দেখতে এ দুর্দিন তোর কেটে যাবে …তোর চক্রাধিপতি স্বয়ং নারায়ণ।

শুনিয়া শরৎ শিহরিয়া উঠিল। গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এমন ভক্তিভরে যেন ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়া ওঠা, আর দীর্ঘ জীবনব্যাপী এত সৌভাগ্য ঠাকুরেরই এখনকার সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে।

শান্ত লাফাইয়া উঠানে পড়িল ; ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমার কালীপুজো ক'রে দিয়ে যাও না, ঠাকুর ; আমি ভাল পেরে উঠছিনে। কালী জিব বের ক'রে ছিলেন, তোমায় দেখে টেনে নিয়েছেন। এসো···

—আসছি আমি।—বলিয়া শরৎ ধাইয়া যাইতেই শান্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঠাকুর দেখিলেন, পাতা ছাড়াইয়া একটা কলার ডাঁটাকে কালীমূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে ; কাঠি গুঁজিয়া মূর্তির হাত-পা প্রস্তুত হইয়াছে···কাঠিরই জিবটা খুলিয়া পড়িয়া গেছে···ডাঁটার গায়ে সেইখানে একটা ছিদ্র আছে ; হাসিয়া বলিলেন,—এই উৎপাতটা একটু স'য়ে থাকিস, মা। ধর্মে মতি, দেব-দ্বিজে ভক্তি ওর হবে, এমনি ক'রেই হবে।

···আরো দশবিশটা ঠাণ্ডা কথা বলিয়া হারাধন ঠাকুর আট গণ্ডা পয়সা, একসের চাল, দু'টি গোল আলু গামছায় বাঁধিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; শরতের সঙ্কুচিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, মা ; ভক্তি ক'রে যা দিয়েছ তা-ই যথেষ্ট···নারায়ণ তুলসী পেলেই খুসী।

শরৎ আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; ঠাকুর প্রস্থান করিলেন—কিন্তু যাঁর হাত দিয়া সৌভাগ্য সুখ মাণিক—বৃষ্টির মত অজস্র ধারায় মাতা-পুত্রের মাথার উপর ছড়াইয়া পড়িবার কথা, তিনি তখন কি মনে করিলেন তাহা তিনিই জানেন।

॥ ৫ ॥

সেইদিনই—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, কিন্তু শান্তর এখনও দেখা নাই। শরতের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।···সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত আনমনায় ; তুলসীমূলে প্রণাম করিবার সময় কাহাকে প্রণাম করিতেছে বুকে জল ছল্‌ছল্‌ করিয়া শরতের তাহা মনে পড়ে নাই···

দুপ্‌দাপ্‌ একটা দুরন্ত পায়ের শব্দ থাকিয়া থাকিয়া তার কানে আসিতেছে, কিন্তু সেটা তাহারই অশান্ত মনের ভুল···দুয়ারের দিকে চোখ পাতিয়া থাকিতে থাকিতে একটা দুঃসহ আতঙ্কে সে বারবার চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিল···বাহিরের ঘন অন্ধকার ঘনতর হইয়া দূরের আকাশ দূরের দৃশ্য যেন চিরদিনের মত গলাধঃকরণ করিয়া অজগরের মত অগ্রসর হইতে লাগিল···কলের চিম্‌নিটা, শ্বেত একটা অট্টালিকার খানিকটা, ফলশোভিত খর্জুর বৃক্ষটি, গৃহচূড়াগুলি···চির-পরিচিত যারা তারা চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকারের জঠরে নিরবশিষ্ট হইয়া একে একে নিঃশব্দে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে···মূকের নীরব বেদনা শরতের প্রাণে বাজিতে লাগিল।

শান্ত এখন কোথায় কে জানে—হঠাৎ শুকাইয়া উঠিয়া শরতের বুকের বায়ু বুকের ভিতরেই আট্‌কাইয়া অচল হইয়া রহিল।

আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শরৎ উঠিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল···গলি বাহিয়া সদর রাস্তার হাত দুয়েক সেখান হইতে দেখা যায়···লোকজন যাতায়াত করিতেছে

…অতি অল্প সময়ের জন্য মানুষের অবয়বটা আর গতিটা চোখে পড়ে…শরতের একাগ্র উন্মুখ বিহ্বল চোখের সম্মুখে যেন ছায়াবাজি চলিতে লাগিল।

ভাড়াটে চিত্ত কাজ করে হোটেলে ; তাহার ফিরিতে রাত সেই এগারটা, কি তারও বেশী।…ঘরের প্রদীপ তেল ফুরাইয়া নিবিয়া গেল ; চাঁদ ছিল না…আকাশে তার আভা ফুটিয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল ; সন্ধ্যার নক্ষত্রটি আড়ালে নামিয়া গেল…লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিল।.. কোথা হইতে স্যাক্‌রার হাতুড়ির খট্‌ খট্‌ শব্দ আসিতে-ছিল, জাগ্রত পৃথিবীর সমাচারের মত…সেটা বন্ধ হইয়া গেল।

শরৎ গলির প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। কুকুরের ডাক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল ; চতুর্দিকে সেই নিশাচরের সতর্ক কণ্ঠ তার নিজের ভাষায় পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, যেমন উচ্চ তেমনি গভীর…দ্রুতবেগে কি একটা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া গেল।

.. দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শরতের হাঁটু দুটি যেন যেন জড়াইয়া আসিতে লাগিল…কিন্তু শান্তর দেখা নাই…অনেক দূরে চৌকিদার হাঁক ছাড়িল…শরৎ যাইয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

## ॥ ৬ ॥

মনোহর দত্ত চেয়ারে বসিয়া ছিলেন ; অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাত্রার সবগুলি পাত্র-পাত্রীকেই তাঁর মনে হইতেছিল যেন সং…দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি জনক, পঞ্চমুখ ব্রহ্মা, মহাতপা মুনি হইতে ভগ্নদূতটি পর্যন্ত কি যে বলিতেছে—তার না হয় অর্থ, তাতে না আছে রস। অর্থ আর রস তাদের কথায় হয়তো ছিল ; কিন্তু মনোহর দত্ত অতিশয় গোপনে পাত্র টানিয়া যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর রসবোধ লইয়া যাত্রা শুনিতে আসিয়া বসিয়াছিলেন তাহাই একটু যেন কেমন, কাজেই তাঁর ভাল লাগিল না।

খানিক ঢুলিয়া খানিক সজাগ হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে লণ্ঠন লইয়া ভৃত্য পানু আসিয়াছিল…তাহাকে অনুবর্তী হইতে সঙ্কেত করিয়া তিনি অটল পদে অগ্রগামী হইলেন।…আসরের বাতাস লোকের নিঃশ্বাসে গরম হইয়া উঠিয়াছিল… বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগিয়া মনোহর আরাম বোধ করিলেন…ব্যাটারা যেন কি! একটু আক্কেল যদি ব্যাটাদের থাকে! এ কি যাত্রা না ছাই! ..যাত্রা ছিল যাদব পাক্‌ড়াশীর …যাত্রা বলে যাকে! গাইত কি!…চা'র চৌকশ ছিল তারা। এদের ডেকে ব'লে দিতে হবে, এমন দল না ক'রে যেন বেগুণ বেচে!

ভাবিতে ভাবিতে নিজের রসটাই উপভোগ করিয়া মনোহর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ; খানিক হাসিয়া বলিলেন,—ওরে পানু, গান শুনলি ?

পানু পশ্চাদ্দিক হইতে বলিল,—আজ্ঞে শুনলাম।

—কেমন শুনলি ?

ইতস্ততঃ করিয়া পানু মনের কথাটাই বলিল,—মন্দ নয়, বাবু।

—হি, হি। তোর যেমন আক্কেল আদেখ্‌লে মন। যাত্রা ছিল যাদব পাক্‌ড়াশীর …গান একবার জুড়লে কার সাধ্য নড়ে—ঠায় বসিয়ে রাখবে শেষ রাত অবধি।

পানু বলিল,—যে আজ্ঞে।

—তাই বল্...থিয়েটার দেখেছিস কখনো ?

—দেখেচি, বাবু ; এখানকার বাবুদের।

শুনিয়া মনোহর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—এখানকার বাবুদের থিয়েটার ! সে ত' থিয়েটারের ঠাট্টা রে···আমিও দেখেছি···এদের সব পৌরাণিক বাবু—ভীম অর্জুন সবাইকে এরা নিজেদের ঢঙে সাজায়···বুঝলি রে ? এরা ভুল করে।...কলকাতার থিয়েটার আমি দেখেছি ; আমরা বলি থিয়েটার, তারা বলে রঙ্গালয়...রঙ্গালয় নয়, যেন নন্দনবন ; হারে রে রে ঝম্ ঝম্ করছে একেবারে। ··নিজেরা ত' সাজেই যাকে যেমনটি মানায় .. চ্যাপ্টা নাক মেয়েগুলোকে এমন অপ্সরী সাজায় যে—বুঝলি, পানু ?

পানু বলিল,—আজ্ঞে শুনছি।

—শোন্ তাই।.. এমন সাজায় মেয়েগুলোকে যে দেখলে তুই বলবি, ওরা যাদু জানে...তুই আর আসতে চাইবিনে।···দেখেছিস কখনো ?

চ্যাপ্টা নাক মেয়েরা অপ্সরী সাজিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে, সে আর আসিতে চাহিবে না, বাবুর মুখে এমন কথা শুনিয়া পানু মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল, বাবু কি ! .. বলিল,—দেখিনি, বাবু।

—দেখে আসিস একবার, গোজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যাবি। ..সেখানকার রাবণ বিভীষণের দাদা, এখানকার লরু লায়েকের ভাগ্নে নয়।...আরে, এখানে-সেখানে বিস্তর—

বলিতে বলিতে মনোহর দত্ত ঝপ্ করিয়া থামিয়া গেলেন—দশ হাত দূরে একটি স্ত্রীলোক দাড়াইয়া আছে···পথ নির্জন, আর রাত দুপুর...মনোহর যাহা অনুমান করিয়া লইলেন তাহা গোলাপী হইলেও একেবারেই ভুল···

শরতও তাঁহাকে দেখিয়াছিল ; মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সে একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল। মনোহর দত্ত ধীরে ধীরে তার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—ছুটো দেখছি··· দরদস্তুর করতে হবে, না একদরে বিক্রয় ?—বলিয়া তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন, এমন নির্ভয়ে যেন অবধ্য দূত তিনি।

পুত্রবতী কুলবধূর সম্মুখে তখন স্বর্গত সপ্তপুরুষ হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; প্রশ্ন করিতেছিল—যে জল দিয়া তিল দিয়া তর্পণ করিয়া আমাদের শীতল করিবে সে কই ?

প্রশ্নের উত্তর ছিল না—ত্রাসে শরতের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। মনোহরের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়াময় ইহলোক সহস্রবাহু রাক্ষসের মত তার দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল—কি উদ্দেশ্যে সে চারিদিকে চাহিল তাহা সে বোধ হয় নিজেই জানে না···কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল, একটা লোহার গরাদে...অর্ধ-চেতনা অর্ধ-অচেতনার মাঝেই সে চক্ষের নিমিষে সেটা তুলিয়া লইয়া মনোহর দত্তের গা বরাবর বসাইয়া দিলো এক ঘা—

ঘা কোথায় যাইয়া পড়িল কে জানে—মনোহর দত্ত একবার পাক খাইয়া "মরিছি" বলিয়া ধরাশায়ী হইয়া বিরাট উদর আকাশে তুলিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

পানু তফাতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঠক্ ঠক্ করিয়া হাত পা কাঁপিয়া তার হাতের লণ্ঠন মাটিতে পড়িয়া গেল...পরক্ষণেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল—খুন, খুন···

এবং দেখিতে দেখিতে সেই জনমানবহীন রাজপথের উপর জনারণ্য যেন মাটি

ফুঁড়িয়া গজাইয়া উঠিল। গরমের দিনে মানুষের ঘুম তখনও আঁটে নাই; চতুর্দিকের দরজা খুলিয়া হু হু শব্দে লোক বাহির হইয়া আসিল...শতকণ্ঠে প্রশ্ন হইতে লাগিল—কে মারলে?

পানু বলিল,—ঐ মাগী।

শরতকে সে চিনিতে পারে নাই। শরৎ তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে...শান্ত যে তখনও ফেরে নাই এ অশেষ উৎকণ্ঠাও তার যেন শেষ হইয়া গেছে। লোকের কলরব সুদূরাগত অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনধ্বনির মত তার কানে যাইতেছে...

একটা লোক উপুড় হইয়া পড়িয়া দত্ত মহাশয় মৃত কি জীবিত তাহাই পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষার বিশেষ দরকার হইল না—দত্ত মহাশয় মূর্ছিত অবস্থাতেই হাঁ করিয়া মুখ দিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিতেই যে লোকটা পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল সে তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া লইয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল,—ও।

ভূধর বলিল,—কি?

সেই লোকটা হাতে কল্পিত গেলাস ধরিয়া চুমুক দিয়া কিছু পান করিবার ভংগী করিয়া হাসিতে লাগিল। অমন করিয়া খাওয়া যায় জল, সরবৎ, দুধ, ঘোল, আরো কত কি...তাতে হাসির কি থাকিতে পারে! ভূধর বলিল,—তাই নাকি?

—হুঁ।

তৎক্ষণাৎ দুর্ভাবনা কাটিয়া লোকগুলি যেন কৌতুকে মাতিয়া উঠিল...একজন মেয়েদের উদ্দেশে চেঁচাইয়া বলিল,—তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও; দত্ত মশায় ভালই আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর।

রুজের বাড়ীর মেয়েরাও দৌড়াইয়া আসিয়াছিল...অন্ধকার একটা কোণে জড় হইয়া প্রথমে ভয়ে জড়সড় নির্বাক হইয়া গিয়াছিল ..পরে গুঞ্জন সুরু করিয়া রুজের শ্যালিকা তামাসা দেখিতে আসিয়া হাইতোলার নিন্দা করিয়া রুজের মেয়েটিকে বলিতেছিল,—ঢুলবি যদি দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মতন, তবে এসেছিলি কেন?...এমন সময় তামাসা তেমন ঘোরালো নয় সংবাদ পাইয়া তিনিই অগ্রবর্তিনী হইয়া সবাইকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

...তারপর জন সাতেক ষণ্ডায় মিলিয়া, মনোহর দত্তের দেহখানা কেহ নীচ হইতে তোলা দিয়া, কেহ উপরের দিকে টান রাখিয়া, কেহ পাশের দিকে ঠেকা দিয়া হিঁও হিঁও করিয়া নিকটবর্তী বারান্দায় তুলিল...তারপর তাঁর উপর জল ঢালিতে লাগিয়া গেল... রঞ্জন লণ্ঠনটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল,—পেটের উপর কেউ বসলে কেমন হয়? অনেকখানি অনাবশ্যক বাতাস আটকে আছে।

—দাঁড়া, আগে দেখি।—বলিয়া ভানু সরকার দত্ত মহাশয়ের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে বলিল,—দেখ ত', মাথাটাও নড়ছে কি না?

রঞ্জন লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—নড়ছে না।

—তবে পেটের উপর বসিসনে...মাথায় একটু হাওয়া কর।

—আপনি উঠবে, আর হাওয়া করতে পারিনে বাবু।

শুনিয়া সকলেই সুস্থির হইয়া দত্ত মহাশয়ের আপনা হইতে উঠিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। রঞ্জন বলিল,—তাস পেলে খেলতাম...কখন উঠবে কে জানে?

কিন্তু ইতাবসরে আরো অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

মনোহর দত্তের গদিতে তখন গুটাইবার তাড়া...ছোট মুহুরী লোকনাথ পাল উঠিয়া পড়িতে ব্যস্ত...খাতা লেখা শেষ হইয়াছে, আলোর তেজ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একটি দরজা বাদে অন্যান্য দরজাগুলি বন্ধ করা হইয়াছে···তামাকে তৈরী হইতেছে, তাহাতেই দু'টান মারিয়া বাতি নিবাইয়া খোলা দরজাটায় কুলুপ লাগাইয়া দিলেই ছুটি—পাশেই হুঁকাটা রাখিয়া লোকনাথ কলিকার দিকে চোখ রাখিয়া হাঁটু তুলিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময় পানু মরি কি পড়ি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিয়া দাঁড়াইল,—শীগগির এসো, পাল মশায়, বাবুকে খুন করেছে।

লোকনাথ আচমকা ভয় খাইয়া লাফাইয়া উঠিতেই তার পাশের হুঁকাটা লাথি লাগিয়া ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িল···

—খুন! বলিস কি?

—হ্যাঁ, প'ড়ে আছেন, দেখবে এসো···রক্তগংগা বইছে···

কিন্তু রক্তগংগা পানুর কল্পিত। পাল মহাশয়ের বিচক্ষণ মাথা রক্তগংগার মাঝে ঘুরিয়া উঠিল···সেকেলে চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল·· প্রভুর মৃতদেহ যেন সম্মুখেই লম্ববান দেখিয়া তাঁর দেহের বায়ু ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। খানিক তো তো করিয়া শেষে বলিলেন,—কোথা?

পানু বলিল,—রাস্তায় রুজের ঘরের সম্মুখে।

—বাড়ীতে খবর দেগে।—বলিয়া টাল সামলাইয়া লইয়া আর সজ্জিত তামাকু ফেলিয়া রাখিয়া পাল মহাশয় ছুট দিলেন...তৎপূর্বে দরজায় তালা লাগাইলেন বটে, কিন্তু ব্যস্ততায় আর ব্যাকুলতায় আর হাত কাঁপিয়া দু'টি কপাটের দুটি কড়া একত্র করিয়া লইতে তাঁর ভুল হইয়া গেল। পানুর মুখে 'প'ড়ে আছেন' কথা দু'টি পাল মহাশয়ের কানে বড় ভয়ংকর শুনাইয়াছিল...অসাড় দেহটা পড়িয়া আছে...গায়ে বোধ হয় এখনো উত্তাপ আছে ...পাল মহাশয়ের সারাগায়ে কাঁটা দিয়া রহিল...

এবং তিনি গলদঘর্ম হইয়া হাঁকপাঁক করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন অন্য দৃশ্য—

রক্তগংগা মিথ্যা কথা—মনিব খুন হন নাই, ঘা'লও বোধ করি হন নাই...অনেকগুলি ফূর্তিবাজ লোকের মধ্যবর্তী হইয়া রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজচক্রবর্তীর মত বসিয়া আছেন —কিন্তু নিঃশব্দে আর মাথা ঝুলাইয়া ··এবং জল এমন প্রচুর পরিমাণে তাঁহার উপর ব্যবহার করা হইয়াছে যে, তাঁর আপাদমস্তকের কোথাও সূচ্যগ্র পরিমাণ শুষ্ক স্থান নাই —কিন্তু এত জলের ভিতরেও তাঁহাকে অতিশয় শুষ্ক দেখাইতেছে···

—বাবু?—বলিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দিয়া পাল মহাশয় বাবুর নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু বাবু ঠোঁটও নাড়িলেন না, ভুরুও তুলিলেন না; প্রভুভক্তির ব্যাকুলতার প্রত্যুত্তরে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পালকেই এবং সম্মুখস্থ আরো চার-পাঁচটি লোককে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে দু'হাতের ধাক্কা দিয়া তিনি দ্রুতবেগে চলিতে সুরু করিয়া দিলেন···জুতা-জামা পড়িয়া রহিল...পাল মহাশয় ঠেলা সামলাইয়া দূরে থাকিয়া তাঁর সংগ লইলেন।

আঘাত গুরুতর নয়—মনোহর দ্রব্যগুণে টলমল করিতেছিলেন, মাটির দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল; এবং সেই ঝোঁকের বশেই তিনি মাটি লইয়াছিলেন; মার খাইয়া তিনি যত ব্যথা না পান, অপ্রস্তুতে পড়িয়া গিয়াছিলেন খুব...চোখ খুলিয়াই দেখিতে পাইয়াছিলেন —এত লোকের একজনও বিষণ্ণ, এমন কি নির্বিকারও নয়···সবারই মুখে ক্ষীণ একটু

হাসি···হাসি ক্ষীণ বটে, কিন্তু সুপ্রচুর অর্থ বাজাইয়া হাসিটা যেন তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে···আর তাঁর দেহখানা লইয়া যে প্রক্রিয়া করা হইয়াছে তাহাও চোখে পড়িয়া তাঁর আনন্দ জন্মিল না·· মনোহর তাই ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দৈবকীর কথাটা কানে লইয়া মনোহর চলিতে লাগিলেন। বক্তা কে তাহা অবশ্য মনোহর বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে কেমন তাহা ওরা বুঝিয়া ফেলিয়াছে এটা তিনি সেই কথাতেই বুঝিয়া ফেলিলেন।

—মাতাল ; ঠিক হয়েছে।

কথা তিনটি অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর সংগে সংগে গেল, শত্রুর পশ্চাতে ধাবমান অভিসম্পাতের মত ; এবং মধ্য পথেই সাক্ষাৎ হইয়া গেল স-পানু স্ত্রী কলত্রের সংগে··· তাঁহারা পর্দা ছিঁড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছিলেন···মানুষের কাঁধে চড়িয়া নয়, মনোহর নিজের পায়েই হাঁটিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

পানু সকাতরে বলিল,—বাবু আসছেন।

কিন্তু বাড়ীতে সে খবর দিয়াছিল খুন হইবার···সদ্যঃনিদ্রোত্থিতা প্রভুপত্নী পতি-বিয়োগের বার্তা অকস্মাৎ পাইয়া যে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই শব্দটা আর তখনকার তাঁর চেহারাটা এখন পানুর বেজায় মনে পড়িতে লাগিল।

ললিতা স্বামীর মৃতদেহ দেখিতে ছুটিয়াছিলেন···স্বামীর সজীব দেহখানাকে ফিরিতে দেখিয়া তিনিও ফিরিলেন।

কোনো কথাই হইল না—কিন্তু স্ত্রীকে চক্ষে দেখিয়াই মনোহরের আড়ষ্ট দেহের অভ্যন্তরে মনটাও গুটাইয়া আড়ষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্ঞান হারাইয়া রাস্তায় পড়িবার কারণ তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে···সেটা কি! অকাতরে জল ঢালিয়া যাহারা তাঁহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরাইয়া দিয়াছে ; মনোহর তাহাদিগকে নগণ্য মনে করেন···তাদের ধার তিনি ধারেন না, কোনো প্রকারেই না ; কিন্তু বাড়ীতে—

মোড়ে আসিয়া মনোহর দাঁড়াইলেন ; বলিলেন,—আমি গদিতে গিয়ে একটু বসব। পানু আমার সংগে আয়। পাল মশাই, ওদের পেঁছে দিয়ে বাড়ী যান।

পাল মহাশয়ের হাত হইতে চাবি লইয়া মনোহর দত্ত গদিতে আসিয়া বসিলেন।

জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া গেছে···রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলি আলো-আঁধারে মাখা ছবির মত দেখাইতেছে···সেই দিকে চাহিয়া মনোহর খানিক নির্বাক হইয়া রহিলেন। পানু বলিল,—তামাক দেবো, বাবু ?

—না।···বাড়ীতে এসে কি বলেছিলি ?

—কিসের কথা, বাবু ?

অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া মনোহর বলিলেন,—আমার প'ড়ে যাবার কথা।

সহজ উত্তরটা সহসা পানুর মুখে আসিল না...জীবিত মানুষের মরার খবর, আর কারো কাছে নয়, সেই মানুষের স্ত্রীর কাছেই বলিয়াছে···তিনি আবার প্রভু···মহা অপরাধই হইয়াছে। পানু প্রভুর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘন ঘন হাতে হাত ঘষিতে লাগিল।

মনোহর বলিলেন,—চুপ ক'রে রইলি যে ? কথার উত্তর দে।

পানু বলিল,—বলেছিলাম যে, আপনি খুন হয়েছেন।—বলিয়াই পানু ঘাড় গুঁজিয়া ভাবিতে লাগিল, প্রভুর পায়ের উপর আড় হইয়া যদি এখনই পড়া যায় তবে বকাবকিটা বোধ হয় অল্পেই মেটে।

কিন্তু মনোহর দত্ত মারমুখী হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন না ; অতিশয় উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে খুন করেছে তা কিছু বলেছিলি ?

—না।

শুনিয়া দত্তের তামাক খাইতে ইচ্ছা হইল ; বলিলেন,—একটু তামাক সাজ, খেয়ে বাড়ী যাই।

পানু তামাক সাজিতে বসিল ; মনোহর বলিলেন,—তবে কাউকে কিছু বলবিনে, বুঝলি ? কে মেরেছে কি বৃত্তান্ত। ··তোর মাইনে কত রে ?

—আপনিই ত' দেন, বাবু, পাঁচ টাকা।

—আট টাকা তোর মাইনে হ'ল আজ থেকে, বুঝলি ?

পানু বলিল,—যে আজ্ঞে বাবু।

—তাকে চিনতে পেরেছিলি ?

—না, বাবু ; বাড়ীর ছাঁইচে আঁধারে দাঁড়িয়ে ছিল।···খোঁজ নেবো ?

—না।···শুনে ওরা খুব কেঁদে উঠেছিল, নয় রে ?

—হ্যাঁ বাবু, কেঁদে উঠেছিলেন···আমি গিয়ে আচমকা ডেকে তুলে অমন কথাটা একেবারে না বললেই পারতাম, বাবু···কিন্তু তখন ত' আমি আমাতে ছিলাম না ; আপনাকে পড়তে দেখেই হকচকিয়ে আমি একেবারে—

মনোহরের বোধ হয় লজ্জা করিতে লাগিল ; বলিলেন,—আচ্ছা, এখন চুপ কর। বাড়ীতে খবর দিয়ে আয়, বাবু ভালই আছেন·· আর এক গেলাস খাবার জল নিয়ে আসিস। দৌড়ে যা। আর শোন—আমি দোকানেই থাকব ব'লে আসিস ; রাত্তিরে বাড়ী যাবো না।

॥ ৭ ॥

মনোহর দত্ত ভূতলে পড়িলেন, কিন্তু তাঁর পতনটা শরতের চোখে তেমন পড়িল না।···তারপর অত ছুটাছুটি, হট্টগোল শরৎ নির্জীব মূর্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিল।

পানু বলিয়াছিল, ঐ মাগী মেরেছে। কিন্তু কথাটা কাহারো কানে ভাল করিয়া গিয়াছিল কি যায় নাই বলা যায় না। কিন্তু যে লোকটা মনোহরের মুখে মদের গন্ধ পাইয়াছিল, তখনকার মত তাহার ইঙ্গিতটাই কাজের হইল বেশী···আহা উহু আর খুনীর তল্লাস লোকে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া সমস্ত ঘটনাটিকেই তামাসায় নামাইয়া আনিল !

মনোহর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিতেই হাসিতে হাসিতে যে যার ঘরে গেল। শরৎ তখনও দাঁড়াইয়া ; লৌহদণ্ড কখন হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেছে তাহাও সে জানে না···

এমন সময় হোটেলের কাজ সারিয়া চিত্ত আসিয়া দাঁড়াইল। সে ঘটনার কতক শুনিয়া আসিয়াছিল ; তবে মদ খাইয়া লোকের বেহুঁশ হইয়া রাস্তায় পড়ার খবর বিশেষ নূতন খবরও নয়, জবর খবরও নয়। চিত্ত আসিয়া দাঁড়াতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শরৎ কাঁদিয়া ফেলিল·· যে জ্ঞানে লোকে পালায় কাঁদে, আপনার জনকে কাছে পাইয়া সে জ্ঞান তার এতক্ষণে ফিরিল ; চিত্ত-র হাত ধরিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—শান্ত কোথায় গেল ভাই, সে আজ বিকেল থেকে বাড়ী আসেনি।

চিত্ত বলিল,—যাত্রা শুনতে গেছে বুঝি ?

—একবার খঁুজে আয়, চিত্ত —

—তা যেতে আমি পারি ; কিন্তু হাজার লোকের মাঝে তাকে কি খঁুজে পাবো ?

—তবু দেখে আয়।···তাকে আনতে না পারিস, সে সেখানে আছে এই খবরটা নিয়ে আয়।

—তা আসছি। তরকারীর ঝাঁকাটা রেখে আসি তোমার ঘরে, এসে যাচ্ছি।

দু'জনে ঘরে আসিল। শরৎ ঘরে আসিতেই তার ঘরের সংগে সন্ধিস্থলটা টাটাইয়া উঠিল ; ঘরের মাটিতে পা দিয়াই সেই বেদনায় সে মাটিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, তার ভুবন একেবারে শূন্য হইয়া গেছে·· যাহা সত্যই ছিল না, তাহা যেন নূতন করিয়া আবার সে হারাইয়াছে। তার কেউ নাই···ভগবান নাই। চিত্ত তাহাকে শান্ত করিতে বসিল,—কেঁদো না, বৌ, চোখের জল মোছো···তোমার মত ছেলে-কাতুরে মেয়ে আমি দেখেছি ত' কি বলেছি ! এই আমি চল্লাম···এই নেও বঁটি ; ওঠো ; কান্নার দিন ত' পড়েই আছে ··তখন কেঁদো যত পারো।

বলিয়া শরতের সম্মুখে তরকারীর ঝাঁকা আর বঁটি দিয়া, যাত্রার আসর যেখানে বসিয়াছিল, সেই স্থানের উদ্দেশে চিত্ত যাত্রা করিল।

সাজঘরের সুমুখ দিয়াই আসরে যাইবার সাধারণ রাস্তা···

ডুগ্ ডুগ্ করিয়া ডুগী বাজিতেছিল—তার নীচে যুগল যন্ত্রের সুর—

চিত্ত সাজঘরের ভিতরের দিকে একবার চাহিল ; দড়ির উপর সাজানো রাজা হইতে ভিখারীর সাজ, আর টেবিলের উপর আয়না তার চোখে পড়িল ; দেখিয়া সে মন্থর পদে অগ্রসর হইতেছিল—হঠাৎ একটা লোকের গায়ের ধাক্কায় সে পথ ছাড়িয়া ছিট্‌কাইয়া দেয়ালের উপর যাইয়া পড়িল। লোকটা যমদূত কি সুবল-সখা সাজিয়াছে তাহা বোঝা গেল না, কিন্তু সুবল-সখার অত বড়টা হওয়া সম্ভব নয়···চিত্ত বলিল,—আঁটকুড়ির বেটা।

তারপর নির্বিঘ্নে যাইয়া যখন একেবারে যাত্রার স্থানে সে দাঁড়াইল, গান তখন জমিয়া উঠিয়াছে···একটি বালক সুচারু কণ্ঠে কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক গান গাহিতেছে·· কৃষ্ণনাম করিয়া যাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন তাঁহাদেরই নামের একটি ফর্দ।

চিত্ত দাঁড়াইয়া গানটি শেষ পর্যন্ত শুনিল—কিন্তু তারপরই যারা চারিদিক হইতে কোলাহল করিয়া উঠিল তাদের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে না পারিয়া চিত্ত ভ্রূভংগী করিয়া রহিল···তারপর শান্ত-র সন্ধানে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল···কিন্তু সে-জনসমুদ্রে বালক কোথায় ডুবিয়া আছে তাহা বাহির করা মানুষের দুঃসাধ্য।

"হারামজাদা ডাকাত ··চোখ খেগো মিন্‌সে ; মেয়ে-মানুষটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে !···হলিই বা তুই যাত্রার দলের লোক, থাক না তোর তাড়াতাড়ি ; তাই ব'লে তুই মেয়ে-ছেলের গায়ে ধাক্কা দিবি !".. ইত্যাদি গজর গজর করিতে করিতে চিত্ত বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

শরৎ তরকারী কুটিতেছিল ; তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া চিত্ত বলিল,—পেলাম না বৌ, তোমার ছেলেকে দেখতে। হাবাতে দেশে লোকে জম্মে কিছু শুনেছে না দেখেছে ···যাত্রা ত' নয়, ডাকাতের দল···ওই ঢং দেখতে দেশের লোক সেখানে—এই এম্‌নি ঠাসা···মাছির মত গিজ্‌গিজ্ ভিন্‌ভিন্ করছে। কোথায় পাবো খঁুজে ছেলেকে···

শুনিয়া শরতের হাতের কাজ বন্ধ হইল না ; কিন্তু চোখের তন্দ্রাটুকু টুটিয়া গেল।

যাত্রা কখন ভাঙিয়া গেছে···শান্ত ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, লোকজন কেউ কোথাও নাই, সতরঞ্চির ধুলার উপর সে গড়াইতেছে ; খানিকটা বেলা হইয়াছে। শান্তর মনে পড়িল, দুটি লোক পরস্পরের প্রতি চোখ রাঙাইয়া অজস্র দম্ভ প্রকাশ করিতেছিল—করিতে করিতে খাপ হইতে তরবারি বাহির করিতে যাইয়া একজন দেখে, খাপের সঙ্গে অস্ত্র কি কারণে আট্‌কাইয়া গেছে,···টানিয়া বাহির করা যাইতেছে না—সভাশুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। যাই হোক, অস্ত্র বাহির করিয়া তারপর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল···যে লোকটার সরু গলা আর মোটা অস্ত্র যুদ্ধে হারিয়া ভোঁ দৌড় মারিয়াছিল সেই···তারপর এই দিবালোক প্রতিভাত হইতেছে, এবং মায়ের কথা মনে করিয়া তার ভয় করিতেছে।

ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসিয়া শান্ত দেখিল, মা উঠানের দিকে পিঠ করিয়া দাওয়ায় শুইয়া আছে। "মা, শুয়ে আছো যে ?" বলিয়া শান্ত যাইয়া মায়ের একেবারে হাতের কাছে দাঁড়াইল।

শরৎ বলিল,—যাত্রা শোনা শেষ হ'ল ?

—কখন শেষ হ'য়ে গেছে টেরও পাই নি। তুমি শুয়ে আছো যে ?

—ঘুম পাচ্ছে। তোর জন্যে সারারাত জেগে ব'সে ছিলাম যে !—বলিয়া শরৎ উঠিয়া বসিল।

—তোমায় না শুধিয়ে আর আমি কখনো কোথাও যাবো না, মা। ননে'রা আমায় টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর তোমার কথা মনেই ছিল না। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

শরৎ আঁচল দিয়া ছেলের গায়ের ধুলো ঝাড়িয়া দিলো। শান্ত বলিতে লাগিল,—তুমি মারবে ব'লে বড় ভয় করছিল, মা ; মারলে না যে ?···তারপর বলিতে লাগিল,—যাত্রা ভাল লাগল না, মা ; সবাই যেন কাঁদতে লাগল আর কঁদতে লাগল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল,—কি পালা হ'ল ?

—কে জানে ; তা আমি জানিনে। লম্বা লম্বা দাড়ি মুখে কারা সব ছিল...তারা কারা, মা ?

—মুনি-ঋষি বোধ হয়।

—দাড়ি এত বড় কেন হ'তে দিত তারা ?

—তাঁরা ত' এখনকার লোক নন, সেই সত্যযুগের লোক ; তখন দাড়ি গোঁফ চুল ওঁরা ফেলতেন না ··

—নাপিত ছিল ?

—ছিল বই কি ; তবে ওঁরা ত' ঘরে থাকতেন না ; নাপিতের কাছেও যেতেন না।

—গরম লাগত না ?

শরৎ হাসিয়া ফেলিল ; বলিল,—না। ··রেতে ক্ষিদে পায়নি ?

—পেয়েছিল। ননে' তার বাড়ী থেকে খাইয়ে আনলে···তার মা ভাত দিলে···এই দেখো, মা, আমি নতুন শিখেছি।—বলিয়া শান্ত পা আকাশে তুলিয়া হাতের উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া রহিল।

—মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে একদিন নাক ভাঙবে তোর।

শান্ত মাটিতে পা আনিয়া বলিল,—ভাঙুক। মানুষ ম'রে কি হয়, মা ?

—স্বর্গে যায়।

—ভূত সেজে এসেছিল একজন...হাসিয়ে মারছিল। বাউল বললে, ম'রে ভূত হয়েছে।

—সবাই তা হয় না।

—বাবা ত' ম'রে গেছে ; ভূত হয়েছে, না স্বর্গে গেছে ?

—স্বর্গে গেছেন।

—কি ক'রে জানলে ?

শুনিয়াই শরতের চোখে জল আসিল। কোথায় তিনি অবস্থান করিতেছেন তাহা এমনি অনিশ্চিত যে ভাবিতে গেলে মন যেমন ফিরিতে চায় না তেমনি দিশেহারা হইয়া যায়। · দেখা হইবেই একদিন বলিয়া ব্যাকুল আত্মার একটা বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ধর্ম ত' তাহাকেই একান্ত অভ্রান্ত অটুট জ্ঞানে সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে না।...ভাবিতে গেলে সুন্দর অসুন্দর কোনে স্থানেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায় না।·· একটা প্রশান্ত অনন্ত স্নিগ্ধ শূন্যতা যেন ধারণায় আসে ; কিন্তু তাহার মাঝে বিন্দুটি কোথায় আছে, এখনও আছে কিনা, থাকিলেও তাহাকে চাহিবে কিনা—এই কঠিন সংশয় ভাঙিবার উপায় মনে কই !

...পান্তা ভাত আর মাছ ভাজা খাইতে খাইতে শান্ত বলিল,—মাছ আর আমি খাবো না, মা ; তুমি খাও না, কেবল আমি আর খাবো না।

শরৎ গোপনে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—বেশ, খেয়ো না।

শান্ত বলিল,—মাছ ধড়ফড় করে দেখে আমার বড় মন কেমন করে।

॥ ৮ ॥

মনোহর দত্ত নিজের তরফের কথাটার দম বন্ধ করিয়া দিলেন · আঘাতটায় একবারও হাত দিলেন না, পাছে কেহ প্রশ্ন করে,—দত্ত মহাশয়, ঐ স্থানটায় হাত দিতেছেন কেন ?

কিন্তু সছিদ্র পাত্রের জলের মত চুঁয়াইয়া অল্পে অল্পে কথাটা শরতের পৃথিবী রসস্থ করিয়া তুলিল...প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষেরা তেমন আমল দিলো না ; কিন্তু তাহাদের অন্তঃপুর সরস সুকোমল স্থান বলিয়াই বোধ হয় কথাটার পুষ্পপল্লব সেইখানেই গজাইতে লাগিল...

মনোহর দত্ত মদ খাইয়া উহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, ইহাতে উহার অপরাধ কি ?... প্রশ্নটি করিয়া অনেকেই অবাক হইয়া রহিল।...কিন্তু আমাকে নয়, তোমাকে নয়, বিদুকে নয়, সিদুকে নয়, উহাকেই কেন সে...ইত্যাদি।...কতদূরে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই বা কে জানে ! মানুষের অন্তরের গুপ্ত কথার সন্ধান কে রাখে বলো !...এত বড় ঘটনার সমুদয়টা কি মাত্র ঐটুকু !...ইহা যে বিশ্বাস করিতে পারে তাহার নিজের মন নিষ্কলুষ, তাহাই কি সে বুকে হাত দিয়া মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতে পারে !··· ঢের দেখা গেছে ; কিন্তু কোথাকার জল কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়, জল দাঁড়াইবার আগে তাহা বিধাতাও জানেন না...অমন সব মানুষ মানুষের চোখে ধূলা আর বিধাতার উপর টেক্কা দিতে এমন দক্ষ যে ডাল নড়ে ত' পাতা নড়ে না·· এমনি ওরা ধূর্ত। কিন্তু একদিন তার শেষ হইবেই...মানুষের চোখে ধরা দিতে হইবেই।

কথাটা এমনি করিয়া অকাতরে ভিতরে ভিতরে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ একদিন যে-

মূর্তিতে আসিয়া শরতের অংগনে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহা সহজ নহে। কথাটা যেন বাঁকের আড়ালে অগোচরে সর্পিল গতিতে চলিতেছিল · কিন্তু নিজের মন্থরতা তার সহ্য হইল না···প্লাবনের মত বলিষ্ঠ আকার ধারণ করিয়া সে ছুটিয়া আসিল—সেই স্রোতে শরতের পৃথিবী পাথার হইয়া গেল।

মনোহর দত্ত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁহার শান-বাঁধানো পুকুর-ঘাটে খুঁদিয়া লেখা রহিয়াছে—'এসা দিন নেহি রহেগা'; বাড়ীর সদর দরজার গণেশ মূর্তির নীচে খোঁদা আছে, 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'; গদির দেয়ালে দশমহাবিদ্যার ছবির সোজাসুজি সিঁদুরের লাল অক্ষরে তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন—'হাতে কাজ করো, মুখে হরি বলো।' সেই দিকে চাহিয়া মনোহরের মনের শক্তি যেমন বাড়ে, পরকাল সম্পর্কীয় দুশ্চিন্তা-গুলি তেমনি তিরোহিত হইতে থাকে।···বলেন,—রামলাল, ভগবানের দিকে আকুলি যার থাকে সে ধন্য, কিন্তু কই মানুষের তেমন রুচি! ঈশ্বর বৃত্তির পয়সা চুরি করে, অধর্মের এমন বাড় হয়েছে আজকাল। আগের আমলে দেখেছি, বাসন্তী বারোয়ারী-তলার চব্বিশ-প্রহর হ'ত···কীর্তনের দল আসত আট-দশটা গাঁ থেকেই ছত্রিশটা; এখন ছত্রিশটা গাঁ থেকে আটটা দল এক ঠাঁই করা মুস্কিল।···খরচ করতাম আমিই; তিন দিনের খাই-খরচ লেগে যেত আড়াই শ' টাকা। আর এখন!···তারপর আগের তুলনায় এখন অধর্মের অভ্যুত্থান কিরূপ প্রবল হইয়াছে তাহাই মনোহর নির্বাক হইয়া ভাবেন··· পেটের চুল টানা তাঁর ক্ষান্ত থাকে।

রামলাল মুচকি হাসিয়া বলে,—যে আজ্ঞে, সে-দিন আর নেই।—সংগে সংগে রামলালের মনে পড়ে, পূজা তহবিলের হিসাব দিতে যাইয়া বাবু শেষবার হরিকিংকরের জেরায় পড়িয়া 'পেটে পরাণে' এক হইয়া গিয়াছিলেন···কাজের খরচ অপেক্ষা সেবারকার পূজায় তিনি বাজে খরচই দেখাইয়াছিলেন বেশী·· সেই হইতে তহবিল তাঁর হস্তচ্যুত হইয়াছে।

এই সব সুবচন আর সুবিবেচনার অন্তরালে মনোহরের একটি রক্ষিতা আছে।··· সুখী নাপ্‌তিনীর বয়স মনোহরের চেয়ে বেশী কি কম তাহা প্রকাশ নাই, নির্ণয় করাও শক্ত···কিন্তু তার অব্যবহিত পূর্বপ্রভু কয়লাওয়ালা কৃপাসিন্ধু যে তার ছোট ছিল, তাহা সুখীর সংগে সবাই জানে; কিন্তু কৃপাকে ত্যাগ করিবার কারণ সেটা নহে, সে এক ফৌজদারী ব্যাপার।

জিতেন আর কৃপাসিন্ধু দুই বন্ধু—বৈকালের দিকে একটু অবসর পাইয়া দুই বন্ধুতে দাবা খেলিতে বসিয়াছে; ভুজংগ কোনো দিকেই নয়, সে পিঠ উঁচাইয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, জিতেন কিস্তি দিয়া বসিয়া আছে। কৃপাসিন্ধু বলিল,—তোর বল সরেস।—বলিয়া গণিয়া দেখিল, জিতেনের একটি গজ বেশী। কিন্তু এদিকে ঘোড়ার কিস্তিতে নৌকাটি যায়। কৃপাসিন্ধু যখন এই সংকটে পতিত এবং অশেষ চিন্তামগ্ন তখন তাহারই কয়লার গদির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল সুখী—অল্প একটু ঘোমটা টানা···সুখী খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশির আওয়াজ দিলো। কিন্তু কৃপাসিন্ধুর রাজার তখন ঘোড়ার চারটে ক্ষুরের নীচে প্রাণান্ত বিপদ; ইশারার অনুচ্চ ডাক তার কানে গেল না, কিন্তু গেল ভুজংগের...সে চাহিয়াই চিনিয়া ফেলিল; বলিল,—সিন্ধু, ডাকছে তোকে।

সিন্ধু যাহাকে চালিত করিবে সেই বলটির শিরোস্পর্শ করিয়া দশদিক ভাবিতেছিল ; বলিল,—কে ?

—চেয়েই দেখ্‌।

খানিক এদিক ওদিক চাহিয়া ঠিক জায়গায় চোখ পড়িতেই কৃপাসিন্ধু বলিল,—যাব'খন।

কাল সে যায় নাই, তাই এই তাগিদ। জিতেন বলিল,—কে হে ?

ভুজংগ হাসিল, কৃপাও হাসিল ; ভুজংগ বলিল,—কৃপার পরকীয়া।

জিতেন মনের কথা মনে রাখিলেই পারিত, কিন্তু বিধাতার মনে ছিল অন্য রকম ; সে সুখীর চেহারার দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল ; বলিল,—ঐ শকুনি ? তোর রুচির বলিহারি মাইরি। ঘেন্না করে না ? আমাকে ত'—

কিন্তু তার উল্লাস ঐখানেই বন্ধ হইল—ঘোমটার যেটুকু আড়াল ছিল সুখী তাহা ঠেলিয়া দিয়া একেবারে সম্মুখে ছুটিয়া আসিল...এবং পরক্ষণেই তার মুখ দিয়া যে ভাষা নির্গত হইতে লাগিল যে ভাষার তুলনা কেবল সেই ভাষা...জিতেনের মাতাপিতা পর্যন্ত সে ভাষার ঝটিকাবর্তে আসিয়া পড়িলেন...এবং তাঁহাদের সে দুর্গতি সহ্য করিতে না পারিয়া জিতেন খানিক হতভম্ব হইয়া থাকিয়া খড়ম লইয়া উঠিয়া পড়িল।

...খুব তোড়জোড় করিয়া মামলা সুরু হইল...বড় বড় মোক্তার নিযুক্ত করিয়া উভয় পক্ষই এমন জিদ দেখাইতে লাগিল যেন তাহারা পরস্পরের শেষ দেখিবার জীবন পণ করিয়াছে।...কিন্তু মামলার শুনানির দিন আসামীর মোক্তার দাঁড়াইয়া বলিলেন,—হুজুর, আমার মক্কেল মামলা মিটিয়ে ফেলতে রাজি আছে। ফরিয়াদী কিছু ক্ষতিপূরণ নিয়ে যদি—

ডিপুটি বলিলেন,—খাসা কথা। এই মাগি, রাজি আছিস ?

সুখী ধর্মাবতারের সম্মুখে হাত জুড়িয়া নম্র হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—যেন ধর্মাধিকরণের প্রতি তার যত শ্রদ্ধা তাহাকে তার তত ভয় ; কিন্তু তার শ্রদ্ধা-ভয় যে মিথ্যা, হাকিমের ঐ সম্বোধনেই তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল—

সুখী কোমরে কাপড় জড়াইল না বটে, কিন্তু প্রলয়ের প্রাক্কালের মত মুখচোখ করিয়া সে যেমন করিয়া হাকিমের দিকে চাহিয়া রহিল তাহাই চরম, তাহাতেই হাকিম থতমত খাইয়া গেলেন। ...সুখী বলিল,—মাগী বলছ কাকে, হাকিম ? হাকিমী করছ, মানুষের সংগে কথা কইতে শেখনি !...মেয়ে-মানুষকে খবদ্দার মাগী-মাগী ক'রো না...তোমার মা-বোন কি ?—বলিয়া সুখী তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দু'টাকে ঘরময় ঘুরাইয়া আনিল এবং অবশেষে হাকিমকে লট্‌কাইয়া তুলিয়া কোথায় ধরিয়া রাখিল কে জানে।

হাকিম একেবারে কেঁচো হইয়া গেলেন ; ব্যাপার গড়াইয়া বুঝি এজলাসের বাহিরে যায়...শশব্যস্তে বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, বেশ। জিজ্ঞাসা করছি, মেটাবে ? উনি রাজি আছেন।

শুনিয়া সুখীর চোখে জল আসিল ; বলিল,—এই পিঠ দেখো, খড়মের দাগ এখনো রয়েছে, এখনো জ্বলছে।

হাকিম এবং আদালতের যাবতীয় লোক মমতার চক্ষে চাহিয়া তাহার পিঠ দেখিলেন। সুখী বলিতে লাগিল,—এখন মেটাবে না কেনে ! এখন যে গরজ ওর...আমি না বুঝি

এমন নয় ।...আমি মেয়েমানুষ ব'লেই ও বেঁচে গেছে, নইলে আজ তোমার কাছে খুনের বিচার হ'ত, ও মরত কি আমি মরতাম·· যত লোকে দাঁড়িয়ে আমার অপমানী দেখেছে তারাই দাঁড়িয়ে লাশ দেখত ।

হাকিম শিহরিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—তা হোক, সে-কথা এখন মনে ক'রে আর কি হবে···উনি এখন সেজন্য দুঃখিত ।

—দুঃখিত ? ঐ দেখো মুখ টিপে টিপে হাসছে ।

শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল ।

...যাই হোক, অনেক বাদানুবাদ, কথা-কাটাকাটি, আপত্তি ও প্রবোধ বাক্য এবং দর-কষাকষির পর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পঞ্চাশ হইতে পঁচিশে নামাইয়া মামলা মিটাইয়া সুখী আসিল ।

সেদিন ষ্টেশনে সে কি জনতা—কেহ হুঁকা লইয়া, কেহ পাখা লইয়া, কেহ গাড়ু আর গামছা লইয়া, কেহ শুধু হাতেই আসিয়া জিতেনের দল জিতেনকে বীর সাজাইয়া আড্ডায় লইয়া ফেলিল । · সেই হইতে সুখী কৃপাসিন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়াছে···যার এমন দুষ্ট সংগী তাহাকে সে চায় না ।

এই সুখী নাপ্‌তিনী মনোহরের বর্তমান প্রতিপাল্যা ।...সুখী মনে মনে জানে, এই তার শেষ, প্রীতির বস্তু না হোক, অবলম্বন বটে । সেইজন্য মেজাজ তার সর্বদাই আরো খিট্‌খিটে হইয়াই থাকে ।...মনোহারর গতিবিধির দিকে তার যেমন তীক্ষ্ন লক্ষ্য, তেমনি নিজের মনের রুক্ষতা চাপিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন দিবারাত্রই হু হু করিতে থাকে—কিছুই ভাল লাগে না ।

সুখী ঘর নিকাইয়া গোবর-গোলা হাঁড়িটা উঠানের কোণে নামাইয়া হাত ধুইতে যাইবার উদ্দেশ্যে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় সে প্রাতঃকালেই সংবাদ পাইল, মনোহর আর তার নয় । যে সংবাদ আনিয়াছিল সে সুখীরই দূতী এবং হিতার্থিনী । বলিল,—ওলো সুখী, ডুগ্‌ডুগী বাজা, আর মালা হাতে কর—দণ্ডবৎ বাবা পুরুষের পায়ে ।

—কি হ'ল ?—বলিয়া হাত আলগোছ করিয়া সুখী তটস্থ হইয়া রহিল ।

—কি আবার হবে ! বাবু দড়ি ছিঁড়েছে...পথ দেখ্ এখন···বাবা, তখনই বলেছিলাম, মুখে যার যত নকুতা, ভেতরে তার তত ফাঁকি ।

—তোর মুখে আগুন । সোজা কথাটা একেবারে বল্ না বাপু !

—বলি ।···ভাবলাম, সইকে আমার সইয়ে সইয়ে খপরটা দিতে হবে···তুই যে পাষাণ তা কি আমি জানি ! তবে শোন ।...বাবু রূপে মজেছে ।

—কার ?

—মোহিত রায়ের ব্যাটার বউয়ের··· ধরা পড়েছে, শুনে এলাম ।

সুখী আজ পর্যন্ত দৈবনির্যাতন অনেক সহিয়াছে, পুড়িয়া পুড়িয়া সে সারে দাঁড়াইয়া গেছে ; কিন্তু দুরদৃষ্টের অতর্কিত আবির্ভাবে যারা মুহ্যমান বিমূঢ় হইয়া যায়, তাহাদের ধাতুতে সে গড়া নয় । মোহিতের বাড়ী সে চিনিত । 'তুই বস্' বলিয়া গোবর মাখা হাত লইয়াই সে ছুটিল ।

চিত্তর দেহ ভাল ছিল না ; রাত্তিরে সকাল সকাল হোটেল হইতে ফিরিয়াছে ; সকালটার জন্য সে ছুটি লইয়া আসিয়াছে ।

রান্নার যোগাড় হইতেছে। শান্ত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ সম্মুখে লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া একাগ্রমনে কি করিতেছে তা সে-ই জানে। চিত্ত বলিতেছিল,—কাল গাঙ্গুলী বললে, দু' পয়সার মৌরি না হ'লে ত' চলে না, চিত্ত।...বললাম, দাও পয়সা, নিয়ে আসি, কাছেই ত' আধার দোকান...ও নাম আমি আবার নিতে পারিনে, ভাসুরের নাম। ...পয়সা দুটো হাতে ক'রে দোকান পানে আসছি, পথে দেখি হাজার লোক গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি দেখছে ; ভাবলাম, বুঝি বেদেদের গুলি—উড়োনো সেই বাজি-টাজি হচ্ছে, এক নজর দেখে যাবো।...কি বলব বৌ, মাথা তুলে চেয়েই আমি অবাক। বেদে নয়, সাপুড়েও নয়, তোমারই ছেলে...কুস্তি লড়ছে! মুখচোখ ছেলের লাল...টেনে টেনে দম নিচ্ছে, আর ওলোট-পালোট ক'রে সে কি কাণ্ড..একবার সে ওঠে ওপরে, চক্ষের নিমেষে দেখি ও মাটি কামড়ে পাষাণের মত প'ড়ে।·শেষকালে সে ছেলেটাকে ও চিৎ ক'রে দিলে .. লোকগুলোর সে কি আমোদ—হাত পা তুলে হৈরে ক'রে সে একেবারে একাকার ; দশ বিশজনে লেগে ওর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল।

উভয়ের শান্তর দিকে উৎফুল্ল নেত্রে আবিষ্টের মত চাহিয়া নির্বাক হইয়া আছে, এমন সময় তাহাদের মাঝখানে ছায়া ফেলিয়া যে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই সুখী। সুখীকে ওরা চিনিত না। চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল,—কি চাও ?

—ভিখিরী না ভাট্ বামুন—চাইব আবার কি ?.. মোহিতের বেটার বৌ তোমাদের মধ্যে কে ?

শরৎ বলিল,—আমি! কেন ?

হাকিম রাজাসনে বসিয়া যে চোখ দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন, শরতকে সুখী সেই চোখ দিয়া দেখিতে লাগিল : বলিল,—কেন ? শোনাচ্ছি কেন।...আমার নাম সুখী নাপ্তিনী...মনোহরের মেয়ে-মানুষ আমি...

সেই ব্যক্তি যে মনোহর, শরৎ তাহা পরে শুনিয়াছিল—এখন আগন্তুকের পরিচয় পাইয়াই তার আসার উদ্দেশ্য আর বক্তব্য তার ঐ চোখের চাহনিতেই শরতেই সম্মুখে মূর্ত হইয়া দাঁড়াইল। শরৎ যেন অতর্কিত আঘাত খাইয়া লাফাইয়া উঠিল ; চেঁচাইতে লাগিল,—চিত্ত, শান্তকে সরিয়ে নে যা ; যা, যা—এক মুহূর্ত দেরী করিসনে·মাথা খাস, ওর কানে যেন এ-কথা না যায়।...বলিতে বলিতে ছুটিয়া যাইয়া সে দুই হাতে শান্তর·দুই কান বন্ধ করিয়া ধরিল ; তারপর তাহাকে ঠেলিয়া আনিয়া চিত্তকে আর শান্তকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলো...চোখের পলক না পড়িতেই যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল।

সুখী তখন বলিতেছে,—আয়, আমার সঙ্গে আয় ; আমার ঘরে থাকবি। নিত্যি নতুন নাগর এনে দেবো, কাবলি, মেড়ো, খোট্টা।...ভিজে বেড়ালটি আমার, নেকী, মুখে রা শব্দটি নেই!...ঘরে থেকে ডুবে ডুবে পরের জলে নোলা ভেজাবি কতদিন ?...আয় বেরিয়ে।

আরো অনেক কথাই সুখী বলিয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া শরৎ সুখীর দুঃখের কথা, রাগের কথা, ধিক্কারের কথা ক্রমাগত শুনিয়া গেল...চোখ তুলিল না, কানে আঙুল দিলো না...এই চরম কুৎসিত অকারণ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সে একটি কথাও বলিল না। সুখী যাইবার সময় বলিয়া গেল,—আজ গায়ে হাত দিলাম না·ফের যদি শুনি তবে এই...

বলিয়া শরতকে বাঁ পা দেখাইয়া সুখী চলিয়া গেল।

চিত্ত আসিয়া দেখিল, শরৎ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তার চোখে জল নাই, কিন্তু তার শুষ্ক চক্ষু এমন লাল যে সেদিকে চাহিতে হঠাৎ ভয় করে। সুখী ঠিক কি বলিয়া গেছে চিত্ত তাহা জানে না, কল্পনা করিতেও বোধ করি সে পারে না ; কিন্তু আগন্তুক যে সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া যায় নাই ইহা ঠিক। খানিক বিষণ্ণ চক্ষে শরতের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—বৌ, ওঠো। হাতের কাজ ফেলে রেখে ভাবছ কি ব'সে?—বলিয়া তার হাত ধরিল।

শরৎ তাহার দিকে মুখ তুলিল না ; বলিল,—উঠি।—বলিয়াই উঠিল, এবং উঠিয়াই শান্তর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া দরজায় শিকল চড়াইয়া দিলো।

শান্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই দরজার খিল ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া দিয়া সে গর্জন করিতে লাগিল। চিত্ত বলিল,—ও কি, বৌ ?

শরৎ বলিল,—থাক।

সুখীর কথাগুলি শরতের কানে গিয়াছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা দুঃসহ ত্রাসের সৃষ্টি করা ছাড়া অন্যদিক দিয়া তাহারা তাহাকে আক্রমণ করে নাই। সুখীর মুখে কথাগুলি যতক্ষণ উচ্চারিত হইতেছিল ততক্ষণ এবং সুখী চলিয়া যাইবার পরও এই আশঙ্কাটা তার তার সর্ব অপমানের উপর জ্বলিয়া উঠিয়াছে যে, শান্তর কানে যদি এই কথা যায় ! কলঙ্ক মিথ্যাই, কিন্তু মানুষের জিহ্বা যে তাহাকে ছড়াইয়া বেড়াইতেছে ইহা ত' মিথ্যা কিছুতেই নয়…এই মাত্র তার একটি সাক্ষী দেখা দিয়া গেছে।…ছেলে যদি শোনে !

দরজায় খিল বন্ধ করিয়া শান্তকে খাওয়াইয়া শরৎ আবার তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিল ; চিত্তের প্রতিবাদে সে কর্ণপাত করিল না…শান্তর কাতরোক্তি ছট্‌ফটানি সে ভ্রূক্ষেপও করিল না, শান্তর প্রচণ্ডতা সে নির্মম হস্তে যেন লগুড়াঘাত করিয়া থামাইয়া দিলো। চিত্ত বলিল,—বৌ, তুমি বড় কঠিন।

কিন্তু এমনটি যে হইতে পারে তাহা শরৎ ভাবিয়া দেখে নাই…হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়িল, দুর্দান্ত শিশু যেন এলাইয়া পড়িয়াছে…মুক্ত বায়ুর খেলা যেন তাহারই চাঞ্চল্যের অভাবে আবন্ধ হইয়া বিষাক্ত পল্বলের মত ক্লেশকর দূষিত হইয়া উঠিয়াছে… তাহার নিজেরই শ্রান্তির যেন সীমা নাই…ছেলের বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে নির্ভীকতা আর নাই —ছেলে রোগা হইয়া গেছে।

…সকাল বেলা চিত্ত উঠিয়া দেখিল, বৌয়ের ঘরের দরজায় শিকল তেমনি চড়ানো, কিন্তু বৌ কোথাও নাই…শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, শান্তও নাই।

॥ ৯ ॥

শরৎ গৃহত্যাগ করিল।

প্রদীপের আলোকে নিদ্রিত শান্তর সর্বদেহের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার মনে হইতেছিল, এ যেন একটি দেববিগ্রহ…সাগরের মত অনন্ত প্রীতির কূলহীনতার মধ্যস্থলে যেন হৃদয়রঞ্জন একটি দ্বীপের উদ্ভব হইয়াছে…অন্তরের আশ্রয় তার…স্বামীর দান বলিয়া সে কেবল স্নেহের সামগ্রী নয়, শ্রদ্ধারও পাত্র…ভালবাসার দান, মাথায় করিয়া রাখিবার মত।

চক্ষু দু'টি নিমীলিত—নিঃশ্বাস-বায়ুর যাতায়াতের সঙ্গে বুক ওঠা-নামা করিতেছে …হাত-পা এখন তার বশে নাই…

ছেলে দুর্বল হইয়া গেছে—হঠাৎ শরতের চোখে জল আসিল…চরম অকল্যাণ যা, যার বাড়া অকল্যাণ মায়ের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না, নিদ্রা যেন তাহারই আভাস…

চোখের জল মুছিয়া শরৎ শান্তকে ডানা ধরিয়া তুলিয়া বসাইল…শান্ত বসিয়া দুলিতে লাগিল, কিন্তু চোখ খুলিল না…শরৎ টানিয়া তাহাকে খাটের উপর হইতে নামাইল ; হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিলো…তারপর পুঁটুলিটা আনিয়া ঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া গলি বাহিয়া শরৎ রাস্তায় আসিল।

শান্তর হাত ধরিয়া রাস্তায় আসিয়া শরৎ কোন্‌দিকে যাইবে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল…কিন্তু দিকনির্ণয় কিছুই হইল না—চারিদিকই সমান অপরিচিত, সমান অন্ধকার, সমান নিরুদ্দিষ্ট…কোনো দিক লক্ষ্য না করিয়াই শরৎ চলিতে আরম্ভ করিল।

চলিতে চলিতে একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে পিছন দিকে চাহিল…অস্পষ্ট আলোকে গৃহশ্রেণী কেবল আব্‌ছায়া ছবির মত দেখা গেল…তার নিজের গৃহ ইতিমধ্যেই গৃহারণ্যের মধ্যে অন্ধকারে হারাইয়া গেছে—চোখে পড়িল না, বা চেনা গেল না…শরতের হৃদয়ের উপর এতক্ষণ যে আবরণ ছিল তাহা উন্মোচিত হইয়া মর্ম নূতন বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল · প্রাণে টান পড়িতে লাগিল।

গৃহের অঙ্গন মৃত্তিকার বন্ধন যে কত কঠিন তাহা কদাচ বাহিরে না যাইয়া সে কখন অনুভবই করে নাই…ধূলির প্রত্যেকটি কণায় যাঁহাদের পাদস্পর্শ ধ্বনিত হইত তাহা যেন এখনো সেখানে আছে · সে ধ্বনি বাঁচিয়া আছে, জাগিয়া আছে, চাহিয়া আছে…সে নিঃশ্বাস ফেলে…সেই বায়ু তাহাদের গায়ে লাগিত, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর প্রবেশ করিত · সেই গৃহের প্রাণবায়ু তাহাদের বেষ্টন করিয়া থাকিত, আগ্‌লাইয়া থাকিত।

সন্ধ্যাপ্রদীপটি কেমন করিয়া জ্বলিত তাহাও শরতের মনে পড়িতে লাগিল। প্রদীপের সেই রক্তশিখাটি যেন গৃহদেবতার দীপ্ত নেত্রের মত ফুটিয়া থাকিত·· সেই আলোকের মঙ্গল দিবার শক্তি ছিল, রক্ষা করিবার, সতর্ক করিবার সামর্থ্য ছিল।

তুলসী-মঞ্চটি—নারায়ণের পবিত্র ক্ষেত্র সে…পত্রপুটে তাঁর শ্রীচরণের স্পর্শ আছে, আশীর্বাদ আছে।

শরৎ সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ফিরিবে কিনা ভাবিতে লাগিল…শান্তর তখন ঘুম ভাঙিয়া চোখ পরিষ্কার হইয়া গেছে…সে-ও দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মা, দাঁড়ালে যে ?

শান্তর ফুর্তি হইতেছিল ; এমন করিয়া মায়ের· সাথে নির্বিবাদে পথ চলিতে সে কোনোদিন পায় নাই।…কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া মোহ কাটিয়া তাহাকেই তাহার মায়ের মনে পড়িয়া গেল—ছেলে রোগা হইয়া গেছে ; লোকে বড় কুৎসিত কথা বলিতেছে।

শরৎ আবার চলিতে সুরু করিল…একবার কথা আরম্ভ করিতে পাইয়া শান্ত মহানন্দে বলিতে লাগিল,—মা, এইটে ননে'দের বাড়ী…ইদিকে মতিদের বাড়ী…ইদিকে মানুদের বাড়ী।

শরৎ বাড়ীগুলি চিনিত না ; কিন্তু ছেলের মুখে ওই সব বাড়ীর ছেলেদের নাম শুনিয়া শরতের মনে হইল, ইহারাও যেন তার অজ্ঞাত আত্মীয় ছিল…ইহাদেরও সঙ্গে

তার বিচ্ছেদ ঘটিতেছে।···চিত্তর কথা তার মনে পড়িল ; দুর্দিনে সে সম্মুখে ছিল, ভালবাসিত, কত উপকার করিয়াছে সে···ঘরে বসিয়া, উঠানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের যেখানে যে বস্তুটি দিবারাত্র চোখে পড়িত, সেগুলিও এখন যেন তেম্‌নি স্পষ্ট হইয়া তার চোখের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল···তাহাদের নয়নানন্দ মূর্তি ছিল, আকর্ষণ ছিল··· তাহারাও প্রিয় ছিল···তখন তারা ছোট আর অল্প ছিল, এখন তারা বিরাট ও প্রচুর হইয়া দেখা দিলো।

সূর্য কিছুদূর উঠিতেই তালগাছের আড়াল পড়িয়া দীর্ঘ একটা ছায়া তার উঠানে পড়িত ; সেইটা ছিল তার বেলা বুঝিবার উপায়—ছোট বড় হইয়া বেলার একটা আন্দাজ সে দিত...সেটি কাল চোখে পড়িবে না...

গৃহের কোথায় কোন্ জিনিষটি রাখা আছে তাহা শরতের মনে পড়িতে লাগিল... লক্ষ্মীর আসন পাতা এক কোণে, গংগাজলের বোতলটি তার কাছেই...মৃণ্ময় পাত্রগুলি পর্যন্ত তার কতখানি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল তাহা আগে সে জানিত না...তাহারাও তাহাকে পিছনে টানিতে লাগিল...শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিবে না—তুলসী-মূল অন্ধকার থাকিবে...

পায়ের নীচে পথের মাটি শীতল—দক্ষিণের বায়ু শীতল—

এই শীতলতার মধ্য দিয়া সম্মুখের অতি-নীরব ও অতি-বিস্তৃত অন্ধকারের দিকে চলিতে চলিতে শরতের বুকের শিরা একটি একটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

## * দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *

### ॥ ১ ॥

"হুং···হুংকারে ব্যোমে মহেশ্বর দেবদেব ত্রিলোচন·· হুং"

খুব বড় তালে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসুদেব আচার্য নিশিকান্ত কবিরাজের "অকৃত্রিম" ঔষধালয় এবং বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিলেন। বাসুদেবের দিনের প্রধান কাজ ঐ সুর ভাঁজা।

বছর দেড়েক আগেকার কথা···তানপুরা কাঁধে ফেলিয়া এক কালোয়াৎ আসিয়া উঠিলেন—রঙে, দাড়িতে, গোঁফে, ভংগিতে এবং সদালাপে, তারপর সুরে, তালে, মীড়ে, গমকে, ঝংকারে, এবং তদুপরি শাস্ত্রজ্ঞানে এমন দিব্য ভক্তির পাত্র তিনি যে, বাসুদেবের মনে হইল, ইঁহার পদধূলি যে-কেহ লইতে পারে, তিনি ত' পারেনই—তাহাতে অপরাধ হয় না !

সভার সর্বাগ্রে গিয়া বসিলেন বাসুদেব—গান যেন অষ্টাংগ ছাড়িয়া দিয়া গিলিতে লাগিলেন। কালোয়াৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া, আর কাহারো দিকে না চাহিয়া কেবল যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন তিনিই বিগলিত প্রাণ বিবশ-তনু বাসুদেব আচার্য।

"বুঝিতে পারিয়াছেন" ভাবিয়া বাসুদেব পুলকে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেছেন, এমন গান শেষ হইয়া গেল এবং বাসুদেব বাহবা দিয়াই অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলেন···কালোয়াৎ হাসিয়া বলিলেন,—একটু দেরী হ'য়ে গেছে।

লোকের হাসির শব্দ থামিলে বৈদ্যনাথ বলিল,—আচার্য একটা গাও না হে···উনি একটু বিশ্রাম করুন।

বাসুদেব কালোয়াতের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন অভয় চাহিয়া। কালোয়াৎ হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত', গান না।

·· বাসুদেব তখন যে গানটি গাহিয়াছিলেন, এবং তাঁর প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সেই গানটির আদি অক্ষর ঐ হুং।···গানটি কালোয়াৎ যত্ন করিয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন সভায় বসিয়াই, কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই।·· বাসুদেব ভাবিয়া লইলেন, লোকটা বড় দাম্ভিক ; আমার কাছে গান শিখিয়া গেল, কিন্তু প্রকাশ্যে ঋণ-স্বীকার করিয়া গেল না —তবু তিনি কালোয়াতকে ক্ষমা করিলেন। না করুক ঋণ-স্বীকার···ঐ গানটি সম্পর্কে আমি তার গুরু···কিন্তু গুরু-দক্ষিণা চাই না।

এবং মেজাজ খুশ হইল সেইদিন হইতে ; গায়ের কুর্তাটির মত, ঐ গানটিকে তিনি তিনি ক্বচিৎ ছুটি দেন ; সুরটি তাঁর ঠোঁটের উপর দিন-রাত নাচে...অন্য কাজও অবশ্য তাঁর আছে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

—কব্‌রেজ কোথা হে ?—বলিয়া বাসুদেব বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র রণজিৎ ফরাসে বসিয়া পড়িতেছে ; বলিলেন,—ওহে, তোমার কব্‌রেজ কোথা ?—প্রশ্ন করিয়া বাসুদেব বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া কুর্তার সর্বনিম্নের তিনটি বোতাম পটাপট্‌ খুলিয়া দিলেন···পেটে বাতাস লাগিল।

রণজিৎ বলিল,—ভেতরে আছেন।

বাসুদেব দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন,—ভেতরে আছেন ! ভেতরে সে কি করে দিন-রাত ? তবু যদি···হুঃ ! · তামাক দিতে বলো, আর ডাকো কব্‌রেজকে।···মনের কথা অর্দ্ধেক উহ্য রাখিয়া বাকি অর্দ্ধেকটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে বাসুদেব সময় বিশেষে ভালবাসেন।

রণজিৎ পুঁথিখানা বন্ধ করিয়া তাহাকে কপালে ছুঁয়াইয়া পাশের কুলুঙ্গীতে তুলিয়া অতিশয় আলস্যভরে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় ঐটুকু বিলম্বেই বাসুদেব অসহিষ্ণু হইয়া জানালায় মুখ দিলেন ; বলিলেন,—কই হে, উঠলে ?

—আজ্ঞে, এই উঠছি।

—হ্যাঁ ওঠো ; তুলে ধরবো ?···কি ছেলে সব হয়েছ বাবা আজকাল ! ব'সে উঠতে এক ঘণ্টা !···ক'দিন খাও না ?···ছিলাম আমরা, হুট করতেই অমনি হাজির, ছুট বলতেই অমনি ছুট।···গা নড়াতে আমাদের এত সময় লাগত না···তোমার নামটা কি ? মনে থাকে না।

কিন্তু নাম শোনা তাঁর হইল না—কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পড়িলেন।

—কি বকছ হে ! ভেতর থেকেই তোমার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।...স্ত্রী বলছিলেন, তোমার সংগীতা—মানে গাইয়ে বন্ধু এসেছেন।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিশিকান্ত চৌকিতে বসিলেন।

বাসুদেবের সম্মুখে সংগীতাচার্য শব্দটা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হইয়া গেছে...তিনি নিজেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন···তিনি ভাবেন ওটা ঠাট্টা। কেন তা ভাবেন সে একটা স্বতন্ত্র কাহিনী—কে একটা ছেলে পথে তাঁহার গায়ে ধাক্কা দিয়াছিল...তাহাতে তিনি

বলিয়াছিলেন, বে-আদপ···আর ছেলেটি বলিয়াছিল, ক্ষমা করবেন সংগীতাচার্য···ঘটনা মাত্র এই ; কিন্তু তার উপর আর একটু রং এই যে, ছেলেটির প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি তাহাকে মারিতে ছুটিয়াছিলেন। যারা বাসুদেবকে মানে, সেই দিন হইতে ঐ কথাটা তারা তাঁর সাক্ষাতে বলে না।

"সংগীতা—" বলিয়াই নিশিকান্ত তাই থামিয়া গেলেন। বাসুদেব বলিলেন,—যেমন গুরু তেমনি শিষ্য···গুরু আছেন স্ত্রীর মুখের কাছে কান পেতে, বন্ধুর খবর শুনছেন ...আর এদিকে শিষ্যকে উঠতে ব'লে আমি বেকুব—উঠে দাঁড়াতেই বেলা কাবার ; উঠতে ওর অত কষ্ট হবে তা কি আমি জানি !...স্ত্রী !...স্ত্রী ব'লে গৈরব করলে হবে কি ?... পদাস্ত সব একই।...কি হচ্ছিল স্ত্রীর কাছে ব'সে বৈঠকখানা ফেলে ?

নিশিকান্ত বলিলেন,—তোমার কি ভাই, সুর ভেঁজে বেড়াচ্ছ, আর হাত তুলে খাচ্ছো ; কত ধানে কত চাল সে খোঁজ তোমার রাখতে হয় না।...কি ক'রে যে আমরা চলি তা আমরাই জানি। সামনেই পুজো ; কাপড়-চোপড়ের ফর্দ এখন থেকেই ক'রে তার টাকার যোগাড়টা এখন থেকেই করতে হবে যে !

—পুজো সামনেই বটে, পেছনে নয় ; কিন্তু...থাকগে, তোমার গরজ তুমিই বোঝো ভাল. এখন তামাক-টামাক দিতে বলবে, না সেটারও সাশ্রয় করছ সামনে পুজো ব'লে ?

—সাধু, তামাক দে. রণজিৎ, পান আনো গোটা চারেক।

—গোটা চারেক কেন ? সংখ্যাটা ব'লে দেবার কি দরকার ! তোমার স্ত্রী দুটো কি দেড়টাও ত' দিতে পারতেন !

বাসুদেবের আত্মীয়তা করিয়া কথা বলার রকমই ঐ—

নিশিকান্ত হাসিতে লাগিলেন ..বাসুদেব সুর ফুটাইলেন।

দু'টি মানুষ মিলিয়া যায় দৈবাৎ, কিন্তু গায়ে-গায়ে লাগালাগি হইয়া যায় যে কারণে তাহাতে আঠা থাকা চাই.. আঠা নাই, তবু বাসুদেব আর নিশিকান্ত পরস্পর সংলগ্নই আছেন—খুলিয়া যান না। নিশিকান্ত ভাবেন লোকটা ক্ষ্যাপা—বাসুদেব ভাবেন, বন্ধুর বুদ্ধি কম—আর দু'জনেই ভাবেন, ওকে একটু আস্কারা দিয়া আমল দিয়া আগ্‌লাইয়া সাম্‌লাইয়া বজায় রাখা দরকার ; কিন্তু কেন দরকার তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয় দু'জনেই আপনমনেই হাসিয়া উঠিবেন।

রণজিৎ ডিবায় করিয়া পান লইয়া আসিয়া বাসুদেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। বাসুদেব সুরের আলাপ বন্ধ করিলেন, কিন্তু পান লইবার উদ্যোগ না করিয়া মাথাটা একটু হেলাইয়া দূরে লইয়া রণজিতকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রণজিৎ লাল হইয়া উঠিল ; বলিল,—পান নিন।

—নিই। ..তোমার চেহারা এমন কেন হে...এই জন্যেই উঠতে তোমার মনে হচ্ছিল, মাথার উপর পর্বত চাপানো আছে।...অসুখ কি তোমার ?—বলিয়া পান একটি তুলিয়া লইয়া আল্‌গোছে মুখের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন এবং রণজিৎ তাঁহার কথার উত্তর না দিয়াই চলিয়া যায় দেখিয়া বলিলেন,—অসুখ কি তোমার বললে না ?

রণজিৎ থামিয়া ফিরিয়া বলিল,—অসুখ কিছু নেই।

রণজিতের অগ্রাহ্যের ভাবে বাসুদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; তার সত্যগোপনের ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমায় কি ন্যাকা পেলে হে ?···অসুখ কিছু নেই, তবে শরীরের অমন ছিরি কিসে হ'ল···ভূতে চাটছে ?

রণজিৎ মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল। বাসুদেব সেইদিকে খানিক ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন,—ওহে কব্‌রেজ, তোমার এই ছাত্রটিই তোমার প্রধান শনি।...ওই চেহারা তোমার নিজের বাড়ীতে দেখে রুগী ভাগ্‌তে একটু দেরী হবে না।—বলিয়া বাসুদেব চক্‌চক্‌ শব্দ করিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন।

কবিরাজ বলিলেন,—দিন-দিন স্বাস্থ্য খারাপই হচ্ছে। মম্মথরস—রণজিৎ, খাচ্ছো ত' ওষুদ?—বলিয়া ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

রণজিৎ ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিল; বলিল,—আজ্ঞে, খাচ্ছি।

বাসুদেব পিক ফেলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মন্মথরসের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেই একগাল পিক তাঁর গলা দিয়া নামিয়া গেল; বলিলেন,—মন্মথরস? মন্মথ নামটাই শুনতে যে কেমন হে!...মন্মথরস কিসের ওষুদ?

নিশিকান্ত বলিলেন,—সে শুনে তোমার কাজ নেই।

—নেই নাকি!...ভাল, কিন্তু শুধু মন্মথরসে চেহারা ফিরবে না...মৃগশিশাবক চাই।...বামুনের হুঁকোটা? এই যে রয়েছে।—বলিয়া বাসুদেব সাধুর হাত হইতে কলিকা লইয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় পুড়ুক পুড়ুক করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।...

কিন্তু রণজিৎ মন্মথরস খায় না। রণজিতের বয়স অনুমান করা শক্ত; তার বয়স একুশ, কিন্ত সে বাড়ে নাই। তার দেশের লোকে বলিত, বিমাতার অবহেলায় তার মন যেমন ক্ষুধাতুর, বিমাতারই বিষদৃষ্টি লাগিয়া তার তেজ নাই, বৃদ্ধি নাই।...ডাঁসা ডাঁসা মুখখানায় তার গোঁফের রেখা কেবল দেখা দিয়াছে, কিন্তু যৌবনোদ্গমের এই লক্ষণে তার শ্রী ফোটে নাই, বরং কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন দেখায়। তবে এত শুষ্ক সে কোন দিনই ছিল না; পেটটাও এত ডাগর তার ছ'মাস আগে কেহ দেখে নাই। তিনমাস আগেও তাহাকে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সে এখন তাহাকে দেখিলে কাঁপিয়া উঠিবে।... সর্বোপরি তার মুখের পাণ্ডুরতাই আরো ভয়াবহ। শরীর কেন এমন হইল তাহা জানিয়াও রণজিৎ শরীরের কথাই তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল... কখন গল্প শেষ করিয়া বাসুদেব আচার্য সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে উঠিয়া গেছেন এবং তাহার পাশেই হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া কবিরাজ মহাশয় পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা সে জানিতেই পারে নাই।

॥ ২ ॥

দরজাটা হঠাৎ হড়্‌মড়্‌ করিয়া নড়িয়া ওঠার শব্দে রণজিৎ চমকিয়া চোখ তুলিয়া দেখিল, কেতকী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।· তাহাকে চোখ তুলিতে দেখিয়া কেতকী বলিল,—বা-বা, তিন-তিনবার তোমাকে জিৎদা জিৎদা ক'রে ডেকেছি এখানে দাঁড়িয়ে...তুমি শুনতে পাওনি।... কি, ভাবছ কি অমন ক'রে?...নাইতে যাও।

তিন-তিনবার ডাকিয়া কেতকী তাহার সাড়া পায় নাই শুনিয়া রণজিৎ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; আনত মুখে বলিল,—আমি শুনতে পাইনি।...যাই, নাইতে যাই, উঠি—

—যাও।—বলিয়া কেতকী চলিয়া গেল।

কেতকী রণজিতের দিকে চাহিয়া হাসে—অতিশয় অনাবিল কৌতুকহাস্য।...প্রথম

দিন কেতকী বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল···চমকপ্রদ অতর্কিত সেই হাস্যরেখাটি অস্ত্রের ফলার মত এখনো তার কোথায় যেন বিঁধ হইয়া আছে...তখন তার আকার খর্বই ছিল, কিন্তু শুকাইয়া এমন কুৎসিৎ কাঠের মত নীরস বর্ণহীন হইয়া যায় নাই।

বর্ষার প্রকৃতির মত কেতকীর দেহ – দেহের তেমনি সমৃদ্ধি আর বর্ণোজ্জ্বলতা। ·· দেহ এমনি পরিপূর্ণ নিটোল যে, দেখিলে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়...মনে হয়, আর একটু অগ্রসর হইলে সে যে কেমন বস্তুতে দাঁড়াইবে তাহা কেউ জানে না, ভাবিতেও বুঝি পারে না।

কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া রণজিৎ দাঁড়াইয়া ছিল ; কেতকী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, —মা, ওটি কে ?

—ওঁর ছাত্তর।

শুনিয়া কেতকী আবার হাসিয়াছিল, যেন তার বাবার ছাত্র হওয়াও ওর মানায় না।

কিন্তু কেতকী ডাকে তাকে জিৎদা বলিয়া—একেবারে নিজেদের লোকের মত তার ব্যবহার। রণজিৎ সেই একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিল, আর সেদিকে চোখ তোলে নাই।

আর একদিন মাত্র সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল ; সেদিন যে-লজ্জা সে পাইয়াছিল, তার জীবনের তা অভিশাপ।

কবিরাজ মহাশয় স্নান সারিয়া ঘরের ভিতর আহারে বসিয়াছেন···বারান্দায় রান্না হয় ···কেতকীর মা গরম গরম বড়া ভাজিয়া তুলিতেছেন···কেতকী গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া হাওয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিতেছে···

রণজিৎ উঠানে স্নান করিতেছিল—স্নান করিতে করিতে হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া সে যেন বাজের আলোয় ঝলসিয়া অসাড় হইয়া গেল—কেতকীর ডান হাতখানা ধীরে ধীরে স্বর্ণলতার মত দক্ষিণে বামে দুলিতেছে···মুখের যতটা দেখা যাইতেছে তাহাই যথেষ্ট···

কিন্তু রণজিতের অদৃষ্ট মন্দ—কেতকী অকস্মাৎ তাহার দিকে চাহিয়াই মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা, দেখো।

—কি লা ?—বলিয়া কমলা মুখ ফিরাইতেই রণজিতের উপরেই তাঁর চোখ পড়িয়া গেল ; রণজিৎ তাড়াতাড়ি চোখ নামাইল। কেতকী বলিল,—দেখলে ?

কমলা বলিলেন,—হুঁ। ও কিছু নয়।

কথা ক'টি স্পষ্ট রণজিতের কানে গেল···যখন চোখ ফিরানো উচিত ছিল তখন সে ফিরাইতে পারে নাই, তার ক্ষমতাই ছিল না···যে দুর্বার আকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের গোলকগুলি একটি কেন্দ্রে পরস্পর সংলিপ্ত হইয়া আছে, তখন সেই আকর্ষণের বশে সে হতচেতন...

কিন্তু পরক্ষণেই জ্বলিয়া জ্বলিয়া তার মনে হইতে লাগিল,·বালতির জল জল না-হইয়া যদি গোখরো সাপের বিষ হইত তবে তার খানিকটা পান করিয়া ঠাণ্ডা হওয়া যাইত। বিষের অভাবে একটা আথালি-পাথালি কাণ্ড বাধিয়া গেল,···হৃদপিণ্ড এমন করিয়া লাফাইতে লাগিল যেন তাহাকেও নাচাইতে চায়···সারা গায়ের রোঁয়ার গোড়ায় ঘাম ফটিল···নিঃশ্বাস অসহ্য দ্রুত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল···মাথা এমন ঘুরিতে লাগিল যে

তার দুর্গতির শেষ রহিল না—যেন রাগ করিয়া কেউ তাহাকে দু'হাতে ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কূপের ধারে তখনই বসাইয়া দিয়া গেছে···গায়ের জল বাষ্প হইয়া গিয়াছিল বহু পূর্বেই।···সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু ভুলিবার নয়···সেদিন তখন তার মনে হইয়াছিল, নির্ঘাৎ এ যমের তাড়না, লইতে আসিয়াছে। তাহার পর নিজের অবাধ্য হইয়া আর সেদিকে সে চাহে নাই।

রণজিৎ গামছাখানা হাতে করিয়া স্নান করিতে আসিল। বাড়ীর ভিতর সে কেবল স্নানাহার করিতে যায়; খাইয়া চলিয়া আসে; কেহ ডাকিয়া না পাঠাইলে আর যায় না। আজ কমলা বলিলেন,—কি ভাবো তুমি এত! কেতকী বলছিল তার তিন ডাকে তুমি রা দাওনি। অত ভেবো না ··তোমার আবার ভাবনা কিসের এত!—বলিয়া তিনি ছেলেটির শীর্ণ অবয়বের দিকে অতিশয় মমতার চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

রণজিৎ মুখ নামাইয়া ছিল, নামাইয়াই রহিল, কথা কহিল না। কিন্তু কমলা লক্ষ্য করিলেন, যেন ব্যথা পাইয়া তার মুখখানা মলিন হইয়া উঠিয়াছে। বলিলেন,—মন খুব বাড়ী বাড়ী করে, নয়?···সৎমা অবাগী স্বামীর ঘরে থাকতেই ত' পারত তোমায় নিয়ে, ধান কলাই দুধের ত' কিছু অভাব নেই তোমাদের···মা-পোয়ের দু'টি পেট স্বচ্ছন্দে চলত···

রণজিৎ তেল মাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কমলা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু আমাদের তুমি পর ভেবো না।···ভাল থেকে মন ভাল রেখে, পড়াটা শেষ ক'রে ঘরে গিয়ে বসবে··· তখন আমাদের কথা মনে থাকবে ত'?—বলিয়া কমলা সস্নেহে হাসিতে লাগিলেন।

রণজিৎ বলিল,—আমি আর যা-ই হই, মা, নিমক্‌হারাম নই; আপনার কথায় আমার পাপ হ'ল।

কমলা বিস্মিত হইলেন; এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া কথা বলিতে এই ছোট মানুষটিকে কোনোদিন তিনি দেখেন নাই। বলিলেন,—ভেবো না। খালি ভাবলে কিছুর দিশে হয় না তা ত' তুমি জানো।

—তা জানি, মা।···বাড়ীর কথা আমি মোটেই ভাবিনে।

—নিমাই ঠাকুরের চিঠি পেলে?

—পেয়েছি।

—তিনি খুব উপকার করছেন কিন্তু; জমি-জায়গা ঘর-বাড়ী তিনিই ত' ধ'রে রেখেছেন···নইলে এতদিনে ছত্রাকার হ'য়ে যেত।

রণজিৎ বলিল,—হ্যাঁ।

—তবে নিশ্চিন্দি থাকো।···ধান বেচে তিনি টাকা পাঠিয়েছেন?

—শীগ্‌গির পাঠাবেন লিখেছেন।

—বেশ।···চান ক'রে দুটি খেয়ে নাও এখন···আমার আবার কাজ আছে।—বলিয়া নিজের উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়া কমলা প্রস্থান করিলেন, যেন স্নেহ-বুভুক্ষু গৃহবঞ্চিত ছেলেটিকে তৃপ্ত করিয়া তাহাকে তিনি যথেষ্ট সুখ সান্ত্বনা দিয়াছেন।

॥ ৩ ॥

রব পড়িয়া গেল, জামাই আসিবে। শুনিয়াই রণজিতের বুকের ভিতরটা আচমকা মুচড়াইয়া উঠিয়া যেন কেমন করিতে লাগিল...এতদিন মাটির পৃথিবীতে নয়, মনেরও দুর্গম স্থানে অন্তরীক্ষ-পথে কোথায় যেন একটু স্পর্শ-প্রবাহ ছিল, জামাই আসিবার সংবাদে সেইটাই হঠাৎ অবরুদ্ধ হইয়া যেন রণজিতের আবহাওয়ার আবাস উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রণজিতের ক্ষয় সুরু হইয়া গিয়াছিল প্রথম মুহূর্ত হইতেই···একটা মহাক্ষুধা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল···পরিণাম ভাবে নাই···তার অবসান আসে নাই, সে আনিতে পারে নাই···সেই আদি-অন্তহীন নির্নিমেষ ক্ষুধার জ্বালা তাহাকে টানিয়া আনিয়া জগতের বাহিরে ফেলিয়াছে আর অবিশ্রান্ত লেহন করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া আনিতেছে···

এমনটি যে ঘটিতে পারে জীবনে কেহ তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে কিনা কে জানে—এ যেন দ্বাদশ সূর্যের অখণ্ড একত্র উদয়, তেমনি নির্মম, আর তেমনি দাহ, সে তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য ; সৃষ্টির কোথাও আর কিছু নাই·· সবুজ নীল সব রং ছাই করিয়া দিয়া একটি রক্তবর্ণ দাহ কেবল জ্বলিতেছে—তাহার তুলনা নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পরিহার করিয়া দৃষ্টি ফেলিবার স্থান নাই, চোখ বুজিবার সাধ্য নাই···মনের ভাবনা আর সব পথ হারাইয়া কেবল ঐ একটি দিকেই দুর্নিবার হইয়া পুড়িয়া মরিতে ছুটিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কে যেন তাহার সর্বাংগ সুকোমল স্নিগ্ধ তনু দিয়া ছাইয়া রহিয়াছে···স্পর্শে সর্বাবয়ব শীতল শিথিল হইয়া গেছে ; কিন্তু বুকের বায়ু বাহির হইতে না পারিয়া ভিতরেই একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

ছ্যাঁৎ করিয়া রণজিতের ঘুম ভাঙিয়া যায়—দেখে, হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করিতেছে···আর তার ঘুম আসে না।

নিশিকান্ত রণজিতকে পড়াইতে বসেন—রণজিৎ পড়িতে বসে ; কিন্তু তার মনে হয়, শ্লোকের পর শ্লোকে আর সূত্রের পর সূত্রে যে-জ্ঞান গ্রথিত হইয়া আছে তার মূল্য নাই, সার্থকতা প্রয়োজন নাই···ভারবাহী জীবের মত সে আয়ুর্বিজ্ঞানের বোঝা পৃষ্ঠের উপর গ্রহণ করিতেছে। ··মানুষকে সে ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবে ; কিন্তু সব ব্যাধির কথা কি শাস্ত্রে আছে !···অগ্নিশিখা যখন মানুষের ভিতরটাকে ছাই করে তখন সে ক্ষয় আর মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কি নাড়ীতে ধরা পড়ে ! তার কি ঔষধ আছে !

নিশিকান্ত শ্লোকগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মনেই অনর্গল বকিয়া যান···রণজিৎ হাঁ করিয়া থাকে···ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিশিকান্ত মুখ তুলিয়া স্পষ্টই দেখেন, ছাত্রের মন কোন্ বিদেশে বিচরণ করিতেছে তাহার উদ্দেশ নাই ; বলেন,—অধ্যয়নে তোমার মন নাই। কিছুদিন বিশ্রাম করো।

রণজিৎ বলে,—যে আজ্ঞে।

'মাধবনিদানম্' তোলা আছে ; রণজিৎ বিশ্রাম করিতেছে ··এমন সময় সংবাদ পেঁাছিল, জামাই আসিতেছে।

॥ ৪ ॥

জামাই আসিল। রণজিৎ চোখ দিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া সমগ্র মন দিয়া যেন তাহাকে সম্পূর্ণ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না…ইহারই নাম মানুষ!…নিজের অপ্রচুর অপরিসর কলেবরটাকে রণজিৎ একবার ধ্যান করিয়া লইল। সে যে এত ক্ষুদ্র, এত নগণ্য, এত কুৎসিত তাহা এমন করিয়া আলো জ্বালিয়া কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় নাই…রণজিতের মনে হইল, সে কোথাও নাই—সূর্যালোকে দীপশিখার মত সে অনাবশ্যক…রূপের এই ঐশ্বর্যের পাশে সে লুপ্ত হইয়া গেছে…যৌবনের এই উদ্দামতার নিম্নে সে তলাইয়া গেছে।…রণজিতের একটা নিঃশ্বাস পড়িল। নিশিকান্তের জামাই গণেন বাস্তবিকই রূপবান, স্বাস্থ্যবান…চাহিয়া চাহিয়া তার চেহারা দেখিতে যার তারই ইচ্ছা করে।

খবর পাইয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসুদেব আসিয়া পড়িলেন।—বাবাজী এসেছ, কেমন আছো?

বাবাজীর সংগে বাসুদেবের আর একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে কালোয়াৎ আসিবার পূর্বে। গণেন বলিল,—ভালই আছি।

—কাজ-কর্ম?

—ভালই চলছে।

—বড় গরম।—বলিয়া বাসুদেব কুর্তার বোতাম সব ক'টিই খুলিয়া দিয়া হাঁকিলেন, —কই হে মন –উঁ হুঁ, রণজিৎ, পান-টান কি এ-বাড়ীতে নেই নাকি?

কবিরাজ বলিলেন,—রণজিৎ, পান আনো।

বাসুদেব বলিলেন,—কব্‌রেজ খালি প্রতিধ্বনি করতে জানে।… পান আমি অন্য কোথাও চেয়ে খাইনে; কিন্তু কেপ্পণ আর বেহায়ার কাছে চক্ষুলজ্জা করলে ঠকতে হয় ব'লেই কেবল এই বাড়ীতেই চেয়ে নি'।…রণজিৎ, পান আনো—চারটে কি ছ'টা কি দুটো কি তিনটে তা আমি কিছু বলছিনে কিন্তু!

রণজিৎ ঘরের ভিতর নির্জনে বসিয়া ছিল—লুকাইবার স্থান নাই; মনে মনে সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া যেন এই রূপলোলুপ অনুসন্ধিৎসু পৃথিবীর একান্তে বসিয়া একটু মুখ লুকাইবার স্থানের সন্ধান করিতেছিল।

—যাই।—বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল।

কেতকী সম্মুখেই ছিল। কেতকীর দিকে চাহিতে রণজিতের নিজেরই বারণ; কিন্তু আজ একটা অসাধারণ উপলক্ষ বড় জাঁক-জমকে সমারোহ করিয়া সাজিয়া আসিয়াছে…

সাহস করিয়া একবার কেতকীর দিকে সে চাহিল; দেখিল, অপরূপ আনন্দ যেন তার শরীরের বাহিরে আসিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিতেছে—পাত্রে যেন তা ধরা যায়…

মুখ নামাইয়া বলিল,—পান চাইছেন বাইরে।

কেতকী বলিল,—দিই।…তারপর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল; বলিল,—জিৎদা, তুমি বড় বিশ্রী হ'য়ে গেছো ত'!…এতদিন ভাল ক'রে দেখিনি।…কেন বলো ত'?

রণজিৎ বলিল,—পান চাইছেন।

কেতকী বিস্মিত হইল—একটা কথাই লোকে অকারণে দু'বার বলে না; কিন্তু ঐ পর্যন্তই…

কেতকী পান আনিতে গেল ; বলিয়া গেল,—দাঁড়াও, পান আনছি।

কিন্তু রণজিৎ দাঁড়াইতে পারিল না···পান আনিয়া হাতে দিবে না মাটিতে রাখিবে ! তারপর, আজ তার শরীরের দিকে কেতকীর ভাল করিয়া দৃষ্টি গেছে···তার কারণও রণজিতের জানা হইয়া গেছে...স্বামীর সঙ্গে সত্য সত্যই তুলনা না করুক, সুপুরুষের পার্শ্বে সে সম্পূর্ণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে···তাহার ক্ষুদ্রতা বিশ্রী হইয়া আজ কেতকীর চোখে পড়িয়াছে···

রণজিৎ পলায়ন করিল। কেতকী পান লইয়া আসিয়া দেখিল, রণজিৎ নাই।··· রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে পানের ডিবাটি লইয়া সে বৈঠকখানার ভিতর দিককার দরজার কাছে ঠক্‌ করিয়া নামাইয়া দিয়া গুম্‌গুম্‌ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। রণজিৎ সেদিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল···শব্দ শুনিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, মানুষ কেহ নাই, পানের ডিবাটি রহিয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় একখানা মোটা বই লইয়া তৃতীয় ব্যক্তির মত নিঃশব্দে ফারাকে বসিয়া আছেন ; গণেন বাসুদেবের গল্প শুনিয়া অবাক হইয়া গেছে···বাসুদেব বলিতেছেন,—গান নিয়েই আছি, বুঝলে বাবাজী, গান নিয়েই আছি···কালোয়াতের গুরুগিরিও মাঝে মাঝে করি···আমার "হুঙ্কারে ব্যোমে মহেশ্বর দেবদেব ত্রিলোচন" গানটা দিয়েছি এক কালোয়াতকে···বড় তালের গান, বড় ঝাঁপতাল···এই দেখো মাত্রা—

বলিয়া বড় ঝাঁপতালের তাল ফাঁক দেখাইতে তিনি গোল চোখ আরো গোল করিয়া হাত পাতিয়া সেই হাতের উপর অপর হাত উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় রণজিৎ পান লইয়া তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাসুদেব পানের দিকে চাহিলেনও না—

—হুং—এ সোম।···এই দেখো।—বলিয়া সুর ভাঁজিয়া আনিয়া যথাস্থানে সেই উদ্যত হাত পাতা হাতের উপর চটাস করিয়া ফেলিয়া গণেনের মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গীতাচার্য মুখ বিস্ফারিত করিয়া রাখিলেন।

গণেন বলিল,—বেশ।—বলিয়া সে বাসুদেবের বিস্ফারিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চোখে চোখে চাহিয়া মনে মনে উঁহারা কি পাঠ করিলেন তাহা জানিলেন কেবল অন্তর্যামী। রণজিৎ বলিল,—পান এনেছি।

বাসুদেব বলিলেন,—তা দেখেছি···তুমি বড় তালকানা হে...অমন সময় ব্যাঘাত দেয় !—বলিয়া দুটি পান তুলিয়া লইয়া একসঙ্গে মুখে পুরিয়া বলিতে লাগিলেন,—এই যে দেখছ ছেলেটি···বাবাজি, পান নেও একটা।

রণজিৎ গণেনের সম্মুখে ডিবা ধরিয়াছিল ; গণেন বলিল,—পান আর আমি খাবো না এখন।—বলিয়া রণজিতের মুখের দিকে চাহিল।

রণজিৎ চলিয়া গেল ; বাসুদেব বলিতে লাগিলেন,—তোমার শ্বশুরের ছাত্র। তোমার শ্বশুরকে বলি, ভাই, ছাত্রটিকে সুস্থ সবল ক'রে তোলো আগে, তারপর বাইরের রুগী দেখো। ঘরের লোকের ঐ চেহারা দেখলে বাইরের লোক যে আঁৎকে পিছিয়ে যাবে !··· আমাদেরই মনে হয়, ছোঁয়াচ লাগল বুঝি।

গণেন বলিল,—ছেলেটির বাড়ী কোথায় ?

—বাড়ী ওর চাঁপাগাছি।...নাঃ, নেহাতই উঠতে হ'ল দেখছি...তামাকের ধোঁয়া যার বিশ্রী লাগে সে তামাক দিতে ব'লে উঠে গেলেই পারে...

নিশিকান্ত হাসিয়া ডাকিলেন,—সাধু, তামাক দে রে।

—এতক্ষণে তামাক দে রে!…তারপর শোনো, বাবাজি।… তোমার শ্বশুর গিয়েছিলেন রুগী দেখতে; গিয়ে উটিকে লাভ করেন।…বাপ নেই, মা আছে, বিমাতা। বাপ জীবিতকালেই ছেলেকে তেমন দেখত-শুনত না, বিমাতা দূর দূর করত; বাপ মারা গেল, সৎমাটা পালিয়ে গেল তার বাপের বাড়ী; ছেলেটি রইল একা। সেই গাঁয়ের নিমাই ঠাকুর ওর বাপের পাঠশালার গুরু…সে-ই ছেলেটিকে নিয়ে এসে তোমার শ্বশুরের হাতে ধ'রে বললে, আপনি নিয়ে যান ছেলেটিকে—বড় ভাল ছেলে, ঠাণ্ডা ছেলে, স্বজাতিও বটে; কিছু জাতীয় বিদ্যে যদি ওকে শিখিয়ে দেন কাজ চলা মত, তবে ক'রে খেতে পারবে। ব'লে দিব্যি গছিয়ে দিলে—তোমার শ্বশুর ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন।… বলে, কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।—বলিয়া বাসুদেব হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন; তারপর ঢোক গিলিয়া পানের ছিবড়ে নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—তোমাদের পশ্চিমের জলে নাকি লোহার মটর হজম হ'য়ে যায়! · একবার নিয়ে যাও ওকে।

গণেন বলিল,—যদি যেতে চান উনি তবে অক্লেশে নিয়ে যেতে পারি।

—আমি হ'লে জোর ক'রে নিয়ে যেতাম।…বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়েছিলি? —বলিয়া সাধুর হাত হইতে হুঁকা লইয়া বাসুদেব হুঁকার গাত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সাধু বলিল,—ফিরিয়েছিনু, বাবু।

—বিশ্বেস নেই বাবা, বামুনের ওপর বদ্যির খুব আক্রোশ দেখা যাচ্ছে আজকাল… শর্মা হচ্ছেন সব…তুমি কিছু মনে ক'রো না, বাবাজ।—বলিয়া বাসুদেব হাসিয়া হুঁকায় মুখ দিলেন।

গণেন বলিল,—উনি ওষুধ খাচ্ছেন ত'?

শুনিয়া বাসুদেব প্রথমে টান থামাইয়া হুঁকাটা বাঁ হাতে করিলেন…তারপর কবিরাজের দিকে চাহিয়া এমন একটু সূক্ষ্ম চটুল হাসি ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট টিপিয়া সম্মিলিত ঠোঁটের ডগায় ফুটাইয়া তুলিলেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবিরাজের মনে মনে ছট্‌ফটানি ওঠ্‌-বস্‌ লাগিয়া গেল।

বাসুদেবকে তিনি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন; কিন্তু বাসুদেব কবিরাজের এয়ার, কবিরাজের চোখের টিপুনি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; বলিলেন,—হ্যাঁ, ওষুদ উনি খাচ্ছেন, তোমার শ্বশুরই দিচ্ছেন, মন্—

কবিরাজের হাতের বই ধপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল; কিন্তু সেই শব্দে ঔষধের নামটি ঢাকা পড়িল কি না কবিরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

এ-দিককার কথাগুলি কানে লইয়া রণজিৎ স্তব্ধ হইয়া তার নিজের স্থানটিতে বসিয়া ছিল ··অনুভব করিতেছিল, চতুর্দিক হইতে মুহুর্মুহুঃ ধাক্কা আসিয়া তার বুকে লাগিতেছে…তাহার দেহ শীর্ণ কদাকার বলিয়া লোকে যেন অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহাদের ভিতর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চায়।

পৃথিবীতে এত লোক; সম্মুখ দিয়া দিবারাত্র তাহাদের চলাচলের অন্ত নাই, কিন্তু কেউ তাহার মত নহে। তবু তাহাদের সঙ্গে নিজের খর্বতা ক্ষুদ্রতা কদর্যতার তুলনা সে কোনোদিন করে নাই—সে স্বতন্ত্র ছিল···আজ এই জামাইটিকে দেখিয়া সে যেন ব্যগ্র হইয়া পৃথিবীর বহির্দেশ ছাড়িয়া মানবের অন্তর-লোকে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হইয়াই কঠিন আঘাত পাইয়াছে। দেখিতে পাইয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিবার পথ তার নাই।

রণজিতের মনে হইতে লাগিল, এ কেন আমাকে দেখিল···দেখার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, বুঝিয়াও রণজিৎ তাহা বুঝিল না ··কোথাও যেন রুদ্ধপথ ছিল—পর্বতের মত আসিয়া পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গেছে ঐ লোকটি...ইহাকে অস্বীকার করা যাইতেছে না।

বাসুদেব আচার্য রণজিতের ইতিহাস বলিয়া গেলেন, জামাই দরদ দিয়া তাহা শুনিল। রণজিতের মনে হইতে লাগিল, সে একেবারেই কাঙাল হইয়া গেছে···তার অবলম্বন কে সরাইয়া লইয়াছে—সে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

গণেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আলাপ করিল ; সকরুণ চক্ষে এবং অতিশয় ভদ্রভাবে তাহার রুগ্ন মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনার অসুখ কতদিনের ?

রণজিৎ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—মাস তিনেকের ; আগে ভাল ছিলাম।

মাস তিনেক আগে একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশের রং যখন রাঙা, আর সেইদিকে চাহিয়া সুখমগ্ন পৃথিবীর হাসির শেষ নাই, তখন হইতে···গণেন বলিল,—অসুখ সারাবার কি কচ্ছেন ?

—কিছুই করছিনে।···এখানে থাকতে আমার অসুখ ভাল হবে না।—বলিয়া ফেলিয়া রণজিৎ চকিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু তারপরই নিজের এ কথাটারই সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে অদৃষ্টপূর্ব একটা আলোকে তার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।···নিজের কথাটাই অস্বীকার করিয়া সে পুলকিত কণ্ঠে বলিল,—আমার অসুখ কিছু নেই, জামাই বাবু। এখান থেকেই ভাল হ'য়ে যাবো।...সহসা তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, এমনি করিয়া সাধনা করিয়া মৃত্যুর স্পৃহা জাগাইয়া লইয়া ক্ষয় হইতে হইতে একদিন একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ার চেয়ে বড় সার্থকতা তার জীবনের আর কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু গণেন অবাক হইয়া গেল। এখানে যত্ন তেমন নাই বলিয়া অসুখ সারিবে না, রণজিতের কথার অর্থ করিতে যাইয়া গণেন এই ভুলই করিয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী উদ্দীপনার সংগে এই অর্থের ভাবসংগতি না পাইয়া সে রণজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

খাইতে বসিয়া গণেন বোধ হয় অন্য কথার অভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,—যাবেন আমাদের ওদিকে ? আমার কাছে বেশ থাকবেন ; পনর দিনে আপনার শরীর ভাল হ'য়ে যাবে। যাবেন ?

তাহারই সম্বন্ধে চেনা-অচেনা আত্মীয়-পর সবারই অহরহ এই উৎকণ্ঠা গায়ের মাংসে সূচ ফুটিবার মত অসহ্য হইয়া উঠিলেও রণজিৎ ঘৃণাক্ষরেও কখনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে নাই ··আগে এবং অন্যত্র হইলে কি হইত কে জানে, কিন্তু এখন এই অন্তঃপুরে বসিয়া জামাতার মুখের এই প্রশ্ন তাহাকে যেন আরো উদ্ঘাটিত অনাবৃত করিয়া দিতেছে ···উত্তপ্ত মুখে সে নীরব রহিল। গণেন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—যাবেন ?

রণজিৎ বলিল,—না।

কেতকীর মা সেখানে ছিলেন ; জামাতৃ-ভোজনের তদ্বির করিতেছিলেন ; তিনিও করুণা করিয়া বলিলেন—যাও না, থেকে এসো কিছুদিন...তোমার শরীর আগে, না পড়া আগে !

রণজিৎ মরিয়া হইয়া বলিল,—যাবো। আপনারা না বললেও যেতাম।

—এই যে বললে 'যাবো না' !—বলিয়া তাহার উল্টাপাল্টা কথায় কমলা হাসিয়া উঠিলেন···গণেনও মুখ টিপিয়া একটু হাসিল···অন্তরালে কেতকীও বোধ হয় হাসিল।

গণেন বলিল,—আপনি আপন, আমি পর ; তাই—

কিন্তু কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

—আমি উঠি।—বলিয়াই সহভোজীকে ত্যাগ করিয়া এবং নিজের আহার অসমাপ্ত রাখিয়া রণজিৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। গণেন বিস্মিত হইয়া রহিল।

কমলা ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—আমি ত' অন্যায় কিছু বলিনি, বাবা !...কিন্তু সে-কথা তার কানে গেল কিনা সন্দেহ।

· বৈকালে গণেন বলিল,—আসুন, বেড়িয়ে আসি।

রণজিৎ বলিল,—আপনি যান, আমি যাবো না।

··শরীর ভাল নাই বলিয়া রাত্রে সে কিছু খাইল না···নিশিকান্ত কুশল প্রশ্ন করিলেন, সাধিলেন ; কমলা বিলাপ করিতে লাগিলেন—ভাল ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, বেচারা খাইতে পাইল না, ও-বেলাও ভাল করিয়া খায় নাই···রাগের ত' কোনো কথাই হয় নাই···হাওয়া বদল করিতে যাইতে বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে ত' উহারই ভালর জন্য ···তাহাতেই কিছু যদি ও মনে করিয়া থাকে তবে বড়ই অন্যায় হইয়াছে···ইত্যাদি।

জামাই রণজিতের হাত ধরিয়া টানিল,—একটিবার আসনে ব'সে যান...কিন্তু রণজিৎ অটল নির্বিকার রহিল, যেন এতগুলি লোকের এতগুলি কথায় তার কিছু যায় আসে না।

রাত্রে অন্ধকার ঘরে শুইয়া রণজিৎ কান পাতিয়া রাখিল—যেখানে কোনো শব্দ যায় না সেই ঊর্ধ্বতম শূন্যের মাঝে...সেখানে শুধু অচেতন গ্রহে গ্রহে অগ্নিমরু ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে...রণজিৎ স্থির নিশ্চল হইয়া শুইয়া ছিল—একটি একটি করিয়া দীপ নিবিয়া গৃহ অন্ধকার হইয়া তারপর ক্রমে নিঃশব্দ হইয়া যাইতেই সে অস্থির হইয়া উঠিল, পিঠের নীচে শয্যা যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে···কে বলে আমি মানুষ ! এ ভয়ঙ্কর মিথ্যা আমাকে কে শিখাইয়াছে ! এই মিথ্যার বশীভূত আমি কেন হইয়াছি !

একবার উপুড় হইয়া, একবার চিৎ হইয়া, একবার এ-পাশে ফিরিয়া, একবার ও-পাশে ঘুরিয়া বিছানায় সে গড়াইতে লাগিল···তার শুষ্ক অস্থি ক'খানা ভাঙিয়া দুমড়াইয়া বেঁকিয়া চুরিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রাণান্তকর আক্ষেপে শয্যার চারিপ্রান্ত জুড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুরিতে লাগিল—যেন জীবনবাহী যন্ত্রগুলি জীবন-প্রবাহ বাহির করিয়া দিয়া চুপসিয়া ক্রমানয়ে ছোট হইয়া আসিতেছে · শিরা ধমনী সংকুচিত হইয়া তাহাকে টানিয়া জড়ো করিয়া আনিতেছে, প্রসারিত করিয়া ছুঁড়িয়া দিতেছে ··তাহার তন্দ্রাহীন অপলক চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, দু'টি অনির্বাণ জ্যোতিঃপিণ্ডের মত জ্বলন্ত দু'টি মূর্তি—তাহারা সুখ-দুঃখ ভুলিয়াছে···তাহারা যে রক্তমাংসের মানুষ সে জ্ঞান তাহাদের নাই···কি রূপ সেই যুগলমূর্তির ! তাহাদের কাহারো পদনখর স্পর্শের যোগ্য সে নয়।

রণজিৎ সহসা শয্যায় উপর উঠিয়া বসিয়া দশ অঙ্গুলির নখ দিয়া নিজের কুরূপ দেহখানাকেই চিরিয়া চিরিয়া রক্তাক্ত করিয়া যেন সম্মুখের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

···ভোর না হইতেই রণজিৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বহুক্ষণ পথে-পথে মাঠে-ঘাটে বেড়াইয়া যখন সে ফিরিল তখন বেলা হইয়াছে, আর সে এমনি বদলাইয়া গেছে যেন তাহাকে চেনা যায় না···চিবুক হইতে ললাট পর্যন্ত কে যেন ছুরি দিয়া ঝুরিয়া তার উপর কালি লেপিয়া দিয়াছে···নাক ঝুলিয়া গালের হাড় বাহির হইয়া

পড়িয়াছে…কোটরপ্রবিষ্ট চোখে অস্বাভাবিক নির্জীবতা আর ক্লান্তি।…খালি গা, কোঁচার কাপড় পাকাইয়া গলার সংগে জড়ানো।

বাড়ী ফিরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রণজিৎ উঠান হইতে ডাকিল—মা, একগ্লাস জল খাবো।

—চা খাবিনে ? কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?—বলিতে বলিতে কমলা বাহিরে আসিয়া ভয় পাইয়া গেলেন।—কি হয়েছে রে তোর ? অমন করছিস যে ?

রণজিৎ টলিতেছিল।

—কি, মা ?—বলিয়া কেতকী আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল…এবং পর মুহূর্তেই যাহা ঘটিয়া গেল, রণজিৎ যে তেমন ক্ষ্যাপামি করিতে পারে তাহা কেহ কখনও ভাবে নাই। …রণজিৎ হয় তো জল খাইতেই আসিয়াছিল—কিন্তু কেতকীর কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই সে তার মুখের দিকে না চাহিয়া চাহিল তার পায়ের দিকে ; দেখিল, রক্তবর্ণ বসনপ্রান্ত তার চরণতল চুম্বন করিয়া আছে…আর তরুণ রৌদ্র তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে… দেখিয়াই রণজিতের কি অদ্ভুত লালসা জন্মিল কে জানে…তাহার জ্ঞান যেন ঘুলাইয়া ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল…চক্ষের নিমেষে সে বসিয়া পড়িয়া কেতকীর পায়ের দশটা আঙুল দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়া স্পর্শ করিয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ॥ ১ ॥

ঘোষপুর-চক্রডিহি রোডে লোক চলাচল সুরু হইয়া গেছে ; কোমরে গামছা-বাঁধা চটি হাতে পথিক হইতে ছাপ্পরওয়ালা গরুর গাড়ীর বাবু—সোয়ার পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঘোষপুরের দিকে চলিয়াছে। কাহারো কাজ ডাক্তারের কাছে—কাহারো কাজ বাজারে—কাহারো কাজ উকিলের কাছে…উকিলের কাছে যাহারা চলিয়াছে প্রাণের ব্যগ্রতা আর মুখের কলরব যেন তাহাদেরই বেশী ··বগলে 'কাগজপত্তর' আর ট্যাঁকে টাকা আছে, তাতেই গরম হইয়া মুখে চালাকির খৈ ফুটিতেছে…'দেখে' নেয়ার গোঁ-এ তাদের খুব সুখ।

ঘোষপুরে আদালত ছাড়া আড়ৎও আছে—ধান বোঝাই করিয়া গোরুর গাড়ী চলিয়াছে চালের কলে ঢালিয়া দিতে। রাস্তাটা ভাল, দু'ধারে তরুশ্রেণী, আর তার দু'ধারের মাঠের শেষ কোথায় হইয়াছে কে জানে।

একটি তরুমূলে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল ; দেখিল, একটি স্ত্রীলোক নিবিষ্ট চিত্তে পাঁচ-সাত বছরের একটি বালকের মুড়ি আর গুড় খাওয়া দেখিতেছে। এরাই শরৎ আর শান্ত। আর ঐ আমাদের রণজিৎ। রণজিৎ বাড়ী চলিয়াছে, শরৎ চলিয়াছে বাড়ী ছাড়িয়া ; পথে উহাদের দেখা হইয়া গেল।

ছেলে মুড়ি খাইতেছে আর মা তাই বসিয়া বসিয়া সস্নেহ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে ইহা দাঁড়াইয়া দেখিবার মত কিছু নয় ; কিন্তু রণজিৎ হঠাৎ উহাদের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল,—তোমরা কোথায় যাবে ?

শরৎ অন্যমনস্ক ছিল ; মানুষের গলার শব্দ পাইয়া সে ঘোমটা টানিতে গেল, কিন্তু টানিল না…আবছায়া চোখে পড়িল, গলার স্বর মোটা হইলেও আগন্তুক ছেলেমানুষ। শরৎ মুখ তুলিল ; বলিল,—যেদিকে ভগবান নেন।

—ভগবান দর্শাদিকেই নিতে জানেন, আর তাঁর ইচ্ছে মোটেই স্পষ্ট নয়। তোমরা কোন্ দিকে যাবে ব'লে বেরিয়েছ ?

শরৎ বলিল,—ব'সো।···গুড়-মুড়ি খাবে দুটি ?

—খাবো।

—দেবো কিসে ?

—এই কাপড়ে।—বলিয়া রণজিৎ কাপড় পাতিয়া বসিল।

অতিথি-জ্ঞানে শরৎ তাহাকে তৃপ্ত করিতে বসিয়াছিল, কিন্তু অঞ্জলি করিয়া মুড়ি দিতে দিতে শরৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার চোখে জল আসিয়াছে ; জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁদছো যে ?

রণজিৎ চোখের জল মুছিয়া বলিল,—বলব পরে।···আর দু'টি দাও।

মুড়ি খাইয়া রণজিৎ শান্তকে বলিল,—আয়, জল খেয়ে আসি।

—জল কোথায় ?

—আছে। আয় ত' আমার সঙ্গে।

শরৎ জানিত না, কিন্তু কিছুদূরে আম-বাগানের ভিতরে পুকুর ছিল।

...জল খাইয়া আসিয়া রণজিৎ বলিল,—তুমি খাবে না ?

শরৎ বলিল,—না, বাবা...

বস্ত্রাভাবের দিনে ত্যক্ত শাড়ী বাহির করিতে হইয়াছিল—শরতের সেই শাড়ী দেখিয়াই রণজিৎ হঠাৎ ভুল করিয়াছিল ; ভুল বুঝিয়া বলিল,—ও, চান না ক'রে বুঝি খাবে না ? চান ক'রে নাও না কেন !

—সময় হয়নি এখনো যে।—বলিয়া শরৎ ছেলেটির মুখের দিকে একবার চাহিয়া বেলার দিকে চাহিল।

—তোমায় আমি কি ব'লে ডাকব ?

শরৎ একটু হাসিল ; পথের দেখার মূল্য কিছু যদি আদায় করিয়া লওয়া যায় ! বলিল,—মা ব'লে।

—তোমরা কোথায় যাবে, মা, এইবার আমায় বলো। তোমার গায়ে এখনো ময়লা লাগেনি, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে তা আমি বুঝেছি। কোথায় যাবে বলো।

কোথাও যাইবে বলিয়া শরৎ বাহির হয় নাই, আশ্রয় পাইবে বলিয়াও তার আশাও নাই। ভাবিয়া বলিল,—তুমি কোথায় যাবে ?

—বাড়ীতে। যাবে আমাদের বাড়ী ?

শরৎ ভাবিতে লাগিল। যে-গৃহ সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে চিরজীবী তার বন্ধন, তীর্থতুল্য তার পবিত্রতা, চির-অক্ষয় তার মাধুর্য ; কিন্তু সে-গৃহে ফিরিবার মুখ তার আর বোধ হয় নাই ; কুললক্ষ্মীর ব্রত উদ্‌যাপন করা অদৃষ্টে তার নাই। পিতৃপুরুষ অভিসম্পাৎ দিবেন না—তাঁহারা কি তার অন্তরের দুঃখ আর আকর্ষণ বুঝিবেন না। যে দুঃখে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহার তুলনা যেমন নাই, তেমনি তাহার মর্ম বুঝিতে পারে অন্তরের এমন কোন আত্মীয়ও তার নাই। আজ সকালে তাহাকে গৃহে না দেখিয়া সন্দেহের যে বিষবাষ্প দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ভিতর প্রবেশ করা আর সম্ভব নয় ; অথচ এই প্রান্তরে বসিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে কেবল দুস্তর অন্ধকারেই দেখা যায়, কোনো রন্ধ্র দিয়াই, চিরদিনের আশ্রয় নয়, বিশ্রামের ভূমিটুকুও চোখে পড়ে না।

এই বালকের আহ্বান যেন ভগবানের নিজের কণ্ঠের সাড়া—অন্তর্যামী অন্তরের বেদনায় বিচলিত হইয়া ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শরৎ এক মুহূর্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করুণাময়ের ধ্যান করিয়া লইল; বলিল,—বাড়ীতে তোমার কে আছেন?

—কেউ না।

—কেউ নেই? মা বাবা—

—মা আছেন, কিন্তু তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকেন না, তাঁর বাপের বাড়ীতে থাকেন। বাবা নেই।

—তাই তোমার এমন শরীর। এতদিন কোথায় ছিলে?

—পড়ছিলাম গুরুগৃহে। পালিয়ে এসেছি।

—কেন?

—ভাল লাগল না।

কেতকীর কথা রণজিতের মনে ছিল, কিন্তু অক্ষম নির্বাপিত ভস্মের আকারে। নিশিকান্ত কবিরাজের বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া কিছুদূর আসিতে না আসিতেই সে আশ্চর্য হইয়া দেখিল যে, যে-চিন্তা বহ্ন্যুৎসব জ্বালাইয়া অহরহ তাহাকে লুব্ধ করিয়া বীভৎস ধ্বংসের দিকে টানিতেছিল, তাহার আভাস মাত্রও নাই। কোনো ক্লেশ,কোনো গ্লানি কোনো বিকার বালাই নাই। শরৎ বলিল,—যাবো তোমার বাড়ী। কিন্তু কেউ যদি কিছু বলে!

রণজিৎ বলিল,—আমি তোমাকে মা বলেছি···সে আমি দেখব।

—আমরা সৎগোপ।

—আমরা বৈদ্য। কিন্তু, মা, এই ভেদজ্ঞানটা তোমায় আগে ছাড়তে হবে।—বলিয়া রণজিৎ মাথা নত করিল। বলিল,—ওঠো যাত্রা করি, তিন মাইল পথ যেতে হবে।... ওরে, তোর নাম কি?

শান্ত এতক্ষণ বিচক্ষণ ব্যক্তির মত দু'জনার কথাবার্তা শুনিতেছিল, যেন এখন যতই বলা আর কওয়া হউক পরিণামে মীমাংসার ভার তাহারই ওপর দেওয়া হইবে···তাহাকে সম্ভাষণ করিতেই সে লাফাইয়া উঠিল; রণজিতের হাত ধরিয়া বলিল,—দাদা...

শরৎ বলিল,—খেয়াল আছে ছেলের।...চ' দাদার হাত ধ'রে।

রণজিৎ হাত বাড়াইয়া বলিল,—তোমার পুঁটুলিটা দাও আমার হাতে; দিয়ে মায়ের মত এসো।

—তোমার যে রোগা শরীর...

—ছিল, কিন্তু এই বাতাসে এসে দাঁড়িয়ে আমি জোর পেয়েছি...তোমায় পেয়ে আরো ভাল হ'য়ে গেছি।...দাও, কুমাতা হ'ও না!

পুঁটুলিটা এক হাতে লইয়া অন্য হাতে শান্তর হাত ধরিয়া পা বাড়াইয়াই থামিয়া রণজিৎ বলিল,—ওরা বেরিয়ে যাক, একটু দাঁড়াও, মা।

দু'টি লোক ঘোষপুরের দিকে ছুটিতেছিল; একজন বক্তা, অপরটি শ্রোতা। বক্তা বলিতেছিল,—শূদ্দুরের শাপও বামুনের লাগে। আমরা সবাই ত' জানি ভূষণঠাকুরের বেনামীতে ভূতো জোতটা কিনেছিল,···মহাজনের ভয়ে ঠাকুরকে কোবালা ক'রে দিয়ে দখল ছেড়ে দিয়েছিল···ভূতো বলেছিল, ঠাকুর জোত আমার নিলে বটে বেকায়দায় ফেলে ফাঁকি

দিয়ে, কিন্তু ভোগ করতে নারবে তুমি...বলা কি ফলা···ছ'মাসও গেল না, ঠাকুরের গলা দিয়ে···

ঠাকুরের গলা দিয়া কি বাহির হইতেছে, শ্লেষ্মা কি রক্ত, তাহা শোনা গেল না। শান্ত বলিল,—দাদা, ওরা কোথায় যাচ্ছে ?

—মামলা করতে।...চ', এসো মা।

বাসুদেব আচার্য এবং তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ রণজিতের এখনকার তৎপরতা আর বাক্‌পটুতা দেখিলে কি ভাবিতেন তাহা অনুমান করা কঠিন...তবে প্রথম কয়েক মুহূর্তে মানব-চরিত্র কি বিচিত্র মনে করিয়া অবাক হইয়া থাকিতেন নিশ্চয়। রণজিৎ চলিতে চলিতে বলিল,—গিয়ে দেখবে, সব মজুত···চাল দুধ...

শান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—কখন পেঁছিব, দাদা ?

—এই একটু বাদেই।···হাঁটতে পারছিস ত' ?

শান্ত তর্‌তর্‌ করিয়া চলিতেছিল ; বলিল,—খুব পারছি···গুড়-মুড়ি খেয়ে নিলাম যে !

রণজিৎ বুঝিতে পারিল, গুড়-মুড়ি খাইবার আগে সে অবসন্ন বোধ করিতেছিল ; বলিল,—গিয়েই রান্নার যোগাড় দেখতে হবে, মা ! ভাইটি আমার গুড়-মুড়ি খেয়ে যতই ফুর্তি করুক না, সে গুড়-মুড়ি টিকবে না বেশিক্ষণ।···আমাদের গাঁয়ের পণ্ডিত মশাই, নিমাই ঠাকুর, তাঁরই জিম্মায় আমার সব আছে, মায় ঢেঁকি কুলো অবধি।···গিয়ে তোমায় বড় ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, মা ; পেঁছিতে বেলা হবে ঢের।···এই হচ্ছিল আর একটু হ'লেই ; আমার মুখের পানে চেয়ে কি দেখছিস ? পথ দেখে চল্‌।—বলিয়া শান্তকে ঠিক করিয়া খাড়া করিয়া লইয়া রণজিৎ বলিতে লাগিল,—ঘর-দোর উনুন-টুনুন সব নোংরা হ'য়ে আছে, পণ্ডিত মশায় ত' আর সাফ করাচ্ছেন না রোজ রোজ। দরকারী জিনিষ-পত্তরগুলো তাঁর বাড়ী থেকে এ-বাড়ীতে এনে সব গুছিয়ে নিতেই অনেক বেলা হ'য়ে যাবে।·· এ-বেলার মত আলু ভাতে ভাত দুটো সিঝিয়ে দিও তিনখানা ইট পেতে...কি বলো, মা ?

—তা-ই ক'রো।

—তা-ই ক'রো নয়। তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রে ফেলো। সড়ক ছেড়ে এইবার আমাদের মাঠে মাঠে যেতে হবে। ঐ আমাদের গাঁ দেখা যায়, কিন্তু দূর আছে।

শান্ত বলিল,—কই, দাদা ?

—উই যে ঘন জঙ্গল দেখা যায়, উরি ভেতর আমাদের বাড়ী।

—আমরা তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি ?

—তবে শুনছিস কি ক্ষ্যাপা এতক্ষণ ! এইটুকু রাস্তাই বড় কষ্টের। তোমার খুব হচ্ছে, মা ; হাঁটা ত' অভ্যেস নেই !

ছেলেটির শরীর এবং শারীরিক আলস্য দেখিয়া সঙ্গীতাচার্য বাসুদেব, অধ্যয়নে অমনোযোগ দেখিয়া কবিরাজ নিশিকান্ত এবং অগ্নিমান্দ্য দেখিয়া কেতকীর মা কমলা কখন বিরক্ত কখন আশ্চর্য হইতেন, কখন হাসিতেন ; কিন্তু শরৎ মুগ্ধ হইয়া গেল ছেলেটির বুদ্ধি আর মমতা দেখিয়া। শরতের মাতৃহৃদয়ে যেন নূতন করিয়া স্তন্যসুধা উৎসারিত হইতে লাগিল। বলিল,—আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। এমন সুখ আমি বহুদিন পাই নি।

কিছুদূর তিনজনেই নিঃশব্দে যাইয়া শান্ত বলিল,—দাদা, গিয়েই আমরা কুস্তীর আখড়া খুলব। কুস্তী লড়লে এমন ক্ষিদে পায় আমার—

রণজিৎ তার হাতে একটু চাপ দিয়া বলিল,—আমার ক্ষিদে ব'সে ব'সেই পায়, যদি জানতে পাই মা আমায় ব'সে খাওয়াবে।

—দাদা, দেখো দেখো—কি ওটা ?

—শেয়াল।

—শেয়াল ঐ-রকম নাকি! তু তু···ধর্ ধর্···

শান্তর চীৎকার শুনিয়া শৃগাল থামিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই ছুটিয়া পালাইল।

শান্ত বলিল,—শেয়াল হাসতে পারে, দাদা ?

রণজিৎ হাসিয়া উঠিল ; বলিল,—আমাদের দেশের শেয়াল ত' পারে না···

কিন্তু শান্তর মনে হইতেছিল, শেয়ালটা ঠিক যেন হাসিয়া চলিয়া গেল।

রণজিতের গ্রামের প্রান্তবর্তী গাছগুলি ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল...মনে হইতেছিল, সবুজ একটা একটানা বেড়া...অল্পে অল্পে তাহাদের মাঝে ফাঁক দেখা দিলো। রণজিৎ বলিল,—গ্রামে ঢুকেই আমাদের বাড়ী নয়, খানিকটা দূর যেতে হবে।...তারপর শরতের দিকে ফিরিয়া বলিল,—একটা কথা বলি, মা, অপরাধ নিও না—ঘোমটা তুমি তুলে দাও···এ গাঁয়ের লোক ভারি বজ্জাত ; ঘোমটা যত টানবে তত তারা দেখতে আসবে ঘোমটা দিয়ে কে এলো···তোমার মর্যাদার হানি হবে।

শুনিয়া শরৎ অসঙ্কোচে ঘোমটা তুলিয়া দিলো ; তার মনে হইতেছিল, এই ছেলেটি মিথ্যা বলিতে পারে না ; ইহার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় হওয়া যাইতে পারে, কেবল মা বলিয়া ডাকিয়াছে বলিয়া নয়, কেমন সরল সুন্দর একটি অনুভূতি আসিয়াছে যাহার হেতু যেন সর্বত্রই আছে, কিন্তু দেখানো যায় না।

॥ ২ ॥

গ্রামে উঠিতেই রণজিৎ বলিল,—শুনতে পাচ্ছো, মা, একটা গোলমাল ?

শরৎ বলিল,—পাচ্ছি।

—ওরা রোজ ঐ অমনি ক'রে ঝগড়া করে।···সে কি মুখ খিস্তী! · ওদিক দিয়ে তোমায় নিয়ে যাবো না—ঘুরে যাবো।

তাহারা ঘুরিয়াই চলিল—এবং সেই ঘোরা পথের মাঝেই সাক্ষাৎ হইয়া গেল রক্ষাকর ঘোষের সঙ্গে। রক্ষাকর গোরুর গলার দড়ি ধরিয়া তাহাকে চরাইতে যাইতেছিল...খানিক আপনি চরাইয়া দড়ি বাবলা গাছে বাঁধিয়া দিয়া আসিবে। পথিক দেখিয়া রক্ষাকর দাঁড়াইল।

—অই, তুমি ?···আমি ত' চিনতেই পারিনি হঠাৎ। তোমার শরীর ত' খুব খারাপ হ'য়ে গেছে!—বলিয়া রক্ষাকর দুশ্চিন্তার ঘোরে যেন জ্ঞানহারা হইয়া রহিল।

রণজিৎ বলিল,—খারাপ একটু হয়েছে···

এবং রণজিৎ আলাপ করিতে দাঁড়ায় না দেখিয়া রক্ষাকর মনের আড়ে আড়ে যে-প্রশ্নটি আলাপ করিতেছিল, কালবিলম্ব না করিয়া সেইটাই বলিয়া ফেলিল,—উনি কে ?

রণজিৎ দূর হইতে বলিল,—শুনবেন পরে! এখন আমাদের তাড়াতাড়ি...

রক্ষাকর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথা থেকে আসছো এখন ?

রণজিৎ উত্তর দিলো না ; শরতকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—উনি দারোগা ছিলেন ; হেড-কনষ্টেবলই ছিলেন...একবার ডাকাত ধ'রে দারোগা হন আর মেডেল পান।...তারপর খুন কবুল করাতে একটা মানুষ খুন ক'রে চাকরিটি খুইয়ে এখন গোরু চরাচ্ছেন...ঢের টাকা আর ভারি বদ লোক ; আমার বাবার—

—তুমি কোত্থেকে ?

রণজিৎ চম্‌কিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখেই গিরিধর বাঁড়ুয্যে···পাশ কাটাইয়া দাঁত মেলিয়া আছেন, আর মুহুর্মুহুঃ লক্ষ্য করিতেছেন সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে, এমন কৌশলে যেন কেউ টের না পায়। মৃতা স্ত্রীর শোকে গিরিধর চুল রাখিয়াছেন—কিন্তু রণজিৎ তাঁর মান রাখিল না ; চলিতে চলিতেই বলিল,—আমার মা।

—ও।—বলিয়া বাঁড়ুয্যে দৈবাৎ লজ্জিত হইলেন।···পরিচয় না জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার যে দৃষ্টিটাকে সে কশাঘাত করিয়া গেল সেই দৃষ্টি তিনি একবার চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া যে দিকে চলিতে লাগিলেন সে দিকে যাইবেন বলিয়া তিনি বাহির হন নাই···

পরক্ষণেই দেখা মাধুর সঙ্গে—

—জিতু, ল্যাখাপড়া হ'ল, বাবা ?

—হ'ল।

—এটি কে ?

—আমার মা।

—তোর মাকে ত' আমি চিনি, বাবা ; সে ত' এ নয়।···কোথা থেকে ধ'রে আনলি ?

কিন্তু জিতু তখন অনেকটা আগাইয়া গেছে। মাধু বলিতে লাগিল,—বাবা, কথা শুদোলে তার জবাব নেই···নবাব হয়ে এসেছে···কেমন ধারা মানুষ তুই···তোর বাবাকে হ'তে দেখলাম...

বেহারীর মা উঠানে কাঠের উনুন জ্বালিয়া ময়লা কাপড় সোডার জলে ফেলিয়া সিঝাইতেছিল ; সুমিষ্ট সোর শুনিয়া ঘটির জল টিনে ঢালিয়া দিয়া সে মাধুর নিকট-বর্তিনী হইল ; বলিল,—কার সঙ্গে কথা কইছিস, বোন ?

—ঐ বদ্যিদের জিতুর সঙ্গে ; একটা মেয়ে নিয়ে গাঁয়ে ঢুকল ; শুদোলাম, কে উটি ? তা দেমাকে কথাই কইলে না।

বেহারীর মা বলিল,—আপন কাজে যা ; কার কথায় কে থাকে বল্‌, কার এমন মাথা ব্যথা···

—কাজে যাবো বই কি, তুই বলছিস ব'লেই যাবো এমন নয়, নিজের গরজেই যাবো।···কাজেই বা যাবো কি ছাই···নচ্ছার ছুঁড়িদের জ্বালায় দু'খানা শুকনো ডাল যে কুড়িয়ে পাবো তারও—

বেহারীর মা বলিল,—কে গেল জিতুর সঙ্গে ? দেখলি ?

—তা কি দেখবার সময় পেলাম !···মাগী ত' নয় মন্দ, এই এখানে এক পা আর ওখানে এক পা···দেখতে দেখতে লাফিয়ে চ'লে গেল, এই, এই রকম করে।—বলিয়া মাধু লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া তফাৎ তফাৎ পা ফেলিয়া শরতের পা ফেলার রকমটা দেখাইল।

—সে-কথায় আর কাজ নেই, বোন।···আমি কারু কথায় থাকিনে।

—আমিই বা কই থাকি ? শুদোলি তাই বললাম।

—আমি বাপু শুদোই-টুদোইনি।···সেবারকার কথা মনে আছে ত' ?

সেবার কোন এক অজ্ঞাত লোক একটি স্ত্রীলোক আনিয়া গ্রামেরই একটা প'ড়ো বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং গন্ধে গন্ধে পুলিশ আসিয়া গ্রাম তোলপাড় করিয়া গ্রামশুদ্ধ লোকের জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল,...সেই কাহিনীটা বর্ণনা করিয়া বেহারীর মা মাধুকে পরের কথায় লিপ্ত হইতে পৈ পৈ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলো।

শরৎ চলিতে চলিতে এক সময় বলিল,—প্রায় সবারই ঘরদোর ভাঙা চোরা দেখছি যে, জিতু !

জিতু বলিল,—অবস্থা কারুরই ভাল নয়, মা ; খেতে পায় না বলেই ত' ক্ষিদের জ্বালাতেই সব আগুন হ'য়ে থাকে, কারো কথা কারু গায় সয় না।

জিতু পেঁৗছিয়া দেখিল, বাড়ীর সদর দরজায় তালা লাগানো ; বলিল,—মা, এইখানে তুমি একটু বসো ; আমি চাবি আর দড়ি বালতি দৌড়ে নিয়ে আসি।

—দাদা, আমিও যাবো।—বলিয়া শান্ত লাফাইয়া উঠিল।

—না, তুই থাক, মা একা থাকবে কেমন ক'রে ! —বলিয়া জিতু চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতরকার একটা ডালিম গাছ প্রাচীরের বাহিরেও শাখা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল, শরৎ তাহারই নীচে বসিয়াছিল···স্থানটা ঝাপসা অন্ধকার আর স্যাঁৎসেতে।··· হঠাৎ সামনের বাড়ীর দরজা খুলিয়া একটি আধবয়সী খাটো কাপড় পরা স্ত্রীলোক অনেকগুলি উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া বাহির হইয়াই চমকিয়া থামিয়া গেল ; বলিল,—ওমা, তুমি আবার কে ?

শরৎ কথা কহিল না—অনাবশ্যক কথা তার মুখে আসে না। বালকের খেয়ালে এখানে আসিয়া সে ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, তন্ময় হইয়া সে সেই কথাই ভাবিতেছিল।...পথে আসিতে আসিতে লোকগুলির কথার যে বক্রতা দেখা গেছে, মানুষকে নিরুৎসাহ করিয়া ভাবাইয়া তুলিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট প্রচুর ও স্পষ্ট একটা কৌতূহলের সম্মুখে পড়িতে হইবে তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই···স্থান অপরিচিত, লোকগুলিও অপরিচিত...কিন্তু ইহাদের আচরণ এমন অপরিচিত হইবে সে-আশা সে করে নাই...এখনো কি করিলে ভাল হয় তাহা বুঝিতে আসিতেছে না। একটা তীক্ষ্ন যন্ত্রণাবোধ লইয়া শরৎ বসিয়া ছিল ; স্ত্রীলোকটি উত্তর না পাইয়া রাগিয়া বলিল,—কোথাকার মানুষ গা তুমি ? কথা কইছ না যে ?

শরৎ এইবার চোখ তুলিল। আর কিছুই তার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল বৃহৎ কেবল দু'পাটি দাঁত, বিরক্তির আধিক্যবশতঃ তার মাড়ি পর্যন্ত বাহির হইয়া আছে। বলিল,—আমাদের বাড়ী মণ্ডলগ্রাম।

—এখানে কেন ?

—রণজিতের সঙ্গে এসেছি।

—তুমি তার কে হও ?

—কেউ না।

—তবে ?

আর উত্তর জুটিল না ; শরৎ চুপ করিয়া রহিল। শান্ত বলিল,—চলো, মা, আমরা এখান থেকে যাই।—মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তার দুঃখ হইতেছিল, কি আগন্তুকের ভ্রূভংগী দেখিয়া তার ভয় করিতেছিল তাহা সেই জানে।

স্ত্রীলোকটি বলিল,—ছেলে বুঝি তোমার ?

—হুঁ।—বলিয়া শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কোথায় যাচ্ছো ?

কোথাও যাইবে বলিয়া শরৎ উঠিয়া দাঁড়ায় নাই ; কেবল ছেলের কথায় সে আরো দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় রণজিৎ দড়ি বালতি আর চাবি লইয়া আসিয়া পড়িল ; বলিল,—কি বলছ তুমি ?

—শুদোচ্ছিলাম পরিচয়।···রকমারি ঢের দেখলাম।—বলিয়া স্ত্রীলোকটি বাসন লইয়া যাইয়া ঘাটে নামিল।

জিতু বলিল,—এসো, মা, ঘরে এসো।—বলিয়া সে মাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল ; বলিল,—ও মেয়েটি আধ-পাগ্‌লা ; কিছু যদি ব'লে থাকে দুঃখ পেয়ো না, মা।...ওর স্বামী মাতাল···কোথায় সে থাকে কে জানে ; মাঝে মাঝে আসে আর ওকে মার ধোর ক'রে চ'লে যায়।···মার খেয়ে খেয়ে ও ক্ষেপে গেছে।

প্রতিবেশীর এই পরিচয়ে শরতের বুকই যেন শুকাইয়া উঠিল। ভগবান দুঃখিনীর দুঃখে গলিয়া যান আন্তরিক এই বিশ্বাসের উপর অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পাইয়া ভগবানের কারুণ্যে শরতের যে অকপট আনন্দ জন্মিয়াছিল তাহাও যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতে লাগিল।···কোনো কারণই বিদ্যমান নাই তবু মানুষ তাহাকে সন্দেহ করিতেছে···সে-সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রগল্‌ভ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে মানুষের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই··· এটা যেন দ্বিতীয় জগৎ···তার সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর অবিশ্বাস প্রবেশ করিতে সে দেখে নাই...মানুষের মনের এত প্রখরতা তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই ; স্বামীর মার খাইয়া স্ত্রী ক্ষেপিয়া গেছে এমন সংবাদ একেবারে নূতন।

শরৎ দেখিল, জিতুর বাড়ীখানা বড়ই। নানাস্থানে ছোট ছোট আগাছা জন্মিয়াছে, এককোণে একটা সজিনা গাছ ছিল, সেটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তার ডাল পাতা শুকাইয়া আছে ; লাউয়ের মাচা বাঁধা হইয়াছিল, তার তিনটি খুঁটি খাড়া হইয়া আছে, আর চুণ মাখানো কালো হাঁড়ি একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দেওয়া রহিয়াছে—শস্য শূন্য মরাই একটা উঠানে।...রণজিৎ দড়ি-বালতি নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—ধান নিমাই ঠাকুর নিয়ে রেখেছেন ; তাতে আমাদের বছর চলবে।

যাহা হউক, বিশ্রাম করিয়া চাল ডাল কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ইঁট পাতিয়া নয়, উনানেই রান্না হইল...রণজিৎ বহুদিন পরে পেট ভরিয়া চারটি খাইল।

বেলা পড়িতেই নিমাই ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিবানিদ্রার দরুণ তাঁর চোখের লাল তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই ; দুই হাতে পৈতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,— তখন ত' ভাল ক'রে কথাই বললিনে, জিতু ; ক্ষিদে-তেষ্টার সময় ব'লে আমিও পেড়াপীড়ি করলাম না।—পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলি যে ?

বলিয়া তিনি বারান্দার ধারেতেই বসিয়া পড়িলেন। আসন তখনও তাঁহার বাড়ীতেই ; বিছানাপত্র বাসন আসন প্রভৃতি আনিবারই উদ্যোগ হইতেছিল।

জিতু বলিল,—ভাল লাগল না ; শরীর দেখছেন ত' আমার !

—তা ত' দেখছি। কিন্তু ছিলে তুমি চিকিৎসকের কাছে ; শরীরের ভয় এখানে বেশী, না সেখানে বেশী ?

—সেখানেই বেশী। এখানে যতদিন ছিলাম, ভালই ছিলাম ; সেখানে গিয়েই ত' এই হাল হয়েছে।

—বেশ, থাকো এখানেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে কোথায় পেলে ?

—যেখানেই পাই ; ও'কে আমি মা বলেছি ; ও'র সম্বন্ধে খুব সতর্ক হ'য়ে কথা বলবেন।

এ বড় বেজায় খোঁটা ! আকস্মিক আঘাতে ঠাকুরের মুখ লাল আর বিকৃত হইয়া উঠিল ; তথাপি তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অতিশয় সপ্রতিভভাবে বলিলেন,—বাহবা, বাহবা ! পিতৃগুরুর সম্মান করতে শিখে এসেছ খুব দেখছি। তোমাকে, বাপু, সেই কবরেজ তাড়িয়ে দিয়েছে তোমার আচরণে।

—আমায় মাপ করুন।—বলিয়া রণজিৎ পিতৃগুরুর পদধূলি হইল ; কাতর হইয়া বলিল,—উনি আমার মা ; পাছে কোনো কথায় দুঃখ পান এই ভয়েই—

—না, আমি কিছু মনে করিনি। তবে মেয়েমানুষকে সম্মান করতে শেখাতে আসা তোমার পক্ষে একটু ধৃষ্টতা ব'লে মনে হয়েছিল।—বলিয়া নিমাই ঠাকুর পৈতা ঘুরাইতে লাগিলেন।

রণজিৎ বলিল,—ধান বেচেছেন কিছু ?

—বেচেছি দু'শো টাকার। টাকা আমার কাছে আছে। উনি, মানে তোমার মা, যদি কিছুদিন এখানে থাকেন তা হ'লেও যে ধান আছে তাতেই চ'লে যাবে।···কিন্তু আমার পার্বনিটা ?

—নেবেন। শতকরা দশ টাকার কথা ত' মজলিশেই ঠিক হয়েছিল, ঠাকুদ্দা।

সব জিনিষেরই দশম ভাগের একভাগ পার্বনি লইয়া রণজিতের ঘর-বাড়ীর, উৎপন্ন শস্য এবং গরু-বাছুরের খবরদারি করিতে ঠাকুর রাজি হইয়াছিলেন। বলিলেন,—ভাল। এসেছ ভালই। আশীর্বাদ করি—

—নিমাই, প'ড়ো বাড়ীতে কি করছ হে ? কথা কইছ কার সংগে ? গলা শুনেই চিনেছি···বলিতে বলিতে পঞ্চানন রায় আসিয়া সুপরিচিতের আপ্যায়নসহ নিমাই ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

নিমাই বলিলেন,—জিতুর সংগে কথা কইছি।

—তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। সে কোথায় না পড়ত ?

—হুঁ। শরীর টিকলো না সেখানে।

উঠানে মেলা সাড়ীখানার উপর পঞ্চাননের চোখ পড়িয়াছিল ; প্রশ্ন করিলেন—সাড়ী শুকোচ্ছে দেখছি ; কার ?

নিমাই জিতুর দিকে চাহিলেন···জিতু তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল···এবার সে কি বলে দেখা যাক। জিতু বলিল,—আমার মায়ের।

পঞ্চানন ভুরু তুলিয়া বলিলেন,—মা ! ও···এসো, নিমাই, যাবে নাকি ?···না, তুমি আবার গার্জেন ! তা এইবার—

অসমাপ্ত কথার উল্লসিত প্রতিধ্বনি নিমাইয়ের প্রাণেই শব্দিত হইল ; বলিলেন,—দূর ক্ষ্যাপা।—বলিয়া হাসিয়া নিমাই পঞ্চাননের হাত ধরিয়া টিপিয়া দিলেন ; এবং 'এখন

আসি' বলিয়া অত্যন্ত তৎপরতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পঞ্চাননের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।···জিতুর দিকে চাহিতে তাঁর যেন অকারণেই সাহস হইল না।

জিতু কাঠ হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তার মনে হইতে লাগিল, মাকে মুখ দেখাইবার তার উপায় নাই···তার মা সম্বোধনটিকে মায়ের সম্মুখে অপমানিত করিয়া যে-জঘন্য ইঙ্গিত আর সংশয় ইঁহারা প্রকাশ করিয়া গেলেন তাহার ব্যথা মায়ের কোথায় যাইয়া বাজের মত পড়িয়াছে তাহা অনুমান করা ত' কঠিন নয়···তাঁর ব্যথিত মুখখানি স্মরণ হইতে লাগিল, ইঁহাদের নির্লজ্জ উৎসুক্যের অন্ত নাই। যে-কথা ভাবিতেই পারা যায় না, যেন সেই চূড়ান্ত কথাটারই সন্ধান করিয়া এই পূজনীয় ব্যক্তিগণ অন্ধকারে সুতীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি হানিয়া বেড়াইতেছেন—হিংস্র জন্তুর শিকার সন্ধানের মত···এত ইতর ইঁহারা যে, ইতর আচরণের চক্ষুলজ্জাটা পর্যন্ত ইঁহাদের সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেছে।···রণজিতের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল···

অন্তরালে বসিয়া শরতের মনেও ঐ একই চিন্তার উদয় হইয়াছিল···তার ইচ্ছা করিতেছিল না যে একটু নড়িয়া বসে, কিন্তু রণজিতের চোখে জল দেখিয়া সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না··এই ছেলেটির চরিত্রমাধুর্য তাহাকে যেমন বিস্মিত করিয়াছে মুগ্ধও করিয়াছে তেমনি···সে ছেলেটির সত্যিকার মা, নহিলে তাহাকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সে কেন আঘাত গ্রহণ করিবে!···পেটের ছেলের মতই সে মায়ের অন্তর্যামী···সুবৎসল লালন-লালসা থাকিয়া থাকিয়া থাকিয়া ইহারই দিকে এমন উদ্বেল হইয়া ওঠে যে শরৎ ঠিক থাকিতে পারে না...ভুলিয়া যায়, শান্ত বেশী আপন, না সে বেশী আপন।

শরৎ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল; যেন কিছুই হয় নাই এমনি সহজ কণ্ঠে বলিল,—যা বাবা শীগ্‌গির, জিনিষগুলো আনবার বন্দোবস্ত কর্···সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে।

রণজিৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। শরৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—ভগবান, তুমি আছো।

কেবল চুপ করিয়া থাকিয়া, কি একটা অতিশয় চমৎকার আর গুরুতর কথা চাপিয়া রাখিয়া গ্রামস্থ স্ত্রী-পুরুষকে ও ঠকাইয়া যাইতেছে...অনুমান করিয়া আদৌ তৃপ্ত হইতেছে না···ব্যাপার আঠার-আনা ঘোরালো করিয়া তোলা যাইতেছে না···প্রাণ পাগল-পাগল ঠেকিতেছে...যেন সেই কথাটা শুনিয়া আঁৎকাইয়া না ওঠা পর্যন্ত দেহের শান্তি নাই, মনের বিশ্রাম নাই—এমনি আইঢাই প্রাণ লইয়া লোক যেন আকাশ হইতে শরতের সম্মুখে পড়িতে লাগিল।

রণজিৎ নিমাই ঠাকুরের বাড়ী হইতে জিনিষগুলি আনিয়া যত্র তত্র রাখিয়া দিয়াছিল; সকালে সেগুলি তিনজনে গুছাইয়া সাজাইয়া যথাস্থানে রাখিতে ব্যস্ত, এমন সময় শান্তা আসিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া বসিল; বলিল,—তুমি এসেছ জিতু, ভালই করেছ। নিমাই ঠাকুর তোমার বাবার গুরু, কিন্তু সোজা কথা বলি, ঠাকুরের মন ভাল নয়; কেবল তোমার বদনাম গেয়ে বেড়াত···খালি তোমার নয়—তোমার বাবারও···আমি বলি, ঠাকুর, তোমার সুরাহা ত' তা থেকেই! কিন্তু কার কথা কে-বা শোনে!...তোমার জিনিষ-পত্তর আর কিছুদিন পরে এলে আর পেতে না।···ভাবছি, তোমায় একটা খবর দি' যাকে-তাকে দিয়ে···আ হা হা, ফেললি ত' ময়দা...

শান্তর হাত হইতে একটা টিনের কৌটা মাটিতে পড়িয়া খানিকটা সাদা গুঁড়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল···তাহারই জন্য শান্তার এই খেদ। শান্ত গুঁড়াগুলি জড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; রণজিৎ বলিল,—ময়দা নয়, সোডা···কুড়োসনে।

শান্তা বলিল,—তোমায় খবর দেবো ভাবছিলাম···তা আর দিতে হ'ল না··· জিনিষগুলি সব বুঝে পেয়েছ ত' ?

—পেয়েছি।···মা, তোমার গোছানো হ'ল ?

ঘরের ভিতর হইতে শরৎ বলিল,—হয়েছে।

—শান্ত, নিয়ে যা।—বলিয়া চার-পাঁচটি কৌটা কুলার উপর তুলিয়া দিলো।

শান্তা বলিল,—কই গো জিতুর মা, তোমায় দেখতে এলাম—বেরোও একবার···

ডাক শুনিয়া শরৎ বাহির হইয়া আসিল। শান্তা তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, —বাঃ, দিব্যি সুশ্রী...মা ব'লে ডেকে সুখ আছে...ব'সো দিদি, দুটো কথা কই...

শান্তাও দেখিতে বিশ্রী নয়।···কিন্তু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় শরতের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল ; বলিল,—বসবার সময় নেই, দিদি···

—তা বইকি, দিদি ; বসবার সময় কি আমারও আছে !...তবু দু'দণ্ড ফুরসৎ ক'রে নিতে হবে। তা নাও গুছিয়ে...হাঁ ক'রে কি দেখছিস রে বেটা ! আমি তোর মাসী।— বলিয়া শান্তকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া শান্তা তাহাকে কোলের উপর বসাইল। বলিল,— ছেলে তোমার দুটিই ভাল···জিতুকে আমি জানি যখন ও মায়ের পেট থেকে মাটিতে পড়ে তখন থেকে...অমন সুবুদ্ধি ঠাণ্ডা ছেলে হয় না।···তবে এখন আসি, দিদি ; আসব মাঝে মাঝে···আচ্ছা ব'সো···

বলিয়া শান্তকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া শান্তা বলিল,—শ্রী ফিরে গেছে বাড়ীর —লক্ষ্মীর হাত পড়েছে কি না !—বলিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট মনে সে একবার চারিদিকে চাহিল ; তারপর বলিল,—ঘরের লক্ষ্মীর যেমন ঘরভরা চেহারা, তেম্নি ভদ্দর আচরণ। ···তোমাদের আপন ঘর কোথা, মা ?

ইতিপূর্বে শরতকে সে দিদি বলিয়াছিল, তাহা ভুল হইয়া গেছে। শরৎ বলিল,— মণ্ডলগ্রাম।

—নাম শুনেছি।·· তা ঘর ছেড়ে চ'লে এলে যে ?

রণজিৎ এতক্ষণ নির্লিপ্ত ছিল। একটু খাড়া হইয়া উঠিল ; বলিল,—এই কথাটা আগে শুদোলেই পারতে ! মিছে কতকগুলো বাজে বকলে কেন ? ঐ কথাটাই জানতে তুমি এসেছিলে···মানুষ ঘর ছাড়ে অতি দুঃখে ; সে দুঃখের কথা বলবার ইচ্ছে ওঁর নেই।—বলিয়া রণজিৎ যেন শান্তাকে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শান্তা কিন্তু রণজিতের উত্তাপ অনুভবই করিল না ; হাসিয়া বলিল,—ভুল বুঝলে, বাবা।···আচ্ছা, আসি। ওঠো, বাবা।—বলিয়া শান্তকে কোলের উপর হইতে উঠাইয়া দিয়া শান্তা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তুমিও যেন আমায় ভুল বুঝো না, দিদি।···বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শরৎ বলিল,—তুই কি সবারই সঙ্গে অমন তেড়ে তেড়ে কথা কইবি ! তাতে কি আমার—

রণজিৎ বলিল,—ও-কথা থাক।

শরৎ বলে,—জিতু, তেল মাখবি আয়।

জিতু মাধবনিদানম্ সংগ্রহ করিয়া আবার অধ্যয়নে মন দিয়াছে; মুখ তুলিয়া বলে,—আমি নিজেই মাখব এখন! তুমি বুড়ো ছেলেকে কেন তেল মাখাবে রোজ?

—তেলে-জলে বাঙালীর শরীর; গায়ে তেল বসিয়ে বসিয়ে দুদিনেই তোমায় মানুষের মত করেছি…

—খাইয়ে করেছ। ডবল খাচ্ছি।

শান্ত বলে,—আমিও তাই।

—তা হোক. তুই এসে বসো।—বলিয়া শরৎ চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়ায়…রণজিৎ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়ে…পা ছড়াইয়া বসে।

সম্ভবতঃ শরতের কথাই সত্য—তেল মাখিয়াই রণজিতের বুকে চোখের কোণে আর গালে মাংস লাগিতেছে, শরীরের রং ফিরিতেছে। বাসুদেব আচার্য এখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় গানের সুর ভুলিয়া যাইতেন…বলিতেন,—তুমি কি সেই তুমি না কি হে?…কত ধানে কত চাল বাবা কেবল তুমিই জানো।

তেল মাখিতে মাখিতে রণজিৎ বলে,—শান্তর যে বুদ্ধি, মা, দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেছি…তোমার ছেলে কি না. বুদ্ধি তার হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে।

শান্ত অনাহূতই বলে,—দাদা, আমাকে বলছ?

শরৎ হাসে; রণজিৎ বলিয়া যায়,—আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া ছিলাম; তোমায় পেয়ে আমি ধন্য হ'য়ে গেছি, মা; আমার যে কত সুখ তা বলতে পারিনে।…আমি দেখতে ছোট, বিশ্রী—আগে আমার তা খুব মনে হ'ত; এখন মনে হয়, মায়ের চোখে ত' আমি দেখতে ভাল! এখন কেবল তোমার কথা আর শান্ত-র কথাই মনে হয়, নিজের কথা ভাবিনে।

শরৎ বলে,—সেদিন কোত্থেকে আসছিলি?

—আমি পড়তাম যে, কবুরেজি।…সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি।…সেখানেও একজনকে মা ব'লে ডাকতাম তিনিও ভালবাসতেন; কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, আমি প্রাণ দিয়ে যা চাই তার আভাস যেন পাই নি।

—তাই বুঝি সেখান থেকে পালিয়েছিলি?

—না, সে জন্যে পালাইনি।—বলিয়া রণজিৎ উঠিয়া পড়ে।

শরৎ বলে,—একটু দাঁড়া, পিঠ্‌টাতে—

কিন্তু রণজিৎ দাঁড়ায় না।

—জিতু আছো হে?

—কে?

—আমি বিনোদ।

জিতু বলিল,—কি দরকার? তেল মেখেছি।

রাস্তার উপর হইতেই বিনোদ বলিল,—দরকার কিছু নেই; যাচ্ছিলাম এইদিক দিয়ে, খোঁজ নিয়ে গেলাম। আছো ভাল?

—হ্যাঁ।

যখন তখন জিতুর কুশলসংবাদ লওয়া লোকের যেন বাতিকে দাঁড়াইয়া গেছে।

শরৎ হঠাৎ বলিল,—আমি সৎগোপের মেয়ে ; আমার হাতে খাচ্ছিস শুনে লোকে যদি তোকে বলে ?

রণজিৎ বলিল,—তার জবাব আমার আছে ; ব'লেই দেখুক না কেউ।—বলিয়া শান্ত-র হাত ধরিয়া সে স্নান করিতে গেল।

…স্নান করিয়া আসিয়া রণজিৎ দেখিল, একটি বছর দশকের মেয়ে আসিয়া বসিয়াছে। জিতুকে আসিতে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল ; যাইতে যাইতে বলিল,—ছি, ছি, তুমি সৎগোপর ছোঁয়া খাচ্ছো, জিতু !…আমি বলছি গিয়ে সবাইকার কাছে।

জিতু বলিল,—যা, বেরো।

মেয়েটি জিতুকে কিল দেখাইয়া চলিয়া গেল, এবং জিতু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখে যেন রক্ত নাই…মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিলে জাতের কথা গোপন করিবার প্রবৃত্তি শরতের হয় নাই…জাত গোপন করার মত কুকার্য নাকি আর নাই।

জিতু খানিক চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিল ; তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল,—মা, যে-মেয়েটি এসেছিল তার বাবা একটা বাগ্‌দীর মেয়েকে নিয়ে আজন্ম ছিল ; তারপর বাগ্‌দীটা মারা গেলে বিয়ে করে ; সেই বিয়ের মেয়ে ঐ।…তোমার কাছে এই সব গর্হিত কথাও আমাকে বলতে হচ্ছে।…তোমায় এখানে এনে ভাল করিনি, মা, ; এত কষ্ট তুমি পাবে তা বুঝতে পারিনি।

শরৎ বলিল,—তা কেউ পারে না…এখন কাপড় ছাড়, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হবে না।

কিন্তু ভিজা কাপড়ে আরো কিছুক্ষণ থাকা তার অদৃষ্টে ছিল·· মাধব রায় হাঁক দিয়া আসিয়া উঠিলেন। তিনি ঐ মেয়েটির জ্যাঠা ; বলিলেন,—মেয়েটি সৎগোপের মেয়ে শুনলাম , তুমি তার হাতে খাচ্ছো ?—বলিয়া চোখ পাকাইয়া তুলিলেন।

জিতু বলিল—খাচ্ছি।

—দৃষ্টান্ত ভাল নয় ; নিজে অধঃপাতে যাচ্ছো যাও, তাতে ক্ষেতি নেই, কিন্তু আরো দশজনকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছো।.. এর শাসন চাই, সমাজের ইষ্টের জন্যে।…তোমাকে আমরা বাধা দিতে পারি তা জানো ?

—জানি।

—তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ হবে, সে ভয় করো কি না ?

—করি বই কি, খুব করি। কিন্তু তার আগে ভয় করি ঝগড়ার·· মায়ের সুমুখে একটা জঘন্য কথা তুলে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার অন্যায় হবে।…আমি ত' সব জানি।

—একটু জানো না…প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হওয়া যায়, এবং তাই করা হয়েছিল, তা তুমি জানো না।

—আমিও না হয় না মরলে তা-ই করব।

—দু'দিনের মধ্যে করতে হবে, আর মেয়েটিকে তাড়াতে হবে…আমার ইচ্ছে তাই, আদেশ তাই।…তোমার দলেও লোক পাবে নিশ্চয়, কারণ মেয়েমানুষ ভেতরে আছে—

দ্বার অবারিত পাইয়া সতীশ মুখুজ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন :—কি গোল হচ্ছে ?… ওরে জিতু, শুনলাম, একটা স্ত্রীলোক এনেছিস !…কেমন স্বভাব, কি জাত, কি খবর কেউ কিছু জানে না, অথচ—

মাধব রায় বলিলেন,—জাত ভালই, সংগোপ···রেঁধে খাওয়াবার পূর্ণ অধিকারিনী।
সতীশ একটু উদারই ; বলিলেন,—তা হোক, যার যেমন রুচি···কিন্তু চরিত্র কেমন ? ঘর ছেড়ে এসেছে কেন ?

রণজিৎ কি করিবে ইতস্ততঃ করিতেছিল ; মাথা যেন আর ঠিক রাখা যাইতেছে না ; তবু আস্তে আস্তেই বলিল,—আমার বাড়ীতে এসে আমাকে অপমান আপনারা করবেন না···

মাধব রায় বলিলেন,—তাড়াবে না কি ? মেয়েটাকে ত' তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

—ভাবতে পারেন যে, আপনাদের আমি যেতে বলছি।···আমি দুর্বল বটে, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, এ কথাটা বলবার জোর আমার আছে। এটা আমার অন্তঃপুর।

—আচ্ছা যাচ্ছি। জানতাম না যে, বাড়ীতে স্ত্রীলোক এসে উঠলেই সেটা অন্তঃপুর ···বলিতে বলিতে মাধব রায় আঁৎকাইয়া উঠিয়া লাফাইয়া পিছাইয়া গেলেন—রণজিৎ হঠাৎ ইঁট কুড়াইয়া লইয়া হাত তুলিয়াছিল···কিন্তু ছুঁড়িতে পারিল না...শরৎ ছুটিয়া আসিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল।

হাতের ইঁট কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়া শরৎ তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—আপনারা এখন আসুন।...নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে যে ব্যবস্থা হয় করবেন। ছেলেমানুষকে অমন ক'রে শাসিয়ে আপনাদের লাভটা কি ?

রণজিতকে ইঁট তুলিতে দেখিয়া মাধব রায় শ্লেষ বাক্য গিলিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রোধ হজম করিতে পারিলেন না ; দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন . সতীশ মুনিব খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন···পথে রণজিতের বাড়ীতে মাধবের গলা শুনিয়া তামাসা দেখার লোভ সাম্‌লাইতে পারেন নাই। মাধব ক্রুর লোক ··আগে লোকের পাঁঠা চুরি করিয়া কাটিয়া খাইত, এখনও লোকের জমির আল কাটিয়া জল চুরি করে...সতীশ তাই এই ব্যাপারে পুলক অনুভব করিতেছিলেন ; কিন্তু নিজের স্বার্থ ভাবিয়া তিনি মাধবের চাইতেও রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু রণজিতের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া থাকা আর চলিল না—সতীশ বাহির হইয়া মুনিব দেখিতে গেলেন—এবং গ্রামের লোক শুনিতে পাইল, মাধব রায় চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছেন···তাঁর মুখ দিয়া যে-ভাষা বাহির হইতেছে তাহা খুব অসংস্কৃত।

সেদিনটা মাতা-পুত্রের প্রাণহীন নীরবতার মধ্যে কাটিল···উভয়ের সে বিষণ্নতা যেন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আকাশ বাতাস অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

॥ ৪ ॥

* * * * রণজিৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দাঁড়াইল,—মা, তুমি ঘর ছেড়ে কেন এসেছ বলো, ওদের আমি শুনিয়ে দিয়ে আসি।

জিতুকে জড়াইয়া যে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহারই সমাধানের উদ্দেশ্য লইয়া গ্রামস্থ মাতব্বর দশজন প্রাতঃকালে মাধব রায়ের সুশীতল আম্রবাগিচায় সম্মিলিত হইয়াছেন। জিতু অনাচার প্রচার করিতেছে...অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রীলোক আনিয়া নৈতিক

হাওয়া দূষিত করিতেছে···ইহার আশু নিবারণ দরকার...নতুবা আসন্ন কল্কি সময় পূর্ণ না হইতেই অশ্বারোহণে আসিয়া পড়িবেন।

নিমাই ঠাকুরও আহূত হইয়া উপস্থিত ছিলেন ; তিনি অক্লান্ত হস্তে গলার পৈতা মাজিয়া মাজিয়া ঘুরাইতেছিলেন···কিন্তু অকাল কল্কির আশঙ্কাটা তিনি তেমন মঞ্জুর করিলেন না ; বলিলেন,—কল্কি তরোয়াল দিয়ে গলা কাটতে এখনই আসছেন না, সে-ভয় তেমন করিনে, তবে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলার একটা বিহিত হওয়া দরকার।

শুনিয়া ফরিয়াদি হিসাবে মাধব রায় পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, জিতুকে ডাকিয়া পাঠানো হোক ...তাহার বক্তব্য শুনিয়া তবে 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি' করা যাইবে।

জিতুকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। হরিশ বলিলেন,—যথেচ্ছাচার আর গুণ্ডামিরও সীমা আছে···জিতু ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলে সে সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে...তার বিচার আগে হওয়া দরকার। তারপর স্ত্রীলোক...

—সে আসুক ; তাকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে।—বলিয়া গিরিধর শান্তিরক্ষা করিলেন।

ভূতপূর্ব দারোগা বলিলেন,—পাপের কোনো কাজই আমার অজানা নয়...দেখে শিউরে উঠতে হয় এমন পাপ অনেক দেখেছি···সেবার যখন আমি মুকুন্দপুর থানার চার্জে তখন···

নিমাই বলিলেন,—কে শুনতে চাইছে !

দারোগা থামিয়া গেলেন। জিতু আসিল—আবহাওয়ায় পেঁছিয়াই সে বুঝিল ব্যাপার জটিল ··কেহ শিকড়ের উপর বসিয়া আছেন, কেহ পায়ের খড়ম ছাড়াইয়া লইয়া তাহার উপর, কেহ গাছের ডাল ভাঙিয়া হইয়াছেন...এবং এমন করিয়া বসিয়া আছেন আর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন অর্থাৎ তাঁদের এমন সুদৃঢ় ভঙ্গী যেন ঐখানেই এবং তখনই কাজ খতম করিয়া তবে উঠিবেন।

জিতুকে দেখিয়া মাধব রায় ফাটিয়া পড়িবার পথে প্রাণান্ত কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। করাল মুখগুলির দিকে একবার চাহিয়া লইয়া জিতু জিজ্ঞাসা করিল,—আমায় ডেকেছেন কেন ?

হরিশ বলিলেন,—তোমার পিতৃগুরুকে জিজ্ঞাসা করো।

নিমাইয়ের চাহিদা বড় ; বলিলেন,—তোমার বাড়ীতে যে-স্ত্রীলোকটি এসে আছে সে ঘর ছেড়ে কেন এসেছে তা জানো ?

—জানিনে।

—সেইটে জেনে এসো।

—কি দরকার ?

—তর্ক ক'রো না। এতগুলি লোক প্রত্যেকে তোমার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ·· আগে ঐ কথাটা জেনে এসো...আমাদের আর যা জিজ্ঞাস্য আছে, পরে শুনবে।

এতগুলি লোকের মাঝে দাঁড়াইয়া জিতু হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল···পিতৃগুরুটি পর্যন্ত যেন শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন এমনি তাঁর ক্রূর ভঙ্গী···হিতার্থী অনেকে থাকিতে পারেন, কিন্তু তার বর্তমান আচরণের কৈফিয়ৎ তাহাকে দিতেই হইবে...গ্রামে বাস করিতে হইলে কৈফিয়ৎ দিয়াই বাস করিতে হইবে। যিনি মিত্র ছিলেন বা আছেন তিনিও এখনকার

সংকটে কিছুতেই তার সহায় হইবেন না, হওয়া সম্ভবই নয়। সে একেবারে একা এবং দশের মুখাপেক্ষী। একা একা যখন ইঁহারা চরিত্রের দুর্বলতা বা অনাবশ্যক কৌতূহল লইয়া আঘাত করিতেছিলেন তখন দৃঢ় হইয়া প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারাই যখন বিচারের দাবি লইয়া সমবেত হইয়াছেন তখন ইঁহাদের দাবি অমান্য করা আত্মহত্যার কাজ হইবে। বলিল,—আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

নিমাই বলিলেন,—এসো।

নিজের গৃহত্যাগের কারণটা জিতুকে বলিবে বলিয়াই শরৎ স্থির করিয়াছিল... জিতুর প্রশ্ন শুনিয়া আর আকুলতা দেখিয়া শরৎ ম্লানমুখে একটু হাসিল ; বলিল,—বলছি।

কিন্তু বলা তার হইল না—

—হরে কৃষ্ণ, ভিক্ষে দে মা।—বলিয়া ভিখারিনী ভিক্ষা মাগিয়া ঠিক সেই সময়টিতেই তাহাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ভিক্ষেটা দিয়ে আসি।—বলিয়া শরৎ ভিক্ষা লইয়া ঘরের বাহিরে পা দিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল···

—আ আমার কপাল। তুমি এখানে !...তোমায় খুঁজে খুঁজে সিষ্টির লোক সারা।—বলিয়া অলকাতিলকাধারিনী কৃষ্ণকায়া মাংসলদেহা রমা-বৈষ্ণবী যেন কেমন করিয়া হাসিতে লাগিল—সে বড় শক্ত হাসি।

শরতের মুস্কিল হইল ভারি—ভিক্ষা দিতে আসিয়া ফিরাইয়া লওয়া যায় না···ভিক্ষা লইয়া ঐ হাস্যমুখী বৈষ্ণবীর দিকে অগ্রসর হওয়া যে কত কঠিন তা কেবল সে-ই জানে, বুকে বর্শা বিঁধিয়া যে কখনো সেই বর্শার দিকেই ঠেলিয়া গেছে।

এই বৈষ্ণবী তার পরিচিতা ; তাহার হাত হইতে বহুবার এ ভিক্ষা লইয়া গেছে, তখন সে গৃহ ত্যাগ করে নাই...হঠাৎ এখন শরতের সর্বপ্রথম মনে হইল, গৃহত্যাগ করা ভাল হয় নাই। তাহার সম্বন্ধে যে মিথ্যা রটিয়াছিল এবং যাহার ভয়ে সে ঘর ছাড়িয়াছিল, এবং যে মিথ্যার অন্ত বোধ হয় এখনো দেশের লোকে পায় নাই সে মিথ্যা এ-ও শুনিয়াছে .. বৈষ্ণবীর ঐ হাসি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি গূঢ় অবিমিশ্র উল্লাস সে নয়।

একটা আকস্মিক অস্বাভাবিক দুর্বলতায় শরতের যে হাতে ভিক্ষার চাল ছিল সেই হাতটা কাঁপিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল, রণজিৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া নির্নিমেষ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।...রণজিৎ তাহার জীবনের একটি কথা শুনিবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে ; কিন্তু বৈষ্ণবীর সঙ্গে সম্ভাষণের সূত্রপাত হইতে যে কয়েকটি মুহূর্ত অতিবাহিত হইয়াছে তাহারই মধ্যে কি একটা নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়া যায় নাই !... ছেলেটি কি মনে করিতেছে !

শরৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেল ; বৈষ্ণবীর ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা দিলো ; বৈষ্ণবী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—দেশের লোকে কি যে বলছে আর কি যে না বলছে তোমার কথা, তা কি বলব ··

শরৎ বলিল,—এসো এখন।·· এবং মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রণজিৎ যেখানে বসিয়াছিল সেখানে সে নাই ; হঠাৎ তার যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল ; বৈষ্ণবী গেল কি রহিল তাহা সে চাহিয়াও দেখিল না ; সেইখান হইতেই ডাকিল,—জিতু ?

সাড়া আসিল না।

—শান্ত ?

শান্ত বলিল,—ঘরেই আছি, মা।

—তোর দাদা কই ?

—এই যে, এখানে ব'সে আছে।

শরতের বুকে ধক্ করিয়া একটা কঠিন ধাক্কা লাগিল···ছেলেটির অমন করিয়া লুকাইবার অর্থ কি !···কিন্তু এই চরম মুহূর্তে তাহাকে ডাকিয়া দু'টি কথা বলিতে শরতের সাহস হইল না। বৈষ্ণবী যেন তাহার মনের শৃঙ্খলা শক্তি ভাঙিয়া দিয়া গেছে।

বাহির হইতে ডাক আসিল,—রণজিৎ ?

জিতু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল ; যে ডাকিতেছিল সে বলিল,—এসো ; ওঁরা সব ব'সে আছেন।

জিতু বলিল,—ও-বেলা যাবো ; এ-বেলা আর সময় নেই। মা ব্যস্ত, সব কথা শোনা হয় নি।—বলিয়া কেবল মাটির দিকে চাহিয়া সে নিজেও বাহির হইয়া গেল।

॥ ৫ ॥

রমা বৈষ্ণবী শরতদের পড়শী ছিল। রমা মানুষকে বিশ্রাম দিয়া দিয়া ভিক্ষা করে··· যে গাঁয়ে একদিন আসে কুড়ি দিন সে গাঁয়ে সে আসে না। জিতুদের গ্রামে ভিক্ষা মেলে ভাল ; মানুষের বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি আছে। কিন্তু শরতকে দেখিয়া হাসিলেও সে ভয় পাইয়াছিল খুব ; তার চোর নামটা এ দেশে অজানা ; চোর নামটা ভিখারীর পক্ষে বড় ক্ষতিকর ; কাজেই সে ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রাজনন্দিনীর চেহারা রাজমহিষীর মত, যেমন স্থূল তেমুনি রাশভারি ; সামনের চুল পাতলা হইয়া আসিলেও রং তেমুনিই আছে। রমা বলে,—তোমার মেয়ের এই ভরা বয়েস, কিন্তু রং তোমারই আরো চমৎকার ; চেয়ে চেয়ে আমি দেখি আর ভাবি, এমন রং তুমি কোথায় পেলে !···বলিয়া রমা সোহাগে গলিয়া যায়।

রাজনন্দিনীর সঙ্গেই রমার খাতির বেশী, কেবল হৃদয়ের বিনিময়মূলক প্রীতিবশতঃ নহে ; রাজনন্দিনী খালি মামুলি চাল দিয়াই বিদায় করেন না, কাঁচা তরকারীও দেন ; কখন কখন ঠাঁই করিয়া বসাইয়া ব্রাহ্মণের প্রসাদও দেন। বৈষ্ণবী এত যত্নের প্রতিদানে আঁটিয়া বসিয়া দিক-বিদিকের এমন সব গল্প করে যাহাতে রাজনন্দিনী হাসিয়া বাঁচেন না···দেশ-বিদেশের লোকের ঘরের কথা শুনিতে তাঁর বড় আনন্দ···

বৈষ্ণবীর মুখে তিনি শরতের কথা আগেই খানিক শুনিয়াছিলেন···যেন গলায় উঠিয়া শিলাপিণ্ডের মত লাগিয়াছে, না উগ্‌রাইলে রক্ষা নাই, এমুনি অস্থির হইয়া রমা-বৈষ্ণবী আজ বাকিটুকু বলিবার জন্য রাজনন্দিনীর কাছে আসিয়া উঠিল।

রাজনন্দিনী বলিলেন,—আয় রমা, বোস। অনেকদিন আসিসনি যে এদিকে ? ভাল আছিস ?

—ভালই আছি, ঠাকরুণ, তোমাদের চরণাশীর্বাদে।—বলিয়া ভিক্ষার ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া রমা বসিল।

রাজনন্দিনী বলিলেন,—পান দি' ?

—না ; তোমাদের পান আমি খেতে পারিনে ; আমার সাজা আলাদা।—বলিয়া ঝুলি

হাতড়াইয়া পানের কৌটা বাহির করিয়া রমা পান মুখে দিলো। পান দিয়া রস নির্গত হইতে লাগিল…মশগুল হইয়া রমা বলিল,—আজ এক মহা নতুন খবর আছে গো, ঠাকরুণ—তোমাদের গাঁ ঘরেরই কথা।

শুনিয়া ঠাকরুণ বড় কন্যাটিকে বলিলেন,—মা, হেসেল দেখ্‌ ত', আমি শুনি কথাটা—একটু জিরুই—বিষ্টির নাম নেই বাবা, হাঁপিয়ে ম'লাম। তোদের দেশে বিষ্টি কেমন ?

—কই, মা, বিষ্টি !—বলিয়া রমা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—আকাশে এবার জল নেই—খা খা করছে।

—হ্যাঁ, নতুন খবরের কথা কি বলছিলি ?

রমা একগাল হাসিল, তারপর উঠিয়া যাইয়া দুই দাঁতের ফাঁক দিয়া নর্দমায় খানিকটা পিক ফেলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া বসিল ; বলিল,—বলি।…তারপর আসন পিঁড়ি হইয়া গুছাইয়া বসিল ; বলিল,—বলেছিলাম না একদিন আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ের কথা ! তোমার মনে আছে কি না জানিনে।

রাজনন্দিনী কপালের চামড়া জড়ো করিয়াও আদৌ মনে করিতে পারিলেন না ; বলিলেন,—মনে পড়ছে না ত' ! কার কথা বলেছিলি ?

—নাম তার শরৎ ! বিধবা হ'য়ে একটা ছেলে নিয়ে থাকত—

রাজনন্দিনীর মনে পড়িল ; বলিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি হয়েছে তার ?

—এখানে এসেছে।

—এখানে এসেছে ? কোথায় ?

—ওই বদ্যিদের বাড়ীতে ; জিতু তাকে নিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই নাকি ?—বলিয়া রাজনন্দিনী যেন কেমন করিয়া রহিলেন, যেন লাফাইয়া উঠিবেন। কিন্তু সে দেহ অত অক্লেশে মাটি ছাড়িবার নয়—খানিক কোমর খাড়া করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—শুনেছি, জিতু এনেছে একটা মেয়েকে ; মা ব'লে ডাকে—তা নিয়ে ওঁদের ভেতর—

রমা বলিল,—মা ব'লে ত' ডাকে—বলিতে বলিতে থুথু জমিয়া অসুবিধা হওয়ায় রমা আবার উঠিল।

রাজনন্দিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—বারবার পিক ফেলা তোর ! কথা শুনব থির হ'য়ে তার যো নেই—কেন খাস ওই পাতাগুলো !

রমা পিক ফেলিয়া আসিয়া বলিল,—না খেলে বাঁচিনে, মা ; কেবল হাই ওঠে।

—তারপর কি হ'ল ?

রমা এইবার গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল,—মা ব'লেই ডাকুক আর মাসী ব'লেই ডাকুক, মেয়েটি পালিয়েছে কিন্তু ভাল মানুষের মত নয়। বলব কি, মা, আমি স্বচক্ষে দেখিনি, লোকে বলে ; আর সবাই যখন বলছে তখন অপেত্যয়ই বা করি কেমন ক'রে !—একদিন মেয়ে রাস্তা অবধি ছুটে এসে লোহার ডাণ্ডায় ক'রে মেরেছিল এক তাগাড় মিন্সেকে—খুন হ'য়ে যেত, কিন্তু জুত্‌ মত ঘা বসেনি তাই রক্ষে। আসল ব্যাপার কি তা জনার্দন জানেন ; কিন্তু লোকে বলে, মেরেছিল তেড়ে এসে—ঘর থেকে মিন্সের পিছু পিছু ছুটে এসে—

রাজনন্দিনী কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন,—মাগো !

রমা বলিতে লাগিল,—যাকে মেরেছিল তার নাম মনোহর দত্ত, খুব বড় লোক সে,

ধনী লোক, মানী লোক।—মেয়েটির স্বামী কাজ করত মনোহরেরই দোকানে ; অল্প মাইনেয় থাকত বেশ বাবুয়ানী চালের ওপর—ব্যারামে তার চিকিচ্ছেও হ'ল শুনলাম, কিছু কিছু দেখলামও। যে মাইনে সে পেত তাতে তিনটে লোকের খেতে পরতেই কুলোয় না—দেখছি ত' দশজনের। অত বাবুয়ানীর টাকা সে পেত কোথায় ! চিকিচ্ছের টাকা ওরা পেলে কোথায় ! আর মনোহর আট টাকার স্থলে পনর টাকা মাইনে দিয়ে তাকে রেখেছিল কেন !

এই তিন দফা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রমা অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিয়া অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু রাজনন্দিনী বলিয়া বসিলেন,—কাকে ?

রমা বলিল,—তোমায় নিয়ে পারা ভার—ঐ মেয়েটির সোয়ামিকে গো ! কে জানে, মা, ভেতরের কথা।—বলিয়া রমা-বৈষ্ণবী কাতর হইয়া ঊর্ধ্বদিকে বোধ হয় জনার্দনের সন্ধানেই দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু জনার্দন তখন শরতের চক্ষু উপড়াইবার সাঁড়াশি প্রস্তুত করাইতেছিলেন--পাপের প্রসঙ্গে আহত বৈষ্ণবীকে তিনি দেখা দিলেন না। রমা চোখ নামাইয়া বলিল,—হরি হে, তুমিই সার।

দৈহিক চাঞ্চল্য বেশী প্রকাশ করা সম্ভব নহে বলিয়াই রাজনন্দিনী চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানের লোমহর্ষক অংশটুকু শুনিয়া বার দুই হাঁপাইয়া উঠিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন—মুখে তাঁর কথা জোয়াইল না। রমা বলিল,—তখন থেকেই—বলিয়া যে ইঙ্গিত করিল তাহা মানুষের না বুঝিবার নয়।

রাজনন্দিনী বলিলেন,—তোর কথা শুনে আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে গেছে, রমা। —তারপর, পালালে কেন ?

—লোক জানাজানি হ'য়ে গেল যে ! আর সে-ও বোধ হয় আর ঘেসলো না—মদের মুখে মনোহর বেয়াড়া কি করেছিল তা শ্রীহরিই জানেন।—বলিয়া রমা কপালে চোখ তুলিয়া ওঠে দেখিয়া রাজনন্দিনী বলিলেন,—বোস, রমা, চাট্টি খেয়ে যাবি।

—না, মা, আর একদিন খাবো।—কিছু ব'লো না কিন্তু আমার কথা, দোহাই তোমার —বড় শাপবে।···রাজনন্দিনী দাঁতে জিব কাটিয়া বলিলেন,—রাম রাম ; ক্ষেপেছিস !

কি একটা রহস্য লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে তার মায়ের একটা নিদারুণ বোঝাপড়া হইয়া গেছে, ইহা রণজিৎ বুঝিয়াছিল স্পষ্টই—কিছু অনুমান করিয়া লইতে হয় নাই। বৈষ্ণবী কি একটা সরস গোপন কথা যেন মনে মনে উপভোগ করিয়া তাহার মায়ের দিকে অতিশয় কৌতুকের চক্ষে চাহিয়া গেছে। রণজিৎ হঠাৎ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—কিন্তু একটু ভাবিতেই সন্দেহের ঘোলা কাটিয়া তার আকাশ ফর্সা হইয়া গেল। ইতর লোকের কথায় কান দেওয়াই কদর্য কাজ ; এবং সেই কথায় মনে মনে প্রশ্ন তুলিয়া মায়ের চরিত্র বিচার করিতে বসা পাপ। মায়ের মুখশ্রী তার মনে পড়িতে লাগিল—অমন মুখ আর কখনো তার চোখে পড়ে নাই ; কেবল সৌন্দর্যই তার সব নয় ; মুখাবয়বে জগদ্ধাত্রীর মাতৃরূপ বিরাজ করিতেছে—অন্তরে অনাবিল বিশুদ্ধি না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ শ্রী ফোটে না, এমন নত করে না, এমন ভক্তি জাগায় না।

রণজিতের মন উজ্জীবিত হইয়া উঠিল ; বাড়ী ঢুকিয়া সোজা মায়ের কাছে যাইয়া বলিল,—মা, ও মাগীর সঙ্গে তুমি কথা ক'ও না—ওকে আমি জানি ; ওর স্বভাব ভাল নয়।

শরৎ শান্তস্বরে বলিল,—বেশ।

সেইদিনই বেলা তখন সাড়ে চারটে—প্রাচীরের উপর একটি বায়স অবসন্ন বেলার দিকে চাহিয়া উচ্ছিষ্টমাখা দু'টি বাটির দিকে এবং অপরাপর দিকেও ত্বরিত দৃষ্টি হানিতেছিল। শরৎ শয়ন-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রণজিতের ছিটের কোটের ফাটা পিঠ সেলাই করিতেছিল। রণজিৎ মাধবনিদানম্ খুলিয়া লইয়া বসিয়া ছিল—শান্ত ছিল অন্য কাজে। এমন সময় অংগনপ্রসারী অপরাহ্নের স্তিমিত আলোক প্রফুল্লিত করিয়া আর পাদবিক্ষেপে মৃত্তিকা ঝংকৃত করিয়া কে আসিলেন ঐ?—সংগে জয়া বিজয়া প্রভৃতি!

বায়স উড়িয়া গেল। কোলের উপর হইতে ছিটের কোট আর হাত হইতে সুচ নামাইয়া শরৎ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল; রণজিৎ বই বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল; শান্ত চারা উপড়াইয়া দেখিতেছিল, শিকড় গজাইয়াছে কিনা—চারা আবার সে মাটির ভিতর গুঁজিয়া দিলো।

যিনি আসিলেন তিনি রাজনন্দিনী। দিবানিদ্রার পর সফরে বাহির হইয়া সরজমিনে ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়াছেন—সংগে ছ'সাতটি সংগিনী। রাজনন্দিনী খুব সাজিয়া আসিয়াছেন; যেখানকার যে অলংকার তাঁর ছিল সব পরিয়া আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য দরিদ্র প্রতিপক্ষকে দাবাইয়া রাখা, তাকে জব্দে রাখা। তিনি অবশ্য জানিতেন না যে, তাঁহার চেহারাই যথেষ্ট শংকাজনক; অতবড় গোলমুখ, অতবড় দুটো চোখ, অতখানি চওড়া নাক, হার্ফ্গিনির মত সিঁদুরের ফোঁটা—দেখিয়া ধড়ফড়াইয়া না ওঠে এমন গরীব খুব কমই আছে; কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না—তাই এই অলঙ্কারের ঘটা; যম দেখিয়াও যে ডরায় না, সে শত্রুর পয়সা দেখিয়া ডরায় তাহা তিনি জানেন।

শরৎ বলিল,—আসুন—

রাজনন্দিনী সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এলাম, কিন্তু বসব না; আমরা তোমার কাছে বসতে আসিনি। অল্প দুটো কথা দাঁড়িয়েই ব'লে যাবো।…মনোহর দত্তকে চেনো?

এই অতর্কিতে প্রশ্নে শরৎ মুহূর্তের জন্য একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল—তাহার নামের সংগে মনোহরের নাম বিজড়িত হইতে আগে সে শোনে নাই। শুনিয়া মাথা কেন তার মাটির দিকে নামিল তাহা কেউ জানে না; বলিল,—চিনিনে; নাম শুনেছি।

—তোমার কে সে?

—কেউ নয়।

—তোমার স্বামী তার কাছে কাজ করত?

—করতেন।

—তাকে তুমি মেরেছিলে কেন?

শরৎ একটু থামিয়া বলিল,—আপনার মুখে এ-সব কথা কেন, আর উত্তর দিতে কি আমি বাধ্য?

—বাধ্য না-ই বা হ'লে—উত্তর তুমি না দিলেও আমার শিরে সম্পাঘাত হবে না; আমরা জানি সব—সে তোমার কে ছিল, সে তোমার স্বামীকে কেন পুষত ডবল মাইনে দিয়ে, কেন তুমি ঘর ছেড়ে চ'লে এসেছ—সব জানি।

শরৎ চাহিয়া দেখিল, রণজিৎ চোখ বুজিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে; বলিল,—সব মিছে কথা শুনেছেন—বৈষ্ণবীর একটা কথাও সত্যি নয়। আমি ভদ্রঘরের ঝি বৌ—আপনাদের সংগে এই কথা নিয়ে ঝগড়া করতে আমার ঘেন্না করছে।

শুনিয়া রাজনন্দিনীর নাক শিকায় উঠিয়া গেল ; বলিলেন,—ফুস্ ! ভদ্দর ঘরের ঝি বৌ তুমি তা বোঝা গেছে—পয়সা দিতে গররাজি হয়েছিল ব'লে মানুষকে তেড়ে রাস্তায় এনে মারধোর করা ভদ্দর ঘরের ঝি বৌয়ের কাজই বটে···তোমাদের দেশের সব ভদ্দর ঘরের ঝি বৌই কি তোমার মত ! আবার আমাদের সংগে ঝগড়া করতে ঘেন্না করছে সতীলক্ষ্মীর !

বলিয়া রাজেন্দ্রাণী তাঁর পরম শত্রুর পাণ্ডুর মুখের দিকে জয়গর্বে বিস্ফারিত হইয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন ; শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া তিনি যাইবেন না।

কিন্তু শরতের কথা ফুরাইয়া গিয়াছিল। শরতের সম্মুখ হইতে ইঁহারা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিলেন। জগতের যে দিকটা আজ তাহার সমুখে কঠোর আর অপরিহার্য হইয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার অন্তরের মহিমার কাছে পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত অপরিজ্ঞাত ছিল—এখন তাহাকে জাজ্বল্যমান সম্মুখে দেখিল, কিন্তু পূর্ণ মূর্তিতে গোচরে আসিয়াও শরতের অনভ্যস্ত ধারণায় সে স্থান পাইল না। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সে দু'টি প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল—কিন্তু তার মূর্ছাহত মন অনুভব করিতে লাগিল, তার কলঙ্ক যেমন অসত্য এই কথাগুলি তেমনি অলীক—সে জাগিয়া নাই।

শরৎ পুনরায় রণজিতের দিকে চাহিল ; সব সে শুনিয়াছে জানিয়াও নিজেকে রক্ষা করিতে আর একটি কথাও সে মুখে আনিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল।

রাজনন্দিনী বলিলেন,—চল্, শীলা।—বলিয়া সংগের মেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি রাজেন্দ্রাণীর মত যেন ঐরাবতে চাপিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

## ॥ ৬ ॥

বাহিরের জগৎ আর পূর্বস্মৃতি এতদিন রণজিতের উপলব্ধির বাহিরে অচেতন হইয়া ছিল—তাহারা ধীরে ধীরে যেন হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। এই গৃহ, তার আসবাব, তার মাটি, তার অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্রতম তৃণাঙ্কুরটি পর্যন্ত যেন নবতর প্রিয়তর মূর্তিতে দেখা দিতেছিল—সে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর যেন সবে মাত্র উঠিয়া বসিয়া আলো বাতাস নূতন চক্ষে দেখিতেছিল। সহসা তার সম্বিতের উপর গুরু আঘাত পড়িয়া মনের দৃষ্টি দৃষ্টির সুখ যেন হাহাকার করিতে করিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই গৃহকে সে কেমন করিয়া ভুলিয়া ছিল, মনে পড়িতেই তার চোখ ছল্‌ছল্ করিত কিন্তু আজ তার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল ইহাই মনে করিয়া, এতবড় আঘাত গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে সে এ গৃহে কেন আসিয়াছিল !

রাজনন্দিনী যে কথাগুলি বলিয়া গেলেন, রণজিৎ তাহা বিশ্বাস করিল। গুরুগৃহের অভিজ্ঞতা তার মনে পড়িতে লাগিল···দাবানল-বেষ্টিত পশুকুলের যন্ত্রণার কথা সে বইয়ে পড়িয়াছে ; পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী আর পুরুষের হৃদয়ে যে-অগ্নি জ্বলিতেছে, বাড়বানলের চেয়ে তাহা ঢের বেশী ব্যাপক, বেশী তেজস্ক···এই আগুনের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া মানুষ নরহত্যা করে, মরিতে ছোটে, না করিতে পারে এমন পাপ নাই···নারী পুরুষ দুই-ই। সে ও পলায়ন করিয়াছিল—এ-ও পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ?

রাজনন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে শরৎ অর্ধেক স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু যে উত্তরটার উপর বিচার নির্ভর করিতেছিল, সে উত্তরটা সে দেয় নাই, ঘৃণা এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এড়াইয়া গেছে···নিজের মানসিক আর শারীরিক অনুভূতির তুল্য প্রত্যক্ষ আর কি হইতে পারে! তার নিজের সেই অনুভূতি ক্ষণিকের চমক নহে···দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রত্যেক মুহূর্তটি তাহাকে যে সত্যদান করিয়া গেছে, কেবল মুখশ্রীর পবিত্র মাধুর্য স্মরণ করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না, অস্বীকার করাও যায় না। পরম সুখের বুকভরা আবেগের পর পরম নিরাশ্বাসে রণজিতের মনে হইতে লাগিল, জীবনের শিক্ষা যে দিতে আসে, সে সুচারু মূর্তি ধারণ করিয়াই আসে, তাই মানুষকে অবিশ্বাস করাই মানুষের ধর্ম দাঁড়াইয়া গেছে।

রমা-বৈষ্ণবী পাত্র-পাত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া, যে-সব কথা বলিয়া গেছে তাহা খুবই স্পষ্ট, মিথ্যা হইতে পারে বলিয়া রণজিতের একবারও মনে হইল না···রাজনন্দিনী যে তর্ক করিয়া গেছেন তাহার ভিত্তি দুর্বল হইলে তিনি কখনই বাড়ী পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতেন না। এই অস্থিরতার মাঝে এখন তার হঠাৎ মনে পড়িল, সে দুর্বল অক্ষম কদর্য বলিয়াই বোধ হয় গুরুগৃহ হইতে লজ্জায় পলায়ন করিয়াছিল···আত্মজয় করিয়া উন্মুখতাকে ব্যাহত করিয়া আসে নাই···কিন্তু পতনের প্রবণতা যেখানে দুর্বার সেখানে যদি বাধা না থাকে তবে কি ঘটিতে পারে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার দরকার নাই।

রণজিৎ উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। শরৎ আসিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল,—জিতু? ওঠ্।

জিতু নড়িল না; শরৎ বলিল,—আমার কথা শুনছিলে?

জিতু তেমনি পড়িয়া রহিল; শরৎ বলিতে লাগিল,—তোর কাছে আর আমার লজ্জা নেই; সব কথাই বলব। তুই আমার শান্তর বড়, তোর মাথা ছুঁয়ে বলছি, যা শুনেছিস সব মিথ্যে···উঠে আমার দিকে চেয়ে বোস, নইলে আমি বলতে পারছিনে।

বলিতে বলিতে শরতের চোখ জ্বালা করিয়া লাল হইয়া উঠিল; এবং রণজিৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।...

শরৎ মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মৃত্যু মানুষের সকল ইন্দ্রিয় ভাঙিয়া আনিয়া ইহার চেয়ে বেশী শুষ্ক অবশ পাণ্ডুর করিতে পারে না। এই ছেলেটিকে সত্যই সে শান্তর উপরে স্থান দিয়াছিল···সুরু হইতেই এই ছেলেটির যে অগাধ শ্রদ্ধা সে পাইয়াছে কেবল তাহাই জননীর আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের মত মাথা পাতিয়া সে গ্রহণ করিয়াছে···শ্রদ্ধা বিনামূল্যে লাভ হয় না; মা বলিয়া ডাক দিয়া অন্তরের কি অমৃত সম্পদের সন্ধান সে পাইয়াছিল তাহা কেবল সে-ই জানে···ভাবিয়া শরৎ শিহরিয়া উঠিল।

আত্মঘাতীর কাজ হইতেছে জানিয়াও সে, তাহারই সম্ভ্রম বাঁচাইতে মানুষের শত্রুতা বরণ করিয়াছে···কিন্তু কলঙ্কের কথা সে বিশ্বাস করিয়াছে·· শরতের মনে হইতে লাগিল, যে সম্পদ দেখিয়া সে শ্রদ্ধা দান করিয়াছিল, সে সম্পদ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেছে··· তার এই রিক্ততা ছেলের চোখে কি দুঃসহ বীভৎস আকারে দেখা দিয়াছে তাহা কল্পনাতেও আসে না।

শরতের বুক হিম হইয়া উঠিতে লাগিল···

শান্ত আসিয়া বলিল,—মা, ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার দাও।

শরতের কানে সে-কথা গেল না। তার উদ্‌ভ্রান্ত মনে এই চিন্তার উদয় হইতেছিল,

কথাটা পরলোকেরও কানে গেছে ; পৃথিবীর প্রতিধ্বনি সেখানে পৌঁছিয়া কি ক্লেশ বিক্ষোভ আর আর্তনাদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শরৎ নিজের বুকে অনুভব করিতে লাগিল।

যে ছেলে মা বলিয়া ডাকিয়া এমন করিয়া সাড়া দিয়াছে আর সাড়া তুলিয়াছে সে সম্মুখে থাকিয়া অন্তরের বার্তা জানিতে পারিল না, ধারণাতীত কোন্ শূন্যে বসিয়া তাঁহারা কি তাহা জানিতে পারিয়াছেন! শরতের মনে হইল, পান নাই…সে যে কলঙ্কিনী নহে, কোনো পরীক্ষা মানিয়া লইয়া তাহা প্রমাণ করিবার কথাও তার মনে হইল না…ছেলের কানে তার কলঙ্কের কথা গেছে, কেবল এই চিন্তায় থাকিয়া থাকিয়া তার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

॥ ৭ ॥

…অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎ উঠিল ; বলিল,—শান্ত, তোর দাদাকে ডাক্।

'দাদা' বলিয়া ডাক দিতে দিতে শান্ত সদর দরজার বাহিরে যাইয়াই বলিয়া উঠিল,—মা, দাদা এখানে ব'সে কাঁদছে।

শরৎ বলিল,—ডেকে আন্ ; খেয়ে আমায় ছুটি দিক।

শান্ত রণজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল…শরৎ ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাইয়া বেড়াইতেছিল ; দাঁড়াইয়া বলিল,—গুড়-মুড়ি খেয়ে এ রাতটা কাটাও, বাবা।

রাঁধিয়া রণজিতের সম্মুখে ভাত দিবার কথা শরৎ ভাবিতেই পারিতেছিল না।

শান্ত ও রণজিৎ খাইয়া শুইতে গেল ; মাতা-পুত্রে একটি কথাও হইল না।

রণজিৎ স্বপ্ন দেখিল, সে শরতের মণ্ডলগ্রামে গিয়াছিল…সেখানকার সবাই একবাক্যে বলিয়াছে যে অমন সতী ছিলেন কেবল সীতা, তারপর ত্রিযুগে আর কেউ দেখা দেন নাই—শুনিয়া সে ফিরিতেছিল ; পথে দারোগার গরুটি তাহাকে গুঁতাইয়া গাছে তুলিয়া দিয়াছে…সে নামিতে পারিতেছে না…

* * * * প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে নিমু মোড়ল 'বাবারে মারে' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া ধড়ফড় করিতে করিতে পুকুরের ঘাট ছাড়িয়া, ছুট্ দিলো·· তার হাতের গাড়ু আর মুখের দাঁতন ছিট্‌কাইয়া একটা পড়িল জলে আর একটা পড়িল জঙ্গলে। নিমু বাগানে উঠিয়া চেঁচাইতে লাগিল,—কার সর্বনাশ হ'ল রে…কে আছো কোথায় শীগ্‌গির এসো…কার সর্বনাশ হয়েছে দেখে যাও…

শুনিয়া লোকে ঘুম ভাঙিয়া কাপড় গামছা সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল, এবং পুকুর-ঘাটে অকস্মাৎ এমন কলরব উঠিল যে পাখীদের আনন্দ-কাকলি বন্ধ হইয়া গেল…

ব্যাপার সামান্যই, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতেছিল। প্রভাতের প্রথম আলোকে উজ্জ্বল জলাশয়ে অচঞ্চল ভাসমান দেহটির দিকে চাহিয়া মাধব রায় বলিলেন,—জিতুর নতুন মা।

# নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ

## ।। এক ।।

কচি শিশুটি দিবারাত্র অবিরাম মুষ্টি বাঁধিয়াই রাখে। মুষ্টির ভিতর কিছুই থাকে না, স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই না—তবু মনে হয়, পৃথিবীর জীবনের আকাশময় আর আশ্বাসময় নির্যাসটুকু, সে যেন ঐ মুষ্টির ভিতর লুক্কায়িত রাখিয়াছে। শশধরের যখন শশধর নাম হয় নাই, আর, মুষ্টি বাঁধিয়া ঘুমাইত কেবল, তখন তার ঠাকুমা কৈবল্য-দায়িনীর ঐ রকম মনে হইত। শিশুর মুষ্টির ভিতর কিছুই নাই—ধন-রত্ন কি স্বর্গ-মোক্ষ কি কোনো অবদান কি উপঢৌকন লইয়া সে আসে নাই, তবু ঠাকুমা মনে করেন, যা কাম্য সবই আছে উহার ভিতর—দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। দিনের কয়েকবারই কৈবল্য ছেলেটির মুষ্টি খুলিয়া দেখেন—রক্ত টক্‌টক্‌ করিতেছে—দেখিয়া তাঁর করুণা জন্মে···ছল্‌ছল্‌ প্রাণে তিনি মুষ্টিটি চুম্বন করেন। শিশুর নিমীলিত চক্ষু, আর বুকের ভিতর যে জীবনধারা চলে, বাহিরে তার নৃত্যপরায়ণ ঢেউগুলি—ইহা দেখিয়াও ঠাকুমার মনে হয়, রথে রাম দর্শন ঘটিতেছে—এই মূর্তির উপভোগ্যতার শেষ নাই।

কৈবল্য-দায়িনী অপরিসীম লালসা ভরে পৌত্রটিকে মানুষ করিবার ভার লইলেন—তাঁর শুচিজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, এবং শশধরের গর্ভধারিণীকে যেন স্তন্য দিবার পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন···ছেলের সম্পর্কে মায়ের আর কোনো কাজ রহিল না।

বৃদ্ধ বয়সে যখন পরকাল খুব নিকটবর্তী মনে হয় তখন ইহকালে সদ্যঃ আগত শিশুকে স্পর্শ দিয়া আবৃত করিয়া রাখিতে খুব বেশী পরিমাণে লোলুপতা জন্মে কি না কে জানে। শিশু উষ্ণ কোমল ; বৃদ্ধ শীতল কর্কশ, শিশুর গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধের গায়ে সংক্রামিত হইয়া আরাম ও আনন্দ জাগায় বোধ হয়—বৃদ্ধ নিজেকে সঞ্জীবিত মনে করে।···সবার উপর, সুদের প্রতি মমতা—নাতি নাকি সুদ ; তার একবিন্দু রক্তের সংগে সংসারের সমগ্র সত্তা জড়াইয়া আছে।

অন্নপ্রাশনে তুমুল ঘটা করিয়া ঠাকুমাই শশধরের নাম রাখিলেন শশধর।

এই শশধরই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ।

## ।। দুই ।।

কতদিনের আয়ু লইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাহা যখন অনুমান করা যায় না, তেমনি অনুমান করা যায় না যে, এই জাতক উত্তরকালে ভীরু হইবে কি বীর হইবে, মূর্খ হইবে কি বিদ্বান হইবে, দরিদ্র হইবে কি ধনী হইবে। ভবিষ্যৎটা সমগ্রভাবে অন্তরালে থাকায়, এবং কোনো দিকে ছিদ্র নাই বলিয়া তার ছায়া সম্মুখে না আসায়, অসন্তোষজনক এই অসুবিধাটা ঘটে। তবু যদি বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ গঠনের এবং ভাগ্য ব্যবস্থাপনের ক্ষমতা, দৈব ব্যতীত, মানুষের হাতেও খানিকটা আছে তবে ভুল বলা হইবে না।···প্রহ্লাদের হরিপরায়ণতা একেবারে সহজাত—দৈত্যকুলকে তিনি সহজ প্রবৃত্তির

দ্বারাই উল্টাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু চর্চার দ্বারা এবং শিক্ষা সদুপদেশের সাহায্যে মানুষ ধর্মজগতে উল্লেখযোগ্য আসন পাইয়াছে, এ-দৃষ্টান্তও আছে। সজ্ঞান যে নিয়ন্ত্রণ তারই মূল্য অধিক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেইটাই দুর্লভ। পক্ষান্তরে সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিবার বেলায় অজ্ঞানতার দ্বারা যে নিয়ন্ত্রণ ঘটে তাহাই সুলভ, তারও প্রভাব চিরস্থায়ী এবং সতেজভাবে কার্যকর।

মানুষ করিবার কায়দার দোষে কত ছেলের মাথা-খাওয়া গেছে তার ইয়ত্তাই নাই— যাদের গেছে শশধর তাদেরই একজন।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিল—আনন্দ করো, আপত্তি নাই ; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, শুভক্ষণে করিল কি অশুভক্ষণে করিল, তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা দৃষ্টে তার বিচার করা ভুল ; জীবন-কথা আলোচনার পর তার বিচার হওয়াই উচিত—কারণ, জীবনে শুভাশুভ কেবল জন্মক্ষণের উপর নির্ভর করে না—মানুষের হাত তাতে থাকে।

ছেলে হইল সুন্দর—ঠাকুমা তার নাম রাখিলেন শশধর অর্থাৎ ছেলে দেখিয়া তার কান্তির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ জুড়াইয়াছে।...স্নেহের প্লাবনে পড়িয়া তিনি ওলট্‌পালট্‌ খাইতে লাগিলেন—ছেলেকে তার মায়ের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাকে মানুষ করিবার ভার লইলেন ভারি তৃপ্তি আর আগ্রহের সংগে। শশধর নামটা পুরাতন আমল বলিয়া মনে হইলেও কেহ প্রকাশ্যে আপত্তি করিল না—ছেলের ঠাকুমার হাতে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেও কেহ আপত্তি করিল না।

শিশু শশধর খানিক সজ্ঞানতা লাভ করিয়াছে। এখন সে একেবারে অনড় নয়—হাত-পা ছুঁড়িয়া বিছানার উপর সে চমৎকার ভংগীতে আর ভারী চঞ্চল অবয়বে খল্‌বল্‌ করে। তাহার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে সোলার রঙিন খাঁচা একটি তার দৃষ্টির সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ··সেটা সত্যই আনন্দপ্রদ হইয়া তার চোখে পড়ে কি না তা কেউ জানে না। কিন্তু ইহা একেবারে অকাট্য নিঃসন্দেহ ব্যাপার যে, ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাইয়া সে হাসে···হাসি দেখিয়া ঠাকুমা চমৎকৃত হইয়া যান, এবং যত হন চমৎকৃত, তার দ্বিগুণ হন বিগলিত ; তাঁর মনে হয়, তাঁহাকে সে চিনিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ তাঁর সংগে মধুর সম্পর্কটা আর নাড়ীর টান শিশু হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছে—তার দৃষ্টিতে আর হাসিতে পরিচয়ের আনন্দ প্রাঞ্জল হইয়াই দেখা দেয়। তা হইবে না কেন! রক্তের টান ও-র রক্তেই আছে—তাহাই সে অবিকশিত চেতনার ভিতরেই অনুভব করে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগে কোথায় তা যেমন ধরা যায় না, কিন্তু শুনা যায় যে, জাগিয়া সাড়া দিলো—এ-ও ঠিক তেম্‌নি···

ঠাকুমা চট করিয়া যাইয়া ব্যাপারটা শশধরের মা-কে জানাইয়া আসেন। শশধরের মা তিলোত্তমারও তাতে সন্দেহ থাকে না—সম্পর্ক টের পাইবে না, এ-ও কখনো হয়!... শশধরের বাবা শ্রীধরও তাহা শুনিয়া অবাক হন—পৃথিবীর সর্বত্রই কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার ঘটিতেছে, দৃষ্টির অগোচরে, মনের ও জ্ঞানেরও অগোচরে ঘটিতেছে ; সেই রকমই সূক্ষ্ম একটা বিষয় ইহা হইতেও পারে!

এই উল্লসিত আবহাওয়ার ভিতর ঠাকুমার হাতে আমাদের এই শশধরের গঠন-কার্য সুরু হইল—এবং তাঁহার সহায় হইলেন দৈব। ঠাকুমা হাত বাড়াইয়াই গঠন-কার্যে হাত দিলেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শুভ কার্য তিনি কিছু করিতে পারিলেন না—সে প্রতিভা তাঁর

নাই—তিনি তার বরং অনিষ্ট করিলেন। কৈফিয়ৎ চাহিলে ঠাকুমা হয়তো কাঁদিয়া ফেলিবেন ; হয়তো বাঁশের খুঁটিতে কপাল ঠুকিয়া রক্তাক্ত হইবেন, এবং বলিবেন, এ-কথাও আমায় শুনতে হ'লো !...কিন্তু অবুঝ সাজিয়া ঐ সব কাণ্ড কেলেঙ্কারি করিলেই যদি ক্ষমা পাওয়া যাইত তবে ফৌজদারি কার্যবিধি আইন বহু পূর্বেই বাতিল হইয়া যাইত, পাপীকে নরকের ভয় দেখানো হইয়া উঠিত হাস্যকর এবং যে-ব্যক্তি মানুষের মন ভাঙিয়া দেয় তারই বাড়িত মান।

সে যা-ই হোক, সে পরের কথা ; এখনকার কথা এই যে, শশধর বড় হইতেছে··· সে কোলে চাপে ঠাকুমার, কাছে শোয় ঠাকুমার, গল্প শোনে ঠাকুমার মুখে, আব্দার করে ঠাকুমার কাছে, মা বাপের ধমক খাইয়া সে চোখের জল মুছিতে আসে ঠাকুমার অঞ্চলে···

ঠাকুমা শিখাইয়া দিলেন—শশধর মাকে বলিল দুদু-মা, ঠাকুমাকে বলিল দিদি। ইহাতে ক্ষতির কারণ কিছু নাই—ঠাকুমার মুখের কথা শশধরের সব চাইতে বিশ্বাস্য, আর সব চাইতে মিষ্ট আর স্পষ্ট মনে হইবে ইহাতেও ক্ষতির কারণ কিছু নাই—হউক ; বিস্মিত হইবারও কিছু নাই।

কিন্তু ক্ষতির কারণ দেখা দিলো খুবই নির্দোষ আকারে—ঠাকুমার হাসি-মাখা মুখের কথায় ··

শশধর বড় চঞ্চল—তিন বছর বয়সেই সে দুরন্তের একশেষ। ঠাকুমা তাহাতে খল্‌খল্‌ করিয়া হাসেন...খুব আজগুবি আর আনন্দপ্রদ মনে হয়, তিনি ঐ উপলক্ষেই বারকতক পাড়া বেড়াইয়া আসেন · কখনো তাকে ধমক দেন ; কখনো হাত ধরিয়া তুলিয়া আছাড় দিবার ভয় দেখান ; বলেন, একেবারে মেরে ফেললে হয়রান করে ! কোথাকার বাঁদর তুই !

শশধর বলে, তোমার ঘরের।

সে যা-ই হোক, শশধরকে কোলের কাছে চুপটি করিয়া বসাইয়া রাখিতেই ঠাকুমাকে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয়, কিন্তু তা না রাখিলেই নয়। শশধরকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখা একাধিক কারণে তাঁর দরকার—তাঁর তা ভাল লাগে ; মনে হয়, যতক্ষণ যতটা নিবিড়ভাবে কাছে সে থাকে ততক্ষণই স্পর্শ সুখ, তত চরম করিয়া তাকে পাওয়া হয়·· আর একটা কারণ তাকে আবদ্ধ রাখা ; কারণ, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর দৃষ্টির বাহিরেই নাকি যাবতীয় শত্রু বিচরণ করে।

শশধরকে কোলের কাছে বসাইয়া রাখার একটি নির্বিশেষ উপায় আছে—সেটি হইতেছে মজার মজার গল্প শুনানো। অসীম স্নেহভরে শশধরের গায়ের ধূলা মুছিয়া দিয়া তিনি তাকে কোলের ভিতর টানিয়া রাখেন, আর, গল্প বলেন—বেশীর ভাগ সন্ধ্যাবেলাতেই সেটা তিনি করেন ; কারণ আসন্ন সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেই অকল্যাণের কেমন একটা ছম্‌ছম্‌ ভয়ের ভাব আছে—আর তাঁর মত, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর বাহিরে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ানো অত্যন্ত বেল্লিকের কাজ।

ঠাকুমা বলেন, সন্ধ্যেবেলায় কোথাও বেড়িও না, ভাই ! জানো না তাই ছুটে যাও। ·· ভূত-প্রেতগুলো ঠিক তখনই সব গাছ থেকে আকাশ থেকে মাটিতে নামে—ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের শরীরে ঢুকতে চায়—একটু অসাবধান এদিক ওদিক হ'লেই ঢুকে পড়ে। তাকেই ত' বলে ভূতে ধরা।

ইহা তাঁর ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, তাঁর মনেরই কথা এবং খাঁটি বিশ্বাস বলিয়াই ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির যন্ত্রণা ও নির্লজ্জ আচরণ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া তিনি শিহরিতে থাকেন।

…একটি বৌকে শ্বশুরের ভূতে পাইয়াছিল। সেই অবস্থায় স্বামীকে পুত্র সম্ভাষণ করিয়া বৌ-টি যেসব কথা উচ্চারণ কীর্তি-কলাপ করিয়াছিল তাহা যেমন অশ্রাব্য তেমনি করুণ।…সে ঘটনাটাও ঠাকুমার মনে পড়ে।

শশধর জিজ্ঞাসা করে, ভূতে ধরলে কি হয়?

—ভারি কষ্ট পায়। ভূতে তাকে আছড়ায়, যা তা খাওয়ায়, রাত্রে ঘুমুতে দেয় না; এমন কি পুকুরে নিয়ে ডুবিয়েও মারে।

ঠাকুমা জানেন, পুকুরে—ডুবে মরা একটি লোকের ভূত তার জীবিতকালের এক প্রতিবেশীকে আশ্রয় করিয়াছিল—তাকে জলে লইয়া ফেলিয়াছিল, ডুবাইয়া রাখিয়াছিল এবং না মরা পর্যন্ত ছাড়ে নাই। শশধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, ভূত কারা হয়?

—যাদের গতি হয় না তারাই ভূত হয়। দোষের সময় যারা মরে তাদের গতি হয় না—ভূত হ'য়ে গাছে-গাছে বেড়ায়।

শুনিয়া শশধর আড়ষ্ট হইয়া যায়; ভাবে, দোষের সময় যেন না মরি।…জিজ্ঞাসা করে, ভূত দেখেছ কখনো?

শুনিয়া ঠাকুমা ভাবেন, এ জন্মে ত' দেখি নাই। কিন্তু দেখি নাই বলিলেই দুরন্ত ছেলে দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে এবং কি অনিষ্ট ঘটাইয়া বসিবে তার ঠিক নাই…বলেন, দেখেছি বৈ কি।

—কোথায়?

-এখানেই।

—কেমন দেখতে?

—কদাকার।

বলিয়া এক কথায়, মাত্র কদাকার শব্দটি ব্যবহার করিয়া, তিনি ভূতের রূপ-বর্ণনা অপ্রচুর ভাবে শেষ করেন না—আরো বাড়ান…ভূতের অংগ-প্রত্যংগের রূপের পরিচয় তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেন…তার চুলের, মাথার, চোখের, নাকের, কানের, দাঁতের, হাতের এবং আঙুলের আর নখের যে বেপরোয়া বর্ণনা তিনি দেন, মানুষের চেহারার সংগে তার খুবই গরমিল, তা খুবই ভয়াবহ, আর তার প্রতিবাদ নাই।…আরও সংকট এই যে, ঠাকুমা শশধরকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিলো, ভূতগণ সংখ্যায় অগণিত, এবং তারা পৃথক পৃথক আকারে বৃক্ষে এবং শূন্যে বিন্যস্ত থাকিলেও তাদের সাধারণ ধর্ম, নাকি-সুরে কথা বলা আর অনিষ্ট প্রবণতা, একই রকম। শশধর জিজ্ঞাসা করে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ।…তবে শোন একটা গল্প।—বলিয়া সুরু করিয়া ঠাকুমা জানিতে চায়, ভয় পাবে না ত'?

ভয়ে চোখ বুজিয়া শশধর বলে, না।

—তবে শোন। একবার এক ঠাকুর যাচ্ছিল বনের ধার দিয়ে ভিন গাঁয়ে তার জামাইয়ের বাড়ী।…মাঠে মাঠে পথ ত'। কিন্তু মাঠের ঠিক মাঝখানে আসতেই তার সন্দেহ লাগল। তেপান্তর মাঠ—চারিদিক শূন্য। ওকে পশ্চিমে মেঘ লেগে গুর গুর ক'রে ডাকতে লাগল ঘন ঘন! বামুন ত' ভয়ে অস্থির। সে আবার শুনেছে, এই মাঠে ভূতের উপদ্রব আছে।…তবু সে যাচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি, আর মনে মনে রাম-নাম জপ করছে…

শশধর জানিতে চাহিল, রাম-নাম জপ করলে কি হয়?

—ভূত এগ্বতে পারে না।

—তারপর ?

—তারপর খানিক বাদেই ঠাকুর দেখতে পেলে, সে যেদিকে যাচ্ছে, সেই দিকেই আর একটা লোক যাচ্ছে, সামনে সামনে। ঠাকুরের তখন সাহস হ'ল যে, একটা সাথী পাওয়া গেল। কিন্তু সাথী ত' সে নয়—যাদের ভয় ঠাকুর করছিল তাদেরই সে একটি !

—ভূত ?

—সন্ধ্যেবেলা নাম করতে নেই।···হ্যাঁ, তাদেরই একটি। গাছ থেকে নেমে এসেছে।

—তারপর ?

—তারপর, ঠাকুর ত' তা জানে না—সে ডাকল, ওগো কে যাচ্ছো, দাঁড়াও ; এক-সঙ্গে যাই গল্প করতে করতে···কিন্তু সে তা শ্বনবে কেন ? তার মৎলব খারাপ।

—কার ?

—সেই ইয়ের।

—তারপর ?

—তারপর, যাচ্ছেই, যাচ্ছেই, দ্ব'জনাই যাচ্ছে—ঠাকুর যতই ছোটে, সামনের লোকটার নাগাল আর সে পায় না।···ততক্ষণে সন্ধ্যে আরো ঘোর হ'য়ে এসেছে।···যেতে যেতে হঠাৎ ঠাকুর দেখল, সামনের লোকটার পা দ্বটো মাটির সঙ্গে ঠেকে নাই—মাটির আধ হাত উপর দিয়ে সে যেন ভেসে চলেছে—পা উঠছে না, নামছে না।···তখন ঠাকুর ব্বঝতে পারল, ও ত' মান্বষ নয়, কোনো অপদেবতা হবে।

—তারপর ?

—তারপর আর কি হবে—ঠাকুর দাঁড়িয়ে প'ড়ে ঠিরঠির ক'রে কাঁপতে লাগল—অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আর কি !···এমন সময় তার মনে প'ড়ে গেল গাইত্রীটা। ব্বড়ো আঙ্বলে পৈতে জড়িয়ে সে চেঁচিয়ে গাইত্রী বলতে লাগল···ওটা তখন তফাৎ থেকে নাকিস্বরে বললে, যাঁ, বেঁচে গেঁলি এঁবার। ব'লে প্রকাণ্ড হ'য়ে যেন মিলিয়ে গেল।

শশধর বলে, বাবা।...তারপর জিজ্ঞাসা করে, আমাদের পৈতে নেই, ঠা-মা ?

—না, ভাই ; আমরা যে কায়েৎ !

শ্বনিয়া শশধর দিশেহারা হয়—পৈতার অভাবে অন্বর্প অবস্থায় সে নিস্তার পাইবে না, ইহাই ভাবিয়া তার ব্বক কাঁপে।...জিজ্ঞাসা করে, গাইত্রী মনে না পড়লে ভূত কি করত ?

—ঘাড় মট্‌কে তাজা রক্ত খেত বামুনের।

প্রবহমান রক্তের ধারা কল্পনা করিয়া ক্ষুদ্র বালক শশধরের আতঙ্কের অন্ত থাকে না ···গায়ত্রীটা শিখিয়া রাখিবার এবং সন্ধ্যার সময় বাহিরে আসিবে না সংকল্প করে।··· জিজ্ঞাসা করে, শেয়াল কেন ডাকে, ঠা-মা ?

ঠাকুমা বলেন, মড়া খায় আর ডাকে। সেই মড়াগ্বলোই ত' ভু—ইয়ে হয় ; বিজন বনে আর শ্মশানে থাকে তারা।

শ্বনিয়া শশধরের কল্পনার দ্বষ্টি খ্বলিয়া যায় ; দেখে, শ্বগালে ম্বতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, আর তাহারই প্রেতাত্মা ব্বক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে।...ঠাকুমার কোলের ভিতর প্রাণপণে মাথা গ্বঁজিয়া দিয়া শশধর ত্রিভুবন অন্ধকার এবং বীভৎস দেখে।···স্নায়্ব তার যে সজীবতা লাভ করে দিনের ক্রীড়ায়, আনন্দ কলরবে,

সন্ধ্যার সময় ঠাকুমা তা নির্জীব শিথিল পীড়িত করিয়া দেন অমানুষিক গল্প বলিয়া, ত্রাসের আঘাতে আঘাতে অস্বাভাবিকভাবে জর্জরিত করিয়া।

যদি মনে করা যায়, ঠাকুমার ঐ একটি গল্পই সম্বল, আর তিনি ঐ একটি গল্পই বারংবার বলেন তবে ভুল হইবে। তিনি বহুস্থান দর্শন করিয়াছেন, বহুলোকের সংগে আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত না হইলেও প্রকাণ্ড নিশ্চয়ই। এই প্রকাণ্ড ভাণ্ডার হইতে তিনি গল্প-রস পরিবেশন করেন—ক্লান্ত তিনি হন না। ঠাকুমা একবার কাশীধামে গিয়াছিলেন—সেখানে সসংগী তিনি দৈবাৎ যাইয়া উঠিয়াছিলেন যে-বাড়ীতে সেই—

ঠাকুমার কাছে সন্ধ্যার সময় বসিলেই শশধরের মনে ভূতের কথাটাই সর্বাগ্রবর্তী হইয়া উপস্থিত থাকে, ক্ষুধার সময় খাদ্যের প্রতি লোভের মত ; সে চম্‌কিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে, ভূত ছিল ?

—উঁহুঁ। সেই বাড়ী থেকে সাত-আটটা বাড়ী তফাতের একটা বাড়ীতে। ভারি উপদ্রব করত।...বলিয়া উপদ্রবের প্রসার পরিমাণ তিনি বাড়াইয়া বাড়াইয়া বলেন—বাড়াইয়া বলার কৃতিত্বের পুলক তাঁর উপরি লাভ।

শশধর কান পাতিয়া তা শোনে...ভয়ে শেষ হইয়া যায়, শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যেন, তবু কষ্টের ভিতরেই কেমন একটা আনন্দে সে উৎসুক হইয়া থাকে।

ঠাকুমা বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন—সেখানকার ব্যাপার আরো অদ্ভুত। বৃন্দাবনে যত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেহই বৃক্ষ নহে—বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া পদ-স্খলিত বৈষ্ণবগণ বিদ্যমান...দিনে তাঁরা বৃক্ষ, কিন্তু গভীর রাত্রে তাঁরা মানব কলেবর ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, অবগাহন স্নান করেন ; তর্ক-বিতর্ক, সাধুদর্শন, শাস্ত্রালোচনা করেন ; এমন কি পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁরা হরিনামে মাতোয়ারা হন, এবং কীর্তন ও নৃত্য করেন...কিন্তু ঊষার প্রাক্কালেই তাঁরা যে বৃক্ষ সেই বৃক্ষ-রজে ধূসরিত হইয়া নিজের নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন ! শশধর জিজ্ঞাসা করে, আমাদের কাউকে যদি তারা তখন দেখে ত' কি করবে ?

—মেরে ফেলবে, কিম্বা যে দেখবে সেই ম'রে যাবে তৎক্ষণাৎ।

বৈষ্ণবগণের প্রেতাত্মারও এই হত্যা-প্রবৃত্তি দেখিয়া ভৌতিক সেই সাংঘাতিক রহস্যে শশধর আরো ঘাব্‌ড়াইয়া যায়—নিস্তার নাই কোনোদিকেই—ওরা সবাই সমান, মারিয়া ফেলিতে ভারি রাজি !

শশধর ঠাকুমার কোলের কাছে শুইয়া রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে গুম্‌রাইয়া কাঁদিয়া ওঠে...তখনই চুপ করিয়া যায়...ঠাকুমা তা টের পান, কোলের ভিতর শশধরকে আরো খানিক টানিয়া লন, কিন্তু তার কাঁদিয়া উঠিবার কারণটা কি তা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না। শশধর স্বপ্নে ভূত দেখে।

## ।। তিন ।।

শশধর আরো খানিক বড় হইয়াছে।

শ্রীধর একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, তোমার নাতিকে এইবার কিছুটা কোল ছাড়া করতে হবে।

—কেন ?—কৈবল্যদায়িনী চমকিয়া উঠিলেন।

—ইস্কুলে পাঠাব মনে করেছি। ঠাকুরমশায় দিন দেখে দিয়েছেন—পরশু ভাল দিন আছে।

বছর দেড়েক আগে যথারীতি হাতে খড়ি দিয়া সরস্বতী পূজার দিন হইতে শশধরের বিদ্যার্জনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিদ্যাদায়িনীর পৃথিবীব্যাপী জ্যোতিঃ পরিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে বলিয়া চন্দনের ফোঁটা কপালে লইয়া সে পা বাড়াইয়াছিল। তারপর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শ্রীধরের অক্লান্ত সাহায্যে অত্যন্ত মন্থর গতিতে উত্তীর্ণ হইয়া এখন সে পাঠশালায় যাইবার উপযুক্ত হইয়া আছে…

কৈবল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে পড়া শেষ হলো ?

—হলো ঠিক নয়, আরো কিছুদিন চলতে পারে। কিন্তু ইস্কুলে যাওয়ার অভ্যাসটা এখন থেকেই করাতে হবে।…তারপর হাসিয়া বলিলেন, তুমি এ-কাজটা পারলে বেশ হ'ত, নয়, মা ?

কৈবল্যও হাসিলেন ; বলিলেন, আমরা খালি গরু ঘেঁটে মানুষ করতে পারি—আমরা কি ওই সব পারি !…তা দেও, লেখাপড়া শিখবে বই কি।

ঠাকুমা শশধরকে কয়েক ঘণ্টা ছাড়িয়া থাকিতে নির্বিবাদে সম্মত হইলেন। জানি বলিয়া কি পারি বলিয়া যখন তখন অপর যে-কোনো কাজের কথায় লাফাইয়া উঠা যাইতে পারে, বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব ; কেবল এই কাজের বেলায় তা অত সহজে পারা যায় না—অনেকেই তা পারে না। ঠাকুমা ত' তা পারেনই না ; কিন্তু ছেলের হিত তিনি প্রাণপণেই চান।…নাতিকে অতবড় করিয়া তুলিয়াছেন—এখন সে তাঁরই হাতে সেবা-যত্ন আদর-কদর পাইতে পাইতে কৃতবিদ্য হোক। অদর্শনের কষ্ট আর দুর্ঘটনার আশঙ্কা সহ্য করিতেই হইবে।

ঠাকুমা-ই তাহাকে স্নান করান, আহার করান, জামা-কাপড়ে সাজান, চুল পরিপাটি করিয়া দেন, হাতে বই তুলিয়া দেন, ঝিয়ের সঙ্গে শশধর পাঠশালায় রওনা হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া যাইয়া তাকাইয়া থাকেন, ওরা ঠিক মত যাইতেছে কি না ; এবং মাঝে মাঝে গরু ঘোড়া গাড়ী কুকুর প্রভৃতি বিপজ্জনক জীবজন্তু বস্তু সম্বন্ধে এমন ভয় দেখাইয়া দেন যে, শশধর কিছুক্ষণ কাবু হইয়া থাকে…দুরন্ত শিশুকে কেমন করিয়া চালিত করিয়া লইয়া নিরাপদে পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিতে হয়, সে-বিষয়ে ঠাকুমার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ঝি মনে মনে প্রায়ই ধৈর্য হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু পরম সুখের কথা এই যে, শশধর নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে করিতে যাতায়াতে পরিপক্ক হইয়া উঠিল…তারপর পাঠশালা ছাড়িয়া সে গেল হাই ইস্কুলে…

এবং সেখানে পড়িবার সময় ঘটিল আর এক কাণ্ড।

## ॥ চার ॥

মা সরস্বতীর সেবা শশধর কিরূপ নিষ্ঠার সহিত আর আনন্দনীয়ভাবে সম্পন্ন করিতেছে তাহা গোপন রাখাই ভাল—সে-ব্যাপার ভাল নয়। যতবার প্রোমোশন পাইয়াছে তার একবারও সর্বাঙ্গসুন্দররূপে, অর্থাৎ সব বিষয়েই পাশ করিয়া, সে পায় নাই।

শশধর এখন বেশ বড় হইয়াছে, তের বছরের ; কিন্তু ভূতের ভয় তার যায় নাই। ⋯ আকাশ যখন দিনান্তে অন্ধ হইয়া আসে আর মৃত্তিকাসংলগ্ন বহুদূরবর্তী দিগন্ত-বৃত্ত কুণ্ডনে আবিল হইয়া যেন ক্রমাগত তাহারই শরীরের দিকে ঝুঁকিয়া আসিতে থাকে তখন শশধর নির্জন মাঠে ময়দানে একা তিষ্ঠিতে পারে না—তার গা ঘেঁষিয়া ভূতের আগমন যেন সর্বান্তঃকরণে সে অনুভব করে—দেখা দেয় নাই, কিন্তু দিতে উদ্যত।⋯শশধর তাড়াতাড়ি পালায়, মানুষের সঙ্গ ধরে, আর তখন মনে মনে হাসে⋯রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দূরে শৃগাল ডাকিতেছে শুনিলে তার অত্যন্ত ভয় করে। বুক ছাঁৎ করিয়া তার মনে পড়ে, শৃগাল মৃতের মাংস ভক্ষণ করে ; দূরে উচ্চকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি করিয়া তাহারা তা-ই করিতেছে—তাহারা মৃতের সন্ধান পাইয়াছে।

দুঃখের বিষয় ইহা নিশ্চয়ই যে, ঠাকুমা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি যা রাখিয়া গেছেন তা শশধরের পক্ষে অত্যাজ্য স্নেহের স্মৃতি আর গল্পগুলি ; তাঁর গল্প বলা সার্থক হইয়াছে। ঐ গেল এক রকম। অবশ্য জগতের এবং সন্দেহের ব্যাপার ওটা, যদিও শত্রু। কিন্তু মানুষের দেহ আর প্রাণ লক্ষ্য করিয়া মর্মান্তিক কত আয়ুধ যে হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টির ঠিক উপর দিয়া প্রতিনিয়ত ছুটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রেলের গাড়ী সেই জ্বলন্ত হিংস্র বস্তুর একটি —অত্যন্ত বেগবান যেন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতে চায়। এই গাড়ী সময়-বিশেষে বিশেষ করিয়া অনিবার্য হইয়া ওঠে, এবং তাহার নীচেয় চাপা পড়িলে সন্দেহই থাকে না যে মরিলাম। এই গাড়ী কী বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করিতে পারে, ভূতের ভয়গ্রস্ত শশধর একদিন তা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল⋯

ইস্কুলের ছুটির পর দল বাঁধিয়া শশধর বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় ছেলেদের কানে জনরব পেঁাছিল যে, রেলের গাড়ীর নীচেয় পড়িয়া একটি লোকের পা কাটা গেছে—ষ্টেশনের ধারেই।⋯বহু লোক সেই দৃশ্য দেখিয়া কলরবপূর্বক আলোচনা করিতে করিতে ফিরিতেছে, এবং সবাই বলিতেছে, লোকটা বোকা এবং গ্রাম্য ; নতুবা গাড়ী ধরিবার ব্যগ্রতায় চলন্ত গাড়ীরই সম্মুখে যাইয়া অমন করিয়া রেলের উপর সে উঠিবে কেন ?

দৌড়াইয়া যাইয়া দেখিবার মত আর কৌতুকপ্রদ দৃশ্য সেটা যে নয়, ছেলেমানুষ শশধরের তা আদৌ মনে হইল না ⋯সেই দৃশ্য দেখিবার আগ্রহ সে দমন করিতে পারিল না, দেখার ভবিষ্যৎ ফলাফলও অনুমান করিতে পারিল না, ভয়ও পাইল না ; আরো পাঁচটি ছেলের সঙ্গে এবং তাহাদেরই মত উৎসাহের সহিত ছুটিয়া ছুটিয়া সে ঘটনাস্থলে পেঁাছিয়া গেল⋯

আগেই দেখিল জনতা —গাড়ীতে-পা-কাটা একটি লোককে দেখিতে এত লোক কেন আসিয়াছে তাহা সঠিক অনুমান করা শক্ত, কিন্তু আসিয়াছে, এবং সেই হতভাগ্যকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া গেছে⋯যা দেখিতে দাঁড়াইয়া তারা আছে তা সুখেরও নয়, অদ্ভুতও নয়—অনুকম্পার টানে তারা আসে নাই, সাহায্য করিতেও আসে নাই, কিন্তু আসিয়াছে, এবং নানা কথার অবতারণা করিয়া হাসাহাসিও করিতেছে⋯

এই জনতা ভেদ করিয়া যাইয়া শশধর সেই বিচ্ছিন্ন-অবয়ব লোকটিকে দেখিল…ছিন্ন স্থানের সম্মুখ দিয়া রেলের লাইনের এদিকে ওদিকে কত যে রক্ত পড়িয়াছে আর মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া বহিয়া গেছে তাহার অবধি নাই ; পা-খানা হাঁটুর নীচে দু টুকরা হইয়া গেছে—টুকরা পা-টা সমগ্র দেহ হইতে দূরে পড়িয়া আছে—বিচ্ছিন্ন স্থানটায় রক্ত টক্‌টক্‌ করিতেছে —খানিকটা মাংস ঝুলিয়া আছে…

আরো অনেক জিনিষ এবং ব্যাপার শশধর সেখানে দেখিল এবং অনেক কিছুই শুনিল —যথা আহত ব্যক্তির আর্তনাদ, তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন, রেলকর্মচারীদের ব্যস্ত আনাগোনা, এবং খাটিয়া ইত্যাদি—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মনে তার ছাপ রহিয়া গেল আর কিছুই নয়—সেই রক্তের নয়, আর্তনাদের নয়, ছিন্ন পা-খানার নয়, এই সবের হেতু একখানা চলন্ত শব্দায়মান গাড়ীর…

ফিরিবার পথে তার ভয় করিতে লাগিল গাড়ীর কথা ভাবিয়া। গাড়ী তখন সেখানে নাই, কিন্তু তার একটি কাজ চোখে দেখা গেল।…শশধরের মন কল্পনা করিয়াই আতুর হইয়া উঠিল।…ভয়ংকর অতএব তার কাছ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে বলিয়া যত জিনিষের ছাপ দুরপনেয় হইয়া তাহার মনে ছিল, চলন্ত গাড়ীর ছাপ হইল তাহাদেরই একটি।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল, সে দু'টি লাইনের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে—গাড়ী তুমুল শব্দ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তার পা উঠিতেছে না—পলায়ন করিতে সে পারিতেছে না…

ঘুম ভাঙিয়া গেল—বুকের ধড়ফড়ানি তখন তার কত। বুকের উপর হাত রাখিয়া শশধর তার হৃদ্‌পিণ্ডের প্রাণান্তকর উত্তেজনা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইল।

তারপর হইতে কাহারো সংগেই গাড়ীতে কোথাও যাইবার দরকার হইলে শশধর ষ্টেশনে যাইয়া অত্যন্ত একান্তে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ; গাড়ীর গুরু-গুরু গর্জন যত নিকটবর্তী হইতে থাকে তত সে পা গুটাইয়া, যেন লোহ-পথের আকর্ষণ কাটাইবার চেষ্টায়, পিছু হটিতে থাকে—একেবারে বেড়ায় পা ঠেকিয়া অচল না হওয়া পর্যন্ত… তারপর গাড়ীর চাকার শব্দ একেবারে নিঃশেষ হইয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে ওঠে, আর মনে মনে হাসে।

কিন্তু উহাই শেষ নহে—এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িলে একদা একটা সংকটজনক পরিস্থিতি অতটা চরমে উঠিতে পারিত না। চিরকাল মনে থাকার মত নিদারুণ বিভীষিকাময় ঘটনা শশধর আরো দেখিয়াছে।

ভূত যদি থাকেই তবে তাহাকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিলে ভয় পাইবারই কথা—কারণ সে পরিচিত পৃথিবীর কেউ নয় ; পরচিত্ত যতটা অন্ধকার তার চাইতেও অন্ধকার অন্ধকারচারী ভূতের মন, অর্থাৎ ভূতের মনে কী থাকে, তারা কি ভাবিয়া আর কি উদ্দেশ্যে কি করে, তাহা অনুমান করিবার উপায়ই নাই—মানুষের বুদ্ধি অতটা দূরে পৌঁছায় না ; তার উপর, ভূতের অনিষ্ট করিবার কতটা শক্তি এবং ইচ্ছা তাহা জানা নাই ; অদৃশ্য থাকিয়াই প্রেতাত্মা যখন চিম্‌টি কাটে এবং গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হয় তখন পলায়ন না করিয়া শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহাকে কাবু করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কেহ বলে নাই…প্রধান সাক্ষী ঠাকুমা তা চিরকালই অস্বীকার করিয়া গেছেন… সুতরাং ভয় পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তা-ই বলিয়া যেখানে অন্ধকার সেখানেই ভূত

আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এমন আশঙ্কা করা অযৌক্তিক, এবং নিজেদেরই অন্ধকার ঘরের দিকে সেই কারণে তাকাইতে না পারা ভারি যন্ত্রণার আর দুশ্চিকিৎস্য হতাশার ব্যাপার।...কিন্তু ঠাকুমার জয় হউক—তিনি বালক শশধরের মন উত্তমরূপে ঠাসিয়া ঠাসিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেছেন—সেখানে যে-ভয় প্রবেশ করিতেছে সেই ভয়ই আর দূর হইতেছে না, রসস্থ স্থান পাইয়া চিরজীবী শিকড় চালাইয়া দিতেছে।

## ॥ পাঁচ ॥

সেদিন রবিবার, ছুটির দিন। কিন্তু মায়ের শাসনে শশধর রবিবারেও কিছুক্ষণের জন্য বই লইয়া বসিয়াছিল...তারপর সে বাহির হইল বাজার-বেড়াইতে—উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, খানিকটা চারিদিকে তাকাইয়া আসা, আর কোনো সংগী-স্যাঙাতের সাক্ষাৎ পাইলে একটু গল্প-গুজব সলা-পরামর্শ করা—

কিন্তু ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইবার কিম্বা কোনো সংগী-স্যাঙাতের সাক্ষাৎ পাইবার পূর্বেই সে যাইয়া পড়িল এক হাংগামার সম্মুখে। দু'টি লোক ঝগড়া বাধাইয়াছে। পা-কাটা মানুষ দেখিবার লোকের অভাব হয় নাই, ঝগড়া দেখিবার লোকের অভাব হওয়াই অনুচিত ; কারণ পথের পথিকের মন আর বাজারের লোকেরও মন একঘেয়েমিতে পীড়িত হইয়া একটু আমোদের আর চিরপরিচিত সংস্থানের ব্যতিক্রম দেখিবার জন্য লোলুপ হইয়াই থাকে।...এই ঝগড়া দর্শকগণের পক্ষে আরো সুখকর এই জন্য যে, ঝগড়া হইতেছে বাংলায় নয়, হিন্দিতে—আর, হিন্দুস্থানীদের ঝগড়ার ভংগীই অন্য রকম। ভাষা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারায় মনে হয়, ঝগড়া ওরা করিতেছে না, গল্পের বিষয়ের গুরুত্বে উত্তেজিত হইয়া বুঝি গল্পই করিতেছে—আর ভংগী দেখিয়া মনে হয়, ওরা যেন পরস্পরকে হাসাইতে চায়।

নানারূপ চীৎকার এবং কুৎসিত গালিগালাজের পর ক্রমশঃ পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া একজন আর একজনের উপর চাপিয়া পড়িয়া উহারা সুরু করিল মুখের কথার সংগে ঘোরতর হাতাহাতি...এখনকার বিকট মুখভংগী আর কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া কৃতসংকল্প হস্তচালনা দেখিয়া দর্শকের হাসি একটু ক্ষীণ হইল—খুনের ইচ্ছা যেন উভয়ের মনেই জাগিয়াছে। শশধর একটু ফাঁকায় যাইয়া দাঁড়াইল—অবগত হইল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট আঠার আনা পয়সা পাইবে—এবং দেখিল, ঝটাপটি করিতে করিতে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের একজন আর একজনকে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া দৌড়াইয়া গেল ; মনে হইল, সে পলায়ন করিল বুঝি ! কিন্তু পলায়ন সে করে নাই, কাপুরুষ সে নয় ; তখনই সে তেমনি দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিল, শূন্য হস্তে নয়, সুদীর্ঘ এক বাঁশের লাঠি লইয়া এবং তাহারই সাহায্যে ঝগড়া শেষ করিয়া দিলো তৎক্ষণাৎ—কেহ সাহসপূর্বক বাধা দিবার পূর্বেই প্রতিপক্ষের মাথায় সে বসাইয়া দিলো সেই পাকা লাঠির এক ঘা—মাথা ফাটিয়া ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল, রাস্তার ধূলার উপরেই আহত ব্যক্তি লুটাইয়া পড়িল...

এত কলরব এক মুহূর্তে থামিয়া গেল—রক্তপাত দেখিয়া জনতা হাল্কা হইতে লাগিল ...শশধর দেখিল, রক্তে ধূলো ভিজিয়া কালো হইয়া যাইতেছে...দরদী লোকে যখন তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলো, তখন, দেখিতে দেখিতেই, বেগবান রক্তে তাহার শরীর আর

পরিহিত বস্ত্র ভাসিয়া গেছে—মুখ-চোখ বহিয়া রক্তধারা পড়িয়া আর সর্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া আর রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া লোকটার যে-চেহারা হইয়াছে তাহা বীভৎস এবং রোমাঞ্চকর। অনেকের মতই শশধরও কাঁপিতে কাঁপিতে সে-স্থান ত্যাগ করিল…তাহার চোখে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু মনে তাহা ঘটিল না—চিরজীবনের স্থায়িত্ব লইয়া তাহার মনে বিঁধ হইয়া রহিল উদ্দাম কলহ নয়, রক্তের সেই প্লাবন নয়, রক্তাক্ত কলেবর সেই মানুষটি নয়, রক্তপাতের হেতুটা, বাঁশের লম্বা লাঠিটা—ভারি মজবুত তার চেহারা, আর শূন্যে উঠিয়া চক্ষের পলকে সে মাথায় পড়িয়াছে !

কাহারো হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি দেখিলে শশধরের প্রাণে তীব্র আতঙ্ক জাগে।

শশধরের বয়স এখন ষোল। সে পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে ঢের, এবং তার ভয় বিস্তর।

ঐ সব ঘটনা বহু আগেকার ; কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য, ভাবিতেও আশ্চর্য, এখনো, এই ষোল বছর বয়সেও, তার জাগ্রত চৈতন্যেই ভয়গুলি আছে—দুঃসহ কঠিন অনিবার্য হইয়া তারা আছে। এখনও সে স্বপ্নে দেখে লাঠি—কাহারো হাতে নাই, তবু রক্তপিপাসু হইয়া আস্ফালন করিতেছে। আর দেখে চলন্ত গাড়ী—পর্বতের মত বৃহদাকার, আর অসহনীয় তার বেগ—কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিতে চায়…এবং আরো দেখে ভূতের খেলা—ভূত অন্ধকারে নানারূপ উপদ্রব করিতেছে—স্বপ্নে তাহারা তাহাকে আক্রমণও করে—পলাইতে যাইয়া সে অসাড় পা টানিয়া তুলিতে পারে না, ভয়ে মরো মরো হইয়া ওঠে।

তবে একটু রেহাই এই যে, ভয়ের এই নিদারুণ অস্তিত্ব আর উৎপাত কেবল তার নিজেরই মনের আধারস্থ বিষয়, আর অনুভূতি আর বিকার ; ভয়ের উদ্বেগ এবং আলোড়ন ভারি কণ্টকর হইলেও এমন কি ঘামাইয়া অবশ করিয়া তুলিলেও, খুব গোপনে আছে—আর কেউ তা টের পায় নাই—ক্লাস পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ ফেল করার মত তা প্রকাশ্য-ভাবে গর্হিত হইয়া ওঠে নাই। উপরন্তু, পরম সুখের বিষয় ইহা নিশ্চয়ই যে, শশধরের এত ভয়, স্বপ্নে এবং জাগরণে মর্মগত তার এত ভয়, তার মনটাকে দুর্বল করিয়া রাখিলেও, তার শরীরের কোনো অনিষ্ট করে নাই ; তার দেহের বেশ শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে—বিনা চেষ্টাতেই হইয়াছে। শশধরের বাবা শ্রীধর শক্তিমান পুরুষ, আকারে মস্ত—তিনি নিজের দেহের প্রতিরূপ পুত্রে দেখেন, এবং দেখিয়া খুশি হন ; অপরাপর লোকেও দেখে, এবং দেখিয়া খুশি হয় যে, কমনীয় কিশোর শশধরের শরীর-গঠন অতিশয় সুশ্রী—শক্তির ব্যঞ্জনা তার দেহে আছে ; দেহ চমৎকার ঋজু, জড়তা বিন্দুমাত্র নাই—বক্ষের প্রসার আর পেশীর তরঙ্গলীলা উপভোগ্য বটে।

তবু সেটা মোটামুটি ব্যাপার—অসাধারণত্ব আরোপ করিবার মত তা নয়। কিন্তু চর্চার দ্বারা শারীরিক দৃঢ়তায় এবং শক্তিতে অসাধারণ হইয়া উঠিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা একদিন তার জন্মিল ষোল বছর বয়সেই।…সেটাও একটা তামাসার ব্যাপার।

## ॥ সাত ॥

শশধরের বাবা শ্রীধর পি, ডব্লু, ডি-র সুপারভাইজার। তিনি বেতন কত পান, কন্যাদায়ে বিব্রত কি না, স্ত্রীকে স্বর্ণালঙ্কার কত টাকার দিয়াছেন, দেশের দিকে কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় জানাইবার দরকার নাই। বিহার-উড়িষ্যায় তাঁর চাকরী, এবং তিনি বদলী হইয়া সম্বলপুরে আসিয়াছেন, সপরিবারেই আসিয়াছেন। শশধরও আসিয়াছে। শুষ্কবক্ষ মহানদীর তীরে ক্ষুদ্র এবং পরিচ্ছন্ন এই সহরটিকে একনজর দেখিয়াই শশধর পছন্দ করিয়া ফেলিল···স্ত্রীলোকগুলির কাপড় পরার ধরণ আর গায়ে হলুদ মাখার ঘটা দেখিয়া অবাক হইল, এবং অধিবাসীদের কথা শুনিয়া একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। নূতন স্থানে শশধর বেড়ায় খুব।

নূতন বাড়ী তৈরী এবং পুরাতন বাড়ী মেরামৎ এবং নূতন রাস্তা তৈরী এবং ভাঙা রাস্তা মেরামৎ করানোই শ্রীধরের প্রধান কাজ—ঠিকাদারের কাজ সুপারভাইজ করেন। সাক্ষাৎ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এই একটা বাড়ীর অসম্পূর্ণ নির্মাণকার্য দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া এখন শেষ হইয়াছে—পাহাড়ের উপর অনেক উঁচুতে সেই বাড়ীটায় এক সাহেব অফিস করিবেন। শেষ হইয়াছে, এখন বাড়ীর আঙিনা আর আশপাশ আবর্জনামুক্ত করিয়া দিলেই এবং ইঁট পাথর প্রভৃতি সরাইয়া দিলেই স্থানটি পরিপাটী এবং সাহেবের ব্যবহার্য হয়।···শ্রীধর সেই উদ্দেশ্যে কুলি-মজুর লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—শশধর তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। ইট পাটকেল বাঁশ তক্তা ঝুড়ি ঝাঁকা টিন ভাঁড় প্রভৃতি ছোটখাট হালকা বস্তুগুলি অক্লেশেই এবং দ্রুতগতি দূরীকৃত হইল—বাকি রহিল পাথর একখানা—প্রকাণ্ড একখানা নিরেট পাথর। এই পাথরটা সরাইয়া সাহেবের চোখে না পড়ে এমন দূরে একটা স্থানে লইতে বিশেষ বন্দোবস্তের এবং কৌশলের প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীধর অনুমান করিলেন। ব্যাপারটা শ্রমসাধ্যও বটে, সময়ও লইবে অনেক।

শ্রীধর পাথরটার উপর পা তুলিয়া দিয়া তাঁর মেটের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এটাকে কি ক'রে সরাই বল্ ত?

বাবু পরামর্শ চাহিতেই বাবু তাহাকেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করিয়াছেন ভাবিয়া পুলকিত মেট্ তৎক্ষণাৎ পাথরটার চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিল—যেন কোন্ দিক হইতে ফুৎকার দিলে ইহাকে অনায়াসে স্থানচ্যুত করা যাইতে পারে, ছিদ্র দেখিয়া সর্বাগ্রে তাহাই নির্ণয় করা দরকার···দেখিয়া আসিয়া মেট্ বলিল, বাগানো কঠিন কিছু নয়, বাবু; জন তিনেক কুলিতে ধরাধরি ক'রে নিয়ে তফাতে ফেলতে পারবে।

—পারবে?

—তা পারবে, বাবু। ভাত খায় না ওরা?

ভাত খাইলেই পাথর নড়ানো যায় শ্রীধর ইহা বিশ্বাস করিলেন কি না কে জানে; জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু পাথর তুলে ধ'রে নীচেয় হাত ঢোকাবে কেমন ক'রে?

মেট্ বলিল, বাঁশ লাগিয়ে চাড় দিতে হবে।

শুনিয়া শ্রীধর কিছু শান্তি বোধ করিলেন—কাজটা তত কঠিন তবে নয়! স্ফূর্তি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, একলা এই পাথরটাকে মাটি ছাড়িয়ে তুলতে কি পাশ ফিরিয়ে দিতে পারিস কেউ?

শুনিয়া শশধর চোখ বড় করিয়া বাপের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল···

কিন্তু শ্রীধর জানেন, কেহ তাহা পারিবে না ; তবু অকারণেই ঐ প্রশ্ন করিয়া তিনি হঠাৎ উদ্‌গ্রীব শ্রমিকমণ্ডলীর মুখের দিকে সকৌতুক হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন··· সুন্দর বৈকালটিতে ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া একটু আনন্দ করা যাক—

একটা তামাসার উদ্ভব হইতেছে মনে করিয়া বাবুর দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিল···এবং "দেখি ত!" বলিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল শ্রীধরেরই জনৈক শ্রমিক, মহীন্দ্র !···বলা বাহুল্য যে, দৈহিক শক্তির জন্য মহীন্দ্র বিদেশে না হোক, এ অঞ্চলে বিখ্যাত, কিন্তু খ্যাতি তার যতই ব্যাপক হোক তা সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত, এবং তার পক্ষপাতী আপনার জনের দ্বারা তাহা প্রচারিত—এতটা শক্তি সে ধারণ করে তাহা তার বন্ধুরা আর পক্ষপাতী গোঁড়ারাও মনে করে না। এই পাথর মহীন্দ্র তুলিবে ! আচ্ছা, দেখা যাক।

লোকে দেখিতে লাগিল—বাব্‌রি চুলে প্রচণ্ড একটা ঝাড়া দিয়া মহীন্দ্র নিঃশব্দে সেই পাথরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া নতচক্ষে পাথরটাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সে যেন পাথরটার ওজন আন্দাজ করিতে লাগিল

সকলের সংগে শশধর তার বক্ষ আর বাহুর দিকে তাকাইয়া রহিল···সহস্রবার দেখা সেই বক্ষের প্রশস্ততা আর বাহুর দৈর্ঘ্যের দিকে তাকাইয়া, এই দুরূহ পরীক্ষার সময়ে তার কর্মসংগীরা হঠাৎ যেন অবাক হইয়া গেল—মনে হইল, পারিবে। শ্রীধর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুলতে পারবিনে ?

মহীন্দ্র বলিল, তুলতে ?

কিন্তু বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাহার এই অন্যমনস্ক প্রশ্ন বাবু বা কাহারো উদ্দেশ্যে নয়—কেবল দুঃখদায়ক একটা সংশয়ের অভিব্যক্তি সেটা। শ্রীধর বলিলেন, যাই করো, বাপু, সাবধান—যেন জখম হ'ও না।

শশধর দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—এই কুলিটার দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যে অভিমানী আভিজাত্যের পারিপাট্যসহ একটা অপরূপ শক্তিশালী দর্প যেন আছে। চমৎকৃত হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে শশধরের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল —যেন লোকটার পৌরুষ আর শক্তির দীপ্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত তাহার শরীরে সত্তায় প্রবেশ করিতেছে···

জখম হইবার বিরুদ্ধে শ্রীধরের সতর্ক-বাণী মহীন্দ্র বিশেষ কানে তুলিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। মনঃসংযোগ করিয়া আর দু'হাঁটু পাতিয়া সে পাথরের সম্মুখে বসিল··· শশধরের মনে পড়িল, পাঠ্যপুস্তকে একটা বাঘের ছবি সে দেখিয়াছিল—ছবির বাঘটা মৃত শিকার সম্মুখে করিয়া ঠিক যেন ঐরকম করিয়া বসিয়া আছে। শশধর তার হাত দু'খানা বুকের উপর শৃংখলিত করিল—অন্যান্য দর্শকের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—

শ্রীধর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মহীন্দ্র কোমর শক্ত করিয়া আর নুয়াইয়া পাথরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল···তার ঘোর কালো আর রোমাবৃত সুবৃহৎ হাত দু'খানা দ্রুত-বেগে প্রসারিত হইয়া পাথরের দুইপ্রান্ত যেখানে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে সেখানে পেঁৗছিল—নখ দিয়া কুড়িয়া খানিক মাটি সরাইয়া পাথরের নীচেয় সে অংগুলি প্রবেশ করাইল—তারপর তার বুক আর পিঠ মাত্র দু'টি মুহূর্তে থরথর করিয়াই দৃঢ় হইয়া রহিল···তার পৃষ্ঠের আর পঞ্জরের মাংসপেশীগুলি সহসা স্ফীত আর কঠিন হইয়া উঠিল···তারপর সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া পাথরটাকে উর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করিতে

লাগিল...দর্শকেরা দেখিল মহেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়াছে, চোখের তারা সিন্দুর হইয়া আছে...তারপর সে যেন কোটিপ্রদেশেই দেহের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়াই অত্যন্ত ধীরে ধীরে সমগ্র শরীরটাকে উপরের দিকে তুলিতে লাগিল···সঙ্গে সঙ্গে পাথর শূন্যে উঠিল, আগে একপ্রান্ত কাৎ হইয়া তারপর উভয় প্রান্তই পর্যায়ক্রমে, তারপর মাত্র একটি নিমেষের জন্য সমগ্র পাথরটা সিকি ইঞ্চি পরিমাণ শূন্যে করিয়া দোল খাইল···ঐ পর্যন্তই—

তারপরই সে-হাত টানিয়া লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—পাথর আবার মাটিতে স্থিতি-লাভ করিল ; তখন মহীন্দ্রের নিশ্বাস পড়িতেছে অতিশয় দ্রুত—কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে...ঘাম মুছিয়া মহীন্দ্র দমের প্রবল টানের ভিতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, বেজায় ভারি। পারলাম না।

কিন্তু সে যাহা পারিয়াছে তাহাই ঢের, আর আশাতীত এবং তার মুখের কথা, বিষণ্ণ হতাশার কথা, কারুরই কানে পৌঁছিল না ; যেটুকু সে পারিয়াছে সেইটুকু পারার ক্ষমতারই ক্ষিপ্ত জয়ধ্বনিতে তার মুখের শব্দ ভাসিয়া গেল—শশধর আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। শ্রীধর বলিলেন, বহুত আচ্ছা।

কিন্তু আরো, এমন কি তার চতুর্গুণ কি তারো বেশী বিস্মিত হওয়ার আর উল্লাসের কারণ ঘটিল তারপরে। মাথায় প্রকাণ্ড মুরেঠা বাঁধা, গায়ে কুর্তা আঁটা, আর বেজায় মোটা সুতার খাটো একখানা কাপড় পরা একটা লোক আসিয়া যে দাঁড়াইয়া ছিল—মহীন্দ্রের প্রস্তরোত্তলন সে দেখিয়াছে, এবং সে কি, তা কেউ জানে না। এই অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি আরো খানিক তুলতে পারি বোধ হয়। দেখব ?

বলিয়াই, অর্থাৎ প্রার্থিত অনুমতি কেহ দিবার পূর্বেই, সে মুরেঠা খুলিয়া ফেলিয়া কুর্তার বাঁধন খুলিতে সুরু করিল···তামাসা আরো চমকপ্রদ হইয়া উঠিতেছে—শ্রীধরের শ্রমশিল্পীগণ উচ্চকণ্ঠে কলরব করিয়া উঠিল : হাঁ, হাঁ...

অর্থাৎ এই সংগত সাধু প্রস্তাবে তাহারা আপত্তি করিবে কি, বিস্তর খুশীই হইয়াছে। শ্রীধরও আপত্তির কারণ দেখিলেন না, কিন্তু বলিলেন, পারো ভালই, কিন্তু বখশিস আমি দিতে পারব না।

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীধর চিরকাল খর-দৃষ্টিসম্পন্ন।

লোকটি পুনরায় কথা কহিল—অত্যন্ত ধীরকণ্ঠ সে। বলিল যে, বলবত্তার প্রতি-যোগিতা ইহা নহে, একটি তুচ্ছ ক্রীড়ামাত্র ; এবং পুরস্কার লইয়া লাভবান হইবার আশা সে করে না। বলিয়াই যেন ঈষৎ টলিতে-টলিতে যাইয়া সে পাথরটার কাছে দাঁড়াইল···

তার খানিক পরেই দর্শকবৃন্দের মনে হইল, পাথরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, তার সর্বাঙ্গ শিথিল করিয়া, আর হাত দু'খানা অত্যন্ত নিস্তেজভাবে ঝুলাইয়া দিয়া লোকটা যেন ধ্যানস্থ হইয়া গেছে—সে যেন দৈবদেয় একটা উজ্জীবনের প্রতীক্ষা করিতেছে···

চুল দাড়ি গোঁফ পরিষ্কাররূপে ক্ষৌরি করা ; ইহারই দরুণ বোধ হয় শ্রীধরের হিন্দু ভাবাপন্ন শ্রমিকগণের মনে হইল, এ ব্যক্তি ঈশ্বর-ভক্ত এবং তাঁর অনুগৃহীত ; তদুপরি, সহসা এমন ধ্যানমগ্ন হইয়া যাওয়া যার-তার কাজ নয়।...চেহারা আছে ভাল—মহীন্দ্রের চাইতে অধিকতর সুসমঞ্জস এবং শক্তির ব্যঞ্জক ; মহীন্দ্রের গায়ে মাংস বেশী, তাকে ঢলঢলে দেখায়, এ-ব্যক্তির হাড় মোটা—হঠাৎ মনে হয়, হাতুড়ি পিষিয়া ইহাকে প্রস্তুত করা

হইয়াছে—ভিতরে বায়ু নাই, একেবারে নিরেট। মহীন্দ্রের কটি স্থূল, ইহার সরু, পশুরাজের মত···

কিন্তু এই সব আকার-গত বিশিষ্টতা তারিফ করিবার সময় বেশী পাওয়া গেল না··· অদ্ভুত অভাবনীয় ব্যাপার তারিফ করা শেষ করিবার পূর্বেই ঘটিয়া গেল ; এরা আগে কখনও তা দেখে নাই, দেখিবার পূর্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। দেখা গেল, তার সর্বশরীর ক্রমশঃ যেন বিস্তৃত বৃহত্তর হইতেছে...কুম্ভকযোগে হনুমান তাঁর দেহ আকাশ-ব্যাপী করিতেন শুনা গেছে—এ যেন প্রায় তা—ই।···তারপর যেন কেবল তারই অভ্যস্ত যোগবলেই তার পদতলের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে একটা তেজের প্রবাহ উত্থিত হইয়া তার পদতল হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল···তাহাই ঘটিয়াছে, নতুবা ভিতর হইতে যেন একটা আলোক নির্গত হইয়া তার সকল শরীর এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কেন !

হঠাৎ তার ধ্যান ভাঙিয়া গেল—সে প্রস্তুত। একবার অগ্রসর হইয়াই সে নত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ, চোখের পলক না পড়িতেই সকলে দেখিল, পাথরটাকে সে মাটির উপর হইতে শূন্যে টানিয়া তুলিয়া হাঁটুর কাছে ধরিয়া আছে এমন অক্লেশে আর সহজ ভংগীতে যেন পাথরেরই ভিতর ফাঁপা বুদ্বুদ সেটা।

কি করিয়া কি ঘটিল কিছুই মাথায় ঢুকিল না ; সবটাই শক্তির সংগে এই ক্ষিপ্রতা, যেন ভেল্‌কি—লোকের তাক্‌ লাগিয়া গেল। সকলে নিঃশব্দ হইয়া রহিল—কেবল মুরুব্বি হিসেবে শ্রীধর বলিলেন, বাঃ ! কিন্তু আরো আছে...

লোকে ভাবিতেছিল, এইবার সে পাথরটাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাতেই মহীন্দ্রের উপর জয়ী হইয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা সে করিল না, ছাড়িল না—অক্লেশেই সে পাথরটাকে আরো একটু উঁচুতে তুলিল···শশধরের মনে হইল, পেশী-সঞ্চালন দেখিতে আশ্চর্য, চমৎকার বটে, কিন্তু যেন অশরীরী একটা ভৌতিক ব্যাপারের মত তা বুদ্ধির অগম্য—কি তাদের ঠেলিয়া তুলিতেছে, টানিয়া নামাইতেছে, আবর্তিত করিতেছে, আর অশ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে তাহার কিছুই ঠিক নাই...

বাঁ পা পিছাইয়া লোকটি ডান পায়ের জানুগ্রন্থি একটু মুড়িয়া লইল—বাঁ হাঁটু মাটিতে চাপিয়া বসাইল—ততক্ষণে সেই প্রস্তর দুলিয়া দুলিয়া আরো উঠিতেছে—তারপর হঠাৎ থামিয়া লোকটা কাঁপিতে লাগিল, যেন ভাঙিয়া পড়িবে ; কিন্তু তা নয়—পরক্ষণেই দেখা গেল, কনুই পর্যন্ত পাথরের নীচেয় লইয়া পাথরখানাকে সে প্রসারিত হাতের উপর ধারণ করিয়া আছে।

বিস্ময়ে শ্রীধর প্রভৃতির ভূত-ভবিষ্যৎ ভুল হইয়া গেল। কিন্তু ইহাও শেষ নহে—ইহার পরও আরো আছে ··মানুষের চোখ ঠিক্‌রাইয়া উঠিয়া দেখিতে লাগিল : সমান্তরালে অবস্থিত নিরালম্ব দুইখানি বাহুর উপর পাথর টাল খাইতেছিল—টাল খাওয়া সে থামাইল ; পাথরটাকে হাতের উপর সুস্থিত কয়িয়া লইয়া তারপর সে অটল দেহে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল...

তামাসা স্বপ্নাতীত অসম্ভব চরমে উঠিল এখন—বিস্ময় আর অহেতুক এবং অব্যক্ত একটা উৎকণ্ঠা যেন বেদনায় পরিবর্তিত হইয়া অপার সেই অনুভূতি শ্রীধর প্রভৃতির মনের সীমায় আর স্থান পাইতেছে না···

এতক্ষণ শরীরের সমুদয় শক্তি সে বোধহয় নিঃশেষে প্রয়োগ করে নাই, এইবার করিবে

…তার দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া বসিল, চোয়ালের হাড় কঠোর হইয়া উঠিল ; পেটের, হাতের, কাঁধের, পাঁজরের পেশীগুলি যে কী উন্মত্ত খেলা খেলিতে লাগিল তাহার না রহিল ইয়ত্তা, না রহিল নিশ্চয়তা—যেন নিঃশঙ্কায় শাসন ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া তারা কাহাকেও ধ্বংস করিতে যায় !

পাথর বুক পর্যন্ত উঠিল—তারপর চিবুক পর্যন্ত—এবং তারপরই সে পাথরখানা ছুঁড়িয়া দিলো…পাথর কোথায় পড়িল, পড়িল কি শূন্যেই রহিল, তাহা তাকাইয়া থাকিয়াও কেহ অনুভব করিতেই পারিল না…শ্বাসপ্রবাহ আপনি রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী তখন যেন স্পন্দনহীন হইয়া গেছে—কিছুই তার চোখে পড়িতেছে না—কোনোদিকেই তার জ্ঞান নাই। তারপর সহসা একটা শব্দ উঠিল—স্তব্ধ আবহাওয়া আর নিশ্চল বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া আচম্বিতে যেমন বাজের মেঘ ডাকিয়া ওঠে…

শ্রীধর হঠাৎ সচেতন হইয়া সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করিলেন : বলিহারি ! এবং তাঁর সংগে সংগে সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিল—হা হা হা…মহীন্দ্র ঊর্ধ্ববাহু হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : জয় গিরি-গোবর্ধনধারী।…বলিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া অপরিচিত বীরের পায়ের কাছে সে কেবল প্রণত নয় ভূলুণ্ঠিত হইল। শশধরও চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, তারপর সে অনুভব করিতে লাগিল, কেমন একটা পুলকে তার দেহ সির্‌সির্‌ করিতেছে।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে—লোকে সেই ব্যক্তির পা পূজা করিয়া তবে ছাড়িল।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীধর চিরকাল খরদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও হঠাৎ তাঁর সেই দৃষ্টি নিস্তেজ হইয়া গেল—পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া তিনি তাহাকে বখ্‌শিস দিতে গেলেন…সে লইতে অস্বীকার করিল, তবু তিনি টাকাটা তার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

শক্তিপূজার এই দৃশ্য, আর এই হর্ষ—অকপট এবং অশেষ—অন্যত্র মাত্র একটা গল্পের বিষয়রূপে সজীব হইয়া থাকিলেও শশধর তাহা গ্রহণ করিল অন্যভাবে, মন্ত্রের মত—তার গুরুকরণ ঘটিল।…এমন শক্তিসঞ্চয় যে ব্যক্তি করিয়াছে তার অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নাই —সে যদি মূর্খও হয় তবু সে ধন্য…শক্তির সাধনায় সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় আর উচ্চাভিলাষে পূর্ণ হইয়া শশধর সে দিন বাড়ী ফিরিল।

ষোল বছর বয়সে তার শারীর চর্চার সুরু।

## ॥ আট ॥

ঐ সব ঘটনা এবং শশধরের ব্যায়ামাভ্যাস দশ বৎসর পূর্বেকার কথা, সুতরাং উহা এখন পুরাতন প্রসংগ। অপরাপর স্মৃতির সংগে বিজড়িত হইয়া একটা সুখদ চিন্তার আকর হইয়া সে আছে—অপরূপ একটা মায়াও সেই অতীতের প্রতি আছে, কিন্তু সে উত্তেজক কিছু নয়।

আবার ইহাও পুরাতন প্রসংগ যে, শ্রীধর পরলোকগমন করিয়াছেন। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে চিরকাল খরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও শ্রীধর এমন কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাকে একটা কিছুর ভিত্তিকল্পে অবলম্বন করা যাইতে পারে। শশধর দুস্তর এবং

দুর্বোধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে থাকিয়া এবং তাহারই ইঙ্গিতে বিদ্যার্জনের কু-অভিনয়টা ত্যাগ করিয়াছে। তারপর সে বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে…তাদের একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মাতাঠাকুরণী মারা গিয়াছেন পৌত্রের জন্মের পূর্বেই।

বর্তমানে—ছাব্বিশ বৎসর বয়সে—শশধর চাকুরিয়া। লেখাপড়ার সঙ্গে আজকাল অর্থ উপার্জনের সম্পর্কটা প্রায় ঘুচিয়া গেছে—লোকে বলে। যে নাকি যেমন সুযোগ পায় তার তেমনি শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি ঘটে। কিন্তু শশধরের বেলায় তা যে ঘটে নাই তা দেখাই যাইতেছে; সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সুবর্ণ সুযোগে দৈবাৎ এবং অদৃষ্টলক্ষ্মীর অপ্রত্যাশিত আর দুর্লভ প্রসন্নতায় মাতব্বরী পদ সে পায় নাই; তার সামান্য চাকুরী, সামান্য বেতন।

সকল বিষয়েই তার এই সামান্যতা, অর্থাৎ এই হতাশকর ব্যাপারসমূহ, দীর্ঘ দশ বৎসর সময়টা যেন কৌতুকের খেয়ালে আচমকা মোড় ফিরিয়া ফিরিয়া আর পুনঃ পুনঃ মুচড়াইয়া উঠিয়া সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। দুঃখ পাইয়া মনে মনে এই বিধানের প্রতিবাদ সে অবশ্যই করিয়াছে, কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে!…তবে পরম সুখের বিষয় ইহাই যে, অদৃষ্টের আচরণে নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সে পয়সা ছাড়া আর-সবকেই পরিত্যাগ করে নাই—সাধুবাদে উৎসাহ পাইয়া ব্যায়ামের অভ্যাসটি সে বজায়ই রাখিয়াছে। এই ছাব্বিশ বছর বয়সে শশধর শারীরিক যে শক্তি অর্জন করিয়াছে তাহা তাহার কেতাবী বিদ্যার মত অকিঞ্চিৎকর ত' নয়ই, সাধনা দ্বারা অর্জিত এবং সংসারে সুলভ নহে বলিয়া তাহা বিশেষ অহঙ্কারের বস্তু—এবং প্রচুর বলিয়াই লোকে জানে, আর হা করিয়া দেখে। ‥পদক আছে কয়েকটি। বলা বাহুল্য, শশধরের মেলাই শিষ্য জুটিয়াছে। তারা ব্যায়াম শিক্ষা করে।

কিন্তু শশধর প্রায়ই বলে: পুঁই-চচ্চড়ি খেয়ে আর মুগুর ভাঁজার কাজ নেই। হাড়ে ধাক্কা খেয়ে কবে ম'রে যাবো।

শশধরের স্ত্রী প্রফুল্ল সে-কথা বিশ্বাস করে না—স্বামীর দুর্জয় শরীরের দিকে পুলকিত চক্ষে চাহিয়া সে হাসে।

বছর দেড়েক আগেও শশধরের শারীরিক শক্তির একটি পরীক্ষা এখানে হইয়া গেছে।

পুনরায়, সে-ও এক তামাসা।

## ॥ নয় ॥

ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, স্থানটা লোকালয় হইলেই সেখানে ষাঁড় থাকা প্রয়োজন—এখানেও আছে। স্থানীয় লোকে ষাঁড়ের নাম রাখিয়াছে শঙ্কর—কেবল সুরযমল মাড়োয়ারী তাকে ডাকে মৈনাক বলিয়া—দেখিলেই হাঁক ছাড়িয়া বলে, মৈনাক হো!… সুবৃহৎ অটল জীব—অত্যন্ত বনিয়াদি অহংসর্বস্বের মত শঙ্করের চাল-চলন; তার কণ্ঠ-নির্ঘোষে মাটি কাঁপে। কাহাকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না; লঘু-গুরু প্রত্যেকটি মানুষকে অত্যন্ত অবহেলার চক্ষে দেখিয়া পথে ঘাটে, ক্ষেতে খামারে, এমন কি গৃহস্থের সামান্য শাকের ক্ষেতেও, সে বিচরণ করে—মহাদেবের প্রতিনিধি যেন!—আদরও পায়, ঠ্যাঙাও খায়; গর্জন করে ভীষণ কিন্তু মারে না। ফলের এবং চাল-ডালের দোকানের সম্মুখেও তাহাকে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।

নির্লিপ্ত শান্ত জীবটি ঐ শঙ্কর, কিন্তু একদিন বড় দুর্দৈব ঘটিল ; দোষ শঙ্করের তত নয় যত এই গ্রীষ্মপ্রধান রৌদ্র-জালার দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৌরাত্ম্যপ্রিয় মক্ষিকার, এবং একটি সাতিশয় অবিবেচক লোকের। শঙ্কর, অথবা মৈনাক, অতীব মন্থর—পরিশ্রম বিশেষ সে করে না, কিন্তু বিশ্রাম করে খুব—কখনো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, কখনো শুইয়া শুইয়া। একদিন সে শুইয়া শুইয়া বড় উৎপাত বোধ করিল।…গ্রীষ্মের অপরাহ্ন বাতাস পথ হারাইয়া পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে কে জানে, কিন্তু এদিকে তার একটুও সাড়া নাই ; বড় গুমোট করিয়া আছে। পথে রোদ ছিল ; শঙ্কর বোধ করি গুমোট উত্তাপে অতিষ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে যাইয়া বিশ্রামে বসিল গুরুচরণ-বাবুর বাইরের উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে, এমন অসঙ্কোচে যেন তার সেখানে প্রবেশে নিষেধ করিবার মালিক কেহ নাই। বদরাগী বলিয়া শঙ্করকে দোষী কেউ করে না—তার সে-অপবাদ নাই ; কিন্তু আজ অপরাহ্নে তার মেজাজ যেন ভাল নাই—গায়ে-পিঠে লেজ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে ভারি ক্লান্ত আর ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—মক্ষিকার উপদ্রব আজ অসহনীয় যেন ··পংগপালের মত অজস্র মক্ষিকা দলে দলে তার মুখে-চোখে বসিতেছে, নাকে-কানে ঢুকিয়া যাইতেছে, দংশনও না করিতেছে এমন নয়। লেজ সাপ্‌টাইয়া আর ফোঁসফোঁস শব্দ করিয়াও শঙ্কর কিছুমাত্র স্বস্তি পাইতেছে না—আজ সে বিপন্ন।…দুরন্ত মক্ষিকাকুল কোথায় এবং কখন তাহার নাগাল পাইয়াছে তার ঠিক নাই, কিন্তু আরও অধ্যবসায়ী ছোট ছোট জীবগুলি শঙ্করকে বহুক্ষণ হইতে এক মুহূর্তও শান্তিভোগ করিতে দেয় নাই—গুরুচরণবাবুর উঠান পর্যন্তও তাহারা আসিয়াছে, কেহ উড়িয়া উড়িয়া, কেহ তাহার দেহেই আরোহী হইয়া আরামপূর্বক।…শঙ্করের নিঃশ্বাস-পতন যতই অসহিষ্ণু আর সশব্দ জোরালো হোক তাহাতে আর কোনো ফল হয় নাই, খানিক ধুলাবালি উড়িয়াছে মাত্র। শঙ্করের কণ্ঠমন্ত্রও শুনিতেই ভয়ঙ্কর—মক্ষিকা বিতাড়নে তা সমর্থ নয় একটুও। হতাশ হইয়াই শঙ্কর এই ছায়ায় আসিয়াছিল—

কিন্তু সেখানেও তার স্থান হইল না—তাহাকে উঠিতে হইল। ছোট ছোট ছেলেদের খেলার স্থান এই উঠান, এবং খেলার সময়ও এ-ই। তাহারা খেলিতে আসিয়া দেখিল, তাহাদের খেলার জায়গা অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছে শঙ্কর। পরিচিত আর নিরীহ অহিংস বলিয়া শঙ্করকে তাদের তেমন ভয় নাই—হৈ রৈ করিয়া, কঞ্চি দিয়া তার গা খুঁটাইয়া, আর তাহার লেজ ধরিয়া টানিয়া ছেলেরা তাহাকে তুলিয়া দিলো—তাহাকে উঠিতেই হইল।…ধীর গতিতে উঠান পার হইয়া, পগার পার হইবার সময় বিড়ালের মত লঘু ভংগীতে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত একটি লম্ফ প্রদান করিয়া শঙ্কর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল ··দুর্দান্ত মক্ষিকাগুলি তখনো তাহাকে ত্যাগ করে নাই—অনিবার্য নিয়তির মত, কিন্তু নিঃশব্দে নহে, পাখার ঝঙ্কার বাজাইয়া, তাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে ··

রাস্তায় আসিয়া শঙ্কর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সহিষ্ণুতার অবিকল মূর্তির মত—যেন সে জানে ; মহাদেবের বাহন সে, তাহাকে অধীর হইতে নাই। · মুহুর্মুহু তার সর্বাঙ্গে শিহরণ বহিতেছে, ককুদ প্রকম্পিত হইতেছে, কিন্তু ক্রোধ তার মনের ত্রিসীমানায় নাই। তার প্রগাঢ় কৃষ্ণকায় চক্ষু দুটির দৃষ্টি ভারি করুণ, যেন সে সহৃদয়তা আশা করিয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে—ত্রাণ আর সেবা প্রার্থনা করিতেছে···

একটি পথিক হন্‌হন্‌ করিয়া আসিতেছিল ; থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল,—···বাবা ষাঁড় !—বলিয়া সে শঙ্করের গুরু নিতম্বে আদরের একটা চপেটাঘাত করিয়া পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল।

লোকটার আদরের চপেটাঘাতকে প্রহার মনে করিয়া শংকর অবশ্যই ভুল করিল না—বরং লোকটির দিকে চোখ ফিরাইবার সময় তাহার চোখে যে কাতরতা ফুটিল তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি ভয়ে পাকাঘর না করিয়া মক্ষিকাগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া গেলে শংকর কৃতজ্ঞ হইত···মানুষের ভালবাসা আর অনুকম্পা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—দুঃখে কেহ নিস্তার দিক, এ-কামনা তার কাছে এবং থাকিবারই কথা, কিন্তু তেমন দয়ালু কেহ আসিতেছে না কেন ?

যে-স্থানে মক্ষিকারা বেশী দুঃসহ সেইখানেই যেন বেশী মধু, আর সেখানে যাইয়া বসিতেই তাদের যেন বেশী আনন্দ !—চোখের কোণে, নাকের আর কানের গহ্বরে তাহারা দলে দলে প্রবেশ এবং বিচরণ করিতেছে ; অসহনীয় হইলেও শংকর বলিয়াই তাহা সহ্য করিয়া আছে, অন্য ষাঁড় হইলে এতক্ষণ কি করিয়া বসিত তার ঠিক নাই। কিন্তু তার যন্ত্রণা হঠাৎ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল—তার লেজের নীচেকার অতিশয় কোমল স্থানটি একটি বিষাক্ত মক্ষিকা তীক্ষ্ন দংশনে বিদ্ধ করিল··

শংকরের কণ্ঠ দিয়া আর্তনাদের একটি গভীর নাদ নির্গত হইল—প্রবলভাবে মাথা ঝাড়া দিয়া সে পা বাড়াইল...ধরণে বুঝা গেল, এইবার সে অসহিষ্ণু হইয়াছে...

কিন্তু রাগ তার তখনই পড়িয়া গেল—

ঐ একটা মানুষ আসিতেছে ; শংকরের বোধ করি মনে হইল, লোকটার এদিকে আসার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই--তাহাকে উদ্ধার করিতেই সে আসিতেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যেন সেখান হইতেই গলা বাড়াইয়া দিয়া শংকর প্রত্যাশিত উদ্ধার-কর্তার দিকে একটু দ্রুতপদেই অগ্রসর হইতে লাগিল...

মানুষটি আর কেউই নয়, এখানকারই বাসিন্দা, ভদ্র এবং ব্যবসায়ী শ্রীদিনকর দে। দিনকরের বয়স এই আটচল্লিশ হইবে—অত্যন্ত দুর্বল আড়ষ্ট চেহারা। দিনকরের বাড়ীটা যে পাড়ায় দোকানটি সে-পাড়ায় নয়। দ্বিপ্রহর অন্তে আহারাদির পর দিবানিদ্রা দিয়াছিল—নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুড়ির সঙ্গে এক গেলাস চা খাইয়া সে দোকানে যাইবে বলিয়া দ্রুতগতি বাহির হইয়াছিল ; কিন্তু পথের মাঝে তার অগ্রগতি বাধা পাইল।

শংকর দরকারী আর পরিচিত এবং লোকের প্রিয় জীবটি হইলেও সে ষাঁড়, এবং মহাদেবের প্রশান্ত বাহন হইলেও বীর্যবান পশু ; বিরাট নিটোল দেহ তার, আর বাঁকা দুটো সিং আছে—ভারি শক্ত ; শৃঙ্গের আঘাতে সে পর্বতকে বিদীর্ণ এবং দেহনিক্ষেপে পর্বতকে নিধাপিত করিতে পারে, এ-ধারণা সকলেরই না থাকিলেও, তাহারই দিক শংকরকে আসিতে দেখিয়া নির্জীব দিনকর দে-র তা মনে হইল, এবং সন্দেহ রহিল না।

দিনকর দে অম্‌নিই আড়ষ্ট—ভয়ে আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল। এম্‌নি দুর্গত অবস্থায় ত্রাণকর্তার আগমনে মানুষের মুখে-চোখে যে ভাব ফুটে, শংকরের মুখে-চোখে তা ছিল না। কাজেই দিনকরও পড়িল সংকটে। শঙ্করকে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে সে দুই হাত শূন্যে তুলিয়া এলোমেলোভাবে আন্দোলিত করিতে লাগিল, এবং আপত্তিসূচক চীৎকারও সে করিতে লাগিল প্রচুর এবং প্রবলভাবে। শঙ্করের বন্ধুভাবটা তাহাতে বাধা পাইল। দিনকরের আত্মরক্ষায় এই তৎপরতা যে বন্ধুভাবের বিরোধী, আর

সহৃদয়তার অভাব তাতে আছে, অর্থাৎ আর্ত জীবের পরিত্রাণার্থ দিনকর উৎসাহী নহে. তবে শঙ্কর, পশু হইলেও, বুঝিল···যেন বিস্মিত হইয়া আর ক্ষোভের সংগেই সে আগ্রহ দমন করিল ; একেবারে দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল···

দিনকর ভাবিল, হুঙ্কারে আর হাত-পা নাড়ায় ফল হইয়াছে, শঙ্কর ভয় পাইয়াছে।···তখনো শঙ্কর খুব কাছে আসে নাই...তাহাকে আরো ভয় পাওয়াইতে, অর্থাৎ তার মুখ বিপরীত দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দিতে, অব্যর্থ একটা প্রহরণের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দিনকর সট্ করিয়া তুলিয়া লইল ভাঙা ইঁটের টুকরা একটা।—শঙ্করের শরীরের দিকে সেটাকে সে ছুঁড়িয়াও দিলো, কিন্তু, কত জোরে ঢিল ছুঁড়িলে কতদূরে যাইয়া পড়ে দিনকরের সে ওজন-জ্ঞান না থাকায় ইঁটের টুকরো অতবড় শরীরটাকেও ডিঙাইয়া পড়িল শরীরের বাহিরে—শঙ্করের গায়ে লাগিল না। কিন্তু উহাতে শঙ্করের বুদ্ধির কাছে একটা কথা পরিষ্কার হইয়া গেল : ও-পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—ও-পক্ষ যুদ্ধই চায়। তথাপি শঙ্কর বোধ হয় মানুষ দিনকরের মত তুচ্ছ শত্রুকে অবজ্ঞাভরে পরিহারই করিত—একবার নাক ডাকাইয়া সে দাঁড়াইল ; তারপর ফিরিবার উদ্দেশ্যেই সে মুখ ঘুরাইতেছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্য দিনকর দে-র তখন দুর্মতিই প্রবলতম—আততায়ী তাহারই ভয়ে পলায়মান হইয়াছে মনে করিয়া তার তেজ বাড়িল ; মনে হইল, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। অতএব সে স্ফূর্তির সংগে আর একটা ইঁটের টুকরা নিক্ষেপ করিল···এটা বৃহত্তর বস্তু—নিক্ষিপ্ত হইল বেশ জোরেই, এবং অদৃষ্টের আরো নিগূঢ় ক্রীড়ানৈপুণ্য এইখানেই যে, এবারকারটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না—শঙ্করের শরীরেই সেই লোষ্ট্র পড়িল, এবং তাহাকে আঘাত করিল ভারি বেদনাচেতন সংগীন একটা স্থানে, নাকে।··শঙ্কর ঝাঁকি দিয়া মাথা তুলিল—দু'বার গাঁক্ গাঁক্ শব্দ করিল ; এবং তাহাতেই দিনকর দে'র ঘটে তোলা-ছটাকের বুদ্ধি বাদে আর-যেটুকু বুদ্ধি এবং প্রাণে যেটুকু সাহস আজন্ম ছিল, এবং এখন মিলাইয়া যাইয়া আবার দেখা দিয়াছিল তাহা, চক্ষের নিমেষে রসাতলে তলাইয়া গেল···কাপুরুষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

ইহার পর যে ট্র্যাজিডি ঘটিল তাহা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। ঐ পলায়নপর নড়বড়ে কৃশ লোকটাকেই এতক্ষণের সমস্ত যন্ত্রণার মূল মনে করিয়া সহসা জাগ্রত পাশব-হিংসায় শঙ্করের মাথা আগুন হইয়া উঠিল...প্রতিহিংসা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্ত হইয়া সে দিনকর দে'র পশ্চাদ্ধাবন করিল...

ভাবিতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, যে, দিনকর দে'র সেদিন দিনারম্ভ হইয়াছিল যারপরনাই অযাত্রায়। পলায়ন করিয়া সে একটা নিরাপদ স্থানে, শঙ্করের অগম্য স্থানে, পৌঁছিতে নিশ্চয়ই পারিত—কিন্তু তার পূর্বোক্ত দুর্মতির চাইতে তার দুষ্টগ্রহ এখন আরো প্রবল, আর নাছোড়বান্দা...ছুটিতে ছুটিতে সম্মুখেই সংকীর্ণ রাস্তার মোড়ে খানতিনেক গরুর গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া পাশ কাটাইবার ফাঁক খুঁজিতে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল·· বেচারার হতবুদ্ধিতা চরমে উঠিয়াছিল নিশ্চয়ই ; নতুবা মুহূর্তও যে মূল্যবান তাহা সে সহসা এ-হেন সংকটকালে বিস্মৃত হইয়া যাইবে কেন, কিম্বা না দাঁড়াইয়া বেচারামের রান্নাঘরেই ঢুকিয়া গেল না কেন! হতভম্ব হইয়া, যেন একটা অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায়, ঘটনাটা তার কিছুই মনে রহিল না—কেন সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতেছিল, পশ্চাতে কেহ বা কিছু আসিতেছে কি না!

তার হুঁশ ফিরিল গুঁতা খাইয়া—অন্ধকার কাটিয়া গেল তখনই। যে-শিঙের আঘাতে

পর্বত বিদীর্ণ হয় বলিয়া দিনকর দে'র বিশ্বাস, এবং সেই কারণেই শিং সম্বন্ধে ছিল তার বিশেষ আতঙ্ক, সেই শিঙের গুঁতো খাওয়া ছিল তারই বরাতে! কিন্তু সেই শিঙের আঘাতে দিনকরের গা ফাটিয়া হাঁ হইয়া গেল না—কারণ তা পাথরের নয়; তার স্থিতি-স্থাপক মাংসময় সমস্ত দেহটা একবার ঘুরপাক খাইয়া মাটিতে গড়াইয়া গেল কেবল।

শরীরের যে-স্থানে আঘাতটা বসিয়াছিল সে-স্থানের অবস্থা কি এবং সেখানে ব্যথা কত তাহা পরে দেখা যাইবে; কিন্তু সম্প্রতি তার দেহ মাটিতে গড়াইয়া পড়িবার পরও পুনরায় সেই শিঙের আঘাতেই আরো কি ঘটিতে পারিত তাহা অনুমান করা যায়, এবং অনুমানও করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।...মানুষটা চোখের সামনেই অপঘাতে মারা পড়ে দেখিয়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গাড়ী থামাইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল·· এবং অন্যান্য কয়েকটি লোক সাবধানে দূরত্ব বজায় রাখিয়া বিপন্ন দিনকর দে'র রক্ষাকল্পে যে-চীৎকার সুরু করিয়াছিল, দিনকর প্রাণসংশয় অবস্থায় মাটিতে পড়িবার পর তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—তাদের চীৎকারের লক্ষ্য শঙ্কর নিশ্চয়ই; কিন্তু কেবল চীৎকার করিলে আর যে-আন্দালনই সফলতার দিকে অগ্রসর হোক, ষাঁড়ের বিরুদ্ধে তা নিষ্ফল—ক্রোধান্বিত বৃষের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির গতিরোধ তাতে হয় না।

ঠিক এই সময়টিতেই শশধর ছাতা হাতে করিয়া কর্মস্থল হইতে ঘরে ফিরিতেছিল··· দিনকর দে'র ফাঁড়া কাটিয়া গ্রহের কোপ তখনো শান্ত হয় নাই—তখনো সে মাটিতে; উঠিতে পারে নাই—শঙ্কর পুনরায় প্রহারোদ্যত হইয়াছে—

হঠাৎ দিনকর দে'র ফাঁড়া কাটিয়া গেল—চক্ষের পলকে হাতের ছাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শশধর লাফাইয়া আসিয়া পড়িল, যথাক্রমে ভূশায়ী আর উদ্যত শৃঙ্গ, দু'টি জীবের মাঝখানে···দিনকরের দেহকে আড়াল করিয়া শঙ্করের শিং দু'টি সে দু'হাতের দুই মুষ্টির ভিতর চাপিয়া ধরিল···

দিনকর যে কেবল অবান্ধব আর অহিতৈষী নহে, পরন্তু পরম শত্রু, নিদারুণ অবিচার করিয়া সে মারিয়াছে, শঙ্কর তা ভোলে নাই,—সুতরাং সে বেজায় রুখিয়া রহিল, এবং শশধরকে যথাসাধ্য ঠেলিতে লাগিল। মারমুখো মানুষের রাগ পড়াইতে হইলে গা না ঠেলিলেও চলে, সুবুদ্ধির নানারকম কথা কওয়া যায় ঢের, তাতে সুফলও পাওয়া যায়; কিন্তু শঙ্কর কথা বোঝে না—ইংগিতে বিদ্রূপে তাহাকে বুদ্ধি দান করা অসম্ভব; কাজেই তাহাকে, খুনচাপা ষণ্ডকে, নিবৃত্ত করিয়া ফিরাইয়া দিতে শশধরকে শারীরিক যে বলপ্রয়োগ করিতে হইল, তাহা অনেকেরই মনে হইল অমানুষিক।

## ॥ দশ ॥

দিনকর দে সেদিন রক্ষা পাইয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের শিঙে অষ্টাঙ্গে ছ্যাঁচা খাইয়া পথের উপর তার অপমৃত্যু ঘটে নাই, শশধরের গায়ে জোর আছে বলিয়া। অসাধারণ শক্তিধর আর সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া শশধর বিখ্যাত আর মানুষের প্রীতির পাত্র হইয়া গেল। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে আর্তরক্ষা করে তার চাইতে মহৎ আর কে! তাহাকে দেখিলে লোকের চোখ বিস্ময়ে একটু বড় হয়।

সুতরাং শশধর আছে ভাল। লোকের গুণমুগ্ধতার স্বাদ ভারি তৃপ্তিদায়ক মধুর।

তার উপর তরুণবৃন্দ তার পরম অনুরক্ত হইয়া তার শিষ্যত্ব সবিনয়ে গ্রহণ এবং গুরুত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। ইহাও সত্য যে মানুষ সর্বাপেক্ষা তৃপ্তি পায় গুরুগিরি করিবার সুযোগ পাইলে—উপরওয়ালা হওয়ার চাইতেও তাতে সুখ বেশী।...ব্যায়াম-চর্চার শিক্ষানবিশ কর্তৃত্বাধীনে পাইয়া শশধর অবিরাম পুলক অনুভব করে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জল্পনাও সে শিষ্যগণের সহিত না করে এমন নয়।

ভুলিলে চলিবে না যে, শশধরের পুলকের দ্বিতীয় একটা কারণও আছে—সশরীরে উজ্জ্বল হইয়া অহোরাত্র সম্মুখেই আছে ...সে কারণটি তার স্ত্রী প্রফুল্ল। প্রফুল্ল অতিশয় প্রেমময়ী। তার প্রেমের প্রথম লক্ষণ ইহাই যে, সে বড় বিরহভীরু—একটি দিনের জন্যও স্বামীর কাছ ছাড়া হইয়া অন্যত্র যাইতে এবং থাকিতে সে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। এই একাগ্র আর নিরবচ্ছিন্ন সংগ-পিপাসা ভারি মধুর। স্ত্রীর সেই অনিচ্ছাকে শশধর নিজ-অর্জিত একটা অমূল্য সম্পদ মনে করে। আবার সেই জন্যই মুস্কিলও বাধে।

সেবার প্রফুল্লর মায়ের অসুখের খবর আসিল—প্রফুল্লকে লইতে লোকই পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রফুল্ল বলিল, বেশী বাড়াবাড়ির কথা ত' কিছুই বলছে না। না গেলেও চলে বোধ হয়। কি বলো?

শশধর বলিল, বোঝো তুমি। কিন্তু আমার মতে যাওয়াই উচিত। বুড়ো মানুষ অসুখে পড়েছেন।

—তা হ'লে তুমিও চলো।

—আমি যাবো কেমন ক'রে? চাকরী কামাই ক'রে?

—তবে আমিও যাবো না।—বলিয়া প্রফুল্ল গোঁ ধরিয়া রহিল বলিল, খাওয়ার কষ্টে তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত সাত দিনের ছুটি লইয়া শশধরকে যাইতে হইয়াছিল, এবং ছুটি পাইতে তাকে মনিবের কাছে কষ্টকর অবনতি স্বীকার এবং মিথ্যা উক্তি করিতে হইয়াছিল বিস্তর। ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিতে এই অনিচ্ছা ছাড়া আর একটা বিষয়েও প্রফুল্লর অনিচ্ছা দেখা যায়; কিন্তু বলিতে আমি বাধ্য যে, সেটা তেমন মধুর নয়।...আপন সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে সে জানে, এবং আপন সঙ্কল্পে সে দৃঢ় হইয়াই থাকিতে চায়—বিচ্যুত করিতে কেহ অগ্রসর হোক, এ-ইচ্ছা তার নয়। তার এই অনিচ্ছাটা যেমন অটল তেমনি তেজী, তেমনি নীরব—তাহাকে দুরূহ করিয়াও তোলে ঠিক তেমনি।

প্রফুল্লর চেহারা বেশ—মুখখানা কচি কচি; কিন্তু সেই বালিকাসুলভ পেলবতার মাঝেই কোথা হইতে একটা দুঃসাহসিক প্রবলতা স্ফুটিত হয়, তার হদিস শশধর পায় না...স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিবার দিকে প্রফুল্লর যথেষ্ট লক্ষ্য আছে, শারীরিক উৎসাহও প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়; কিন্তু অকারণেই আকাশস্পর্শী আশার সংগে পর্বতপ্রমাণ উদ্বেগ মিশাইয়া সে বহন করে না—সর্বদাই কাঁটা হইয়া থাকে না। নির্বোধ সে নয়—হাসিমাখা প্রশ্রয় আর ক্ষমার ভাব তার আছে—শশধর এটা বেশ হৃদয়ংগম করে; কিন্তু তার আচরণের কুত্রাপি আতুরতা নাই—শশধর ইহাও হৃদয়ংগম করিয়া অস্বস্তি অনুভব না করিয়া পারে না।

সে যাহাই হউক, আনন্দের কথা এই যে, প্রফুল্লর স্বচ্ছতা, সুপরিচ্ছন্নতা আর সুষমা দেখিয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে কল্পনার পর কল্পনা করিয়া তাহাকে আরো সুন্দর আর

অজানা গুণে ভরপুর করিয়া চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে মানুষের ইচ্ছা হয়। টাকা দিয়া নয়, পয়সা দিয়া নয়, কেবল অমূনিধারা অফুরন্ত সুমিষ্টতা দিয়া যে আকর্ষণ করিতে পারে তার সংগলাভে যে-সুখ তা কখনো নিঃশেষিত হয় না—বিস্বাদ হইয়াও ওঠে না। প্রফুল্লর বান্ধবী এবং হিতৈষিণী অনেক।

একটি শিশু জন্মিয়াছে—

শিশু যে স্পর্শসুখ দেয়, তার অংগে যে ঘ্রাণ থাকে তাহা, আর তার অজ্ঞান নির্ভরতা এবং তার মুখের অকারণ হাসি এ-পৃথিবীর সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না—অত রস মথিত করিয়া তোলা পৃথিবীর সাধ্য নয়। হাসিটা প্রফুল্লর খুব চতুর মনে হয়—বলে, ছেলে খুব চতুর হবে।

শশধর বলে, জানলে কেমন ক'রে ?

—ভারি দুষ্টুর মত হাসে—সবটা যেন হাসে না ; হাসি লুকিয়ে একটুখানি হাসে।

শশধর অত তলাইয়া দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়া ভারি খুশি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিশুটিকে পাইয়া ওরা যেন পৃথিবীর বাহির হইতে একটা অবলম্বন পাইয়াছে, এবং চমৎকৃত হইয়া আছে ; মাঝে মাঝে আবার অবাক হইয়াও যায়—শিশুর মারফৎ দরিদ্রেরও এমন সৌগাৎ লাভ হইতে পারে, শিশু জন্মিবার পূর্বে তাহারা তাহা জানিত না।

কিন্তু শশধরের মনের গতি অন্যদিকেও ধাবিত হয়—বলে, তোমার চাইতেও দীপক বলবান হবে।

প্রফুল্ল বলে, হ্যাঁ, ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ।

শশধর জবাব দেয়, কিন্তু তুমি ত' রাক্ষসী নও।

স্বামী বলবান, এ-গর্ব প্রফুল্লর আছে। বলে,—তা না-ই বা হলাম। বাপ ত' ভীম।

দু'জনেই হাসে, আর, দীপককে নাচায়।

## ॥ এগারো ॥

ঐ প্রকারের সুখেই সংসার চলিতেছিল—হাসিমুখ সবারই। পাড়ার লোকের কাহার মনে গভীর গোপন দুঃখ আছে তাহা তল্লাস করিয়া কাজ নাই—বাহিরে অশান্তি উৎপাত কিছু ছিল না ; কিন্তু হঠাৎ একদিন শান্তিভংগ হইয়া অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল, শশধরের বা তার স্ত্রী প্রফুল্ল কিম্বা তাদের পুত্র দীপকের নয়—অন্য একটি লোকের। শশধর জড়াইয়া গেল তারই সংগে—সেটাও শোচনীয়।

নিজের চেষ্টায় শশধর এখন শরীরে শক্তিশালী যতই হোক, যতই তার নাম ছুটুক, আর শিষ্য-সেবক-চেলার দল তার যতই জুটুক, আর তার দরুণ জীবন সার্থক হইল বলিয়া যতই সে মনে করুক, এ-সবের মূল্য দেয় লোকে নিরবয়ব উৎসাহ দিয়া, কৃতজ্ঞতার আনুগত্যে আর নির্ভর করিয়া। কিন্তু বই লইয়া বসিয়াও সরস্বতীর প্রতি যে অবহেলা একদিন সে দেখাইয়াছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল লক্ষ্মী—তিনি বিমুখ হইয়া আছেন। শশধর দরিদ্র। সুতরাং বড় বড় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বা ভাড়া লইয়া বৃহতের৷

যে-অঞ্চলে বাস করেন, এবং টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে বলিয়া মনে করেন, সেখানে তার প্রবেশপত্র পাওয়ার কথা নয়। দরিদ্র পল্লীর একেবারে অভ্যন্তরে না হোক, একরকম তার গা ঘেঁষিয়াই সে বাস করে···পাড়ার অনেক বাড়ীরই কান্না কলরব তারা স্পষ্ট শুনিতে পায়, সুতরাং তারা কাছেই থাকে বলিতে হইবে। লোকগুলি দরিদ্র হইলেও তাদের মান-ইজ্জৎ বজায় আছে—আত্মসম্ভ্রম কি পারিবারিক প্রতিষ্ঠা পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হোক, এ তারা চায় না, ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় তারা চঞ্চলই হয়।

হঠাৎ একদিন অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল, দূরবর্তী কাহারো নয়, বা শশধরদের নয়, এই দরিদ্র পল্লীরই একটি দরিদ্র পবিত্র বাসিন্দার।

শিক্ষা ও রুচি হিসাবে অনুন্নত লোকের ভিতর শশধরের পদস্থ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক—তা-ই সে আছে; সে কাছে আছে বলিয়া দুর্বলেরা খানিক নির্ভয় হইয়া আছে, ইহাও সত্য—তারা তা প্রকাশই করে; ডাকে 'বাবু' বলিয়া—'শশধর' বাবু নয়, খালি, 'বাবু'।...কিন্তু আশা-ভরসা সবই একদিন বৃথা হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ নির্মেঘ, আর রাত্রি পূর্ণিমার। এই জ্যোৎস্না যে কি অপরূপ আর কত আনন্দকর তাহা বলিবার নয়—এই জ্যোৎস্নার আনন্দে বিহ্বল আর তার প্রাণময়তায় উদ্দীপিত আর অভিষেক-অভিলাষী হইয়া বালকেরা মুক্ত স্থানে ছুটিয়া আসে; লোকে নাম-কীর্তনে বাহির হইয়া যেন বাঞ্ছিত পথে যাত্রা করে; কবির চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া যায়; শিশু সেই সুবর্ণ আলোকের উদ্দেশে হাত বাড়ায়···কিন্তু এই অদ্বিতীয় রাত্রিতেই অতুলনীয় দুঃসহ যা তাহাই ঘটিল।

আজকে তেমন গরম নাই—দূরে কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে বোধ হয়, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে···পল্লী নিদ্রিত। নিদ্রিত পৃথিবীর উপর জ্যোৎস্নার এই প্রলেপ-প্রবাহ নিদ্রিত ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না—কিন্তু দেখিয়া ঘুমাইয়াছে—সেই দেখার সুখ তার ঘুমের ভিতর আছে—সেই সুখ ঘুমে গাঢ়তর হইয়াছে।

প্রৌঢ় নকুল মণ্ডল এই দরিদ্র পল্লীর দরিদ্রতম ব্যক্তি—অতিশয় অমায়িক। তার স্ত্রীও শান্তশিষ্ট লোক—প্রফুল্ল তাকে ভারি আনুকূল্য করে···এই রাত্রে তাহারা ও নকুলের বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নকুলেরই বাড়ীর মাটির প্রাচীরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল পাঁচ ছ'টি লোক···তাদের একজন ডাকিল, নকুল?···নির্ভয়ে আর অবাধ কণ্ঠেই সে নকুলকে আহ্বান করিল—শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে যে, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলেও, এবং হাতে লাঠি থাকিলেও, লোকটি বা লোকগুলি ভাল—দুরভিসন্ধি কিছু নাই।

কিন্তু নকুল তখন খুব ঘুমাইতেছে—নিঃশব্দ নিশীথে শব্দ প্রবল শুনায় এবং বহুদূর যায়, তবু এক ডাকেই নকুলের ঘুম ভাঙিল না।···নকুলকে যে ডাকিয়াছে, নকুলের ঘুম ভাঙানো তার চাই-ই; কাজেই সে ঘন ঘন কয়েকবারই নকুলের নাম হাঁকিল···

নকুলের ঘুম ভাঙিল—সাড়া দিবার পূর্বে, বিছানায় থাকিয়াই, সে কান খাড়া না করিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাইল, প্রাচীরের বাহির হইতে অস্ফুট হাসির শব্দও আসিতেছে···

কারা ওরা? দুপুর রাত্রে দরজায় আসিয়া গৃহস্বামীর ঘুম ভাঙাইয়া হাসিবার অর্থটা কি?···নকুলের চিরকালের ধারণা, সাবধানের বিনাশ নাই। মনে মনে খুব সজাগ আর সাবধান হইয়া নকুল বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; জবাব দিলো, কে?

খুবই অসঙ্কোচে অদৃশ্য ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিলো ; বলিল, আমরাই।…অর্থাৎ ইহা জানা কথা যে, তারা নকুলের প্রীতির পাত্রই।—তারপর বলিল, দরজাটা খোলো দেখি একবার ; ভারি জরুরী কাজ আছে।

তবু নকুল ভুলিয়া গেল না যে, সাবধানের বিনাশ নাই ; অদৃশ্য লোকটির কণ্ঠের ব্যগ্রতায় সে বিস্মিতও হইল। নকুল ডাক্তার নয় যে বিপন্ন গৃহস্থ এমন অসময়েও তার শরণাপন্ন হইবে ; চোরের ভাণ্ডারী ত' সে নয়ই ; তা সে হইলে, ঠিক এম্‌নি সময়ে তার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করা আর ঘুম ভাঙানো স্বাভাবিক দেখাইত।…বুকটা ছাঁৎ করিয়া নকুলের হঠাৎ মনে হইল এই কৌশল অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ বাড়ীর লোককে ডাকিয়া আনিয়া দরজা খুলাইয়া, ডাকাত ডাকাতি করিয়া থাকে—ওরূপ ঘটনার কথা সে শুনিয়াছে। কিন্তু তার বাড়ীতে ডাকাত আসিবে কেন ? এমন পণ্ডশ্রমের কাজ কি আর আছে !

ভাবিয়া নকুল আরও বিস্মিত হইল ; বলিল, পাড়ার কেউ নয় তুমি। গলা চিনলাম না। কে তুমি ?

—দরজা খুললেই দেখতে পাবে। চোর ডাকাত নই।

ভরসা পাইয়াও দরজা খুলিতে নকুলের সাহস হইল না ; বলিল, উঁ হুঁ।

—তবে আমারই খুলে নিচ্ছি।

বলিবার সংগে সংগে নকুলের মৃৎপ্রাচীরের উপরকার খড়ের ছাউনির উপর লাঠি এবং দরজার উপর লাথি পড়িতে লাগিল।…

সেই শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল প্রফুল্ল এবং শশধরেরও। প্রফুল্ল বলিল, শব্দ কিসের ?

শব্দের দিকে কান পাতিয়া শশধর নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিল, শব্দ লাঠি এবং লাথির… তার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল…একটা মিথ্যা কথা বলিল ; পাপ করিল ; বলিল, বুঝতে পারছিনে।

কিন্তু না বুঝিয়া আর পারা গেল না অবিলম্বেই—নকুলের পিতার আমলের আমকাঠের আর উঁইয়ে জীর্ণ দুর্বল দরজা তুমুল শব্দে ভাঙিয়া পড়িল…

ঐ শব্দ ছাড়া পৃথিবীর এই স্থান-খণ্ড একেবারে নিঃশব্দ—জনমানবহীন প্রান্তর যেন—সেই নির্জন প্রান্তরে নির্জন একটি গৃহে বলপূর্বক প্রবেশের এই সশব্দ উদ্যম চলিতেছে।

প্রফুল্ল ছিট্‌কাইয়া উঠিল। শশধর বলিল, ডাকাত পড়েছে নকুলের বাড়ীতে।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু নকুলের ত' কিছু নেই—বিধবা একটা মেয়ে আছে কেবল। বুঝতে পারছ না ? ওঠো, শীগ্‌গির যাও।—বলিয়া প্রফুল্ল শশধরকে দু'হাতে ঠেলিতে লাগিল…

গত বৎসর ঠিক এম্‌নি দিনে দূরের একটা খড়ের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল—সন্ধ্যার কিছু পর ; শশধর তখন আহারে বসিতেছে। কোলাহল শুনিবামাত্র সম্মুখের বাড়া ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া শশধর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া একাই একশোজনের কাজ করিয়াছিল—আগুনের গ্রাস হইতে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল—দু'খানা ঘর ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল প্রায় একাই। তার গায়ে আগুনের আঁচের জ্বালা প্রায় দুই দিন ছিল ; সেই জ্বালা নিবাইতে ঘোল আর ডাবের জল সরবরাহ করিয়াছিল পাড়ার লোকে।

কিন্তু আজ শশধর উঠিল না, শুইয়া রহিল ‥

একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসিল—আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া,

জোৎস্নালোক তামস তুহিনপুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া, এবং বোধ হয় অন্তরের দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হইল এবং মিলাইয়া গেল ...তারপর গুরুভার দ্রব্যপতনের শব্দ হইল ; গুরুভার দ্রব্যটি বোধ হয় মনুষ্য-দেহ...এবং তার পরই একটা পুরুষ কণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল...

প্রফুল্ল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, যাবে না ?

—দরকার নেই।—বলিয়া শশধর চোখ বুজিল। তার মুদ্রিত চক্ষু প্রফুল্ল দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিতে পাইলেও সে বুঝিতে পারিত না যে, শশধর চোখ বুজিয়া আলস্য উপভোগ করিতেছে না—নিজের জীবনের অতীত কাহিনীর একটি অধ্যায় সে সজীব মনের আড়ালে রাখিতেছে।

তারপর ওদিকে একটা ছুটাছুটি এবং দৌড়ধাপের শব্দ হইল এবং পরিসমাপ্তিতে শেষ শব্দ যাহা উচ্চতর আর তীক্ষ্ণতর হইয়া অবিরাম প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা ক্রন্দন—নকুলের স্ত্রী কাঁদতে লাগিল।

নকুলের বাড়ীটাই ইহাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী—ছোট একটি ভাঙা প'ড়ো বাড়ী এবং ছোট একটি প'ড়ো জায়গা মাত্র ব্যবধান। প্রফুল্ল বলিল, এবং সে কথা বলিল কান্না দমন করিয়া,—গেলে না যে ? কি ঘটলো তা বুঝতে পারলে ?

নকুলের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে দস্যুসমাগম হয় নাই, ইহা স্পষ্ট হইয়া গেছে।

শশধর বলিল,—হুঁ।

—তবু গেলে না যে ?

শশধর কথা কহিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল।

॥ বারো ॥

মানুষের ঘুমের আরাম ভাঙিয়া দিয়া রাত্রি একসময় প্রভাত হইল। তারপর হইল সূর্যোদয়। রাত্রি প্রভাত হওয়ায়, এবং তারপর সূর্যোদয়ে আর কিছু সুরাহা না হোক, সত্বরই জানা গেল যে, নকুল বিস্তর প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসবাস করে—'বিস্তর' এই জন্য যে, যে-জনতা তাহার গৃহের সম্মুখে সমবেত হইল তার অর্ধেক লোকসংখ্যায় একটা হাট দিব্যি চলে। অতএব বুঝা গেল, জানিতে কাহারো বাকী নাই যে, নকুলের অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা মৃণাল অপহৃতা এবং নকুল নিদারুণভাবে প্রহৃত হইয়াছে। নকুলের ভাঙা দরজার শূন্য স্থানটা লোকের চোখের জলে নয়, চোখের আলোকে ভরিয়া উঠিল...নকুলের তা চোখে পড়িল না, কিন্তু ব্যাপার তাই-ই।

ইহা গরজের সত্য নয়, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চিরকালের প্রমাণিত সত্য যে, মানুষমাত্রেই পরের আপদে-বিপদে অনুকম্পায় কাতর হইয়া পড়িবেই—সেটা ঈশ্বরদত্ত সহজ প্রবণতা। সুতরাং নকুলের ভাঙা হাড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল, অর্থাৎ নকুলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দু'টি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে জানা গেলে নরেশ্বর পাইন ডাক্তার ডাকিতে গেল...

তা ছাড়া সেই লোকারণ্য আরো সৎকার্য করিল ইহাই যে, এই পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া খুব মর্মাহত, স্তম্ভিত এবং বিধির বিধানে অসন্তুষ্ট হইল—পরদুঃখে

মুহ্যমান হইল যত, নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান এবং আকুল হইল তত ; এবং নকুলকে সাহায্য করিবার বা তার দুঃখমোচনের কোনো উপায় হাতের কাছে তখনই নাই দেখিয়া হতাশ হইল আরো তত, আরো ব্যাপকভাবে ; আর বাক্যব্যয় যে কত করিল তাহার ইয়ত্তাই নাই। মানুষের বুকের শব্দে আগে নকুলের বুক, তারপর তার বাড়ী এবং তারপর ক্রমশঃ যেন ব্রহ্মাণ্ডই পূর্ণ হইয়া গেল...সকলেই অধিকতর হাহাকার করিল এবং করাঘাতে ললাট ফাটাইতে উদ্যত হইল এইজন্য যে, এতবড় কাণ্ডটা ঘটিল—এত কাছে ঘটিল—কিন্তু ঘুম ভাঙিল না ! ইহাতে, অর্থাৎ নিজের নিদ্রার প্রগাঢ়তা কত মর্মে তাহা অনুভব করিয়া সকলেই বিস্ময়ে বিশেষ অবাক হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকেই নিজের অদৃষ্টকে প্রাণপণে আর চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া ধিক্কার দিয়া দিয়া পরের চোখের সম্মুখে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিলো... নকুলের পশ্চিমদিককার প্রতিবেশী ভাস্কর দত্তের ছ'মাস পূর্বে ডান কানে পুঁযে হইয়াছিল—পুঁযপূর্ণ কানের উপর তুলা চাপা দিয়া আর দু'কান প্যাঁচাইয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া তাহাকে দিন সাতেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তখন বাঁ কান আগাইয়া দিয়া তাহাকে মানুষের কথা ধরিতে হইত এই মিথ্যা কল্পনার বশে যে, ডান কানে শব্দ প্রবেশ করিতেছে না—সে অভ্যাসটি সে এখনো ছাড়িতে পারে নাই ; কাজেই নকুলের কথা কানে ঢুকাইতে নকুলের দিকে বাঁ কান আগাইয়া দিয়া সে জানিতে চাহিল, সমগ্র ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ঘটিয়াছিল ?

তিন স্থানে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নকুল ক্ষীণস্বরে জবাব দিলো, না, বিস্তর সোরগোল !

ভাস্কর সে ক্ষীণস্বর শুনিতে পাইল ; কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, বিস্তর ? কিছুই জানতে পারিনি।—বলিয়া পরম বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া সে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল।

তা সে থাক—তাহাতে তাহাদের কাহারো অনিষ্ট কিছু ঘটিবে না, এবং ইহাও ঠিক যে, এইরূপ সব আলোচনা আর জিজ্ঞাসাবাদেও অনিষ্ট কিছু ঘটিতে পারে না ; কিন্তু অনিষ্ট ঘটিতে পারে হঠাৎ সেইরূপই একটা উক্তি করিয়া বসিল উমা পণ্ডিত।

পাঠশালার পণ্ডিত এই উমা পণ্ডিত—নাবালকদের শিক্ষাগুরু সে। চিরকাল অপরিপক্কবুদ্ধি ছেলেগুলির সংশ্রবে থাকিয়া থাকিয়া সংগপ্রভাবে তাহারও বুদ্ধি যেন কাঁচিয়া আসিতেছে—পণ্ডিতের উক্তি যাহার যাহার কানে গেল তাহাদের সকলেরই মনে হইল তা-ই—তারা পণ্ডিতকে মনে করিল মূর্খ। ব্যাপার এই যে, গোলমালের মধ্যে পণ্ডিত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে জানিতে চাহিয়াছে, কারা তারা ?

শুনিয়া কয়েকজন না শুনিবার ভান করিল—জানা জবাবটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া না যায় ; কিন্তু ভুজংগ দাস পণ্ডিতকে ছাড়িল না ; বিশ্রী কর্কশকণ্ঠে আর রুষ্টচক্ষে তৎক্ষণাৎ সে বলিল,—মূর্খ কোথাকার ! জানতে চাইছ তারা কে ? তুমি স্ত্রী কন্যা অবলা নিয়ে বাস করো না ? শুনে তুমি করবে কি ? তাদের ধ'রে এনে ফাঁসি দেবে ? তোমার কি মাথা-খারাপ ? শুনিয়া উমা পণ্ডিত ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল—এবং ভুজংগ দাস চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে নিরাপদ স্থানে, অর্থাৎ নিজের বাড়ীর দাওয়ায়, যাইয়া উঠিল।

মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা বা পরামর্শ কিছু হইল কি না, হইলে তার স্বরূপ কি ইত্যাদি বিবরণ দিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই ; এবং নির্বান্ধব সংসারে সে বাস করে এই ধারণা নকুলের মনে জন্মিল কি না, তাহাও উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন শশধরকে দিয়া—তার বাড়ীতে যা ঘটিল তা আর এক রকম, এবং তা-ও নিদারুণ সন্দেহ নাই।

## ॥ তেরো ॥

গৃহলক্ষ্মীর প্রাতঃকালীন কর্তব্য, দ্রুতগতিতে ঘর-দুয়ারে বাসি কাজ সারিয়া ফেলা, তারপর অন্যান্য কাজ, যাই থাক চলিতে থাকে। প্রফুল্লও প্রতিদিন তা-ই করে। কিন্তু সে-দিন দেখা গেল, প্রফুল্ল আদৌ কাজে হাত দেয় নাই, পরিচ্ছন্নতা আর প্রসন্নতা লইয়াই সে দিনের গৃহকর্মে রত হয়, কিন্তু আজ পরিবারের কল্যাণের দিকে আদৌ তার লক্ষ্য নাই—যেন নড়িয়া বসিবার সাধ্য নাই, এমনি অসুস্থ নির্জীবের মত সে একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে···তার চোখের পাতায় গাঢ় ছায়া—কোনো দিকেই তার দৃষ্টি নাই—ছেলেটিকে পর্যন্ত সে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। ওদিকে, বিপন্ন এবং অপদস্থ প্রতিবেশীর তল্লাস লইবার উদ্দেশ্যে শশধর মুখ ধুইয়াই বাহির হইয়াছিল—উহা কর্তব্য; কিন্তু সটান যাইয়া সেখানে উঠিতে পারে নাই। খানিক অন্যদিকে বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া শিহরিত কলেবর আর কলরবমগ্ন জনতার একপাশে যাইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইল।···জনতা তখন বারো আনাই অনুপস্থিত—চার আনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আতঙ্ক, কোলাহল, সান্ত্বনা, বিশ্বাস, সতর্কতা ইত্যাদি ভাব-বৈচিত্র্যের জের টানিয়া চলিয়াছে।...“এই যে, শশধরবাবু! কিছু টের পাননি?” কে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিল, বোধহয় হঠাৎ আগত হৃদকম্প আর হতবুদ্ধিতাবশতঃই শশধর তাহা জানিতে পারিল না, কিন্তু সম্বিতে অনুভব করিতে তার বাকি রহিল না যে, সে টের পাইলে এই সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটিতে কিছুতেই দিত না, প্রশ্নকর্তার তা-ই আশা। শশধরের কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। নিরুত্তর থাকিতে সে পারিল না, নিরুদ্দেশেই সে বলিল, কিছুই টের পাইনি।...বলিয়াই তার মনে হইল, তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই; তাহার দেহের গৌরব মিথ্যা, আর সে ভণ্ড, অকর্মণ্য—এই ইংগিত করিয়া সকলেই যেন হাসিতেছে!

কেহই হাসে নাই—নিজের কথাতেই সকলেই মত্ত, যাইবার জন্য ব্যস্ত; যাহার প্রশ্নের এবং যাহাদের নীরব উৎসুক্যের জবাব সে দিয়াছে তাহাদেরই কানে কথা প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ···কিন্তু বিখ্যাত হইবার কষ্ট শশধর অনুভব করিল এই প্রথম। শশধর পলায়ন করিল—মনে মনে গা-ঢাকা দিয়াই সে অধোমুখে পলায়ন করিল।

এই একটি প্রশ্নের সূত্রেই তারপর শশধরের একটু রাগ হইল···আশেপাশে অনেকেই ত' ছিল! অনেকে একত্র হইয়া দাঁড়াইলে একটা শক্তি পুঞ্জীভূত আর দুর্বার হইয়া ওঠে, এ কথাটা ওদের কেউ যেন জানে না। কেবল তার উপর নির্ভর করার কি মানে হয়?

## ॥ চৌদ্দ ॥

শশধর পলায়ন করিয়া বাঁচিল নয়, তখনকার মত নিজেকে চাপা দিলো, কিন্তু তার দুর্গতি চরমে উঠিল বাড়ীতে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল প্রফুল্লকে; এবং তাহাকে অমন করিয়া অসুস্থের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে শঙ্কিত হইল খুব—স্নেহভরে জানিতে চাহিল, ব'সে রয়েছ যে অমন ক'রে? শরীর খারাপ হয়েছে?

—না।—বলিয়া প্রফুল্ল শশধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, দৃষ্টিকে যেন তার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, যেমন বিদ্যুৎ হঠাৎ অসতর্ক চোখের উপর অতর্কিতে তীক্ষ্ণভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তেম্‌নি করিয়া।

শশধর অগ্রসর হইতেছিল স্ত্রীর শারীরিক কুশল জানিবার ব্যগ্রতায়—বাধা পাইয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।...শশধরের মনে পাপ ছিল—দৃষ্টির অর্থটা সে বুঝিল। নকুলের

বাড়ীর সম্মুখবর্তী জনতার ভিতর হইতে যে প্রশ্নটি এক ব্যক্তি তুলিয়াছিলেন, সে প্রশ্নটি দ্বিগুণ সজীব আর প্রফুল্লের দৃষ্টির আগুনে জ্বালাময় হইয়া উঠিল যেন...শশধর ভারি কুণ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু এবার পলায়নের পথ নাই। বুক কাঁপিয়া তার মনে হইতে লাগিল, কি আসিতেছে ওদিক হইতে। আসিল বাক্য—প্রফুল্ল বলিল, তুমি এমন কাপুরুষ তা জানতাম না। আমি তোমার লজ্জায় তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে।

অপরাধের ক্ষয় বা ক্ষালন কিছুই হইতেছে না জানিয়াও শশধর নিজেকে সমর্থন করিল; বলিল, তুমি অবুঝের মত কথা বলছ। আমি কিছুই করতে পারতাম না।

—ঐ দেহ সত্ত্বেও? ভয় পেয়েছিলে তুমি কিসের? প্রাণের?...শশধর অনুভব করিল, প্রফুল্ল যেন বলিতে চায়, ঐ প্রাণের কোনো মূল্যই নাই। শশধর বলিল, প্রাণের ভয় সকলের বড় ভয়। সকল ভয়ের গোড়াকার ভয়, আর তা সবারই আছে।...নকুলের বাড়ীতে শব্দ নাই—ওরা কাঁদিতে পারিতেছে না—ওদের জাত গেছে।...মেয়েটি এতক্ষণ...প্রফুল্ল আর ভাবিতে পারিল না, ছট্‌ফট্ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, সর্বনাশের জন্যে দায়ী তুমি—তুমি পাপী। তুমি যে যাওনি এ অন্যায়টা আমি কিছুতেই কোনো কৈফতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিনে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার। কেন গেলে না?

—জীবন বিপন্ন ক'রেও লাভ কিছু হ'ত না।

—হ'ত। লাভ এত হ'ত যে, তা কল্পনা করবার সাধ্যই তোমার নেই—থাকলে যেতে।

শশধরের পুরুষত্ব দণ্ডিত হইতেছে, হউক; স্বীকার না হয় করাই গেল, সে কাপুরুষ এবং দোষী; কিন্তু তার কি বুদ্ধিও নাই? শশধর এবার ভ্রূভঙ্গী করিল, নির্বুদ্ধিতার অপবাদের প্রতিবাদ সে করিবেই; বলিল, কি লাভটা হ'ত শুনি? আমিই না হয় বুঝিনে; বুঝিয়ে দাও।

—একটি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বাঁচাতে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছ, অর্থাৎ ধর্মপালন করেছ, এই গৌরবই হ'ত পরম লাভ। লাভ হ'ত তোমার, আমার, আমাদের এই ছেলেটির, আর মানুষের।...অনুক্রমগত এই লাভবানের তালিকার মর্ম শশধর ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, অবিবেচকের মত বিপদ ঘাড়ে নেয়ার কোনো মূল্য নেই।

—অবিবেচকের মত? ভীরু আর দুর্বলই বিবেচক সেজে ব'সে থাকে, আর সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে।...মানুষ যে এখন তোমায় আঙুল তুলে দেখাবে তা বিবেচনা করতে পারো? আগে নমস্কার করত বীর ব'লে, এখন দেখাবে কাপুরুষ ব'লে।

এ বড় কঠিন সম্ভাবনা—শশধর বাঁচিয়া আছে ঐ রসেই ডুবিয়া; কিন্তু মুখে খাটো হওয়া এখন চলিবে না। যেন নির্ভয়ে সত্য কথা উচ্চারণ করিতে তার মত সক্ষম ব্যক্তি আর কেহই নাই, এম্‌নি একটা বিশাল আর গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া শশধর মিথ্যা কথা বলিল; বলিল, গ্রাহ্য করিনে।

শুনিয়া প্রফুল্লের চোখে হঠাৎ জল আসিতে চাহিল, কিন্তু জল আসিতে সে দিলো না; সূচ্যগ্রের মত অত্যন্ত সূক্ষ্ম শাণিত একটু হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটাইয়া সে বলিল,—আমাকে গ্রাহ্য করো ত'? আমিও তা-ই বলছি তোমাকে।...মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গা-গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ! অমন নড়া ভুতেরও নড়ে, জানোয়ারেরও নড়ে—সম্ভ্রমবোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়—তা তোমার নেই, আর তোমার জন্যেই মানুষের তা নষ্ট হয়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছিনে।

শশধর কেন নারী অপহরণকারীকে বাধা দিতে দৌড়ায় নাই তার কারণ আছে, কিন্তু

সে কারণটি প্রফুল্ল জানে না ; প্রফুল্লর তার বিরুদ্ধে যত কিছু অভিযোগ, আর সাধারণ নীতি সম্বন্ধীয় তার যাবতীয় উক্তি ও মন্তব্য শশধর সর্বান্তঃকরণে স্বীকারই করে, প্রকাশ না করিলেও স্বীকৃতি তার জীবনের উপলব্ধিতেই আছে ; তথাপি ধিক্কারে ব্যথিত হইয়া শশধরের মনে হইল, যে ব্যক্তির অক্ষত দেহ বজায় থাকার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষাই নারীর ত্রাণের আর সীমন্তের আর'মর্মের একমাত্র কথা, অর্থাৎ অবলম্বন, সেই প্রিয়তম ব্যক্তি কেন প্রাণ দিতে দৌড়ায় নাই, প্রাণটি হাতে করিয়া লইয়া যাইয়া উৎসর্গ করে নাই, কেবল তাহাই জানিতে চাহিয়া এত কথার সৃষ্টি যে-স্ত্রী করে এবং মেজাজের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করিতে চায় তাহার মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং প্রীতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে হতাশ হইতেই হইবে। প্রফুল্ল কেন বলিতেছে না : যাও নাই ভালই করিয়াছ ; দুর্বৃত্তগণের সংগে মারামারি করিয়া তোমার কি ঘটিত বলা যায় না।...শশধরের আরো মনে হইল, দৃষ্টিটাকে আরো গভীর স্থানে প্রেরণ করিলে হয়তো ইহাই চোখে পড়িবে যে, স্ত্রীর মনে পূর্ব হইতেই বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল। সুতরাং শশধর ক্রোধ প্রকাশ করিল ; বলিল, আমি তোমার মত বিদ্যেসাগর নই।

—তা জানতে বাকি নেই। কিন্তু গায়ের জোরের অহঙ্কার ত' আছে!...ছেলেরা আসে—তাদের কাছে নিজের কৃতিত্বের পসার করতে ঢের শুনেছি। শক্তির উপকারিতার আর বলহীনতার অসুবিধা আর কষ্টের কথাও বলেছ অনেক—শক্তিহীন আর মৃত দুই প্রায় একই রকম অকেজো বস্তু, এ-ও বলেছ। শক্তির প্রধান ব্যবহার আর্তরক্ষায়, তা-ও তোমার মুখে শুনেছি। কিন্তু সবই তোমার শূন্য ঢেঁকির আওয়াজ। যখন চরম বিপদ আর আর্তরক্ষার সময় এলো তখন তুমি রইলে শুয়ে ; কারণ, তখন মুখের আস্ফালন কাজে লাগবে না।...তোমার তরুণ ভক্তেরা তোমায় কি মনে করবে এখন ? তাদের সামনে মুখ তুলতে পারবে ?...এ তোমার সাময়িক ভীরুতা নয়, তোমার মজ্জাগত চিরদিনের ভীরুতা। তোমার কোনো মূল্য নেই।

অসহ্য সত্য উক্তি ইহা। শশধর বসিয়া পড়িল ; কাতর কণ্ঠে বলিল,—পাগল !

—পাগল তুমি ক'রে তুলেছ।...মানুষের সাধারণ স্বধর্ম আর প্রাথমিক প্রবৃত্তির অভাব যার আছে তার স্ত্রী হ'য়ে নিজেকে ভারি অসহায় মনে করছি আমি। অমন অবস্থাতে আমাকেও ফেলে তুমি পালাতে এবং পালাবে। আমি শিউরে অবশ হ'য়ে গেছি —আমার বড় ভয় করছে।—বলিয়া প্রফুল্ল চোখ বুজিল। ভীতির কারণ এই সংসারকে সে যেন দৃষ্টি এবং স্পর্শের সম্পর্কের বাহিরে রাখিতে চায়। ..শশধর কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—অমন অবস্থাতে স্ত্রীকে ফেলিয়া সে পলায়ন করিত কি না তাহা যেন অনুমান করিতে পারিতেছে, কিন্তু অনুভব করিতে গেলে অসহনীয় অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।

সে ছাড়া আর কেউ জানে না যে, ভূতের ভয় যেমন তার আছে, গাড়ীর চাকার দিকে তাকাইতে যেমন তার ভয় করে, তেমনি আছে তার লাঠির ভয়, অব্যর্থ। গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে আসিতে হইলে সে চোখ বুজিয়া বাহির হয়—চলন্ত গাড়ীর দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর লাঠি যখন দুরাচার আর রক্তপিপাসু হইয়া ছুটিয়া আসে তাহার সম্মুখে সে যাইতে পারে না—সে সাহস তার নাই। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত বৃষকে আর জ্বলন্ত অগ্নিকে সে যুদ্ধ দান করিতে পারে।

অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যেই শশধর মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—লাঠির ভয় তার ঘুচিয়াছে। বলিল, না, পালাবো না। আমার ভয় গেছে।

অপ্রকাশিত নাটক

# নিষেধের পটভূমিকায়

এই নাটকটি জগদীশ গুপ্তের 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন লেখক স্বয়ং। কিন্তু এ-পর্যন্ত নাটকটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি, 'রচনাবলী'তেই প্রথম মুদ্রিত হলো।—সম্পাদক।

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ গৃহস্থের অনভিজ্ঞাত অর্থাৎ সাধারণ গৃহ ; বাসের ঘর দুখানা টিনের ; রান্নাঘর খড়ের, উঠানে তুলসীমঞ্চ ; ফুলের গাছ কয়েকটা ; কাপড় শুকাইতে দিবার তার ; দুটি খুঁটির সংগে দড়ি বাঁধা—ছাড়া কাপড় আর গামছা ঝুলিতেছে ; একখানা বাসের ঘরের বারান্দায় দুটি লণ্ঠন, একটা ল্যাম্প, কেরোসিন তেলের বোতল এক পাশে, অন্য দিকে পূজার বাসন কয়েকটা উপুড় করা ; দ্বিতীয় বাসের ঘরের বারান্দায় একটা পিতলের ঘড়া, এক বালতি জল, তার পাশে পিতলের ঘটি ইত্যাদি। গৃহকর্তা কালিকা টিনের চেয়ারে বসিয়া আছেন ; সিঁড়ির এক ধাপে বসিয়া আরেক ধাপে পা দিয়া গৃহিণী ত্রিগুণা-সুন্দরী বসিয়া আছেন। ]

কালিকা। মেয়েটাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া অন্যায় হয়েছে···

ত্রিগুণা। ( ভ্রূভংগীপূর্বক )—অন্যায় আমি করেছি, না ? ইস্কুলে সে যাক, কিন্তু আমি তা পারব না, তোমাদের যেতে হবে।

কালিকা। কোথায় ?

ত্রিগুণা। ইস্কুলে তাকে দিয়ে আসতে হবে, ইস্কুল থেকে তাকে নিয়ে আসতে হবে···

কালিকা। তার মানে ?

ত্রিগুণা। তার মানে, মেয়ের বয়স হ'লো তেরো, কত বদ ছেলে বেড়ায়, কেউ যদি ফুসলে নেয় !

কালিকা। ছি, ছি !

ত্রিগুণা। ছি, ছি নয় ; ঘট্‌ছে না এমনধারা কত শত ?

কালিকা। কিন্তু ওর সমবয়সীরা ত যায় আসে ! কিছুই ঘটছে না !

ত্রিগুণা। ঘটে কি রোজ ? ঘটতে কতক্ষণ ! যদি ঘ'টে যায় তখন কি করবে ? গলায় দড়ি দিতে হবে যে···

কালিকা। তোমার বড় সন্দেহ-বাই···

ত্রিগুণা। সন্দেহ বাই নয়, সাবধানে আছি, সাবধানে রেখেছি ··

[ উহাদের মেয়ে, ত্রয়োদশবর্ষীয়া অভয়া ওরফে জ্যোৎস্না হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে ঢুকিয়া ওঁদের সামনে আসিল। ]

ত্রিগুণা। ( সবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে ) এই যে আর টোস্‌কা মেরে বেড়াসনি লা, ডানা গুটিয়ে বোস্‌ একটু দেখি, দেখি আমি দু'চক্ষু ভরে দেখতে তোকে কেমন লাগে··· [ অভয়া অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল —বালিকার মুখ বিষণ্ণ হইল ]

অভয়া। সইদের বাড়ী গিয়েছিলাম, মা।

ত্রিগুণা। তোমার সইয়েদের কথা আমায় শুনিও না বেশি। বেণী দুলিয়ে বেড়াক তারা পথে-ঘাটে, হোক একটা কেলেঙ্কারী ; আমার তাতে কি ! মুখ গোমরা করলে হবে কি ! দেখছ না নিজের দিকে চেয়ে ! [ বলিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেলেন। কালিকা মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; আস্তে আস্তে বলিলেন,— ]

কালিকা। বারণ করে, তবু যাস কেন, মা ?

জ্যোৎস্না। ভুলে যাই, বাবা।

কালিকা। তা সম্ভব ; কুকথা মনে রাখার বয়স এখনো আসে নি।

জ্যোৎস্না। লতা, ঊষা, শশী, নিশি, এ-রা ত' ইস্কুলেও যায়, এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়াতেও যায়।

কালিকা। তাদের বাবা-মায়ের অনুমতি আছে তারা যায় ··

জ্যোৎস্না। তুমিও কি বারণ করো বাবা ?

[ কালিকা কথা কহিলেন না—বাহির হইতে কে ডাকিল ; তিনি উঠিয়া গেলেন—এবং তখনই আসিল পারুল আর শশী ; জ্যোৎস্নার সমবয়সী তারা—আসিয়াই জ্যোৎস্নাকে সম্মুখে পাইয়া পারুল কলস্বরে বলিতে লাগিল,— ]

পারুল। জ্যোছ্‌না ভাই, তোর নেমন্তন্ন রইল ; আমরা বনভোজন করব।

[ দৃষ্টিতে অপার বেদনা ফুটিয়া জ্যোৎস্নার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল—সে জানে, এ আহ্বান একেবারে বৃথা। ওদিকে রান্নাঘরের দরজা নড়িয়া শিকলের শব্দ হইতেই পারুল মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ত্রিগুণা চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাঁর চোখে ক্রোধাগ্নি। পারুল কিন্তু হাসিমুখেই বলিল,— ] মাসিমা, আমাদের বনভোজন হবে ; জ্যোছ্‌নার নেমন্তন্ন রইল, আর, চারটি চাল দাও···[ ত্রিগুণা পারুলের দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া ক্রোধে মিনিটখানেক বাক্যহারা হইয়া রহিলেন ; তারপর বলিতে লাগিলেন— ]

ত্রিগুণা। শুনে গা জুড়িয়ে গেল। শরম হারার মাথা খেয়ে তোমরা পথে পথে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াও, বনভোজন করো, খ্যাম্‌টা নাচন নাচো, তা আমি দেখতে যাবো না ; আমার মেয়েকে তোমাদের বেহায়াপনার সাথী করতে কেন এসেছ শুনি ? সে যাবে না।

শশী। বনভোজন হবে আমাদের পাশের বাড়ীতে ; ভাড়াটেরা উঠে গেছে। সেই বাড়ীতে। পথে পথে আমরা বেড়াব কেন, মাসিমা ? খেম্‌টা—

ত্রিগুণা। এই যে এলে এতখানি পথ বেয়ে, ও-বাড়ী থেকে এ-বাড়ী, সে কি শূন্যপথে, না, হেঁটে ? বাপ-মায়ের আক্কেলের বলিহারি যাই ! বেটাছেলের সংগে পথে চোখা-চোখি হয় না ? তোমরা যাও বাপু এখন ; তোমাদের সংগে আমি বকতে পারিনে।

পারুল। যাই, মাসিমা। ঝি যদি ওকে সংগে ক'রে নিয়ে যেতে আসে তবু যেতে দেবে না ?

ত্রিগুণা। না। [ বলিয়া ত্রিগুণা চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে পারুলদের প্রস্থানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন···অভয়ার চোখে জল আসিল—ত্রিগুণা তাহাকে বলিলেন,— ] হই-হই ক'রে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে তোমায় আমি দেবো না। তোমার বয়েসের যে গাছ-পাথর নেই।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ পরদিন সকাল,—অভয়া বাপের কাছে পড়ে—পরদিন পড়া শেষ হইবার পর অভয়া বৈঠকখানায় হইতে আসিয়া শয়নগৃহে গেল···এবং সে বাহির হইতেছে না দেখিয়া ত্রিগুণা পা টিপিয়া টিপিয়া সেইভাবেই আসিলেন—দেখিলেন, অভয়া জানালায় দাঁড়াইয়া আছে ; সে জানালায় দাঁড়াইলে রাস্তা এবং আকাশ আর পাশের বাড়ীর বাগান, এই তিনই দেখা যায়···অভয়া মায়ের আগমন টের পাইল না ; হঠাৎ চুলে প্রবল টান পড়িতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিয়া দেখিল মা—যেন রাক্ষসীমূর্তিতে গ্রাস করিতে উদ্যত···চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ত্রিগুণা তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,— ]

ত্রিগুণা। হারামজাদি, কুলে কালি দিবি তুই ! কি হচ্ছিল ওখানে দাঁড়িয়ে ?

অভয়া। অম্‌নি দাঁড়িয়ে ছিলাম, মা। দোতালার বাড়ীর ছাদে পায়রা ওড়া দেখ্‌ছিলাম।

ত্রিগুণা। ছোঁড়াটা তোর পানে চেয়ে হেসে হাত নেড়ে গেল কেন ?

[ বলিতে বলিতে ত্রিগুণা মেয়ের পিঠে চটাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলেন ··সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া কালিকা বৈঠকখানার ভিতর-দরজায় দেখা দিলেন। ]

অভয়া। কই, আমি ত' দেখিনি, মা।

ত্রিগুণা। তবে আমি মা হ'য়ে তোর নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছি, এ-ই তুই বলতে চাস ? দূর হ, দূর হ। [বলিয়া ত্রিগুণা অভয়াকে পায়ের ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন—অভয়া বসিয়া পড়িল—ত্রিগুণা বলিতে লাগিলেন,— ] ও মিন্‌সে যদি মানুষ হ'ত তবে এ-র বিহিত করত সে ! [ কালিকা উঠানে নামিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন...ত্রিগুণা বলিতে লাগিলেন,— ] আমি আর পারিনে ; তুই মর্‌ কি আমি মরি। তুই না হয়ে পাঁচ মাসের সে-ছেলেটা থাকলে আমাকে···

কালিকা। কি, হ'ল কি ? [ জিজ্ঞাসা করিয়া কালিকা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অভয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,— ]

অভয়া। আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম—মা তাই মেরেছে।

ত্রিগুণা। নালিশ করা হচ্ছে ! কিন্তু ও'র কিচ্ছু ক্ষমতা নেই। ও'কে আমিই চালিয়ে নিয়ে এসেছি চিরকাল।

কালিকা। আমি তখন যথেষ্ট বড়ো হয়েছিলাম। কিন্তু ও ছোট। ও-র অনিষ্ট হচ্ছে ! দশ বছরের না হতেই তুমি শাসন শুরু করেছ—ও-র মন অবশ পিণ্ডাকার হয়ে উঠছে। এমন অস্বাভাবিক আবহাওয়া···

ত্রিগুণা। বক্তৃতা তুমি থামাও। তোমারই যদি সব দায়িত্ব আর দরদ তবে ভালোমন্দের ভাগ আমাকে দিতে চেয়েছ কেন ?

কালিকা। তোমার সবই অতিরিক্ত ; আমাকে তুমি চুপ করিয়ে ছেড়েছ।

[ বলিয়া কালিকা চলিয়া গেলেন। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ অপরাহ্ন—ত্রিগুণার বাড়ীতে দু'জন প্রতিবেশিনী বেড়াইতে আসিয়াছে—বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া তাহাদের বসিতে দেওয়া হইয়াছে··ত্রিগুণা তাদের সন্নিকটেই আছেন—জ্যোৎস্না ( অথবা অভয়া ) অদূরে দাঁড়াইয়া আছে··· ঠিকা ঝি উঠান ঝাঁট দিতে দিতে উঠানের মধ্যস্থলে ঝাঁটা হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ও'দের কথাবার্তা শুনিতেছে··· ]

ত্রিগুণা। ( অভয়ার প্রতি ) দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ? পান দে। তুমি বুঝি দোক্তা খাও ?

১ম প্রতিবেশিনী। খেতাম, ছেড়ে দিয়েছি। বার দুই হাঁপানির মত হতেই উনি বললেন, ওটা ছাড়ো···( হাসিল )।

ত্রিগুণা। ( অভয়ার প্রতি ) কই, গেলিনে ?

অভয়া। যাই। ( গেল )।

২য় প্রতিবেশিনী। দু'মাস ছিলাম না এখানে—দু'মাসেই কত বড়টা হয়ে উঠেছে মেয়ে !

ত্রিগুণা। হ্যাঁ, অবাক করে' দিচ্ছে··মিনিটে মিনিটে বাড়ছে যেন।

১ম প্রতিবেশিনী। বিয়ের কথা দু'এক জায়গায় চলছে বোধ হয় !

ত্রিগুণা। কিছু না, সে কথার নামই নেই। বলব কি, দিদি, নিজের ঘরে পরের মতো প'ড়ে আছি। যাঁর মেয়ে তিনি একেবারে মৌনী মোহান্ত—না-আছে ভালোমন্দ বিবেচনা, না-আছে কোনো-কিছুর মন্দ বিবেচনা, না-আছে কোনো-কিছুর দিকে নজর—কেঁদে কিছু করতে পারিনে—রেগে কিছু করতে পারিনে···

২য় প্রতিবেশিনী। অতবড় মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বুক শুকিয়ে ওঠে না, এমন মানুষও ত' বেজায় মানুষ।···কি বলে ?

ত্রিগুণা। বলে, ছেলে খুঁজছি। হয় মিছে কথা বলে, না-হয় মনে মনে খুঁজছে। ( হাসিল )।

ঝি। নিশ্চয়। দত্তদের হাসির বিয়ের কথা নিয়ে তার বাপ-মায়ে তোলপাড় লেগে গেছে—ছেলে খুঁজছে তা বোঝা যাচ্ছে ; কিন্তু এ-ঘরে রা-টি নেই। দু'বেলা আসি—বিয়ের কথা শুনিনে কারো মুখে !

ত্রিগুণা। কথা কইব কার সংগে ! বাইরে ত' আমি যেতে পারিনে যে ছেলের কথা কুড়িয়ে আনব। সময়মতো একখানা চিঠি লেখাতে পারিনে মেয়ের বাবাকে দিয়ে। সে কাজও আমারই। চিঠি লিখেছি কতজনের কাছে তার ইয়ত্তা আছে !—ভগ্নিপতি শ্রীধর থেকে মামার বেয়াইকে পর্যন্ত। তারা লিখছে, দেখছি, সবুর। ( হতাশার সুরে ) আছি সবুর স'য়ে··· [ অভয়া পান সাজিয়া আনিয়া ও'দের সামনে দিয়া সকলের পিছনে যাইয়া চুপটি করিয়া বসিল। ]

২য় প্রতিবেশিনী। ছেলেরাও আজকাল দেখছি নারাজ বেজায় ; বিয়ে করতে চায় না।

ত্রিগুণা। বজ্জাত ছোঁড়ারা। হারামজাদারা বিয়ে করতে চায় না, এদিকে দেখগে, পরের ঘরের মেয়ের ওপর চোখ ফেলে' বেড়াচ্ছ কত যে তার ঠিক নেই। কেলেঙ্কারীর ভয়েই ত আমি আরো অস্থির। [ ঝি, দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিল ; বলিল,—]

ঝি। কেলেঙ্কারীর কথা ব'লো না, মা, ব'লো না ; হয়েছে এক কেলেংকারী ও পাড়াতে —মেয়েটাকে পড়াত—

[ ত্রিগুণা একবার মেয়ের দিকে চট্ করিয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

ত্রিগুণা। তুমি থামো, ঝি। না বুঝেসুঝে যা-তা ব'লো না।

ঝি। সত্যি কথাই বলছিলাম, মা! বলিয়া ঝি আপন কাজ করিতে লাগল ]

বৈষ্ণবী। হরেকৃষ্ণ। দুটি ভিক্ষে, মা। [ বলিয়া পিতলের ঘটি হাতে এবং ফরসা কাপড় পরা শৌখিন ধরণের বৈষ্ণবী আসিয়া ওঁদের কাছেই দাঁড়াইল…… ]

ত্রিগুণা। তোমাদেরও বলা রইল, দিদি। আমাদের গুষ্টিগোত্তর ত' জানোই। চেনা-শোনার মধ্যে খোঁজ পেলেই জানিও…

১ম প্রতিবেশিনী। তা দেখব ; কিন্তু এই দেখো, মনে হচ্ছে বলি, সবুর।

[ বলিয়া হাসিল—ত্রিগুণা প্রভৃতিও হাসিলেন। ]

বৈষ্ণবী। এই মেয়ের বিয়ের কথা হ'চ্ছে বুঝি! বেশ ডাগর হয়েছে ত'! এতদিন…

২য় প্রতিবেশিনী। তোমার ত' সে-কথায় কোনো কাজ নেই, বাপু ; সে ভাবনা আমাদের।

ত্রিগুণা। ভিক্ষে পেলে না গো।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ সন্ধ্যার পর। কালিকা মেয়ে অভয়াকে পড়াইতে বসিয়াছেন। তাঁর ডানদিকে আলো জ্বলিতেছে। টেবিলের দু'দিকে দু'খানা চেয়ারে সামনাসামনি হইয়া পিতাপুত্রী বসিয়া আছেন… কালিকা আঁক কষিতে দিয়াছেন ; অভয়া নতমস্তকে খাতার দিকে চোখ রাখিয়াছে—কালিকা পাটিগণিত সামনে উপুড় করিয়া রাখিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া আছেন ; অভয়ার সামনের খাতার উপর তার চোখের জল এক ফোঁটা টপ্ করিয়া পড়িতেই কালিকা তাড়াতাড়ি সেদিকে চোখ ফিরাইয়া বলিলেন—]

কালিকা। কাঁদছিস, অভয়া? [ অভয়া ফোঁপাইয়া উঠিল—মুখ তুলিল না। ] কাঁদছিস কেন বল্। কি হয়েছে তোর?

[ অভয়া অশ্রুসংবরণ করিল, কিন্তু মুখ তুলিল না ; বলিল,—]

অভয়া। মা আমাকে বড় কাঁদাচ্ছে বাবা।

কালিকা। আমাকেও কাঁদিয়েছেন চিরকাল, তাঁর শাসনে আমি বাড়ীতে টিকতে পারিনি…

[অভয়া মুখ তুলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল—কালিকা বলিতে লাগিলেন,—]

কালিকা। তুমি দেখছ, তোমার মায়ের সংগে আমার কথা প্রায় বন্ধ ; কিন্তু একদিনে তা হয়নি। অপ্রিয় কথা, স্বার্থপরের মতো আমাকে কেবল পয়সা আনার যন্ত্র মনে করা, আর তাঁর দরদের অভাব আমি কত সহ্য করেছি তা জানো না ; কিন্তু এখন আমি পুতুলের মতো হয়ে আছি—কিছুতেই অনিচ্ছা আপত্তি নেই ; একটা অসাড়তার মাঝে প'ড়ে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।…কি বলেছেন তিনি তোমাকে?

অভয়া। আমি খুব বড় হয়ে উঠেছি ; এখনই বিয়ে না দিলে কেলেংকারী ক'রে বসতে আমি পারি। আমি তোমাদের সব শান্তি হরণ করেছি, বাবা।

কালিকা। তাঁর করেছ, আমার করোনি।

অভয়া। আমার ইচ্ছে হয়, ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই—মায়ের সামনে থাকতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছি ব'লে…আমাকে শীগ্গিরই বিদায় করো, বাবা।

কালিকা। আমারও তাই ইচ্ছে হ'ত, ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই…

অভয়া। তুমি পালাতে পারতে, কিন্তু তুমি জ্ঞানী বলেই পালাওনি তা এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে ক্ষমা করো, বাবা...

কালিকা। কেন?

অভয়া। মায়ের সঙ্গে তোমার বনিবনাও নেই দেখে তোমাকেই আমি মনে মনে অপরাধী করতাম।

কালিকা। তুমি অস্বাভাবিক ধারণা কিছু করনি। তোমার মায়ের আমাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা দেখলে তা-ই মনে হয়। কিন্তু তোমাকে স'য়ে থাকতে হবে আরো কতদিন তা' জানিনে……

অভয়া। পৃথিবীতে কত আনন্দ কত উৎসব! কিন্তু আমি একেবারে বঞ্চিত। শুকিয়ে মলাম আমি। [ অভয়া মাথা নত করিল। কালিকা প্রগাঢ় বেদনায় নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। ]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ ছ'-সাত মাস পরের কথা। কালিকা পোষ্টকার্ডের একখানা চিঠি লইয়া ত্রিগুণার সম্মুখীন হইলেন—ত্রিগুণা চটের ওপর কাপড়ের পাড়ের সুতা দিয়া ফুল প্রস্তুত করিয়া আসন তৈরি করিতেছিলেন—অভয়া সেখানে বসিয়া বিবিধ বর্ণের পাড়ের ভিতর হইতে টানিয়া টানিয়া সুতা বাহির করিতেছিল…কালিকা বলিলেন,— ]

কালিকা। শ্রীধরবাবু চিঠি লিখেছেন।

ত্রিগুণা। বহুদিন পর। কি লিখেছে?

কালিকা। ছেলে আছে…

ত্রিগুণা। থাকবেই ত'! ছেলে মেলে না আজকাল, এ-কথা কেবল তোমার মুখেই শুনি; অথচ ঢোলের বাজনা শুনে মনে হয়, এখানেই মাসে দশটা ক'রে বিয়ে হচ্ছে। ছেলে কোথায়?

কালিকা। কাছেই। ই বি. আর-এর বিনোদপুর ষ্টেশন থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে। ছেলের পিসে শ্রীধরের পরিচিত তারই মারফৎ সে খবর পেয়েছে।

ত্রিগুণা। পড়োই না চিঠিখানা! আমি না হয় তোমার দু'চক্ষের বিষ, মেয়ে ত' নয়।

[ কালিকা একটু হাসিলেন; পড়িতে লাগিলেন,— ]

কালিকা। "শ্রীচরণেষু দিদি, আপনার চারখানা পত্রই পাইয়াছি; কিন্তু সময়াভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে নাই। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শ্রীমতী অভয়ার জন্য একটি সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ছেলের নাম বসন্ত; মা আছে, বাপ নাই; দু'ভাই; বসন্ত ছোট। বসন্তের দাদা হেমন্ত বিদেশে চাকরি করিতেছে—সত্তর টাকা মাহিনা পায়; উন্নতির আশা যথেষ্ট আছে। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র খুবই ভালো। দু' ভায়ে সদ্ভাব আছে। অবিবাহিতা ভগিনী একটি আছে। ই. বি. আর-এর বিনোদপুর স্টেশনের সিকি মাইল দক্ষিণে উলট-গ্রামে ইহাদের বাড়ী। শ্রীযুক্ত দাদাকে একটু গা তুলিতে বলিবেন—তিনি যেন দেখাসাক্ষাৎ করিয়া যথাকর্তব্য এবং সুব্যবস্থা করেন। কুশলে আছি। প্রণাম গ্রহণ করুন। শ্রীচরণে নিবেদন ই—"

ত্রিগুণা। আচ্ছা, হয়েছে। সেখানে আমি যাবো, না, তুমি যাবে ?

[ কালিকা একটু হাসিলেন ; অভয়াও হাসিল। কালিকা বলিলেন,— ]

কালিকা। আমিই যাবো ।

ত্রিগুণা। যদি বিয়ে হয়, তুমি যদি দেও, তবে টাকা ত' লাগবে !

কালিকা। তাতে সন্দেহ নেই।

ত্রিগুণা। টাকা আছে ?

কালিকা। না।

ত্রিগুণা। আছে, আমার কাছে কিছু আছে। টাকা তখন কেড়ে কেড়ে নিতাম, বাজে খরচ করতে দিতাম না, তখন তোমার রাগ হ'ত। সে-টাকায় আমার শ্রাদ্ধ নয়, এই বিয়ের খরচ কতক হবে।

কালিকা। ভালোই। [ বলিয়া কালিকা প্রস্থোনোদ্যত হইলেন। ]

ত্রিগুণা। কবে যাবে ?

কালিকা। রবিবারে। চিঠি লিখে যেতে হবে।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ চতুর্থ দিন পরে অর্থাৎ সোমবার বিকালে। ত্রিগুণা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন —চিন্তা করিতেছেন ; তাঁর মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়িয়াছে। পারুল, শশী আর নিশি আসিল—তিনজনেরই মুখে প্রচুর হাসি—উঠান হইতেই পারুল বলিল,—]

পারুল। অভয়া, ভাই, চললি ?

অভয়া। হ্যাঁ, জন্মের মতো। [ বলিয়া অভয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল…]

ত্রিগুণা। শুনলি পারুল, মেয়ের কথা। তোরা বললি কি, আর, ও জবাব দিলো কি ভাবে !

পারুল। তা বলুক মাসিমা। মিছে কথা বলেনি ত'। বিয়ে হয়ে ত' আমরা জন্মের মতোই যাই ! তুমি আসো নি ?

ত্রিগুণা। তোর সঙ্গে কথায় পারব না। বোস, আয়। [ বলিয়া ত্রিগুণা হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ]

পারুল। আয়, অভয়া, আমরা ও ঘরে বসিগে… [ চারজনে যাইয়া ও-ঘরে বসিল ]

পারুল। সব ঠিক ?

অভয়া। হ্যাঁ। দু'শো নগদ—গয়না-টয়না অনেক। বাবা ছুটি নিয়ে দু' একদিনের মধ্যেই কাজে লেগে যাবেন…

নিশি। তার মানে ?

অভয়া। ঘরদোর মেরামত, টাকা সংগ্রহ। গয়না গড়ানো, ইত্যাদি। জব্দ খুব।

[ অভয়া বলিয়া ভারি হাসিতে লাগিল…ওরা হাসির দিকে চাহিয়া রহিল — অভয়া বলিল— ]

অভয়া। বাবা নয়, মা। মা আমাকে আর বাবাকে যা ভালোবাসে তার শতগুণ বেশী ভালোবাসে টাকা আর গয়না ; সেগুলো ছাড়তে হচ্ছে।

[ বলিয়া অভয়া যেন পরম চরিতার্থ হইয়া উৎফুল্ল হইয়া রহিল ‥]

শশী। তোর ভারি স্ফূর্তি দেখছি যে! বিয়ের নামে ত' অন্য মেয়ে মুষড়ে যায়!

অভয়া। স্ফূর্তি হবে না কেন! আমি কি এখানে সুখে ছিলাম নাকি! মা কেমন টিপে রেখেছিল তা জানিস ত'! পাছে কেলেংকারী ক'রে বসি। দম বন্ধ হয়ে আমি মরছিলাম, আর, ভাবছিলাম কবে উদ্ধার পাবো।

পারুল। দেখতে এসে কি পরীক্ষা করল?

অভয়া। বিশেষ কিছু না—গেঁয়ো ধরণ মনে হ'ল।

শশী। গান-টান?

অভয়া। গান জানি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল; আমি বললাম, জানিনে।

পারুল। নোতুন একটা দিদিমণি এসেছে, ভাই, কী সুন্দর গলা!

অভয়া। শিখছিস ঢের?

পারুল। ঢের নয়, দুটো একটা। তোর কথা ভেবে ভারি দুঃখ হয়···মাসিমা তোকে ছাড়িয়ে নিলেন!

অভয়া। হ্যাঁ, মা আমার খুব সাবধান—কেবলই আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে তাঁর প্রাণ কাঁপত·· দু'দিন বাদেই প্রাণ খুলে বাইরের দিকে তাকাতে পারব। যাক। দিদিমণি বেশ ভালো লোক?

পারুল। খুব ভালো।

অভয়া। শোনা দেখি একটা নোতুন গান। শোনাবি? [ মাথা নাড়িয়া পারুল রাজি হইল। ]

—পারুলের গান—

মা আমার যে জগন্মাতা—
মা সুধাংশু নিভাননী;
শারদশশীর অংগে মায়ের
অফুরন্ত হাসির খনি।
চরণতলের আভ জ্বলে
সহস্রজল ঐ উৎপলে—
তাঁর আনন্দে হিল্লোলিত
শ্যামলাংগী এ ধরণী।
মায়ের লঘু চরণধ্বনি
তটিনীর ঐ কলস্বরে—
মায়ের হৃদয় কল্লোলিত
ঊর্মিমুখর সাত সাগরে;
ফোটে ছায়া মেঘদলে—
রোষ হানে রে বজ্রানলে;
মায়ের মূর্তি কভু কাশী—
কভু লক্ষ্মী, নারায়ণী।

অভয়া। বেশ; ভারি সুন্দর।

পারুল। আমার কিছুই হল না, ভাই—দিদিমণির মুখে কি সুন্দর লাগে। যাই ; মাসিমার সংগে দুটো কথা ক'য়ে যাই ; তা নইলে অন্যায় হবে।

[ সকলে বাহিরে আসিল। পারুল ডাকিল, "মাসিমা" ? ত্রিগুণা ঘরের বাহিরে আসিলেন ; পারুল বলিল,— ]

পারুল। জামাইয়ের কথা দু একটা বলুন, মাসিমা !

[ ত্রিগুণা মিষ্টস্বরে বলিলেন,— ]

ত্রিগুণা। আমি ত' তাকে দেখিনি। তোর মেসোমশায় বললেন, স্বাস্থ্য রঙ স্বভাব বেশ—শান্তশিষ্ট গেরস্ত। পাকা একতলা বাড়ী। আর কি শুনবি ?

পারুল। আচ্ছা, শুনব ক্রমশঃ। এখন আসি, মাসিমা।

ত্রিগুণা। এসো। আসিসনে কেন তোরা ?

[ পারুল কথা কহিল না—অভয়ার মুখের দিকে তাকাইল···দরজার কাছে আসিয়া অভয়া বলিল,— ]

অভয়া। সবই দেখছি উৎকৃষ্ট ; কিন্তু···

পারুল ও শশী। কিন্তু কি ? [ ওরা জানিতে চাহিল। ]

অভয়া। যদি আমাকে ভাল না বাসে ? কিম্বা আমি যদি দেখি, কেমন যেন ?

শশী। দূর বাঁশরী······[ ওরা চলিয়া গেল। ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ বিবাহ হইয়া গেছে। অভয়ার শ্বশুরবাড়ীতে বাসের জন্য তিনটি কামরা এবং রোয়াকযুক্ত একটি ইষ্টকালয় আছে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর মতোই অন্যান্য ঘরগুলি···বাড়ীতে বিধবা শাশুড়ী মহেশ্বরী আছেন, অবিবাহিতা একটি ননদ আছে, আর আছেন অভয়ার স্বামী বসন্ত। শাশুড়ী নিরীহ প্রকৃতির লোক—আরতি চঞ্চলা পঞ্চশশী ; বসন্ত গোবেচারা, অর্থাৎ কোনো বিষয়েই তার উত্তাপ কি উত্তেজনা নাই ; ভালবাসিতে হইলে উদ্বেল হইয়া উঠিতে হইবে, এ-কথা তার মনেই পড়ে না। সে কুনো। আপন কোণটিতে বসিয়া সে কি শাশ্বত ধাঁধার সমাধানে নিযুক্ত থাকে তাহা কেহই জানে না। গ্রীষ্মকালে পাখা, শীতকালে সোয়েটার, আর বর্ষাকালে ছাতা লইয়া সে ব্যস্ত, কারণ, আবহাওয়ার দোষে অসুখ করিতে পারে। বাহিরের কোনো আনন্দ উৎসব পর্ব তাহাকে কোণছাড়া করিতে পারে না। হাসে কম—নিজের খেয়াল হইলে অনর্গল কথা বলে ; নতুবা চুপ করিয়া থাকে। স্ত্রীর রূপ-যৌবনের কোনো আবেদন তার কাছে পৌঁছে বলিয়া মনে হয় না। বিবাহের পর কুটুম্বগণ প্রস্থান করিলে, আরতি একদিন তার মাকে বলিল,— ]

আরতি। মা, দেখেছ, বৌদির মুখ কেমন গম্ভীর ?

মহেশ্বরী। দেখেছ। ও-টা হয়তো কথাই বলে না। ছেলেমানুষের মন, এখন খেলা চায়। চিরকালই বসল ঘুপসির ভেতর ঘাপটি মেরে রয়ে গেল।

আরতি। বৌদিকে বলব কিছু ?
মহেশ্বরী। কি বলবি ?
আরতি। মন খারাপ ক'রে থাকে কেন ?
মহেশ্বরী। অন্যায় হবে না ত' ?
আরতি। অন্যায় কেন হবে ! কৌশলে জানতে হবে। আসছে। তুমি ও-ঘরে যাও।

[ মহেশ্বরী চলিয়া গেলেন, অভয়া আসিল··· ]

আরতি। এসো বৌদি ; হল আলাপ শেষ ?
অভয়া। কার সঙ্গে ?
আরতি। দাদার সঙ্গে।
অভয়া। আমি তাঁর কাছ থেকে ত' এখন আসছিনে !
আরতি। দাদা তোমার সঙ্গে গল্প করে ?
অভয়া। করেন। এত গল্প করেন যে আমি ভাবি, ঘুমুবেন কখন ! [ বলিয়া হাসিল। ]
আরতি। তা-ই নাকি ? এত কি গল্প করে ?
অভয়া। ভাল ভাল গল্প, হিতোপদেশপূর্ণ। দৃষ্টান্তগুলো মনে রাখলে সংসারে আমার অসুখ বলতে কিছু থাকবে না।
আরতি। তুমি ঠাট্টা করছ, বৌদি।
অভয়া। না, ঠাকুরঝি, সত্যিই তা-ই।
আরতি। উঁহুঁ, দাদাকে আমরা চিনি। ঐ কোণটিতে বসে থাকে—কেউ ও-র কাছে আসে না—ও কারো কাছে যায় না।
অভয়া। কিন্তু বিয়ের সময় সঙ্গে বন্ধু গিয়েছিল ত' অনেক !
আরতি। বড়দার খাতিরে......

[ অভয়াকে কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করিয়া আরতি বলিল,— ]

আরতি। তোমার মন ভালো থাকে না, তা বুঝতে পারি। নয় ?

[ অভয়া যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেল ; বলিল,— ]

অভয়া। আমি তোমার দাদাকে আনন্দ দিতে পারিনি, ঠাকুর-ঝি।
আরতি। তার মানে তুমি আনন্দ পাওনি...

[ অভয়া কথা কহিল না। তারপর অন্য কথা বলিল ; হাসিয়াই বলিল,— ]

অভয়া। কিন্তু আর নয়, পতিনিন্দা তুমি আমাকে ঢের শুনিয়েছ। এই মুহূর্তে আমি দেহত্যাগ করলে একটা নাম থেকে যায়।···কিন্তু এ-কথা সত্যিই ঠাকুরঝি, আমাদের এই বাড়ীতে কোনো শব্দ নেই—শব্দ না থাকলে মনে কলরব উঠবে কেমন করে ! বুঝলে ?
আরতি। বুঝেছি। দাদা নীরব নির্জীব বলেই তোমার চারিদিক শূন্য মনে হয়। ঢেকো না—আমিও তা অনুভব করি।

[ মহেশ্বরী আসিয়া বলিলেন— ]

মহেশ্বরী। বৌমা, বসন্ত জানতে চাইলে, তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখেছ ?
অভয়া। লিখেছি মা। ঘড়িটা যে বন্ধ হয়ে গেছে তা লিখে দিয়েছি।
মহেশ্বরী। বলে এসো।

[ অভয়া বসন্তের ঘরে এবং তার কাছে আসিল—বসন্ত তার তক্তপোশের ধারে

ঢেকো হইয়া বসিয়া হাতপাখা নাড়িয়া মশা ও মাছির উৎপাত নিবারণ করিতেছিল...নবপরিণীতা যুবতী স্ত্রী সন্নিকটবর্তী হইলেও তার উৎফুল্লতা দেখা গেল না—অভয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—বেদনার উপরে কৌতুক প্রবল হইয়া অভয়ার মুখে একটু হাসি ফুটিল। অভয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—]

অভয়া। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন জ্যোছনা; মা বলতেন, জ্যোছনা কথাটাই ভালো না, কেমন উড়ু উড়ু বাবুয়ানী ঢং। মা নাম রাখলেন, অভয়া...

বসন্ত। তাতে কি হয়েছে?

অভয়া। বলছি যে, মা ঠিকই করেছিলেন; জ্যোছনা নাম তুমি পছন্দ করতে না।

[ বসন্ত বাক্যব্যয় করিল না। অভয়া বলিল,— ]

অভয়া। বাবার কাছে চিঠি লিখেছি। ঘড়ি কেন হঠাৎ বন্ধ হল তা জানতে চেয়েছি। যদি বলো এ-র পরের চিঠিতে লিখব যে, এ-ঘড়িটা বদলে একটা ভালো ঘড়ি দিতে পারা যায় কি না!

বসন্ত। এইবারই তা লিখলে কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকত।

অভয়া। ভুল হয়ে গেছে। ইস্!

[ বসন্ত অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল—অভয়া কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,— ]

অভয়া। আশা করে এসেছিলাম অনেক কিন্তু তুমি ত' বসতেও বললে না!

[ বসন্ত নির্লিপ্তচিত্তে চুপ করিয়া রহিল। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ মাস পাঁচ-ছয় পর বৈকালে। রোয়াকের অপর প্রান্তে বসিয়া অভয়া রুমালের কোণে সূচীকার্য করিতেছে···আরতি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে। মহেশ্বরী তাঁর রান্নাঘরে আছেন—মুগ ভাজিয়া ডাল করিতেছেন···গৃহ নিঃশব্দই ছিল। বসন্তের ঘরে একসময় একটা কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আরতি লাফাইয়া উঠিল, "মা, অতুলদা এসেছেন"·· মা সাড়া দিলেন: "তাই নাকি? যাই।" আরতি অভয়াকে বলিল,— ]

আরতি। দাদাদের খুব বন্ধু। যেমন রাজপুত্রের মতো চেহারা, তেমনি রাজার মতো ধনী। খুব আমুদে। মাকে নিয়ে তীর্থ বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরেছে দেখছি। আমি যাই, বৌদি; গল্প শুনি গে। হাসিয়ে মারে।

[ আরতি তার দাদার ঘরে গেল—মহেশ্বরীও গেলেন—অভয়া একলা বসিয়া রহিল··· ]

* * *

[ বসন্তের ঘর—অতুল চেয়ারে বসিয়া আছে; বসন্ত তার তক্তপোশে পাখা লইয়া বসিয়া মাছি ও মশা তাড়াইতেছে। মহেশ্বরী যাইয়া দাঁড়াইলেন—আরতি তার দাদার তক্তপোশের একটু দূরে বসিল···অতুল মহেশ্বরীর দিকে হাসিমুখে তাকাইল; মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন,— ]

মহেশ্বরী। ফিরলে, বাবা? কখন পৌঁছেছো?

[ অতুলের কণ্ঠ স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত প্রবল; বলিল,— ]

অতুল। কাল রেতে পৌঁছেছি, খুড়ীমা।

মহেশ্বরী। মা ভালো আছেন?

অতুল। হ্যাঁ, ভালই আছেন। কিন্তু খুব ক্লান্ত। বসনকে বলছিলাম, মাকে একবার তীর্থ ঘুরিয়ে আনো···

মহেশ্বরী। হ্যাঃ। ওকে তক্তপোশ থেকে নামাও দেখি!

[ অতুল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—তার সঙ্গে আরতিও খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ হাসির শব্দ কানে যাইয়া অভয়া উৎকর্ণ আর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তার সূচীকার্য বন্ধ হইয়া গেল—উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কান পাতিয়া রহিল...অভয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে—মাঝে মাঝে পায়চারি করিতেছে। অতুলের কণ্ঠস্বর অভয়ার কানে পৌঁছতে লাগিল: ]

অতুল। বললাম বটে আপনার তীর্থে যাবার কথা, কিন্তু তীর্থ করা মানে বাঁদরের সঙ্গে নেচে বেড়ানো।...হ্যাঁ, খুড়ীমা, কাশীতে আর বৃন্দাবনে সত্যিই তাই—পাণ্ডার চাইতেও তারা প্রবল···মা ত' একদিন কেঁদে আকুল—

মহেশ্বরী। কেন?

অতুল। তাঁর পুজোর ফুল বেলপাতা সমেত ফুলের সাজি আর টাট নিয়ে একদিন দুই বাঁদর উঠলো ছাদে···

আরতি। কোথায়?

অতুল। কাশীধামে। আবার কোথায়?

আরতি। তারপর?

অতুল। এক ছড়া কলা দিয়ে তবে সব আদায় করি···

[ আরতির হাসির শব্দ অভয়ার কানে আসিল। অতুল বলিল,— ]

অতুল। তীর্থের কথা এখন থাক, খুড়ীমা; পরে বলব ক্রমশঃ। সংক্ষেপে ব্যাপার এই যে, যে-স্থানের নাম তীর্থক্ষেত্র সেখানে উৎপাতের, খরচের আর খাওয়া থাকার কষ্টের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বসনের বিয়েতে আমি অনুপস্থিত···

মহেশ্বরী। দুঃখ আমাদেরও কম নয়, বাবা। এমন দিন যায়নি, আর বাড়ীতে এমন লোক ছিল না যে, তোমার কথা বলেনি! সবারই ইচ্ছে, তুমি ফিরলে তবে বিয়ে হবে। কিন্তু মেয়ের মায়ের কিছুতেই সবুর সইল না।

[ অতুল কি বলিল, কিংবা কেহ কিছু বলিল কিনা অভয়া তা শুনিতে পাইল না · হঠাৎ দৌড়াইয়া আসিল আরতি—অভয়া চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিল; আরতি হাসিতে হাসিতে বলিল— ]

আরতি। অতুলদা তোমাকে দেখবে, বৌদি! ( নিম্নস্বরে ) গিনি একটা নিশ্চয়ই দেবে।

[ অভয়া একটু হাসিল। মহেশ্বরী আসিলেন— ]

মহেশ্বরী। বৌমা, অতুল দেখবে তোমাকে। খুব আপনার লোক আমাদের।···একটু চা ক'রে আনো। তারপর সেজে নিও শীগ্‌গির।

[ অভয়া নামিয়া গেল—মহেশ্বরী আর আরতি আবার গেলেন অতুলের দরবারে। ]

*   *   *

[ অভয়া স্টোভ জ্বালিয়া জল বসাইয়া দিলো—চা প্রস্তুতের যাবতীয় সরঞ্জাম একাই করিল…আরতি আসিল ; বলিল,— ]

আরতি। চা হল বৌদি ?

অভয়া। এত শীগ্‌গির হয় কখনো ! একটু বসো…

আরতি। উঁ হুঁ। চা তুমি নিয়ে যাবে।

অভয়া। পাগল নাকি তুমি ? তুমি নিয়ে যাবে বলেই ত' তোমাকে বসতে বলছি।

আরতি। কিন্তু গল্প শোনা ঢের বাদ পড়ে যাবে…

অভয়া। তা যাক ; কি এমন রত্ন জিনিস যে দুটো একটা বাদ পড়লে সে ক্ষতির আর পূরণ হবে না !

আরতি। আমি আসছি আবার এখুনি। [ বলিয়া আরতি চলিয়া গেল…ওদিক হইতে কথার আওয়াজ থাকিয়া থাকিয়া আরতির অতুলের এবং মহেশ্বরীরও হাসির শব্দ আসিতেছে চা প্রস্তুত হইল—মহেশ্বরী আসিলেন। ]

মহেশ্বরী। সেজে নাও। আর নমস্কার করো ! [ অভয়া মাথা কাত করিয়া নমস্কার করিতে সম্মত হইল—অভয়া জিজ্ঞাসা করিল,— ]

অভয়া। উনি কে, মা ?

মহেশ্বরী। আমার ছেলের বন্ধু। খুব টাকার মানুষ। আরতিকে পাঠিয়ে দিই গে। [ বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আরতি আসিল—কাপড়ের বাক্স খুলিয়া শাড়ী বাহির করিল—কলার কচিপাতার মতো তার রং। অভয়া সেই কাপড় পরিল…আরতি তার মুখে একটু পাউডার ঘষিয়াও দিলো। ]

মহেশ্বরী। হল বৌমা ? [ জিজ্ঞাসা করিয়া মহেশ্বরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। ]

আরতি। হয়েছে।

মহেশ্বরী। এসো আমার সঙ্গে।

[ তিনজনে মিছিল বাঁধিয়া যাত্রা করিলেন—সর্বাগ্রে মহেশ্বরী, তাঁর পশ্চাতে অভয়া, এবং তার পশ্চাতে আরতি…দরজার সম্মুখে আসিয়া অভয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া ভিতরের দিকে চাহিল—এবং এইদিকেই মুখ করিয়া উপবিষ্ট একটি নিমেষের জন্য অতুলের সঙ্গে তার চোখাচোখি হইয়া গেল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহেশ্বরী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন—অভয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—আরতি অতুলের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল—অভয়া দুই হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিল— ]

অতুল। ( হাস্যপূর্বক ) এই ভুল করলেন। আমি আপনাকে নমস্কার করবো আগে, তারপর আপনি আমাকে প্রতিনমস্কার করবেন। ( মহেশ্বরীর প্রতি ) বসন, আমার আড়াই মাসের বড়ো, নয় খুড়ীমা ?

মহেশ্বরী। হ্যাঁ।

অতুল। তা হলেই সম্পর্কে আমি ছোট দাঁড়িয়ে যাচ্ছি।…বেশ বউ হয়েছে, খাসা বৌ হয়েছে খুড়ীমা ; আপনার ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন।

[ অভয়া আবার এক নিমেষের জন্য চোখ তুলিল—অতুল তখন তার "মুখ দেখিতেছে।" ]

মহেশ্বরী। সেই কামনা করো, বাবা ; লক্ষ্মী যেন অচলা হ'য়েই থাকেন।

বসন্ত। তা নির্ভর করে চেষ্টার উপর।

অতুল। ওঁকে আরো আড়ষ্ট করে তুলে দরকার কি ! ওঁকে নিয়ে যান, খুড়ীমা। আচ্ছা খুড়ীমা, দাঁড়ান একটু। আরতি, তোমার বৌদিকে নিয়ে যাও—

আরতি। কেন ? বৌদি কি এ-ঘর থেকে বেরুবার পথ চেনে না ?

[ মহেশ্বরী ধমকাইয়া উঠিলেন,— ]

মহেশ্বরী। চেনে, চেনে। তোকে যা বলা হচ্ছে তাই কর।

আরতি। এসো। [ বলিয়া আরতি অভয়ার হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইল। ওরা চলিয়া গেলে অতুল ক্ষুব্ধস্বরে বলিল,— ]

অতুল। কি কেলেঙ্কারীটাই হলো, খুড়ীমা ! বসন্ আমাকে কি লজ্জাই দিলে !

মহেশ্বরী। কি করেছে বসন্ ? [ আরতি আসিয়া দাঁড়াইল ; অতুল বলিতে লাগিল,—]

অতুল। আপনারা এ-ঘর থেকে বউকে আনতে গেলে, বসন্ বললে, বউ ত' দেখবে। কি দিয়ে দেখবে ? আমি বললাম, গিনি। বসন্ বললে, দেখি গিনিটা—গিনির চেহারা কেমন তা জানিইনে। দিলাম গিনি ও-র হাতে ; কিন্তু আর আদায় করাই গেল না— আপনারা এসে পড়লেন।

মহেশ্বরী। তাতে আর কি হয়েছে—তুমি দুঃখিত হ'ও না, বাবা। বসন্‌কে ত' তুমি চেনো !

অতুল। দুঃখের কারণ হয়েছে বই কি, খুড়ীমা ! অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হল, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। নোতুন বউ মনে করলে কি ! ছি, ছি ! [ বলিয়া অতুল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। যেন খুব জিতিয়া গেছে এমনিভাবে বসন্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ]

অতুল। আমি উঠি এখন। [ বলিয়া অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল। ]

*　　*　　*　　*

[ অভয়া তৃতীয় কুঠুরিতে আনমনা হইয়া বসিয়া ছিল—আরতি লাফাইয়া আসিয়া পড়িল : ]

আরতি। বৌদি, কি করছ ? একটা ভারি মজা হয়ে গেছে মুখ দেখার ব্যাপারে !

অভয়া। নোতুন রকম লাগছে যেন কেমন !

আরতি। তুমি তা জানো না।

অভয়া। তোমাকে দেখেই বলছি। একটা মানুষ একদণ্ড বসেই তোলপাড় করে দিয়ে গেছে। তোমার এত আনন্দ আগে দেখিনি ত' !

আরতি। তোমার দিব্যি, তা-ই বৌদি। বহুদিন পরে বেশ তাজা লাগছে। তোমার লাগছে না ? [ অভয়া জবাব দিল না। ] তবু ত' গান শোনাননি !

অভয়া। গানও জানেন না কি !

আরতি। খুব। কিন্তু রাজী করানো মুশকিল ; কান্নাকাটি করে না ধরলে হাঁ করতে চান না। [ উভয়েই হাসিতে লাগিল—]

অভয়া। এবার এলে কান্নাকাটি করে ধ'রো ঠাকুরঝি।

আরতি। সে আর তোমাকে বলতে হবে না—আজই ধরতাম। কিন্তু দাদার অত্যাচারে হল না...

অভয়া। কি রকম ?

আরতি। দাদা করেছে কি জানো! তোমার মুখ দেখে তোমাকে একটা গিনি দেবেন বলেছিলাম না! সত্যিই অতুলদা গিনিই এনেছিলেন। দাদা তা শুনে বললে, দেখি গিনিটা! গিনির চেহারা কেমন তা জানিইনে। অতুলদা গিনিটা তাকে দেখতে দিলেন ; কিন্তু দাদা তা ফেরত দিলে না। অতুলদা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন...

অভয়া। কেন ?

আরতি। শুধু হাতে নতুন বউয়ের মুখ দেখতে হল—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না!

অভয়া। আমাকে দিলেও আমি তাঁকেই দিতাম ; না-হয় তিনি আগেই নিয়েছেন!

আরতি। ( মাথা নাড়িয়া ) উঁ হুঁ, দাদা কাজটা খারাপই করেছে ..

মহেশ্বরী। বৌমা, রাখো এই গিনিটা তোমার কাছে—হাতছাড়া করো না ; অন্ততঃ, আমাকে না জানিয়ে ত' নয়ই। [ বলিতে বলিতে মহেশ্বরী সেখানে আসিলেন ]

অভয়া। আপনার কাছেই থাক, মা!

মহেশ্বরী। না রাখো।

আরতি। তুমিই রাখো, বৌদি! এ ত' হাতী ঘোড়া নয় যে কোথায় রাখবে তার ঠিক নেই!

মহেশ্বরী। অনেক কষ্টে আদায় করেছি। হতভাগা কি দিতে চায়!

[ অভয়া হাত বাড়াইয়া গিনিটা লইল। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ পরদিন বৈকাল। অতুল আসিয়াছে—মহেশ্বরী সেখানে আছেন, আরতি ত' থাকিবেই। অভয়া স্টোভ জ্বালিয়াছে—জল ফুটাইবার পর স্টোভ নিবাইয়া দিলো...ও ঘরে গান শুরু হইল : ]

কুড়ায়ে চলেছি পথে পথে আমি
মধুর হাসির কণা—
তা-ই আমি এত সন্ধানী ওগো—
তা-ই আমি আনমনা।

[ অভয়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল গান চলিতেছে : ]

হাসিরাশি ল'য়ে অরুণ-উদয়,
কূজন কাকলি জাগো বনময় ;
স্মিত জ্যোছনায় এ-দেহ ডুবায়ে
স্বপনের জাল বোনা।

[ অভয়া যেন আকুল হইয়া উঠিল—শব্দের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রহিল ...ইত্যবসরে তার চা প্রস্তুতকার্য অগ্রসর হইতেছে। ]

আঁধারে তটিনী হাসে ঝিকমিক,
বৃন্তে কুসুম হাসে—
হাসিভরা ঐ আকাশের গায়ে
মেঘের হাসিটি ভাসে...

তবু এ-পথিক হাসির ভিখারী,
এসো কাছে মোর বন্ধু আমারি,
তোমার হাসিটি করো মোরে দান—
আর-কিছু চাহিব না।

[ গান শেষ হইতেই আরতি ছুটিয়া আসিল : ]

আরতি। বৌদি, চা হল ? দাদা তোমাকেই নিয়ে যেতে বললে। গান শুনলে ?

অভয়া। হ্যাঁ। চমৎকার। জ্যোছনার কথা কি বলছিলেন ? [ পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে অভয়া জিজ্ঞাসা করিল ; তারপর আরতির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। ]

আরতি। তা ত' ঠিক মনে পড়ছে না, বৌদি। গানের ভেতর আছে জ্যোছনার কথা ?

অভয়া। তবে শুনলে কি ? আমার একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে গেছে।···তোমার দাদা আমাকেই চা নিয়ে যেতে বললেন ?

আরতি। হ্যাঁ, চলো। [ অভয়া আরতির সংগে সংগে অতুলের জন্য চা লইয়া চলিল। ]

*  *  *  *

[ বসন্ত হাত-পাখার সাহায্যে মাছি এবং মশা তাড়াইতেছে—মহেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছেন। অতুল চেয়ারে ; বলিতেছে : ]

অতুল। আজ সকালে আপনাদের এদিকে চারটে গাইয়ে বাজিয়ে লোক আসেনি, খুড়ীমা ?

মহেশ্বরী। না। কারা তারা ?

অতুল। একজনের ঘাড়ে এক ঢোলক, একজনের হাতে বেহালা ; তারা তাই বাজাচ্ছে, আর দুটো ছেলের একটাকে সাজিয়েছে কেষ্ট, আর একটাকে সাজিয়েছে রাধিকে। কেষ্ট আর রাধার সে কি গান গলা মিলিয়ে, "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী"···এক মেলার লোক দাঁড়িয়ে গেল তাদের ঘিরে—

বসন্ত। দিলে কিছু ?

অতুল। দিলাম চারটে পয়সা। বজ্জাতি আর ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেয়া হল বলে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু মোটের উপর ভিখিরী ত' !

[ বলিতে বলিতে তাকাইয়া দেখিল, আরতির সংগে অভয়া চা লইয়া দরজায় আসিয়াছে··· ]

অতুল। চা এসে গেছে, বউঠাকরুণ নিজে বয়ে এনেছেন···

[ অভয়া অগ্রসর হইয়া চা অতুলের সম্মুখে নামাইয়া দিলো...তার হাত এখন অল্প অল্প কাঁপিতেছে—অতুল তাহা লক্ষ্য করিল·· অভয়া পিছাইয়া আসিল —মহেশ্বরী বলিলেন,—]

মহেশ্বরী। অতুলের সামনে তুমি অত সংকোচ ক'রো না, বৌমা—তোমার দেওরের মতো !

[ অতুল চায়ের 'কাপ' তুলিয়া লইতে লইতে বলিল,—]

অতুল। দেওর যদি দুর্জন হয় তবে ?

মহেশ্বরী। তুমি ত' দুর্জন নয় !

বসন্ত। দুর্জন নয় ! আমাকে ঠেঙিয়েছে কম !

অতুল। সে তোমাকে আক্কেল দিতে। ( হাসিয়া উঠিল ; তাকাইয়া দেখিল, অভয়ার মুখে হাসির ছায়া ভাসিতেছে ) দুর্জন আমি না হ'লেও দুর্দান্ত ত' বটেই···বউঠাকরুণের স্বতন্ত্র একটা বসার জায়গা নেই—দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছেন···

মহেশ্বরী। আচ্ছা তুমি এখন এসো বৌমা।

[ পলকের জন্য অতুলকে লক্ষ্য করিয়া অভয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ দিন তিনেক পর—সকালবেলা। মধ্যাহ্নিক আহারের আয়োজন চলিতেছে—আরতি আর অভয়া বঁটি তরকারী, শিল নোড়া মশলা প্রভৃতি লইয়া রান্নাঘরের বারান্দায় ব্যস্ত…মহেশ্বরী ধীরে ধীরে সেখানে আসিলেন; বলিলেন, ]

মহেশ্বরী। বৌমা, আমার রান্নার যোগাড় করো না; আমার জ্বর হয়েছে।

অভয়া। দেখি। [ বলিয়া অভয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল; শাশুড়ীর কপালে হাত দিয়া দেখিল; বলিল,—] জ্বর খুব বেশী হয়েছে, মা। আপনি সকালবেলা গা কাপড় ধুলেন কি বলে?

[ মহেশ্বরী বধূর ভৎর্সনায় হাসিয়া বলিলেন,— ]

মহেশ্বরী। কথা শোনো একবার! গা কাপড় না ধুয়ে আহ্নিক করা হয়!

অভয়া। চলুন, শুইয়ে দিইগে আপনাকে। [ বলিয়া অভয়া শাশুড়ীর ডানা করিল; তাঁহাকে আনিয়া তাঁর বিছানায় শুয়াইয়া দিলো…বসন্তের ঘরে গেল—বসন্ত হাতপাখা নাড়িয়া মাছি এবং মশা বিতাড়িত করিতেছিল। অভয়া সংবাদ দিলো,— ]

অভয়া। মায়ের জ্বর হয়েছে খুব। শুইয়ে দিলাম। ডাক্তার আনা দরকার।

বসন্ত। এখনই জ্বর এলো, এখনই ডাক্তার?

অভয়া। জ্বর এসেছে বোধহয় রাত্তিরে।

বসন্ত। চব্বিশ ঘণ্টা দেখা যাক; জ্বর যদি না ছাড়ে তখন ডাক্তার আনা যাবে।

অভয়া। অতুলবাবুকে একটা খবর দাও।

বসন্ত। অতুলবাবু এসে কি জ্বর টেনে ছাড়িয়ে নেবেন? অল্পেই এত ব্যস্ত হওয়া কেন?

[ বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসন্ত জ্বরের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিলো। ]

*　　　*　　　*

[ অফিস হইতে ফিরিয়া বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল,— ]

বসন্ত। জ্বর ছেড়েছে?

[ আরতি আর অভয়া মহেশ্বরীর কাছেই বসিয়া ছিল; আরতি বলিল,— ]

আরতি। দেখছ না! জ্বর ছাড়ার লক্ষণ কি দেখলে তুমি? জ্বর বেড়েছে; সারা দুপুরটা খুব কাতরেছে আর কেশেছে।

বসন্ত। অতুলকে ডাকি—জলটল খেয়ে বেরুই। [ বলিয়া বসন্ত কাপড় ছাড়িতে গেল—অভয়া তাহাকে জলখাবার দিতে উঠিয়া গেল। ]

*　　　*　　　*

[ বসন্ত অতুলকে ডাকিয়া আনিয়াছে—অতুল বলিল,— ]

অতুল। বেহুঁশ অবস্থা; গলার ভেতর শ্লেষ্মার আওয়াজ দিচ্ছে। উত্তাপ অত্যন্ত। ডাক্তার এখনই আনা দরকার।

বসন্ত। এক কাপ চা খেয়ে যাও।

অতুল। না, আসি।

বসন্ত। তুমিই যাবে ?

অতুল। তোমার দ্বারা কাজ হলে আমি যেতাম না। [ বলিয়া অতুল চলিয়া গেল। ]

*            *            *

[ ডাক্তারবাবুকে সংগে করিয়া লইয়া অতুল আসিল···ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,— ]

ডাক্তার। প্লুরিসি, নিউমোনিয়ার 'সাউণ্ড'ও পাচ্ছি।

বসন্ত। ( অকস্মাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল ) সর্বনাশ। উপায় ?

ডাক্তার। উপায়, চিকিৎসা আর শুশ্রূষা। [ বলিয়া ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র ও উপদেশ দিলেন আর দর্শনী লইলেন ] শীগ্‌গিরই লোক পাঠিয়ে দিন। আমি ডিস্‌পেন্‌সারিতেই এখন যাচ্ছি।

অতুল। ডাক্তারবাবু, হিসেব চলবে আমার নামে।

ডাক্তার। থ্যাঙ্ক উ।

অতুল। ( বসন্তকে ) যাও, ওষুদ পথ্য নিয়ে এসো—ভালো করে শুনে এসো ডাক্তার আরও যা বলেন।

[ বসন্ত চলিয়া গেল। অভয়া চা লইয়া আসিল—অতুলের সম্মুখে নামাইয়া দিলো··· ]

অতুল। আমাকে আর আপনি বিশেষ লজ্জা করবেন না—করলে চলবে না। বসন্ত বেকুব, আল্‌সে ; আরতি আপনার চাইতেও ছেলেমানুষ। আপনার শাশুড়ীকে নিয়ে বেশ সংকটই হবে ; অসাবধান হলেই বিপদ।

অভয়া। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।—[ অভয়া অতুলের চোখে চোখে চাহিয়া বলিল। ]

অতুল। বেশ উৎসাহজনক কথা।—[ অভয়ার চোখে চোখে চাহিয়া অতুল বলিল।··· তারপর বলিল,— ] আমি চা খেয়েই বেরুবো ; দুটো নার্স ঠিক করে আসি ; আমরা রুগীর শুশ্রূষা ত' শিখিনি।

অভয়া। কিন্তু···

অতুল। খরচের কথা বলছেন, না বসন্তের মতামতের কথা বলছেন ?

অভয়া। দুটোর কথাই বলছি।

অতুল। ( হাসিয়া উঠিল ) শেষেরটার কথা ছেড়ে দিন···[ অভয়াও হাসিয়া ফেলিল ] খরচের কথা বসন্ত ভাবুক—ও অকারণেই দিবারাত্র ভাবে। খরচটা আমি চালিয়ে দেবার অনুমতি চাই।

[ অভয়া মাথা নত করিয়া রহিল—সেইদিকে মুহূর্ত দুই অপলকচক্ষে তাকাইয়া অতুল "আসি" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ দিনে নার্স—রাত্রে নার্স—নিযুক্ত হইয়াছে। শিশিতে তুলায় কৌটায় এবং রোগীর জন্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে টেবিল পূর্ণ হইয়া গেছে। ওঘরে বসন্ত বলিল,—"দিন আট টাকা !" বলিয়া চোখ বিস্ফারিত করিল। ]

অতুল। তা ছাড়া কি করা যায় বলো ! মানুষকে বাঁচাতে হবে ত' !

বসন্ত। তোমার ঋণ আমি এ-জন্মে শোধ করতে পারব না।

অতুল। পরজন্মে চেষ্টা করো ; দাদাকে আর বোনদের খবর দিয়েছ ?

বসন্ত। দিইনি এখনও।

অতুল। এখনই দিও না। দেয়ার দরকার হলে আমিই বলব। তোমারও ছুটি নিয়ে কাজ নেই।

[ এ ঘরে মহেশ্বরীর শিয়রে দাঁড়াইয়া আরতি চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছে··· কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ]

আরতি। বৌদি, মা যদি না বাঁচে !

অভয়া। না—বাঁচার কথা ত' কেউ বলছে না, ঠাকুরঝি ! মিছিমিছি ভয় পেয়ে তুমি কেঁদো না ; একজনকে কাঁদতে দেখলে সবারই মন খারাপ হয়ে যায়।

[ আরতি চোখ মুছিয়া কান্না নিবারণ করিল। ওঘর হইতে এঘর দেখা যাইতেছে—অতুল বলিল,— ]

অতুল। আরতি কাঁদছিস বুঝি ? এদিকে আয় আমাদের কাছে। [ আরতি ধীরে ধীরে গেল। ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ মহেশ্বরীর অসুখ বৃদ্ধির দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ যেন কম পড়িয়াছে—শ্লেষ্মা অনেক কম, উত্তাপ আর অস্থিরতাও কম। বসন্তের দাদা হেমন্ত এবং দুইটি ভগিনীর কাছেও খবর গেছে...তাঁহারা টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, অবিলম্বে রওনা হইবেন। শুশ্রূষা ভালই চলিতেছে—নার্সদ্বয় আসিতেছে ; তথাপি বাড়ীর লোকের এবং অতুলের বিশ্রাম নাই। দ্বিপ্রহর। নার্স দ্বিপ্রহরে ঘণ্টা তিনেকের জন্য বাড়ী যায়—তখন অতুল আর অভয়া এবং আরতি হাজির থাকে...অতুলের নির্দেশ মতো ঔষধ পথ্য অভয়া খাওয়ায়· অতুল বলে,— ]

অতুল। শিশি থেকে গেলাসে ওষুদ ঢালতে গেলেই আপনার হাত কাঁপে কেন ?

অভয়া। আপনার কাঁপে না ?

অতুল। না।

অভয়া। আপনার মন দুর্বল নয়, আমার মন দুর্বল ; আমার এ-কাঁপুনি দুর্বলতার।

অতুল। মানসিক চঞ্চলতার দরুণ একরকমের দুর্বলতা দেখা দেয়—আপনার কি তাই ?

অভয়া। এ-কথার উত্তর ভেবে দেয়া দরকার। কিন্তু আমার হাতের শিশিটা সত্যিই কাঁপছে। আপনি ঢালুন...

অতুল। দিন। [ বলিয়া অতুল অভয়ার হাত হইতে শিশি লইবার সময় তার আঙুলের উপর আঙুল পড়িল...উভয়ে সেইদিকে নতচক্ষে মুহূর্তেক তাকাইয়া থাকিল— ]

অভয়া। ধরেছেন শিশি ?

অতুল। ধরেছি।

অভয়া। ছেড়ে দেবো ?

অতুল। সে আপনার ইচ্ছা।

[ অভয়া শিশির উপর হইতে আঙুল টানিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল···অতুল গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া রোগিনীকে সেবন করাইল। অভয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া অতুল বলিল,— ]

অতুল। একটু চা খাবো। আরতি কই ?

অভয়া। ঘুমুচ্ছে। আমিই যাচ্ছি।

* * *

[ বৈকলে। বসন্তকে অতুল ছুটি লইতে দেয় নাই। অফিস হইতে ফিরিয়া বসন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ]

বসন্ত মা কেমন আছেন ?

অভয়া ভালো।

অতুল ভালো। ভয় কেটেছে।- -[ অতুল অভয় দিলো।

বসন্ত তোমার কথা, না, ডাক্তারের মত ?

দুই-ই ; কারণ, আমিও লক্ষণ দেখছি, ডাক্তারও বলেছেন।

বসন্ত। বাঁচা গেল। কিন্তু দাদা আর হাসি খুশী দুই বোন কালই আসছেন ; অফিসে চিঠি পেলাম।

অভয়া। বেশ ত', আসুন না !

বসন্ত। তোমার গিনিটা দিও তা হলে ! ভাঙিয়ে খরচ চালাবো।

[ অভয়া অতুলের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল—অতুল হাসিয়া বলিল,— ]

অতুল। স্ত্রীর সর্বস্বই স্বামীর। কৌশলপূর্বক ভাঙিয়ে নিতে পারলেই হল।

* * *

[ দিনের নার্স চলিয়া গেছে—সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাত্রের নার্সের নিকট হইতে এক চিঠি আসিল—শরীর অসুস্থ হইয়াছে ; যাইতে পারিব না—আজ রাত্রিটা আপনারা অনুগ্রহপূর্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া চালাইয়া লইবেন। বসন্ত আর অতুল বসিয়াছিল—আরতি তাহাদের কাছে চিঠি লইয়া আসিল ; এবং চিঠির মর্ম অবগত হইয়া বসন্ত আর্তনাদ করিয়া উঠিল : "তা হলে কি করা যায়" ? ]

অতুল। তুমি চক্ষে অন্ধকার দেখে আর্তনাদ করতে থাকো—আমি ব্যবস্থা করি···

[ শুনিয়া আরতি হাসিয়া উঠিল— ]

অতুল। খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত্রি দশটা ; ততক্ষণ সবাই থাকব ; বৌঠাকরুণ বাদে। তারপর আমি আর আরতি বসব রাত্রি দেড়টা কি দুটো পর্যন্ত। তারপর তোমাদের দু'জনকে ডেকে বসিয়ে দিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে যাবো। কেমন রাজি ?

বসন্ত। খাসা ব্যবস্থা হয়েছে।

অতুল। আরতির উপর তেমন নির্ভর করা যায় না। কি বলিস রে ?
আরতি। ( একটু হাসিল ) না, পারব জেগে থাকতে।
অতুল। পারো ভালোই। না পারলে ক্ষতি নেই।

* * *

[ খাওয়া-দাওয়ার পর বসন্ত আর অভয়া শয়ন করিয়াছে—ওদিককার দরজা বন্ধ। আরতি মায়ের শয্যার কাছেই মশারির বাইরে চেয়ারে বসিয়া আছে—অতুল বসিয়া আছে খানিক দূরে টেবিলের ধারে চেয়ার লইয়া···রোগিনীর পায়ের দিকে তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে—বন্ধ-করা দরজার বাহিরে রোয়াকে প্রজ্বলিত লণ্ঠন রাখা আছে। সাড়ে এগারটা বাজিল। আরতি হাই তুলিল—অতুল বলিল,— ]

অতুল। ঘুম পাচ্ছে রে ? ও-ঘরে গিয়ে ঘুমো—অনর্থক বসে কষ্ট পাচ্ছিস···
আরতি। না অতুলদা, কষ্ট হ'চ্ছে না। থাকি, যতক্ষণ পারি। আপনাকে একলা রেখে ··

[ বলিতে বলিতে আরতি ঝিমাইয়া পড়িয়াই সচেতন হইয়া উঠিল— ]

অতুল। ( হাসিয়া ) যা না।

[ আরতি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেল—মায়ের পায়ের দিক্‌কার ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। বারটা বাজিল—তারপর সাড়ে বারটা ; একটা ; সওয়া একটা ···একটা বৃহদাকার পতঙ্গ ঘরে ঢুকিয়া অবিরাম বোঁ বোঁ শব্দ করিয়া উড়িতে লাগিল···একবার ঠক্ করিয়া মেঝেয় পড়িল—আবার উড়িল···অতুল রোগিনীর জ্বরের উত্তাপ দেখিতে থার্মোমিটার লইয়া বাহিরে লণ্ঠনের কাছে আসিল। পারদ নামাইয়া থার্মোমিটার দিলো···আবার থার্মোমিটার লইয়া ভিতরে আসিল। দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, অভয়া তাদের ঘরের এদিক্‌কার দরজায় দাঁড়াইয়া আছে ; বলিল,— ]

অতুল। উঠে এলেন যে ?
অভয়া। ঘুমোইনি ; ঘুম হল না।
অতুল। হলে ভালো হত। সারারাত জাগবেন কেমন করে ?
অভয়া। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি যে।
অতুল। লজ্জার কি কারণ হল ?
অভয়া। যাঁদের মা তাঁদের হুঁশ নেই। আর আপনার বিশ্রামের অবসর নেই।
অতুল। কিন্তু সবারই কি সব দিকে হুঁশ থাকে ! হুঁশ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সব কাজ সকলের দ্বারা কি হয়ে ওঠে ?
অভয়া। বন্ধুকে ঢাকছেন আপনি। উদ্বেগ, কর্তব্য, মমতা, এ-গুলো ত' সবারই থাকার কথা···

[ ভীমরুলের মতো সেই পতঙ্গটা শব্দ করিয়া উড়িতে উড়িতে ঠক্ আবার মেঝেয় পড়িল—সেই শব্দে অভয়া এক মুহূর্ত থামিয়া বলিতে লাগিল,— ]

অভয়া। না, সে-গুলোর যে-কাজ আরও বরাত দেওয়া চলে ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে !
অতুল। এ-কথার অন্ত নাই ; অতএব এখন থাক ··

[পতঙ্গটা আবার বোঁ বোঁ শব্দে উড়িতে লাগিল···অতুল একটু থামিয়া বলিল,—]

অতুল। পোকাটা জ্বালালে। একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে···

অভয়া। মা ঘুমুচ্ছেন?

অতুল। হ্যাঁ। নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হচ্ছে, বেশ সুস্থ ঘুম।

অভয়া। কি কথা জানতে চান?

অতুল। আপনি ত' আমাকে কিছু বলেই ডাকেন না!

অভয়া। আমি আপনার কত ছোট, তার ওপর মেয়েমানুষ; আপনিও ত' আমাকে আপনি বই তুমি বলেন না।

অতুল। মুশকিল ত' সেইখানেই।

অভয়া। মুখে উচ্চারণ করিনে, কিন্তু মনে মনে ডাকি বন্ধু বলে।

অতুল। বন্ধুর কিন্তু উপকার করতে হয়—দায়িত্ব নিলেন কিন্তু।

অভয়া। দরকার হলে বলবেন, দায়িত্ব পালন করব।

অতুল। বসন্‌কে ডাকুন, দুটো বাজে।

[ পতঙ্গটা শব্দ করিয়া মাথার উপর খুব উড়িতেছে··· ]

অভয়া। আমি পারবো না। আপনি ডাকুন, দেখুন যদি জাগাতে পারেন!

[ অতুল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল—অভয়া দরজা ছাড়িয়া এ-ঘরের দরজার একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল...অতুল অগ্রসর হইয়া যখন সেই দরজার কাছে গেছে ঠিক তখনই উড্ডীয়মান সেই পতঙ্গ পড়িল তেলের প্রদীপটার উপর—প্রদীপ নিবিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল···এবং চক্ষের নিমেষে অভয়া হাত বাড়াইয়া অতুলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইল—দুই বাহু দিয়া তার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। ]

* * *

অতুল। ( একা দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল,—) বসন্, ওঠো।

[ বসন্ উঠিল না—আরো দু'বার ডাকিবার পর বসন্তের ঘুম ভাঙিল। কান্নার মতো স্বরে সে বলিয়া উঠিল,— ]

বসন্ত। এ্যাঁ···কি বলছ? মা নেই?

অতুল। আছেন, আছেন। ওঠো, আমি শুতে যাবো।

বসন্ত। বউ?

অতুল। তা জানিনে; তোমার পাশেই বোধহয়।

বসন্ত। হ্যাঁ, আছে। ওগো, ওঠো শীগ্‌গির। অতুল ডাকছে, শুতে যাবে সে। কটা বাজল?

অতুল। দুটো।···লণ্ঠন আনি। [ বলিয়া অতুল লণ্ঠন আনিতে গেল ]।

বসন্ত। দুটোয় আমাদের ওঠার কথা। উঠি। ওগো, ওঠো। অতুল আমাদের যথার্থ বন্ধু। তার ঋণ আমি শুধতে পারব না। বুঝলে?

অভয়া। হুঁ। ওঠো এখন।

[ বসন্ত এবং তার আড়ালে আড়ালে অভয়া উঠিয়া আসিল—অতুল লণ্ঠন ভিতরে আনিল। আরতিকে তোলা হইল—অতুল সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল। ]

## সপ্তম দৃশ্য

[ সেই ঘরে পরদিন। সকালে দেখা গেল মহেশ্বরীর জ্বর না থাকারই মতো। বেলা দশটা হইতে বারটার মধ্যে হেমন্ত এবং তাঁর ভগিনীদ্বয় ক্রমান্বয়ে আসিয়া পড়িলেন—লোকে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। সর্বাগ্রে আসিলেন হেমন্ত, স্ত্রী এবং তিন-চারটি ছেলেমেয়ে লইয়া; তারপর আসিলেন এক ভগিনী, স্বামী এবং ছেলেমেয়ে লইয়া। এবং তারপর আসিলেন এক ভগিনী, একা। সবারই একই প্রশ্ন: "মা কেমন আছেন" ?—এবং উত্তর একটাই: "ভালই আছেন"। তারপর গৃহে কলরবের অন্ত রহিল না। হেমন্ত আসিয়াই মায়ের অবস্থা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে দেখিয়া একসঙ্গেই সন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হইয়া গেলেন; মাকে বলিলেন,— ]

হেমন্ত। মা, সবাই আমরা একত্র হয়েছি বড় সুখের কথা। তোমার বিপদ কেটে গেছে। এ আরো সুখের কথা। কিন্তু বসন্ত কাল একখানা তার করলে আমরা অনেকটা সুস্থপ্রাণে আসতে পারতাম।

[ মা একটু হাসিলেন মাত্র। ছেলেমেয়েরা নাতি নাতনীরা মহেশ্বরীর কাছে দাঁড়াইয়া বসিয়া খানিক জটলা করিয়া আমোদে মাতিয়া গেল···বধূদ্বয় এবং তাদের ননদদ্বয় যথারীতি সাদর সম্ভাষণাদি করিলেন··· ]

* * *

[ বৈকালে অতুল আর বসন্ত প্রায় একই সঙ্গে আসিল·· হেমন্ত অতুলকে অভ্যর্থনা করিল; হেমন্তর ভগিনীরা তাহাকে সম্ভাষণ করিল—হাসিমুখ সবারই···হেমন্ত বলিল,— ]

হেমন্ত। শুনলাম সব। তোমার মহিমাকীর্তন আমি কিছু করব না—ভগবানের খাতায় তা লেখা পড়েছে।

অতুল। হেমন্তদা, তুমিও কি ক্ষেপে গেলে না কি ওদের মতো ? বসন্ত যোড়হস্ত—খালি ঋণ-পরিশোধের উপায় খুঁজছে, আর, উপায় না পেয়ে হতাশ হয়ে যাচ্ছে। বসন্তের স্ত্রীও অত্যন্ত কুণ্ঠিত। কেবল আরতি বেচারা অত তলিয়ে বোঝে না বলেই বোধহয় ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার কথা বলছে না। [ হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিয়া অতুল আরো হাসিতে লাগিল ]।

বসন্ত। অতুল, চা খাও একটু।

অতুল। ঐ দেখো! ঋণ পরিশোধের ঐ একটা উপায় ও-র।···বেশ আনাও চা, খাই। আরতি, বলে আয়। [ আরতি চলিয়া গেল ]।

হেমন্ত। গান শোনাতে হবে কিন্তু।

অতুল। কিছুতেই না। বিয়ে দিলে ভাইয়ের; খোঁজ নিলে না; পর ভেবেছ নিশ্চয়। মায়ের অসুখে একটু তত্ত্ব তল্লাশ নিলাম—তাতে তোমরা ভারি অপ্রতিভ হয়ে গেছো। পর ভেবেছ নিশ্চয়।...এ বাড়ীতে আর আসাই চলবে না।—চা কই ?

আরতি। বৌদি করছে। [ বলিতে বলিতে আরতি আসিল। ভগিনীরা বলিল,—"কিন্তু অতুলদা, গান তোমাকে শোনাতেই হবে···" ]

অতুল। তোমার মায়ের কাছে শুনে এসো।

...শুনিয়া আসিয়া এক ভগিনী বলিল,—]

ভগিনী। মা বললে, ভালই লাগে।

[ কেবল অভয়া মহেশ্বরীর কাছে বসিয়া আছে, তাঁর দেহে হাত বুলাইতেছে ; মহেশ্বরী চোখ বুজিয়া আছেন। আর সবাই বসন্তের ঘরে অতুলের গান শুনিতে সমবেত হইয়াছে · অতুলের চা-পান শেষ হইয়াছে—]

—গান—

চঞ্চল জগতে কিছু নহে থির—
উথলিছে সিন্ধু ছুটিছে সমীর।
পূবে উঠি সূর্য পশ্চিমে নামে—
নাচিছে পল্লব দক্ষিণে বামে ;
অবিরাম গতিশীল নীর তটিনীর।
আজ যে কলিকা কাল সে ফোটে—
আজ যে সুদূরে কাল সে নিকটে ;
আজ মন দুঃখে ক্রন্দনাতুর—
কাল দেখা দেবে হাসি সুমধুর··
ছায়া কায়া আসে যায় তরল, গভীর।

[ সকলেরই মুখ উৎফুল্ল দেখাইল।]

হেমন্ত। চমৎকার...

অতুল। আমি উঠি এখন। নিজেরও একটা কাজ আছে ; আর, নার্স দুটিকে আসতে বারণ করে আসি।

হেমন্ত। এসো কিন্তু।

অতুল। কথা দিতে পারছিনে। [বলিয়া অতুল ওদিক্‌কার দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।]

হেমন্ত। একটু গম্ভীর যেন!

হাসি। হ্যাঁ, একটু গম্ভীরই। অত বেশী ঋণ-স্বীকার হয়তো ওঁর ভাল লাগে না।

## অষ্টম দৃশ্য

[ তিন-চারদিন পর : মহেশ্বরী কাল অন্নপথ্য করিবেন। হেমন্ত আসিয়া তাঁর কাছে বসিল ; বলিল,—

হেমন্ত। মা, এইবার আমরা যাই ? কাল তোমাকে ভাত দিয়ে দুপুরের গাড়ীতেই ?

মহেশ্বরী। কাজের ক্ষতি হচ্ছে ?

হেমন্ত। হচ্ছে, মা।···একটা কথা বলি। বড় বউয়ের মুখে শুনলাম, বউমা তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা। আমার ওখানে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চাই—স্বাস্থ্যকর জায়গায় শরীর ভালই থাকবে।···খুশী মাসকতক এখানে থাকতে পারবে বলেছে। বউমা প্রথমটা খুবই আপত্তি করেছিলেন—তারপর বড় বউয়ের কথায় রাজি হয়েছেন। তুমি কি বলো ?

মহেশ্বরী। নিয়ে যাও। আমার আপত্তি নেই। বসনকে শুদিও।
হেমন্ত। তারও অনিচ্ছা নেই।
মহেশ্বরী। কাউকে বলে ছোট বৌমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

[ হেমন্ত চলিয়া গেল। অভয়া আসিয়াছে ; মহেশ্বরী বলিলেন,— ]

মহেশ্বরী। বৌমা, বড় বৌমা আর হেমন্ত তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে রাখতে চায়। যাবে ?
অভয়া। আমি দিদির কাছে সম্মতি দিয়েছি, মা। বলেছি আপনি বারণ না করলে আমি যেতে পারি।
মহেশ্বরী। যাও। শরীর ভাল থাকবে বলছে ওরা।
অভয়া। যাবো।

* * * *

[ সেইদিনই বৈকাল। উঠানে ছেলেমেয়েরা জড়ো হইয়াছে—হাসাহাসি খেলাধুলা চলিতেছে...অভয়া প্রভৃতি উৎফুল্লমুখে রোয়াকে বসিয়া আছে...আরতি মায়ের কাছে ছিল ; সে আসিয়া মায়ের একটা আদেশ জাহির করিল : "ওরে, ছোড়দার বিয়ের সময় এসে তোরা কে কে নেচে নেচে যে-গানটা গেয়েছিলি তেমনি ক'রে সেই গানটা গা—মা বললে।" ]

ছেলেমেয়েদের একজন। আমি, ননী আর অবনী গেয়েছিলাম।
আরতি। গা তেমনি ক'রে।

[ মন্ডলাকারে দাঁড়াইয়া গেল···]

—গান এবং নাচ—

এসো মধুমাধব আনন্দ মাধব
আজি পূর্ণিমা রাতি অতি সুন্দর ;
এসো মম মন্দিরে, এসো মনোমন্দিরে
এসো নন্দকিশোর অতি সুন্দর।
মলয়-অনিল বহে স্নিগ্ধ শীতল,
কুসুমিত উপবন গন্ধ-উতল,
চরণে নূপুরধ্বনি এস নেচে নীলমণি,
এসো বংশীবদন অতি সুন্দর।
আলোকিত মেঘদল শিথিল অতি—
ভেসে আসে পরপর মৃদুল গতি ;
যমুনার নীলজল জ্যোছনা-উজল—
তীরে তীরে তরু-ছায়া কৃষ্ণ-কাজল ;
এসো গোপীবল্লভ এসো হৃদি-বল্লভ,
এসো ভুবনমোহন অতি সুন্দর ॥

[ মহেশ্বরী প্রভৃতি গান শুনিয়া ও নাচ দেখিয়া খুশী হইলেন। ]

## নবম দৃশ্য

[ মহেশ্বরী অন্নপথ্য করিলেন…অভয়াকে লইয়া হেমন্ত প্রভৃতি চলিয়া গেলেন —খুশী বোনটি এখানে রহিল। হেমন্তের বাড়ীতে অভয়ার মন যেন টেকে না. আনন্দ এবং আদর আর সাহচর্য সেবা প্রভৃতি দানের আয়োজন প্রচুর, তবু তার মন অতিশয় চঞ্চল—প্রেমাস্পদের চিন্তায় সে আনমনা আর অস্থির—নির্জনে থাকিতেই ভালবাসে—এমনি করিয়াই মাস চারেক কাটিল…তারপর ত্রিগুণা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন…পারুল প্রভৃতি দেখা করিতে আসিল ; কিন্তু আসর জমিল না…পারুল বলিল,—]

পারুল। তুই আর সে-মানুষ নেই, জোছনা !

অভয়া। কি হয়েছে ?

পারুল। বেজায় গম্ভীর।

[ অভয়া হাসিল। পিত্রালয়েই অভয়ার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল…তারপর সে তিন-চার মাসের কন্যাটিকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া শাশুড়ীকে পৌত্র এবং স্বামীকে পুত্র উপহার দিলো…আনন্দের অবধি রহিল না। অতুল আসিল—মেয়েটিকে কোলে লইয়া এত আদর আনন্দ করিল যে তার ইয়ত্তা নাই। অভয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া ; অতুল বলিল,—]

অতুল। খুড়ীমা, লোকে শিশুকে আদর করে সোনা মাণিক ব'লে—সাত রাজার ধন এক মাণিক ; কিন্তু সোনার মাণিকে হাত দিলে এত ভাল লাগে !

[ অভয়ার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। ]

মহেশ্বরী। তা সত্যি, বাবা…

বসন্ত। মেয়ে নিয়েই এত, ছেলে হলে কি করতে !

অতুল। এই রকমই—কোনোই পার্থক্য নেই…যার বুকের ভেতর থেকে এ এসেছে, ছেলেও তা-ই আসত। যারা ছেলে আর মেয়েকে ভিন্ন চোখে দেখে আমি মনে মনে তাদের তিরস্কার করি…

[ মহেশ্বরী সুখী হইয়া হাসিতে লাগিল—অভয়ার চক্ষু নিষ্পলক হইয়া রহিল। আরতি বলিল,—]

আরতি। মেয়ে যে নিয়ে থুয়ে চ'লে যায় !

অতুল। সে-অপরাধ কি মেয়ের ? আমরাই কেড়ে নিই, আমরাই কাড়তে দিই ; আর দোষ চাপাই মেয়ের ঘাড়ে। চায়ের নামও যে করছিস নে তোরা ?

[ অভয়া পা টিপিয়া সরিয়া গেল। ]

বসন্ত। আরতি, যা শীগ্‌গির—মেয়েটাকে নিয়ে যা।

[ আরতি মেয়ে লইয়া চলিয়া গেল। ]

* * * *

[ রান্নাঘর—আরতি আর অভয়া—আরতির কোলে মেয়ে…অভয়া স্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিল… ]

আরতি। অতুলদা, বড় ভালো লোক, বউদি !

অভয়া। হাঁ, একশোবার শুনেছি যে তিনি ভালো লোক। আজ নতুন কি ঘটলো বলো।

আরতি। তোমার মেয়েটাকে নিয়ে কত সোহাগ করলেন...তুমি দেখলে অবাক হয়ে যেতে।
অভয়া। অবাক আমি না দেখেই হয়েছি। আর, অবাক হবার কি আছে! যাদের মেয়ে তাদের আপন মনে করলে আদর করা আপনিই আসে।
আরতি। কিন্তু বিয়ে করতে চান না, ঐ একটা মস্ত দোষ।

[ অভয়া এ-কথার উত্তর তৎক্ষণাৎ দিলো না...একটু পরে বলিল,—]

অভয়া। তেমন ভাগ্যবতী মেয়ে বোধহয় নেই, যে ও'র মতো লোকের ঘরণী হতে পারে!
আরতি। ( হাসিয়া ) ত' কতকটা সম্ভব। [ চা প্রস্তুত করা হইল— ]
আরতি। তুমি দিয়ে এসো। আমি এ পুঁটুলিকে ছাড়ছিনে। [ বলিয়া দোল দিতে লাগিল —অভয়া চা লইয়া চলিল। ]

* * *

মহেশ্বরী। এইবার বিয়ে করো, বাবা। তোমার সমবয়সীরা ত' সবাই করেছে!
অতুল। ( গম্ভীরভাবে ) বিয়ে বড় বাঁধন, খুড়ীমা!...যেন পূর্বজন্মের ঋণ-পরিশোধ—কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে থাকে...
মহেশ্বরী। কে?
অতুল। সংসার। যেন পেয়ে বসে। কিন্তু বসন্ত আছে ভালো।
বসন্ত। কিসে?
অতুল। তোমাকে কিছুতেই কিছু পেয়ে বসে না... [ অভয়া চা লইয়া আসিল। ]
বসন্ত। চা নেও।
অতুল। ( অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া ) দিন, রাখুন।

[ অভয়া অতুলের সম্মুখে চা রাখিয়া চলিয়া গেল। ]

### দশম দৃশ্য

[ অতুলের বাড়ী—অতুল একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া তার সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া আছে...কাগজখানায় মাত্র তিনটি শব্দ লেখা আছে; অতুল তা আবার পড়িল: "আমায় উদ্ধার করো।—অ।" অতুল জবাব লিখিল: "পরশু রাত্রি বারটার পর। অ।" ]

* * *

[ তৃতীয় দিনে রাত্রি বারটার পর অতুল বাহিরে দাঁড়াইয়া—সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া অভয়া মেয়েটিকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ]

* *

[ পরদিন প্রাতঃকাল। বসন্তের গৃহ: বসন্ত পাখা লইয়া নিমীলিতনেত্রে বসিয়া আছে—পাখা নড়িতেছে না। মহেশ্বরীর চক্ষে জলধারা বহিতেছে—আরতি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে... ]

* * *

[ ঐ ঘটনার তৃতীয় দিনে...কালিকা ও ত্রিগুণার কাছে পত্র আসিয়াছে: "আপনাদের কন্যা কুলত্যাগ করিয়াছে"। ঐ পঙ্‌ক্তিটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া কালিকা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে... ত্রিগুণা নিঃশব্দ হইয়া তার কাছেই।

### একাদশ দৃশ্য

[ অতুলের কলিকাতাস্থ নূতন গৃহ—শৌখিন ধনীর গৃহের মতো মনোরম করিয়া সজ্জিত আর আরামপ্রদ করিয়া ব্যবস্থিত—একটি প্রকোষ্ঠে অতুল ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছে—পরম প্রফুল্লমুখে আর পরিপাটি সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া অভয়া অদূরেই টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে···মেয়েটি ক্ষুদ্র একখানি চৌকিতে শয্যায় শায়িতা···]

অভয়া। ( হাসিতে অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া ) বেঁচেছি···

অতুল। বুঝিয়ে বলো।

অভয়া। মা আমাকে টিপে ধরে রেখেছিলেন—বেরুতে দিতেন না, রাস্তার দিকে তাকাতে দিতেন না—ফুলের গায়ে হাত দিতে দিতেন না···

অতুল। কি বলতেন ?

অভয়া। যা বলতেন তার ভিতরকার মানে এই যে, মন-ভুলানোর আয়োজনে আর কাজ নেই।···বাক্যবাণে বিঁধে বিঁধে আমার মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ছাড়তেন। যন্ত্রণায় মনে হ'তো বেরুতে পারলে বাঁচি।

অতুল। বেরিয়ে বাঁচলে ?

অভয়া। না।...তোমাদের দেশে এসে দেখলাম আর অনুভব করলাম আর একরকম।. একটা অসাড় উত্তাপহীন লোক আমার জীবনের আর সুখের মালিক হলেন···

অতুল। তারপর ?

অভয়া। কোনোদিকেই সাড়া না দিয়ে দিয়ে যেন প্যাঁচ কষে কষে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে লাগলেন তোমার বন্ধু...তারপর তুমি একদিন এলে, হাসলে, কলরব করলে, গান করলে···

[ অভয়া যেন কৃতার্থ হইয়া অতুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ]

অতুল। তার ফল কি হল ?

অভয়া। আমার প্রাণ যেন মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলো—রক্তে গতি এলো···শরীরের প্রত্যেকটি রোমে আনন্দের স্ফুলিঙ্গ ফুটতে লাগল···তোমাকে পেলাম—

অতুল। পাওয়ার আগে ?

অভয়া। পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম। [ উভয়ে সুখে বিভোর হইয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিল···]

অতুল। মেয়ের নাম রেখেছ ?

অভয়া। হ্যাঁ। শান্তি।

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ শান্তি বড় হইতেছে···পাঁচ-সাত-দশ···ঘরময় বেড়ায়। শান্তি বাপের কাছেই পড়ে...অতুল অভয়ার কাছে জানিতে চায়,—"তুমি সুখী, তৃপ্ত ?" ]

অভয়া। হ্যাঁ। তুমি ?

অতুল। আমিও। আর একটু কাছে এসে দাঁড়াও।

[ অভয়া অগ্রসর হইতে থাকে…অতুলের 'কারে' দু'জনে বেড়ায় খুব—থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি খুব দেখে। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ সতের বৎসর পর। শান্তির বয়স এখন সতের। তার শরীরের গঠন-নিবিড়তা এমন চমৎকার পূর্ণাংগ যে, অভয়ার মনে হয়, তার তুলনা নাই। অতিশয় সুশ্রী মেয়ে ঐ শান্তি—সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকর তার চক্ষু দুটি—গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা আর, ভারি অস্থির; মনে হয়, গভীরতার ভিতরে এখন চঞ্চল একটা স্রোত বহিতেছে যার লক্ষ্য নাই, ইষ্টকর গন্তব্যক্ষেত্র নাই, প্রতি মুহূর্তে যার গতি পরিবর্তিত হইতেছে…অভয়ার অত্যন্ত ভয় এখানেই—তার মনে হয়, মেয়ে যেন কেবলি ভাবে, কাজের বেলায় ন্যায়-অন্যায় লঘু-গুরু বলিয়া বাধা কিছু নাই; দেখিতে হইবে, কাজে দুঃসাহস চাই কতটা, আর, তাতে নূতনত্ব আর কৌতুক কতটা! যত উদ্ভট আর উৎকট আলাপ তার আর কার সংগে তা জানা নাই, কিন্তু বাপের, অর্থাৎ অতুলের সংগে। অতুলের এবং অভয়ার চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়াছে—পরিবর্তনটা অভয়ারই বেশী—সে মোটা হইয়াছে, এবং তাহাকে বয়স্কা দেখায়, কিন্তু অতুল প্রায় তেমনিই আছে। অতুল শান্তিকে বিস্তর লেখাপড়া শিখাইয়াছে। নৃত্যনিপুণ শিক্ষকের কাছে শান্তি নৃত্যবিদ্যা শিখিয়াছে এবং ওস্তাদের কাছে এসরাজ বাজাইতেও শিখিয়াছে।…অতুলকে সে এসরাজ বাজাইতে শিখাইয়াছে। অতুল তার পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছে—শান্তিও আর একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছে…অভয়া সেই ঘরের বাইরের দরজার পাশে, ওদের অদৃশ্য স্থানে, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে বই উপুড় করিয়া নামাইয়া রাখিয়া গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চাহিল,—]

শান্তি। বাবা, তা কি সম্ভব?

অতুল। [ বইয়ের উপর দিয়া তাকাইয়া ] কি?

শান্তি। ঐ "প্লেটোনিক লাভ"!

[ অতুল না বুঝিয়া শান্তির দিকে তাকাইয়া রহিল…]

শান্তি। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হবে, অথচ স্ত্রী-পুরুষের নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হবে যা'তে তা আদৌ ঘটবে না—তা কি হয়?

অতুল। কোথায় পেলে এ-কথা?

শান্তি। একখানা ইংরেজী বইয়ে পড়লাম। একটি যুবক আর একটি যুবতী ঐ সর্তে বিয়ে করেছিল। স্ত্রীটি ছিল নর্তকী। নৃত্যকলায় চরমোৎকর্ষ দেখানোই ছিল তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—সব-কিছুকে বলি দিয়ে; কিন্তু জয়মাল্য পেতে হলে সবুর সয়ে থাকতে হয়…ছেলেটি তাকে ততদিন প্রতিপালন করতে রাজি হল। দুজনাই ঐ কলা নিয়েই উন্মত্ত…

অতুল। ( উৎসাহের সহিত ) তারপর?

শান্তি। খেয়ালের ঝোঁকে কিছুদিন বেশ চলল, ছেলেটি কাছে ঘেঁষে না ; চুম্বন পর্যন্ত নির্বিঘ্ন ; কিন্তু ক্রমশঃ ছেলেটির সম্বন্ধে দেখা গেল, রক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে ; হৃৎপিণ্ডে আঘাত করছে ; বললে, আমরা ভুল করেছি—তুমি এসো...

অতুল। মেয়েটি এলো ?

শান্তি। না। মেয়েটি বললে, উঁহুঁ, আমি আর্টের উপাসিকা, তপস্বিনী। তোমাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সাবধান, তুমি আমার সম্মুখে এসো না—তুমি অত্যন্ত দুর্বল, দুর্বল পুরুষকে আমি ঘৃণা করি। তুমি যাও·· ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে পেলে। কিন্তু একদিন হল কি...

অতুল। কি হল ? [ সাগ্রহে জানিতে চাহিল। ]

শান্তি। বাগানে সেদিন জ্যোৎস্না রাত। স্বামী বাগানে বসেছিল, অন্ধকার একটা জায়গায়। স্ত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে—মিহি ঢিলে একটা আঙরাখায় দেহ আবৃত ; বাহু তুলে সে চাঁদের দিকে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে রইল··· বাহু আন্দোলিত করে কাকে যেন সে আহ্বান করল···

অতুল। ( সস্মিতমুখে ) চমৎকার ছবিটি !

শান্তি। সে আহ্বান যাকেই করা হোক, ছেলেটির মনে হল যেন তাকেই···বাহুসঙ্কেতে সে অন্তরঙ্গ পুরুষকেই অশ্লেষে আহ্বান করেছে ; এতদিনে বুঝি স্ত্রীর নারীত্ব দুর্দমনীয় হয়ে জেগেছে, সে-আহ্বান আন্তরিকতায় এমনি গভীর আর উত্তপ্ত যে, ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসে দুর্বার হয়ে ছুটে এলো জ্যোৎস্নামণ্ডিত সেই অপরূপ মূর্তির কাছে—আত্মার প্রথম বরণ সার্থক করতে···

অতুল। ধন্য লেখক ! তারপর ?

শান্তি। কিন্তু তার আশা অমূলক। স্ত্রী তার কথা শুনে অবাক হয়ে বললে, সে তাকে ডাকেনি—জ্যোৎস্নালোকে স্ফুট স্ফূর্ত জীবনকে সে অনাদি অনন্ত অমর জীবন-স্রোতে ঢেলে দিয়েছিল। শুনে ছেলেটি সাদা হয়ে গেল—কাঁপতে লাগল [ বলিয়া শান্তি যেন ক্লান্ত হইয়া থামিল ; বলিল,—] আরো ঢের আছে ; অতো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বাবা !

অতুল। [ একটু হতাশ হইল ; কিন্তু হাসিয়া বলিল,··· ] শেষটায় কি হল ?

শান্তি। যাকে পেয়ে, অর্থাৎ যার আকর্ষণে আর স্পর্শে মেয়েটির যৌবন উদ্বেল আর পূর্ণ সত্তা উন্মুখ হল সেই পুরুষকেই সে আত্মসমর্পণ করল···

অতুল। স্বামী ?

শান্তি। সে বেশ্যাসক্ত হল।···আচ্ছা বাবা, যৌন-আকর্ষণ কি এমনি দুর্বার ?

অতুল। ( শান্তির চোখে চোখে চাহিয়া ) তা-ই ত' মনে হয়।

শান্তি। কিন্তু আমি ত' বোধ করিনে !

অতুল। সেই অর্থে উগ্র স্পর্শ তুমি পাওনি।...নারীর উপর পুরুষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই—পুরুষ জাগায়, তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে, আর, নিজেকে দান করে নিঃশেষ করে। এ-টা হবেই ; সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করে রেখেছে ঐ নিয়মটি...

[ পর্দা ঠেলিয়া একটু বেগের সঙ্গেই অভয়া প্রবেশ করিল—অতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,— ]

অভয়া। তোমার কি একেবারেই মতিচ্ছন্ন ঘটেছে? এতদূর ক্ষেপেছ তুমি?

[ শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল ঈষৎ হাস্য করিল, অর্থাৎ দেখো তামাশা! শান্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—]

শান্তি। মা একেবারে ষোল-আনা সেকেলে; পাঁজির মতো নিষেধে পরিপূর্ণ আর ঘাট বেঁধে দেওয়া।

অভয়া। শাসন করে সংযত রাখি আর কেমন করে! অতো অশুভ অন্যায় কথা আমি এখানে হতে দেবো না।···তোমরা সম্পর্ক ভুলেছ এমন একটা মোহের বশে যাকে ঘৃণা করতে যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তা-ও যেন পারিনে।

[ শান্তি মায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিল; সুন্দর ভাষায় আর সুন্দরতর ভঙ্গী-সহকারে সে বলিল,—

শান্তি। মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে; যত গ্লানি, অপরাধ, আর দুষ্টুমি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুণ। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করব কেন? শিক্ষা নেবো না?

অভয়া। এত বই পড়ে আলোচনার বিষয় পেয়েছ ঐ কথাগুলো! নেও শিক্ষে!

[ বলিয়া অতুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভয়া চলিয়া গেল। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ আর একদিন। অপরাহ্ন। শান্তি বলিল,—]

শান্তি। বাবা, এসরাজে তোমার হাত অতি চমৎকার; আমার চাইতেও ভালো, ভারি মিষ্টি। আমার কাছে শিখে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছাড়িয়ে যাও। গুরুজী সেদিন তোমার বাজনা শুনে গেলেন ত'! আমাকে বললেন, শান্তি, তোমার বাবা একটি অদ্ভুত প্রতিভা; শিক্ষকের শিক্ষাকে এমন দ্রুত আয়ত্ত আর উন্নত করতে আর কাউকে দেখিনি।

[ নিজের প্রশংসা শুনিয়া অতুল যথেষ্ট পুলকিত হইল; বলিল,—

অতুল। তার একটা মানে আছে।

শান্তি। মানেটা কি?—[ মানে জিজ্ঞাসা করিয়া মৌলিক কিছু শুনিবার আগ্রহে ঘাড় উঁচু করিয়া রহিল ··]

অতুল। তোর কাছে শিখতেই আমার কত আনন্দ! সেই মুখর আনন্দের আলাপ শুনে তোদের মনে হয়, মধুর সুরকে মধুরতর করা হচ্ছে···

[ বলিয়া অতুল যেন চুরি করিয়া হাসিতে লাগিল···তারপর বলিল,—]

অতুল। তোর মাস্টারের কাছে শিখলে ওটা হত না।

শান্তি। কেন? [ অতুল সঙ্গে সঙ্গেই কোনো জবাব দিলো না; একটু পরে, যেন একটা কিছু সহিয়া লইয়া বলিল,—]

অতুল। সে অন্য কথা।

[ শান্তি তখন জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল; বলিল,— ]

শান্তি। অন্য কথা থাক।·· কেমন মেঘ করেছে দেখো বাবা! অকালের মেঘ দেখে আমার খুব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটু বাজাবে, বাবা?

[ অতুলও মেঘ দেখিল : অপরাহ্নের সূর্যকে আবৃত করিয়া অত্যন্ত গাঢ় নীল পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—মেঘের অংগ লাবণ্যময়, আর, ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে··· চক্রবালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে·· বলিল, - ]

অতুল। বাজাবো। যন্তরটা দে।

[ শান্তি এস্‌রাজ আনিয়া দিলো ; বলিল,—]

শান্তি। তুমি ততক্ষণ সুর বাঁধো ; আমি সেজে আসি।

[ বলিয়া সে নাচের ভংগীতেই চলিয়া গেল। অতুল যন্ত্র বাঁধিল। শান্তি সাজিয়া আসিল : অতি উজ্জ্বল চওড়া লালপেড়ে মেঘবর্ণের শাড়ী ঘাগ্‌রার মতো করিয়া সে পরিয়াছে, আর, সর্বাংগে জড়াইয়াছে ঐ রঙেরই ওড়না ; ওড়নায় জরির পাড় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে ; গভীর কালো চুলের রাশি বিস্তৃত করিয়া এলাইয়া দিয়াছে···সমগ্র-কৃষ্ণ পরিবেষ্টনীর মাঝে তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে। দেখিয়া অতুল মুগ্ধ হইয়া গেল ; বলিল,- ]

অতুল। বাঃ......

শান্তি। মেঘ বিদ্যুৎ ঝড়। ( বলিয়া শান্তি হাসিল )।

অতুল। সেজে ত' এলে চমৎকার। কি বাজাবো ?

শান্তি। ( ভ্রূভংগী করিল ) তুমি যেন দিন-দিন নাবালক হচ্ছো বাবা !

[ এই ভর্ৎসনায় অতুলের আনন্দ দেখা দিলো ; যেন কৃতার্থ হইয়া সে বলিল,—]

অতুল। তা আমি জানি। কিন্তু নাচবে যে তুমি ! তোমার মন এখন কি বলছে আর কি চাইছে তা' আমি কি জানি !

শান্তি। জানো।

অতুল। আচ্ছা।

[ বলিয়াই অতুলের যেন সেই মুহূর্তেই মনে মনে প্রতীক্ষার আর আয়োজনের শেষ হইয়া গেল—শান্তির উদ্দীপ্ত দেহ-ভংগীর মাঝে সে একটা ছন্দ খুঁজিয়া পাইল...যন্ত্রের তারে তার একটিমাত্র আঘাতেই শব্দ যেন আত্মার আবেগে কল্লোলিত হইয়া উঠিল—তারপর তার বাজ্‌না শুরু হইল...শান্তি অপরূপ যন্ত্রের সহিত সর্বাংগ সংযত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে ধীরে তার দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল···নৃত্য শুরু হইল—বাহু দেহ চরণের গতি মর্মময় রূপ গ্রহণ করিল...অভয়া তার ঘরে ভূমিশয্যায় পড়িয়া প্রাণান্তকর বিক্ষোভে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল···হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল ; আপনমনেই বলিল : - "উৎসন্নে যাবার পথে কি ওদের এক মুহূর্তের জন্যও একটু চৈতন্যের উদয় হয় না যে তারা ভদ্রলোক ! নরকের ভয় নেই ! আমি কি করবো ! আমার কোনো ক্ষমতা নেই। বড় দুখিনী অসহায় আমি।" এ-ঘরে শান্তি নাচিতেছে ; নৃত্য ব্যঞ্জনাময় ; কুমারী সে—কেহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই—সে কিছুই জানে না, কিছুই সে গ্রহণ করে না। প্রেম তার অজ্ঞাত · তারপর, পুরুষ তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে—তার দেখা পাইয়াছে, কিন্তু পরিচয় পায় নাই—কুমারীর গুহ্য অন্তর-রহস্যে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ···তারপর সে প্রেমাভিলাষিণী, কিন্তু ছলনাময়ী...অতুলের হাতে যন্ত্র যেন সজীব হইয়া

সংগীত ধ্বনিত করিতে লাগিল···শান্তি ব্যঞ্জনা দিতে লাগিল : কুমারীর কল্পনার লাস্য আর কেলিপ্রবণতা তিরোহিত হইয়াছে···সে এখন মহিমময়ী ; জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার প্রেমে সে এখন প্রদীপ্ত—সে তার আত্মার সহচরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে ; সে এখন রাজ্ঞী অথচ পরিচারিকা, বিজয়িনী অথচ কোমলা, পূজারিণী অথচ উপাস্যা, রঙ্গিনী অথচ অপাপবিদ্ধা—পরবশার মতো চায় সবই, কিন্তু কাঁপিয়া সারা হয়, ; মন চায়, আরা না-চাহিবার ভান করে, আর ভয় পায়···তারপরই সহসা একসময় কুলভার্য্যা উদ্বেল প্রেমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্বস্ব সমর্পণ করে—পুরুষের আপন হয়···তারপর আসিল স্থিতি, গতি গণ্ডির ভিতর—শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাহুতি···ঐ ব্যঞ্জনাময় নৃত্য শেষ হইল। শান্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—মেঘ কাটিয়া অস্তমান সূর্যের আভায় পশ্চিমের আকাশ তখন লাল—ঘরেও তা প্রতিফলিত হইয়াছে—আর প্রতিফলিত হইয়াছে, শান্তির শ্রমে উত্তেজনায় রক্তাভ মুখমণ্ডলে, আর তার মুখের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয় স্বচ্ছতম ঘর্মে···( অভয়া তখন তার প্রকোষ্ঠে ব্যাপিয়া অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছে···) এ-ঘরে অতুল শান্তির মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল · শান্তি নিজেকে অধ্যয়ন করিয়া সুখভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল···অতুল টানা সুরে বলিল,··]

অতুল। আশ্চর্য।

শান্তি। ( হাসিতে হাসিতেই ) কি আশ্চর্য ?

অতুল। তুই।

শান্তি। কেমন নাচলাম, বাবা ?

অতুল। চমৎকার। কিন্তু প্রেমের তুই কি জানিস যে এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুললি ?

শান্তি। স্বপ্নে পেয়েছি। যাই, পোষাক বদলে আসি।

[ অভয়া বারান্দা দিয়া চুপি চুপি আসিয়া ঐ ঘরের পর্দা ঘেঁষিয়া দেয়ালের কাছে দাঁড়াইল শান্তি বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিল অতুল তখন কৌচে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে—শান্তি আসিয়া পালঙ্কে পা ঝুলাইয়া বসিল .. ]

শান্তি। বাংলা তিরিশে গগন খাস্তগীরের বাড়ীতে যে— [ পর্দা সরাইয়া অভয়া প্রবেশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল · শান্তি না থামিয়াই বলিতে লাগিল,— ] নৃত্য-প্রতিযোগিতা হবে তাতে আমি এই নাচটা দেখাব বাবা। আরো বারকতক রিহার্সেল দিতে হবে। তুমি বাজাবে, বাবা। তুমি বাজালে মেডেল আমি অনিবার্য পাবই ; ওস্তাদজীও খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। . মা এসে দাঁড়িয়ে আছে. ( বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া শান্তি হাসিল। অভয়া বলিল,— )

অভয়া। ঠাট্টা হচ্ছে ! ( অতুলকে বলিল,— ) তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা ছিল···( শান্তি বলিয়া উঠিল,— )

শান্তি। তোমার গোপনীয় কথা কিছুই নেই। আমি রসাতলে যাচ্ছি, বাবা তার সহায় — এই নিয়ে বাবাকে তুমি বকবে। এ-ই তোমার কথা—আমার সামনেই বলো।

[ অভয়া মেয়ের কথা ভ্রূক্ষেপও করিল না— অতুলকে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া অভয়া রাগের সহিত বলিল,—]

অভয়া। এখনো তোমার অন্ন খাচ্ছি, এ-ই আমার সব দুঃখের বড় দুঃখ।

[ বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পর্দা সরাইয়া সে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল···কিন্তু অতুল কিছুমাত্র বিদ্ধ হইল না--হাস্যপূর্বক বলিল,— ]

অতুল। অকারণ এবং অসম্বন্ধ।

*　　　*　　　*

[ রাত আটটা। অতুল এবং শান্তি টেবিলে বসিয়া আছে—শান্তির সম্মুখে বই খোলা। শান্তি মুখ তুলিয়া বলিল,— ]

শান্তি। বাংলা বইয়ের চাইতে ইংরেজি বই ভাল—একটুখানি নাম করা লেখকের ভিতরেই একটু-না-একটু মৌলিক চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, কি লিখনভঙ্গী থাকেই···

অতুল। বাংলা লেখকদের ভেতর কার বই ভাল লাগে বেশি ?

শান্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনি অনুমানের ওপর কিছু লেখেন নি—উপলব্ধ বিষয় নিয়েই লিখেছেন ; অর্থাৎ তাঁর লেখা দৈবাৎ উত্‌রে যায়নি। পরীক্ষামূলক থিওরীর দিকে না গিয়ে তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠার দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন মনে হয়। তুমি কি বলো ?

অতুল। তা-ই···

শান্তি। ইংরাজিতেও ন্যাকামি শুরু হয়েছে। পুরনো আমলের মেকলে, থ্যাকারে, এ্যাডিসনের ভাষা প্রবল নয়, বৃহৎ ; সেক্সপীয়রের এত নিজস্বতা আর পাঠান্তর যে বাঙালীর তার ভেতর হিস্যে পাওয়া শক্ত ; ইংরেজিতে অনুবাদ করা অন্যান্য দেশের বই পড়া কঠিন, নামগুলো কণ্টেসৃষ্টে উচ্চারণ করতে পারলেও বেশীক্ষণ মনে থাকে না। আধুনিক লেখকগণ বেশী প্রগল্‌ভ আর ধড়িবাজ, মাঝে মাঝে অত্যন্ত নগ্ন—এতটা প্রায়ই ভাল লাগে না ; প্রবন্ধ কি ভ্রমণবৃত্তান্তও ভাল লাগে না— মনে হয়, কুন্থন বড় বেশী।

[ বলিয়া শান্তি ঠোঁট বাঁকাইয়া রহিল···অতুল হাসিয়া বলিল,— ]

অতুল। তবে তুই চাস কি ? প্লেটোনিক লাভের বই ?

শান্তি। আমি চাই সরল আনন্দ। ডিকেন্স আমি খুব পড়ি।···[ পর্দায় ছায়া পড়িতেই শান্তি চেঁচাইয়া উঠিল,—] কে ওখানে ?

অভয়া। আমি। [ বলিয়া ঢুকিয়া পড়িল ; তার মনেই ছিল না যে, চাঁদ উঠিয়াছে, আর, এই ঘরটা পূর্বদ্বারী, এবং পর্দার উপর হঠাৎ তার ছায়া পড়িতে পারে। ]

অভয়া। তোমাকে দেয়া হচ্ছে সরল আনন্দ নয়, গরল—সেই আয়োজনই দেখছি।-- [ বলিয়া সে অতুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—তার চোখের উপর চোখ পড়িল ; বলিল,---] মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো তো ?

অতুল। নষ্ট করতে চাই তা তুমি জানলে কি ক'রে ?

অভয়া। তবে 'লাভের' কথা ওঠে কেন ? তুমি সরে থাকো না কেন ? ইচ্ছা করেই সরে থাকো না দেখে তা-ই মনে হয়। তুমি গুরুজন ; গুরুজনের সম্মান নষ্ট হচ্ছে, তা না বোঝার ভান করো কেন ! আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা ঘটেছে···তুমি মেয়েটাকে এমনিভাবে তৈরী করেছ যাতে ওকে দুদিনের আনন্দের সহচরী করতেই পুরুষে চাইবে—বিয়ের কথা ভাববে না।

অতুল। [ অত্যন্ত শান্তস্বরে ] তুমি যাও এখন।

অভয়া। যাই। কিন্তু আমি আর যন্ত্রণা সইতে পারছিনে; নিজেকে বইতে পারছিনে। এত ভয় আমি কোনোদিন পাইনি।

অতুল। ভয়ের কোনো কারণ নেই।

অভয়া। আছে। আমি তোমাকে চিনি।—[ বলিয়া অভয়া চলিয়া যাইতেছিল; শান্তি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল: "মা শোনো"! তারপর বলিতে লাগিল,— ]

শান্তি। তোমাদের কথা আমি বুঝলাম না কিছুই; কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা দুঃখের —তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে বলে ভয় করছ? সেটা কি মা? বাবার কি চরিত্রদোষ ছিল?

অভয়া। বলব একদিন।

অতুল। [ নির্বিকারভাবে বলিল,— ] তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

অভয়া। তা জানিনে। [ বলিয়া অভয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল...এবং শান্তি হঠাৎ জানিতে চাহিল, ]—মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?

[ এই প্রশ্নে অতুল একটু যেন কৌতূহলী হইল—মুখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিল। অভয়া কথা কহিল না—অতুল বলিল,— ] কেন বলো ত'?

শান্তি। আমি দেখি তা-ই। কোনদিন তোমাদের মুখে অপর কারো কথা শুনিনে—কারো চিঠি আসে না! আমার কি মামা মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা কেউ নেই?

অতুল। আছে...

শান্তি। তবে?

অতুল। তারা আমাদের খোঁজ নেয় না—আমরাও তাদের খোঁজ নিইনে।

শান্তি। কখ্খনো না?

অতুল। না।

শান্তি। অপরাধ?

অভয়া। অপরাধ ওঁরই; উনি তা অস্বীকার করুন দেখি!

[ মুখ চোখ দেখিয়াই মনে হইল, অতুল যেন বিপন্ন হইয়াছে—মনে মনে ভারি ছটফট্ করিতেছে; নিষ্পলকচক্ষে সে কয়েক মুহূর্ত অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন করুণা প্রার্থনা করিয়া...মুখে সে বলিল, ] তুমি এখন কি পড়ছিলে?

[ জিজ্ঞাসা করা হইল অবশ্য শান্তিকেই; এবং শান্তিই বলিল, — ] তুমি কথা চাপা দিচ্ছ, বাবা। আচ্ছা, তা-ই হোক্—অতীতকে আর কথা কইয়ে কাজ নেই। [ বলিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল,— ] পড়ছিলাম প্রাইড্ এ্যাণ্ড্ প্রেজুডিস্; কিন্তু বলছিলাম যে, ডিকেন্সের লেখায় আমি যেমন সরল আনন্দ পাই, অপর কারো লেখায় তা পাইনে। কিন্তু মা এসে রসভঙ্গ করে দিলে। তুমি যাও মা।

[ উভয়েরই কাছে অপ্রতিভ হইয়া অতুল কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া রহিল...অভয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং বাহিরে আসিয়া সে ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ]

## তৃতীয় অঙ্ক

### চতুর্থ দৃশ্য

[ অভয়ার শ্বশুরালয় অর্থাৎ বসন্তের বাড়ী···বসন্ত পুনরায় বিবাহ করিয়াছে—চার-পাঁচটি পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—বসন্ত এখন প্রৌঢ় এবং পাখাখানা ত্যাগ করে নাই—আরতি অনুপস্থিত—মহেশ্বরী অথর্ব—বধির এবং অন্ধ। ]

* * *

[ অভয়ার পিত্রালয়, অর্থাৎ কালিকা ও ত্রিগুণার বাড়ী। ত্রিগুণার বহুদিন পরে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে—বয়ঃক্রম বার এবং আট। বয়স বাড়িবার লক্ষণ স্বামী স্ত্রী উভয়েরই শরীরে প্রকট হইয়াছে। ]

* * *

[ অতুলের পল্লীর বাড়ী—অতুলের অংশে তালা দেওয়া—অপরাংশে তার দাদা সপরিবারে বাস করিতেছেন। ]

### পঞ্চম দৃশ্য

[ অতুলের কলিকাতার বাড়ী। অতুল আর শান্তি সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিল. শান্তি অতুলকে বৈঠকখানায় বসাইয়া উপরে গেল·· এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া মাকে ছাদে পাইয়া শান্তি বলিল,— ] মা, একটা খবর শোনো—ব্যাপারটা বোধহয় তোমাদের জীবন-রহস্যের সঙ্গে জড়িত।

[ বলিয়া সে অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল···অভয়া চকিত হইয়া উঠিল কিন্তু অগ্রসর হইয়া আসিল। ]

শান্তি। বাবা আর আমি রাস্তায় বেড়াচ্ছি, হঠাৎ সামনে পড়ে গেল একটা ভদ্রলোক : কিন্তু সেই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে দেখেই বাবার সে কি থতমত খাওয়া আর পালাবার চেষ্টা ! বাবা যেন চোর—ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছে !

অভয়া। সে লোকটা কি করল ?

শান্তি। চোখ বড়ো ক'রে বাবার রকম দেখতে লাগল।···যেতে যেতে অনেকক্ষণ পরে পিছনে তাকিয়ে দেখি, সে দাঁড়িয়েই আছে, ঠিক সেখানেই, আর, আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে।

অভয়া। মুখখানা কেমন ? কতকটা ও'র মতো দেখতে ?

শান্তি। না, বাবার মতো নয়, তোমার মতো ত' নয়ই। কে, মা ? চেনা মানুষ নিশ্চয়ই ; আর, তার কাছে বাবা লজ্জাকর গুরুতর অপরাধে অপরাধী, এও নিশ্চয়। ব্যাপারটা কি ? তুমি নিশ্চয়ই জানো।

[ অভয়া কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল, ] তা ত' জানিনে ! খুব বুড়ো নাকি লোকটা ?

[ বিরক্ত হইয়া শান্তি বলিল,— ] বুড়ো বই কি ; বয়েস ঢের হয়েছে মনে হল। আরো যদি বর্ণনা চাও, দিতে পারি। খুব ফর্‌সা রং, লম্বা, মোটা নয় বেশী, তবে

পাত্‌লাও নয়। হদিশ পেলে ? ভাল কথা, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই—টাকার মানুষ বলে মনে হল—টাক পড়ে আসছে। তোমরা দিনদিন আমাকে বিষম করে তুলছ তা জানো !

[ অভয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,— ] উনিই চেনেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে আমার কাছে এসেছিস্‌ কেন, মা ?

শান্তি। যাই।...[ বলিয়া শান্তি অতুলের কাছে আসিল ; অভয়াও তার সঙ্গে নামিয়া আসিল··· ]

শান্তি। বাবা, যে-লোকটাকে দেখে তুমি পালালে সে-লোকটা কে ?—

[ জিজ্ঞাসা করিয়া শান্তি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল··· ]

অতুল। সেই লোকটা ? আমাদের পরম শত্রু।

শান্তি। শত্রু ?

অতুল। হ্যাঁ। আমাদের চূড়ান্ত অপকারের চেষ্টা করেছিলো, আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে···

শান্তি। কখন ?

অতুল। যখন আমি আর দাদা পৃথক হবার কথা তুলেছি। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার ভেতর ও-লোকটার আসার দরকারই ছিল না ; আমরা কেউ তাকে ডাকিওনি ! দাদাকে ওকালতী কুপরামর্শ দিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতেই দিলাম একদিন দমতক্‌ প্রহার। সেই থেকে লোকটা পরম শত্রু হয়ে আছে···

[ বলিবার পরই অতুল একটা প্রাণখোলা উচ্চহাস্য ধ্বনিত করিল ]

শান্তি। ( সন্তুষ্টচিত্তে ) তা-ই বলো। ঠিক্‌ করেছিলে।

[ অভয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বাহির হইয়া গেল। ]

অতুল। একটা গান শোনা, শান্তি। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে ঐ লোকটাকে দেখা অবধি ··

শান্তি। কেন, বাবা ?

অতুল। আমরা আরও ভালভাবে থাকতে পারতাম, আর, দাদা অত পর হয়ে যেত না যদি ঐ লোকটা মাঝে না পড়ত।···অনেক কথা ; বলা কঠিন, দরকারও নেই। এসরাজটা আন···

[ শান্তি এসরাজ লইয়া আসিল ]

—গান—

ওগো নিষ্ঠুর—<br>
পথের আলোক নিবায়ে আমারে<br>
ডুবালে অন্ধকারে,<br>
পাথেয় হরণ করিয়া আমায়<br>
ভরে দিলে হাহাকারে···<br>
মোর যেতে হ'বে বহুদূরে।<br>
যাহারে বন্ধু করেছিনু মনে—<br>
চলে গেছে ফেলি নির্জ্জন বনে,<br>
কণ্টকক্ষতে দুর্গম পথ

ভিজিছে শোণিতধারে—
ওগো নিষ্ঠুর,
মোরে যেতে হবে বহুদূরে।
সিন্ধুর গুরু আহ্বান আসে
আকুল অবিশ্রাম—
রেখেছে পাতিয়া বিরাট বক্ষ
পুরাতে মনস্কাম…
দাও পথ দাও, দাও পথে আলো,
পথ খুঁজি খুঁজি জীবন ফুরালো…
প্রিয়তম মম কাঁদে অভিমানে
একা সেই পারাবারে—
ওগো নিষ্ঠুর,
মোরে যেতে হবে বহুদূরে।

* * *

[ বেলা ৪৷৷ টা—অতুল এবং শান্তি ছোট্ট টেবিলের উপর ছক পাতিয়া দাবা খেলিতে বসিয়া গেছে। সময় কাটে না বলিয়া অতুল শান্তিকে ঐ খেলা শিখাইয়া লইয়াছে ; কিন্তু শান্তি এখনো বেজায় কাঁচা। তাহাকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে অতুল সময়-সময় অত্যন্ত সংকটে পড়িবার এবং দুশ্চিন্তার ভান করে। এখন তা-ই করিতেছে—বলিল,— ]

অতুল। তা-ই ত'। বেজায় মুশকিলে ফেললি…

[ ভাবিতে লাগিল…শান্তিও পরবর্তী চাল ভাবিতেছে…ওদিকে অভয়ার এ-ঘর ও-ঘর করিয়া পরিভ্রমণের বিরাম নাই…ঘুরিতে ঘুরিতে অভয়া উহাদের খেলার কাছেই আসিল—নিকটবর্তী চৌকিতে বসিল…অতুল ছকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অভয়ার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—তারপর ছকের দিকে তাকাইয়া তাহাকে বলিল,— ]

অতুল। সাহায্য করো না গো একটু ! শান্তি বড় সমস্যায় ফেলেছে…তুমিও ত' খেলতে।

অভয়া। আমি ত' পাগল ! আমি তোমাকে খেলা দেখাব কি ?

[ বলিয়া অভয়া উঠিয়া দাঁড়াইল…অতুল 'বল' চালিল—বলিল,— ]

অতুল। ঠিক

[ অভয়া চলিয়া গেল। শান্তি চালিল—অতুল বলিল,— ]

অতুল। ভুল করলে। আমি ঘোড়ার কিস্তি দিলে তোমার মন্ত্রী যায়…

[ শান্তি চমকিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল,— ]

শান্তি। তা-ই ত'! আমি ফেরৎ নিচ্ছি।

অতুল। না ; সে কথা ত' ছিল না।

শান্তি। তা-ই বলে আমি মন্ত্রী মারা দেব !

[ বলিয়া যে-বড়েটা সে চালিয়াছিল তাহাকে তুলিতে গেলেই অতুল খপ্ করিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল…]

শান্তি। আমার সঙ্গে খেলায় জিততেও তোমার এত আগ্রহ !

অতুল। ( হাত ছাড়িয়া দিয়া ) আগ্রহ আগে ছিল না—আজ হয়েছে···
শান্তি। কেন ?
অতুল। অমনি, খেয়াল ! সব-বিষয়ে আগ্রহ কি প্রত্যহই থাকে !···সিনেমায় যাবি, শান্তি ? 'মাধুকরী' ছবি খুব ভালো হয়েছে।
শান্তি। কিন্তু খেলা যে শেষ হ'ল না !
অতুল। ( উঠিতে উঠিতে ) ঐ হয়েছে—তুমি পেরে উঠলে না।
শান্তি। ( উঠিতে উঠিতে ) হ্যাঁ, তা-ই বই কি !
অতুল। যাবি ?
শান্তি। যাবো।

* * *

[ অতুল আর শান্তি সাজিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া অভয়া জিজ্ঞাসা করিল— ]
অভয়া। কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?
শান্তি। সিনেমায়।
অভয়া। ( অতুলের প্রতি ) দুজনে পাশাপাশি বসে দেখবে আর শুনবে ?
অতুল। ভালোর বেলায় চোখ কান খুলে আর মন্দের বেলায় চোখ কান বন্ধ করে ত' থাকতে পারব না—দু রকমই দেখতে আর শুনতে হবেই !
অভয়া। ( ভ্রূভঙ্গীপূর্বক ) আমাকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ারই মতলব ছিল তোমার !
অতুল। ( ঈষৎ হাসিয়া ) তুমি ত' দেখে এলে একেবারে !
শান্তি। চলো, বাবা। সময় নেই বেশি।
[ অভয়া পিছন ফিরিল—ওরা নামিয়া গেল। ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ সিনেমা হল—ছবি দেখানো চলিতেছে···একটা স্থানে নায়িকা অপর্ণা বলিতেছে: "তবু তুমি আমাকে চাও পরিণীতা স্ত্রীরূপে" ? নায়ক নরেন্দ্র: "চাই, অপর্ণা। তুমি সন্তানের উদরান্নের জন্য বহু পুরুষের পরিচর্যা করেছ ; তবু, আমি জানি, তুমি কায়মনোবাক্যে আমারই ছিলে"···দর্শকগণ করতালি দিল—অতুলও দিল। সিনেমা দেখা শেষ হইল—ওরা বাহির হইয়া আসিল ··]

## সপ্তম দৃশ্য

[ 'শো' শেষ হয় সাড়ে ন'টায় ; কিন্তু এখনো অতুল আর শান্তি ফেরে নাই—রাত দশটা বাজে। এই বিলম্বেই অভয়া উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে—নিজেদের 'কারে' গিয়াছে, তাতেই ফিরিবে—আট দশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। · ছটফট করিতে করিতে অভয়া যাইয়া দাঁড়াইল দরজায়, কিন্তু সেখান হইতে বড় রাস্তায় যে উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে, একটা বাড়ীর গায়ে তারই খানিকটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।...অভয়া

ফিরিয়া আসিল—জানালায় যাইয়া দাঁড়াইল ; সেখান হইতে দেখা গেল ঊর্ধ্বগামী আলোকপুঞ্জের আভায় উজ্জ্বল খানিকটা শূন্য—তার উপরে অন্ধকার—তার উপরে নক্ষত্র···সরিয়া আসিয়া সে দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ···দূরে একটা উচ্চ শব্দ হইতেছিল, যন্ত্রের গর্জনের মতো—সেই শব্দের দিকেই সে যেন চোখ মেলিয়া রহিল...তারপর যাইয়া সে শুইয়া পড়িল মাটিতেই। রাত তখন সওয়া দশটা ; ওরা এখনো ফেরে নাই...শুইয়া থাকিতে থাকিতে তার সর্বাঙ্গ একবার নড়িয়া উঠিল—একটা অনুচ্চ উঃ আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল—ছাদে গেল—কোনোদিকেই না তাকাইয়া নামিয়া আসিল—শান্তির পড়িবার ঘরে গেল—সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ গেল নিজের শুইবার ঘরে—পাতা বিছানা টান মারিয়া উল্টাইয়া দিল—বসিয়া পড়িল...আপনমনেই বলিল,—]

অভয়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে—কিন্তু যে উত্তাপ দিয়ে গলিয়েছিল সে আজও পরম আনন্দে আছে···

[ তখনই পাওয়া গেল সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ—অভয়া স্তব্ধ হইয়া নির্নিমেষচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর দ্রুতপদে গেল উপরে যেখানে সিঁড়ির শেষ হইয়াছে—শান্তি হাসিতে হাসিতে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল—তার পশ্চাতে অতুল ; তারও হাসিমুখ···শান্তি বলিল,—]

শান্তি। মা হয়তো ভাবছিল, মোটর অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে আমরা হাসপাতালে চালান গেছি, তা-ই ভাবছিলে না, মা?

[ অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে অভয়া বলিল,—]

অভয়া। না, আমি তা ভাবিনি। এত দেরী হল যে?

[ কৌতুকে পুলকে ছিটকাইয়া উঠিয়া শান্তি বলিতে লাগিল,—]

শান্তি। বাবার কি কাণ্ড! মটোর ফেরৎ দিয়ে বললে, চলো হেঁটে যাই। তারপর রাস্তায় আসতে আসতে বাবার বারবারই দাঁড়ানো শুরু হল ঃ ভিখিরীটা কেমন ভঙ্গী ক'রে বেঁকেচুরে শুয়ে আছে, তা' দেখল দাঁড়িয়ে ; চানাচুরওয়ালার সুর-ভাঁজা আর বুলি শুনল দাঁড়িয়ে ; রেলিং-এ লটকানো ছবি দেখল দাঁড়িয়ে ; একটা শতচ্ছিন্ন কাপড়পরা মেয়েমানুষ বসে আছে পা ছড়িয়ে—একটা উলঙ্গ ছেলে আছে তার পিঠের উপর উপুড় হয়ে, তা' দেখল দাঁড়িয়ে! ইত্যাদি···ইস, এগারোটা বাজে যে!

অভয়া। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে, ; শেখানো কথা—উনি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বলতে। তুমি পাষাণ, পাষণ্ড!

[ অত্যন্ত ঝাঁঝালো সুরে শান্তিকে অবিশ্বাস করিয়া আর অতুলকে গাল দিয়া অভয়া প্রস্থান করিল। শান্তি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল—বলিল,—]

শান্তি। মা বলতে চায় কি! হঠাৎ ক্ষেপে গেল না কি! তোমাকে মা কেন গাল দিয়ে গেল?

[ নির্লিপ্তভাবে অতুল বলিল,—]

অতুল। ঈশ্বর জানেন! চিরকালই দেখে আসছি, মাঝে মাঝে অমনি আবোল তাবোল বকে।

[ আহারান্তে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে উহারা বিশ্রম্ভালাপ করিতে বসে—এ নিয়মটি আজও প্রতিপালিত হইতেছে। শান্তি বলিল, ]

শান্তি। ছবিখানা দেখে বেশ আনন্দ পেলাম, বাবা। অভিনয় উচ্চাঙ্গের নয়, বাবা ?

অতুল। হ্যাঁ।

শান্তি। নায়কের কণ্ঠস্বরের চমৎকার তাৎপর্য্য আছে—বেশ খেলে। কিন্তু নাচটার তারিফ করতে পারছিনে। ব্যঞ্জনার চাইতে ঢং বেশী…

অতুল। অত হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি আমি।

শান্তি। বাবা, মা যদি দেখে তবে কি বলবে! মূর্চ্ছা যাবে হয়তো।…সন্তানের উদরান্নের জন্য নানা পুরুষের পরিচর্য্যা করা—অথচ কায়মনোবাক্যে যথার্থ সতী! উঃ, মা তা ভাবতেই পারে না।

[ বলিয়া শান্তি হাসিয়া উঠিল। অতুল কেবল বলিল,—]

অতুল। হুঁ।

শান্তি। কিন্তু ধন্য নরেন্দ্র। সেই মেয়েটিকেই ভালোবেসে বিয়ে করলে! ঐ জায়গাটায় কি-রকম হাততালি পড়ল! তুমিও ত' হাততালি দিয়েছিলে, বাবা।

অতুল। না, আমি দিইনি।

শান্তি। দিয়েছিলে………

[ অতুল আবারও অস্বীকার করিল,— ]

অতুল। না, আমি দিইনি।

[ ক্ষিপ্ত একটা মেজাজের উপর অভয়া বলিয়া উঠিল,—]

অভয়া। তুমি নিশ্চয় দিয়েছিলে। তাইতেই ত' এত রাত হল! তোমার চরিত্র চিরকাল কু।

[ শান্তি বিহ্বলের মতো তার বাপের মুখের দিকে তাকাইল ; সে নির্বিকার-চিত্তে অন্যদিকে তাকাইয়া আছে…মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তার চোখে প্রচুর জল আসিয়াছে……শান্তি মায়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়াই বলিল,—]

শান্তি। ব্যাপার কি তোমাদের! মা তোমাকেই আমি দোষ দিই। বাবার চরিত্র কু হলেও সে-ইঙ্গিত বারবার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ! আমাকে জানানো উচিত নয়।

অভয়া। তোকে ও কুসংসর্গ দিচ্ছে—কেন বলব না ? পড়ায় তোকে কদর্য্য বই, নাচায়, কথা কয় খারাপ খারাপ—আমি চুপ করে থাকব ?

[ তারপর একটা নিরানন্দের মাঝে তিনজনই চুপ করিয়া রহিল…শান্তি বলিল, ]

শান্তি। তোমাদের পরস্পরের আক্রোশ আর বোঝাপড়ার মধ্যে পড়ে আমি গেলাম যে! আমার মনে যে কথাগুলো জমেছে তা আমি এখনই বলব। নিরীহ ভদ্রলোককে পথে দেখে বাবার চোরের মতন পলায়নের কারণ গভীর—পারিবারিক কারণে বিবাদ নয়। বাবার কুশিক্ষায় আর প্রশ্রয়ে আমি অধঃপাতে যাচ্ছি, মায়ের এ উদ্বেগ অকারণ কিন্তু স্বাভাবিক ; মায়ের সেকেলে মনে আর শ্লীলতাবোধে তা আঘাত করতে পারে···কিন্তু মা গোপনে লক্ষ্য রাখতে সচেষ্ট কেন ? মা প্রকাশ্যে আমাকেই শাসন কি সাবধান করে না, যতো আক্রোশ বাবার প্রতি—যত ভর্ৎসনা তাঁকেই ; আর, এমন কি ঘটেছে যে কাঁদতে হবে! মা

খুব কাঁদেও।...আজকার শেষ কথা এই যে, আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারা জীবনে কেউ একবার দেখা করতে এল না। সে দুষ্কৃতিটা কি যার দরুন সবাই দূরে সরে আছে একেবারে চিরদিনের মতো !...তোমাদের বলবার আছে—মা, বাবা ?

[ কেহ কথা কহিল না—শান্তি বলিল,— ] যাই।—[ চলিয়া গেল। অতুল অভয়ার দিকে চাহিয়া বলিল,— ] কঠিন করে তুললে এতদিন পরে।

* * *

[ রাত্রি তখন অনেক। অভয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—মেয়ের ঘরের দরজায় গেল—চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল···ডাকিল, ] শান্তি ?

[ শান্তি ঘুমায় নাই ; বলিল,— ] কে ?

অভয়া। আমি, তোর মা। উঠে আয়, কথা আছে।

[ শান্তি উঠিল—দরজা খুলিয়া বাহিরে, মায়ের সম্মুখে আসিল, বলিল,— ] চলো, শুনিগে।

[ উভয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠিল, এবং উঠিয়াই অভয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—চরম ব্যাকুলতার সহিত মেয়েকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া যে কথা অভয়া জানিতে চাহিল তাহা অভাবনীয়—বলিল,— ] আমি পাগল হয়ে গেছি ; আমার বুক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে··· [ তারপর অভয়া জিজ্ঞাসা করিল,— ] বল সত্যি করে, শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি ত' ?

[ এ-প্রশ্ন মানুষকে কেবল অবাক নয়, পাণ্ডুর করিয়া তুলিবার পক্ষেও যথেষ্ট—শান্তি পাণ্ডুর হইয়া উঠিল—মায়ের স্পর্শ ত্যাগ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,— ]

শান্তি। নষ্ট করার মানে কি ? আর "ও" বলে তুমি কার কথা বলছ ?

অভয়া। বেটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিসনে ?

শান্তি। বুঝলাম। কিন্তু "ও" মানে কে ?

অভয়া। অতুল।

[ শুনিয়া শান্তি যেন বুকে ঘা খাইয়া নড়িয়া উঠিল, আর সরিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, ]

শান্তি। বাবার কথা বলছো ?

অভয়া। হ্যাঁ। ও ইচ্ছে করলে যে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।

শান্তি। তুমি সত্যই ক্ষেপে গেছ, মা—একেবারে উন্মাদ হয়েছ ; নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে ! বাবা, চরিত্রহীন, এ-কথা তুমি অনেকবার বলেছ ; কিন্তু এ কি কথা তোমার মুখে ! বাবা—

[ বাধা দিয়া অভয়া বলিল,— ] ও তোর বাবা নয়, কেউ নয় ; তোকে তিন মাসের কোলে নিয়ে আমি ও-র সংগে কুলত্যাগ করেছিলাম···[ বলিতে বলিতে হঠাৎ অভয়া নিঃশব্দ আর মুদিতচক্ষে ধীরে ধীরে অধোমুখ হইয়া গেল। শান্তির একটা নিঃশ্বাসপতনের শব্দ হইল··· ]

## অষ্টম দৃশ্য

[ পরদিন প্রাতঃকাল ! অতুল ও শান্তির একত্র বসিয়া প্রাতর্ভোজনের সময়— অতুল টেবিলে বসিয়া আছে—খবরকাগজ খুলিয়া লইয়াছে···কিন্তু শান্তির এখনো দেখা নাই...অতুল দরজার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে··· ভৃত্য চা লইয়া আসিল— ]

অতুল। দিদিমণিকে ডেকে দে। বল্ যে বাবু বসে রয়েছেন। আর, তার চা নিয়ে আয়।

[ ভৃত্য চলিয়া গেল—অতুল একবার খবরের কাগজের দিকে একবার দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল...ভৃত্য শান্তির জন্য চা লইয়া আসিয়া খবর দিল, ] দিদিমণি আসছেন ; মুখ ধুচ্ছেন—তাঁর উঠতে আজ দেরী হয়ে গেছে বললেন।

[ ভৃত্য চলিয়া গেল—এবং দুই মুহূর্ত পরেই শান্তি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং কন্যার নবতর রূপ দেখিয়া অতুল বিস্মিত হইয়া গেল—শান্তি তার চুলগুলি আজ জড়াইয়া বাঁধে নাই—এলানো আছে ; অনেকগুলি চুল তার কাঁধের উপর দিয়া বাহুর উপর পড়িয়াছে--ললাটের খানিকটা চুলে আবৃত— চক্ষু জাগরণক্লান্ত·· অনতিপূর্বে উদিত সূর্য্যের আভা তার মুখে—বস্ত্র পরিবর্তন না করার দরুণ তার আকৃতিতে একটা শিথিলভাবই যেন পরিস্ফুট হইয়া আছে...অতুল উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু একটি কথায় শান্তি তাহাকে নির্বাপিত করিয়া দিল—বলিল, ] প্রাতঃপ্রণাম, অতুলবাবু।

অতুল। মানে ?

[ বলিতে বলিতে অতুল ঋজু আর শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শান্তি বলিল,— ] মানে বলি। বসি আগে। [ বলিয়া বসিল ; তারপর বলিল,— ]

শান্তি। মা আমাকে বলেছে—যা বলেছে তা অন্য ভাষায় এই যে, আপনি আমার বাবা নন্,—আপনি আমার মায়ের উপপতি, মা আপনার উপপত্নী। শুনতে কেমন লাগলো ?

অতুল। ভালো না। হঠাৎ শুনতে ভালো লাগল না।

শান্তি। হ্যাঁ, ভালো না, যন্ত্রনাপ্রদ। প্রেমের বৈজয়ন্তী যতই উজ্জ্বল উদার হোক, আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে তাই ঘরের ভিতর উড়িয়েছে, এ-কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

অতুল। কিন্তু উল্টো কথা আগে ঢের বলেছ !

শান্তি। বলেছি . কিন্তু সুশিক্ষার পরিচয় দিয়েছি •বলে এখন ভাবতে পারছিনে।... উপপতি উপপত্নী শব্দ দুটো আপনারও ত' ভাল লাগল' না ; আপনি ত সগর্বে বলতে পারলেন না, শব্দে কি আসে যায় ! জীবন সার্থক হয়েছে, প্রেম লাভ করেছি দান করেছি ! আপনি এ-কাজ কেন করেছিলেন ?

[ এতক্ষণে তাল সামলাইয়া লইয়া অতুল ধাতাস্থ হইয়া বসিয়াছে ; লঘুকণ্ঠে বলিল,— ]

অতুল। তা আমিই সব বলতে পারব না ; তোমার মা-ও কতকটা জানেন ; তবে মোটামুটি কথা এই যে, পরস্পরের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে আমরা এ-কাজ করেছিলাম।

শান্তি। তা সত্যি নয়। মায়ের সন্দেহ, আপনি আমাকেও নষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করেন। মায়ের এই সন্দেহ থেকেই বুঝতে পারি, আপনি অগ্রসর হয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন...এই যে মা!

[ অভয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল—তার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গেছে; তাহাকে যে কত জীর্ণ দেখাইতেছে তাহা বলিবার নয়। অতুল অভয়ার দিকে তাকাইয়া বলিল,—এস। সুপ্রভাত জানাই।—

[ বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসিল। শান্তি মাকেই বলিতে লাগিল,—]

শান্তি। তোমরা পরস্পরের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে ফলাফলের যে ঝুঁকি নিয়েছিলে তা তোমরা পাওনি—এখনও তা-ই খাড়া আছে। তোমাদের রীতিনীতি হিতাহিত সুখদুঃখ তোমাদেরই থাক; কিন্তু আমাকে তুমি নিয়ে এসেছিলে কেন? আমার ঘরে আমাকে ফেলে রেখে আসনি কেন?

[ অভয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—] তুই যে সন্তান!

শান্তি। সন্তান বলে মমতা যদি থাকবে তবে সন্তানের দুকুল নাশ করিবার আগে তুমি ভেবে দেখতে! সংসারে আমার কেউ নেই। আমি কোনো দোষে দোষী নই; তোমাদের দোষ, তোমরা আমার পর; তোমাদের দোষে তারা আমার পর; আমার জন্মক্ষেত্র আমার পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান···এর চাইতে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি হতে পারে!

[ অভয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল ঃ ]—"শান্তি"!

শান্তি। কি, মা? জিজ্ঞাসা করি, এমন কি উত্তমতম প্রলোভন তোমার সামনে ইনি ধরে ছিলেন যে সমুদয় প্রতিবন্ধক, বিবেকবারণ, পরিনামের আতঙ্ক, গার্হস্থ্য আশা ভুলে তুমি এঁর অনুসরণ করেছিলে? তোমার মন বড় দুর্বল···

অভয়া। শান্তি, আমাকে ক্ষমা কর।

শান্তি। না!

[ বলিয়া শান্তি চলিয়া গেল। অভয়া কাঁদিতেই লাগিল···সেইদিকে নির্বিকার চক্ষে চাহিয়া অতুল বলিল,—কাঁদো, কাঁদতে তোমাকে বারণ করিতে পারিনে; কিন্তু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তোমার স্বামী ছিলেন অপ্রেমিক নিস্তেজ; আমার উজ্জ্বলতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলে তুমিই আগে, আমন্ত্রণ করেছিলে···সে কথা তোমার মনে নেই; আমার চারিত্র কু এই হয়েছিল তোমার বুলি...অনর্থক আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে তুমি এই অনর্থের সৃষ্টি করেছ। তোমাদের দুজনারই কাছে আমি অপরাধী!—বলিতে বলিতে অতুল হাসিয়া উঠিল ]

অভয়া। তুমি—

অতুল। ( গ্রাহ্য না করিয়া )—তোমার মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী; তাকে আমি নষ্ট করতে চেয়েছি, এ-ধারণা করে তুমি ভুলই করেছ। তাকে হাসিয়ে নাচিয়ে আনন্দ দিয়ে খেলা দিয়ে চোখের সামনে তাকে উজ্জ্বল করে রেখে আমি তার রূপই দেখতাম; তোমার কুৎসিৎ কথাগুলো কানে তুলিনি—এত আনন্দ পেতাম!

অভয়া। নিজের মেয়ে হলে তা পারতে না; তাকে জাগিয়ে নাচিয়ে নিজের চোখের সামনে তার রূপ ফুটিয়ে রাখতে চাইতে না।

[ বলিয়া অভয়া ধীরে ধীরে অতুলের সান্নিধ্য ত্যাগ করিল—আপন কক্ষে আসিয়া সে নিঃশব্দে শয্যাগ্রহণ করিল। ]

* * *

শান্তি মায়ের কাছে আসিল—বলিল,—] কাঁদছ ?

[ অভয়া কথা কহিল না। ]

শান্তি। তোমার দুর্বলতার সামনে এই লোকটার রূপ কিংবা ঐশ্বর্য্যই হয়তো অনিবার্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল ; আর, তাইতেই তোমার মনে হয়েছে, ঐ রূপ দেখিয়েই আর বাকপটুতার সাহায্যে সে যে-কোনো নারীকে বশীভূত করতে পারে। তা সত্যি নয়—যে-কোনো নারীকে বশীভূত করতে কোনো পুরুষই পারে না।…একটিবার ওঠো ত', মা ; দুটো কথা তোমার কাছে আমি জানতে চাই।

[ অভয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু শান্তির মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না… শান্তি বলিল,—] আমার বাবার নাম ঠিকানা দাও।

অভয়া। যাবি সেখানে ?

শান্তি। যাবো।

অভয়া। কেন ?

শান্তি। সেখানে গিয়ে আমি তাদের কাছে থাকব। বিনা অপরাধে আমাকে সবাই পরিত্যাগ করেছে, এ-অবস্থা আমি সইতে পারছিনে।

অভয়া। তারা তোমাকে নেবে না।

শান্তি। কেন ?

অভয়া। সে-কথা কি আমার মুখ থেকেই শুনতে চাস ?

শান্তি। তুমি তাদের ত্যাগ করে এসেছ বলে ? কিন্তু আমি ত' স্বেচ্ছায় আসিনি। তারা মানুষই—নিরপরাধ সন্তানকে তারা ত্যাগ করবে না ; আমার মর্মব্যথা আর অসহায় অবস্থা তারা বুঝবে।…বলো।

[ টেবিলের উপর হইতে কাগজ পেনসিল লইয়া অভয়া ঠিকানা লিখিয়া দিল। শান্তি হাত পাতিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল : "বসন্ত বিলাপ রায়—উলটগ্রাম। রেল স্টেশন বিনোদপুর"। ]

## নবম দৃশ্য

[ আজ শান্তির ওস্তাদজীর ছাত্রদের ক্লাশ বসিয়াছে—বিবিধ যন্ত্রের ঐকতান চলিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে গলা মিশাইয়া ওস্তাদজী গাহিতেছেন ঃ ]

পৃথিবীরে ঘিরি নাচিছে মৃত্যু
অসীম অন্ধকারে—
ওহে পলাতক, হানিছে সে কর
তোমারো রুদ্ধ দ্বারে
এ-মহানিশার নাহি অবসান—
আসিবে না উষা, জীবনের গান,
যা ল'য়ে পুলক হাসি সুখ মান—

সব দিতে হবে তারে।
পৃথিবীরে ঘিরি'···ইত্যাদি।

[ (শান্তি আসিয়া দরজার পাশে অভ্যন্তরস্থ লোকের অদৃশ্য স্থানে, দাঁড়াইল) গান চলিতে লাগিল : ]

ঐ শোনো দূরে ওঠে কোলাহল
মরণহরষ ভরে—
উৎসব হতে দূরে কেন, ভীরু,
কাঁপিছ আপন ঘরে !—
বিধি প্রসন্ন, আসিয়াছে ডাক,
বন্ধন ডোর পিছে পড়ি থাক্,
এসেছে মরণ, মুক্তির ক্ষণ,
তব চির-কারাগারে—
নিবাও তোমার নিস্ফল শিখা
অসীম অন্ধকারে—
পৃথিবীরে ঘিরি···ইত্যাদি।

[ শান্তি প্রবেশ করিল—ওস্তাদজী তাহাকে আসনগ্রহণ করিতে চোখের ইঙ্গিত করিলেন—শান্তি চেয়ারে বসিল—গান শেষ হইল—ছেলেরা একে একে চলিয়া গেল...ওস্তাদজী বলিলেন,—] কি মনে করে, মা, অসময়ে ?

শান্তি। আমার সঙ্গে আপনাকে এখুনি একবার শেয়ালদা ষ্টেশনে যেতে হবে। শুধু তা-ই নয়—বিনোদপুরের একখানা টিকিট কিনে দিতে হবে—টাইম্ টেব্‌ল্ দেখতে হবে ; গাড়ীতে চাপিয়ে দিতে হবে...

ওস্তাদজী। সেখানে তোমার কি কাজ ?

শান্তি। কাজ উলটগ্রাম গ্রামে। আর কিছু আপনাকে এখন জানাতে পারব না, গুরুজী, তবে প্রয়োজন খুবই জরুরী।

ওস্তাদজী। চলো, যাই। আমার আপত্তি নেই।···তোমার বাবা কেমন আছেন ?

[ বলিতে বলিতে গুরুজী উঠিলেন—শান্তি কথা কহিল না। ]

*    *    *

[ শান্তি শিয়ালদহে গাড়ীতে উঠিল—বলিল,— ] সাড়ে আটটার গাড়ীতে নিশ্চয় ফিরবো। স্টেশনে থাকবেন কিন্তু।

ওস্তাদজী। থাকব। তোমার বাড়ী পর্যন্ত আমাকে যেতে হবে, তা-ও আমি জানি।

[ বলিয়া ওস্তাদজী হাসিলেন। ]

*    *    *

[ বিনোদপুর ষ্টেশন গুরুত্বে ছোট—শান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া একটি কুলীকে ডাকিল— ] "বসন্তবাবুর বাড়ী চেন ? বসন্তবিলাস রায় ?

কুলী। চিনি, উলটগ্রামের।

শান্তি। কিছু বইতে হবে না তোমাকে—কেবল আমার সঙ্গে গিয়ে বাড়ী চিনিয়ে দেবে।

কুলী। চলুন।

## দশম দৃশ্য

[ নানান রাস্তা দিয়া কুলীর সংগে শান্তি অগ্রসর হইতে লাগিল··· বসন্তের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী রাস্তাটায় ইট পাতা—কুলী শান্তিকে বসন্তের বাড়ীর কাছে আনিয়া বলিল,—এই বাড়ী বসন্তবাবুর। শান্তি তাহাকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিয়া সেই বাড়ীর দিকে তাকাইল···টিনের ঘরের চাল দেখা গেল—তার বাঁয়ে ইষ্টকালয়ের আলিসা হইতে জানালার মাথা পর্য্যন্ত আংশিকভাবে দেখা গেল······কতকগুলি নারিকেল লিচু আম প্রভৃতি গাছের অগ্রভাগ আর ডালপালাও দৃষ্ট হইল...সম্মুখে রহিয়াছে একখানা টিনের ঘরের পিছনটা—কাঁচা বারান্দা, অপরিষ্কার এবং ছেলেদের খেলার যাতা উপকরণ অনেকগুলি ছড়ানো রহিয়াছে......প্রবেশ দরজার চৌকাঠের মাথা আর একটা পাল্লার কোণ দেখা যাইতেছে···শান্তির ভীষণ ভয় ভয় করিতে লাগিল······ অত্যন্ত ধীরে ধীরে পা তুলিয়া আর পা নামাইয়া সে যেন বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দরজার সম্মুখে আসিতেই একটি বালক সেই চৌকাঠের ওধার হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, ]

—মা, আমাদের বাড়ীতে কে যেন আস্‌ছে !

[ শান্তি থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখে একটু হাসি ফুটাইল—ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল,— ]

—কে রে ?

[ বালকটি বলিল,— ]

বালক। একটা মেয়ে—খুব বড়ো।

—কি চায় জিজ্ঞাসা কর।

বালক। কি চাও তুমি ?

শান্তি। তোমার বাবার সংগে দেখা করতে চাই। তিনি আছেন বাড়ীতে ?

বালক। আছেন। তাঁর শরীর ভাল নেই।·· ···ও মা, বাবার সংগে দেখা করবে বলছে।

[ ভিতর হইতে অনুমতি আসিল,— ] আস্‌তে দে।

[ বালকটি বলিল,— ] এস।

[ শান্তি অত্যন্ত বিমনাভাবে চৌকাঠের এদিকে পদার্পণ করিল···সুবৃহৎ একটি কাঠটগরের গাছ সম্মুখটা আড়াল করিয়া আছে—তাহার পাশ দিয়া সমগ্র উঠানটা তার চোখে পড়িল, আর লম্বা রোয়াকটা···রোয়াকে বিষন্নভাবে গৃহিনী পা মেলিয়া বসিয়া আছেন—তাঁর কোলে একটি শিশু—দুটি ছেলে রোয়াকে ইটের ছোট ছোট টুক্‌রা লইয়া ছকের উপর 'সাত গুঁটি বাঘ-বন্দী' খেলিতেছে—রোয়াকে স্থানে স্থানে তুলাশূন্য তোশক কাঁথা বালিশ এবং কয়েকখানা শুক্‌নো কাপড় জড়ো করা রহিয়াছে···একটি ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে অন্য ঘরের বারান্দায় কুলার উপর ডাল লইয়া বাছিতেছে···শান্তি দৃষ্টির ভিতর আসিতেই ওরা সবাই অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল··· নিকটবর্ত্তী হইয়া শান্তি জিজ্ঞাসা করিল,— ]

শান্তি। আপনিই এই বাড়ীর গিন্নী ?

—হ্যাঁ।

[ শান্তি তাঁহাকে প্রনাম করিল—গৃহিনী বলিলেন,— ]

গৃহিনী। পান্‌তো ওঠ্‌—মানুষ এলে বসতে দিতে হয় তা-ও জানিস্‌ নে? আসন দে, শীগ্‌গির।

[ কুলা নামাইয়া রাখিয়া মেয়ে পান্‌তুয়া ওরফে পান্‌তো উঠিল···গৃহিনী জানিতে চাহিলেন,— ]

গৃহিনী। গাড়ীতে এলে?

শান্তি। হ্যাঁ, মা!

[ বিস্ময়ে চোখ খুব বড়ো করিয়া গৃহিনী বলিলেন— ]

গৃহিনী। একা?

[ শান্তি একটু হাসিল— ]

গৃহিনী। খুব সাহস ত' তোমার! পথে বিপদ্‌ ঘট্‌তেও ত' পারত!

[ শান্তি রোয়াকের বাহিরে পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিল······ ]

গৃহিনী। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

[ শান্তি চারিদিকে চাহিয়া পুনরায় একটু হাসিল; বলিল,— ]

শান্তি। আমি কলকাতা বরানগর থেকে আসছি।

গৃহিনী। আমরা ত' তোমাকে চিনিনে! কি কাজে এসেছ?

শান্তি। বাবুর সংগে দেখা করতে চাই।

[ একটি ছেলে বোঁ করিয়া রোয়াক বরাবর দৌড়াইয়া সকলের শেষের ঘরটার ভিতর ঢুকিয়া গেল—গৃহিনী তখন বলিতেছেন,— ]

গৃহিনী। কি কাজ তাঁর সংগে?

শান্তি। তাঁকেই বল্‌ব।

[ যে-ছেলেটি দৌড়াইয়া গিয়াছিল সে দৌড়াইয়া ফিরিল; বলিল,— ]

ছেলেটি। এস, বাবা তোমাকে ডাক্‌ছে। কি বল্‌বে এস।

[ শান্তি উঠিল—বসন্তের উদ্দেশে যাত্রা করিল···এবং তার সংগ ধরিল এ-বাড়ীর ওরা সবাই···শান্তি তার পিতার সম্মুখে গেল; দেখিল, প্রৌঢ় তিনি তক্তাপোশের ধারে একখানা পা মুড়িয়া আর-একখানা পা তাহার উপর দিয়া প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছেন। গায়ে গেঞ্জি, হাতে তালবৃন্ত—মশা অথবা মাছি গায়ে বসিতে দিতেছেন না···শান্তি পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন,— ]

জনক। প্রণাম করা কেন! বস।

[ শান্তি জনককে প্রণাম না করিয়া ছাড়িল না। বসন্ত পুনরায় বলিল,— ]

বসন্ত। বস। সংকোচ কি! বস ঐ চেয়ারে।

[ শান্তি বসিল—বসন্ত বলিল,— ]

বসন্ত। তোমাকে আমি চিনিনে। তুমি নেহাত ছেলেমানুষ; আমার কাছে তোমার কি কাজ?

[ শান্তি উপস্থিত সকলের দিকেই একবার তাকাইল; বলিল,— ]

শান্তি। সর্ব্বাগ্রে কেবল আপনাকেই আমি কথাটা বল্‌তে চাই।

[ বসন্ত তার স্ত্রীর দিকে তাকাইল—স্ত্রীর মুখে অসন্তোষ প্রকট হইল ; ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে সে বলিল,—আয় তোরা বেরিয়ে ! ভিড় করেছে দেখ ! যেন সং পেয়েছে !···বলিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ]

বসন্ত। বলো এখন।

শান্তি। আপুনি আমাকে চিনতে পারলেন না ?

বসন্ত। না।

শান্তি। কিন্তু আমি শুনেছি, আমার মুখাকৃতি অনেকটা আমার মায়ের মতো······

বসন্ত। ও, তুমি আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা সন্তান। তারা এখন কোথায় ?

শান্তি। বরানগরে।

বসন্ত। অতুল আমার খুব বন্ধু ছিল ! [ শান্তি বাপের মুখ লক্ষ্য করিতেছিল—দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য অসন্তোষ স্নেহ আক্ষেপ রোষ কিংবা উত্তেজনার কোনো লক্ষণ নাই—চলতি কথায় নিঃস্পৃহভাবে সায় দিবার মতো করিয়া তার বাবা কথা কহিতেছেন। অতুলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সংবাদ দিয়া বসন্ত বলিল,— ] এখানে কি কাজে এসেছ ?

শান্তি। নিজের বাড়ী দেখতে, আর···[ বলিতে বলিতে শান্তি অন্য কথা বলিল,— ] সম্প্রতি আমি সব জানতে পেরেছি ; আমার লজ্জা ব্যথা হতাশার অন্ত নেই—তাঁদের কাছে আমি দাঁড়াতে পারছিনে। আপনার অনুগ্রহ আমি চাই, বাবা।

বসন্ত। কি করতে পারি ?

শান্তি। আমাকে এখানে স্থান দিন।

বসন্ত। তা হয় না।

[ শান্তি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল,— ]

শান্তি। হয় না !

বসন্ত। না। কোনোদিক দিয়েই তা' সম্ভব নয়। তোমার মা কুলত্যাগ করেছিলেন—সে কথাটা লোকে ভুলেছে—আমিও তার লজ্জাটা ভুলেছি। তোমাকে এখানে দেখলে লোকে পরিচয় জানতে চাইবে—পরিচয় আমাকে দিতেই হবে...তারপর দেখছই আমি আবার বিবাহ করেছি—ছেলেপিলে হয়েছে—আমি বিব্রত—তোমার বিয়ে আমাকে দিতে হলে সমাজের দিক থেকে এবং আর্থিক ব্যাপারে আমাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে। অত জবাবদীহি আর কষ্টস্বীকার করতে আমি রাজি নই।

শান্তি। আপন সন্তানের জন্যও নয় ?

বসন্ত। না। অতুলের কন্যা-পরিচয়ে তোমার ভবিষ্যত ভালো। সেখানেই থাকো গিয়ে······

শান্তি। কিন্তু তাঁদের কলঙ্কিত জীবন আমি সহ্য করতে পারছিনে।

বসন্ত। তোমাকে এখানে যে-চোখে দেখবে তা আরো অসহ্য হবে। মনে হয়, লোকের কৌতুক-কৌতূহলের অন্ত থাকবে না।

শান্তি। তা সহ্য করতে আমি রাজি আছি।

বসন্ত। আমি নেই। তোমার চেহারা অতি সুন্দর। তোমার অতীত আমি জানিনে।

[ শুনিয়া শান্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল,— ]

শান্তি। অতীত সম্বন্ধে অনুমান করতে যাওয়ার আগে আপনার ভেবে দেখা উচিত,

আপনার কাছে একটা সত্য আমি উপস্থিত করেছি—তাঁদের ঐশ্বর্য্য এবং আদর ত্যাগ করে আপনার আশ্রয় পেতে এসেছি।

[ বসন্ত কথা কহিল না—মাথা নত করিয়া জোরে জোরে পাখা নাড়িতে লাগিল—শান্তি তাহাকে আবার প্রণাম করিল,— ]

বসন্ত। সুখী হও।…একটু মিষ্টিমুখ ওরে ন্যাবা, গোব্‌রা, হাঁদু, তোদের দিদি—

—তাই নাকি, বাবা? আমাদের দিদি? কোথাকার দিদি?—

[ বলিতে বলিতে ৩।৪ জন নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল…তাহাদের সম্মুখ দিয়া শান্তি রক্তবর্ণ আর অবনত মুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ]

## একাদশ দৃশ্য

[ শান্তি স্টেশনে আসিল—তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। যুবকগণের ষ্টেশন প্লাটফর্ম্ম বেড়াইবার একটা স্থান…শান্তির দিকে অনেকেই আড়চোখে তাকাইতে লাগিল—একজন রুমালে মুখ ঘষিয়া মুখ উজ্জ্বল করিয়া লইল—একজন চুলে হাত বুলাইয়া দেখিল। পারিপাট্য বজায় আছে কি না·· একটি যুবক দূরে ফেন্সিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া যুবকগণের ভাবভঙ্গী গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল—সে ধীরে ধীরে শান্তির সমীপবর্ত্তী হইল…একটি নমস্কার করিল; বলিল,—আপনি বসবেন একটু? শান্তি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,—শিয়ালদা যাবার গাড়ীর কত দেরী জানেন?—অনেক দেরী। আসুন, আপনাকে বসিয়ে দিইগে। বলিয়া যুবকটি অগ্রসর হইল—শান্তি তার অনুসরণ করিয়া মধ্যমশ্রেণীর ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিল ]

যুবক। চেয়ারে বসুন। আমি আসি।

[ বলিয়া সে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। যথাসময়ে সন্ধ্যার পর গাড়ী আসিল। শান্তি উঠিল। ]

* * * *

[ অতুলের বাড়ীতে অত্যন্ত বিষণ্ণতা বিরাজ করিতেছে…অভয়া অনাহারে শুইয়া আছে—অতুল খবর লইয়া তাকে রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে আসিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু অভয়া দরজা খোলে নাই…রাত্রি আসিতেই অতুল পুনরায় অভয়ার দুয়ারে আসিল; ডাকিল, ]

অতুল। দরজা খোলো! আমার অনুরোধ রাখো। কষ্ট বরণ করে লাভ কি হবে? পরস্পরের উপর দোষারোপ করে আর ক্রুদ্ধ হয়েও সমস্যার সমাধান হবে না। খোলো—আমার কথা শোনো।

[ অভয়া দরজা খুলিয়া দিল—বলিল,—]

অভয়া। শান্তি বলে গেছে তারা মানুষ—সন্তানকে তারা ত্যাগ করবে না। যদি তারা তাকে সত্যিই রাখে; আসতে যদি না দেয়!—

[ বলিতে বলিতে অভয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ]

অতুল। আমি দিশেহারা হলাম জীবনে এই প্রথম—শান্তি না ফিরলে কি হবে তা আমি

জানিনে—ফিরলে কি হবে তাও আমি জানি নে। তবে এইটুকু জানি যে, মঙ্গল কোনোদিকে নেই।

অভয়া। ( অসহায় ভাবে ) কি করব আমি এখন !

অতুল। তা-ও জানিনে। আমি তাকে মনে মনে কত দূরে রেখেছিলাম—

[ নীচে হইতে সিঁড়িতে পদশব্দ উঠিতে লাগিল—]

অভয়া। ব্যগ্রভাবে চুপ করো, আসছে বুঝি !

[ উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া রহিল···শান্তি তাহাদের নিকটবর্তী হইল—এবং তিন জনই কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক হইয়া রহিল...তারপর শান্তি বলিল,—]

শান্তি। অস্বাভাবিকতার বিঘ্ন অতিক্রম করা সত্যিই কঠিন, মা। তুমি বলেছিলে, তারা আমাকে নেবে না—তা-ই সত্য হল—নিলে না। এত অগৌরবের ভেতর থেকে গৌরবের উদ্দেশে যাত্রাকরা আমার ভুল হয়েছে। তারা ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, কঠোর·· আমি বুঝতে পেরেছি, স্বামীর নিষ্প্রাণতা তোমাকে নিরুদ্দেষ আর বঞ্চিত হওয়ার কষ্টে জর্জ্জর করেছিল—এঁর ভেতর প্রাণের প্রাবল্য দেখে তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে।

অভয়া। সকাতরে, আমার কথা তুই ত্যাগ কর, শান্তি, আর বলিসনে।

শান্তি। আমাকে তুমি সেখানে রেখে এলে তারা বোধ হয় লজ্জামুক্ত হবার জন্যে আমাকে বেচে কি বিলিয়ে দিত ··

অতুল। তোমার মা সারাদিন অভুক্ত আছেন।

শান্তি। আমার সংগে খাবে এখন।—কিন্তু আপনার কথাও আমি না ভেবে পারছিনে ! আপনার আচরণ ভাবভংগী কথাবার্তার ধরণ চিন্তা করে হঠাৎ চমকে উঠে আমার গাড়ীর ভেতর মনে হল আপনি আমাকে ঠিক কন্যার মতো দেখেননি—আনন্দের অনুষংগ হিসাবে দেখেছেন। আপনার আশ্রয়ে আমার আর থাকা হবে না।·· মা, কাপড় ছেড়ে এস ; আমিও যাই।

**দ্বাদশ দৃশ্য**

[ সকাল ৭টা। শান্তির গুরুজী তানপুরায় সুর রাখিয়া মুদিতনেত্রে গাহিতেছেন ঃ ]

* * * মকরধ্বজ মত্তমাতংগ হরং,
করিচর্ম্মস নাগ-বিবোধকরং।
বরদাভয়—শূলবিষাণ-ধরং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং,
করুণয়ৈব পুনস্ত্রিরূপ ধরং।
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥

[ গান চলিবার সময়ই শান্তি বাহিরে জুতা রাখিয়া গুরুজীর ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বসিল। ]

ন দেয়ং পুষ্পং সদা পাপ-চিত্তৈঃ,
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।

ভজতোদখিন-দুঃখ-সমূহ হরং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

*　　*　　*

[ অতুলের গৃহের একটি প্রকোষ্ঠ—অতুল চেয়ারে বসিয়া আছে দুই করতলের ভিতর মাথা নত করিয়া—অভয়া বসিয়া আছে ছলছল চক্ষে অন্যদিকে দৃষ্টি মেলিয়া…অতুল বলিল,— ]

অতুল। আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিই ছিল একত্বের বন্ধন, আনন্দের উৎস, ছোট বড় অভিলাষ পূরণের প্রেরণা আর সযত্ন সেবার মূল…তা কি নষ্ট হতে দিতে চাও ?

অভয়া। দিতে চাইনি কিন্তু তা হয়ে গেছে…

*　　*　　*

[ গুরুজীর কক্ষ—গানের শেষে চোখ খুলিয়া গুরুজী শান্তিকে দেখিতে পাইলেন ; তানপুরা নামাইয়া রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন,—]

গুরুজী। তোমাকে বড়ই চঞ্চল দেখছি, মা ! খুব অশান্তভাবে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ। কি হয়েছে বলো।

[ শান্তি উঠিয়া আসিয়া গুরুজীর পায়ের উপর পড়িল ; বলিল,—]

শান্তি। আমায় রক্ষা করুন, বাবা ; সংসারে আমার কেউ নেই—আমি বড় অসহায় !

গুরুজী। ওঠো।

[ শান্তি উঠিল— ]

গুরুজী। বসো।

[ শান্তি যাইয়া চেয়ারে বসিল। গুরুজী বলিলেন,— ]

গুরুজী। বাপমায়ের সংগে মনান্তর ঘটেছে তোমার ?

শান্তি। ঘটেছে। জীবনের ধারা আর শুচিতা সম্বন্ধে তাঁদের যেমন চেতনা আমার তা নয়…

গুরুজী। অসংযত আচরণ করনি ত', মা ?

শান্তি। না, বাবা। অসংযত আচরণের প্রতিবাদ করেছি।

গুরুজী। তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাইতে তোমাকে ত্যাগ করেছেন ?

শান্তি। আমার আচরণ তাঁদের কাছে অসংযত মনে হয়েছে কিনা জানিনে, তাঁরা আমাকে ত্যাগ করেছেন কিনা তা স্পষ্ট বলেননি ; কিন্তু আমি তাঁদের ছেড়ে এসেছি।

গুরুজী। বাপমাকে ? কেন ?

শান্তি। গুরুজি, কাউকে বিশ্বাস নেই—কেমন করে দিন চলবে !

গুরুজী। যার দশজনকে নিয়ে কারবার তাকে অবিশ্বাস আর অবিশ্বাসীকে স্বীকার করে নিয়েই চলতে হবে। আর, যথার্থ বিশ্বাসের পাত্রকে খুঁজে নেয়ার সহিষ্ণুতা যার নেই তাকেও ত' প্রশংসা করতে পারিনে, মা !—

[ বলিয়া হাসিলেন ; বলিলেন,—]

গুরুজী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছিলাম বাপ মাকে ছেড়ে এলে কেন ?

শান্তি। আমি তা আপনার সম্মুখে বলতে পারব না। আপনি চলুন আমার সংগে—আপনার সম্মুখে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব।…তাঁরা ছাড়া আর কোথায় আমাকে আপনি দাঁড়াতে বলেন ?

গুরুজী। আমি কিছু বলিনে এখনই। চলো।

* * *

[ অতুলের গৃহ—অতুল সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে—অভয়া নিস্পন্দের মতো অদূরে বসিয়া আছে··· ]

অভয়া। আমাদের সম্পর্কের ভিতরকার লজ্জাটা এতদিন আমাদের চোখে পড়েনি কেন ?

অতুল। আমার পড়েছিল—তোমার পড়েনি। পড়লে বিভ্রান্ত অবস্থাতেও তা তোমার মনে থাকত। তুমি যে ক্ষতি করেছ তার ইয়ত্তা নাই—মেয়ের অন্তরে তোমার আর স্থান নাই ; প্রেমের মণিকোঠা পাঁকে ভরে তুলেছ নিজের হাতে।—[ বলিয়া অতুল হাসিল।···তারপর বলিল,— ]—তোমার আমার ভিতর যে-ব্যবধানের সৃষ্টি সে করেছে তা তুমি অনুভব নিশ্চয়ই করছ···

[ খবরের কাগজের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া থাকিয়া অতুল পুনরায় বলিল, ]

অতুল। এতদিন ভাবা যাচ্ছিল, পৃথিবীর উপরে উঠে আমরা বৈকুণ্ঠে বাস করছি—এই আত্মবিস্মরণ আর আত্মবিসর্জনে কেবল মধুই আছে—বোধহয় থাকত, কিন্তু মক্ষিরাণীকে জানিয়ে দিয়ে তার দংশন নিতে হল···ভাল কথা, এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছ, আমার কাছে তোমার মেয়ে কেবল কুশিক্ষাই পায়নি !

[ বলিয়া অতুল খবরের কাগজ টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল · ]

অভয়া। কোথায় গেল সে একবার দেখবে না ?

অতুল। পলাতকার পশ্চাদ্ধাবন করতে আমি পারছিনে। সে তার গুরুজীর কাছে গেছে, অনুমান করি। সে আর কাউকে চেনে না ; আর কোনো স্থান তার পরিচিত নয়। যদি বলো তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি···

[ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন গুরুজী—অভয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল··· ]

অতুল। প্রাতঃপ্রণাম, ওস্তাদজী। কুশল ?

গুরুজী। আজ্ঞে, কুশল। কিন্তু আমার সঙ্গে আছেন শান্তি-মা। তিনি বিমর্ষ।

অতুল। তা জানি। আসুন। আসন গ্রহণ করুন।

গুরুজী। মা আজ আমায় দেখে···

[ বলিতে যাইয়া বসিলেন ; শান্তি তাঁর ইঙ্গিতে প্রবেশ করিল—বসিল। ]

গুরুজী। মা আজ আমায় দেখে···

অতুল। ( সকৌতুকে ) পালালেন ! লজ্জায়। তাঁর মেয়ে তাঁকে লজ্জা দিয়েছে।···এখন খবর বলুন।

গুরুজী। খবর অল্পই। শান্তি মা কি দোষ করেছে, আর, আপনারা তাকে কি এমন ভর্ৎসনা করেছেন যে, সে আমার কাছে গিয়ে বলছে, একটা আশ্রয় খুঁজে দিন !

অতুল। আপনি গৃহী-বৈরাগী, সস্ত্রীক সাধুর জীবন যাপন করেন। কেবল সেই কারণেই আপনার কাছে অকপটে সত্য কথা বলব। শান্তি কিছু বলেনি ?

গুরুজী। না।

অতুল। শান্তির আজকার বিতৃষ্ণার কারণের উদ্ভব হয়েছিল সতেরো বছর আগে। তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কারণ, ঘটনার সঙ্গে তাল বজায় রেখেই আমাকে

চলতে হবে। সূক্ষ্ম বিবরণের মধ্যে না গিয়ে সার কথাটা সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে যে, শান্তি তার মায়ের কাছে শুনেছে, তিনি আমার পরিনীতা স্ত্রী নন্...

[ গুরুজী চেয়ারের উপর একটু নড়িয়া চাড়িয়া স্থির হইয়া রহিলেন...]

অতুল। শান্তির অবাধ কথাবার্তা, চালচলন, নাচগান, অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার অসংকোচ আচরণ দেখে' শান্তির মায়ের মাথায় একটা পরম অশান্তিকর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হল —তিনি মনে করলেন আমি তাঁর স্বামীর ঔরসজাত কন্যা শান্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টায় আছি। [ চেয়ারের উপর গুরুজীর নড়িয়া ওঠাটা এবার প্রবলতর হইল— অতুল হাত তুলিয়া তাঁহাকে বিচলিত হইতে নিষেধ করিল -বলিল,— ]

অতুল। সেই দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে তিনি শান্তিকে ডেকে আমার সম্বন্ধে বললেন, লোকটা কু—আমার মতো তোকেও বিপথে নিতে চায়। শুনে শান্তি আমাদের সংস্পর্শ অপবিত্র মনে করে আমাদের ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছে।

গুরুজী। তরপর ?

অতুল। আমরা, আমরা ঠিক নয়, আমি শান্তিকে থাকার যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছি।

শান্তি। সে জন্যে ধন্যবাদ ; কিন্তু আমার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবে কি করে ! সংসারে আমার আপনার বলতে কাউকে রাখেননি—বাবা স্থান দিলেন না। কার পাপের ফল আমি ভোগ করছি ! জীবনান্ত পর্যন্ত কার অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমি লোকের মাঝে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে থাকব। এখানে আমি থাকব না—আমি স্থান চাই; মুখ তুলে থাকতে চাই, স্বস্তি চাই···এখানে আমি তা পাবো না।

অতুল। ( ওস্তাদজীর প্রতি ) শৈশব থেকে শান্তি আমার কাছে আছে ; সে হিসাবে ওর প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা আছে—ওর মর্ম্ম আমি উপলব্ধি করেছি ; আমার অনুকম্পারও ইয়ত্তা নেই। আমি কেবল হিতাকাক্ষীর অধিকারে বলছি, আপনার তত্ত্বাবধানে থাকলে আমি সুখীই হব, নিশ্চিন্ত থাকব। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো, শান্তি।...তোমার প্রয়োজনীয় আর ব্যবহারের যে যে জিনিস এখানে আছে তা আজই পাঠিয়ে দেব।

গুরুজী। আপনি যথেষ্ট উদার···

[ অতুল হাসিয়া উঠিল—বলিল,—]

অতুল। মোটেই নয়। আমার নীড়ের আরাম আর প্রচ্ছন্ন নিবিড়তা ও ভেঙে দিয়েছে। শান্তির প্রাণে ব্যথা দিতে চাইনে ; কিন্তু এ-সত্যকে কে অস্বীকার করবে যে, বিদ্রোহীকে কেউ সুখপ্রদ মনে করে না !

[ শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল,—]

শান্তি। মায়ের কথা ত' আপনি একটিবারও বলছেন না ?

অতুল। তাঁর দায়িত্ব তাঁরই। ফলভোগও তাঁর।

শান্তি। আসুন্ গুরুজী। আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই।

গুরুজী। হ্যাঁ, মা, সব বিষয়েই। চলো।

## চতুর্দশ দৃশ্য

[ দিন ৯।১০ পর গুরুজীর গৃহে। কক্ষ—প্রাতঃকাল। গুরুজী সস্ত্রীক কম্বলাসনে বসিয়াছেন—শান্তি স্বতন্ত্র আসনে তাঁর অনতিদূরে বসিয়াছে··· গুরুজী ও শান্তি উভয়ে নিমীলিত নেত্রে, গাহিতেছে ঃ ]

অধরং মধুরং বদনং মধুরং—
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং—
মধুরাধি পতেরাখিলং মধুরং। ১
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং—
বসনং মধুরং চলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং—
মধুরাধিপতেরাখিলং মধুরং ॥ ২
বেনুর্মধুরো রেণু মধুরঃ,
পানিম ধুরং পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং—
মধুরাধিপতেরাখিলং মধুরং। ৩
গীতং মধুরং পীতং মধুরং,
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং,
মধুরাধি পতেরাখিলং মধুরং ॥ ৪
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা,
যমুনা মধুরা বীচি মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং,
মধুরাধিপতেরাখিলং মধুরং ॥ ৫
গোপী মধুরা লীলা মধুরা—
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
ইষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং,
মধুরাতিপতেরাখিলং মধুরং ॥ ৬

[ গুরুজী একক— ]

ওঁ পাপোহহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

[ তিনজনেই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন—গুরুজী সূর্য্যকে প্রণাম করিলেন···তারপর বলিলেন,—]

গুরুজী। আমাদের সনাতন মুড়ি আর চা আছেই—দাও!—এস। জল ফুটছে এতক্ষণ।

[ শুনিয়া গুরুজীর স্ত্রী অগ্রসর হইয়া গেলেন...গুরুজী যাইয়া ও-ঘরের বারান্দায় বসিলেন—শান্তিও বসিল—]

গুরুজী। চা খেয়ে বেরুবো একটু।

শান্তি। আপনি প্রায়ই বেরোন। কিন্তু আমাকে ত' একদিনও সঙ্গে নেন্ না, বাবা। আপনিও কি আমাকে সমাজের বাইরে ফেলে' রাখতে চান!

[ গুরুজী হাসিয়া বলিলেন,—]

গুরুজী। ও-কথা আবার বললে তোমাকে আমি শাসন করব, মা। আজ তোমাকেই নিয়ে যাবো বলে বেরুবো।

শান্তি। কোথায় নিয়ে যাবেন ?

গুরুজী। প্রচণ্ড এক ধনীর বাড়ী—টাকার কুমীর। আমার বাল্যবন্ধু; বৃহৎ পরিবার—তোমার বয়সী মেয়েরা আছে। তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দেব...

শান্তি। কি পরিচয় দেবেন ? শুনে আমার ভয় হচ্ছে যে!

[ গুরুজীর স্ত্রী বাটিতে করিয়া মুড়ি—আর চা দুজনকে দিলেন—শান্তিকে বলিলেন,—]

গুরুজীর স্ত্রী। তুমি এখানে এসে কিছু রোগা হয়ে গেছে, মা। সত্যিই তোমায় আমরা বন্দী করে রেখেছি যেন!

শান্তি। কিন্তু বাবা বন্দীদশার বাইরে নেয়ার কথা কয়ে ভয় দেখাচ্ছেন যে!

গুরুজী। আমি ভাবতাম, আমার গর্বই ছিল আর কেউ না পারুক তুমি আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করতে পারো। পারো না ?

শান্তি। পারি।

[ বলিয়া শান্তি লজ্জিত হইয়া চক্ষু নত করিল। চা জলপান শেষ হইল—ওঁরা উঠিলেন।...তারপর বাহির হইয়া গেলেন। )

## পঞ্চদশ দৃশ্য

[ বিরাট এক অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গুরুজী বলিলেন,—]

গুরুজী। এই বাড়ীতে আমরা যাবো।

শান্তি। চলুন। পরিচয় ছাড়া আমার ভয়ের আর কোনো কারণ নেই।

গুরুজী। পাগলী...

[ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দ্বিতলের বারান্দায় পৌঁছিতেই ১৫।১৬ এবং ১৩।১৪ বছরের দুটি মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে শান্তির সম্মুখে পড়িয়া গেল—সহাস্যমুখে তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল—বড়টি বলিল,—]

বড়টি। জ্যাঠামশায়, দেখুন ত' মায়ার অত্যাচার—জানে না, অথচ জিদ ছাড়বে না! বলছে, অদ্ভুত দীর্ঘ উকাব, উদ্ভিদে ত...

গুরুজী। মায়ারই ভুল। দৌড়ে কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা ?

[ বড় মেয়েটি বলিল,—]

বড় মেয়েটি। দাদার কাছে।

গুরুজী। তা আর যেয়ে কাজ নেই। তার বদলে ( শান্তিকে দেখাইয়া ) এই মেয়েটিকে নিয়ে বসাও, নাম শান্তি,—গল্পসল্প করো ; আর যদি ইংরেজি কি বাংলার বানান আর মানে নিয়ে গোল বাধে, এ-কে জিজ্ঞাসা করলেই মীমাংসা করে দেবে।

বড়মেয়েটি। তা-ই নাকি ?

গুরুজী। হ্যাঁ। ইংরেজি, বাংলা সব বই পড়ে শেষ করেছে। তোমার বাবা কোথায় ?

বড়মেয়েটি। তাঁর ঘরে আছেন। ( বলিয়া মায়া যাইয়া শান্তির হাত ধরিল—বলিল,— ) এস, দিদি, তোমার কাছে অনেকগুলো ইংরেজী কথার উচ্চারণ শিখে নিইগে।

[ বলিয়া শান্তির হাত ধরিয়া লইয়া চলিল···গুরুজী গেলেন গৃহকর্তা, তাঁর বন্ধুর কাছে। ]

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ ওস্তাদজী আর গৃহকর্তা নিস্তারণবাবু সুসজ্জিত কক্ষে সুবিস্তীর্ণ টেবিলের সামনে সুবিস্তীর্ণ চেয়ারে বসিয়া আছেন—ওস্তাদজীর হাসিমুখ ; নিস্তারণ-বাবু মুখেচোখে এমন বিস্ময়ের ভাব লইয়া বসিয়া আছেন যাহার অর্থ, ব্যাপার এমন গুরুতর ! ]

ওস্তাদজী। তার বাবা তাকে আশ্রয় দিলেন না ; কারণ অনুমান এই করি যে, পাপের পরিচয় তাঁরা ঘরে রাখতে চান না। কিন্তু মেয়েটির প্রকৃতির আর মেধার পরিচয় পেলে তাকে মেয়ে কি বধূ করে নিতে যার ইচ্ছা না হয়—তাকে বুদ্ধিমান বলা চলে না।

নিস্তারণ। তা কতকটা বটে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ লোকের পক্ষে ঝুঁকি নেয়া অসম্ভবই মনে হয়।

গুরুজী। কারো সংগে জীবনে মেশেনি বাপ বলে জানিত ঐ লোকটিকে, তাছাড়া—কুটিলতা জানে না—সোজা সহজপথে স্বাভাবিকভাবে চলতেই তার আগ্রহ—শুধু আগ্রহই নয়, উদ্বেগ যা দেখেছি তা অসাধারণ। আসার সময় অতুলকে সে কি বললে শোনো। বললে, কার পাপের ফল আমি ভোগ করছি ! জীবনান্ত পর্যন্ত কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি লোকের মাঝে অপাঙক্তেয় হ'য়ে থাকব ! এখানে আমি স্থান চাই, মুখ তুলে থাকতে চাই, স্বস্তি চাই······

[ নিস্তারণ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। ]

* * *

[ মায়া এবং তার দিদি মলির পড়িবার ঘর—টেবিলের উপর যথেষ্ট ছোট বড় বই যথেচ্ছভাবে ছড়ানো রহিয়াছে—খাতা, পেন্সিল, দোয়াত, কলম ইত্যাদির অভাব নাই— ]

মলি। বাবা বলেন, বিদ্যে জাঁকালো করে কাজ নেই, বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিরও দরকার নেই—ইংরেজী, বাংলা ভাষা যত পারো পড়ো—পৃথিবীর মানুষের চিন্তার, কীর্তির, আর উন্নতির ইতিহাস পড়ো—রাজাদের আর তাঁর মন্ত্রীদের কাহিনী থাক···

[ মলি হাসিল—শান্তিও হাসিল—]

শান্তি। আমার সঙ্গে এইখানটায় তোমাদের মিলছে বেশ…

মায়া। তুমি কার কাছে পড়তে ?

শান্তি। [ এক মুহূর্তের জন্য চক্ষু নত করিয়া বলিল,—] একজন আমার শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন, তাঁরই কাছে।

মলি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে বুঝি ! কি হন তোমার ?

শান্তি। আমার গুরুজী—বাবা বলে ডাকি। ওঁর কাছে আমি নাচ আর গান শিখেছি·

[ মায়া লাফাইয়া উঠিল—বলিল,—] নাচতে গাইতে জানো তুমি ? যাই আমি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। তুমি রাজি হবে না তা জানি। তাঁকে ধরি গিয়ে।

[ বলিয়া লাফাইয়া নামিয়া গেল।]

*　　　*　　　*

[ পূর্ববর্ণিত নিস্তারণবাবুর কক্ষ—গুরুজী বলিতেছিলেন,—]

গুরুজী। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ! ইংরেজী আর বাংলা সাহিত্য যা-কে বলে গুলে খাওয়া তা-ই করেছে ও। অতুল আর যা-ই করুক, মেয়েটিকে বিদুষী করে তুলেছে খাসা…

[ "জ্যাঠামশায়" ? উত্তেজিত অবস্থায় ডাক দিয়া মায়া ঘরে ঢুকিল। ]

ওস্তাদজী। কি বলছ, মা ?

মায়া। শান্তিদি বললে, আপনার কাছে সে নাচতে গাইতে শিখেছে…

ওস্তাদজী। শিখেছেই ত' ! তিরিশ তারিখে গগন খাস্তগীরের বাড়ীতে নিখিলবঙ্গ নৃত্য-প্রতিযোগিতায় তার দাঁড়াবার কথা ছিল ; কিন্তু গেল না !

মায়া। কি বললে ?

ওস্তাদজী। বললে, থাক, বাবা। আর্টের দোহাই দিয়ে চাপল্য আর ভালো লাগে না। কিন্তু মেডেল পেতো নিশ্চয়।

মায়া। তা হোক। আপনি তাকে বলুন ; তার গান একটা আমরা শুনবো।

নিস্তারণবাবু। তোমার কাছেই রাখবে ?

ওস্তাদজী। উপায়ান্তর নেই। পালক ওকে প্রকারান্তরে তাড়িয়েছে ; ভাষায় দখল আছে বলে বেশ সাজিয়ে সে কথাটা বলেছে·

নিস্তারণবাবু। বলো শুনি।

ওস্তাদজী ! "আমার নীড়ের আরাম আর প্রচ্ছন্ন নিবিড়তা ও ভেঙে দিয়েছে। ও-র প্রাণে ব্যথা দিতে চাইনে ; কিন্তু এ সত্য কে অস্বীকার করবে যে, বিদ্রোহীকে কেউ সুখপ্রদ মনে করে না।"

মায়া। জ্যাঠামশায়, আমি একটা কথা বলেছিলাম…

ওস্তাদজী। ও, তোমার কথার জবাব দেয়া হয়নি। রাগ করিসনে, মা। কিন্তু গান ত' এখন হয় না ! শান্তিকে এখন তা বলা চলে না।

মায়া। কেন ?

ওস্তাদজী। সব গানই কি যখন-তখন শুরু করা যায় ! আর একদিন হবে—আমরা তৈরী হ'য়ে আসব।…( নিস্তারণের প্রতি )—উঠি এখন…(উঠিলেন)—

নিস্তারণ। আচ্ছা…ওরে মায়া, শান্তিকে চা-টা দিয়েছিলি ?

মায়া। দিয়েছি, বাবা। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবহারটা দেখে রাখলাম আমরা।

[ ওস্তাদজী আর নিস্তারণ চোখে চোখে চাহিয়া হাসিলেন...]

ওস্তাদজী। আজ নয়; আর-একদিন···তোরা বড় অসহিষ্ণু। যা, শান্তিকে বল, যেতে হবে।

[ মায়া দরজার দিকে ফিরিল। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ ৩। ৪ দিন পর—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে—গুরুজী আসনে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন—শান্তি অদূরে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে··· । বাহিরের দরজা হইতে আহ্বান আসিল,—"ত্রিদিব ? আমি নিস্তারণ।" যাঁহার গৃহে সেদিন সে বেড়াইতে গিয়াছিল তাঁহার নাম নিস্তারণ, শান্তি তা গুরুজীর কাছেই শুনিয়াছিল—অভ্যর্থনা করিতে অভ্যাগতের উদ্দেশে সে ব্যস্তভাবেই গেল—দরজা খুলিয়া দিয়া নিস্তারণের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইল··· । নিস্তারণ বলিলেন, ]

নিস্তারণ। ত্রিদিব নেই বাড়ীতে ?

শান্তি। গুরুজীর কথা বলছেন ?

নিস্তারণ। হ্যাঁ, মা। তার নাম ত্রিদিব...

শান্তি। আসুন। তিনি আহ্নিক করছেন।

[ নিস্তারণ ভিতরে পদার্পণ করিলেন—এবং দরজার এদিকে আসিতেই শুনিলেন, ত্রিদিবের স্ত্রী বলিতেছেন, ]

ত্রিদিবের স্ত্রী। আজ আমাদের সুপ্রভাত। এক যুগ পরে দর্শন পেলাম !

নিস্তারণ। এক যুগের মধ্যে একদিন খেতে বলেছ ? অমনি আসার মত ক্ষুদ্র ভেবেছ আমাকে ? খেতে না বললে আমি আসিনে, বুঝলে, শান্তি, তোমার মা আর বাবা নিজেরা খাবে চব্যচোষ্য, আর, আমি এলেই বলবে, কিচ্ছু নেই। রাগ হয় না এ-কথায় ? আসতে ইচ্ছে হয় ?—

[ বলিয়া নিস্তারণ প্রচুর হাস্য করিলেন—শান্তিও হাসিল—ত্রিদিবের স্ত্রীও হাসিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—]

ত্রিদিবের স্ত্রী। রাগ আজ হঠাৎ পড়ল কি করে !

নিস্তারণ। সে অনেক কথা। বসতে একটু জায়গা দেবে না, দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে ! —এস। [ ত্রিদিবের স্ত্রী বলিলেন। ]

ওস্তাদজী। কে ওখানে অত জোরে জোরে কথা কয় ?—( বলিতে বলিতে ওস্তাদজী দেখা দিলেন। )

নিস্তারণ। আমি নিস্তারণ। খেতে এসেছি।

ওস্তাদজী। কেবলি খাই খাই করছে—ওকে কিছু দাও তোমরা, দাঁড়িয়েই খেয়ে নিক।

নিস্তারণ। চলো, বসিগে। কথা আছে।

[ সকলেই যাইয়া বসিলেন—]

ওস্তাদজী। কি কথা বলো এখন।

নিস্তারণ। আমি একটা উৎসবের পরিকল্পনা করেছি, কাল সন্ধ্যার পর—কেবল তোমরা আর আমরা। কিন্তু উৎসব মানেই যথাসাধ্য আহার, আর যথাসম্ভব হট্টগোল করা। একটু হট্টগোলও করতে চাই।

ওস্তাদজী। কি উপায়ে?

নিস্তারণ। শুনলে তুমি চটে যাবে। তা যদি না যাও, যদি অভয় দাও ত' বলি।

ওস্তাদজী। বলো, নির্ভয়েই বলো।

নিস্তারণ। তোমার শিষ্য-সেবকদের নিয়ে যেও যন্ত্রাদিসহ। তাঁদেরও তোমার মারফত আহ্বান করছি। পরিকল্পনাটা কেমন করেছি?

ত্রিদিবের স্ত্রী। খাসা করেছ। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

নিস্তারণ। কিছুই নয়—তোমার তদ্বিরে একদিন একটু ভালো করে খাব। উঠি এখন।

ত্রিদিবের স্ত্রী। কিছুতেই নয়। কিছু না খাইয়ে ছাড়ছিনে, (উঠিবার উদ্যোগ করিলেন)।

নিস্তারণ। তুমি বসো, শান্তি চা করে আনুক। শান্তি হয়তো ভেবে অবাক হবে যে, এত খাই-খাই ক'রে শেষে এক-কাপ চায়েই তুষ্ট! তার কারণ এই যে, কালকের জন্যে আমিও এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছি। যাও।

[ হাসিতে হাসিতে শান্তি চলিয়া গেল। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ পরদিন সন্ধ্যার পর নিস্তারণের গৃহে আয়োজন চলিতেছে—হলঘরে আসর বসিবে—ফরাশ বিছানো হইয়াছে—নিস্তারণবাবু স্বয়ং এবং তাঁর পুত্র ও কন্যারা খুবই ব্যস্ত···ত্রিদিব, তাঁর স্ত্রী ও শান্তিকে লইয়া পৌঁছিয়া গেলেন—ত্রিদিব শান্তিকে গৈরিক বর্ণের শাড়ী পরাইয়া আনিয়াছেন। মলি আর মায়া ছুটিয়া যাইয়া শান্তিকে জড়াইয়া ধরিল—ওস্তাদজী ফরাশে যাইয়া বসিলেন—নিস্তারণের অনুরোধে তাঁর স্ত্রী গেলেন রন্ধনশালায়···ওস্তাদজীর পার্টি ৮।১০ খানা তারযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া পৌঁছিয়া গেল—নিস্তারণের পুত্র তপেশ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল···নিস্তারণ ত্রিদিবকে বলিলেন,—এঁরা বিশ্রাম করুন—তপেশ রইল এখানে। চলো আমরা ও-ঘরে বসে দুটো কথা কই গিয়ে।

ত্রিদিব। চলো।

* * *

নিস্তারণ। তুমি কি মনে করেছ, আজকের ব্যাপারটা কেবল খাওয়া আর গান শোনার জন্যেই?

ত্রিদিব। তবে কিসের জন্য?

[ নিস্তারণ হাসিয়া বলিলেন,—]

নিস্তারণ। মূর্খ তুমি। গভীর উদ্দেশ্য আমার।

ত্রিদিব। অর্থাৎ?

নিস্তারাণ। অর্থাৎ তপেশ আজ শান্তিকে দেখবে...

ত্রিদিব। সে রাজি হয়েছে?

নিস্তারণ। হ্যাঁ, আমি অসাধারণ চিরকাল। বাবা রেখে গেছলেন ঋণ। পথে ভিক্ষে পর্যন্ত করেছি—দাঁতন আর পুতুল ফেরি করেছি। তোমাদের আশীর্বাদে উন্নতিও করেছি! পাপের চিত্র আমি ঢের দেখেছি জীবনে। কিন্তু একের পাপে অন্যের সর্বনাশ হয়েছে দেখে আমি যত মর্মপীড়া সহ্য করেছি তত আর কিছুতেই নয়। ...কনে দেখার সাধারণ পদ্ধতি আমার মোটেই ভালো লাগে না—কেমন যেন আড়ষ্টতা আর দু'পক্ষেরই কৈফিয়ৎ দেবার মতো কিছু তার ভিতর থাকে।

ত্রিদিব। কিন্তু শান্তি? সে যে বেজায় মেয়ে!

নিস্তারণ। তাকে ক্ষুণ্ণ না করেই এগোতে হবে—আমাদের কাজে কথায় নিশ্চয়ই চালাকি থাকবে না; স্পষ্ট করে তাকে জানাতে হবে যে, এ-ই আমাদের ইচ্ছা।

ত্রিদিব। আমি একদিন তাকে বলেছিলাম, যার মনের দাঁড়াবার ঠাঁই নেই সে হাসবে কিসের জোরে! ঠকের সংসারে হাসা বাহুল্য নয় কি!···বোঝো কথার মর্মটা, আর, তার ব্যথাটা! কিন্তু তোমার এ আয়োজনের কোথায় যেন একটা খুঁত থেকে যাচ্ছে!

নিস্তারণ। কোথায়?

ত্রিদিব। যেন অত্যন্ত হঠাৎ কিছু ঘটছে।

নিস্তারণ। আমি পূর্বেই বলেছি, তুমি একটি মূর্খ। পূর্বরাগের কথা যদি তোমার মনে এসে থাকে তবে তাকে এখুনি বাদ দাও। অনিষ্টের সূত্রপাত করে রাখতে চাইনে।

[ তপেশ আসিয়া খবর দিল, —]

তপেশ। জ্যাঠামশায়, ওঁরা আপনাদের ডাকছেন।

[ ওঁরা উঠিলেন—তপেশ চলিয়া গেল—ত্রিদিব বলিলেন, )

ত্রিদিব। যদি ঘটে তবে তোমাকে আমি কোলে করে নাচব।

নিস্তারণ। মূর্খ, যদি ঘটে কি?

* * *

[ নিস্তারণ এবং ত্রিদিব ( ওস্তাদজী বা গুরুজী ) আসরে আসিলেন—]

ত্রিদিব। মেয়েদের এখানে আনো তপেশ।

[ তপেশ যাইয়া শান্তি, মলি এবং মায়াকে লইয়া আসিল। ]

ত্রিদিব। তোমরা আমার কাছে এসে বস।

[ মেয়েরা যাইয়া তাঁহার কাছে বসিল। যন্ত্রসংগীত শুরু হইল—একবার বাজাইবার পর ত্রিদিব শান্তির কানে কানে বলিলেন,—]

ত্রিদিব। মা, ওঠ···গুরুর অনুরোধ রাখবিনে? আমার গানও চলবে···

[ শান্তি মাথা কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইল...ত্রিদিব শিষ্যাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—]

ত্রিদিব। গংগাস্তোত্র।

[ যন্ত্র বাজিতে লাগিল—ত্রিদিব গাহিতে লাগিলেন·· শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—]

— গান —

[ ডি. এল্. রায়ের "পতিতোদ্ধারিণি গংগে"—অথবা : শান্তির নৃত্য : ]

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গংগে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরংগে।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং,
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে,
পতিতোদ্ধারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে ।
পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে,
বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে কোঽপি ন জাতঃ ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং,
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে" ॥

[ সংগীত ও নৃত্য শেষ হইল—শান্তি বসিল—মায়া বলিয়া উঠিল,— ]

মায়া। অবাক করেছ, দিদি...

[ মলি পরম উৎসাহের সহিত হাততালি দিল। নিস্তারণ বলিলেন,—]

নিস্তারণ। সাধু, সাধু।

[ তপেশ পুলকিতনেত্রে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল—ত্রিদিব তা লক্ষ্য করিলেন। ]

* * *

[ আহারব্যাপার প্রচুর সমারোহ আর উল্লাসের সহিত এবং প্রচুর উপকরণের প্রশংসাধ্বনির মাঝে শেষ হইয়াছে—ওস্তাদজীর শিষ্যগণ একে একে বিদায় লইয়া গেলেন; শান্তি, মলি এবং মায়ার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতেছে—ত্রিদিবের স্ত্রী উপরে আসিলেন—নিস্তারণ ত্রিদিবকে একটু তফাতে লইয়া বলিলেন,— ]

নিস্তারণ। ইয়ে করো···

[ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন— ]

ত্রিদিব। কি করবো ?

নিস্তারণ। কাল পরশু একদিন শান্তিকে আর বউকে নিয়ে এস তুমি—কালই এস। শান্তির কাছে প্রস্তাবটা আমিই ক'রবো।

ত্রিদিব। আসবে, ৫টা থেকে ৬টার ভেতর, অবশ্য যদি পেটের অবস্থা ভাল থাকে।

নিস্তারণ। মূর্খ তুমি চিরকাল—চিকিৎসার জন্যেও এখানে আসতে পারো···

[ ত্রিদিব হাসিলেন—স্ত্রীকে এবং শান্তিকে ডাকিলেন—ত্রিদিবের স্ত্রী মলি এবং মায়াকে বহু আদর করিলেন—মলি এবং মায়াও শান্তিকে বহু আদর করিল। ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ তার পরদিন বৈকাল পৌনে ছ'টা—নিস্তারণ এবং ত্রিদিব তাঁর স্ত্রী আর শান্তি বসিয়াছেন···নিস্তারণ বলিতেছেন— ]

নিস্তারণ। শান্তি মা, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে সম্প্রতি এবং হঠাৎ ; অথচ দেখামাত্রই জেনেছি, এই মেয়েকে মা বলে ডাকায় সার্থকতা আছে—ডাকতে কারো কুণ্ঠা থাকতে পারে না। কিন্তু তোমাকে যথেষ্ট আদর করতে আমরা বোধ হয় পারিনি ! আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে পারতেন।

শান্তি। আপনি আমাকে মাতৃসম্বোধন করেছেন ; তার চাইতে স্নেহ আর আদর মেয়ের বয়সী মেয়েকে করা যায় না।

নিস্তারণ। চমৎকার। আমি মাতৃসম্বোধন করে জিতে গেছি। ত্রিদিব, চিরমূর্খ তুমি, ভাবছ কি ?

ত্রিদিব। ভাবছি, সত্যের জয় হউক···

নিস্তারণ। তা হবে, কারণ, আমি ইচ্ছা করেছি তা হোক।

ত্রিদিবের স্ত্রী। ( হাসিয়া ) তোমার ইচ্ছা···

নিস্তারণ। তোমার সন্দেহ আছে নাকি ! জানো, মা শান্তি, একদিন আমি ইচ্ছে করেছিলাম, নিজের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করব ; তা করেছি। এখন আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, আমাদের তোমার কেমন লাগল ?

শান্তি। আমার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে ; কিন্তু এ-র চাইতে উৎকৃষ্টতর সংস্পর্শ আমি কল্পনা করতে পারিনে।

নিস্তারণ। কত বড়ো প্রশংসা পেলাম তা বুঝলে, ত্রিদিব ?

ত্রিদিব। বুঝলাম।

নিস্তারণ। ( ত্রিদিবের স্ত্রীর প্রতি ) তুমি ?

ত্রিদিবের স্ত্রী। বুঝলাম।

নিস্তারণ। তুমি একটু যাও দেখি, দিদি—ভূতনাথ চা দিচ্ছে না কেন দেখে এস···

[ ত্রিদিবের স্ত্রী গেলেন

নিস্তারণ। কিন্তু শান্তি আমাদের চেনে না বললেই চলে। একটু আত্মপরিচয় দিই। আমি দারিদ্র্যাবস্থা থেকে কেবল মনের জোরে সাধুতা বজায় রেখে অর্থলাভ করেছি —কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। আমার ছেলে তপেশের সঙ্গে বুঝি তোমার আলাপ হয়নি ?

শান্তি। না।

নিস্তারণ। হলে দেখবে, সে যে-কোনো পিতার গর্বের সামগ্রী। সত্যপ্রিয়, সুশিক্ষিত, সরল আর সামান্য লাজুক। ( ত্রিদিবের প্রতি ) ওহে মূর্খ, নয় কি ?

ত্রিদিব। অত্যুক্তি করনি।

শান্তি। ( হাসিতে হাসিতে ) আপনি আমার গুরুজীকে মূর্খ বলছেন, কিন্তু উনি ত' মূর্খ নন !

নিস্তারণ। মূর্খ নয় ! তুমি জানো না মা ; ও মূর্খই। যখন কারবার শুরু করি তখন ওকে বলেছিলাম, সঙ্গে এস। ও এক তানপুরো ঘাড়ে করে বললে, বেশ আছি।

ত্রিদিব। এখনো বলি, বেশ আছি।

নিস্তারণ। তা আছো ; আরো বেশ থাকবে যদি শোনো যে, ভূতনাথ তোমার একলব্যের মতো শাগরেদ হয়েছে। ভূতনাথ বাতাসে তর্জনী নাড়ে, অর্থাৎ তানপুরোয় ঝঙ্কার তোলে, আর তোমার কায়দায় সুর ভাঁজে। মলি আর মায়া এ-কথা আমাকে অনেকবার বলেছে।

[ সকলেই হাসিতে লাগিল—ভৃত্য ভূতনাথ ট্রে-তে করিয়া চা প্রভৃতি লইয়া আসিল— ]

নিস্তারণ। এই যে ভূতনাথ ! এত দেরী করলি যে ?

ভূতনাথ। ( কাচুমাচুভাবে ) ঠাকুর... ( ট্রে নামাইয়া দিল )।

নিস্তারণ। যা।

[ ত্রিদিবের স্ত্রী পরিবেশন করিলেন ; তারপর মলি ও মায়ার কাছে গেলেন। ]

নিস্তারণ। ( চায়ে তিন চারবার চুমুক দিবার পর )—আর একটা কথা বলব তোমাকে, শান্তি ; কথাটা তোমার হয়তো কষ্টকর হবে।

[ শান্তি কথাটা শুনিবার জন্য নিস্তারণের মুখের দিকে সোৎসুকে তাকাইল—নিস্তারণ বলিলেন,—]

নিস্তারণ। আমি শুনেছি, ত্রিদিবই আমাকে বলেছে, তুমি অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে থাকো···

[ বলিয়া নিস্তারণ শান্তির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—শান্তি তাকাইল তার গুরুজীর মুখের দিকে, কিন্তু গুরুজী তখন চায়ের পেয়ালার ভিতর চায়ের গভীরতা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ]

শান্তি। আপনি সব-কথা জেনেছেন। সংকুচিত হ'য়ে আমি থাকি, কারণ নিজেকে প্রসারিত করবার স্থান আমার নেই।

[ নিস্তারণ হাসিয়া বলিলেন,—

নিস্তারণ। এমন ছেলেমানুষী কথা কখনো শুনেছ, ত্রিদিব। শান্তি যেন নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি করছে !···আমার কথা শোনো তবে ঃ আমি রাস্তায় ভিক্ষে করেছি—দাঁতন আর খেলনা ফেরি করেছি—এখন লাটসাহেবের দরবারে আমি নিমন্ত্রণ পাই। পাপের কাজ আমি ঢের দেখেছি—কিন্তু একের পাপে অন্যের শাস্তি পাওয়া আমি সহ্য করিনি—প্রতিবাদ আর প্রতিকার করেছি। তোমার নিজের সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি কি ?

শান্তি। নিষ্কলঙ্ক।

নিস্তারণ। তবে সংকোচ আসছে কোথা থেকে ?

[ শান্তি কথা কহিল না—নিস্তারণ বলিতে লাগিলেন,—]

নিস্তারণ। পৃথিবীর এক পাই লোক বাদে সবারই চরিত্র, নীতি, অর্থ, মন, বৃত্তি কলুষিত। তারা তা স্বীকার করে এবং আনন্দ করে তাদের প্রসারের অন্ত নেই। আর তুমি স্বয়ং নিষ্কলুষ হয়ে বলছ ; নিজেকে প্রসারিত করবার স্থান তোমার নেই !

শান্তি। দেখিয়ে দিন…

নিস্তারণ। দেখিয়ে দেব ? তা মেনে নিবি মা ?

শান্তি। নেব।

নিস্তারণ। আমার এই গৃহ—আর, আমার সমাজ যথেষ্ট প্রশস্ত…

[ শান্তি অবাক হইয়া নিস্তারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ত্রিদিব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ]

নিস্তারণ। আমি একটু উত্তেজিত হয়েছি, না ?

ত্রিদিব। হ্যাঁ।

নিস্তারণ। ( শান্তির প্রতি ) সহজ সরল এই যে, তোমায় আমি পুত্রবধূ করব…সম্মত আছ ?

[ শান্তি মাথা নত করিয়া রহিল— ]

নিস্তারণ। এই মুহূর্তে থেকে তুমি আমার পুত্রের বাগদত্তা ; এর ব্যতিক্রম হবে না। ত্রিদিব, আনন্দ করো।

[ —ত্রিদিব উঠিয়া শান্তির মস্তক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন —তারপর নিস্তারণ—শান্তি উভয়কে প্রণাম করিল। ত্রিদিব মায়া এবং মলিকে ডাকিলেন—তাহারা এবং তাঁর স্ত্রী আসিলে সংবাদ দিলেন—মলি আর মায়াকে বলিলেন, তোদের বৌদি…স্ত্রীকে বলিলেন,—যা ভেবেছিলাম, তা-ই হল। উল্লাসের সীমা রহিল না। ]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ বিবাহের দিন আগতপ্রায়—২।৩ দিন বাকি। বিরাট কলরব, সুদীর্ঘ গুম্ফ-শ্মশ্রুসংযুক্ত এবং পাগড়ী বুট পট্টি চাপরাশ আর খাকীর কাটাপোষাক-পরিহিত অর্থাৎ দুর্বলের চক্ষে ভয়াবহ, এক দ্বারবান শনিবারের অপরাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইল উলটগ্রাম গ্রামের বসন্তবিলাস রায়ের দরজায়—হাতে পিওনবুক। ডাকিল, ] বসন্তবাবু ?

[ কণ্ঠস্বর অত্যন্ত প্রবল—চমকিয়া উঠিবার মতো…বসন্তের স্ত্রী ছিলেন উঠানে—মেয়ে পানতো ছিল রোয়াকে—অন্যান্য সন্তানগণ ছিল যত্রতত্র—বসন্ত নিজে ছিলেন তাঁর ঘরে—পাখা নাড়িয়া মশামাছি প্রভৃতির উৎপাত নিবারণ করিতেছিলেন—সকলেই চমকিয়া কান খাড়া করিলেন…পুনরায় আহ্বান আসিল, ]

পিওন। বসন্তবাবু ?

[ বসন্ত সাড়া দিলেন,— ]

বসন্ত। কে ?

পিওন। আমি আছি—বাহারে আস্থন ; চিঠি লেন…

[ দু'টি ছেলে দরজার দিকে গেল—বসন্ত তক্তাপোশ হইতে অবতরণ করিয়া দরজায় গেলেন—দ্বারবানের সম্মুখীন হইলেন—তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ]

দ্বারবান। আপনি বসন্তবাবু আছেন ?

বসন্ত। হ্যাঁ, আমারই নাম বসন্ত।

দ্বারবান। সেলাম হুজুর। এই চিঠ্‌ঠি।

[ বলিয়া দ্বারবান পিওনবুক বসন্তের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল—বসন্ত চিঠি তুলিয়া লইলেন—দ্বারবান পেনসিল তাঁর হাতে দিল—বসন্ত পিওনবুকে স্বাক্ষর করিলেন—]

দ্বারবান। সেলাম, হুজুর।

[ বলিয়া দ্বারবান প্রস্থান করিল। খুব পুরু বৃহৎ লেফাফায় টাইপ করা নাম ও ঠিকানার দিকে তাকাইয়া তিনি উঠানে আসিলেন—দেখিলেন, সবাই অত্যন্ত উদগ্রীব · বসন্তের স্ত্রী জানিতে চাহিলেন,—]

বসন্তের স্ত্রী। কার চিঠি ?

[ একটি ছেলে বলিল,—]

একটি ছেলে। মা, দারোয়োনকে দেখনি তুমি ? বাপরে…

বসন্ত। দেখি কার চিঠি।

[ বলিয়া লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন · নিঃশব্দে পড়িয়া বলিলেন,—]

বসন্ত। আশ্চর্য চিঠি !

[ ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে লাগিল ঃ "কার চিঠি, বাবা" ? "কে লিখেছে, বাবা" ? "খামখানা আমাকে দাও, বাবা"…ইত্যাদি। ]

বসন্তের স্ত্রী। ব্যাপার কি বলো না শীগগির !

বসন্ত। পড়ি, শোনো ঃ—( বলিয়া বসন্ত পড়িতে লাগিলেন—)

সহৃদয়েষু,

বহুসম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ আপনাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি আপনার অস্থবিধার কারণ হইয়া থাকি তবে কৃপাপূর্বক মার্জনা করিবেন।

আপনার সংগে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারিলে ধন্য হইব। আমি সম্প্রতি নানাকারণে সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি নতুবা নিজেই যাইয়া মহাশয়ের সংগে পরিচিত হইয়া কৃতার্থ হইতাম।

পত্র দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। আগামী বাংলা ২৭ ও ২৮ তারিখে পর্বোপলক্ষে অফিসাদি বন্ধ থাকিবে। ঐ ২৭ তারিখে সকাল ৭টায় বিনোদপুর ষ্টেশন হইতে কলিকাতার দিকে যে-গাড়ী ছাড়ে সেই গাড়ীতে আপনি রওনা হইয়া আসিবেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এই দ্বারবান এবং সম্ভব হইলে অন্য লোক এবং গাড়ী উপস্থিত থাকিবে। আপনার কষ্টের কারণ হইবে না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, এই সাক্ষাৎকারের ফলে আপনি পরম সন্তোষলাভ করিবেন। নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি—

ভাবদীয় প্রীতিপ্রার্থী শ্রীনিস্তারণ মজুমদার।

[ বাড়ীশুদ্ধ লোক অবাক হইয়া রহিল—বসন্তের স্ত্রী বলিলেন,—]

বসন্তের স্ত্রী। ঠিকানা দেখনি ?

বসন্ত। দিয়েছে বই কি! ১০, পৃথ্বীরাজ স্ট্রীট...ফোন নম্বর, সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাফের ঠিকানা, সবই আছে—ধনী নিশ্চয়ই।

বসন্তের স্ত্রী। তোমাকে দিয়ে তাঁর কি দরকার।

বসন্ত। ঈশ্বর জানেন!

বসন্তের স্ত্রী। যাবে না কি ?

বসন্ত। যাব। না গেলে রহস্যের কিনারা হবে না।

[ "বাবা, আমি যাব", বলিয়া ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিতে লাগিল···]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ নিস্তারণের কক্ষ—নিস্তারণ এবং ত্রিদিব বসিয়া আছেন—]

নিস্তারণ। ভাড়ার বাড়ীটাতে তুমি থাকবে সস্ত্রীক শান্তিকে নিয়ে—মায়া, মলিদের দুই মাতুল আসবেন সপরিবারে—তাঁরা থাকবেন সেখানেই—লোকজন চাকরবাকর ত' থাকবেই—চা জলযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে; বিয়ের পর খাওয়াদাওয়া হবে এখানে; সন্ধ্যার পরই বিয়ে, অসুবিধে কিছু হবে না।

ত্রিদিব। না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নিস্তারণ। সমস্যা বসন্তবাবুকে নিয়ে। যদি না আসেন ?

ত্রিদিব। সকালের গাড়ীতে যদি না আসেন—দুপুরের গাড়ীতে আমি নিয়ে আসবো। লগ্ন আছে দুটো। একটু দেরী হয়ে যাবে।

নিস্তারণ। শান্তি কেমন আছে ?

ত্রিদিব। ভাল আছে; কিন্তু বড় চাপা মেয়ে—খুশীর ভাবটা দেখছিনে।

নিস্তারণ। তার বাবা আসছে শুনেছে ?

ত্রিদিব। না।

নিস্তারণ। শুনিয়ে কাজ নেই—যদি বেঁকে বসে! চটে আছে বাপের উপর।

[ ত্রিদিব হাসিলেন— ]

নিস্তারণ। অনেক কাজ; তোমার গা তেমন নড়ছে কই ?

ত্রিদিব। তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু নড়ছে। সমুদয় আয়োজন কমপ্লিট।

## সপ্তম দৃশ্য

[ নিস্তারণের বাড়ীর ফটক—নিস্তারণ আর ত্রিদিব দাঁড়াইয়া আছেন…গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল—দ্বারবান নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল—বসন্ত তার ব্যাগ লইয়া সাবধানে অবতরণ করিল,—প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার দিকে একবার চোখ তুলিল—নিস্তারণ ও ত্রিদিব অগ্রসর হইয়া প্রচুর সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন—সঙ্গে করিয়া লইয়া দ্বিতলে তুলিলেন।—তাঁহাকে গদিআঁটা চেয়ারে বসাইলেন… ]

নিস্তারণ। আপনি আসায় আমরা পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি, আর আনন্দিত যে কত হয়েছি তা বলতে পারিনে।

বসন্ত। আপনারা দাঁড়িয়ে থাকলেন…

'বসো', ত্রিদিব। [ বলিয়া নিস্তারণ বসিলেন। ]

নিস্তারণ। ( অত্যন্ত পুলকিতভাবে হাসিতে হাসিতে ) আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেননি যে, আপনার নিজের কাজেই আপনি এখানে এসেছেন…

বসন্ত। আমি কিছুই অনুমান করতে পারিনি, কিন্তু বিস্মিত হয়েছি খুব।

[ চা আসিল—তার সঙ্গে নানাবিধ ফল। ]

নিস্তারণ। বিস্মিত হ'ন ক্ষতি নেই, কিন্তু উদ্বিগ্ন হবেন না। আজ আমাদের বড় শুভদিন—আমার পুত্রের আজ বিবাহ।

বসন্ত। একটা উৎসবের কথাই সজ্জা আর লোকসমাগম দেখে সেইরকম মনে হয়েছিল।

নিস্তারণ। এইসূত্রে আপনি হয়তো মনে মনে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনার পুত্রের বিবাহ—কিন্তু অপরিচিত আমাকে আহ্বান করা হয়েছে কেন ?"

[ বসন্ত একটু হাসিল— ]

নিস্তারণ। ফলগুলো সব খান ; কারণ। আপনাকে এখন ঐ যা খেতে দেওয়া হ'ল ; তারপর খাবেন আপনি রাত আটটা কি নটায়। সমস্ত দিনটা একটু শরবৎ ছাড়া কিছু দেয়া হবে না। [বলিয়া নিস্তারণ উচ্চহাস্য ধ্বনিত করিলেন।…তারপর বলিলেন—] ত্রিদিব আমাদের অতিথিসৎকারের নিয়ম ঐ না ?

ত্রিদিব। কখনো কখনো দাঁড়ায় তাই।

বসন্ত। ( অপ্রতিভভাবে ) কথাটা বুঝিয়ে বলুন।

নিস্তারণ। বলি। সম্পর্ক হিসাবে একটু তামাশা করলাম বই ত' নয় ! আমার পুত্রের আজ বিবাহ, আগেই বলেছি। বিবাহ হচ্ছে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে—আপনি সম্প্রদান করবেন।

বসন্ত। [কিছুমাত্র বিস্মিত কি আনন্দিত হইলেন না, সহজভাবে বলিলেন,—] আপনারা তাকে কোথায় পেলেন ?

নিস্তারণ। ত্রিদিব এবার পালা তোমার—প্রশ্নের জবাব দাও।

ত্রিদিব। আপনার কাছে সে গিয়েছিল—গর্ভধারিণী এবং অতুলের বিষয় জানতে পেরে তাদের সে ত্যাগ করেছে এ-কথাও সে বলেছিল ; কিন্তু আপনি ওকে স্থান দিতে সম্মত হননি—এ-পর্যন্ত আপনি জানেন…

বসন্ত। জানি। লোকলজ্জা আর সমাজের ভয়ে—

ত্রিদিব। যে কারণেই হোক...কিন্তু বিশ্বাস করুন যে, সেজন্যে কারো মনেই ক্ষোভ নেই ; কারণ নিজের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে আমাদের চিন্তনীয়। আমি অতুলের হিতৈষী এবং বন্ধু। আপনার প্রত্যাখ্যানের পর সে এসে দেখল, অতুলও তাকে তাড়াতে চায়···আমার কাছে সে এল—আমি তাকে স্থান দিলাম—তারপর দিলেন, অথবা দিচ্ছেন, ইনি। আমার স্থান ছিলো নেহাৎ সংকীর্ণ, ইনি তাকে আনছেন খুব প্রশস্ত স্থানে—একমাত্র পুত্রের বধূ করে। আপনার কন্যা অতুলনীয়া, রূপে, গুণে, চরিত্রে, শিক্ষায়। তার যোগ্য স্থানে সে আসছে। লক্ষ্মী তাঁর ভাণ্ডারে আর-একটি লক্ষ্মী স্থাপিত করছেন।

বসন্ত। ( কুণ্ঠিতভাবে ) কিন্তু আমি ত'···

ত্রিদিব। কি করে জানবেন আপনি ? সত্য কথা। সে যখন তিনমাসের শিশু তখন আপনি তাকে দেখেছিলেন ; তারপর দেখলেন হঠাৎ, যখন তার বয়েস সতেরো। আপনার কোনো ত্রুটি দেখা যায় না—আপনাকে আপন বই পর আমরা কেউ মনে করিনে—কোনো দুঃখ নেই—দুঃখ করবেন না।

বসন্ত। কিন্তু আমি ত' এমন-কিছু আনিনি যা দিয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করব।

নিস্তারণ। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবেন না। আমাদের সনাতন আশীর্বাদের দান ধান এবং দূর্বা—আপনি তা-ই তাদের মাথায় দিয়ে সর্বান্তঃকরণে শুভাকাঙ্ক্ষা করবেন। আসুন আমরা কোলাকুলি করি···

[ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিস্তারণ ভাবিলেন ; মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে এখন ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক ; বলিলেন,— ]

নিস্তারণ। মেয়েটিকে দেখবেন ? আনবো ?

[ বসন্ত কথা কহিল না—নিজের দক্ষিণ হস্তের অনামিকাস্থ অংগুরীটির দিকে নিঃস্পৃহচক্ষে তাকাইয়া রহিল। ]

## অষ্টম দৃশ্য

[ বিবাহসভা—ধনীর আয়োজন বিপুল...বসন্ত সম্প্রদান করিতেছে—অদূরবর্তী একটা কক্ষে ওস্তাদজীর শিষ্যগণ উপভোগ্য যন্ত্রসংগীতের সৃষ্টি করিয়াছে···সম্প্রদানের পর প্রচলিত বিবিধ অনুষ্ঠানান্তে বরবধূ বাসরঘরে আসিল। ]

যবনিকা

# গল্প ও কাহিনী

# বিনোদিনী

## —উৎসর্গ-পত্র—

### মলয়,

তুমি,

ফুল হ'য়ে ফোটোনাক আমার অঙ্গনে—
অস্ফুট কলিটি, পরে প্রপূর্ণ যৌবনে
ঢল ঢল মুখে—
হাসিয়া হাসিয়া তুমি নাচিয়া দুলিয়া
হৃদয়ের মধুকোষ দাও না খুলিয়া
আমার সম্মুখে।—

আমার এ আম্রশাখে জাগিলে মঞ্জরী
আকুল হইয়া তুমি আস না গুঞ্জরি
মধুপ-সমান ;
তোমার গুঞ্জনগান মুকুলের গায়ে
রাখেনা আনন্দঘন রোমাঞ্চ জাগায়ে
সারা দিনমান।—

সাঁতারি আস না তুমি নীল-পারাবার—
যামিনীর পুলকিত লাবণ্যসম্ভার
চাঁদের মতন ;—
পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় তুমি নাহি ঢালো
আমার মুখের পরে রূপময়ী আলো
মেলিয়া নয়ন।—

শুনিতে শুনিতে বেদ-বন্দনার গান
তপনের মত তব হয় না উত্থান
পৃথিবী উজলি,
নয়নে আলোক দিয়ে হৃদয়ে চেতনা
জীবন প্রবাহমূলে তুমি ত' ঢালো না
উষ্ণ রসাঞ্জলি।—

বৈশাখের অপরাহ্নে খররৌদ্র পরে
আস না ঈশানে তুমি সাজি স্তরে স্তরে
মেঘের মতন—
ঢালো না গর্জন করি দীর্ঘ জলধার
ধরার তাপিত অঙ্গে, তুলি অঙ্গে তার
শ্যাম-আস্তরণ।

নাহি শব্দ, নাহি রূপ, নাহিক কিরণ
শুধু স্পর্শ, যেন কার নিঃশ্বাস পতন,
গোপনচারিণি ;—
আস তুমি গোপন পথশ্রান্ত দেহ—
যেন কার অনাহত সুগভীর স্নেহ—
চিনিতে পারিনি !

# গল্প কেন লিখিলাম

এত লোক থাকিতে আমারই এই গল্পগুলি লিখিবার কি দরকার পড়িয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস আছে।......সেই অনাদি নর ও নারী।

আমার স্ত্রী আলসে মানুষ দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। আমি হাত পা গুটাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি দেখিলেই তিনি আমার হাতে একটি পয়সা দিয়া বাজারে পাঠাইয়া দেন; বলেন, ধনে নিয়ে এস; কোনোদিন বলেন, পান: কোনোদিন, কাঁচালঙ্কা; কোনোদিন, সোডা; কোনোদিন, মউরি; কোনোদিন আর কিছু।.....কিন্তু ঐ এক পয়সার; কোনোদিন তার বেশী নয়।

হঠাৎ একদিন আপত্তি করিয়া বসিলাম, এবং আমার সে দুর্মতির শাস্তি তিনি হাতে হাতেই দিলেন; তাঁর সেই অননুকরণীয় ভ্রূভঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল; বলিলেন,—আর কোনো উপকার না হোক্, বাতের হাত থেকে বাঁচবে।

পয়সাটি হাতে করিয়া ধনে আনিতে রওনা হইলাম।......আসা-যাওয়ায় বাজার সওয়া ঘণ্টার পথ; এবং পথের সমস্তটাই বাত-নিবারক।

এমনি করিয়া অমূলক বাতের ভয়ে বাজারে হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ ফাঁকি দিবার একটি ফন্দি মিলিয়া গেল।......

পরদিনই কাগজ আর পেন্সিল লইয়া উর্দ্ধনেত্র এবং চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বসিলাম, এবং বসিয়াই রহিলাম।

.....প্রিয়ম্বদা ঘরে ঢুকিয়া লিখিবার সরঞ্জামগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ও-গুলো নিয়ে কি হচ্ছে?

উর্দ্ধনেত্র তাঁহার দিকে নামাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলাম,—বাজারে আর যাচ্ছিনে।—প্রকাশ্যে বলিলাম,—একটা গল্পের কথা ভাবছি।

......এবং, প্রিয়ম্বদার ঠোঁটের কোণে হাসির উদয়শিখরে অতিশয় তীক্ষ্ণ হাসির একটি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াই মনের লঘু ভাবটা একনিমেষে কাটিয়া গেল; তাড়াতাড়ি করিয়া বলিলাম,—সবাই ত' গল্পটল্প লেখে দেখি, দেখি আমিও যদি দৈবাৎ পেরে উঠি —বলিয়া অত্যন্ত কাপুরুষের মত শুষ্কমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, যেন গল্প লিখিতে পারিয়া উঠিব কি না সেই মুহূর্ত্তে সেইটাই আমার নিদারুণ ভাবনা।

......কিন্তু আসল কথা, আসা-যাওয়ায় বাজার পূরো সওয়া ঘণ্টার পথ, এবং বাতের ভয় আমার নাই।

কি ভাবিয়া প্রিয়ম্বদা আমাকে সে-যাত্রা ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

হঠাৎ এক ধাক্কা—

ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, প্রিয়ম্বদা সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন।

বলিলাম,—একটু তন্দ্রামত এসেছিল।—বলিয়া এমনি করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম, যাহার মত হৃদয়বিদারক ব্যাপার জগতে খুব কম ঘটে।

গল্পের প্লট্ যাহার উপর লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই কাগজখানা প্রিয়ম্বদা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিলেন,—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ঘটনা, হাইকোর্ট; ওয়াটার-টাওয়ার; এক পয়সার মিঠেকড়া তামাক; ঢোঁড়া মিঞা; মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়; পয়সায় দুটো শশা; বিভূতি চৌধুরী, রামনবমী; তারি সনে দেখা হ'লে; হাতুড়ে......

টানিয়া টানিয়া পড়িতে লাগিলেন; আর, আমার মনে হইতে লাগিল মানুষের সব দুর্গতিরই যদি সীমা থাকে তবে তা আসিতে কত দেরী?—

—এ-গল্প বিলেত পাঠাবে না দেশী কাগজেই দেবে? বলিয়া কাগজখানা আমার পাশে ছুড়িয়া দিয়া প্রিয়ম্বদা চলিয়া গেলেন।——

ঘাড়ের উপর জগদ্দল বিপদের পাথর চাপিয়া রহিল, কিন্তু দমিলাম না,——বহুক্লেশে পাঁচদিনের দিন গল্প একটী তৈরী হইল; এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আরো চারদিন বাজারকে ফাঁকি দিলাম।—

কিন্তু সে যন্ত্রণাও ভুলিবার নয়।

এই হইল সুরু; এবং এখনও সেইভাবেই চলিতেছে।—বসিয়া বসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া কলম নাড়িয়া যদি ফাঁকি দেওয়া যায় তবে কে এখন ধনে আনিতে বাজারে দৌড়ায়?——

যাহার জন্মের ইতিহাস এইরকম সে যে মানুষকে আনন্দ দিবে, নূতন কিছু দিবে সে বিশ্বাস আমার কদাপি নাই।

আমার দুইটি অশেষ হিতৈষী পরমবন্ধুর সহায়তায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল; শ্রীযুত শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগ এবং শ্রীযুত ব্রজজনবল্লভ বসু মহাশয়ের অর্থানুকূল্য। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা তাঁহারা গ্রহণ করুন।

আবরণপত্রের চিত্রখানির পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস। আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম।

বোলপুর,
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪। } শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

## দিবসের শেষে

রতি নাপিতের বাড়ীটার অবস্থানক্ষেত্র বড় চমৎকার—বাড়ীর পূর্বে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান ; উত্তরে বেণুবন ; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিংগুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে ; রতি ঠিক পাখীর ডাকেই জাগে,—গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলীর সংগে সংগে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে ; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ সির্ সির্ করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, দক্ষিণে সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না ; কিন্তু এই এতবড় কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই—তার চোখ কান এ-সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাকরাণ জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান। রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইত না ; এবং রতির বাড়ীর পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম, কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায় তবে রতি নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। কিন্তু লোকে সে-কথা বিশ্বাস করে। দু'ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আম-কাঁঠালের কালে আম, কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলী ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলী কবচ তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অংগে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমংগলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এত করিয়াও নারাণীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই ; দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ একসময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে—তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারাণীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই—এমনি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিয়া বসিল তাহা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি অবিশ্বাস্য। নারাণী তাহাকে হাত ধরিয়া ক্ষেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল—নিঃশব্দে যাইতে যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

নারাণী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—সে কি রে ?

—হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

—কি ক'রে জানলি।

পাঁচু বলিল,—তা' জানিনে।

ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারাণী প্রথমটা ভয়ানক চমকিয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেল।···পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলিয়াছে ;—একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল ; আর একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল।···এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে। পাগল ছেলে !

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিল। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেল তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্সীর কথাটা। অধর বক্সী সেবার নৌকা-যাত্রা করিবার ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল,—প্রাঙ্গণে লাফাইয়া লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলি চিৎকার করিয়াছিল—ও কে ? ও কে ?...সে-দিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারো সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মত আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সে-দিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,—রতি, রকম ভাল নয়, এ-টা মৃত্যুর লক্ষণ ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিম্বা যার মরণ ঘনিয়েছে।···

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোরকণ্ঠে শাসন করিয়া দিল,—খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আনবি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিটে ভাঙবো।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ—নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল্ ছল্ শব্দে লেহন করিতেছে ; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে ; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী, কামদা, তার দুইতীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত ; এ নদী ত' নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মত মমতাময়ী—চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লী-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল,—আয়, নেয়ে আসি।

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল ; মায়ের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আমি আজ নাইব না, মা।

—কেন রে ?

—ভয় করছে।

নারাণী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল,—পাঁচু নাইবে না আজ।

রতি ভ্রূভংগী করিয়া বলিল,—কেন, কি হয়েছে ?

—হয়নি কিছু।

—তবে ?

—নাইতে চাইচে না, থাক্ না আজ।

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিল,—না, ও-র ভুলটা ভাংগা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি ত' হাসলেনই, আরো কতজনে হাসলে।

গ্রামের বাবু চৌধুরীমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে ঘষিতে রতি পাঁচুগোপালের উদ্ভট উক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে ত' হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসম্বরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমীর ? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কি হইতে পারে! চৌধুরীবাবু বলিয়াছিলেন,—কিছু না, তুই সংগে করে নাইয়ে নিয়ে আসিস ; কুমীরে যদি নেয় ত' তোকেই নেবে—

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল—বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক হবে।

হলধর রাজবংশী বাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল ; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল,—রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ ? তাতে আবার জেতে নাপিত !—

ইত্যাদি বিরক্তিকর বিদ্রূপে মনে মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বক্সীর এই শ্রেণীর ভুলের দরুণ সদ্য সদ্য নিধনপ্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সঙ্কল্প করিয়া রতি বাড়ী আসিয়াছিল।

নারাণী পাঁচুকে বলিল,—যাও, বাবা, নেয়ে এস। সংগে বড় একটা মানুষ যাচ্ছে—ভয় কিসের ? বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিল, মনে মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিল।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছট্‌ফট্ করিত ; আজ সে দাঁড়াইয়া নির্বিবাদে তেল মাখিল, এবং বাপের গামছাখানা হাতে করিয়া তার পিছন পিছন ঘাটে আসিল।

স্নানার্থিগণের উঠানামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল—তার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। নিস্তরংগ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্নরৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতবড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভাল করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না ; যেন গংগাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।—এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কত হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে!…রতি শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও

বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল—নদীর নিষ্কম্পবক্ষে একটি বুদ্বুদও কোথাও নাই।...ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দু'টি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বাহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে—সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতন। প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুঁটিতে সাজাইয়া দূরদূরান্তে স্থানে স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।—নদীর দুইতীর নির্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিল।...

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ওটা কি?

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল—একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুস করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগবাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিল,—শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, বাবা?

—খাবে বলে। ও-রা বড় বড় রুই কাৎলা মেরে মেরে খায়।

শুশুকগণ জলের ভিতরেই বড় বড় রুই কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—জলের ভিতর ত' অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায়?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল, কামদায় কুমীর ভাসিতে এ-গ্রামের কেহ কখন দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখন পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের?

ঝপ্ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিল; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইল এবং এক হাতে তার ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিল, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইল, তারপর উপরে তুলিয়া গা মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

রতি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—পাঁচু কৈ রে?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিল,—খাচ্চি, বাবা।

—কেমন, কুমীরে নেয়নি ত?

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে হাসিতে বলিল,—না।

নারাণী বলিল,—ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারাণী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারাণীর চোখে পড়িল তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নেই।—নারাণী গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেল। হাঁকিল,—পাঁচু?

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধ হয় একদৌড়ে বাড়ী যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ীর সীমানার বাহিরে যাইতে পারে নাই। মায়ের

ডাক শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়সড়ভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্তি দেখিয়া নারাণীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যাপার এই—

নারাণী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সংগীরা ঘরে রাখা ছোট একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইয়াছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার ঠিক পদ্ধতিটা জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ়রসে সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধূলায় গড়াগড়িও দিয়াছে; কাজেই ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা!

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্টচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল। এত বেলা পর্যন্ত সে যে বড় ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিল,—যেমন ছেলের গলা তেমনি তার—হয়েছে কি?

নারাণী বলিল,—হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কত!—বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিল যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রূভংগী করিয়া বলিল,—থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা' হ'লে ত' হবে? বলিয়া সে উঠানে নামিল।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিল—সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বাপের আগে আগে নদীর দিকে চলিল।...রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিল। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিল,—বাবা আমার ঘট?

উভয়েই ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিল,—নিয়ে আসি, বাবা?

রতি বলিল,—যা।

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় তাহারাই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্তেই সে স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।...মুদ্রিত-চক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশী সময় লাগিল না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহুঃ তীব্র আর্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।......

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল। ...জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।...কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিল না।...সে তখন মূর্চ্ছিতা।—

## পল্লী-শ্মশান

"কোহিনুর" ওয়াল্‌ল্যাম্পের শিখাটা একদিকে অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়া অনর্গল ধোঁয়া ছাড়িতেছিল, সেটাকে পরিমিত মাত্রায় কমাইয়া দিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারপর, বাড়ী যাচ্ছ কবে ?

পূজার ছুটি আরম্ভ হইতে তখন মাত্র দু'দিন ছিল।

প্রশ্নের উত্তরে বসন্ত বলিল,—বাড়ী ? বাড়ী ত' আমাদের নেই।

—বাড়ী নেই ?

—থাকলে কি আর হৃদয় রজকের এই বাড়ীটা কিনি স্ত্রীর গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে ?

—নিজের দেশে তোমাদের বাড়ী নেই ? ছিলই না ?

—ছিল, কিন্তু এখন নেই !

—গেল কিসে ? বাকি খাজনায় ?

—না, না। গেছে মানে ভেঙ্গে গেছে, আর উইয়ে খেয়েছে কতক। বছর তিনেক হল আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ী হয়েছি।

—পল্লীবাস একেবারে ত্যাগ করে ?—আমার কণ্ঠস্বরে একটু ভর্ৎসনা ছিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, একেবারেই ত্যাগ ক'রে। তার কারণ বড় সমস্যামূলক। শুনবে ?

শুনব।

বসন্ত বলিতে লাগিল,—আমাদের গ্রামের দক্ষিণে মুসলমান, পশ্চিমে মুসলমান, পূবে নদী—ফাঁকা ; উত্তরে জঙ্গল, এক পাশে ভূতপূর্ব দয়া বোষ্টমীর পরিত্যক্ত পঞ্চবটী, তারপর ব্রাহ্মণ আর নরসুন্দর, এই চৌহদ্দির মধ্যস্থিত কাঠা আষ্টেক ভূখণ্ডের উপর তিন ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। উত্তরের জঙ্গলপারের ব্রাহ্মণরা একঘর ভেঙ্গে তিনঘরে দাঁড়িয়েছিলেন ; সেই তিন ঘরের দু'ঘর ডালেমূলে বহুপূর্বেই নির্মূল হয়ে গেছেন ; অবশিষ্ট একঘর ছিলাম আমরা, তাও পালিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ীতে থাকতেন, অর্থাৎ বারমাস থাকতেন, দুটি বউ, আমার বিধবা দিদি, আর এঁদের অভিভাবক ছিল চোদ্দ বছরের একটি বালক, কমল, আমার দিদির সৎছেলে।...নরসুন্দর রামগতি বিপত্নীক ও খোঁড়া, তার একখানা পা জন্মাবধিই শুকনো আর খাটো, তার একখানা হাতও অকেজো, মানে পক্ষাঘাতে বিকল। তার ছেলেটি কালাজ্বরের রুগী, একেবারেই অচল। তিন ঘরের অবস্থা পরস্পরের তুলনায় এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বর্গাইতরা ফসলের অর্ধেক বলে এক-দশমাংশ যা দিত তাতে তাঁদের জোড়াতালি দিয়েও দিন চলত না, তবে খরচের টাকাটা নিয়মিতই আসত আর যথেষ্টই আসত। এঁরা মোটের উপর সংখ্যায় পাঁচজন ছিলেন ; সবাই রমণী ; বিদেশগত পুরুষদের বিধবা ভগিনী, বিধবা ভাজ ইত্যাদি।—এঁদের তদ্বির তাদারক করত একটি ছেলে, খোকা, বয়স তের, মাঝের ঘরের নিস্তারিণীর ছেলে, বয়স হিসাবে নগণ্য আরও গুটিকতক ছিল। রমণী পাঁচজনের মধ্যে একটিমাত্র সধবা ছিলেন ; তিনি যখন বিধবা হ'লেন তখনই গল্প জমে উঠল।

শিবদাসীর স্বামী, জিতেন বাবু, হঠাৎ একদিন আসাম থেকে আপাদমস্তক শোথ আর রক্তহীন পাণ্ডুরতা নিয়ে পৈতৃক ভিটেয় প্রাণত্যাগ করতে এলেন। চিকিৎসার বাইরে তিনি

অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন ; কিন্তু বাড়ীতে এসে তাঁর চিকিৎসা বন্ধ রইল চিকিৎসা নিরর্থক জেনে নয়, চিকিৎসক গ্রামে ছিল না বলেই। কয়েকটি মাদুলী ধারণ ক'রে জিতেন্দ্র অষ্টপ্রহর হাঁপানীর টানে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন নেমে গেলেন। জিতেন্দ্র যখন মারা গেলেন বেলা তখন সাতটা। বিধবাদের স্বাভাবিক অবস্থাতে সাধ্যই হত না মুমূর্ষুর অসাড় দেহ হাততোলা ক'রে নড়িয়ে রাখেন, কিন্তু ঘরের মধ্যেই মানুষ ম'রবে পারলৌকিক এই ত্রাসে তাঁদের শক্তি দশগুণ বেড়ে গেল। মুমূর্ষু জিতেন্দ্রনাথকে তাঁরা বাইরে আনতে আনতেই তাঁদের হাতের উপরেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শোক যতবড়ই হোক, সৎকারের আয়োজন করতেই হয়। মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাতে হিঁদুর বড় একটা ব্যগ্রতা দেখা যায়, বোধ হয় তার শাস্ত্রীয় কারণ আছে। এ দায়িত্বটা পুরুষের ; এক্ষেত্রে পুরুষের অভাবে বাড়ীর মেয়েরাই শোকসম্বরণ ক'রে উঠলেন।…

কর্তাদের আমলের কথাই মেয়েদের মনে ছিল ; ইতিমধ্যে যে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সংস্থাপিত হ'য়ে চুকে গেছে এ নূতন তথ্যটা তাঁরা অবগত ছিলেন না। কর্তাদের আমলে বাড়ীতে মৃত্যু ঘটলে সাহায্য ডাকতে হত না, আপনি আসত ; এখন ডাকতে হয়, এইটুকু তাঁরা জানতেন। তাই সাহায্য ডাকতে মুসলমান প্রতিবেশীবাড়ীতে লোক গেল ; খোকাই গেল। অনুরোধ জানাতেই এরফানরা তিন ভাই একসঙ্গে চমকে উঠল। খুব উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ছি স্বপ্ন দেখে মানুষ যেমন চমকে উঠে তাদের চমকটাও ঠিক তেমনি প্রবল, হৃৎকম্পজনক। অনুরোধটা ছিল এই যে তারা কেউ এসে সৎকারের কাঠের যোগাড় যদি করে দেয়……

এরফান বাড়ীর মাতব্বর ; সে প্রশ্ন করলে,—তোমাকে কে পাঠিয়েছে, খোকা ?

খোকা বললে,—মা।

এরফান একটু হেসে বললে,—বাড়ীতে মড়া বলেই তিনি অচেতন হয়ে গেছেন। তাঁকে বলগে যাও, হিঁদুর মড়া আমরা ফেলিনে।

—তোমরা কেন ফেলবে ? কাঠ—

বলতে বলতে খোকা চমকে উঠে থেমে গেল। এরফান গর্জন ক'রে বললে,—ছোঁড়া ত বড় বাচাল হে। দুটোতে তফাৎ কি হ'ল ? কাফেরের মড়া পোড়াবার কাঠ আমরা যোগাইনে। যাও, বলগে তোমার মাকে।

এরফানের মনে মৌলভীর বক্তৃতার "কাফের"……প্রভৃতি কতক অংশ স্থিতিলাভ করেছিল।

এরফানের ভাই তালেবর হেসেই বললে,—মাটি দাওগে, তোমরাই পারবে।

খোকা কাঁদ কাঁদ মুখে বাড়ী ফিরলে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করলেন,– এরফানরা কেউ এল না ?

—না।

—কি বললে ?

—বললে, মাটি দেওগে। বলেই খোকা কেঁদে ফেললে।

খোকার কাঁচ মন ঐ শেষ কথাটার গুরুত্ব কতদূর পৌঁছয় তা উপলব্ধি ক'রেছিল

কিনা তা তার মনই জানে, কিন্তু পথে আসতে আসতে সে কথাটা মনে মনে বহুবার আবৃত্তি করেছিল সন্দেহ নেই ; বোধ হয় সহজবোধে সে ব্যথাও পেয়েছিল।

নিস্তারিণী কথাটা শুনে বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে হতবাক্ বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য যেমন বালির উপর জ্বলতে থাকে, মৃতের প্রতি এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অপমানের জ্বালা তেমনি তেজে তাঁর শোকের উপর জ্বল্‌তে লাগল। তাঁর মনে পড়ল, বাবা যখন মারা যান তখন এই এর্‌ফানেরই পিতামহ তিন দিন তিন রাত্রি শয্যাত্যাগ করেনি ; ভাইফোঁটার দিন এর্‌ফানরা নেমন্তন্ন খেত ; নিবিড় প্রণয়ের খাতিরেই এর্‌ফানের বসতবাড়ীর সাত কাঠা ভূঁই নিষ্কর।—

যাক, সে সব কথা স্মরণ করে এখন লাভ নেই। যাদের সঙ্গে এত বাধ্যবাধকতা তাদেরই যখন মৃতের উদ্দেশে এমন কথা বলতে বাধলো না তখন আর কার দরদের আশা করা যেতে পারে ?

নিস্তারিণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে সন্তাপটি পরিপাক ক'রে নিয়ে বললেন,—খোকা, তুই আর একবার যা। বলগে, কাঠ না দিতে পার, দু'জন লোক ডেকে দাও, আর বিনোদপুরের সেনেদের একটা খবর দাও।

খোকা গেল।....

এর্‌ফান বিরক্ত হ'য়ে বললে,—মুসলমানকে দিয়ে ও কাজ হবে না, খোকাবাবু, কেন বৃথা হাঁটাহাঁটি ক'রে হয়রাণ হচ্ছ ? আর বেগার দিতে আমরা দু'কোশ রাস্তা দৌড়তে পারব না। অধর্ম ঢের ক'রেছি, আর না।

মৌলভী বলে গেছে, কাফেরের উপকার করাও মুসলমানের মহাপাপ, ধর্মের নিষেধ আছে।

নিস্তারিণীর অন্তঃপুরে এ খবর পৌঁছয় নাই। তাই তিনি খোকাকে তৃতীয়বার পাঠালেন ; বলগে,—আমাদের বড় বিপদ, একটিবার তারা কেউ এসে দেখে যাক। তারপর যা বলবার হয় আমিই বলব। বলে তিনি সূর্যের দিকে চোখ তুলে বেলা দেখলেন কি ভগবানকে ডাকলেন তা তাঁর অন্তর্যামী শুধু জান্‌লেন।

খোকা এসে বললে—তারা খেয়েই আসছে।

মৃতদেহ কিছুক্ষণ বাড়ীতে রাখার বিধি আছে ; সেই নিরূপিত কালটা অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা আসছে শুনে নিস্তারিণী ক্ষিপ্রহস্তে সব গুছিয়ে ফেললেন—ঘি, সোনার টুক্‌রো, রূপোর টুক্‌রোর বদলে একটা দু'আনি, তিল, তাঁবা, কড়ি, পাঁকাঠি ইত্যাদি।

খোঁড়া রামগতি তার কালাজ্বরওয়ালা ছেলেটাকে সঙ্গে করে এসে নিজের অকর্মণ্যতায় বড় কুণ্ঠিত হয়ে বসেছিল ! সে উঠে এক হাতে এক পায়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগল ; মুখাগ্নির পলতে এক হাতে সেই পাকিয়ে দিলে।

বেলা বাড়তে লাগল। বস্ত্রাবৃত মৃতদেহের উপর রোদ পড়ল। এর্‌ফানদের আসার ভরসায় তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা আসতে বড় দেরী করতে লাগল। তারাই দাহনের কাঠ সংগ্রহ করবে, দু'ক্রোশ দূরের বিনোদপুর থেকে মৃতের স্বজাতিকে ডেকে আনবে।…

একটি ঘণ্টার প্রতি মুহূর্ত দুঃসহ উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে নিস্তারিণী বিস্মিত এবং শঙ্কিত হয়ে খোকাকে এরফানের বাড়ীতে আবার পাঠালেন।

খোকা এসে বললে,—তারা ত কেউ বাড়ী নেই, মা!

শুনে নিস্তারিণী আঁৎকে উঠলেন।—বাড়ী নেই? বলিস কি?

—তারা কোথায় গেছে বললে এরফানের বউ। রাত্তিরে আসবে।

নিস্তারিণীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। মানুষের মনের যে দিকটা আজ মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখে প্রকট হয়ে উঠল তা যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মভেদী! এহেন প্রবঞ্চনার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত হ'য়ে থাকতেই পারে না—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মন, আর এই সময়। তাদের এই আসব বলে আশা দেওয়ার দানবীয় নির্মমতার বুঝি তুলনা নাই।......

রামগতি ঘাড় হেঁট করে বসেছিল, হঠাৎ সে চোখ তুলে দেখলে নিস্তারিণী বিস্ফারিত পলকহীন রক্তবর্ণ শুষ্কচক্ষে তারই দিকে চেয়ে আছেন। নিস্তারিণীর এই ভয়ংকর চাহনি যে তাঁর ব্যথায় অসাড় মনেরই প্রতিবিম্ব, তার আর কোনো অর্থ নাই, রামগতি তা বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেললে; বললে,—মা, আমি যে বড় নিরুপায়......

রামগতির কথায় নিস্তারিণীর যেন চমক ভাঙলো। বললেন,—খোকা তুই বিনোদপুর চিনিস?

—চিনি।

—তবে তুই-ই যা।

—যাই। বলেই খোকা যেতে উদ্যত হল।

নিস্তারিণী বললেন,—তোর যেতে আসতেই যে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

রামগতি বললে,—তা ত' যাবেই, মা। আমার পা থাকলে আমি বসে থাকতাম না, মা। হা ভগবান!......

একখানি পায়ের উপর ভর দিয়ে এক হাতে কুড়োল চালান' রামগতির পক্ষে যেমন অসম্ভব, তাড়াতাড়ি চলাফেরা করাও ঠিক তেমনি।

আমার ভাগ্নেটাও এসেছিল।

—খোকার সংগে আমিও যাই?—বলে সে খোকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে।

নিস্তারিণী বললেন,—বাড়ীতে শুনে এস।

—আচ্ছা। বলে সে সুবোধ ছেলের মত বাড়ীতে শুনতে গেল কিন্তু আর ফিরল না। বোধ করি, দুপুরের কাঠফাটা রোদে অতটা পথ, অনর্থক যাতায়াতের অনুমতি সে পেলে না।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করে নিস্তারিণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ফেলে বললেন,—খোকা, তুই একাই যা।

খোকা গেল।......

কান্না, শোক ভুলে চারিটি নিরুপায় বিধবা, সৎকার বুঝি হয় না এই আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে বসে রইলেন।......মৃতদেহের আবরণ শ্বেতবস্ত্রের উপর থেকে সূর্যের

তেজ ঠিকরাতে লাগল ; যিনি মৃতদেহ স্পর্শ করে বসেছিলেন তাঁর পিঠ রৌদ্রের তাতে ঝলসে কালো হয়ে উঠতে লাগল।......

মৃতদেহের এ দুরবস্থা আর চোখে সহ্য হয় না এমনি অবস্থা হয়ে উঠল! রামগতি বসেই ছিল, সে-ও উঠে গেল ; এ অবস্থায় তার অস্তিত্বের কোনই সার্থকতা নেই।··· মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলতে লাগল, ততোধিক জ্বলতে লাগল উৎকণ্ঠায় তাঁদের অন্তর।··· যদি খোকা বিনোদপুরের কাউকে না পায় ; শুনলে তারা নিশ্চয় আসবে, কিন্তু যদি তারা বাড়ীতে না থাকে ? ··

ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখে চোখ যেমন আপনি বুঁজে আসে, তাঁদের মনের ভাবনা ঐ পর্যন্ত এসেই অন্তরের মুখে তেমনি করে থেমে নিশ্চল হয়ে গেল।—

শিবদাসী মৃত স্বামীর গায়ের উপর ডান হাতের স্পর্শ রেখে নড়ে বসে বললেন,—কাঠের কি হবে, দিদি ?

নিস্তারিণী বললেন,—আর ভাবতে পারছিনে, বৌ। ভগবান জানেন কি হবে।

তারপর আবার সব নিঃশব্দ।

খোকা যখন বিনোদপুরের তিনটী লোককে সংগে নিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল তখন তার মুখের দিকে চেয়েই নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। · সূর্যদেব যেন তাকে রোদে ভেজে এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছেন, তার দেহের সমস্ত রক্ত তার মুখের ত্বকের নীচে এসে জমেছে, ওষ্ঠাধর তার এমনি বিশুষ্ক যেন একটু পরেই তা শুক্‌নো মাটির মত ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কিন্তু জীবিতের প্রতি মায়ামমতায় আহা-উহু করবার সময় তখন কারু ছিল না।

বান্ধবত্রয়ের একজন বিশ্রাম করতে করতে বললেন,—কাঠের যোগাড় হয়েছে ত ? খোকা বলছিল হয়নি।......

নিস্তারিণীর চোখে পুনরায় জল দেখা দিল এবং দেখা দিয়েই ঝর্‌ ঝর্‌ করে ঝরতে লাগল। শব্দহীন বৃহৎ বাড়ীটা এতক্ষণ যেন দুনিয়া থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে নিঃশব্দ প্রেতভূমির মত থম্‌ থম্‌ করছিল,—শুধু একটা দাঁড়কাক মাঝে মাঝে চালের উপর উড়ে এসে বিশ্রী কর্কশকণ্ঠে অবিশ্রান্ত কা কা করছিল, অলক্ষণে জেনেও সেটাকে হাত তুলে তাড়াবার উৎসাহ পর্যন্ত কারু অবশিষ্ট ছিল না। দুস্তর বিপদের সম্মুখে তাঁদের ভয়ার্ত নিরাশ্রয় মনের শোক করবার শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; এখন উদ্ধারকর্তার প্রশ্নে তাঁদের মন আশ্রয় পেয়েই হু হু করে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে নিস্তারিণী বল্‌লেন,—না বাবা, কাঠের যোগাড় হয় নি।

—সেটাও কি আমাদেরই করতে হবে ?

এই প্রশ্নটিই বন্ধুর জিহ্বাগ্রে এসে পড়েছিল, কিন্তু তিনি সামলে নিয়ে প্রশ্নের পরিবর্তে ভ্রূভংগী কর্‌লেন। নিস্তারিণী সে ভ্রূভংগী দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছে ফেললেন।

দ্বিতীয় বন্ধুটি ভাইপোর রূঢ় ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে বললে,—কুড়োল দাও ত' খোকা, কাঠের যোগাড় করে নিচ্ছি।

তারা উদ্যোগী হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু কুড়োল চালাতে যে অভ্যস্ত কৌশলের দরকার তা তাদের ছিল না; কাজেই কুড়ি বাইশটি গাবের চারাগাছ ভূমিসাৎ করেই বোধ হয় ক্লান্তিবশতঃই তাদের মনে হল, যথেষ্ট হয়েছে।

তারপর সমস্যা উঠল, প্রচুর হোক, অপ্রচুর হোক, কাঠ শ্মশানে নেবার উপায় কি?

আগে এমন দিনে কাঠ নৌকয় যেত। এর্‌ফানরা অথবা তাদের অনুগত যারা তারাই গাছ কেটে কাঠ ক'রে নৌকয় বোঝাই দিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিত। কিন্তু এখন তারা নারাজ, ধর্মভীরু হয়েছে।

গণনীয় লোকের মধ্যে খোকাকে নিয়ে চারটি। দু'জনে শব বহন করলেও তৃতীয় একজন কাঁধ দেবার উপযুক্ত লোক হাতের কাছেই থাকা দরকার, বিশেষতঃ শ্মশান যখন হাঁটাপথে দেড় মাইল দূরে। বিনোদপুরের তিনজন গেল বহনের কাজে, বাকি রইল খোকা। তাকে দিয়ে কাঠ টানানো অসম্ভব।

নিস্তারিণী পুনরায় খোকাকে বললেন,- যা ত', বাবা, আর একবার দেখে আয় এর্‌ফানরা কেউ বাড়ী এসেছে কিনা।

খোকা গেল এবং কিছু বিলম্বে ফিরে এসে বললে,—তারা বাড়ী এসেছে; কিন্তু এ বাড়ীতে আসতে তারা পারবে না। বললে, হিঁদুর মড়ার কাঠ বইলে আমাদের জাত যাবে।

মৌলভী সাহেবের অনুজ্ঞা যেমন অভ্রান্ত তেমনি পালনীয়—তাই তারা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে চায়।

ব্যাপার যখন এমনি সঙ্গিন, সৎকার বুঝি হয় না;—উপায়হীন অন্ধকার অপার দুঃখের নিষ্পেষণে নিস্তারিণীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, এমন সময় ভগবান দয়া করলেন। রামগতি তার শ্যালককে নিয়ে মূর্তিমান জনার্দনের মতই এসে উপস্থিত হল। শ্যালক জনার্দন ভগ্নিপতির বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। সমুদয় কাঠ শ্মশানে পৌঁছে দেবার ভার সে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করলে।

শব আর কাঠ যখন শ্মশানে এল তখন রোদ পড়ে এসেছে, বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। চিতা সাজাতে সাজাতে অন্ধকার হ'য়ে এল।

চিতা জ্বালা হ'ল, কিন্তু মুস্কিল অত্যন্ত দুর্বার হ'য়ে উঠতে লাগল ঐ দেহটাকে নিয়েই।···শোথের রুগী, সর্বাঙ্গ ছিল তার জলপূর্ণ, আগুনের আঁচ লেগে জল প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে শেষে সোঁ সোঁ শব্দে গড়াতে সুরু কর্‌ল। চিতা নিবে গেল; বার বার অল্প সময়ের জন্য জ্বলে বার বার ধোঁয়া হ'য়ে নিবে গিয়ে কাঠ যখন নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেল তখন মৃতদেহ একেবারে অক্ষত, শুদ্ধমাত্র গায়ের চামড়া তার কালো হয়ে গেছে।

দাহনকারীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, তাতে শুধু সময়েরই অপব্যয় হ'তে লাগল, আসল কাজ এগলো না।

নিস্তারিণীর বাড়ীতে পা দিয়েই যে-ব্যক্তি ভ্রূভঙ্গী করেছিল, সে বললে,—এক কাজ করা যাক—

কিন্তু কাজের কথাটা বলতে গিয়েও সে বলতে পারল না ; তাকে থেমে যেতে হ'ল। তার মানে আছে। সংস্কার বড় কঠিন বস্তু। অতীত যুগযুগান্তরের মধ্যে তার জন্ম, পুরুষ পুরুষান্তরের অটুট নিষ্ঠার মধ্যে তার মূল, পাষাণস্তম্ভের মত তা অটল অবস্থায় নেমে এসেছে। এই সংস্কারের বাধা পেয়েই তার কথা আট্‌কে গেল, কিন্তু কথাটা শেষ করলে রামগতির শ্যালক জনার্দন। সে বল্‌লে,—বাবুর মনের ভাব আমি বুঝেছি। তাই করা যাক।

বাবুর মনের কথা সে বুঝেছিল কি না তা তার ঈশ্বর জানেন ; তবে সে গা-মোড়া দিয়ে আলিস্যি ভেংগে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের ইংগিতে বাবুরাও উঠলেন। বিশ্রামের জন্য পেতে বসতে যে বস্তাটা আনা হয়েছিল তারই অর্ধেকটা জনার্দন বালি তুলে বোঝাই করে ফেললে। মৃতদেহ চিতার উপর থেকে নামিয়ে তার কোমরের সংগে সেই বস্তাটা বেঁধে সবাই মিলে তাকে নদীর জলে ছেড়ে দিলে। বালির ভারে মৃতদেহ ডুবে গেল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে একবার হরিধ্বনি করে শ্মশানবন্ধুরা যে যার ঘরে গেল।...

মকরবাহিনীর শবসাধনার প্রয়োজন ছিল না ; তিনি সে মৃতদেহ ঠেলে জলের উপরে তুলে দিলেন। বস্তার মুখ বাঁধা হয়েছিল অত্যন্ত অসাবধানে, বস্তার স্থানে স্থানে ছেঁড়াও ছিল ; কাজেই শূন্যবস্তাসহ মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেরী হ'ল না।

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে বেলা অনুমান ন'টার সময় নিস্তারিণী নদীর ঘাট থেকে পাগলের মত আলুথালু হ'য়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে মৃত ভ্রাতার নাম ধরে একটা চিৎকার করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন,—এমনি তীব্র সে আর্তনাদ যে মনে হ'ল, শব্দের বেগে নিস্তারিণীর কণ্ঠ আর আকাশ একসংগেই বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে। শূলবেদনায় পেটের ভিতরটা মোচড়াতে থাকলে মানুষ যেমন লোটায় নিস্তারিণী তেমনি ক'রে উঠানে পড়ে লোটাতে লাগলেন। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা শশব্যস্তে ছুটে এলেন।

—কি হ'য়েছে ?—জিজ্ঞাসা করতেই তিনি উঠে বসে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বলতে লাগলেন,—আমি জানিনে, আমায় কেউ তোরা কিছু জিজ্ঞাসা করিসনে ; তোরা কেউ ঘাটে যাসনে।...

বহু ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরেও নিস্তারিণী পুনঃপুনঃ কেবল ঐ একই কথা বল্‌তে লাগলেন,—

—ওরে, তোরা কেউ ঘাটে যাসনে। আজ না, কাল না, কোনো দিন না।...

কিন্তু তাঁর এ নিষেধ কেউ মানলে না। দু'তিন জনে ঘাটে গিয়ে যে দৃশ্য দেখে এল তা যেমন শোচনীয়, তেমনি অকথ্য।...জিতেনের মৃতদেহ ভেসে উঠে ভাসতে ভাসতে এসে নদীর দুইতীরে এত স্থান থাকতে তাঁদেরই ঘাটে লেগেছিল। শেয়াল কুকুরে তা ডাঙগায় টেনে তুলেছে, শকুন নেমে এসেছে, কাক জুটেছে ; শকুন, শেয়াল, কুকুর, কাক ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি কাড়াকাড়ি ক'রে সেই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।—

পরমাত্মীয়ের মৃতদেহের কল্পনাতীত এই বীভৎস পরিণামে বিধবাদের চোখের জল আর থামতে চাইল না ; তার মৃত্যু সহ্য হয়েছিল, কিন্তু তার দেহের এই দুর্ভাগ্য বুকে সইল না। এ দুঃখ যে মানুষের কতবড় দুঃখ তা কল্পনা করাও বুঝি অসম্ভব, তার বুঝি সীমা নাই; বুকে কতখানি শক্তি থাকলে তবে মানুষ এই দুঃখে বিকল হয় না বলতে পার ?

আমি বললাম,—না।

বসন্ত বলিতে লাগিল, হিঁদুর সব সহ্য হয়, দেহকে সর্বপ্রকারে পীড়িত করে নিজেকে সে অশেষ দুঃখ অক্লেশে দিতে পারে,—উপবাসে, অনিদ্রায়, তপস্যায়, পুণ্যের লোভে। তার কল্পনাও সর্বদা সুশীল নিরীহ নয়, কিন্তু নিজের প্রাণহীন দেহের এ দুর্গতির কল্পনাও সে করতে নারাজ ; অত্যন্ত ব্যথার স্থানে আঙ্গুলের চাপের মত হিঁদুর মনের উপর এ কল্পনার স্পর্শও অসহ্য। আকাশস্থ আত্মা ক্লেশ পায়, তার গতি হয় না।···

বসন্ত থামিল।

আমার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতেছিল। বলিলাম,—তারপর ?

—তারপর মেয়েদের কাছে গ্রামের মাটি বিষের মত হ'য়ে উঠল। কান্নাকাটি করে তাঁরা যে যাঁর আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুর কাছে পালালেন ; একটি মাসের মধ্যে গ্রাম হিন্দুশূন্য হ'য়ে গেল।

শুনেছি, সেই দেহ যেখানে শেয়াল শকুনে খেয়েছিল, ঠিক তার সোজা ওপারে এখন ওপারের গাঁয়ের শ্মশান !

## ভরা-সুখে—

বাড়ীতে আজ মহাসমারোহ—

মা অন্নপথ্য করিবেন।

রত্নগর্ভা বলিতে যা বুঝায় হরিমোহিনী ঠিক তাই। যে ভাগ্যদেবতা নারীর গর্ভে সুসন্তান দিয়া তাহাকে সার্থক করিয়া তোলেন তিনি হরিমোহিনীর প্রতি সুরু হইতেই সুপ্রসন্ন। হরিমোহিনীর সাতটি সন্তান, তার মধ্যে একটি মেয়ে।

এ-কথা বলিতেছি না যে মেয়ে রত্ন নয়, মেয়েও রত্ন—তবে তাঁকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই তাকে রত্ন জ্ঞান করিয়া মা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন না।—ছ'টি ভাইয়ের চোখে বোনটি রত্নই ; বোন কাছে আসিলে ভাগ্নের সংখ্যা দেখিয়া আর ভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া ভাইদের শঙ্কিত হইয়া উঠিবার কারণ নাই।—

হরিমোহিনীর পাঁচটি ছেলের মাসিক আয় ছ'হাজারের উপর ; কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার—এবং সবাই বড় পর্যায়ের। ছোটটি শিক্ষায়তনের চূড়া ডিঙ্গাইয়াও বাড়ীতে থাকে ; সে বক্তা ভাল ; কথার' খোঁচায় চাষার ট্যাঁক ছিঁড়িয়া খাজনা ইসরাল তাহারই কাজ।

পাঁচটি ছেলে বিদেশে থাকে।

মায়ের হাতে টাকা নাই তবু ছেলেরা মাতৃভক্ত। অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো ব্যাপার হরিমোহিনীর অমতে বা অনিচ্ছায় আজ পর্যন্ত একটিও সাধিত হয় নাই। বৌরাও তেমনি—মা বলিতে অজ্ঞান। ছ'টি ছেলের ছয় ছক্ ছাত্রিশটি অর্থাৎ বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপরে মা। অপরা করুণা, অনন্ত শ্রী, অসীম ধৈর্য, অতুল আনন্দ; অজস্র কল্যাণ

লইয়া মা মাথার উপরে বিরাজ করিতেছেন—অনুগত ভৃত্যের মত সংসার তাঁর আজ্ঞাবহ !......

ছেলেরা বলিয়া দিয়াছে,—তোমার আর কোনো কাজ নেই, মা ; তুমি কেবল আদেশ ক'রবে।

মায়ের আদেশ একটিও লঙ্ঘিত হয় নাই।

এই হরিমোহিনী অসুখে পড়িয়াছিলেন, বাঁচিবেন এ আশাই ছিল না ; অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন ; আজ তিনি অন্নপথ্য করিবেন।...

সূত্রপাত অতি সামান্য—সামান্য একটু সর্দি, সামান্য একটু খুস্ খুস্ কাশি, সামান্য অরুচি ; হরিমোহিনী গ্রাহ্যও করিলেন না ; আহার কমিলেও আহ্নিকের খাতিরে স্নান নিয়মিতভাবেই চলিতে লাগিল।......ছোট বৌ নিরুপমা একবার ঢোক গিলিয়া একটু নিষেধের সুরে বলিল,—নাওয়াটা দু'দিন বাদ দিলে হয় না, মা ? যদি অসুখ বেশী হ'য়ে পড়ে !

হরিমোহিনী হাসিয়া বলিলেন,—বেশী হ'য়ে পড়লে তোমরা আছ, দেখ্‌বে।

শুনিয়া নিরুপমা অবাক হইয়া গেল। যার দেখিবার লোক আছে তাহার অসুখ বাড়িতে দিতে হইবে !—

পুত্রবধূর নিষেধ অমান্য করা চলে, সে প্রতিশোধ লয় না, কিন্তু প্রকৃতির হাত অনিবার্য—সে প্রতিশোধ নিল।......

একদিন হরিমোহিনী পূজার ঘর হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখেই নিরুপমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমার বুঝি জ্বর এল, বৌমা। আমায় ধর।

নিরুপমা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া শুয়াইয়া দিল।......

কবিরাজ আসিলেন।

বলিলেন,—যা হোক, ভয়ের কারণ নেই ; তবু সবাইকে খবরটা দিয়ে রাখুন ; প্রাচীন মানুষ কি না।......

খবর পাইয়াই ছেলেরা ছুটিয়া আসিল।

আরো তিন দিন গেল—অসুখ বাড়িল না, কমিলও না। কিন্তু কবিরাজ হঠাৎ অনুমতি দিলেন—যা খেতে চান তা-ই দিতে পারেন।

শুনিয়া ছেলেদের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কবিরাজ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—না, না, সে ভয় ক'রবেন না। অরুচিটা আছে কি না, আহারে রুচি না এলে ত' দুর্ব্বল হ'য়েই মারা যাবেন ; রুচিটা আনতেই হবে।—

কিন্তু কোনো খাদ্যই হরিমোহিনীর মুখে রোচে না—আহারে তাঁর বড় অনিচ্ছা।

ফলমূলের ঝুড়িতে বাড়ী বোঝাই হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—রস খাইয়ে তোরা বাঁচাতে চাস ! পাগল তোরা ! আমার ডাক এসেছে, যেতে দে। বলিয়া তিনি প্রাণপণে মুখ বন্ধ করিয়া রহিলেন।—

—এই রসটুকু খাও মা, একটুখানি এইটুকু দুধ, খেয়ে ফেলো, মা।......ছেলে আর বৌদের এমনি সহস্র কাকুতি নিষ্ফল হইয়া গেল—হরিমোহিনী কোনো খাদ্য মুখে লইলেন না।

শুধু জল আর জল !—

মুহুর্মুহুঃ মুখে জল দিতে হইতেছে ; প্রতিবারই হরিমোহিনী প্রশ্ন করিতেছেন,—গঙ্গাজল ত' ?

পনর দিনের দিন কবিরাজ হরিমোহিনীর নাড়ীর উপর আঙ্গুল রাখিয়া মিনিট তিনেক পরে মুখ অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন।—নাড়ী কখনও পাওয়া যাইতেছে, কখনও পাওয়া যাইতেছে না।······

আড়ালে যাইয়া কবিরাজ বলিলেন,—আজ রাতটা সাবধানে থাকবেন।

—সে কি বলিয়া ছেলেরা চমকিয়া শুকাইয়া উঠিল।

—নাড়ী বড় এলোমেলো। আমার সঙ্গে লোক দিন। বলিয়া কবিরাজ বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু সে-রাত্রি হরিমোহিনীর কাটিল—

পরদিন প্রাতঃকালে কবিরাজ তাঁর নাড়ী দেখিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিতে পাইলেন, এতগুলি মানুষ তাঁহারই মুখের দিকে নিষ্পলকচক্ষে চাহিয়া মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে ; কবিরাজ বুঝিতে পারিলেন, উৎকণ্ঠায় এই সব স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবার প্রাণ এমনই কণ্ঠাগত যেন তাঁহারই উচ্চারিত বাক্য দণ্ডাজ্ঞার মত এই মুহূর্তেই তাদের মারিবে কি বাঁচিতে দিবে।

কবিরাজ চোখের ইসারায় বড় ছেলে গঙ্গাধরকে ডাকিয়া বলিলেন,—নাড়ীর অবস্থা ভাল, আশা হ'য়েছে।

কথাটা মর্মে গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধর উঠিয়া দাঁড়াইতেই তার মুখের আভায় যেন দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং যে পুলকের একটা অতি স্নিগ্ধ ধারা সেই অবরুদ্ধশ্বাস চরম উদ্বিগ্ন প্রাণিগুলির প্রাণের উপর বর্ষিত হইয়া গেল তাহার পরিমাণ নাই, তুলনা নাই।

হরিমোহিনী সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং পথ্যে রুচি ফিরিল।

আজ তাই বাড়ীতে এত সমারোহ—অসুখের পর মা প্রথম অন্নপথ্য করিবেন।

কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন,—একতোলা অত্যন্ত পুরণো চাল আধঘণ্টা সিদ্ধ করে সেই ভাত একতোলা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে দিতে হবে।—

এই হইবে মায়ের অন্নপথ্য, কিন্তু আয়োজন হইয়াছে একটা যজ্ঞের। বধূরা সবাই আজ স্বতন্ত্রভাবে রাঁধিয়াছে······

নিরামিষ ব্যঞ্জন—তিত', ঝাল, মিষ্টি—যাহার যাহা জানা ছিল সব প্রস্তুত হইয়াছে ! মেয়ে নিপুণাও রাঁধিয়াছে।

মা এত খাইবেন না—রাঁধিয়া শুধু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে দিবার আনন্দের লোভে একটি বেলার জন্য পরস্পর পৃথক্ হইয়া গেছে। জানা ছিল, প্রসবগৃহ হইতে বাহির হইবার পর যাহারা গঙ্গাস্নান না করিয়াছে হরিমোহিনী তাহাদের রান্না খান না। মেজ আর ন' বৌ এদিক দিয়া অশুচি ছিল ; তাহারা তাড়াতাড়ি নৈহাটি যাইয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিয়াছে।—

পথ্য প্রস্তুত করিল বড়বৌ নিজে।

হঠাৎ একটা-গোলমেলে প্রশ্ন উঠিল, মায়ের মুখে পথ্য দেবে কে ?……

অনেক মান, অভিমান, কান্নাকাটি, রেষারেষি, ইচ্ছা, আবদার, নালিশ, সালিশের পর বড়বৌ নিপুণার দিকেই গড়াইলেন। নিপুণা বারমাস মায়ের কাছছাড়া হইয়া থাকে, কাজেই তাহাকেই এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করা হোক।—রায় শুনিয়া অনেকের চোখেই জল আসিল।

ছোটদের মধ্যে কে একজন ইস্কুলের অভ্যাসবশতঃ বলিয়া উঠিল,—লটারি হোক।

কিন্তু এমন সুসংগত প্রস্তাবটা কোলাহলের মধ্যে নিজের ঠাঁই পাইল না।

পথ্য প্রস্তুত হইয়াছে।—

ছেলেরা, বউরা, নাতি, নাতনী, নাতবৌ সবাই স্নান করিয়া আসিয়াছে ; হরিমোহিনীর ঘরের ভিতর পুরুষদের এবং আড়ালে বারান্দায় মেয়েদের আহারের ঠাঁই হইয়াছে ; বৌরা পাথরের থালায় ভাত এবং অসংখ্য পাত্রে অসংখ্য নিরামিষ ব্যঞ্জন তুলিয়া থালার চতুর্দিকে সাজাইয়া দিয়াছে।—সেইদিকে চাহিয়া আর বধূদের দিকে চাহিয়া হরিমোহিনী ছলছলচক্ষে হাসিতে লাগিলেন—এত সুখ যে মানুষের ভাগ্যে কেমন করিয়া ঘটিতে পারে তাহাই যেন তাঁর ধারণায় আসিল না।—

মা পথ্যগ্রহণের পর সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রের স্পর্শ দিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন মায়ের প্রসাদ করিয়া লওয়া হইবে ; পুরুষেরা মায়ের চোখের সম্মুখে বসিয়া আগে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরে যথারীতি ভোজন করিবে।—

নিপুণা কাপড় ছাড়িতে গেল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হরিমোহিনীর বিছানার চতুর্দিকে সারি সারি বসিয়া গেল, বৌয়ের দল প্রাচীনত্বের ক্রমহিসাবে সাজাইয়া বসিল—যার যার কোলে ছেলে ছিল না, তারা যার তার একটাকে টানিয়া লইল।……

বালিশের ঠেস রাখিয়া হরিমোহিনীকে অতি সন্তর্পণে একটু তুলিয়া বসাইয়া ছেলেরা তাঁর অদূরে বসিল। হরিমোহিনী সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

নিপুণা গরদ পরিয়া আসিল।

পথ্যের পাত্রটা হরিমোহিনীর মুখের কাছে লইয়া নিপুণা ডাকিল,—মা।

গংগাধর ঝুঁকিয়া ডাকিল,—মা, পথ্য কর।

মা কথা কহিলেন না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া গংগাধর উচ্চতরকণ্ঠে ডাকিল,—মা ?

মা তথাপি নীরব।—

গংগাধর চমকিয়া উঠিল।—হেঁট হইয়া সে হরিমোহিনীর বাঁ হাতখানা তুলিয়া লইল ; ঘর একেবারে নিঃশব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও নাই।……হরিমোহিনীর নাড়ীর

উপর গঙ্গাধরের আঙ্গুল কাঁপিতে লাগিল, এবং তখনই সে—"মা ত' নেই"—বলিয়া আর্তনাদ করিয়া মায়ের কোলের উপরেই লুটাইয়া পড়িল—

পরক্ষণেই মা মা আহ্বানে আর আর্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল।—

মা প্রসন্ন হাসিমুখে নীরব রহিলেন।......

## এইবার লোকে ঠিক বলে—

চিরদিনই এমন ছিল না—

মা, স্ত্রী ও তিনটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া পল্লীপ্রান্তে শিবপ্রিয় সুখেই ছিল।

মা পোয়াতির কাঁথা শেলাই করিয়া দেয়; আজুরা বার আনা, একটাকা, আঠার আনা; ঘর লেপিয়া, ঘুঁটে দিয়া দেয়, দুইবেলা খাইতে পায়। স্ত্রী নিত্য গৃহস্থের ধান ভানিয়া দেয়—বিশ সেরে দু'সের তার পারিশ্রমিক।......তিনজনে প্রাণপণে গরু তিনটির সেবা করে; তারাই লক্ষ্মী। দুধ লইয়া শিবপ্রিয় বাজারে বেচিয়া আসে; খড়, ভুষি, ঘাস, বাগান-কুড়ান জ্বালানি কাঠ অদূরের টাউনে লইয়া বেচে! .....

এমনি করিয়া তিল কুড়াইয়া তারা তাল করে।

দিন চলে।

পথের দিকে চাহিয়া কি দেখিয়া শিব মুখ টিপিয়া হাসে।......নিত্য তার নিটোল দেহ দুলাইয়া কলসীকাঁখে জল আনে: জলের কলসী দাওয়ায় নামাইয়া হাঁফ ছাড়ে; কাঁখালের সিক্ত স্থানটায় কাপড়ের ভিতর দিয়া ত্বকের কাঞ্চন আভা ফুটিয়া ওঠে—

সেইদিকে একবার অলক্ষ্যে চাহিয়া লইয়া শিব বলে,—আছি বেশ।

নিত্য বলে,—নিতাই ত শুনি: এখন, অদৃষ্টে টিকলে বাঁচি।

টিক টিক করিয়া টিকটিকি ডাকে।

—বরাত। বলিয়া শিব বলে,—দোনাটা কই? আজ দুধ আর বাজারে নেব না, নিত্য। খাব।

—মা কই?

—কোন বাড়ী কাঁথা দিতে গেল।

নিত্য দোনাটি আগাইয়া দেয়, কিন্তু শিবপ্রিয়র গরু দোহাইবার গরজ দেখা যায় না।—

নিত্য চৌকাঠে জলের ছিটা দিয়া ঘরে ঘরে, তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া ফেরে; তার অতুলন গঠনসুষমার দিকে চাহিয়া শিবপ্রিয়র কেমন নেশা ধরিয়া যায়; মুহুর্মুহুঃ দুজনার চোখোচোখি হয়, মুহুর্মুহুঃ হাসি ফুটিয়া মুখময় ছড়াইয়া পড়ে।

নিত্য তাগিদ দেয়,—নেও, ওঠো, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল, গরু দুইতে হবে না নাকি আজ?

—সে হবে' খন। বলিয়া শিব নির্জীবের মত বসিয়া থাকে। বলে,—আছি বেশ।

নিত্য হাতের প্রদীপটি তুলিয়া ধরিয়া উঠানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়ে; হাসিয়া বলে,—কে নেই শুনি?

—অটল নাপিত নেই, জগাই ঘোষ নেই, সুদাম পাল নেই। আর বলব? তাদের বৌ—

প্রদীপটি হঠাৎ টানিয়া লইয়া নিত্য চলিয়া যায়; মনে মনেই ঠোঁট ফুলাইয়া বলে,—বৌ সুন্দর, সেই গরবেই দিনরাত আটখানা।—

দিন চলে।

হঠাৎ একদিন "বম্ মহাদেও" বলিয়া "বিরাশী দশ-আনা" ওজনের এক হাঁক ছাড়িয়া সশিষ্য এক সন্ন্যাসী সেনেদের পুকুরপাড়ে আসিয়া লিচুগাছের নীচে আড্ডা জমাইয়া বসিলেন।

এক নিমেষেই যারা সাধুর পদপ্রান্তে ভিড়িয়া গেল শিবপ্রিয় তাহাদের অন্যতম। সন্ন্যাসীর খড়মের বোল হইতে সুরু করিয়া চূড়া করিয়া বাঁধা ঐ জটাদাম পর্যন্ত সবই অপার্থিব এবং উহাদেরই কোথাও ঐহিক সিদ্ধি এবং পারত্রিক মোক্ষ বিতরণ করিবার জন্যই একত্র করিয়া রাখা আছে এই বিশ্বাস যে কেমন করিয়া গ্রামস্থ পুণ্য ও ত্রাণলুব্ধ ব্যক্তিগুলির জ্ঞানজগতে বদ্ধমূল হইয়া গেল সকলের চেয়ে আশ্চর্য সেইটাই।

একটা অত্যন্ত কৃশ চুলওঠা লোক কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া সন্তর্পণে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল;—চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকেই "মনোনীত" করিয়া আঙ্গুলের ইসারায় কাছে ডাকিয়া লইলেন।...সে প্লীহার ঔষধের সন্ধানে আসিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে নিকটস্থ হইতেই সন্ন্যাসী তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন—

প্লীহার রোগী অতিশয় আশান্বিত হইয়া অতিশয় ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার গায়ের কাপড় সরিয়া পেট বাহির হইয়া পড়িল; তাহার প্লীহার স্থানটিতে চিতার কষ দিয়া বীভৎস একখানা ক্ষত করা হইয়াছে; সেইদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তোমাদের গাঁয়ের অতিথি, আমাদের খাওয়াও।

শুনিয়া জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

—ও বড় গরীব, বাবা; কি সেবা হবে হুকুম করুন, আমরাই—

বলিয়া সকলে সসম্ভ্রমে হাত জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

সাধু তখন তাঁর খাদ্যোপকরণের এমন দীর্ঘ এবং মহার্ঘ এক ফর্দ দিলেন যে, তিনি জীবন্ত স্বর্ণমৃগের মাংস চাহিয়া বসিলেও দরিদ্র গ্রামবাসীরা ইহার বেশী বিব্রত হইয়া পড়িত না।......ফর্দের এ-পিঠে দাঁড়াইয়া জনতা দেখিল, সন্ন্যাসী তাঁহার জটাজালসহ যেন আরও দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছেন।—

লোকগুলির নিঃশব্দ শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি এমনিই রোজ খাই। টাকা? আচ্ছা, টাকা আমিই দিচ্ছি। একজোড়া নতুন সরা আর কিছু ঘুঁটে আমায় এনে দেও তোমরা।

নূতন সরা এবং ঘুঁটে আসিল।

সন্ন্যাসী কোথা হইতে দুইটি শিশি বাহির করিয়া একটির ছিপি খুলিয়া সরার মধ্যে ঢালিলেন খানিকটা কাঁচা পারা; তারপর বলিলেন,—এটা সুলেমানী নিমক। বলিয়া দ্বিতীয় শিশি হইতে খানিকটা "সুলেমানী নিমক" সেই পারার মধ্যে ঢালিয়া দিতেই পারা জমিয়া কঠিন হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, জ্বাল' ঘুঁটে।

জ্বালা হইল—

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় সরাটি দিয়া প্রথম সরাটি আবৃত করিয়া আগুনের উপর তুলিয়া দিলেন।—

জনতা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখিতে লাগিল।......

মিনিট পনর পরে সরা সরাইয়া আনিয়া আবরণ তুলিয়া ফেলিতেই দেখা গেল, পারা এবং "সুলেমানী নিমক্" আগুনের উত্তাপে মিশিয়া খানিকটা সিঁদুর রঙের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—

সন্ন্যাসী বলিলেন,—এ স্বর্ণচূর্ণ। স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাও, গলে জমে গেলেই খাঁটি সোনা হবে।

সত্যই সোনা।

তেরটাকা সাড়ে পাঁচ আনায় সেই সোনা বিক্রয় হইল। ......সন্ন্যাসী সশিষ্য প্রচুর ভোজন করিলেন, এবং তাঁহার "সেবার" পর সমাগত আশুভক্তগণ যাহা প্রসাদ পাইল তাহাও প্রচুর।......

শিবপ্রিয়র চোখে সে-রাত্রে ঘুম আসিল না।

আসিবার কথাও নয়!

অতন্দ্র চোখে আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে শিবপ্রিয় ভাবিতে লাগিল,—কিসের বিনিময়ে সন্ন্যাসী এই সোনা প্রস্তুত করিবার প্রণালীটা শিখাইয়া দেয়!—একখানা হাত, একখানা পা, একটি চক্ষু,—সন্ন্যাসীর কথায় শিবপ্রিয় কাটিয়া উপড়াইয়া দিতে পারে, যদি উহাদের একটিকেই সেই বিদ্যাদানের দক্ষিণা বলিয়া সে চাহে।......একটা নিদারুণ তীব্র আশা বার বার তাহার মনে সত্য হইয়া উঠিয়া তাহাকে যেন শরবিদ্ধ করিয়া শয্যার উপর তুলিয়া তুলিয়া বসাইতে লাগিল......মন্ত্র হোক, দ্রব্যগুণ হোক, বাকসিদ্ধি হোক,—প্রভুর অশেষ কৃপায় যেন তাহা তাহার করায়ত্ত হইয়াছে.........অট্টালিকা, বৈভব কত!......নিত্য সুবর্ণমণ্ডিত সালঙ্কারা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিমার মত হাসিতেছে।

—নিত্য?

ঘুম ভাঙিয়া নিত্য বলিল,—কি?

—কিছু না। ভোর হতে আর কত দেরী?

—জানিনে, দেখ। বলিয়া নিত্য আবার ঘুমাইয়া পড়িল।—

শিবপ্রিয় বুক বাঁধিল—

যেমন করিয়াই হউক, প্রভুর নিকট হইতে এ-বিদ্যা আহরণ করিতেই হইবে। .....

তখনও ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই—

শিবপ্রিয় যাইয়া দু'হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন,—কি বাবা?

শিবপ্রিয় সন্ন্যাসীর পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—বাবা, আমি বড় অনাথ, তোমার কৃপার ভিখারী।

প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—কৃপার ভিখারী কে কার নয়, বাবা? বেদান্তের সার-মর্মই ত' এই যে, আত্মাই জগতের উপাদান, আত্মাই ঈশ্বর; অতএব তুমিও ঈশ্বর, আমার প্রণম্য। আমিও তোমার কৃপার ভিখারী।

সন্ন্যাসীর এই উচ্চাঙ্গের বৈদান্তিক বিনয়ে শিবপ্রিয় শশব্যস্তে দাঁতে জিব কাটিয়া যেমন কুণ্ঠিত তেমনি বিগলিত হইয়া গেল।

শিবপ্রিয়র সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী পুনশ্চ বলিলেন,—কিন্তু কথাটা কি?

মুহূর্তেক কণ্ঠহারা থাকিয়া শিবপ্রিয় হু হু করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইয়া গেল, —তুমি কি করে কাল সোনা করলে, সেইটে আমায় শিখিয়ে দাও, বাবা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—সেটা বিতৃষ্ণা, বিদ্রূপ, কি তৃপ্তির হাসি তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বলিলেন,—দেব। কিন্তু একটা কথা বাবা—

—আজ্ঞে করুন। বলিয়া শিবপ্রিয় হাঁটু তুলিয়া হাত জুড়িয়া বসিল।

শিবপ্রিয় ভাবিয়াছিল, সন্ন্যাসী বুঝি কি না কি চাহিয়া বসিবেন; কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সহজসাধ্য। বলিলেন,—আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ছ'মাস থাকতে হবে।—

এত সুলভ!—

শিবপ্রিয় আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনর্বার সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল, —বাবা, তোমার অপার দয়া।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—ছ'মাস যেদিন পূর্ণ হবে সেইদিন……

……ছ'মাসের প্রথম মুহূর্তেই শিবপ্রিয়র অন্তরের দিক দিয়া পরিপূর্ণতার আর কিছু বাকি রহিল না।… ..

রাত্রি তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; পৃথিবী নিঃশব্দ।……লতাগাছ বাড়িয়া একপায়া পথের উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে; হন হন করিয়া চলিতে চলিতে তাহাতে পা বাধিয়া শিবপ্রিয় দাঁড়াইল—

কানে গেল, মাথার উপর বাঁশের ঝাড়ে বাদুড়ের ঝটাপটি, দূরে একটা পাখীর কর্কশ-কণ্ঠের আর্তনাদ—কোয়াক কোয়াক কোয়াক।………

আবার সব নীরব।—

পৃথিবীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উল্লাস তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষিপ্ততা সুপ্তিসমুদ্রে ডুবিয়া গেছে, কেবল শিবপ্রিয়র বুকে জ্বলিতেছে বিনিদ্র লালসা।—

শিবপ্রিয় গৃহত্যাগ করিয়াছে……

পরিত্যক্ত গৃহে জননী নিদ্রিতা, নিত্য নিদ্রিতা—

সম্মুখে সুবর্ণের লোভ নিত্যকালের সমস্ত মোহ ছাপাইয়া দুটি ব্যগ্রবাহুর ইঙ্গিতে তাহাকে নিরুদ্দেশের দিকে প্রাণপণে ডাকিতেছে; তাহারই উগ্র উত্তাপে মায়া বুঝি বাষ্প হইয়া গেছে……

তবু শিবপ্রিয় একবার চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই চলিতে সুরু করিল।……

আজ পূর্ণিমা; ছ'মাস পরে আর এক পূর্ণিমায় তার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—

শিবপ্রিয় “আশ্রমে” যাইয়া উপনীত হইতেই যাত্রা করিলেন।

পথের আর শেষ নাই।·····

শিবপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে,—আমরা কোথায় চলেছি, বাবা?

বাবা গম্ভীরকণ্ঠে গন্তব্যস্থলের নামাবলী উচ্চারণ করিয়া যান,—গোকর্ণ, রামেশ্বর, মধ্যার্জুন, বদরিকা, কেদার, পুণ্ডরীকপুর, কালহস্তীর—

শিবপ্রিয় চুপ করিয়া ভাবে, না জানি ইহারা কোথায়!

চিরদিন পল্লীর সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া শিবপ্রিয়র অন্তর ছিল শিশুর মত কুতূহলী; কিন্তু বাহিরের সমগ্র অখণ্ডতা উপলব্ধি করিয়া মনের ভাণ্ডারে চির-আনন্দের রসবিলাস সঞ্চয় করিয়া লইবার শক্তিও তার ছিল না।·········ক্ষণেক বিস্মিত হইয়া, ক্ষণেক ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণেক অধীর হইয়া সে নীরবে সন্ন্যাসীর সংগী হইয়া চলিয়াছে।—

সে কি সেবা!

শিবপ্রিয় সাধুর পা ধুইয়া দেয়, ভাং বাঁটে, পা টিপিয়া দেয়, শয্যারচনা করে; সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া অকারণ এবং অবিরাম যে অশ্লীল শব্দগুলি নিঃসৃত হয় তাহা সে ভ্রূক্ষেপও করে না; কুকুর-কুন্ডলী হইয়া সে গাছের তলায় পড়িয়া থাকে—

আর দিন গোণে।

রাবণের চিতা নাকি অনির্বাণ, কান ঢাকিলেই তার আগুনের সোঁ সোঁ শব্দ কানের ভিতর বাজিতে থাকে—তেমনি করিয়া অনুক্ষণ জ্বলে সুবর্ণের পিপাসা শিবপ্রিয়র বুকে।······

ছ'মাস গেছে—

ছ'মাস পূর্ণ হইয়া আজ সেই নিরূপিত পূর্ণিমা।

বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে সন্ন্যাসীর “ক্যাম্প” পড়িয়াছে। সম্মুখে কিছুদূরেই শীর্ণা নদী—ওপারে দিগন্তরাল হইতে চাঁদ উঠিতেছে।

দৌর্বল্যের ভারে স্তিমিত নেত্রদু'টি একটু বড় করিয়া শিবপ্রিয় নিবেদন করিল,—বাবা, আজ ছ'মাস পূর্ণ হ'ল। সেবায় তোমায় তুষ্ট করিতে পেরেছি কি না জানিনে।

হাত তুলিয়া সাধু বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, আমার খেয়াল আছে। আমি তোমার সেবায় খুব খুসী হয়েছি। আজ তোমার বরলাভ হবে।

একজন শিষ্য বলিল,—আলবৎ হোবে।

শিবপ্রিয়র তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, সাধু মিথ্যাভাষী নহেন; তবু কথাটা নূতন করিয়া সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়া তার সর্বাংগে কাঁটা দিয়া উঠিল।—

হুকুম, হইল,—সরবৎ বানাও।

সরবৎ বানান' হইল।

—নদী থেকে জল নিয়ে এস।

শিবপ্রিয় লোটা লইয়া জল আনিতে গেল।

অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল।

সন্ন্যাসী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া লোটাভর্তি সরবৎ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইয়া শিবপ্রিয়র হাতে দিলেন,—পিও।

শিবপ্রিয় ঢক্ ঢক্ করিয়া একচুমুকে একলোটা সরবৎ গলাধঃকরণ করিয়া তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল—

পুনরাদেশ কি হইবে কে জানে! কিন্তু আদেশ কিছু আসিল না—

সন্ন্যাসী নিমীলিত-চক্ষে দুলিয়া দুলিয়া হরগৌর্যষ্টক গাহিতে লাগিলেন,—

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালা পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
চলৎ * * *

অষ্টকগীতির সুর সুস্পষ্ট হইয়া সুরু হইয়া ক্রমশঃ একটানা গুঞ্জনের মত শিবপ্রিয়র কানে আসিতে আসিতে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া একসময় বাতাসে মিলাইয়া গেল······

শিবপ্রিয়র যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন ঊষাকাল, সূর্যোদয়ের বিলম্ব আছে।—কি উদ্দেশ্যে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, কি কারণে সে এখানে, এই প্রান্তরে শুইয়া,—চোখ মেলিয়াই হঠাৎ তাহার কিছুই মনে পড়িল না; কিন্তু মনে যখন পড়িল তখনই এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল সংসারে যাহার উপমা নাই;—অন্তরের অতলতম স্থান হইতে সহসা একটা ভূকম্পনের তীব্র তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তার প্রাণের গভীরতম মূল পর্যন্ত প্রচণ্ড আলোড়নে টলাইয়া সম্মুখের দিকচিহ্ন যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়া দিল। · সে বিস্ময়ের সীমা নাই, সে যন্ত্রণারও সীমা নাই।···উঠিয়া বসিয়া শিবপ্রিয় ক্লান্তচক্ষে চাহিয়া রহিল; দেখিল, সশিষ্য ও সসম্পত্তি সেই সন্ন্যাসী কোথাও নাই; অর্ধদগ্ধ একটা গাছের গুঁড়ি আর ভস্মের স্তূপ পড়িয়া আছে······অসময়ের সম্বল বলিয়া যে কাঁচা টাকা দশটা সে ট্যাঁকে করিয়া আনিয়াছিল তাহাও অস্তমিত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

শিবপ্রিয় গা তুলিয়া ধীরে ধীরে ফিরিবার পথ ধরিল।—

দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না, উপবাসে, অনিদ্রায় অর্ধমৃত শিবপ্রিয় এমনি চেহারা লইয়া ছ'মাস পরে যখন একদিন গৃহে পৌঁছিল তখন সূর্য ডুবু ডুবু।······

মা বলিয়া ডাকিতেই বন্ধদুয়ার ঘরের ভিতর শুধু একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা বাতাসে ভারি পাখার ঝাপটা মারিয়া স্থান পরিবর্তন করিল, আর কোন সাড়া আসিল না।

—নেত্য?

নিত্য সেখানে ছিল না।

—মা?

ষোল সতর বছরের একটা ছেঁাড়া হারান' বাছুর খুঁজিতে সেইদিকে আসিয়াছিল ; সে জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—মা তোমার উই রায়েদের বাড়ী।

—সেখানে কি করে ?

—জানিনে। বলিয়া ছেঁাড়া আবার জঙ্গলে ঢুকিল।

মা ?

নিঃশব্দে মা আসিয়া রায়েদের পিছনবাড়ীর চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।—শিবপ্রিয় বড় আশ্চর্য অবাক হইয়া গেল—মা কথা কয় না কেন !—

—মা কথা কইছ না যে ? বলিয়া শিবপ্রিয় নিত্যর সন্ধানে এদিক ওদিক চাহিতেই সেই চাহনির অর্থ বুঝিয়া সহিষ্ণুতা ভাঙ্গিয়া মা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল।

ভীত হইয়া শিবপ্রিয় বলিল,—কি হয়েছে বল না, মা ?

—কোথায় ছিলি এতদিন ? আমরা যে একেবারে ধনে-প্রাণে গেছি রে। বৌমা নেই।......

বলিয়া দক্ষ মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নাই—এত বড় অতর্কিত আঘাতে শিবপ্রিয় যেন এক নিমেষেই আসড় পাষাণ হইয়া গেল—

খুঁটিতে পিঠ দিয়া সে ঠায় বসিয়া রহিল ; না আসিল চোখে তার একফোঁটা জল, না ফুটিল মুখে একটি কথা।

—কি হয়েছিল আগে সব বল তারপর আমি জল মুখে দেব।—বলিয়া শিবপ্রিয় দীর্ঘ রুক্ষ কেশ দুহাতে মুঠায় বাঁধিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

দক্ষ বলিল,—অন্নকষ্ট পাইনি, বাবা, কোনদিন। বলিয়া নতচক্ষে খানিক থামিয়া সে বলিতে লাগিল,—তুই যাবার সাতদিন পরে মাধব পাল একদিন হঠাৎ 'পিসি' বলে ডাক দিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল ; বলল, শিবপ্রিয় ত' নিরুদ্দেশ, তোমাদের চলবে কি করে, পিসি ? বললাম, ভগবান চালিয়ে নেবেন।......মাধব হেসে বললে,—ভগবান নিজে হাতে চালিয়ে নিচ্ছেন এমন ত' কখন দেখিনি।—তোমাদের কিছুর অভাব যদি কোনোদিন হয় তবে আমাকে জানিও, বুঝলে, পিসি ? আমাকে তোমাদের আপনার বলেই জেন।—বলে সে চলে গেল।......মাত্র তিনদিন সে এসেছিল ; একদিন খালি বৌমাকে হেসে ডেকেছিল, বৌদি। যেচে এসে দরদ জানিয়ে যাবার কি দরকার তার পড়েছিল তা সেই জানে আর তার ধর্ম জানেন। বৌমা তাকে মুখ দেখায়নি কোনোদিন একথা আমি মা হ'য়ে তোকে বলছি, বাবা। কিন্তু গাঁয়ে রটে গেল বড় খারাপ কথা—

—কি কথা ?

—সে কথা মুখে আনতে ভয় করে ; মনে হয়, সতীর শাপে মুখ খসে পড়বে। রটল—মাধব পাল বৌমাকে গয়না দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে......কেউ দেখেছে হাসতে, কেউ দেখেছে পান দিতে, কেউ দেখেছে আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে—

—তারপর ?

—শুনে তার চোখের জল দিনরাত আর থামে না ; ঘুরে ফিরে সে কেবলি তোর কথাই বলে, মা, সে এসে শুনে কি ভাববে, আমি এ মুখ তাকে দেখাব কেমন করে, এ মিথ্যে যে একেবারে মিথ্যে তা' আমি একা তাকে কেমন করে বোঝাব ?..... বলতে বলতে সে চোখের জলে নেয়ে ওঠে।

একটু থামিয়া দক্ষ বলিতে লাগিল,—দিনরাত তার চোখদুটো ফুলো ফুলো আর টকটকে লাল—দেখে আমার ভয় করত। না ঘুমিয়ে আর উপোসে আর ভাবনায় শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে উঠতে উঠতে—

কে জানত তার মনের কথা, জানলে কি তাকে আমি একদণ্ডও চোখের আড়াল করি ?……

একদিন সে—বলিয়াই দক্ষ আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।……একটু থামিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল,—পাড়া থেকে এসে দেখি, বৌমার ঘরের দোর ভেজান, ভেতরে যেন একটা হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে, ঠেলা দিয়ে দরজা খুলেই দেখি, সামনে ঝুলছে ; প্রাণটা তখনও সব বেরোয়নি ; দড়ি কেটে নামিয়ে নিলাম, কিন্তু—

বলিয়া দক্ষ মাথা কপাল কুটিতে লাগিল……মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে সে গেছে ; মিথ্যে, শিব, একেবারে মিথ্যে।—

শিবপ্রিয় সহসা ছিটকাইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—মা, এস।

কোথায় ?

—টাউনে।

—সামনে যে রাত্তির।

—তা হোক। এ মাটি আর সইছে না, মা।

সেই হইতে শিবপ্রিয় ভিখারী—

মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে ; চুলের লালচে রংটা রৌদ্রালোকে ঝিকঝিক করে ; মহিষের অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিংটায় ফুৎকার দিয়া সে বাজায় ; কাঠের সর্পিল লাঠিটা বগলে থাকে ; গাল ফুলাইয়া তাহার উপর আংগুলের দ্রুত আঘাত দিয়া বাজায় বু—উ—উ ; মুখে বলে ববম্‌ বম্‌ ; কাপড়ের রং লাল ; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাভি স্পর্শ করে ; ললাট রঙের রেখায় দ্বিভক্ত করিয়া সিন্দুরের ত্রিশূল অঙ্কিত থাকে।—

ভিক্ষা মাগিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—

চুন চুন স এ হমারে মরী ঐ।*

লোকে বোঝে না ; বলে,—পাগল।……

একটি বছর গেছে।

প্রত্যহ গভীর রাত্রে আসিয়া নিত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়া যায়—

শিবপ্রিয় শয্যায় পড়িয়া কান পাতিয়া থাকে ; আকাশে কোথায় নিত্যর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় ; তারই চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া বুঝি শিয়রের মাটি ভিজিয়া থাকে।…

দক্ষ একদিন অসুখে পড়িল ; কিন্তু বেশী ক্লেশ সে দিল না ; তিন দিনের দিনই বোঝা নামাইয়া দিল।

আবৃত শবদেহ স্পর্শ করিয়া শিবপ্রিয় হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল ; মন তার আশ্রয়চ্যুত হইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল।—নিত্যর অপমৃত্যুর স্মৃতি ত'

* বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রু নিপাত কর।

ভুলিবার নয় ; নিত্যর সেই নিদারুণ সতীধর্মপালনের, সে যে আপন হাতে বৃন্ত ছিন্ন করিয়া গেছে সেই নিষ্ঠুরতম কথাটার সাক্ষী কেবল মা, আর তার নিজের অন্তরাত্মা।... ...এই দুঃসহ উপলব্ধিটাই তার মনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, মা মরিয়া আজ সে একেবারে একা—

নিত্যর বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎ—

মা তাহাকে একান্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ করিয়া সংসারের উত্তপ্ত এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেছে—

নিত্যর পক্ষে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে আজ সে একা—

সান্ত্বনা চাহিয়া মুখপানে চাহিবে এমন আর কেহ নাই।......

মনে পড়িতে লাগিল, মা তাহাকে কি করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল।—

শিবপ্রিয় বলিত,—আমি ছেলেবেলায় খুব কাঁদতাম, নয়, মা?

মা বলিত,—কম জ্বালিয়েছ তুমি আমাকে ; এক একদিন—

—খুব গরীব ছিলাম নাকি আমরা?

মা কথা কথা কহিত না।—দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বুকে লইয়া সদ্যঃবিধবার সেই ভিক্ষা-জীবনের দিনগুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দ্রুতবেগে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিত।...

শিবপ্রিয় বলিত,—তুমি নিজে না খেয়ে ভিক্ষে করে আমাকে খাইয়েছ, একথা সত্যি, মা?

মা হাসিয়া বলিত,—কে বললে তোকে?

—লোকেই বলে। বলিয়া হঠাৎ সরিয়া আসিয়া শিবপ্রিয় মায়ের পায়ের ধুলো দু'হাতে করিয়া মাথায় লইত।...

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তার মনে হইল, মা বুঝি সামনেই বসিয়া আছে—

তাড়াতাড়ি চোখ তুলিতেই বস্ত্রাবৃত শবদেহ পার হইয়া তার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িল সেটা একখানা অপরিচিত মুখ।—

জানালার জালিতে মুখ দিয়া কে একজন দাঁড়াইয়াছিল ; শিবপ্রিয়কে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল,—ওরে পাগলা, তোর মা মরেছে? ফেলবি না রেখে দিবি?

শিবপ্রিয় বলিল,—লোক চাই যে, বাবা, ডেকে দাও না। আমরা—

—তা দিচ্ছি, কিন্তু মাল চাইবে তারা। আছে ত'?

—নেই ত'।

—গঙ্গারাম।—বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই আরও চারজনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উঁকি মারিয়া কহিল,—পাগলা, আছিস ত?

—আছি বাবা।

—নে, তবে ওঠ। মাল আনগে ; আমরা মড়া আগলাচ্ছি। বলিতে বলিতে এক এক করিয়া পাঁচজন শ্মশান-বন্ধু ঘরে ঢুকিল।

যে বন্ধুটি মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছিল সে বলিল,—পাঁইটে হবে না তা বলে দিচ্ছি ; বোতল চাই দুটো। কি বল, হরিদাস? ঠ্যালা ত' কম নয়!—

হরিদাসও ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বোতল দুটোই চাই এবং ঠ্যালাও কম নয়।......

শিবপ্রিয় বাক্স হাঁতড়াইয়া কি পাইল তাহা সেই জানে ; কিন্তু তক্তপোষের নীচে হইতে যে বস্তুগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া গেল তাহা কাঁসা আর পিতল।—

আজ শ্রাদ্ধের দিন।—

শিবপ্রিয়র কোনোই যোগাড় নাই ; সে এক মতলব ঠাওরাইয়াছে।—

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শুইয়া কাটাইয়া সে উঠিল……

মায়ের কুশাসন হইতে একটি কুশ বাহির করিয়া লইয়া একবস্ত্রে যখন সে ঘাটে আসিল তখন নদীতীরে স্নানার্থী কেহ নাই।—

ঘাটের উপর সমতলস্থানে শিবমন্দির।—

জলের ধারেই খানিকটা স্থান গঙ্গাজল দিয়া সযত্নে সমতল পরিষ্কার করিয়া লইয়া শিবপ্রিয় সেই কুশ তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া পাতিল…বালির একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইয়া অঞ্জলির মধ্যে ধারণ করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল,—দশরথ রামের হাত থেকে বালির পিণ্ড নিয়েছিলেন ; মা, তুমিও আমার এই বালির পিণ্ড নাও।…বলিয়া বালির পিণ্ডটা ত্রিখণ্ডিত কুশের উপর স্থাপন করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।…

কতক্ষণ সে ধ্যানস্থ হইয়াছিল কে জানে, কি ধ্যান করিল সেই জানে ; কিন্তু চোখ খুলিয়াই হঠাৎ সে ছ্যাঁৎ করিয়া চমকিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।…বালির পিণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে ..চারিটি অঙ্গুলির দাগ সম্মুখের সেই কুশক্ষেত্রে একেবারে স্পষ্ট।… নির্নিমেষচক্ষে সেই রেখা কটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শ্রাদ্ধের এই অচিন্ত্যনীয় সার্থকতায় শিবপ্রিয়র সর্বান্তঃকরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া অনির্বচনীয় আনন্দে বিস্ময়ে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল।—

·· প্রেতলোকবাসিনী জননী স্বহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন!—

এ আনন্দ যে কতবড় আনন্দ, কাহারও অদৃষ্টে যদি এমনধারা ঘটিয়া থাকে তবে সেই তা জানে। আনন্দে পরিতৃপ্তিতে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া শিবপ্রিয় ঘাড় গুঁজিয়া চলিতেছিল ; শিবমন্দিরের কাছে আসিতেই কে যেন ডাকিল,—এই বাঙ্গালী ?

শিবপ্রিয় দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কৌপীনপরা দুইটি খোট্টা ছোঁড়া মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।…

তাদের একজন বলিল,—এই দেখ।…বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া যাহা দেখাইল তাহাতে শিবপ্রিয়র মুহূর্তপূর্বের সীমাহীন থৈ থৈ অগাধ আনন্দ বজ্রাগ্নিশিখায় পুড়িয়া নিঃশেষে শুকাইয়া তার বুকের ভিতরটা ভাঙিগয়া চুরিয়া সেখানে যে কি বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা একমাত্র তিনিই জানিলেন যাঁহার অগোচর কিছুই নাই।…

শিবপ্রিয় দুইহাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ;—চুন্ চুন্ সঅ হমারে মরী ঐ।

…বলিয়া অকস্মাৎ যখন সে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল তখন তাহারা বালির পিণ্ড মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে।…

কিছুক্ষণ দৌড়াইয়াই শিবপ্রিয় ভুলিয়া গেল কেন সে দৌড়াইতেছে।…দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে চারিদিকে একবার চাহিল ; একটি লোক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতেছিল ; শিবপ্রিয় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নদীটা কোনদিকে বলে দিতে পারেন ?

·নাইব।

—ওদিকে, ওই গলি দিয়ে গেলেই সামনেই।

শিবপ্রিয় বলিল,—ধোঁকা দিচ্ছ, বাবা? ওদিকে আর নেই, সরে গেছে।

—জানা আছে দেখছি, তবে জিজ্ঞেসা করে কি তামাসা করা হচ্ছিল? বলিয়া ছাতি মাথায় লোকটি শিবপ্রিয়র উন্মাদদৃষ্টির দিকে চাহিয়া একটু ত্বরিতপদেই অগ্রসর হইয়া গেল।...

সেইদিন হইতে পথে পথে অহোরাত্র কে চীৎকার করে—

চুন্ চুন্ সও হমারে মরী ঐ।

শব্দটা আর্তনাদের মত শোনায়।

লোকে বলে—সেই পাগলাটা।

এইবার লোকে ঠিক বলে।

## অন্নদার অভিশাপে

গভীর রাত্রে নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা গুরুর দুই চক্ষুর কোণ বহিয়া জলের ধারা নামিয়া আসিল। কিছু পূর্বেই স্ত্রীর অতি সত্য অথচ অতি কঠিন বাক্যগুলি তাহাকে নিরতিশয় বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু তখন চোখে জল আসে নাই, চোখ দুটা শুধু জ্বালা করিয়াছিল, বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া টাটাইয়া উঠিয়াছিল। সত্যকে তখন মিথ্যা বলিয়া ভ্রম হয় নাই; কিন্তু সে সত্য ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরহস্তে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াছে তাহার বেদনায় সংজ্ঞাশূন্য মনের উপর। এতক্ষণ পরে তাহার মনের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে এবং সংজ্ঞা ফিরিতেই চোখের জল আর বাধা মানে নাই।—

গুরুর মনের অবিকল সত্যকার রূপটা—এতদিনে একটি মুহূর্তের জন্যও অমলার চক্ষে ধরা পড়ে নাই। আজ গুরুর মনুষ্যত্বের প্রতি সংসারের ধিক্কারের সীমা নাই—সংসারের দেওয়া লজ্জা, অপমান আর মনোবেদনার ভারে গুরু ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেছে, তবু তার মুখের হাসিটি আজিও তেমনি সজীব, তেমনি অম্লান। কিন্তু তাহার ঐ নিরবচ্ছিন্ন হাসির অন্তরালে হৃদয়ের একটী গভীর রক্তাক্ত ক্ষত দিবারাত্রে লুকানো থাকিতে পারে, চোখের আড়ালের এই নিগূঢ় তথ্যটি অমলার মনে কখনো সন্দেহের সঙ্গেও দেখা দেয় নাই। তাই সে কথাবার্তার মাঝখানেই সেই অজ্ঞতাবশতঃ হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাত্রা রক্ষা করিতে পারে না।

আজ অমলা একেবারেই বলিল,—আমায় সকলের পায়ের তলায় এনে ফেলে দিলে? বলিয়া গুরুর দিকে সে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ তার চোখে পলক পড়িল না।

এ অনুযোগে কিছুমাত্র অত্যুক্তি ছিল না এবং কথাটা যে আমূল যথার্থ তাহা গুরু নিজে যেমন জানে তেমন করিয়া আর কাহারো জানা নাই। যে পুরুষ নিজে অপরের পদতলে, অপরের পদতল ছাড়া আর কোন্ স্বর্গে তার স্ত্রীর আশ্রয়? পৃথিবী দিগন্ত পর্যন্ত বৈশাখের বৃষ্টিহীন মধ্যাহ্ন আকাশের মত ক্ষুধার উত্তাপে ধক্ ধক্ করিতেছে—

পথভ্রষ্ট নিরুপায়ের শ্রান্তি তাই অপরের পদচ্ছায়ায়। ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ মুখে তুলিতে চোখের জলে দৃষ্টি বুঁজিয়া আসে, তবু গুরু হাসে। অস্থানের অযোগ্য সেই হাসিটার মূল্য যে কত তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া অমলা কাঁদিয়া কাটিয়া অকর্মণ্য উপায়হীনের অশেষ মর্মদাহের উপর আগুন জ্বালিয়া দেয়।

স্বামীর প্রতি সংসারের অশ্রদ্ধায় স্ত্রীর বেদনার পরিমাণ কত তাহাও গুরুর কাছে অপ্রকাশ নাই। ইহাও সে জানে, যেখানে চলাই নিয়ম সেখানে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে স্রোতের আঘাত লাগিবেই; এবং সচল অবস্থায় যে ক্লেশ অনুভূত হয় না, চলিতে অক্ষম হইয়া উঠিলেই নিত্যসঙ্গিনীকে বহনের সেই ক্লেশ দেখিতে দেখিতে দুঃসহ হইয়া ওঠে। দর্পণের বুকে প্রতিবিম্বের মত গুরু অমলার অন্তরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে।—নিজেরই অস্তিত্বের প্রতি এই অসাধারণ ধীমতী নারীটির আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই; ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া একদিকে যেমন তার সুকঠিন ক্রোধের অন্ত নাই, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি নিদারুণ একটা প্রীতি আলোড়িত হইয়া তাহাকে মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিতেছে না। অমলার মনের এই হিংস্র ক্ষিপ্ততা আর যাহাই হোক অস্বাভাবিক নহে।

সংসার যাহার কাছে তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারে না তাহাকে সে তাহার অভ্যন্তরের আশ্রয়-কোষ হইতে বিচ্যুত করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া তুলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিতে চায়, এই নির্মম অনিবার্য সত্যটিও গুরুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাসাইয়া দিবার কাজটি এমনই দৃঢ় দানবীয় বিরামহীন কঠোরতার সহিত চলিতে থাকে যে, নিষ্কৃতির রন্ধ্র কোথাও থাকে না;—এই নিষ্পীড়ন পুরুষের পক্ষে যেমন জীবন্ত, স্ত্রীর পক্ষেও ঠিক তেমনি; অগোচরে থাকিবার বস্তু সে নয়। এই দেনাপাওনার জগতে শুধু পাওনার দিকটাই ভারি করিয়া তোলা যায় না—এবং সেই অসাধ্য অসম্ভব কার্যটি করিতে উদ্যত হইলেই দিগ্বিদিক হইতে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত যে আঘাত পর পর ছুটিয়া আসিতে থাকে তাহা যতই প্রাণান্তকর প্রচণ্ড হোক, তাহাকে অস্বীকার করিয়া পরিহার করিবার উপায় বুঝি দেবতারও জানা নাই।

গুরুর দেড় বৎসরব্যাপী নিষ্কর্ম জীবনের এই সবল অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ নূতন এবং তেজস্বী, প্রাণবান। সে যখন-চাকরী ছাড়ে তখন কেবল এই কথাটাই তাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, চাকরী শুধু অন্ন আনয়নের দ্বার নহে, তাহা নির-বসান শান্তির একটা নিজস্ব অটুট নিকেতনে প্রবেশের দ্বারও বটে।···ভৃত্যজীবনে এই কথাটা কখন সত্য, কখন মিথ্যা—এমনিধারা সত্যমিথ্যায় জড়ানো বলিয়াই গুরুর উত্তেজনায় অশান্ত মন মিথ্যার দিকটা দেখিতেই পায় নাই। তার উপর আশা ছিল, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি, অর্থাৎ উপায় হইবেই; কিন্তু চাকরীর দিকে পিছন ফিরিয়া সম্মুখে যে সুপ্রশস্ত আলোকিত ক্ষেত্র সে বিস্তৃত দেখিয়াছিল তাহা দিন দিন সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে একেবারে চিহ্নহীন শূন্যে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে পরের দুয়ারের কাঁটাবনের উপর বসাইয়া-দিয়া গেল।—

যে সম্ভ্রম বাঁচাইতে গুরু চাকরী ছাড়িয়াছিল, পরের দুয়ারে আসিবার সম্ভাবনাতেই যে সেই সম্ভ্রমই পুনরায় বিপন্ন হইতে পারে, পরের দুয়ারে বসিবার আগে সে কথাটা তার মনেই পড়ে নাই। মনে পড়িলেই যে উপায় কিছু হইত সে নয়, কিন্তু গুরুর ঐ

মনে না পড়াটাই অমলার চোখের সামনে নির্বোধের অমার্জনীয় অপরাধের আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুরুর নিজের কাছে সেটা অপরাধ নয়—ভুল। একই জিনিষকে দুইজনে দুই চক্ষে দেখিয়া একজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, আর একজনের সশব্দ সাশ্রু অধীরতার অন্ত রহিল না।

গুরু স্ত্রীকে ভালবাসিত। আত্মসম্মানের ক্ষয়ে সে নিজের জন্য নিজে যেমন ব্যথিত ততোধিক ব্যথিত সে অমলার দিকে চাহিয়া। কিন্তু যার জন্য এত ব্যথা তাহার কাছে ত ব্যথার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। দেবতার সম্মুখে বসিয়া শপথ করিয়া সে স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল—সেই দেবতা তাহার কাছে যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, দায়িত্বও তেমনি আমরণ অটল; পলায়ন করিয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিবার উপায় নাই, অন্ধ সাজিয়া তাহাকে না দেখাও চলে না; অথচ চতুর্দিকের পৃথিবী সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ আঁটিয়া বসিয়াছে, অন্ন আহরণে যাইবার পথ কোনোদিকেই খোলা নাই। গুরুর মানসিক যন্ত্রণার শেষ নাই, তুলনা নাই।

বোঁটা শুকাইয়া উঠিবার সংগে সংগে বৃক্ষ-মাতার সংগে যেমন ফলটির সম্পর্ক ফুরাইয়া আসে, তেমনি একটা ভাবান্তর গুরুর বুকে চলিতেছিল। অন্নের গ্রাস নিয়মিত-ভাবেই উদরে পৌঁছিতেছে—কিন্তু মানুষ তাজা থাকে শুধু অন্নরস পরিপাক করিয়া নয়, তাহার মনের সজীব থাকার পক্ষে আরও কিছুর প্রয়োজন; সেই সার বস্তুটির অভাবেই গুরুর সংসারের সংগে যোগের বৃন্তটি দুর্বল হইয়া যেন তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে না।

ভিতরের এত খবর অমলা রাখে না। সে মাঝে মাঝে বলে,—দুবেলা ত' খাচ্ছো বেশ; আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, ভাতের গ্রাস তোমার মুখে ওঠে কেমন করে!

গুরু হাসিয়া বলে,—সে কৌশলটি জানে না এমন মানুষও ত আমি দেখি নে।

অমলা আগুন হইয়া বলে,—আমায় বলা হচ্ছে? আমি ভাত খাই নে, যা খাই তা আমিই জানি। আমি পুরুষ হ'লে তোমাকেও খাওয়াতাম, আমিও খেতাম।

গুরুর প্রাণে স্ত্রীর প্রতি যে একটা অসীম ধৈর্যশীল সদয় মার্জনার ভাব নিরন্তর জাগরূক থাকিত, সেটা অমলার অঙ্কুশের এই আঘাতেও ক্ষুণ্ণ হইত না। তাহার চাইতে কে বেশী জানে যে, অমলাকে সে যে অবস্থায় রাখিয়াছে তাহাতে তাহার মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হওয়ার মত স্বাভাবিক আর কিছুই নাই।

অনুগ্রহের অন্ন গিলিতে গুরুর কণ্ঠনালীর মুখ আঁটিয়া আসে, তবু এই ক্লেশমোচনের তেমন প্রাণপণ উদ্যোগ তাহার কই? গুরু নিজের কাছেও স্বীকার করে, প্রশ্নটি অবোধ প্রশ্ন নহে। কিন্তু—

তাহার হাত আছে, পা আছে, আর সে অবয়বগুলি দিব্য সুস্থ, সাধারণের চাইতে কিছুমাত্র দুর্বল নহে; অল্পতর বুদ্ধিবিবেচনার লোক বলিয়া যাদের অপবাদ আছে তারাও পরান্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাঁচিয়া নাই; তবে কেন এই কষ্ট পাওয়া আর দেওয়া?

অমলার এ প্রশ্নের উত্তর আর সে কে দিবে! উত্তরটি দেশের কত লোক যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গলদ্ঘর্ম হইতেছে তাহারই যে ইয়ত্তা নাই।

—চাকরী করেই ত' দেশের লোক খাচ্ছে। কেবল তোমার বেলাতেই স্থান নেই ?

চাকরী করিয়াই দেশের অসংখ্য লোক খাইতেছে ইহা গুরু অস্বীকার করে না ; আবার অসংখ্য লোকই যে খাইতে পাইতেছে না তাহা লইয়াও সে তর্ক করিতে চায় না ; শুধু হাসিয়া বলে,—অদৃষ্ট !

কিন্তু সকলেই জানে এবং অমলাও জানে যে, এমনি করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া অদৃষ্টকে নির্বিবাদে মানিয়া লওয়ার মধ্যে অলস পরাঙ্মুখ মনের অনায়াস একটা আত্মমার্জনার চেষ্টা থাকে। তাই অমলা বলে,—কথাটা আহাম্মক আর আলসের।

—কিন্তু তুমি ত' জানো, একটি বছর ধরে দোরে দোরে কত ঘুরেছি, কোনো কোনো দিন অনাহারে—

—তাই সব দোর ছেড়ে এই দোর ধরে আছ সস্তা ভাতের আশায় ?

এমনি বচসা শতবার উঠিয়া এমনিভাবেই শেষ হইত। হোক্ সে স্ত্রী, তবু সে একদিক দিয়া বাহিরেরই মানুষ। বাহিরের মানুষ অপরের মনের প্রাণান্তকর আকুলিব্যাকুলির কোনো খবরই রাখে না, প্রাণপণ চেষ্টার ইতিহাস সে জানিতে চায় না—সে শুধু সফলতা-নিষ্ফলতার স্তুতি-নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিতে জানে।

আজ রাত্রে গুরু শুইতে আসিয়া অমলার রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইল। এতদিন সে স্ত্রীর রুক্ষ অসহিষ্ণুতাই দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিল তার চোখের জল। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল—গুরু দেখিল, দীপের ধারে মাটিতে বসিয়া অমলা একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া তার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সপ্রশ্নদৃষ্টিতে অসীম উৎকণ্ঠা লইয়া গুরু অমলার পাশে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া অমলা তাহার দিকে ফিরিয়া বসিল ; তাহার হাতখানা হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—সত্যি বলো, আমায় ভালবাস ?

এতদিন পরে অমলার মুখে এ প্রশ্নটা বড় আশ্চর্য শুনাইল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা নিদারুণ সংশয় জন্মিয়া গুরু শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; গুরুর অনুরাগ অর্পণের ক্ষেত্র এই পৃথিবী এবং অমলা, কিন্তু অমলা সর্বহৃদয় দিয়া একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া আছে একমাত্র তাহাকেই। অমলা তাহার নিজস্ব সত্তাটি বিসর্জন দিয়া একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে স্বামীর সত্তায়—অন্ততঃ এতদিন ত তেমনটিই ছিল। কিন্তু আজ বুঝি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে, যন্ত্রণা সহিয়া সহিয়া অশেষ নির্যাতনে উন্মত্ত হইয়া সে নিজেরই অবোধ ভালবাসার সন্ধান আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাই এই প্রশ্ন। অমলার সকল অনিষ্টের মূল যে গুরু নিজে।

গুরুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ শুকাইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া গেল।

প্রশ্নের উত্তরের আশা বোধ হয় অমলা করেই নাই। একটু থামিয়া সে বলিতে লাগিল, —আমায় এত দুঃখ কেন তুমি দিচ্ছ ? তোমার দুঃখ আমি বুঝি ; কিন্তু আমার দুঃখ কেন তুমি বোঝ না, আমায় আজ তা বলতেই হবে।

অমলার এ অভিযোগেরও প্রত্যুত্তর আসিল না ; অমলাও থামিল না ; বলিতে লাগিল,

—আমার মুখ তুলে কথা কইবার মুখ তুমি রাখনি। আমি আর সইতে পারি নে, আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো।

—কোথায় যাব ?

—তা আমি জানি নে। যাবার স্থান না থাকে বিষ এনে দাও। বলিয়া অমলা গুরুর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

আজ দুপুরবেলাতে বড় গুরুতর একটা ঘটনা ঘটিয়া গেছে।...অবাধ্য ভৃত্যকে অমলা ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইতেই অপর একটি নারীকণ্ঠ বলিয়াছিল,—চাকরকে তুমি কিছু বল না, অমলা। চাকর একটা রাখতে পার ? না, চলে গেলে এনে দেবে ? মাইনে দিচ্ছি আমরা, শাসনকর্তা তুমি সাজলে চলবে না ত'। আমাদের চাকর, যা বলবার হয় আমরা বলব—ইত্যাদি।

শুনিয়া চাকর বেটা হাসিয়াছিল, কিন্তু অমলার তখন মনে হইয়াছিল, ঐ কণ্ঠ দিয়া যে বিষ এইমাত্র উদ্গিরিত হইল তাহাতে বুঝি ব্রহ্মাণ্ড পুড়াইয়া দেওয়া যায়।

এতদিন এমনি সব কথায় অমলার স্বামীকে মনে পড়িত—আজ তাহার মৃত্যুকে মনে পড়িয়াছে। মৃত্যু ইহার চাইতে ঢের ঢের ভাল !—

স্বামীকে নিজে সে যতই আহত করুক, বাহিরের আঘাত হইতে তাহাকে জীবন দিয়াও বাঁচাইতে হইবে, এত দুঃখের মধ্যেও মমতার সে-কথাটি অমলা মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয় নাই।

আজ অমলা ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; প্রাণের প্রতি সত্যসত্যই আজ তার বিন্দুমাত্র মমতা নাই, তবু স্বামীকে সে ঐ অপমানের ভাগী করিতে পারিল না। কিন্তু গুরু দেখিল, এই বন্ধ্যা নারীটির অপার অস্থিরতার মধ্যেও যে একটুখানি সহনশীল দৃঢ়তা ছিল তাহা যেন আজ অতলস্পর্শ আশ্রয়হীন অন্ধকারের গর্ভে তলাইয়া গেছে।...

অমলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অমলার মুখের দিকে চাহিয়া যন্ত্রণায় গুরুর সর্বশরীর মাতালের মত টলিতে লাগিল।

পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে যে ইচ্ছাটা গুরুর মনে সময় সময় হেলায় ফেলায় উদয় হইত, সেইটাই এখন এক নিমেষে একেবারে সুদৃঢ় সংকল্পে পরিণত হইয়া তার বিচারবুদ্ধি নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিল।......

অমলার গায়ের উপর হাত রাখিয়া গুরু ডাকিল,—ওঠো।

তিন ডাকের পর অমলা উঠিয়া বসিল।

গুরু বলিল,—চলো, আমরা যাই।

—কোথায় ?

—কলকাতায়।

—সেখানে গেলে উপায় হবে ?

—হবে।

দুইজনে দুইখানামাত্র বস্ত্র এবং পাথেয় লইয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

গুরুর নাম এখন এড্‌ওয়ার্ড রায় ; মিশনারী স্কুলের সে শিক্ষক ; বেতন প'য়তাল্লিশ টাকা।

## পুরাতন ভৃত্য—

বিশ্বেশ্বর যাজকব্রাহ্মণ—তাঁর যত যজমান সবই নমঃশূদ্র। তাঁহার শিষ্যরা শুদ্ধমাত্র আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়াই ঠাকুরকে তৃপ্ত রাখে না, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভক্তির সংগে আরো যাহা দেয়, ভক্তির চাইতে সংসারে তার ঢের বেশী আদর এবং প্রয়োজন।

ঠাকুরের মারফত শিষ্যরা পারত্রিক মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে কিনা কেবল তাঁহারাই জানেন যাঁহারা অন্তরীক্ষে থাকিয়াও মানুষের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। বিশ্বেশ্বরের নিজেরও যদি সে খবরটা জানা না-ও থাকে, তবু সে-অজ্ঞতা পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে দেনা-পাওনার আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতে আজ পর্যন্ত পারে নাই। বিশ্বেশ্বর যাহা দান করিতেন তাহার সারবত্তা ও সার্থকতায় সংশয় থাকিলেও বুঝি থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা গ্রহণ করিতেন, সংশয়ের ঘুণপ্রবেশের মত দৌর্বল্য তাহার অংগে থাকিতে পারে না।—

বিশ্বেশ্বরের প্রাপ্তি প্রচুর হইলেও, বাহিরটা দেখিয়া মনে হয়, যেন সঞ্চয় প্রচুর হয় নাই। যাজকব্রাহ্মণ চির-দরিদ্র, এ-টা প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য—কারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দানে তুষ্ট কর, চাহিদার মূলমন্ত্রই ঐ। লোকে দেখিত, যুগধর্মের দোহাই দিয়া ছোট্ট দু-আনিটি পর্যন্ত তার জ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে একেবারে দেউলিয়ার হাটে বসাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়,—বিশ্বেশ্বর প্রাণপণ করিয়াও ঐ চঞ্চল বস্তুগুলিকে আটকাইতে পারেন না ; তাই তাঁর এত আকুলি-ব্যাকুলি আর বাজার-দেনা।

কাজেই যখন স্ত্রী ক্ষেমংকরী স্বর্গারোহণ করিলেন তখন বিশ্বেশ্বরকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল।—

নামাবলী, টিকি এবং পৈতা, এরা বাহ্যিক একটা নির্জীব সরঞ্জামমাত্র, ব্রাহ্মণীর শ্রাদ্ধের খরচ তোলা একা তাহাদের সাধ্য নয় ; বিশ্বেশ্বর তাই জিহ্বাগ্রে সাজাইতে সাজাইতে চলিলেন শব্দব্রহ্মকে—যাহা উচ্ছন্নে পাঠাইতে পারে, রাজা করিতে পারে, এমন-কি অপুত্রককে পুত্র দিতে পারে ; মন ভিজাইয়া টাকা আদায় করিতে ত' পারেই।···মজুত তহবিল হইতেই বিশ্বেশ্বর শ্রাদ্ধের খরচটা অক্লেশেই দিতে পারিতেন ; কিন্তু এটা যে বড় জানা কথা যে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভিক্ষায় ব্রাহ্মণের লজ্জার কারণ তেমন নাই, আর তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। শূদ্রের পুণ্যলাভের লোভ অক্ষয় রহুক, তাহা হইলেই শ্রাদ্ধের খরচের জন্য পুরোহিতের আর ভাবনা থাকিবে না।—

বিশ্বেশ্বরের সংগে চলিল ভৃত্য নব।

নবর বয়স এখন সাতাশ। যখন প্রথম সে বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়ে তখন তার বয়স ছিল বাইশ। এই পাঁচ বৎসরেই সে বিশ্বেশ্বরের সংসারের অপরিহার্য পুরাতন একটা অংগের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।···নব যখন আসে নাই তখন তাঁদের কাজকর্ম কেমন

করিয়া নির্বাহ হইত, এই কথাটা ভাবিয়া মাঝে মাঝে বিশ্বেশ্বরের সহর্ষ বিস্ময়ের অবধি থাকে না ; এখন ত' সে না হইলে এক মুহূর্তও চলে না !

পাঁচ বৎসর আগে ফাল্গুনমাসের একটা দিনে বুন্দুরপুরের শ্রীধর মণ্ডলের বাড়ীর বাস্তুপূজা সারিয়া বিশ্বেশ্বর আল ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাঠ পাড়ি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন ; মাঠের শেষে গ্রামে উঠিবার পথের প্রান্তে কড়ুই গাছটার নীচে পেঁাছিয়াই তিনি বাধা পাইলেন ; দেখিলেন, একটি লোক হাত-পা গুটাইয়া কাত হইয়া পড়িয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে। তার দরিদ্রবেশের দিকে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর ডাকিলেন, —কে তুমি এমন ক'রে পড়ে' ?

যে পড়িয়াছিল সে কথা কহিল না।

বিশ্বেশ্বর ক্রমশঃ তেজ বাড়াইয়া আরও দু'বার প্রশ্ন করিলেন ; এবং উত্তর না পাইয়া হাতের চটি মাটিতে নামাইয়া ছাতাটি মুড়িয়া ফেলিলেন, লোকটার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, মুড়ি ভাজা যায় এমনি তা গরম ; ওষ্ঠাধর শুকাইয়া চড়্ চড়্ করিতেছে ; নিঃশ্বাস যেন আগুন ! বিশ্বেশ্বর আপন মনেই বলিলেন,—ম'রবে না কি ?

তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হাঁকডাক সুরু করিয়া দিলেন ; দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের সাহায্যে পীড়িত ব্যক্তিকে গৃহের উঠান পর্যন্ত আনিয়াই দ্বিতীয়বার বাধা পাইলেন।

দেখিয়া লোকটাকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়, তবে হিন্দুর মধ্যেও নাকি এমন জাতিও আছে যে উল্লেখযোগ্য জাতির বারান্দায় উঠিবারও অযোগ্য। এখন হঠাৎ সেই প্রশ্নটিই উঠিয়া পড়িল। উঠানে নামাইলে এই ভরা-সন্ধ্যায় দেখিতে অতি বিশ্রী হয় ; ক্ষেমঙ্করী তুমুল আপত্তি তুলিয়া তাহা করিতে দিলেন না ; কাজেই বেহুঁস রোগীকে হাতের উপর করিয়া গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক এমন কোলাহল জুড়িয়া দিল যেন বীরভদ্র বিশ্বেশ্বরের উঠানে পড়িয়া দ্বিতীয়বার দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিতেছেন। মানুষের বারান্দায় উঠিবার যোগ্যতা তার আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরটা কেবল সে-ই জানে যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। তর্ক ছাড়িয়া লাঠি মারিয়া বেড়াইলেও আর কাহারও নিকট হইতে উত্তরটা আসিতে পারে না, আশ্চর্য এই যে, এতগুলি লোকের মধ্যে এই সরল কথাটি কাহারও মাথায় আসিল না।

একজন বলিল,—গোয়ালে নিয়ে চল। গোয়ালের জাত নাই।

বিশ্বেশ্বর চটিজোড়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি গোয়ালের উল্লেখে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমার এতগুলো গরু যাবে কোন্ চুলোয় ? ঘরবারান্দা আমার না তোমাদের হে ? উঠাও বারান্দায়, তারপর যা হয় তখন দেখা যাবে।—বলিয়া তিনি ভুলবশতঃ হাতের জুতা মাটিতে নামাইয়া পায়ে দিলেন।

লোকে বিস্মিত হইয়া গেল—বিশ্বেশ্বরের গোয়াল কি তার জাতের চাইতেও বড় !—

লোকটাকে বারান্দায় তোলা হইল ; সে বিছানাও একটু পাইল এবং শুশ্রূষায় ক্রমশঃ তার সংজ্ঞাও ফিরিল। তখন সে তার নাম বলিল, বিন্ধ্যপ্রসাদ, জাতিতে কুর্মী।

কুর্মী জাতটার সংগে গ্রামের লোকের পরিচয় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—তোর হাতের জল খাওয়া যায় ?

—যায়।—বলিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ আবার চোখ বুঁজিল।

আঃ, বাঁচা গেল, জাতিরক্ষা হইয়াছে।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া কেবল চিরতার জল খাওয়াইয়া বিশ্বেশ্বর রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিন্ধ্যপ্রসাদ আত্মজীবনী যাহা বলিল তাহা এই—তাহার পূর্বপুরুষের ঘর ছিল গয়া জিলায়, কিন্তু সে-দেশের সংগে সম্পর্ক তার নাই, ছিলও না, দেশের জন্য লালায়িতও সে নয় ; বাংলাদেশের মাটিতেই সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই মাটিরই ফলশস্য দানাপানি খাইয়া সে এত বড় হইয়াছে ; ভূভারতে আপনার জন কেহ তাহার নাই ; মাঠ পার হইয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, নদী পার হইয়া আট ক্রোশ দূর সহরে সে কর্মের অন্বেষণে যাইতেছিল, আরও কয়েকবার সে এ-অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিয়াছে ;—এবার মাঠের মাঝামাঝি আসিতেই তার হি হি করিয়া কাঁপাইয়া জ্বর আসে ; কোনপ্রকারে বহুক্লেশে গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া সে গাছের নীচে জ্ঞান হারাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার পর মেহেরবান্ ঠাকুরজি গৃহে আনিয়া তাহার জান্ বাঁচাইয়াছেন। আর কোথাও যাইবার তার প্রবৃত্তি নাই, সে এই ঠাকুরজির কাছেই বিনা বেতনেই থাকিবে।—এই সংকল্প নিবেদন করিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ বিশ্বেশ্বরকে বলিল, বাবাঠাকুর ; ক্ষেমঙ্করীকে বলিল, মা। শুনিয়া ক্ষেমঙ্করীর মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হইয়া গেল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু তে.র ঐ খোট্টাদেশের দাঁতভাঙা নাম ত' আমাদের মুখ দিয়ে বেরুবে না রে। আমরা তোর নাম রাখলাম, নব।

বিন্ধ্যপ্রসাদ হাত জুড়িয়া বলিল,—যে-আজ্ঞে, মা। আমি আপনার সন্তান ; মা সন্তানকে যে নামে খুসী ডাকবেন।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—সেই ভাল। আমার সেই দশ মাসের ছেলেটা বেঁচে থাকলে অতবড়ই হত। তার নাম রেখেছিলাম, নব। বলিতে বলিতে ক্ষেমঙ্করীর চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদের চোখও যেন ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদ নামান্তরিত হইয়া নব ডাকেই সাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বাড়ীর সকলের কাছেই এই সুসংবাদটা ধরা পড়িয়া গেল যে, নবর মুখই শুধু সাড়া দেয় না, তার অন্তরও যেন সাড়া দিয়া লাফাইয়া উঠে। মানুষের মনের এই বার্তাটির মত সুসংবাদ বড় বেশী নাই ; আমারই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য আর একটি অন্তর অনুক্ষণ উর্ন্মুখ হইয়া আছে, শুধু এই অনুভূতিটাই পরম অমৃতময় ; মানুষের অদৃষ্টে এই অনুভূতির আস্বাদ বেশী মিলে না।......দেখিতে দেখিতে ক্ষেমঙ্করীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নবর এমনি বশীভূত হইয়া উঠিল যে, অন্য কাজ করিবার ফুরসৎ পাওয়াই তাহার মুস্কিল হইয়া উঠিল।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—ও-রা আবার তোকেই বড়ভাই পেয়েছে।

—যে-আজ্ঞে, মা।—বলিয়া নব যেন ধন্য হইয়া গেল।

সর্বাপেক্ষা মিষ্ট নবর মা ডাকটি। এমন সুর সে কোথায় পাইল কে জানে,—সময় সময় তাহার ডাকে ক্ষেমঙ্করী চমকিয়া উঠেন ; তাঁহার সকল হৃদয় মথিত হইয়া একটা অনির্বচনীয় প্রীতির রস ফেনায়িত হইয়া উঠে।···নব খুব কম কথা বলে, হাসেও কম ;

কিন্তু মেঘের পশ্চাতে সূর্য লুকাইলেও তার আলো যেমন একেবারেই নিবিয়া যায় না, তেমনি নবর কম কথা আর কম হাসির আড়ালে তার অন্তরের প্রসন্নতা কোনোদিনই অস্তমিত হইয়া যায় নাই।···দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন ;—নবর গম্ভীর ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ মূর্তির দিকে চাহিয়া যেমন সাহসে তাঁর বুক ফুলিয়া ওঠে ; তার নিখুঁত পরিচ্ছন্ন কর্মপটুতা দেখিয়া তেমনি তাহাকে ভালবাসিতেও ইচ্ছা করে।

ক্ষেমঙ্করী অসুখে পড়িলেন।

নব 'মা' বলিয়া ডাক দিয়া শতবার তাঁহাকে দেখিতে আসে ; কোথায় তাঁর অশান্তি চক্ষের নিমিষে সেটা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়া যায়।

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করেন,—ওদের সব খাইয়েছিস, নব ?

নব বলে—তুমি কিছু ভেব না, মা। আমি খাইয়ে দাইয়ে ঠিক করে দিয়েছি। তোমার কাছে এলে তোমায় বিরক্ত ক'রবে বলে তাদের কাউকে আসতে দেইনে।

—বেশ করিস। কিন্তু মাঝে মাঝে আসতে দিস, বড় দেখতে ইচ্ছে করে যে।

ছেলেমেয়েরা এখন বিশ্বেশ্বরের জ্ঞাতসারেই নবর হাতে খায় ; বড় মেয়েটা রাঁধে ; যতক্ষণ সে রাঁধে ততক্ষণ অন্যদিকে মন দিবার সময় বড় পায় না। তাই, দুই একদিন ইতস্ততঃ করিয়া নব ক্ষেমঙ্করীর অনুমতি লইয়া ছোটদের ভাতে হাত দিল।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—তুই যে আমার ছেলে রে।—

বিশ্বেশ্বর ভাবিলেন,—বিপদে নিয়মো নাস্তি!

ক্ষেমঙ্করীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর নিজে পত্নীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়েন, কিন্তু নব দিনের পর দিন সারারাত্রি অতন্দ্র নিষ্পলকচক্ষে ক্ষেমঙ্করীর মুখের দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া থাকে ; সহস্রবার উঠিয়া তাঁর আরাম, ঔষধ, পথ্য জোগায়।

কিন্তু ক্ষেমঙ্করী বাঁচিলেন না।

ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যু হইলে নব মা মা বলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল; ছেলে-মানুষের মত শতবার সে বিশ্বেশ্বরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—বাবাঠাকুর, মা আমার কোথায় গেল ?

গ্রামের লোক বিশ্বেশ্বরকে শান্ত করিল, কিন্তু নবকে শান্ত করাই দুরূহ হইয়া উঠিল।...... তারপর নব শোকসম্বরণ করিয়া ছোটদের আগ্‌লাইয়া রহিল ; শব শ্মশানে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুইদিন বাড়ীতে থাকিয়া বিধবা ভগিনীর জিম্মায় ছেলে-মেয়েদের রাখিয়া বিশ্বেশ্বর অনুচর নবকে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

বিশ্বেশ্বরের তল্পীটি লইয়া নব তাঁহার পিছন পিছন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে লাগিল।—

বিশ্বেশ্বর বাড়ীতে নবর প্রভু ছিলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে নব তাঁহার যে মূর্তি দেখিল, বাড়ীর সেই চেহারার সঙ্গে তাহার কোথাও মিল নাই······

বিশ্বেশ্বর এখন ভিক্ষাথী, অত্যন্ত করুণ তাঁর কণ্ঠ ; এমনি তাঁর বিনীত নিস্তেজ ভাব যে, যাহাকে স্বয়ং পদধূলি দিতেছেন, যেন তিনি তাহারও পদানত।

বিশ্বেশ্বরের এই দুর্দিনে তাঁহার অশিক্ষিত নিরক্ষর শিষ্যরা যে উদারতা দেখাইল তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।—শিক্ষিত যাঁরা, যাঁরা গুরুপুরোহিতের তোয়াক্কা না করিয়া, ধর্মানুষ্ঠান বিকল্পে সিদ্ধ করাটাই মার্জিত রুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন, বিশ্বেশ্বরের টাকার থলিটা এখন দেখিলে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইয়া যাইত।

পুরা সাতশত টাকা বিশ্বেশ্বরের সংগ্রহ হইল,—এতগুলি টাকা থলিটায় তুলিলেন বিশ্বেশ্বর শুধু পদধূলি আর ধৃতোপবীত আশীর্বাদ দিয়া।·····

অর্ধলক্ষ্মী কৃষিকর্মে এবং বাংলার সেই লক্ষ্মী যে মাঠে আর বিলে তাহাতে আর যাহারই সন্দেহ থাক, বিশ্বেশ্বরের নাই।

নব নিঃস্পৃহের মত চাহিয়া চাহিয়া এই টাকা আদায় করা দেখিল ; দেখিয়া তাহার মনের গতি কোন্‌দিকে ফিরিল কে জানে ; ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সে যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিতে লাগিল।—মানুষ পরমাত্মীয়কে পোড়াইয়া যেমন করিয়া শ্মশান হইতে ফেরে গতি তার তেমনি মন্থর ; স্বচ্ছ সন্তোষের যে স্ফূর্তি তাহার চোখেমুখে হাল্কা হাওয়ার মত দিবারাত্র ঢেউ খেলিত তাহা যেন সহসা থমকিয়া গেছে ···

বিশ্বেশ্বরের পা পড়িতে লাগিল খুব ফাঁক ফাঁক ; এতগুলি আমদানী সঙ্গের থলিতে বোঝাই—বিশ্বেশ্বরকে কিসে যেন ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল। লুঠতরাজের ভয় একটা আছেই—সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, সঙ্গে এতগুলি টাকা ; যেদিক দিয়াই হোক কেহ লাঠি কাঁধে করিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেই থলিসমেত টাকাগুলি তাহার হাতে বিনাবাক্যে তুলিয়া দিতে হইবে ; এখনও প্রায় দ'ক্রোশ পথ চলিতে হইবে, তার দেড়ক্রোশই জনশূন্য প্রান্তর ; সঙ্গে নব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একজন না আসিয়া যদি ঠাঙ্গাড়েরা পাঁচজন আসে তবে একা নবই বা তখন কি করিয়া রক্ষা করিবে!—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্যস্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর যথাসাধ্য তীরের মত চলিতে লাগিলেন ; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, নব তল্পী লইয়া ঠিক সঙ্গেই আছে।

সূর্য যখন অস্ত গেল তখন বিশ্বেশ্বর মাঠের মাঝামাঝি আসিয়াছেন ; ·····এবার চৈতালীতে সোনা ফলিয়াছে—

বিশ্বেশ্বরের বর্গাভাগে কিছু জমি ছিল।—

ডালটা এবার সম্বৎসর কিনিতে হইবে না, ফসল ফলিয়াছে ভাল ; ডালেরও কি কম খরচ ; মানুষ শুধু খাইয়া খাইয়া ফতুর হইয়া গেল ; খাওয়ার খরচ না করিতে হইলে টাকা জমিত কত!—ব্যাটারা আবার ফাঁকি দেয় ; বিঘা ভুঁই দশ মণ ফলিলেও যা, দু'মণ ফলিলেও তাই ; ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া এ পর্যন্ত কাহার কি সুসার হইল তাহাও ত' দেখা যায় না!—এবার দেখিয়া শুনিয়া ভাগটা আদায় করিয়া লইতে হইবে। খাতকরা কেবল খৎ বদলাইয়া দিয়া থামাইয়া রাখে, অথচ সুদ এক পয়সা দিবার নামটি নাই ; যেন তামাদি রক্ষা হইলেই মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। এবার সুদ আর আসলেও কিছু না দিলে তিনি ছাড়িবেন না ; তবে নালিশের বড় হাঙ্গামা, ঘরের টাকা গোড়াতেই—

হঠাৎ নব ডাকিল,—ঠাকুর !

চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া বিশ্বেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া পড়িলেন ; ত্রস্তনেত্র ঘুরাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—যে-ভয় করিতেছিলেন সেই ভয়-ই আগত বুঝি ; কিন্তু তা ত' নয় ।······তাঁহারা দু'টি প্রাণী ভিন্ন প্রান্তর তেমনি জনমানবহীন, নিস্তরংগ সমুদ্রের মত নিঃশব্দ ; এক ঝাঁক পাখী মাথার উপর দিয়া দিগ্বলয়ের দিকে ছুটিতেছে ; অস্তগত সূর্যের আলোকাংকনগুলি মিলাইয়া আকাশের প্রান্তে অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছে···

তাড়াতাড়ি বাড়ী পেঁছিতে পারিলে বিশ্বেশ্বর বাঁচেন—বেটা অকারণে ডাকিয়া বাধা দেয় কেন ?

বিশ্বেশ্বর নিরুত্তরে চলিতে সুরু করিলেন ।

নব আবার ডাকিল,— ঠাকুর !

চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন,—কেন রে ?

নব বলিল,—পালাও ।

সে কি !··· · চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তৃতীয় মানুষের নাম-গন্ধও নাই । বেটা ক্ষেপে গেল নাকি ? দাঁড়াইয়া নবর কথাটার তাৎপর্য গ্রহণ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহারই পশ্চাদ্দিক হইতে যে ব্যক্তি অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বিশ্বেশ্বর কাঁপিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সে নব । বিশ্বেশ্বর থামিয়া আর চলিলেন না, থামিয়া চোখ তুলিয়া দেখিলেন, নবর চোখের দৃষ্টি যেন কাঁপিতেছে, মুখে তাহার রক্তের লেশমাত্রও নাই ।······বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কি রে ? কি হয়েছে ?

নব নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

—বল, কি হয়েছে । ভয় পেয়েছিস ?—বলিয়া বিশ্বেশ্বর গায়ত্রী স্মরণ করিলেন । এই মাঠেরই কোন্ দিকে যেন শ্মশান আছে, এবং এ-দিকে ভুতের ভয় আছে বলিয়াই জনশ্রুতি ; সন্ধার পর এদিকে সচল অগ্নিপিণ্ড অনেকেই দেখিয়াছে । তিনি এটাও এখন লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার তল্পীটা নবর হাতে নাই, তাহার নিজের লাঠিখানাও ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে ।—বিশ্বেশ্বরের গায়ে কাঁটা দিল । বলিলেন,—কি হয়েছে বল্‌না রে ? দুর্গা, দুর্গা, ভালোয় ভালোয় মাঠটা পার হতে পারলে বাঁচি । কি, হ'ল কি তোর ?

নব প্রত্যুত্তরে আগের কথাটাই আবার বলিল । সোজা তাঁহারই দিকে চাহিয়া বলিল,—পালাও ।

—পালাব কেন ?

—তবে পালিও না ।—বলিয়াই নব বাঁ-হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল । বলিল,—টাকা দাও, না দিলে—বলিয়া ডান হাত বাড়াইয়া যে জিনিষটা সে বিস্ময়ে-অবাক বিশ্বেশ্বরের নিষ্পলক চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ তুলিয়া ধরিল, সেটা যেন সর্বনাশীর একটিমাত্র দাঁত ; ভয়ংকর ধারালো, ঝক্‌ঝকে ।···ছোরা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের শীর্ণদেহ আর খাড়া থাকিতে পারিল না ; কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নবর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন ; টাকার থলিটা তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—টাকা নে, কিন্তু প্রাণে মারিস নে, বাবা ।

—সে হয় না।—এই কয়টি কথাই শুধু বিশ্বেশ্বরের কানে গেল…

মুহূর্তের জন্য একটা তীব্র ব্যথার অনুভূতি তাঁহার মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল।

তারপর তিনদিন পরে যখন তিনি বিছানায় শুইয়া চোখ মেলিলেন তখন তাঁহার সেই সাতশ' টাকার থলিটা আর নব সেখানে অনুপস্থিত।

## প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী—

চোখ দুটো তার গোল আর লাল ; আড়ে দীঘে সে প্রকাণ্ড ; কিন্তু আকার আর চেহারার চেয়ে ভয়ঙ্কর তার কথা।

সদু খাঁ কথা কয় খুব আস্তে আস্তে, চাপা গলায় ; তার কথায় আর চেহারায় এমনি গরমিল যে তাহার কথা শুনিলেই ধাঁ করিয়া মনে হয়,—আগুন ধোঁয়াইতেছে।

বাস্তবিক কথাগুলো তার ধোঁয়ার মতই—যেন হালকা ; কিন্তু ভিতর হইতে কখন যে আগুনের জিব বাহির হইয়া আসিবে তাহারই দিশা না পাইয়া লোকে তাহার সামনে একেবারে কুঁচকিয়া যায়। যে কয়জন পেয়ারের মানুষ তার আছে, সদুর লোক বলিয়া তাহাদের দাপটও কম নয়, অথচ তাহারাই আবার তার সামনে শীতের ব্যাঙের মত গুটাইয়া থাকে।··

সদু খাঁ আগে গাঁওয়াল করিত—

মানে, কোমরের ঘুনসী, তামার তাবিজ, সুতোর গুলি, সুঁচ, টিনের আয়না, চিরুণী, কাঠের কৌটা, খেলনা—এই সব মণিহারী জিনিষ মাথায় করিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করিয়া বেড়াইত।··

তারপর সে স্নুরু করিল ফড়ের কাজ—

পাট, তিসি, সর্ষে, রাই, ধান, ধনে, গম, তিল, কলাই—এইসব যখনকার যা ফসল, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া দশ বিশ সের সংগ্রহ করিয়া আড়তে আনিয়া দিত।···

তারপর হইল সে ব্যাপারী—

মানে মহাজনের নৌকা পাট কি ধান বোঝাই হইয়া যায় মোকামে, সদু খাঁ সেই নৌকার আর মালের ভার লইয়া কর্তা হইয়া নৌকায় যাওয়া আসা করে।···

অতঃপর হাজার-মণে এক পালোয়ারী নৌকা কিনিয়া সে নিজেই মহাজন হইয়া গদিতে বসিল।…

পয়মন্ত লোক, দেখিতে দেখিতে পড়তা ফিরিয়া গেল। অনর্গল পয়সা হাতে আসিতে লাগিল।

কিন্তু লোকটার বজ্জাতি গেল না।

···সে হাটে যায়, বাজারের সেরা মাছটার চোয়াল ধরিয়া তুলিয়া অনর্থক জিজ্ঞাসা করে,—কত ?

জেলে বলে,—আড়াই টাকা।

সদ্দ বলে,—আড়াই টাকা? বেশ সস্তা ত! বলিয়া চাকরের হাতে মাছটা দেয়।

—বিদেশী যদি কেহ সেখানে থাকে, সে ভাবে, বুঝি সত্যই সস্তা সদুর কাছে; কিন্তু যে চেনে সদুকে সে মনে মনে হাসে; জেলে কাঁপিয়া ওঠে।…

সদু যাবার বেলা আটগণ্ডা পয়সা জেলের চুপড়ির ভিতর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়; যথা-লাভ মনে করিয়া জেলে তা-ই ট্যাঁকে রাখে।

সুদখোর নিধিরাম দত্তর ঘরে সেদিন আগুন লাগিয়া গেল।

এমন প্রায়ই হয়।

গ্রামের ছোট-খাটর মধ্যে এ-ও একটা ব্যবসা।

দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়া চালের উপর ফেলিয়া দিলে, আগুন লাগুক আর না লাগুক,—তার দাম এক টাকা।

খড়ের ভিতর জ্বলন্ত টিকে গুঁজিয়া দিলে—তিন টাকা।

ঘরের চার কোণেই আগুন দিলে—পাঁচ টাকা।

ঘরের ভিতরকার মানুষ বাহির হইতে না পারে এমনি করিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধছন্দ করিয়া আগুন দিলে—দশ টাকা।

সদু খাঁ ছিল এই-সবের সর্দার।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মস্ত ব্যবসাত্ বলিয়া চারিদিকে নাম পড়িয়া গেছে।

নৌকা হইয়াছে তিনখানা। ওদিকে ঢাকা, ওদিকে রাজমহল, ওদিকে কলকাতা পর্যন্ত তার মাল খরিদ-বিক্রী হয়।

দোতালা দালানও উঠিয়াছে, বিশটা কুঠুরী তার। বৈঠকখানা, ফরাস, তাকিয়া, গড়গড়া, ফুরসী, অম্বুরী তামাক, পিতলের বদনা,—সবই হইয়াছে। দাসী, বাঁদী, খানসামা,—তাও দশ বিশটার কম নয়। বিবিও জুটিয়াছে—গোটা পাঁচেক—সোয়া গণ্ডা।

বিবিদের মহাল সব আলাদা আলাদা। এক এক বিবির খাসে দুই দুই বাঁদী।

দাসী বাঁদী বিবি—সকলের গর্ভেই ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করিতেছে।…তিনচার বছরেই সদু খাঁর অত বড় বাড়ী নোংরামিতে আর গোলমালে জংলা পায়রার আড্ডাকেও ডিঙ্গাইয়া গেছে।

নৌকার ক্ষেপে ক্ষেপে সদু টাকা ঘরে আনে চার পাঁচ হাজার; কিন্তু একটি অভ্যাস সে কোনওদিন ছাড়ে নাই। একখানা না একখানা নৌকায় সে প্রতিবারে যায়ই; একবার এখানা, একবার ওখানা, এইরকম করিয়া তিনখানাতেই সে পালাপালি করিয়া বেড়ায়; সঙ্গে থাকে গোটা দুই দাসী, বাঁদী, আর তার কয়েল চৈতন্য। চৈতন্যর মত অমনধারা ভয়ঙ্কর পাকা লোক সহজে চোখে পড়ে না; ফি দাঁড়ির ঝুলে দেড়সের পর্যন্ত সে চুরি করিতে পারে, এমনি তার সাফাই হাত!—

কালিগঞ্জের বাজারের ঘাটে সদু খাঁর নৌকা গেরাপি করা আছে। পাটের গাঁট নামিয়া ঘাটেই কামানে ওজন হইয়া মহাজনের গুদামে উঠিয়া যাইতেছে।

বাজরের ঘাটের খানিকটা উত্তরেই স্নানের ঘাট।…

নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া ছাতি মাথায় দিয়া মালের নামা-ওঠা দেখিতে দেখিতে সেই স্নানের ঘাটের দিকে হঠাৎ চাহিয়া সদুর মনে হইল—বাঃ, বেশ বৌটি ত' !—

বিশ বাইশ বছরের একটি বৌ জল লইতে আসিয়া ঘোমটা একটু তুলিয়া সদুরই পাটের গাঁট ওজন করা দেখিতেছিল।...

রাঁধাবাড়ার জন্য সঙ্গে যে বাঁদী দুটি আসিয়াছিল তাহাদের একটাকে ডাকিয়া বৌটার পিছন ধরাইয়া দিল।

বাঁদী বৌ-এর বাড়ী চিনিয়া আসিয়া গোপনে সদুকেও সেই বাড়ীটা দেখাইয়া দিল।

সদু তার পরদিন হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক তার পাশের বাড়ীটাতে গিয়া উঠিল। বাহিরের উঠানে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই বাড়ীর লোকে সমাদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া জলচৌকির উপর বসাইল। বড় একজন কারবারী সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া তাহারা সদুর মুখ চিনিত ; তাই খাতির করিয়া পান দিল, তামাক দিল। কিন্তু তামাক খাওয়া সদুর ভাল করিয়া হইলই না,—হুঁকা টানিতে টানিতে সহসা দুটি গণ্ড বাহিয়া তার চক্ষের জল অবিরলধারে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।···বাড়ীর লোক অবাক হইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কাঁদছেন কেন ?

সদু বলিল,—কাঁদছি ভাই বড় কষ্টে। যাকে আর কোনোদিন দেখব বলে মনে আশা ছিল না, আল্লার দোয়ায় তাকেই আমি দেখেছি।

উপস্থিত সকলেই হাঁ করিয়া রহিল।

সদু বলিতে লাগিল,—তাকেই আমি দেখেছি, ভাই। সে আমার বোন। নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে গেল একটা বৌ ··হঠাৎ তাকে দেখেই আমার বুক ছাঁৎ করে উঠল, এ কাকে দেখলাম ; ঠিক আমার সেই মরা বোনটি, যেন বেহেস্ত থেকে ফিরে এসেছে ; তেমনি রূপ, তেমনি গড়ন, পা ফেলাটা পর্যন্ত ঠিক তারই মতন, একেবারে সে-ই।

বলিয়া সদু হুঁকা ফেলিয়া আরো কাঁদিতে লাগিল।

একজন বলিল,—ও-বাড়ীর জসিমের বৌ, সেই খুব সুন্দর।

সে-দিন ঐ পর্যন্ত—

সদু কাঁদিয়া কাটিয়া চলিয়া আসিল।

কিন্তু কথাটা জসিমদের কানে উঠিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তাহারা সদুর নৌকায় যাইয়া দেখা করিল ; বলিল,—যাবেন একবার মেহেরবানি করে গরীবের বাড়ী, বসে আসবেন।

তার পরদিন সদু দুই হাঁড়ি খাজা বাতাসা আর দুই হাঁড়ি জিলিপী লইয়া জসিমদের বাড়ী আসিয়া হাজির।

আদর আপ্যায়ন দস্তুরমতই হইল,—বোনের বাড়ী ভাই আসিলে যেমন হওয়া দরকার।

বোনের ছেলেটিকে কোলে লইয়া সদু আর ছাড়িতে চায় না, এমনি স্নেহ ! বোনের ছেলেবেলাকার গল্প, বড় হওয়ার গল্প, আর সুখ্যাতি যা করিল তা-ও ঢের।···

আরও হাঁড়ি চার পাঁচ খাজা বাতাসা জিলিপী ভাগনের নামে পাড়ার লোককে খাওয়াইয়া সদু নৌকা লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দিন পনর পরেই সদ্‌রর লোক আসিল জসিমের বাড়ী প্রায় শ-খানেক টাকার কাপড়-চোপড় লইয়া—

বোনের কাপড়, রুমাল ; ভাগ্‌নের কাপড়, জামা, জুতো, রাঙা ছাতি ; জসিমদের তিন ভাইয়ের কাপড়, জামা, জুতো, গামছা, ছাতি ; আরও মিঠাই হরেক রকমের। সংগে চিঠি আসিল—বোনের জন্য প্রাণ চব্বিশ ঘণ্টাই হু হু করে।

জসিমের বাড়ীতে রীতিমত চেঁচামিচি লাগিয়া গেল,—এ আহ্লাদ রাখি কোথায় ! এতগুলো—এই-সব একেবারে আমাদের।···

লোকে বলিতে লাগিল—যাক, এত দিনে জসিমের দুঃখ ঘুচল শালাকে পেয়ে। আর কোমরজলে দাঁড়িয়ে পাট পোঁচাতে হবে না—

কিন্তু এত পাওয়ার পাল্‌টা দেওয়া ত কিছু চাই-ই, তবেই মুখরক্ষা হয়,—কিন্তু জসিমদের অবস্থা, ভাত জোটে ত' নুন জোটে না মত,—কষ্টেসৃষ্টে সের পাঁচেক বাতাসা ছাড়া আর কিছুই পাঠান হইল না।

তবে ইহাতে জসিমদের আক্ষেপ করিবার কিছুই রহিল না। সের পাঁচেক বাতাসা পাইয়াই সদু এমন আরজ পাঠাইল, যেন সে সোনার খনির মুখ খোলা পাইয়াছে।

এমনি করিয়া লেন-দেনের প্রণয় চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন সদুর বাড়ী একটা বিবাহ কেমন করিয়া যেন আসন্ন হইয়া উঠিল।

জসিমের বাড়ীতে সদুর পিয়াদা চিঠি লইয়া আসিল ; আর আট বেহারার এক পাল্কী, জন দুই পাইক, এক দাসী আসিল বোনকে লইতে।

চিঠিতে লেখা ছিল,—

জসিম ভাই, আমার ছোট ভাইয়ের সাদি, অমুক তারিখে ; বোনকে অবশ্য পাঠাবে। সাদির আর আটদিন আছে—তোমরা তার দু'একদিন আগেই রওনা হয়ে আসবে, তাতে অমত বা অন্যথা করবে না।···

জসিমের বৌ পাল্কী চড়িয়া আগে পাছে পাইক্ পেয়াদা আসাসোটা লইয়া হুম্ হুম্ করিয়া সদুর বাড়ী আসিয়া পেঁাছিল। জসিমের ছোট ভাই কাসেম, পনর ষোলো বছরের ছেলে,—সেও সংগে আসিল।—পাল্কী সটান অন্দরের দরজায় আসিয়া নামিল ; দাসীর সংগে জসিমের বৌ ভিতরে চলিয়া গেল।

বিয়ে যেদিন হইবার কথা তার তিনদিন আগে সদু কাসেমকে ডাকিয়া বলিল,—বিয়ে এ তারিখে হ'ল না হে ; লোক সংগে দিচ্ছি, তুমি এখনকার মত বাড়ী যাও ; জসিম ভাইকে বলো, বিয়ের আগেই তারা ঠিক খবর পাবে।

কাসেম বলিল,—বৌ ?

—বৌ কিছুদিন থাকবে এখানে। তার ব্যবস্থা পরে করব।

কাসেম চলিয়া গেল।

কিছুদিন যাইতেই জসিমেরা বৌএর জন্য একটু ব্যস্ত হইয়াই উঠিল। তার

উপর, পরের বাড়ী যাইয়া এতদিন থাকা, হাজার দহরম মহরম কুটুম্বিতাই থাক, ভাল দেখায় না।

কাজ কামাই করিয়াই অবশেষে জসিম একদিন সদুর বাড়ী আসিল।—

জসিম সদুর বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া আছে, মনে মনে ভাবিতেছে, বাপ্‌রে কত বড় বাড়ী! এমন সময় বাড়ীর মালিক আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপ্যায়িত হইয়া জসিম একটু হাসিলও; কিন্তু ভুরু তুলিয়া সদু বলিল,—কি চাও?…যেন জসিমকে চেনেই না এমনি সদুর আল্‌গা ভাব।

জসিম ভাবিল, বড়লোকেরা বুঝি এইরকমই ঠাট্টা করিয়া থাকে; তাই আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল,—ভাই আমাকে চিনতে পারলেন না?

—না হে না, কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়?

সদুর রাগ দেখিয়া জসিমের মনে হইল, এ-টা বড় লোকের ঠাট্টা না-ও হইতে পারে। সে অবাক হইয়া গেল। একটু থামিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল,…আপনার নামই ত' সদু খাঁ?

—হ্যাঁ, আমারই নাম সদু খাঁ।

—তবে চিন্‌তে পারলেন না কেন বুঝতে পারছিনে। আমার নাম জসিম কারিকর, বাড়ী কালিগঞ্জ।

সদু বলিল,—কালিগঞ্জ চিনি বটে, কয়েকবার যাওয়া আসা করেছি; কিন্তু তোমাকে ত' চিনিনে। সে কথা মরুকগে—এখন কি দরকারে এসেছ এখানে?

জসিম বলিল, আমার স্ত্রী—

—পালিয়েছে বুঝি?

শুনিয়া জসিম যেন আর থই পায় না; সদুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,—আপনি তাকে নিয়ে এসেছেন—

সদু যেন আচমকা বাঘ ডাকিয়া উঠিল,—জেন্দার—

'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া ঝাঁকড়া চুল ঘুরাইয়া খিৎমৎগার জেন্দার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই জসিমের কোমরজলে দাঁড়াইয়া পাট পোঁচাইবার পরেও হাতে পায় যেটুকু বল ছিল তাহাও অবশ হইয়া গেল। জেন্দারের ভ্রমরের মত মিস্‌মিসে কালো তেলমাখানো দেহখানার দিকে চাহিয়া জসিমের জিবটা একটু নড়িয়া গলার মধ্যে হিক্কার মত একটা শব্দ হইল,—আল্লা হক্‌।

সদু জসিমের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া বলিল,—এই বেটা পাগল। বলছে, আমি ওর বৌকে নিয়ে এসেছি। বাঁদীর বাচ্ছার কান দুটো কেটে রেখে নদী পার করে দিয়ে আয়।

—'যো হুকুম' বলিয়া জেন্দার আগাইয়া আসিতেই জসিম ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল,—দোহাই হুজুরের, মা বাপ, রক্ষে করুন।

সদু বলিল,—যা তবে, আর পাগলামী করিসনে।

কেমন করিয়া খোঁজ পাইল কে জানে—

জসিম আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল ঠিক মানুষটির সামনে।…

অর্জুন নমঃশূদ্র। সত্তর বছরের বুড়ো।

ঘটনা সব শুনিয়া অর্জুন বলিল,—তুমি থানায় যাও; আমরা কি করতে পারি?

কিন্তু জসিম সে কথা কিছুতেই মানিল না ; বারবার সে একই কথা বলিতে লাগিল,—তোমরা একবার চলো সদুর কাছে, তোমরা বললেই সে আমার বৌকে ছেড়ে দেবে।

…বেচারা তখনো জানে না যে, সদু তার বৌকে নিকা করিয়া তাহারই ঘরে থাকে।

জসিম কাঁদিয়া কাটিয়া অর্জুনের পা ধরিতেই যায়।

অর্জুন বলিল,—চলো যাই, দেখে আসি, কিন্তু ব্যাপার অল্পে মিটবে না। তুমি তাকে চেন না।

জসিমের সঙ্গে অর্জুনকে দেখিয়াই সদু হাসিয়া বলিল,—কি বাবা রাম, হনুমান নিয়ে এসেছ ?

এই হইল তার প্রথম কথা।

…তারপর দুইপক্ষের অনেক কথাই হইল, চটাচটির মতই—

সদু এ-কথা বলিল না যে জসিমের বৌ তার বাড়ীতে নাই; আছে যে তাও বলিল না সে—কথাটি এড়াইয়া নবাগতদের সে এই কথাই কেবলই ধমকাইতে লাগিল,—মুসলমানে মুসলমানে আমাদের যা-ই হোক, তোরা তার মধ্যে কোথাকার কে ?…

জসিম ত' ভয়ে কথাই বলিল না।

তারপর শেষ কথা সদুই বলিল, জাত তুলিয়াই বলিল,—তোদের আক্কেল হয় জুতো খেলে : অনেকদিন বুঝি তা মাথায় পড়ে না ?

অর্জুনের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার বড় ভাইপো যুধিষ্ঠির তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল ; আনিবার সময় চেঁচাইয়া বলিয়া আসিল,—এ-মামলা মিটবে লাঠির ঘায়ে। খবর দিও কবে চাও।

সদুও চেঁচাইয়া বলিল,—আচ্ছা।

দু'পক্ষই জানিল, একটা মারামারি হইবেই।

যুধিষ্ঠিররা দলে প্রায় পঁচিশ জন। সবাই অর্জুনের সাগরেদ।

খবর পাঠাইলে আরও কিছু লোক পাওয়া যায়। কিন্তু অর্জুন তাহা হইতে দিল না! বলিল,—তারা দু'শোর বেশি ত' নয়।…

বাহিরের মধ্যে দলে রহিল কেবল জসিমরা তিন ভাই। তারাও কেবল দেখিয়ে। লাঠি তাহাদের ধরিতে দেওয়া হয় নাই।

মারামারির জায়গা ঠিক হইল, নমঃশূদ্রপাড়ার নীচেকার গোচারণের ঐ মাঠটা। সেটা কিন্তু সদুরই প্রস্তাব।—বোধ হয় তার ইচ্ছা ছিল, ইহাদের মারিতে মারিতে ঠেলিয়া বাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সেই ঝোঁকেই ঘর বাড়ী পর্যন্ত সাপাট করিয়া দিবে।

যুধিষ্ঠির একবার আপত্তি করিল ; কিন্তু অর্জুন বলিল,—না, ঐখানেই হবে।

দিন ধার্য হইল।…

ধার্যদিনে উহারা আসিল। গুনতিতে দু'শো হইবেই, তার বেশি ছাড়া কম নয়।

ইহারা মাত্র বাইশ জন। বাইশটি ঋজু সুগঠিত বৃষের মত সুদৃঢ় দেহের প্রত্যেকটি অংশে দুর্জয় সংযত শক্তি; আপাদমস্তকে কোথাও জড়তা নাই।—সকলেরই গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে রক্তাম্বর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে একখানা করিয়া চারহাত লম্বা লাঠি।

সবাইকে একত্র করিয়া অর্জুন বলিল,—তোরা খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে যা, আমি আসছি!...বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিল।

সেখানে মাটিতে চাপিয়া বসিয়া মিনিট পাঁচেক চোখ বুঁজিয়া থাকিয়া, তারপর 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যখন সে চোখ খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তার সে পূর্বের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেছে।—এখন সে যেন শিবের সংহার-মূর্তি।

এইবার সে বাহিরে আসিল। সচরাচর যেন চলিতে পারে না, এমনি সে জবুথবু; কিন্তু এ-সময়ে যেন রক্তের গন্ধে সে ছুটিয়া চলে। তার হাঁকে বাঘেরও পিলে চমকায়, এমনি গলার বেগ!—তার লৌহকঠিন পেশীবর্তুলগুলির তরঙ্গের শৃঙ্গে শৃঙ্গে তটে তটে—তাদের সঞ্চরণে আকুঞ্চনে সম্প্রসারণে যেন রুদ্রের তেজ নাচিতে থাকে!...

'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিয়া অর্জুন বলিল—সঙ্গে আয়।—বলিয়াই হাঁক ছাড়িয়া মাঠে যাইয়া পড়িল।...

তারপর যে কি হইল তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারিব না।—

...এক একটা ঝড় এমনি আসে—খালি একটা সোঁ সোঁ শব্দ; অন্ধকারে হঠাৎ চোখ বুঁজিয়া যায়; চোখ খুলিয়াই দেখি, হাত-পা ছেঁড়া গোটাকতক মানুষ পড়িয়া আছে, চোখের সামনে আর সব ফাঁকা......সেইরকমই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল চক্ষের নিমেষে।

মারামারি যখন থামিল, তখন সেই বাইশজনেরই মনে হইল, কতকাল পরে তারা যেন মাটিতে ফিরিয়াছে।

অর্জুনরা কজন ছাড়া মাঠে তখন আর কেউ নাই। জসিমরা তিন ভাই দূরে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

* * *

জসিম তার বৌকে ফিরিয়া পায় নাই।

বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই।

## "* *পয়োমুখম্"—

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে; কিন্তু কলাপই বলুন, মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমনি ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।...মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।......

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আরম্ভে একটু বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

……সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তার নিজের অলঙ্কারের কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্তু হইয়া ওঠে নাই।—

তা না হোক……

মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয় ; আর, ভগবান গৃহ-বিবাদে সালিশী করিতেও বসেন নাই যে, মামলা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! কিন্তু মেধা না থাকার পিছুটানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আর হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা হয় না।

……তাই ষোলো-সতর বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই—সম্মত হইয়াছে।……

শুভস্য শীঘ্রম্—

সেইদিনই কাঠের সিন্দুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুগ্ধবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দু'খানাকে চিনিত—

তাহাদিগকে উঠানের রৌদ্রে পিঁড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুসী হইল না।—

……বই দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফস করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিল, তার মান কেহ রাখিল না।……

কথাটা কানে যাইবার পর কৃষ্ণকান্ত বক্রদৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—

ভূতনাথ সরিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।……

এবং সে অবসর তখনই মিলিল।……

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে দেখছি—ঠিক সেইরকম।—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি রকম ?

—এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—

—কে ?

—কোনো গেরস্ত। একটা গল্প বলছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আনতে। দোকানী দিলে ; ছোঁড়া গুণে বললে,—মোটে পাঁচখানা ?—দোকানী ক্ষেপে উঠে বললে—পাঁচখানা নয় ত' কি পঁচিশখানা দেবে ? ঘিয়ের দর জানিস আজকাল ?… ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে চলে এল।…বাড়ীতে বললে,—কিরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা

এনেছিস এক পয়সায় ? ছোঁড়া বললে,—তাই দিলে, মা। বললুম, তা দোকানী তেড়ে উঠল ; বললে,—ঘিয়ের দর জানিস আজকাল ?···শুনে গিন্নির হাত গালে উঠে গেল ; অবাক হ'য়ে বললেন,—কি বজ্জাত দোকানী গো ! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কি !...বলিয়া তুমুল শব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ভুতোর বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মত, কার্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতার উদ্দেশ্যে স্বামীর এই বিদ্রূপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন,—কি, করেছে কি ?

—বলছে, পড়ব কবরেজী, তাতে ব্যাকরণের কি দরকার !

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন,—আয়ুর্বেদশাস্ত্র খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত... ব্যাকরণের পর সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি ; তারপর শাস্ত্র—

ভূতনাথ মনে মনে বলিল,—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন—ভূতনাথের কচুর কথাটা টেরও পাইলেন না ; বলিতে লাগিলেন,—কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে দরকার। ইত্যাদি।

দরকারী কথার কত ভাগের কত ভাগ তার কানে গেল তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিতে পারিল না।—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ হইতেই সেদিককার কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেল। ··

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে মাঝে মায়ের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছের পাতা, ও-গাছের মূল, এ-টার ছাল, ও-টার কুঁড়ি, এই নিয়ে ত' কবরেজের কারবার ; তা করতে মুগ্ধবোধ পড়ে কি হবে ?—বলিতে বলিতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তার সর্বশরীরে প্রকাশ পায়।

মাতঙ্গিনী বলেন,—আমি ত' কিছু জানিনে রে।···

যাহা হউক, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিল ;—এবং পবিত্র শাস্ত্রসৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া জীবনের এমন একটা দরকারী কাজ শেষ করিয়া আনিল যাহার ফল প্রতিফল দুটোই নিরেট।···দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্বণের চাইতে তা ঢের সংক্ষিপ্ত ও সরস,—

উদ্দেশ্যও উচ্চদরের—

শুধু সানাতন শাস্ত্রীয় প্রথায় নরকনিবারক পুত্রলাভ।···ভূতনাথ বিবাহ করিল ; তখন তাহার বয়স সতর বৎসর কয়েকমাস মাত্র—

স্ত্রী মণিমালিকা ন' বছরের—

পণ সর্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না······

বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন···বৈবাহিকমহলে

প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রীগোলকরুষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র…ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে।……আরো বলিলেন,—দু'তিনটি পাশকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্বেদের দিকে দেশের নাড়ীর টান যথার্থই ফিরিয়াছে; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না; দু'তিন বছরেই—ইত্যাদি।…

তাই সাতশত টাকা পণ।

রুষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত, রসায়ন, অরিষ্ট, আসব……বিবিধ রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। রুষ্ণকান্ত কাছে-কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান।…পথে আসিতে আসিতে বুঝাইয়া দেন—রোগলক্ষণ; কোন রসাধিক্য কোন রোগের হেতু, কী ভাবে তার বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি।…পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ুর কোনটা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কিভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।…এমনি সব ভূয়োদর্শনের কথা।—

ভূতনাথ গাছগাছড়া, ফলমূল কিছু-কিছু চিনিয়াছে; তাহাদের গুণাবলী ও প্রয়োগ-বৈচিত্রের সঙ্গেও কিছু কিছু পরিচয় ঘটিতেছে।……

মণি ছোট্টটি—

স্বামীর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে রাগায়, কাঁদায়, আবার খিল খিল করিয়া হাসায়ও।…… মাঝে মাঝে মণি যখন বাপের বাড়ীর কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সদুপদেশও দেয়; বলে, এই তোমার আপন বাড়ী।

কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না;—বলে,—ধেৎ। এ ত' তোমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী—

ভূতনাথ বলে—তা বটে। কিন্তু তুমি যখন বড় হবে তখন বঝবে, সে-বাড়ী তোমার দাদা-বৌদির, এই বাড়ীই তোমার; তারপর ছেলেপিলে হ'লে—

মণি এবার লজ্জা পাইয়া হাসে…

বলে,—ধেৎ।

মণির দু'বারকার দু'টি ভর্ৎসনার কত তফাৎ ভূতনাথ, তা বোঝে—

খুসী হইয়া উঠিয়া যায়।

•

ভূতনাথের ছোট ভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে,—তুমি বৌদি না ছাই। বলিয়া বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে,—বললুম, দুটো আম ছাড়াও, নুন লঙ্কা মেখে খাই; তখন কথাই কওয়া হল না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়াগের হাসি হচ্ছে। এই বয়সেই শিখেছ ঢের!…

মণির কিন্তু মনেও আসে না'যে, এই বয়সে দেবনাথও শিখিয়াছে ঢের!

—বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছিগে। বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণির জ্বর হইল—

উজ্জ্বল মণি ম্লান হইয়া গেল।...

কৃষ্ণকান্ত নাড়ী দেখিয়া বড়ি দিলেন; তাহাতে জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইল না···

শেষরাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দুটার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়া গেল।······সীঁথিভরা সিঁদুর লইয়া লালপেড়ে সাড়ী পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—

মাতঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—হ্যাঁ গা, এক ফোঁটা ওষুধও ত' দিলে না······

কৃষ্ণকান্ত বড় বিজ্ঞ; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভংগী করিয়া বলিলেন,—দিলেও ফল হত না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি—

আয়ুর্বেদের এই চরম দিব্যদৃষ্টির বিষয় মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকান্তের এতদিনের স্ত্রী হইয়াও বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।···চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছিবার নয়...

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে······

'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মত অনুক্ষণ সে পায় পায় ঘুরিত।···সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন।···মণির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিত······এই ম্লান, এই উজ্জ্বল······পরক্ষণেই 'মা' বলিয়া ঘেঁষিয়া আসিত······

মাতঙ্গিনীর বুক ফাট্ ফাট্ করে।—

ভূতনাথও কাঁদিল বিস্তর; কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মত অসহ্য হইয়া রহিল।······

সংসারে শোকতাপ আছেই—

আবার "ভগবদেচ্ছায়" মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে।······দিন দিন দূরত্ব বাড়িতে বাড়িতে মণির শোক কৃষ্ণকান্তের "ভগবদেচ্ছায়" গৃহ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।······

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিল।—

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন,—স্বয়ং শিব দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন।······কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কি না তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।—

এবার পণ, পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা··· কিছু লোকসান গেল।

মণি মরিয়া পাত্রহিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে; বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—

কিন্তু বৌটি এবার আরো ভাল······

চমৎকার একটা সুহাসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে—

যেন "বালার্কসিন্দুরশোভিত" ঊষা,······সেইদিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর চোখের পলক পড়িতে চাহে না...অনুপমা শ্বশ্রূর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।—

মাতঙ্গিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া যান······যেন তাঁর চতুর্দিকেই খর রৌদ্র······তার ঝাঁঝে চক্ষু পীড়িত হইয়া ওঠে······তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারম্বার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিল—

তাই একদিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া মাতঙ্গিনী মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন ; কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়াইয়া গেল।······

বৌমার খাসকামরায় যাইয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৌমা, তোমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না বাপু।

—অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানিকে আর চোখের আড়াল করছিনে...

কিন্তু বৌমা অন্তর্যামিনী নয়।—

শ্বাশুড়ীর অভিলাষ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দু'টি তুলিয়া সোজা মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিল এবং মাতঙ্গিনীর আশা-আকাঙ্খা-আহ্লাদ ঘূর্ণীবায়ুর মত আবর্তিত হইতে হইতে কোথায় যে মিলাইয়া গেল তার চিহ্নও রহিল না।····· সে দৃষ্টির অর্থ যে কি···প্রাণভরা কিন্তু অপ্রকাশিত আশার পরেই এ যে কত কঠিন নিরাশ্বাস··· উগ্র মনের কতখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিষ্পলক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে···তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অংগুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুত্তলী।—

মাতঙ্গিনীর প্রাণ বধূর সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল······

মাতঙ্গিনী সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—কিছু মনে করো না, মা ; তোমার মুখখানি—

কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

একান্ত আপনার জ্ঞানে নূতন বধূর প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভরা সোহাগের আরো কত কথা বলিবার ছিল—

পাষাণী তাহা বলিতে দিল না।

মাতঙ্গিনীর মনে হইল, আশাভংগের এই ব্যথাটা তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবেন না।······কিন্তু ভুলিলেন ; এবং ভুলিতে তাঁহাকে জন্মান্তরে পৌঁছিতে হইল না।······দিন তিনেকের মধ্যেই তাঁহার মাতৃহৃদয় অজ্ঞান সন্তানের সুকঠিন অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদার অংগনে বরণ করিয়া লইল।—

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে।......পিত্ত, বায়ু,

কফ—ইহাদের কোন্‌টার প্রাবল্য কোন্ নাড়ীতে প্রকট হয় পিতার উপদেশে তাহাও যেন সে অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।—

কিন্তু অনুপমা নাক সিঁট্‌কায়—

বলে,—কব্‌রেজী পড়ে' কি হবে শুনি ?

ভূতনাথ বলে—কব্‌রেজী ত' আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে। পয়সাও—

—তা জানি। কলকেতায় গিয়ে বসতে পারবে ?

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে ; বলে—দেশেও ত' বেশ পয়সা আছে।

—আমাদের সেই বনমালী কব্‌রেজের মত কব্‌রেজ হবে ত' ? তার ত' নেংটি ঘোচে না। আমরা তাকে বলি বোক্‌রেজ মশায়।—বলিয়া অনুপমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে।

ভূতনাথ মর্মাহত হয়—

কবিরাজীকে সে নিজেও বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না ; জঙ্গল কাটা আর শুকনো কাঁচা জঞ্জাল জড়ো করা কবিরাজী যে হালফ্যাসনের খুব বড় একটা গর্বের জিনিষ ইহাও সে মনে করে না ; তবু কবিরাজই সে হইবে……অদৃষ্টের লিখন তাই—

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিরাজীর প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া সে সত্যকার ক্লেশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মণি নয়—

অনুপমাকে ধমক দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।……

অনুপমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে ; ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে।… অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—তোমার নাম রেখেছিল কে ?

—বাবা রেখেছিলেন।

—নামের মানে ত' মহাদেব, নয় ? বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া যায়।……

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তামালার মত দন্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট…

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।……

ঠিক সে ধরিতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের দুয়ারে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পেঁছায়……অন্তরের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ন কাঁটার মত একটা ব্যথা ফোটে… কাহার প্রচ্ছন্ন কায়ার নিষ্ঠুর একটা কালো ছায়া বুক জুড়িয়া পড়ে……চারিদিক অশ্রু-কলঙ্কে মলিন হইয়া ওঠে……

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে ; ধরা গলায় বলে,—আসি এখন।

অনুপমা বলে,—দন্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি ? তা এস।

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন—

তাঁর সর্বজ্ঞ মাতৃহৃদয়ের কাছে ভিতরের অনন্ত দুঃখের বার্তাটি ষোলো আনাই আসে…

মনটি তাঁর লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে…

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিন্ধুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করো। ওঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই ; হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনোফা হয়েছে।…তাঁর তখনকার তৃপ্তিটুকু উপভোগের জিনিষ—

দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিল ; মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিয়া উঠিল,—মণি-বৌই ছিল ভাল ; এ একটা কি এনেছ দাদাকে বিয়ে দিয়ে ! ভুরু তুলেই আছে ! দেমা—

কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকারচর্চা বন্ধ হইয়া গেল।

পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তের মুনাফার টাকা পর বৎসরই ঐ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেল।…

অনুপমার জ্বর হইয়াছে—

জ্বর অল্পই…

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুড়িয়া, কিল ছুড়িয়া, কাঁদিয়া, বায়না লইয়া, বাটী আছড়াইয়া, ঔষধ, পথ্য ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যেন লজ্জা-সরম আর সহিষ্ণুতা বলিয়া সংসারে কোন জিনিষই নাই।……তাহার কাছে ধমক না খাইল এমন লোক নাই…মাতঙ্গিনী পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন…ভূতনাথ চড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল · দেবনাথের দিকে ত' সে পা-ই তুলিল।—

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া জ্বর ছাড়িয়াছে ; অনুপমা অন্নপথ্য করিয়াছে ; কিন্তু সেইদিনই ভোররাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ তার ধাতু বসিয়া গেল।…অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া ; অনুপমা মরিল, অজীর্ণরোগের উপর জিদ্‌বশে অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থ করিয়া।……মাতঙ্গিনী কাঁদিলেন, ভূতনাথ কাঁদিল, দেবনাথও কাঁদিল ; কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার চক্ষু-মার্জনা করিয়া শোক-চিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—বড় জেদী একগুঁয়ে মেয়ে ছিল, ভাই……

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।

মণি তার যৌবনের সহচরী হইয়া উঠে নাই……সে ছিল খেলার সামগ্রী, স্নেহের জিনিষ, মিষ্ট দৌরাত্ম্যের পাত্রী।—

অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন দিন অপর্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে রক্তে দুর্নিবার জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।……অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার

খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত… চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিত তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মত রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মত যৌবন……তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের দিগন্ত পর্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে।…

ভূতনাথের কলাপ, মুগ্ধবোধ এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আলমারীতে যাইয়া উঠিয়াছে।……এখন সে পুরাপুরি একজন কবিরাজ।—

কিন্ত বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন-দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন ; এইভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্জনার ভাব থাকিবে না—এ ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।…

…স্ত্রীই হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেরা ; একটির নিপাতেই সে-সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।……

আগেকারটা ?—সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

…চলাচলম্ ইদং সর্বম্—মরিবে ত' সবাই, দু'দিন আগে, দু'দিন পরে।……মূর্খ আর বলে কাকে !……স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা !……এই সৌখীন সন্ন্যাসের ভাণ আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক, তেমনি অসহ্য।……মানুষ মরে বলিয়াই ত' পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয় ; নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত !……

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিঃস্পৃহ।

ধিক্কারে, ভর্ৎসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুনয়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।—

প্রত্যুত্তরে ভূতনাথ বলে,—বাবা, আমায় মার্জনা করুন ; বিবাহে আর আমার রুচি নেই ; বরং দেবনাথকে ধরুন ; সেই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ পূর্ণ করবে।…

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাহুল্য ; কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার জানেন।……তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিয়া দেবনাথকে ধরিতে তাঁর আপাততঃ তেমন আগ্রহ নাই—নানা কারণে। · …দেবনাথের বিবাহের পরই ভূতনাথের বিবাহোদ্যম এ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতঃ দৃষ্টিকটু না হইলেও, ভূতনাথই অবশেষে আপত্তির এই অতিরিক্ত কারণটা দেখাইয়া যখন তখন বিরুদ্ধ দিকে জোর করিতে পারিবে।……

তারপর, এই কারণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে। দুইটি স্ত্রী মারা গিয়াছে, তারপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ……বয়স বেশী না হইয়াই যায় না ; এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো করিবার জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে।……

সুতরাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপত্নীক অবস্থায়

থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।—

তারপর বলিলেন,—এ ত' নির্বোধেও জানে।

দ্বিতীয়তঃ, ভূতনাথের গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য আজকাল ক্রমশঃই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এইবেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে।......

তৃতীয়তঃ, শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য একটা ধর্ম হইলেও, সেইটাকেই জীবনে স্থায়ী করিয়া লইয়া প্রাণপণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ-ব্যবস্থা গো-মূর্খেও দিবে না।......

চতুর্থতঃ—যাক, উহারাই কি যথেষ্ট নহে ?—

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না।

যম তাঁহাকে দু' দু'বার দাগা দিয়াছে—

তাঁর বধূ-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্খাটি সেই নিষ্ঠুর উপড়াইয়া লইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে·· সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বস্তুটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপে।···নিজের ক্লেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন···সে বুঝি ,অসুখী হইবে। .....

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিল,—যা ইচ্ছে করুন······

বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেল।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল।—

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল—

দু' দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দু'টিকেই ঘরে তুলিলেন।......

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।—

বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দু'টি আর ভ্রূযুগল ; ভুরু দু'টি টানা টানা ; চক্ষু দু'টি আবেশে ভরা।—

মাতঙ্গিনীর নিজের সুখদুঃখ কোনোদিনই তাঁর অন্তরের একান্ত নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই,···জলের উপর পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেমনি করিয়া মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ সংসার-পাথারের বুকের উপর ভাসিয়া বেড়ায়···পাথারে ঘা লাগিলেই তাঁর বুক দুলিয়া উঠে।—

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না—

স্বামী তৃপ্ত হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অম্লানবদনে তাই তিনি বীণাপাণিকে তেমনি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন ; এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।······

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—বৌ কেমন হয়েছে গো ?

মাতঙ্গিনী বলেন, লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে—বিগত দু'টির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।···একটা গল্প তাঁর মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি······

কিন্তু গল্পটি তাঁর বলা হয় না ··· মাতঙ্গিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছোট্ট একটি অস্ফুট শব্দ তাঁর কানে আসে।—

দেবনাথ বলে,—এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দু'টো ভালো ছিল না।···একটু থামিয়া আবার বলে,—প্রথমটা ছিল নেহাৎ ছোট, গরজ বুঝত না। তারপরেরটা ছিল বদমেজাজী। এইটে বেশ······

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছাঁৎ করিয়া ওঠে ; বলেন,—বেশ কিসে রে ?

—কথায় বার্তায় আলাপে আদরে বেশ।

শুনিয়া, প্রখর মধ্যাহ্নের উপর মেঘের চঞ্চল ছায়ার মত, মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর দিয়া কিসের একটা সুখকর সুশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়।···কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চমকিয়া ওঠেন।···সারাজীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্বেই তাহাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন · তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আজিও তেমনি জাগ্রত···মাতৃ-হৃদয়ের সে-ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই।···প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে।···কিন্তু এ যে কথায় বার্তায় আলাপে আদরে বেশ ! -

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইত—

তার ঘোমটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত—

কত খেলা, কত আমোদ, কত কৌতুক।······

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিত, হঠাৎ দেখা দিত। নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনীয় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইত।

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে···ঝড়ের পর ঢেউ আপনি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।—

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্বে দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন ; স্ত্রী দু'টিই সুন্দরী ছিল।—

সে কালো।—

মাতঙ্গিনী দুরু দুরু বুকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তাঁর মনের দুশ্চিন্তা মনেই পরিপাক পাইতে পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া

শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।···বলেন,—সব জানো ত' বৌমা, আগেকার কথা ?

বীণাপাণির বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে,—জানি, মা।···তারপর মনে মনে বলে, আমি যে কালো।—

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কি করিয়া টের পান বীণাপাণি তা জানে না ; তার মুখচুম্বন করিয়া বলেন,—মা আমার কালো ; কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।

এটা সান্ত্বনার কথা—

শ্বাশুড়ীর এই মমতার্দ্র ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে ; হাত বাড়াইয়া শ্বশ্রুর পায়ের ধুলো লইয়া বলে,—তুমি ভেবো না, মা······

মাতঙ্গিনী অবাক হইয়া যান—

তাঁর লুক্কায়িত উদ্বেগ কি করিয়া বধূর কাছে ধরা পড়িল !···

আশীর্বাদ করেন,—জন্ম এয়োতি হও।

মণি শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিত—কতক ভয়ে, কতক কৌতুকে ; মনের কথা সে বুঝিত না ; কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিল, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইত।··· মাতঙ্গিনী বকিয়া ঝকিয়া পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন।···মণিকে তিনি আপন পেটের অবোধ সন্তানের মত ভালবাসিয়াছিলেন।—

অনুপমা প্রকাশ্যে একবারে হাতে-কলমে পায়ে না ঠেলিলেও, আমল প্রায়ই দিত না। ···দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড় ছিল না।···তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—পুত্রের প্রিয়তমা বলিয়া।...অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, বধূকে পাইয়া পুত্র এক হিসাবে চরিতার্থ হইয়াছে।—

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম—

অতিশয় শান্ত, অথচ এমন তীক্ষ্ণধী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না—কি করিয়া অতটুকু মেয়ে তাঁর মনের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায় !—

মাতঙ্গিনী পরের হাতের সেবা কখনো পান নাই। সেবা কি মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন।—

অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে।···এ বসায় কলরব নাই, উন্মাদতা নাই, বিক্ষোভ নাই ; জয়-পরাজয়ের শঙ্কার নিঃশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে · এ বসা শুধু একটা রসঘন নির্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।—

ভূতনাথের পসার হইয়াছে—

কিন্তু সব জিনিষেরই "মূল্যাদি" অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াই সংসারের 'নাই নাই' রবটা যেন থামিয়াও থামে না।··

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মণিঅর্ডারে টাকা আসে ; কে পাঠায়, কেন পাঠায়, কে জানে ; কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকান রহিল না।……

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিল—তাঁহার পরিবর্তে তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিল না…রোগ বড় কঠিন—

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাল্কীতে যাইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার পাল্কীও দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, মণিঅর্ডার আসিয়া পড়িল।—

বীণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা।—

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়নকালেই স্থূল ছিল; কিন্তু আজকাল অন্ততঃ বহিরাবরণ ছিন্ন করিবার মত ধারালো হইয়াছে।…টাকা দশটি পুরোভাগে রাখিয়া হুঁকায় দু'টি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।…রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে মাসে জরিমানা দিতে হইতেছে।—

…এবং এই ব্যাপারের সুরুর সুদূর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিল না… অপরাজিতাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ আহরণ করিয়া নিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে সংযত রাখিতেছেন।……

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ংকর সন্দেহ ধীরে ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল।……কি হেতু অবলম্বন করিয়া অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা দুরূহ হেঁয়ালির মত; অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য, যেন নিজেই তৈরী হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের পাল্কী অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিল; এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্দরে না যাইয়া হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিতে করিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই এমনভাবে থম্‌কিয়া গেলেন যেন চুরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।—

ভূতনাথের কোলের কাছেই দশটি টাকা সাজান' রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নাম-সম্বলিত কুপনখানাও রহিয়াছে……তাহারাই এই মহৌষধির কাজ করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিল,—শ্বশুর আপনাকে দশটা টাকা পাঠিয়েছেন। কেন?

কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন—তর্‌ তর্‌ করিয়া বলিয়া গেলেন,—তোমাকে বোধ হয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার 'কথা, যে শ্রীমানের বড় টানাটানি; তাই বুঝি তিনি মেয়ে জামাইকে—

বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অত সুলভে নিষ্কৃতি পায় না—

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেমনি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেল।……তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যাকথাগুলির বিনাশ কিন্তু অত সহজে ঘটিল না……তাদের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতি-

মুহূর্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভুতনাথের কর্ণবিবরে আবর্তিত হইতেই লাগিল।

ভুতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না; ভুতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরামবাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্টভাষায় ধাপ্পাবাজ অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা ল্যাঠি উল্টাইয়া ধরিলে কোৎকার মত একই জিনিষ।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সংগে বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন।···জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যাদাতা পিতা সম্পর্কে হইল বড়—আর তারই স্বার্থ হইল বড়!······ অমন ছেলের—ইত্যাদি।···অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আওড়াইয়া দিলেন।

মূর্খ পুত্রের জন্মদাতার যত কষ্ট সব সেই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।—

বীণাপাণির জ্বর।

জ্বর অল্প; কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে;······আকুলিব্যাকুলি কেবলি মধুসূদনকে ডাকিয়া ডাকিয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে।......

আর দুটি এমনি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষক দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে; মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাহাকে কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন; তাহাকে পথ্য দিয়া এইমাত্র উঠিয়া গেছেন।

—বোমা, কেমন আছ? বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,- ভালই আছি, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—কিছু খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—কখন?

এখুনি খেলাম।

—তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো। বলিতে বলিতে কাপড়ের খুঁটের আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন,—জ্বর যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাবে; আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। এই খাটের পায়ার কাছেই রইল কাগজঢাকা; নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো'।

বীণাপাণি কহিল,—আচ্ছা।

ভুতনাথ কোথায় ছিল কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহির হইয়া যাইতেই সে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—বাবা এসেছিলেন দেখলাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন?

বীণাপাণি বলিল,—হ্যাঁ। কেন?

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিল না।

—খাওনি ত'?

বীণাপাণি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।......এ ব্যাকুলতার অর্থ কি ?..... বলিল,—না। কেন বলো না ?

—কোথায় সে ওষুধ ?

খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দেখো।

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া সট্‌কা টানিতেছিলেন—

কিন্তু এ-সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিল না।......

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন—এমনি অপরিসীম ত্রাসে তাঁর সর্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবী আর্তনাদ বাহির হইয়াই কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিল।......

ভূতনাথ সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না ; একটু হাসিয়া বলিল,—এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মর্‌ল' না, বাবা।......পারেন ত' নিজেই খেয়ে ফেলুন।...বলিয়া সে ঔষধসমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

## তৃষিত আত্মা—

সীতাপতি মারা গেলেন বড় হঠাৎ।

খামার-বাড়ী হইতে বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া মণ্ডপ-ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া যখন তিনি ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন তখনো তাঁর শরীরে বাহ্যিক কোনো গ্লানি ছিল না ; তামাক সাজিয়ে আনিতে যে অত্যল্প সময়টুকু লাগিল তাহারই মধ্যে কোথায় যেন কি হইয়া গেল বোঝা গেল না। ভৃত্যের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়াই প্রথমে তাঁর হাত, পরে সর্বাংগ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হস্তচ্যুত হইয়া হুঁকা পড়িয়া যায় দেখিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি হুঁকাটি লইয়া লোক ডাকিতে ডাকিতে সীতাপতিকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল ; সীতাপতি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুত্রপরিজন-পরিবেষ্টিত সীতাপতি স্বর্গারোহণ করিলেন।

যে বহুকাল রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার মৃত্যুতে তাহার অধিকৃত স্থানটিই কেবল শূন্য হইয়া যায়—সে যেন নিশ্চিত এবং নিঃশেষ অনুপস্থিতি ; কিন্তু, যে-মানুষ এই ছিল, এই নাই, সে কাছে না থাকিয়াও কোথায় যেন থাকে ; তার অভাবে গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, প্রত্যেক অংগন, প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক মোড়, প্রত্যেক অংশ—গৃহের সমগ্র মর্মস্থলটিই যেন শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকে ; ঠিক সেই কারণেই আবার জীবিতের সচকিত ভীতির অন্ত থাকে না,—ঐ বুঝি সে আসনে বসিয়া, ঐ বুঝি সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—এমনি ভুল সহস্রবার ঘটিয়া মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া মৃতের দৈহিক অস্তিত্বের মৃণালটুকুর নিশ্চিহ্নরূপে ও নিঃশেষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে বহু বিলম্ব ঘটে।......

এটা বোধ হয় সাধারণ। কিন্তু সীতাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুর পর পুত্রবধূ লক্ষ্মীর প্রাণে যে-আতঙ্কের সঞ্চার হইল তাহা যেমন দুঃসহ প্রবল, তেমনি নিরেট, অব্যক্ত ; তাহা মুখ ফুটিয়া পরের কাছে বলিবার নয়, নিজেরই মনের সঙ্গে সে-কথা লইয়া বুঝি তর্ক করাও চলে না।

প্রথম রাত্রি তার নির্বিঘ্নেই কাটিল।

দ্বিতীয় দিন স্বামী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মৃৎপাত্রে বায়সভোজ্য ক্ষীরোদক দিতেছেন,—তিন মাসের শিশুটিকে কোলে করিয়া অদূরে বসিয়া উদকদান দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর সহসা আশ্চর্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া গেল—সে দেখিল, উদকাধারের ঊর্ধ্বস্থিত বায়ু যেন জৈবিক একটা আকার ধারণ করিতে করিতে একখানা স্বচ্ছ অথচ সুস্পষ্ট মুখাবয়বে রূপান্তরিত হইয়া শূন্যে ভাসিতে লাগিল ; আর সে মুখখানা—

লক্ষ্মী সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল ; ক্রোড়স্থ শিশু কাঁদিয়া উঠিল ; পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া লক্ষ্মী দেখিল মুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহার পর দিনমান নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু লক্ষ্মীর প্রাণের উপর যে-ছায়াপাত হইয়াছিল সেটা মুছিল না।

সন্ধ্যা অজ্ঞাতলোকের সমস্ত প্রচ্ছন্নতার কুহক পীড়ন লইয়া ঘনাইয়া আসিল ; আবছায়া অন্ধকারের দিকে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেও ভয়ে লক্ষ্মীর গা ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল।—পল্লী-আবাসের চতুর্দিকের অনিবিড় বিস্তৃত জঙ্গল অন্ধকারের বাঁধনে একাকার হইয়া ক্রমে জমাট কঠিন হইয়া উঠিল ; তার ঊর্ধ্বেই আকাশের খানিকটা নক্ষত্রের দুর্বল আলোকে আর বাষ্পের আবরণে রহস্যগভীর ; দীর্ঘদেহ নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের শ্রেণীর মাথাগুলি দুলিয়া-দুলিয়া পাতায় পাতায় একটা সির্ সির্ শব্দ উঠিতেছে—যেন কাদের কানে কানে ফিস্ ফিস্ কথা। বাড়ীর উত্তরকোণে ঘনপত্র বৃহদাকার একটি গাবগাছ—তাহার সর্বাঙ্গে জোনাকি হাজারে হাজারে অদৃশ্য জীবের অসংখ্য চক্ষুর মত টিপ্ টিপ্ করিয়া নিবিয়া-নিবিয়া জ্বলিতেছে ; আলোকের ঐটুকু স্পর্শে সেইস্থানের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আছে ; সে যেন কি বলিতে চায়—কিন্তু না বলিতে পারিয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতায় হাঁপাইতেছে।

লক্ষ্মীর স্নায়ুকেন্দ্র নিরতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া এই নিঃশব্দ অন্ধকারে ভিতর হইতে গুপ্ত অথচ অবিশ্রান্ত একটি চঞ্চলতার আঘাত গ্রহণ করিতে লাগিল।—প্রত্যেক অলক্ষিত স্থানেই যেন একটা অতীন্দ্রিয় গতিবিধি চলিতেছে ; কি একটা যেন গা-ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে—সে ছায়া নয়, বস্তু নয়, অথচ যেন তা ছায়া, বস্তু দুই-ই ; ঐ সে সরিয়া গেল, ঐ সে অগ্রসর হইতেছে, ঐ দেখা যায়, ঐ মিলাইয়া গেল—এমনি একটা লুকোচুরি লক্ষ্মীর চোখের সামনে অবিরাম চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে যাইয়া শ্বশ্রূর গা ঘেঁষিয়া বসিল। কিন্তু সেস্থান হইতেও ওদিককার শুইবার ঘরখানার ভিতর পর্যন্ত তাহার চোখে পড়িতেছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সেখানেও একটা নড়াচড়া, চলাফেরা, উঁকিঝুঁকি চলিতেছে—ঘরের বদ্ধবাতাসে যেন কার মর্মান্তিক দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।······ আর কোনো দিকে না চাহিয়া সুমুখের প্রজ্বলিত বাতিটার দিকে লক্ষ্মী অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল।

রাত্রে খুব সতর্ক হইয়া সকলে শয়ন করিলেন।

মানুষ মনে করে, পরলোকের যে-স্তর পর্যন্ত সাংসারিক বন্ধন-মায়ার আকর্ষণলীলা চলিতে থাকে তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিতে মৃতাত্মা সহজে পারে না ; সুতরাং আসক্তির দুর্নিবার টানে তাহার পক্ষে নিকটতম প্রিয়তম জনের একান্ত সমীপবর্তী হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে কিন্তু অনেকগুলি তুক্ আছে—তাহারা মৃতাত্মাকে দূরে দূরে রাখে।

সে-রাত্রি ও পরের দিবাভাগটি অমনিই কাটিল। কিন্তু চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন অমানুষিক লতার তাড়সে চিড়্ খাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাড়ীর অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয় বিশালপক্ষ একটা-পক্ষী বাড়ীর এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া ও অগণ্য আনাগোনার একটা ষড়যন্ত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সে যেন উঠি-উঠি করিতেছে ; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। .....

এমনিধারা ভয়ঙ্করের দুশ্ছেদ্য একটা মোহ আছে ; সে যেন মনটাকে ফাঁদে জড়াইয়া ফেলে। আবিষ্ট বন্দী মনের প্রাণান্তকর ছট্‌ফটানির শেষ হয় কেবল তখন, যখন এই দুঃসহ শীতল আবহাওয়ার মধ্যে সে মূর্চ্ছিতের মত এলায়িত শ্লথ অসাড় হইয়া আসে।... লক্ষ্মীর মনও এমনি বাঁধা পড়িয়াছিল—হঠাৎ স্বামীর খক্ খক্ কাশীর প্রচণ্ড শব্দে তাহার মন একটানে বন্ধনজাল ছিঁড়িয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ধক্ ধক্ শব্দে দুলিতে লাগিল। সে জোর করিয়া নিজেকে সবেগে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ছেলের কাছে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

নিকটেই আড়ালে স্বামী ও শ্বশ্রূ বসিয়া শ্রাদ্ধ-সম্পর্কীয় কথাবার্তা কহিতেছিলেন, কিন্তু তবু লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিল না। অত্যল্পকাল পরেই সে ছেলেটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া শাশুড়ীর পাশে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, বৌমা ?

লক্ষ্মী কথা কহিতে পারিল না।

কাশীশ্বরী বলিলেন—অমন ক'রে চ'লে এলে যে ?

লক্ষ্মী কষ্টের সহিত বলিল,—কিছু না, মা, অমনি।

তাহার বুকের মধ্যে কি করিতেছিল তাহা সেই জানে—ঘোমটার মধ্যেও তাহার চোখের দু'পাতা যেন এক হইতে চাহিল না।

লক্ষ্মীর এই সন্ত্রাস পলায়ন অকারণ নহে।

ছেলের পাশে শুইয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল—ওদিক্‌কার খোলা জানালাটির ঠিক ও-ধারে আসিয়া কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবলি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া মারিয়া ঘরের ভিতর তাহাদেরই উপর দৃষ্টি ফেলিতেছে।.. লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইত জানালায় কেহই নাই ;—কিন্তু এই নিদারুণ অনিশ্চিতকে ভালমন্দ যে-কোনো প্রকার সুনিশ্চিতে পরিণত দেখিবার মত দৃঢ়তা তার অবশ মনের ছিল না। আতঙ্কটা উত্তরোত্তর উৎকট হইয়া লক্ষ্মীর শ্বাসপ্রশ্বাসের রন্ধ্রপথটি চাপিয়া-চাপিয়া তাহাকে যেন অজ্ঞান করিয়া ঠেলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিল।

কাশীশ্বরী মনে মনে বুঝিলেন, বধূ ভয় পাইয়াছে। তিনি লক্ষ্মীর পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিলেন,—শ্রাদ্ধটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত সন্ধ্যার পর একলা কোথাও থেক না, মা।

সীতাপতি শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন, আলো। সেই রাত্রে সীতাপতিরই কণ্ঠের শব্দে লক্ষ্মীর ঘুম ছ্যাঁৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। লক্ষ্মী যেন শুনিল, সীতাপতি বাহির হইতে গভীর-স্বরে ডাকিতেছেন, আলো ?—ঐ একটিবার মাত্র,—লক্ষ্মী ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্তকণ্ঠে ডাকিল,—মা ?

শাশুড়ী জবাব দিলেন,—কি, বৌমা ?

—কে যেন খোকাকে ডাকলে, শোননি ?

—না, আমি ত' শুনিনি, জেগেই ত' আছি।

লক্ষ্মী বলিল,—আলো ব'লে ডাকলে।

বাড়ীর অপরাপর সবাই শিশুকে খোকা বলিয়া ডাকে ; কেবল সীতাপতি ডাকিতেন আলো বলিয়া। লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বরে অপরিচিত একটি উদ্বেলতা লক্ষ্য করিয়া কাশীশ্বরী উঠিয়া তেলের প্রদীপটি জ্বালিলেন ; এবং দীপহস্তে লক্ষ্মীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া শিশুর মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, শিশুরা যেমন ঘুমায় সেও তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে সুস্থ নিদ্রায় অভিভূত।

কাশীশ্বরী খোকার ও লক্ষ্মীর শিয়রে বসিয়া রহিলেন ; সে-রাত্রি তাঁহাদের জাগিয়া কাটিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ একবার শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী চমকিয়া উঠিলেন ; শিশুর চোখে জ্ঞানের ও ধারণাশক্তির অভাবের যে সহজ স্বচ্ছ সরল নিস্তেজ দৃষ্টি থাকে খোকার চোখে তাহা যেন নাই।—জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তার সম্যক্‌ বিকাশপ্রাপ্ত জাগ্রত কর্মক্ষম হইয়া পৃথিবীর সংগে শিশু আত্মাটির পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়া গেছে, এমনি তার সজ্ঞান দৃষ্টি। দেখিয়া কাশীশ্বরী যেমন বিস্মিত হইলেন তেমনি ভীতও হইলেন ; কিন্তু মুখে তিনি মনের ভয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। সেইদিনই তিনি গোপনে একটি মাদুলি সংগ্রহ করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেন।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল,—মাদুলী কিসের, মা ?

কাশীশ্বরী নিঃস্পৃহস্বরে বলিলেন,—তুমি যে কাল ভয় পেয়েছিলে, বৌমা, তাই।

কথাটি ঠিক পরিষ্কার হইল না, কিন্তু লক্ষ্মী মনে মনে বুঝিল, অকল্যাণকর একটি ভয়ের ছায়াপাত শ্বাশুড়ীর প্রাণেও হইয়াছে। বুকটা তার হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

রাত্রের প্রথমভাগে লক্ষ্মীর চোখে ঘুম আসিল না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল। রাত্রির অন্ধকার যেন এই দুর্দিনে তার অন্তরস্থ শূন্য ক্ষুধিত মহাগহ্বরটির মুখের আবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর পৃথিবীর কঠিন, অকঠিন সমুদয় বস্তু বায়ুবেগে ক্ষয় হইয়া তাহারই মধ্যে হু হু শব্দে ঢালিয়া পড়িতেছে।...দূরে কোথায় একটি কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া থামিয়া-থামিয়া কাঁদিতেছিল—সে-শব্দটা যেন আসন্ন অনিবার্য বিনাশের শঙ্কায় আতুরা ধরণীরই সবিরাম আর্ত হা হা রব।

ঘরে দীপশিখাটি নাচিতেছিল ; সে-দিকে চাহিয়া লক্ষ্মীর সহসা মনে হইল, যেন কাহার রক্তাক্ত লেলিহান্ জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বায়ুর স্তরপ্রান্ত লেহন করিতেছে।···
···লক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল।···শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে লক্ষ্মীর কখন ঈষৎ একটু তন্দ্রার ঘোর আসিয়াছিল—ঘোর ভাঙিয়া হঠাৎ সে জাগিয়া দেখিল, ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেছে, এবং ঘোর অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কে যেন দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের ভিতরকার মাটি হাতড়াইতেছে।······

—মা, মাগো!

বধূর ভীত চীৎকারে কাশীশ্বরী, 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিতে বলিতে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ; দেখিলেন, বধূ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাতাটির মত হি হি করিয়া কাঁপিতেছে ; তার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে। শিশু নিদ্রামগ্ন।

কাশীশ্বরীর অধীর জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মী বলিল,—ঐ ফাঁক দিয়ে কে হাত বাড়িয়ে মাটি হাতড়াচ্ছিল।—বলিয়া সে কম্পিতহস্তে চৌকাঠ দেখাইয়া দিয়া 'মাগো' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জানিতেন, ভয় তাড়াইবার উপায় তর্ক নয়। কাজেই বধূকে কিছু না বলিয়া তিনি ছেলেদের এই ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা দু'ভাই আদি-অন্ত অবগত হইয়া একেবারেই হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই—স্ত্রীলোকের দুর্বল মস্তিষ্কে সবই সম্ভব, বিভীষিকা দেখাও আশ্চর্য নয়। বাড়ীতে মৃত্যু ঘটিলে মানুষে ভয় পাইয়াছে এ কথা ইতিপূর্বেও শোনা গেছে। আবার তাঁহারা উপসংহারে বলিলেন—ও সেরে যাবে।

সারিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কাশীশ্বরী ও তাঁর ছেলেরা বুঝিতেই পারেন নাই যে, আতঙ্কটা লক্ষ্মীর প্রাণে সময় সময় দমকা হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া বহিয়া যাইত না—সেটা তার মস্তিষ্কের চারিপ্রান্ত জুড়িয়া অহরহ ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিতেছিল।
······লক্ষ্মী দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতেই লাগিল—শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, চোখ বুঁজিলেই তাহার মনে হয়, কে যেন ঘরের সহস্র ছিদ্রপথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।

ষষ্ঠদিনে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, শিশুর দেহ একরাত্রেই যেন কাঠির মত শুষ্ক হইয়া গেছে। প্রাণপণে চুষিয়া অভ্যন্তরের সমস্ত রস বাহির করিয়া লইলে রসাল ফলটির যেমন আকৃতি হয় শিশুর সর্বাবয়বের আকৃতি ঠিক সেইরূপ বিকৃত—মাথাটি ছাড়া সর্বাঙ্গ যেন নীরস হইয়া চুপ্সিয়া আয়তনে একেবারে অর্ধেক হইয়া গেছে। কাশীশ্বরীও দেখিলেন ; দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন ; শিশুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী ও লক্ষ্মীর বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—এত বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে বুঝি দুটি ঘটিতে পারে না ; চোখের উপর শিশুহনন চলিতেছে—অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই, বাধা দিবার সাধ্য নাই ; সান্ত্বনা নাই!

হেতু যতই অনির্দেশ্য হোক, ফল সম্বন্ধে কাহারও মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। নিরুপায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাশীশ্বরীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রটিকে বুকে করিয়া লক্ষ্মী নির্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সে রাত্রিতে কেহ কাহারও কাছছাড়া হইল না।......স্তিমিত প্রদীপটিকে ঘিরিয়া বসিয়া একটা অজ্ঞাত ত্রাসে সবাই নিঃশব্দ—রাত্রি নীরব, মানুষের কণ্ঠ নীরব।

লক্ষ্মীর আর্তনাদে সহসা সেই কঠিন নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া মায়াজগৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল; কাশীশ্বরী কাঁপিয়া উঠিয়া শিশুর বুকের উপর হাত রাখিলেন; দেখিলেন, নিঃশেষিত-তৈল শিশু-দীপটী কখন যেন নিবিয়া গেছে।

লক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।—

যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিল, তখন প্রকৃতির অপ্রাকৃতিক সমস্ত সংক্ষোভ শান্ত হইয়া গেছে।

জগন্নাথের যন্ত্রণা

রাস্তার ধারে গাছে ঠেস্ দিয়া জগন্নাথ পড়িতেছিল—

"পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বন্দী।"

"নিশা ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আকাশে নক্ষত্ররাজি ভীষণ জলদপটলে আবৃত। নিবিড় অন্ধকার আকাশ হইতে ভূতল পর্যন্ত একখানি দুর্ভেদ্য কৃষ্ণ যবনিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার আঘাতে মুহূর্তের জন্য বিদীর্ণ হইয়া অন্ধকার যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ুমণ্ডল স্তব্ধ হইয়া যেন প্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। পৃথিবী নিঃশব্দ। সেই ভীষণ অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাজেন্দ্রকুমার চারিজন পাষণ্ড কর্তৃক দ্রুতবেগে বাহিত হইতেছেন। মস্তকে লগুড়ের প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিলেন; বাহকগণের হস্তের উপর তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন; বুঝিতে পারিলেন, তিনি শত্রুকবলে পতিত হইয়াছেন; বোধ হয় পাষণ্ডগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে বধ্যভূমিতে বা কালী-মন্দিরে লইয়া যাইতেছে। রাজেন্দ্রকুমারের হস্তপদ কঠিন রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, বলপ্রয়োগের কোনই উপায় নাই। জীবনের মায়া তিনি করিতেন না; তবে একমাত্র দুঃখ রহিয়া গেল—হতভাগিনী নিরুপমার উদ্ধারসাধন হইল না। নিরুপমার দুরবস্থার স্মৃতি তাঁহাকে সহস্র বৃশ্চিকদংশনের মত যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তিনি দন্তে অধর দংশন করিলেন, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। হায় হতভাগিনী, তুমি জানিতেছ না যে, আমিও তোমারই মত দুর্বৃত্তগণের হস্তে আজ বন্দী, আমারও জীবন বিপন্ন।—পাষণ্ডগণ নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবে।

বাহকগণ নিঃশব্দে তাঁহাকে বহন করিতেছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রাজেন্দ্রকুমার অনুমান করিলেন, দিক্‌বিদিক্‌হীন এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। মস্তকের আঘাত হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল, কিন্তু নিরুপমার চিন্তায় বিভোর হইয়া তিনি সে যন্ত্রণা এতক্ষণ অনুভব করিতে পারেন নাই। সহসা একটা কঠিন পদার্থের সহিত আহতস্থান পুনরায় প্রহত হইল; তিনি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন তিনি অনুভব করিলেন, কঠিন এবং শীতল একটি স্থানে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন; হস্তপদের বন্ধন উন্মোচিয হইয়াছে। এ কি বধ্যভূমি না কক্ষ? কিন্তু তৎক্ষণাৎ অনুভবে বুঝিতে পারিলেন, তিনি একটা কক্ষের মধ্যে আনীত এবং বন্দী হইয়াছেন। সহসা একটিস্থান আলোকিত হইল—রাজেন্দ্রকুমার দেখিলেন, দেওয়ালের উপর গোলাকৃতি বৃহৎ একটি আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে সেই আলোকের উপর ধীরে ধীরে একটি কালো ছায়ার সঞ্চার হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই ছায়া আকার ধারণ করিতে লাগিল; ছায়া যখন পূর্ণাবয়বে পরিস্ফুট হইল তখন রাজেন্দ্রকুমার দেখিতে পাইলেন—উহা একটি পিস্তলের ছায়া। কোথা হইতে কোন্ ছিদ্রপথে অলোক আসিতেছিল তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য।"

ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক "অসীম সাহসী" রাজেন্দ্রকুমারের জীবন যখন এইরূপ বিপন্ন তখনই বাস্তবজগতে একটা অনৌপন্যাসিক ঘটনা ঘটিয়া গেল।—

ক্ষুধিত নেকড়ে যেমন করিয়া মাংস খায়, জগন্নাথ ঠিক তেমনি গোগ্রাসে ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পড়ে। বর্তমানে রাজেন্দ্রকুমারের বিপদে তাহার বুক দুরু দুরু করিতেছিল—কি হয়, কি হয়!—প্লট্ ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া তাহার মনপ্রাণ টানিয়া টানিয়া ডুবাইয়া লইতেছিল—

এমন সময় তাহারই বিশ গজ দূরে চীৎকার করিয়া কে বলিয়া উঠিল,—"চোর চোর!"

বন্দী রাজেন্দ্রকুমারকে অন্ধকার কক্ষের বাহিরে দেখিবার জন্য জগন্নাথের পরমাত্মা ছট্‌ফট্ করিতেছিল—কি আশ্চর্য কৌশলই না তিনি অবলম্বন করিবেন!—উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া সহস্রবার তার মনে হইতেছিল, আর পারা যায় না, শেষ পরিচ্ছেদটা পড়িয়া লই। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিলেই জমাট মজা মাটি হয় তাহাও সে জানে। প্রাণপণ চেষ্টায় উৎকণ্ঠা দমন করিয়া সে রাজেন্দ্রকুমারের দুঃখে সহানুভূতিতে গলিয়া, বিপদে কণ্টকিত হইয়া, সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া, সাহসে ও বিক্রমে বিস্মিত হইয়া রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় "চোর—চোর" চীৎকারে মগ্নদৃষ্টি তুলিয়া দেখিতে পাইল, একটি লোক তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, চার পাঁচজন লোক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে, এবং মোটা একটি ভদ্রলোক "চোর চোর" শব্দ করিতে করিতে চোরের সমান ছুটিতে না পারিয়া হাঁস্‌ফাঁস্ করিতেছেন।—দেখিতে দেখিতে চোর জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া পড়িল; জগন্নাথ অলসভাবে ডান্ পা-খানা তুলিয়া চোরের দিকে বাড়াইয়া দিতেই চোর সেই পায়ে বাধিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল। যাহারা চোরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল তাহারা আসিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহাকে পায়ের উপর খাড়া করিয়া দিল।

মোটা ভদ্রলোকটি কিছু বিলম্বে আসিয়া পড়িলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—আমার ঘড়ি নিয়েছে।

অনুসন্ধানে ঘড়ি চোরের ট্যাঁকেই পাওয়া গেল। চোরের বিরুদ্ধে সবাকেই উত্তেজিত দেখিয়া এবং ঘড়িটা পকেটে রাখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—ঘড়ি পাওয়া গেছে, আর বেশী হাংগামায় কাজ নাই; দু'চারটে চড়চাপড় মেরে ছেড়ে দাও—

কিন্তু দু'চারটি ছাড়িয়া চড়চাপড় শ' দুশো হইয়া গেল। সাবধানে গণিয়া গণিয়া ঠিক দু'চারটি চড়চাপড় মারা যায় চোরের দেহ সে জিনিষ নহে···লোকে চোরের অপরাধ ক্ষমা করিতে এত নারাজ কেন সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ইহাই যে, নিজের অপরাধ পরের মধ্যে প্রকাশিত দেখিলে সেটা খুব বড় দেখায়।

জগন্নাথ ইত্যবসরে বই লইয়া সরিয়া দূরে আসিয়াছিল।

"রাজেন্দ্রকুমারকে মৃত্যুভয় প্রদর্শন নিষ্ফল। ইতিপূর্বেও বহুবার তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন; হৃদয় তাঁহার কখনও কম্পিত হয় নাই। শত্রুগণ তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, কণ্টকপূর্ণ গভীরকূপে নিক্ষেপ করিতে, বিষধর সর্পের দংশনে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে; তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে অপূর্ব কৌশলে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুর চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়াছেন।

"রাজেন্দ্রকুমার ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটা ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। ঐ একটীবার মাত্র; আর সে শব্দ তিনি শুনিতে পাইলেন না। শব্দটা কিসের? বৃহদাকার ভারি দ্রব্যপতনের মত শব্দ, অথচ শব্দের শেষে যেন ধাতব পদার্থের ঝনৎকারও তিনি শুনিতে পাইয়াছেন। রাজেন্দ্রকুমারের চতুরতা যেমন অসাধারণ, চিন্তাশক্তিও তেমনি প্রখরা। ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভারি দ্রব্যপতনের শব্দটা মৃতদেহের এবং ধাতব পদার্থের ঝনৎকার অলঙ্কারের, সুতরাং মৃতদেহ রমণীর।—

সেই অনৌপন্যাসিক মোটা ভদ্রলোকটি জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—তুমি ত' বেশ চালাক ছোকরা। চট ক'রে বেশ বুদ্ধি ক'রে চোরটাকে ধরিয়ে দিয়েছ। তুমি ব্যাটাকে শুইয়ে না দিলে আড়াইশো টাকার ঘড়িটা নিয়ে পালিয়েছিল আর কি।—বলিয়া অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানার সহিত তিনি জগন্নাথের কাঁধের উপর হাত রাখিলেন।

—"কে সে? নিরুপমাকে কি দুর্বৃত্তগণ সত্য সত্যই হত্যা করিয়াছে? রাজেন্দ্রকুমার আর ভাবিতে পারিলেন না, দুইহাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার"—

স্কন্ধদেশে একটা ঝাঁকির সংগে প্রশ্ন হইল,—তোমার নামটি কি বাপু?

ঐ "তাঁহার" উপর আংগুল রাখিয়া জগন্নাথ এইবার অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সেই নাছোড়বান্দা লোকটির দিকে মুখ তুলিল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আমাকে বলছেন? আমার নাম জগন্নাথ মিত্র। ঘড়ি ত' পেয়েছেন, আর কি দরকার?

জগন্নাথের চোখমুখের ভংগী দেখিয়া ভদ্রলোক তাহার কাঁধের উপর হইতে ব্যস্ত-ভাবেই হাত নামাইয়া লইলেন; তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন,—প'ড়ো এখন, আমার কথাটা আগে শোনো। আমার বাড়ীতে রবিবারে তোমার নেমন্তন্ন রইল। —বলিয়া ভদ্রলোক ছোট একখানি কার্ড বাহির করিয়া জগন্নাথের ডিটেকটিভ্ উপন্যাসের উপর রাখিয়া দিলেন।—

নামটি পড়িতেই রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যুদ্বেগে জগন্নাথের মস্তিষ্ক ত্যাগ করিয়া গেল। থতমত খাইয়া জগন্নাথ বলিল,—আপনি, আপনি, আমি, আমি,—বলিতে বলিতে সে বই মুড়িয়া পিঠটান দিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমিও বই পড়তে ভালবাসি, কেউ বাধা দিলে আমারও বড় রাগ হয়। যাদের বই পড়া বাতিক তাদের—

তাদের অবস্থা কি তাহা জগন্নাথই তাঁহাকে বলিতে দিল না; আচম্বিতে হেঁট্ হইয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইতে গেল। তিনি অবশ্য পায়ের ধুলো দিলেন না, মধ্যপথ হইতেই তাহার হাত ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু জগন্নাথ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াই রহিল; কেবলি তার মনে হইতে লাগিল—ইস্, কাকে কি বলেছি রে!

ভদ্রলোক বলিলেন,—রবিবার সকালে যেও কিন্তু। মনে থাকবে ত'? মোটর পাঠিয়ে দেব। তোমার ঠিকানাটা কি?

—না, না, নেমন্তন্ন।

ইহার অতিরিক্ত সকরুণ আপত্তি জগন্নাথের মুখে ফুটিল না।

—যেও, লজ্জা করো না। যাবে ত'?

জগন্নাথ ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়াই সম্মতি দিল।

ভদ্রলোক তাহার ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেলেন।

জগন্নাথ সম্মতি দিল বটে, কিন্তু প্রমাদ গণিল। ইহারই নাম দৈব। নিমন্ত্রণকারী রায় দুর্গাদাস গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর ; লোকবিশ্রুত ধনী, আর মারাত্মক মানী।—

উপন্যাসের উত্তেজনা শীতল হইয়া গেল, এবং যে মৃতদেহটা রাজেন্দ্রকুমারের কাছাকাছি কোথাও ধপ্ করিয়া পড়িয়াছে তাহা নিরুপমাই কি না সে সংবাদটা জানিবার জন্যও জগন্নাথের আর তিলমাত্র আগ্রহ রহিল না। এক কথায়, দুর্গাদাসবাবু পৃথিবীর স্বাদ একেবারে বদলাইয়া দিয়া গেছেন।

জগন্নাথ বাড়ী আসিলে সকলে দেখিল, তাহার মুখখানা চিন্তাভারে বিলম্বিত।

মা সেইদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগন্নাথ, মুখখানা অমন ক'রে আছে কেন বাবা ?

জগন্নাথ বাহিরে যতই নিরীহ মুখচোরা লাজুক হোক, ভিতরে তার মূর্তি চড়কপূজার সন্ন্যাসীর চেয়ে তাণ্ডব।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে জগন্নাথ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—মনের সুখে, নইলে আর কেন ? তোমাদের যন্ত্রণায় ত' ঘরে তিষ্ঠোবার যো নেই ; বাইরে বেরিয়ে ঘরে বিপদ ডেকে আনতে হয়।

মায়ের মুখে দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

ভগ্নি ঈশানী জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে দাদা ?

দাদা সকাতরে বলিল,—নেমন্তন্ন।

শুনিয়া মা মেয়ের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া নিজের কাজে গেলেন।

নিমন্ত্রণের সঙ্গে যে বিপদের যোগ-সাজস থাকতে পারে, জগন্নাথ ব্যতীত বাড়ীর অন্যান্য লোকের তাহা জ্ঞানাতীত। কি করিয়া এই অসম্ভব সংযোগ ঘটিল ঈশানী তাহা জিজ্ঞাসা করিতেই জগন্নাথ সিংহনাদ করিয়া বলিল,—কার বাড়ীতে তা' জানিস ?

—না, কার বাড়ীতে ?

—রায় বাহাদুর দুর্গাদাস গাঙ্গুলির বাড়ীতে। বলিয়া সে চৌকীর উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

—তা আর বিপদ কি দাদা ?

—বিপদ নয় ? আমার কাপড় আছে ? জামা আছে ? মোজা আছে ? জুতো আছে ? চাদর আছে ? কি পরে যাব আমি বড়লোকের বাড়ী ? বাঁদর সেজে যাব ?

—তোমার যা আছে তাই পরে যাবে। নেমন্তন্ন কবে ?

—রবিবারে।

ঢের দেরী আছে। দু'দিনের মধ্যে কাপড়-জামা যোগাড় করে নিও······

জগন্নাথ পা ছড়িয়া বলিয়া উঠিল,—ওরে, তোরা আমার সামনে থেকে যা, আমায় একটু ভাবতে দে। তোদের যন্ত্রণায় আমার ঘর ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই পড়তে হয়। আমায় বিপদে ফেলে এখন হিতৈষী সেজে পরামর্শ দিতে এসেছেন, যোগাড় ক'রে নিও। ডাক মাকে।—বলিয়া সে চৌকির পিঠের উপর নির্জীবের মত এলাইয়া পড়িল।

মা আসিলেন।

জগন্নাথ বলিল,—আমি কি পরে নেমন্তন্ন রাখতে যাব বলতে পারো ?

মা বলিলেন,—তোমার যা আছে তা-ই পরে যাবে।—

ঈশানী পূর্বে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন, মা-ও বলিলেন। একই কথা দুইবার শুনিয়া জগন্নাথের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল।

—দুনিয়ার আদপ-কায়দা জান তোমরা ? না, অমনি ঢালাও বলে দিলে, যা আছে তা-ই পরে যেও। আমার লজ্জা করে না ? মাথা হেঁট হ'য়ে যায় না! থাকো কোণে পড়ে—কি আর বলব বল ! আমার ইচ্ছে করছে, খুন হ'য়ে মরি।

শেষের দিকটায় স্বর কাঁপিয়া গর্জন বেসুরো হইয়া গেল।

—"বালাই, বালাই" বলিতে বলিতে মা পুনরায় নিজের কাজে গেলেন।

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিল,—কি ক'রে নেমন্তন্ন যোগাড় করলে, দাদা ?

বড়লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের বিভীষিকা সত্ত্বেও এই স্থানটিতে জগন্নাথের একটু উৎসাহ ছিল। বলিল,—বলি শোন্। রায় বাহাদুরের পকেট থেকে আড়াইশো টাকার ঘড়িটা তুলে নিয়ে এক ব্যাটা ছুটে পালাচ্ছিল। আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে দেখে পা-খানা তুলে বাড়িয়ে দিলুম, চোর হাত পা তুলে ডিগ্‌বাজি খেয়ে ধপাৎ ক'রে মাটিতে প'ড়ল। আমি তখন তন্ময় হ'য়ে পড়্‌ছি। তোমাদের উপদ্রবে ত' ঘরে ব'সে পড়্‌বার যো নেই, রাস্তায় বেরিয়ে গাছ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়তে হয়। কি বল্‌ছিলুম ? হ্যাঁ —তন্ময় হ'য়ে পড়্‌ছিলুম কি না; চোর প'ড়ে গেল এই পর্যন্তই জানি। তারপর দেখি মোটা হেন একটা ভদ্রলোক আমার কাঁধ ধ'রে ঠেলছেন। খুন-রহস্য বইখানা তুই পড়েছিস্ ? পড়িস্ নি ? সেই বইয়ের রাজেন্দ্রকুমার তখন বিপদে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমি তন্ময় হ'য়ে পড়্‌ছিই ! ভদ্রলোক আমায় ঠেলে ঠেলে বই থেকে মুখ তুলিয়ে তবে ছাড়্‌লে। বল্‌লে—সাবাস্ ছোক্‌রা, তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুব খুসী হয়েছি; রবিবার সকালে তোমার নেমন্তন্ন রইল; মোটর পাঠিয়ে দেব, যেও কিন্তু।—এই বলে এই কার্ডখানা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। এখন কি পরে সেখানে যাব ? ছোটলোকের মত কাপড়-চোপড় দেখে যদি তাড়িয়ে দেয় ?

সান্ত্বনার সুরে ঈশানী বলিল,—নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মোটরে যাবে; তাড়িয়ে কেন দেবে ?

—আমার যে কাপড়-চোপড় নেই। ময়লা কাপড় পরে মোটরে গেলে ভাববে শালা চোর।

—তোমার যেমন বুদ্ধি !—বলিয়া ঈশানী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মা মনে মনে হাসিয়াছিলেন, ঈশানী প্রকাশ্যে হাসিয়া গেল; কিন্তু মা ভগিনীর হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার মত চৈতন্য জগন্নাথের ছিল না।

পরিচ্ছদের দৈন্যের প্রতিবন্ধকটা তাহার ভয়ের গৌণ কারণ; তাহার গা কাঁপিতেছিল যে-ভয়ে সেই মুখ্য ভয়ের হেতু সে ব্যক্ত করে নাই।

বৃহস্পতিবারের বৈকালে বারবেলার মধ্যে সেই ঘটনাটা ঘটে, এবং নিমন্ত্রণলাভ হয়।

শুক্রবার দুপুরবেলা তার একসেট কাপড়-জামা সাবানে কাচিয়া ধপ্‌ধপে করা হইল। মায়ের অভিপ্রায়, সেই কাপড়-জামা পরিয়া ছেলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবে। কিন্তু জগন্নাথ মায়ের হাত হইতে কাপড়-জামা টানিয়া লইয়া ধূলার উপর টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—আমি বাড়ীতে কাচা কাপড় পরে যাব সেই বাড়ী ! ইস্তিরি নেই, ফিস্তিরি নেই—তুমি ক্ষেপেছ, মা ? ধোপদোস্ত ইস্তিরি-করা সার্ট তারা রোজ একটা করে ভাঙে তা জানো ?

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—তোর যে সে অবস্থা নয় রে পাগ্‌লা।

ছেলে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কি মনে হইয়া তপ্ত খোলার উপর খইটির মত ছিটকাইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।—তাহার মনে পড়িয়াছে, এক বন্ধুর একসেট পোষাকী কাপড় আছে; কেবলমাত্র রবিবার দ্বিপ্রহরের জন্য যদি সে ধার দেয়—

বন্ধু বলিল,—আলপাকার কোট আছে, শান্তিপুরে ধুতি-চাদর আছে, সিল্কের মোজাও আছে, নিতে পারো; কিন্তু আমার জুতো ত' তোমার পায়ে হবে না, ভাই।

তা না হোক্, তবু জগন্নাথ কূল পাইল; ভাবিল, জুতার জন্য আট্‌কাইবে না; তাহার নিজের জুতাও নেহাৎ অভদ্রোচিত নহে।

জামা-কাপড়-মোজার যোগাড় হইল, তথাপি রাত্রে জগন্নাথের ভাল ঘুম হইল না। অশান্তিকর নানাবিধ দুঃস্বপ্নের উপদ্রবে পুনঃপুনঃ ঘুম ভাঙিয়া তাহার গা ঘামিতে লাগিল—

উপযুক্ত পরিচ্ছদ অভাবে নিমন্ত্রণে যাওয়া যাইতে পারে না, ইহা তাহার কঠোর দুশ্চিন্তার কারণ সন্দেহ নাই, তবে, সেটা তত ভয়ঙ্কর নহে; তাহাকে হিম করিয়া দিতেছিল যে ভয়টা তাহা এই—সে কেমন করিয়া সেখানে উঠিবে বসিবে! ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক ভয়াবহ দুর্গম স্থান অক্লেশে এবং অকুতোভয়ে অতিক্রম করিলেও, দশজন নিরীহ ভদ্রলোকের মাঝে যাইয়া বসিতে হইবে, এই কল্পনাতেও তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। উপায়ান্তর অভাবে যদি কখন বাধ্য হইয়া বসিতে হইত, তবে সেই বসাটাই তাহাকে মুহুর্মুহুঃ ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিত। কেবলি তাহার মনে হইত, সকলেই বুঝি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে, চারিদিকে তাহারই সম্বন্ধে গোপনে গোপনে ঠাট্টা তামাসা হাসাহাসি কানাকানি চলিতেছে; তাহার পোষাক বুঝি ভাল হয় নাই, বুঝি ঠিক কায়দামত সে বসিতে পারে নাই, বুঝি কথা না বলা ভাল হইতেছে না। হঠাৎ কোনো কথার সংস্রবে কিছু বলিয়া ফেলিয়াই বুক কাঁপিয়া তাহার মনে হয়, এ কি করিলাম! না বলিলেও চলিত। মনের এমনি উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়, কি বলিয়াছে তাহা পরক্ষণেই মনে করিতে পারিয়া যন্ত্রণা আরো বাড়িয়া যাইত। ইহা সাধারণভাবে মেলামেশার কথা; সাধারণভাবেরই এই ঝঞ্ঝাট, অসাধারণভাবের যে কি ঝঞ্ঝাট তাহা বোধ হয় মানুষের কল্পনাতীত। দুর্গাদাসবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণের মধ্যে অসাধারণত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে; সে সেখানে দশজন নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজন নহে যে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া থাকিবে; সে একাই নিমন্ত্রিত, দুর্গাদাসবাবু নিজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; আড়াইশত টাকার ঘড়ি-উদ্ধারের গল্পটা সে-বাড়ীর ইতর-ভদ্র ছেলে-বুড়ো সকলেই শুনিয়াছে। সুতরাং সে উপনীত হইবামাত্র দারোয়ান হইতে বাবু পর্যন্ত সকলে আপ্যায়নে তুষ্ট করিতে আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষু করিয়া তুলিবে ইহাতে সন্দেহই নাই।

অত্যন্ত মর্মদাহের সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল—কোন দুষ্টগ্রহ তাহাকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াইয়া দিবার দুর্মতি দিয়াছিল! চোর পালাইলে রায় বাহাদুরের আড়াই শত টাকা মূল্যের ঘড়িটা যাইত, তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হইত?

দুর্গাদাসবাবুর উদ্দেশেও সে মনে মনে বলিল—বাবু আমার কল্পতরু, নেমন্তন্ন করেছেন!

তাহারা সব বড় বড় বাবু; তাহার অত্যন্ত সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বেশভুষা দেখিয়া

তাহারা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হাসিবে ; কি বলিতে কখন সে কি বলিয়া ফেলিবে—শুনিয়া বাবুরা তাহাকে প্রকাণ্ড একটা গর্দভ মনে করিবে ; হয়তো—হয়তো কি !—নিশ্চয়ই, এমন সব জিনিষ খাইতে দিবে যাহা কি করিয়া খাইতে হয় তাহা জানা না থাকায় কি যে ঘটিবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না ; পরে যেটা খাওয়ার পদ্ধতি সেইটাই সে আগে খাইতেছে দেখিয়া ছেলেরা হাসি চাপিতে যাইয়া কাশিয়া ফেলিবে, এবং বুড়োরা নিঃশব্দে চোখ পাকাইয়া ছেলেদের শাসন করিতে যাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিবে।—তখন তাহার অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ! কত প্রকারে কত ভুল-চুক্ ঘটিতে পারে, বেফাঁস কত কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে ; বিপদ কোন্ দিক হইতে আসিবে তাহার ঠিক কি !—

—মা, মা ?

মা আসিলেন।

জগন্নাথ বলিল— আমি যাব না, মা।

মা ছেলের বিপন্নমূর্তি দেখিলেন, বলিলেন—যাবিনে কেন, ভয় কিসের ?

জগন্নাথ নির্ভয়ে বলিল—ভয় আবার কিসের ? তারা বাঘ না ভালুক যে খেয়ে ফেলবে ! কথা বোঝো না কেন ? ভয়ের কথা হচ্ছে না। ঐত কাপড়-চোপড়—বড়লোকের কাছে ওসব চলে না।

—চলে, চলে। পাগলামী করিসনে ! নেমন্তন্ন না রাখলে অপমান করা হয় তা জানিস ? তাদের চটালে আমাদের ভাল হবে না।

সর্বত্রই ভয় !—

জগন্নাথ চোখ বুঁজিয়া বলিল,—আচ্ছা যাও ; আমায় একটু নিরিবিলি ভাবতে দাও।

—ভাবনা কিসের বাপু তা তুই জানিস।—বলিয়া মা কাজে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল—আজ রবিবার ; আজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে ; ঘুম ভাঙিয়া জগন্নাথ বিকারগ্রস্ত রোগীর মত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।—

মা ও ভগিনী আসিয়া শয্যাত্যাগ করিবার তাগিদ দিয়া গেলেন, জগন্নাথ কর্ণপাতও করিল না।—ভাবনার শেষ নাই, অন্ত নাই, কূল নাই, কিনারা নাই, অদৃষ্টে যে কি আছে, আর কি না আছে, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহার ছায়ামাত্রও এখন লক্ষ্য হইতেছে না !—অবশেষে সেই ভাবনাই অকস্মাৎ তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল ; অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়েই সে তাড়াতাড়ি স্নান করিল ; আলপাকার কোট ইত্যাদি পরিয়া বেশপারিপাট্য সমাধা করিল ; মিছরির সরবতে ভুঁড়ি ও মুড়ি ঠাণ্ডা থাকে বলিয়া একগ্লাস মিছরির সরবত পান করিয়া যখন সে নিঃশব্দে বসিয়া মোটরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল তখন তাহার মনের অসাড় অবস্থা ;—ভয় নাই, ভাবনা নাই, নিশ্চিত মৃত্যুর মোহেই যেন মনপ্রাণ স্পন্দহীন হইয়া গেছে।—শুধু এই কথাটাই তার নিশ্চেষ্ট নিঃস্পৃহ মনের ধূ ধূ পিঙ্গল আকাশে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল,—আজ রবিবার, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেই হইবে।

কিন্তু সশব্দে মোটর আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াতেই আতঙ্ক আবার মূর্তিমান হইয়া উঠিল—ঐ আসিয়াছে, যাইতে হইবে।

জগন্নাথের হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ঈশানী আসিয়া বলিল,—দাদা, তোমাকে নিতে মোটর এসেছে।

জগন্নাথ সাড়া দিল না।

সবার ছোট ভগ্নি ভবানী আসিয়া জগন্নাথের হাঁটু ধরিয়া বলিল,—দাদা, আমি যাব।

জগন্নাথ তার কাঁধ ধরিয়া এমন ঠেলিয়া দিল যে সে ছিটকাইয়া তার দিদির পায়ের তলায় যাইয়া পড়িল।

জগন্নাথ ধীরে ধীরে বাহিরে যাইয়া বলিল,—মোটরে আমি যাব না, মোটর তুমি নিয়ে যাও, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।

মোটরচালক বলিল,—হেঁটে কেন যাবেন, বাবু! মোটর—

—আমি হেঁটে যাব বলছি, তুমি কি জবরদস্তি আমায় মোটরে নিয়ে যাবে?

মোটরচালক অবাক হইয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

মা বলিলেন,—গাড়ীতে গেলিনে যে?

জগন্নাথ বলিল, আমার খুসি!

আসল কথা এই যে, দেরী করিলে যদিও নিস্তার নাই, তবু আসন্ন বিপদকে যতক্ষণ দূরে রাখা যায়। মোটর চক্ষের নিমেষে হুস্ করিয়া লইয়া যাইবে—ভাবিবার চিন্তিবার সময়ই মিলিবে না; হাঁটিয়া গেলে তবু যা হোক কিছু সময় পাওয়া যাইবে।

জগন্নাথ পদব্রজেই রওনা হইল।

দূর হইতে দুর্গাদাসবাবুর বিরাট অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়—চোখে পড়িবামাত্র জগন্নাথ থামিল; ভাবিতে লাগিল,—যাইয়া যদি দেখি, তাহাদের একটা বিপদ ঘটিয়াছে, চারিদিকে গোলমাল কান্নাকাটি তবে বেশ হয়, কেহ না জানিতেই ফিরিয়া আসিতে পারি।

অবসন্নপ্রাণে ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সদর গেটের সম্মুখেই ভোজপুরী দ্বারবান বন্দুক কাঁধে পাহারায় ছিল। সে জগন্নাথকে সেলাম করিয়া বলিল,—যাইয়ে বাবু, বলিয়া সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

যাইয়ে ত', কিন্তু যাইবে কোথায়? জগন্নাথ তখন সম্মুখে দুস্তর সাগর বিস্তৃত দেখিতেছে।—

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, যে রাস্তা দিয়া সে আসিয়াছে সেই রাস্তার দিকে চাহিল; সেইখানে কাহারও অভয়হস্ত উত্তোলিত দেখিতে না পাইলেও ঐ রাস্তাটিকেই বিপত্তারণ যথার্থ বন্ধু বলিয়া তাহার মনে হইল।

কিন্তু বন্ধুর দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকাও ঘটিয়া উঠিল না; তাহার কারণ এই—

আলপাকার কোর্টটির সম্মুখটা নূতনের মতই বেশ ঝকঝকে; সম্মুখটা দেখিয়াই সেটাকে সে মঞ্জুর করিয়াছিল; কিন্তু আজ গায়ে চড়াইবার আগে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে যাইয়া তার চোখে পড়িয়াছিল—কোটের পিঠের একটা স্থানে সামান্য তামাটে রং ধরিয়াছে। দেখিয়াই প্রথমটা চমকাইয়া উঠিলেও, একটু চিন্তার পর সেটাকে একেবারেই অচল মনে হয় নাই; ভাবিয়াছিল, ঔষধ আছে; কোটের উপর চাদরটা জড়াইয়া গায়ে দিলেই কলঙ্কের দাগ ঢাকা পড়িবে।—

কিন্তু এখন, দারোয়ানের দিকে পিঠ করিয়া রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই সন্দেহটা খট্ করিয়া উঠিল—জালের মত পাতলা চাদরের ভিতর দিয়া সেই কলঙ্কিত স্থানটা দেখা যাইতেছে কি না কে জানে; বোধ হয় দেখা যাইতেছে; আর বড়লোকের দারোয়ান তা-ই দেখিয়া হাসিতেছে।—চট্ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দেখিল, দারোয়ান আপনমনে পরিক্রমণ করিতেছে, হাসির আভাসমাত্রও তাহার ঠোঁটে নাই।—

দারোয়ানকে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জগন্নাথ দেখিল, ডান দিককার একটা ঘরে একঘর লোক হাতবাক্স, হুঁকা এবং খেরুয়া-বাঁধান' খাতা-পত্র লইয়া লেখাপড়ার কাজ করিতেছে।—জগন্নাথের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। একজন কর্মচারী তাহাকে দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,—আপনার নাম জগন্নাথ মিত্র?—জিজ্ঞাসা করিয়া সে হাসিতে লাগিল।…জগন্নাথের চোর শোয়াইয়া দিবার ফন্দির কথা মনে পড়িয়াই সে হাসিতেছিল; কিন্তু জগন্নাথের উষ্ণ কল্পনা সেদিক দিয়া গেল না; জগন্নাথ ঠাহর করিতেই পারিল না, লোকটা কি দেখিয়া হাসিতেছে—আলপাকার কোট, না জুতা, না মোজা, না চাদর, না কাপড়, না তার চেহারা—কি দেখিয়া সে হাসিতেছে? জগন্নাথ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া শুধু খানিকটা হা করিল।

কর্মচারী বলিল,—ঘরে এসে বসুন, বিশ্রাম করুন।

জগন্নাথ ঘরে উঠিল, বসিল, বিশ্রাম করিতেও লাগিল—কিন্তু মনে তাহার বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না।

কেনো কোনো চেয়ারের পিঠটা বেত দিয়া ছাওয়া থাকে; কিন্তু দুর্গাদাসবাবুর কর্মচারী জগন্নাথকে আনিয়া যে চেয়ারে বসাইয়াছে তাহার পিঠটার সে রকম নয়—খালি সরু কাঠ একখানা মাঝখানে আড়াআড়িভাবে দেওয়া আছে। দুর্গাদাসবাবুর জমিদারী বিভাগের কর্মচারীরা জগন্নাথের সম্মুখে, তেজারতি বিভাগের কর্মচারীরা তাহার পশ্চাতে; তাহার আলপাকা-কোটের পিঠ একেবারে তেজারতি বিভাগের চোখের সামনে যাইয়া পড়িয়াছে—যে কেহ চোখ তুলিলেই সেই তামাটে স্থানটা স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইবে।—

একজন কর্মচারী হাসিতে হাসিতে বলিল—বাবু সেদিন এসে শতমুখে আপনার সুখ্যাত করলেন; বললেন, অমন উপস্থিতবুদ্ধি বড় দেখা যায় না। আড়াইশো টাকার ঘড়িটা গিয়েছিল আর কি আপনি না থাকলে।—

কিন্তু এতগুলি কথার একটি বর্ণও জগন্নাথের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার সমস্ত মন পৃথিবী ছাড়িয়া আসিয়া আলপাকা কোটের ঐ পিঠের সঙ্গে বিঁধিয়াছিল; চেয়ারের উপর উস্‌পিস্ করিতে করিতে আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না—মুখ লাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্মচারী বলিল—উঠলেন যে?

—অমনি। বলিয়াই জগন্নাথ বসিয়া পড়িল।—জুতো খুলে ভাল হ'য়ে বসুন। বিনোদ, বাবুকে পা ধোবার জল দে, সাবান তোয়ালে দিস্। চাদরটা খুলে দিন ওর হাতে।

সর্বনাশ।—

জগন্নাথ চাদর চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—চাদর থাক।

—সে কি কথা। এই গরমে—

জগন্নাথ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—কই আর গরম। আর গরমেই আমি ভাল থাকি।

—তবে থাক। ওরে, বাবুকে খবর দে, জগন্নাথবাবু এসেছেন।

জগন্নাথ কাতরকণ্ঠে বলিল—তাঁকে আর খবর দেবেন না।

কর্মচারী বলিল—বলেন কি। আপনি তাঁর নিমন্ত্রিত; তিনি বার বার করে বলে

দিয়েছেন, জগন্নাথ এলেই আমাকে খবর দিও। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খাবেন বলেছেন ; তাঁর ছেলেরা, ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগনে, ভাগনিরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আপনার পথ চেয়ে আছে।—

দর্শকবৃন্দের তালিকা শুনিয়া জগন্নাথের বুকের স্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তাহার চোখের সামনে দিবালোক ধূসর হইয়া আসিতে লাগিল, এবং যেন মাথার ভিতর রেলগাড়ী চলিতেছে এমনি একটা শব্দ তার কানের ভিতর বাজিয়া উঠিল।···

ভৃত্য জগন্নাথের আগমনসংবাদ বাবুকে জানাইয়াছিল। দোতালার বারান্দায় অনেক-গুলি জুতার শব্দ উঠিল, ছেলেমেয়েদের কলরব শোনা গেল।—চেয়ারের নীচে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে, জগন্নাথের দেহ এমনি অস্থির হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়টিতেই তেজারতি বিভাগের কে একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া কাহাকে কি বলিল। সকম্পন অস্থিরতার মধ্যেও অস্ফুট শব্দটা জগন্নাথের কানে গেল। সে ভাবিল, তাহার আলপাকা-কোটের সেই তামাটে স্থানটা একজন দেখিতে পাইয়া আর একজনকে ডাকিয়া দেখাইতেছে।—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল ; জগন্নাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্মচারী বলিল—বাবুরা আসছেন।

জগন্নাথ তা জানে ; সে কোনোদিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে আসিল, এবং বেগ কমাইয়া সদর গেট পার হইল।

* * * *

দুর্গাদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—জগন্নাথ কই ?

এবং তখনই কর্মচারিগণের বিস্মৃত দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, চাদর-গায়ে একটি লোক তাঁহার বাড়ীর বিপরীতদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ও ?

একজন কর্মচারী বলিল—আজ্ঞে, জগন্নাথ।

## দুই

### মারে কেষ্ট রাখে কে !

স্বর্ণকার গঙ্গাধর রায়ের পুত্র পঞ্চানন কি কারণে পাপপথে পা দিল, তাহা মনস্তত্ত্বের দুরূহ সূক্ষ্ম একটা প্রশ্ন। পঞ্চানন এখন পঞ্চানন, ওরফে গৌরগোপাল, ওরফে সরোজকুমার, ওরফে নিত্য, ওরফে সাতকড়ি।······ফৌজদারী আদালতের নথিপত্রে এতগুলি ওরফে তড়িঘড়ি পরিচিত হইয়া উঠা যার তার কর্ম নয় ; কিন্তু পঞ্চানন হইয়াছে।—

পঞ্চাননের বাপ গঙ্গাধর স্বর্ণকারের কেবল সোনা লইয়া নাড়াচাড়া ; ঐ নাড়াচাড়ায় যেটুকু গুঁড়া পড়ে তাহাই কুড়াইয়া গঙ্গাধরের ঢের পয়সা।······তৎসত্ত্বেও পঞ্চানন কেন পরের দ্রব্যে লোভ করিতে শিখিল তাহা বাড়ীর সকলে বুঝিতে ত' পারেই নাই, তার দলের লোকেও পারে নাই।······

দলের মুকুন্দ বলে,—তু' শালা হেতায় কেন রে ? বাপের ঘরে যা—

কিন্তু, গাঁজার মাহাত্ম্যে মুকুন্দর ধর্মজ্ঞান বাড়িয়াছে মনে করিয়া পঞ্চানন শুধু ঐ সম্বোধনটাই তাহাকে ফিরাইয়া দেয়।

পঞ্চানন চারবার জেল খাটিয়াছে।

অনাহারে তার দিন কাটিয়াছে, শেলসম এ সংবাদও পঞ্চাননের মাতার কর্ণে পেঁাছিয়াছে।

ভদ্রবেশে মেসে, হেটেলে ঢুকিয়া ছেলেদের ঘড়ি, ছাতা, ব্যাগ প্রভৃতি লইয়া চম্পট দেয় যারা, পঞ্চানন তাদেরই একজন।

····· বেশ সুশ্রী চেহারা ; তাহার মনের ছাপ মুখে যেন পড়ে নাই ; দেখিলে সন্দেহ করা অসম্ভব যে ঐ সুশীল সুঠাম রূপের আড়ালে পাপের বাসা আছে।—

আজ সারাদিন পঞ্চানন অনাহারে আছে ; গত রাত্রিটাও তার অর্ধাহারে কাটিয়াছে ; তাই সন্ধ্যা সাতটার সময় কিছু উপার্জনের আবশ্যকতা অনিবার্য হইয়া উঠিল।......

জুতার উপর কোঁচা আছড়াইয়া ধুলা ঝাড়িয়া পঞ্চানন আপাদমস্তকে মার্জিত রূপ ধারণ করিল ; এবং হেলিতে-দুলিতে ২৯।১ নম্বর হরকুমার দাসের লেনে ঢুকিয়া পড়িল। ······তার ডান হাতে মাথা-বেঁকান' বেতের ছড়ি, বাঁ হাতে কাগজ মোড়া রাবিস্······এই রাবিস্ই তার উপার্জনের মূলধন।

২৯।১ হরকুমার দাসের লেনে একটি বোর্ডিং—ছেলেরা থাকে।······ঢুকিতেই খিলান করা করিডরের মুখে খানিকটা প্রশস্ত স্থান, তারপর প্যাসেজ।

······পঞ্চানন সটান চলিয়া আসিয়া সিঁড়ির ধাপের উপর এক পা তুলিয়া দিতেই পিছন হইতে প্রশ্ন আসিল,—কি চাই মহাশয়ের ?

পঞ্চাননের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল······

কিন্তু মুহূর্তের জন্য—

পরক্ষণেই সে নিরতিশয় নির্লিপ্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, নীচে কাঠ এবং উপরে কাঁচ দিয়ে ঘেরা বুকিং অফিসের মত ছোট্ট একটী কুঠুরীর ভিতর হইতে একজোড়া বৃশ্চিকের মত গোঁফ তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহারই দিকে মন দিয়া চাহিয়া আছে।······

ইনি কেরাণী।—

পঞ্চানন বলিল,—নীহারবাবুকে চাই।

এবং কাগজমোড়া রাবিসের পার্শেলটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—এই পার্শেলটা তাঁকে দিতে দিয়েছেন একজন।

গোঁফ বলিল,—কোন্ ফ্লোরে, কোন্ নম্বরে ?

—তা জানিনে।

গোঁফ বলিল,—থামুন, দেখছি।······বলিয়া সে মোটা একখানা বাঁধান খাতার পাতা উল্টাইয়া নীহারবাবুকে খুঁজিতে লাগিল।

নীহারবাবু কাল্পনিক ব্যক্তি—

কাজেই ধপ্ করিয়া খাতা বন্ধ করিয়া গোঁফ বলিল,—নীহারবাবু কেউ এখানে থাকে না।

থাকে কি থাকে না তাহা পঞ্চাননের কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জানিবার বিষয় নহে।······তবে তাহাকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই হইল।...কাঁচা লোক হইলে আম্তা আম্তা করিয়া ওখান হইতেই ফিরিত। কিন্তু পঞ্চাননের গুরুপদে মতিই বৃথা, যদি এটুকু শিক্ষাও তার না হইয়া থাকে যে দীর্ঘসূত্রতা যতই দোষাবহ হোক, প্রত্যুৎ-

পদ্মর্মাতত্ত্বের সঙ্গে ধৈর্য ও অধ্যবসায়, তৎপরতার মত স্থানে স্থানে এমন কাজে লাগিয়া যায় যে, সেটা ভাবিতেও আরাম।……একটুখানি পরে যে কাজটি করিলে ভবিষ্যৎ নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, সেই কাজটা তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্ট হইয়া গেছে ইহার দৃষ্টান্ত তাদের মহলে ঢের আছে।……যাই হোক্, মতলবের গলায় দড়ি পড়িবামাত্র পঞ্চাননকে ন্যাকা সাজিতে হইল।…… আস্তে আস্তে আগাইয়া যাইয়া বলিল,—এটা কি ২৯ নম্বর নয় ?

গোঁফ বলিল,—না। এটা ২৯ এর ১ নম্বর। আপনার নীহারবাবু বোর্ডিংএ থাকেন কি বাড়ীতে থাকেন জানা আছে কি ?

—বোর্ডিংএ থাকেন।

—তা হ'লে ২৯।২ নম্বর দেখুন। সেটাও বোর্ডিং।

শুনিয়া পঞ্চানন যেন দিশা পাইল ; অতিশয় খুসী হইয়া বলিল,—ঠিক ঠিক, তাই বটে ; ২৯।২ নম্বরের কথাই ত' তিনি বলে দিয়েছেন।…কি আশ্চর্য !…আচ্ছা, তবে আসি। অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিলুম। বলিতে বলিতে পঞ্চানন পার্শেল এবং ছড়িসহ যুক্তকর কপালে তুলিল,……

কিন্তু কে জানে কেন, গোঁফ তাহা লক্ষ্যও করিল না ; কোটর ছাড়িয়া সে বাহিরে আসিল ; এবং ক্রমশঃ একেবারেই পঞ্চাননের গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখ নাড়িয়া বলিল—ঐ ২৯।২ নম্বরেই দেখুন, সুবিধে হ'তে পারে।…… বলিয়া গোঁফের আড়াল হইতে এমন দু'পাটি দাঁত বাহির করিল যে মানুষমাত্রেরই তা অসহ্য।—

২৯।২ নম্বরে সুবিধার কথাটায় গোঁফ কি ইঙ্গিত করিতেছে তাহা পঞ্চাননের বুঝিতে দেরী হইবার কথা নয় ; বিশেষতঃ তাহার ঐ গুম্ফলগ্ন বক্রহাসি……

পঞ্চাননের প্রাণে যেন বৃশ্চিকের বিষ ঢালিয়া দিল।

কিন্তু এইখানে পঞ্চানন যে অভিনয়টুকু করিল তা একেবারে নির্দোষ, চমৎকার…

অবাক হইয়া গোঁফের মুখের দিকে খানিক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সে নিজের মুখের উপর মর্মাহতের অপার বেদনার এমন একটা কালো ছায়া নামাইয়া আনিল যার কৃত্রিমতায় সন্দেহ করা দূরে থাক, মনেই হইবে না যে এই আঘাত সে জীবনে ভুলিতে পারিবে।… নিষ্কলঙ্কে যে ব্যক্তি এমন দারুণ সন্দেহ করে তাহাকে পঞ্চাননের বলিবার কিছু নাই।… পুনর্বার সে কপালে হাত ঠেকাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বাহির হইয়া গেল।—

মোড়ের আড়ালে আসিয়া পঞ্চানন ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া মনের অশান্তি ও ক্লান্তি দমন করিতে লাগিল। এতক্ষণ সে বাহিরে একেবারে নির্লিপ্ত সাধারণ ভদ্রোচিত ভাব বজায় রাখিলেও বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া তার ভিতরের উত্তাপ কিছু ওঠানামা না করিয়া পারে নাই।…

দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে ভয় হয় বৈকি—

অত্যন্ত অসাবধান ব্যস্তবাগীশ কাঁচা লোক কাজে হাত দিয়া বাজার এমন খারাপ করিয়া দিয়াছে যে একটু বেতর হইলেই আর কথা নাই……কেলেঙ্কারীর একশেষ হইয়া যায়।—

পঞ্চানন ধীরে ধীরে পয়াচারি করিতে লাগিল ; যেন কাহার আসিবার কথা আছে ; আপনমনে সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে……

কিন্তু মনটি স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় পুনরায় কেন্দ্রে আনিতে তখন তাহার

পায়চারিই দরকার।...ঠিক-মানুষের এইটুকু বড় সুখ যে, মন একসঙ্গে অসংখ্য বিষয়ে তাগিদ দিতে থাকিলেও দেহ তাদের একটিকেই প্রাধান্য দিয়া চলে, বসে, ছোটে কি শোয় ইত্যাদি।...কিন্তু এমন মানুষও আছে, যে এই অসংখ্য তাগিদে অস্থির হইয়া ওঠে... কোনো দিকেই দিশা পায় না.. কেবল আকুলি-ব্যাকুলি করে...

ইহারাই কাজ পণ্ড করিবার গোঁসাই—

এবং মন ইহাদের অসুস্থ।

জ্বালা নিবারণই পঞ্চাননের তখনকার প্রধান আকাঙ্ক্ষা ; কাজেই উপার্জনের দিকে দুর্বার একটা তাগিদ সত্ত্বেও সে পায়চারি করিয়া মানসিক দাহ নিবারণ করিতে লাগিল।—

পাশেই ২৯।২ নম্বর।—

কিছুক্ষণ হাওয়া খাইয়া, ঢুকিবে কি ঢুকিবে না ভাবিতে ভাবিতেই পঞ্চানন ২৯।২ নম্বরে ঢুকিয়া পড়িল।...দুইটি একই প্যাটার্নের বাড়ী।...বাঁ দিকে সিঁড়ি ; কিন্তু বিঘ্নবিনাশিনীর নাম স্মরণ করিয়া সে ঘুরিল এবার ডান দিকে।—২৯।১ নম্বরে ডান দিক হইতেই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল।...দেখিল, এখানেও কেরাণী বিদ্যমান ; কিন্তু ইনি একটু অলস প্রকৃতির।—টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কায়-ক্লেশ মোচন করিতেছেন।......

সেই মুহূর্তেই স্তম্ভিত বাধ' বাধ' ভাব কাটিয়া পঞ্চানন সাফল্যের সম্ভাবনায় ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল......বোর্ডিং-এর ছেলেরা যেমন তর্ তর্ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া যায়, পঞ্চানন তেমনি অবাধগতিতে উঠিয়া গেল।

সিঁড়ির সম্মুখেই রেলিং-গাঁথা প্রশস্ত বারান্দা ; বারান্দার কোণেই একটা ঘর, অন্ধকার এবং নিঃশব্দ।...ঘরের সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়াই গলার একটু শব্দ করিয়া পঞ্চানন ঢুকিয়া পড়িল—

কিন্তু আজ বিধাতা বাম।...

তখনই পাশের ঘরে চটির শব্দ এবং সিঁড়িতে জুতার শব্দ যুগপৎ জাগিয়া উঠিল।... চটি যার সে কাহার প্রশ্নের উত্তরে একটু থামিয়া বলিল,—পড়তে যাচ্ছি। চটির শব্দ পাশের ঘরের দরজার বাহিরে আসিল।—

ও কি এই ঘরেরই অধিবাসী ? নিশ্চয়ই তাই। পাশের ঘরে ছিল বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া যায় নাই। সিঁড়িতে খট্ খট্ জুতার শব্দ অবিশ্রান্ত উঠিয়া আসিতেছে।—

—কয়েক মুহূর্তেই অন্ধকার অভ্যস্ত হইয়া—বিছানার সাদা চাদরটা পঞ্চাননের লক্ষ্য হইল...হাঁতড়াইয়া তক্তাপোষের কিনারা পাইল...এবং কালবিলম্ব না করিয়া অক্লেশে তক্তাপোষের নীচে ঢুকিয়া গেল।...সেই নিমিষেই চটির শব্দ সেই ঘরে ঢুকিল ; এবং সিঁড়িতে জুতার শব্দেরও শেষ হইল।......

তক্তাপোষের উচ্চতা অল্প ; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সাড়ে তিন টাকার তক্তাপোষ।—তাহার নীচে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকা যায় বটে, কিন্তু তাহার সময়ের একটা সীমা নির্দিষ্ট করা আছে ; সময়ের সেই সীমাটা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই ঘাড়ের দাঁড়া টাটাইয়া ওঠে। চটি বিজলী বাতি জ্বালিয়া পড়িতে বসিল। তার পড়া সুরু করিবার তোড়জোড় করিতে যে মিনিট পনর গেল তাহার মধ্যেই হেঁটমুণ্ড পঞ্চাননের ঘাড় টাটাইয়া যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল।—

পঞ্চানন ভাবিতে লাগিল,—ছোঁড়া পড়িতে বসিল খাওয়া শেষ করিয়া, না পড়া শেষ করিয়া খাইতে যাইবে ? রাত মোটে আটটা—ইহারই মধ্যে খাওয়া বোধ হয়, হয় নাই।… আর একখানা তক্তাপোষ দেখিতেছি। তিনি আসিবেন কখন!…যদি খাইয়া আসিয়া পড়িতে বসিয়া থাকে তবে, মাল হাতান চুলোয় যাক পলায়নের অবসর মিলিবে কি!… ভাবিয়া লাভ নাই, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।…

পঞ্চানন ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয়বার পদশব্দ ঘরে ঢুকিল—

এবার রোপ্‌সোল। ইনি অন্য সিটের দখলিদার।

রোপ্‌সোল বলিল,—কি হে ভাল ছেলে, সন্ধ্যে না ওৎরাতেই যে বসে গেছ।

চটি বলিল,—মনটা ভাল নেই ভাই, তাই অন্যমনস্ক হচ্ছি।

—ছাই হচ্ছ। "এমন চাঁদের আলো"—ঘরে মন ভাল থাকে কখন! চল ছাতে যাই। দিব্যি জ্যোস্না।

চটি কথা কহিল না।

রোপ্‌সোল বলিল,—ঘরে বসে এমন সন্ধ্যা কাটিও না, মহাপাপ হবে।

পঞ্চানন তক্তাপোষের নীচেয় আশান্বিত হইয়া উঠিল…চাঁদের আলোর এ নিমন্ত্রণ বুঝি সার্থক হয়।……

কিন্তু পঞ্চাননের এ উল্লাসটুকু বাজে খরচ হইয়া গেল।…চটি বলিল,—ছাতে এখন যাব না, জ্যোৎস্নায় মন আরও উদাস হয়ে যায়।

পঞ্চানন মনে মনে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, উদাস! ব্যাটা কত কথাই কইতে শিখেছে! তোমার মাথা খাওয়া গেছে বাবা!…এই বয়সেই জ্যোস্না দেখে উদাস!…হয় হবে উদাস—একটিবার যা।

কিন্তু পঞ্চাননের মনের কামনা চটিকে ঠেলিয়া ছাতে পাঠাইতে পারিল না—সে বসিয়া বসিয়া পড়িতেই লাগিল…জ্যোৎস্নায় তার রুচি নাই।

—তবে পচ। বলিয়া রোপ্‌সোল বাহির হইয়া গেল।

ঘাড়ের হাড় টন্‌টন্‌ করিয়া টাটাইয়া ওঠায় পঞ্চানন পা ছড়াইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসার মত বসিয়াছিল, কিন্তু মানুষের রক্ত-মাংসের দেহে সেটাও অসম্ভব—এই কারণে যে, কঠিন স্থানে কনুই বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিলে সন্ধিস্থলে যেন আগুন জ্বলিয়া ওঠে।…কাজেই বহুবার এ-হাত ও-হাত পাল্টাপাল্টি করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া পঞ্চানন পার্শেলটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। শুইবার সময় খস্‌ করিয়া একটু শব্দ হইল। · চটি চেঁচাইয়া পড়িতেছিল, শব্দটা শুনিতে পাইল না।…পঞ্চানন কাঁপিয়া উঠিয়া ভাবিল,—সর্বনাশ! শুনতে পেলেই গেছলুম।……

কিন্তু যাবার দাখিল করিয়া তুলিল মানবশত্রু মশা। · তাহারা একদল পঞ্চাননের আশেপাশে জুটিয়া গেল · কেহ ধরিল কর্ণমূলে গান…পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ না করিলেও কেহ কেহ যাইয়া পড়িল পায়ে। মশার গান মধুর না হইলেও বিষাক্ত নহে ; কিন্তু হুলে তার বিষ বীজাণু দুইই আছে।… · পঞ্চানন ঘনঘন দেহ আন্দোলিত করিয়া নূতন মশা বসিতে দিল না বটে, কিন্তু যাহারা বসিয়া গিয়াছিল তাহারা শুধু আন্দোলনে বিচলিত হইল না—

তা হয়ও না। যাহারা রক্তশোষণ করে তাহারা আন্দোলনে বিচলিত হয় না এটা আধিভৌতিক, বৈজ্ঞানিক সত্য—

রক্তশোষণের ধর্মই ঐ।

মশক অল্পপ্রাণ জীব, কিন্তু তার জ্বালা অল্প নয়। অমানুষিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া পঞ্চানন মশক-দংশন নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিল।...কিন্তু সময় আর কাটে না—

ছোঁড়া কি মহাভারত শেষ না করিয়া উঠিবে না? ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই?

ঢং ঢং করিয়া খাবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—

সে শব্দে পঞ্চাননের মনে হইল, যেন কত যুগ পরে গুরুভার মর্মবেদনার নীরবতা ভাঙ্গিয়া পৃথিবী সহসা আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি করিতেছে।...কত যুগ সে বন্দী হইয়া আছে···মুক্তি ঐ অদূরে।—

চটি সশব্দে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রোপসোলও "চাঁদের আলো" ছাড়িয়া ঘরে আসিল; বলিল,—তালাটি কোথায় রেখেছ?

শুনিয়া পঞ্চাননের অদূরবর্তী মুক্তি সুদূরে সরিয়া গেল, এবং যাইবার সময় তার মুখেচোখে একটা পাণ্ডুরতা মাখাইয়া দিয়া গেল।...হঠাৎ একটা মানসিক উত্তেজনার ধাক্কায় পঞ্চানন সহসা উঠিয়া বসিবার উদ্যম করিয়াই যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া থাকিয়া সম্মুখে জেলের দ্বার উম্মুক্ত দেখিতে লাগিল।···তবে কি ধরা পড়িলাম।...দরজায় তালা লাগাইবার পূর্বেই হঠাৎ বাহির হইয়া দু'জনকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া কি লম্বা দেওয়া যায় না!···খুব দ্রুতবেগে অথচ শব্দটি না করিয়া তক্তাপোষের তলদেশ হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু নিঃশব্দে নির্গত হওয়াই অসম্ভব...খস্‌খস্‌ খুঠখাট একটু শব্দ হইবেই। আচ্ছা দেখা যাউক।—

তালা খুঁজিয়া লইয়া দরজায় লাগাইয়া দিয়া ছেলে দু'টি খাইতে গেল।···পঞ্চানন তক্তাপোষের তলাকার পিঠটার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—এ পিঠটা পালিস করে না কেন। সে কথা যাক—এখন উপায় কি?···আছে, উপায় আছে।···ছেলেরা বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িলে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া—শব্দ একটু হইলই বা, মনে করিবে ইঁদুর টিঁদুর—আস্তে আস্তে বাহির হইয়া হুট্‌ করিয়া দরজা খুলিয়া হৈ চৈ চিত্তাকর্ষক হইবার পূর্বেই দৌড় দিলেই—

কিম্বা এখনই দরজার পাশে একেবারে খাড়া-চৌকাঠ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া যদি থাকা যায়, আর দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি মারিয়া ভয় দেখাইয়া—

কিন্তু ছেলেরা বেজায় আড্ডাধারী—

পড়াশুনা ত' অষ্টরম্ভা, কেবল বাপমায়ের টাকার পিণ্ডি চট্‌কান'—

খাওয়াদাওয়ার পর পাঁচসাতজন এক একটা ঘরে বসিয়া অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক দেড়েক ধরিয়া আড্ডা দিয়া থাকে; যদি পাঁচ সাতজন একসঙ্গে এই দরজার সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়ায়।······কাজ কি অতশতয়। প্রথমটাই ভাল।

···দেখিয়া রাখি কোথায় কি আছে, যাইবার সময় ফাঁকতালে যদি কিছু সরাইতে পারা যায়। ফাঁক অবশ্য পাওয়া কঠিন; তবু······

পঞ্চানন চিৎ হইয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া ঘষিয়া আসিয়া শরীরের অর্ধেকটা তক্তাপোষের বাহিরে আনিয়াছে এমন সময় দরজার বাহিরে কে যেন ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল,—কে?

পঞ্চাননের বুক ধড়ফড় করিয়া নিশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।······

কিন্তু তাহাকে নয়।

বাহিরে কে একজন বলিল,—আমি।

—প্রভাত ? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ, আমি হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছি।

পঞ্চানন মনে মনে বলিল,—ঢের বেশী চমকেছি আমি।

বুকের ধড়ফড়ানি থামিলে পঞ্চানন মাথাটা ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল, কোথায় কি আছে ; দেখিল—যে-ছেলেটি পড়িতেছিল তাহার টেবিলের উপর একটি রিষ্ট্-ওয়াচ্ রহিয়াছে—চোরাই মালের দামে তার দাম তিন টাকা কি তের সিকে ; মণিব্যাগ একটা আছে বটে, কিন্তু তার চোপসান পেট দেখিয়া মনে হইল তার গর্ভে কিছু নাই ; একটা ফাউন্টেন পেন রহিয়াছে ; পঞ্চাননের মনে হইল, নূতনই তার দাম দশ আনার বেশী নয় ; আলনায় মামুলি চাদর, জামা, ছাড়া-কাপড় রহিয়াছে...ইত্যাদি।

ওধারকার রোপ্‌সোলের টেবিল দেখিতে পাওয়া গেল না ; চিৎ অবস্থায় সেটা পঞ্চাননের পিছনে পড়িয়াছিল।—

ছেলেরা খাইয়া আসিল—

কিন্তু তৎপূর্বেই পঞ্চানন স্বস্থানে প্রবেশ করিয়াছে।···পঞ্চাননের নাকে রোপ্‌সোলের বিড়ির এবং চটির সিগারেটের একটা মিশ্রগন্ধ আসিতে লাগিল।...রোপ্‌সোল দু'টানেই বিড়ির ঘুন্‌সী পর্যন্ত আগুন আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল—

কি চাওয়া যে চেয়ে গেল
মৃগনয়নী—
বুকে রক্ত তোলপাড়,
নাচে ধমনী !
যৌবন লুটাতে চায়
তারি পায়, তারি পায় ;
দোলে প্রাণ ঢেউ লাগি
যেন তরণী।
তার সেই চাহনিতে
বিষ ছিল কি—
ঢেলে দিয়ে গেছে তাই
ছলে ঝলকি !
মিলাল বিদ্যুৎরেখা—
কোথা তার পাব দেখা,
জ্বলে প্রাণ, জ্বলে—
শূন্য ধরণী।
কি চাওয়া যে চেয়ে গেল—হা।...

সোমের স্থানে হা দিয়াই রোপ্‌সোল বলিল—বউয়ের চিঠি পেলাম আজ আবার।

চটি বলিল,—বেশ ঘন ঘন লেখে ত' !

—লিখবেই ত। চোদ্দ বছর বয়েস, লিখবে না ?

—পড়, শুনি।

—একটুখানি সবুর কর। চোদ্দ বছরটাকে একবার অনুভব ক'রে নি।

মিনিটখানেক নিঃশব্দে গেল।

চটি বলিল,—কিরকম বোধ করলে ?

—গরম। আঃ হা হা। শাঁস জমে নিরেট হ'তে সুরু করেছে। আ হা হা।...

—মসগুল যে। আমারও দিন আসবে হে আসবে ; তোমরা তখন—

—কবে আসবে ? আসতে আসতে ওদিকে যে যাবার সময় হয়ে আসবে। সত্যি ভাই, ষোল আনা সুখ যদি কোথাও থাকে তবে চোদ্দ বছরেই আছে।

—বিরহেও ?

—তুমি নেহাৎ একটি ভোজপুরী খোট্টা, রসশূন্য। সুখ ত' বিরহেই। কাঁচা মাংস যেমন অচল, শুধু মিলনও তেমনি অচল। ধ্যান ক'রে মনটাকে কেমন তৈরী ক'রে নিচ্ছি—সেও নিচ্ছে। যখন দেখা হবে তখন—

বলিয়া সে থামিল।

চটি বলিল,—তখন কি ?

—দু'জনেই পরিপক্ব ; বিরহের তাতে পেকে লাল হ'য়ে আছি......দুই বুকের মাঝখানে ফুলের মালার ব্যবধানটাও সইবে না।

—আমাকেও যে তাতিয়ে তুললে হে।

—চোদ্দ বছরের ধর্মই ঐ। যে শোনে সেও তাতে।

—এখন চিঠি শোনাও দেখি।

পঞ্চানন অবিবাহিত, কিন্তু রসগ্রাহী।...মশকের দংশনজ্বালা ভুলিয়া সে ছেলেদের কথাগুলি বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল।

চৌদ্দ বৎসর যার স্ত্রীর বয়স সে বলিল,—শোনো। অবহিত হয়ে শোনো। প্রিয়া লিখছেন—

প্রাণাধিক, তোমার চিঠি পেলুম। তুমি কত কথা লিখেছ, আমি তোমার সব কথা ভাল বুঝতে পারিনি। তুমি জানতে চেয়েছ, আমি তোমাকে ভালবাসি কি না। ইহা জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় নি। স্বামীকে কে না ভালবাসে ?

চটি বাধা দিয়া বলিল—এই মরেছে। এ যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর চিঠি। রস কই ?

—আছে, বন্ধু, আছে। সিঁড়ি ভাঙতে হবে, নইলে স্বর্গে উঠবে কি করে !

রোপ্সোল বিষবৃক্ষ পড়িয়াছে।

চটি বলিল,—আচ্ছা, তারপর ?

রোপ্সোল পড়িতে লাগিল,—স্বামীকে কে না ভালবাসে ? তোমার মুখখানা সব সময়ই আমার মনে পড়ে। স্বপ্নেও দেখি যেন তুমি আমায় আদর করছ। ঘুম ভেঙে দেখি, গায়ে কাঁটা দিয়ে আছে।

শ্রোতা চটি বলিল,—দেবারই কথা।

পাঠক রোপ্সোল বলিল,—ভেবে দেখো, কত বড় কথাটা লিখেছে—গায়ে কাঁটা দিয়ে আছে !...ইস্। আমার একটা দুঃখু রয়ে গেল, ভাই।

—কি দুঃখু ?

—আমি ছুঁলে তার গায়ে কাঁটা দেয়, দেয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইটে আমি চোখে কখনো দেখতে পেলাম না। দেখতে পেলে বেশ জমে কিন্তু।

—সামনাসামনি বোধ হয় অন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্বপ্নে শিহরণ, কিন্তু জাগ্রতে স্বেদ। যাক, তারপর ?

—আগের চিঠিতে চুমু দিতে ভুলে গেছলুম তাতে তুমি রাগ করে লিখেছ, এই বয়সেই চুমু দিতে যে ভুলে যায় সে পাষাণ। তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি রাগ করো না। সেবারকারটা এখুনি দিলুম। নিলে ত'?

মনের কথা ভাল করে আমি লিখতে পারিনে। তাতে কি তুমি রাগ কর? তোমাকে দেখবার আশায় আমি সর্বদাই ব্যাকুল। মনে হয় তোমার কাছে ছুটে যাই।

চটি বলিল,—তা বেশ ত' আসুন না। আমরা না হয় একটা ঘর ছেড়ে দেব।

রোপ্সোল বলিল,—তুমি একটি ছাগল। হাটের মাঝে প্রেম হয়? মনে কর ব্রজাঙ্গনাদের কথা…তাঁরা বৃন্দাবনের বাজারে বসে প্রেম করেননি, প্রত্যেকের একটি করে কুঞ্জ ছিল।

চটি বলিল—তা সত্যি।

রোপ্সোল বলিল—আমার মনে হয় কি জানো? আমাদের ভালোবাসাটা বরাবর ঘোরাল থাকে না এই জন্যে যে, নিরিবিলি ভাবটা, শুধু আমরা দু'জন, এই ভাবটা, বেশীদিন থাকতে পায় না।

—যায় কিসে?

—একান্নবর্তী পরিবারের গোলে যায়; তার উপর ছেলে-পিলে হলে ত' একেবারে সে কুরুক্ষেত্রের হাঙ্গামা ঘরের ভেতর। কার সাধ্য—যাক, তার কোনো উপায় নেই। …তারপর শোনো।—ছুটে যাই। কিন্তু উপায় নাই। দূরে থেকেই সব জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে। একটিবার আসতে পার না? দু'দিনের জন্যে? যদি পারো তবে এসো।

ভাল আছি। আর সবাই ভাল আছেন। আমার প্রণাম নিও। চুমু। ইতি—

তোমারই সেবিকা ঝরণা।

চটি বলিল,—এ নামটা নূতন শুনছি।

আগের চিঠিতে ঐ নাম রেখেছি। হাসির ঝরণা, প্রেমের ঝরণা, প্রাণের ঝরণা, রসের ঝরণা কি না!

—চিঠিরও ঝরণা।

—সে আমরা দু'জনেই।

—ডেকেছে, যাবে নাকি?

—কি করে যাই বল, একটু কারণ না দেখাতে পারলে বাড়ীতে বড় লজ্জা করে।

শুনিয়া এত কষ্টের মধ্যেও পঞ্চানন ঠোঁট মুচড়াইয়া একটু হাসিল।

চটি বলিল,—আলো নিবিয়ে দেব?

—একটু পড়ব কি না ভাবছি।

—এই যে পড়লে! এইবার শুয়ে পড়ো।

……তক্তাপোষের পায়া বাহিয়া ছারপোকা নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ছারপোকা সন্ধান পায় একটু বিলম্বে, কিন্তু নামে একেবারে ডিম্বটি পর্যন্ত…

একটি পঞ্চাননের ঘাড়ে এবং একটি পঞ্চাননের পায়ে যুগপৎ শুঁড় ফুটাইয়া দিল… পঞ্চানন নড়িয়া উঠিল এবং ঘাড়েরটাকে ঘাড়ের সঙ্গেই টিপিয়া মারিল।…পা-খানা একপাশে একটু কাৎ করিয়া অন্যটাকে বঞ্চিত করিল বটে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য।—

চটি উঠিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ড্যাণ্ডা লাগাইয়া দিল···আলো নিবাইয়া দিয়া দু'জনেই শুইয়া পড়িল।

রোপ্‌সোল বলিল,—ছুটির আর কত দেরী ?

চটি বলিল,—হি হি হি। এখনো তিন মাস।

—তিন মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কি বল ?

—তা যেতে পারে।

—যেতে পারে কিরকম ? যাবেই।

—তা ছাড়া আর সান্ত্বনা কই। তিন মাসকে যত লম্বা করে দেখবে কষ্ট তত বেশী।

মিনিট দুই দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল।—

ওরা দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই পঞ্চাননের মনে একটু আশার আলোক প্রবেশ করিয়াছিল ; দু'জনে চুপ করিতেই আলোর তেজ একটু বাড়িল ; কিন্তু ছেলেদের, বিশেষ করিয়া এই দু'টির, পড়ায় যেমন অমনোযোগ, চোখেও তেমনি ঘুম নাই।......

রোপ্‌সোল বলিয়া উঠিল,—আজ এক ব্যাটা ফড়ে দোকানদার আমায় বড্ড ঠকিয়েছে, ভাই।

— কি রকম।

—আসছি বৌবাজার দিয়ে। পুরণো ল্যাম্পট্যাম্পগুলো নিয়ে মাটিতে দোকান পেতে যারা বেচে তাদেরই একজন। দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে একটা বাতিদান আমার পছন্দ হয়ে গেল, দিব্যি ফুলদার। দাম বললে আট আনা। আট আনাই দিয়ে চলে আসছি, তখন সে বললে, মশাই, ভুল হয়েছে, ওটির দাম এক টাকা। আমি বললাম,—এখন দাম বাড়ালে চলবে না। তুমি নিজে চাইলে আট আনা, আমি বিনা বাক্যে দিলাম, এখন বলছ এক টাকা। কথাটা ত' ব্যবসাদারের মত হল না। সে বললে—একটাকাই দিতে হবে ; যদি নিতে চান, না হয় রেখে যান। ·····চন্ করে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল ; ঝনাৎ করে আর একটা আধুলি তার সামনে ফেলে দিয়ে বাতিদানটাকে একখানা ইঁটের ওপর রেখে একখানা ইঁট দিয়ে ছেঁচে তার দোকানে ফেলে দিয়ে চলে এলাম। রাস্তার লোক সব অবাক হয়ে গেল।

চটি বলিল,—দোকানীর ত' ভারি লোকসান হল তাতে !

—হল বৈকি। কতজন তাকে কথা শুনিয়ে গেল।···আরো দু'চারজন যারা দোকানে বসে জিনিস পছন্দ করছিল তারা সরে পড়ল।

—আমারও একদিন প্রায় ঐ রকমই হয়েছিল। বলিয়া চটিও ঠন্‌ঠনিয়ার এক অসৎ দোকানদারের কারচুপির একটী দৃষ্টান্ত দিল।···

ইতিমধ্যে অধোগামী ছারপোকার সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কাপড়-জামার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহারা পঞ্চাননের দেহ যেন শরশয্যার উপর তুলিয়া দিয়াছে।··· তৎসত্ত্বেও তার চোখের চারিটি পাতা ঘুমের আঠায় যেন জড়াইয়া জড়াইয়া আসিতে লাগিল।.... সমস্ত দিনের শ্রান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, তার উপর স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষুধায় দুর্বল।······পঞ্চাননের হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল।—

......বেপরোয়াভাবে তক্তপোষের নীচে হইতে বাহির হইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাই······আর ভয় করিলে চলিতেছে না······ধরা পড়িয়া মার খাওয়াও ভাল,

কিন্তু এ অবস্থায় আর নয় .....ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চাননের দিব্যদৃষ্টি লোপ পাইতে পাইতে হঠাৎ রহিয়া গেল।—

......মার ত' আছেই ; তারপর যদি পুলিসে দেয়......নিষ্ফল চেষ্টার অপরাধেও দাগীর খুব লম্বা জেল হয়। এতক্ষণে পঞ্চাননের ভগবানকে মনে পড়িল ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া আসিল। ·· কিন্তু সে উত্তপ্ত আকুলতা ভগবানের পায়ে পেঁছায় নাই ইহা ঠিক।...

দশটা বাজিল—

ছেলেরা গল্প করিতেই লাগিল...প্রফেসারদের গল্প, বন্ধুবান্ধবের গল্প ;—নিন্দাই তার বেশীর ভাগ ;—খরচপত্রের গল্প, বিলাতের গল্প, রাজনৈতিক গল্প......

অবশেষে রোপ্‌সোল বলিল,—শুনেছ হে, ভারতবর্ষে নাকি আটলক্ষ শিক্ষিত লোক কাজের অভাবে বেকার বসে আছে ;

চটি বলিল,—আমাদেরও থাকতে হবে।

—আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থগুলো কালে লোপ পেয়ে যাব।

—যদি শিক্ষার অভিমান না ছাড়তে পারি।

—অভিমান ছাড়লে উপায় আছে নাকি ?

—আছে, মানে নতুন কিছু নেই। এখন যে-কাজ অশিক্ষিত লোকে করছে সেই কাজ আমাদের করতে হবে।

—যথা ?

—কামার, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি—

—তা হলেও ত' লোপ পাওয়াই হল। আমরা মরব না বটে, কিন্তু আমরা আর আমরা থাকব না। মধ্যবিত্তশ্রেণী লোপ পাবেই, তাতে—

* * * * *

সকালবেলা ছেলেরা মুখ ধুইতে গিয়াছে—

সেই অবসরে চাকর ছোঁড়া ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল,—বাবুগো, খাটের নামোতে কে রয়েছে।—

পাশের ঘর হইতে একটি ছেলে বাহির হইয়া বলিল,—কে রে ?

ছোঁড়া বলিল,—কি জানি, বাবু। দেখুন এসে।

—চল্ দেখি। বলিয়া পাশের ঘরের ছেলেটী তার নির্দেশমত হামা দিয়া দেখিল, তক্তাপোষের নীচে কে একজন কাগজের একটা পার্সেল মাথায় দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। ...চক্ষের নিমেষে এই আবিষ্কারের সংবাদ ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল—খাটের নীচে শুয়ে কে ঘুমুচ্ছে, দেখুন এসে...

পশু ঝাঁটা হাতে করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—আমি আগে দেখেছি, বাবু।—

চটি ও রোপ্‌সোলও, "কোথায় কোথায় ?"—জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদেরই ঘর লোকে পূর্ণ হইয়া গেছে।...সবাই হেঁট হইয়া জানু পাতিয়া একবার করিয়া পঞ্চাননকে দেখিয়া লইল ; এবং চটি ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়া নিজের ছিন্নকণ্ঠ চোখের সামনে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এত বিক্ষোভেও পঞ্চাননের নিদ্রাভংগ হইল না।—

যশোদা বলিল,—ঢুকল কখন ?

কেহ তাহা জানে না।

হেমন্ত বলিল,—জাগাও লোকটাকে। বলিয়া নিজেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া ডাকিল,—মশাই, উঠুন, ঢের বেলা হয়েছে।

মশাই উঠিলেন না।

বামন গলার আওয়াজের জন্য বিখ্যাত ; বলিল—মিহি গলায় কাজ নয়। আমি দেখি। বলিয়া সে ডাকিল—কে আপনি তক্তপোষের নীচে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ?

আওয়াজে কাজ দিল—

পঞ্চাননের ঘুম ভাঙিল—এবং চোখ খুলিয়া দেখিল, তক্তপোষের তলাটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে···

হরেন বলিল,—জেগেছে ?

বামন পঞ্চাননকে চোখ খুলিতে দেখে নাই ; বলিল—বোধ হয় না।

রমেশ হুকুম দিল—গুঁতোও।

শুনিয়া পঞ্চানন আপসে নড়িয়া উঠিল···

এবং চোখ ফিরাইয়াই সে যে-দৃশ্য সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইল ছাগবলি আর রক্তমাখা বলির খাঁড়া গোঁসাইয়ের চক্ষে তত কঠোর দৃশ্য নহে। কিন্তু দেখিল অতিশয় সাধারণ দৃশ্য···দুই জোড়া চক্ষু, আর অসংখ্য পা।—

তক্তপোষের তলাটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াই তার মনে ভবিষ্যতের একটা ইতিহাসের প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল। অতগুলি পা কাছাকাছি এক জায়গায় দিবালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সেই ইতিহাসের সীমায় দৈত্য নাচিতে লাগিল।—

বামন বলিল,—জেগেছেন, আমাদের পানে চেয়ে রয়েছেন।—পঞ্চাননকে বলিল,—দয়া ক'রে বেরিয়ে আসুন। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে।

পঞ্চাননের মনে হইল, এই বিদ্রূপে যেন জেলখানার অসংখ্য সিপাই অসংখ্য কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।···কিন্তু ভগবানের মস্ত একটা আশীর্বাদ এই যে, বিপদের যখন কূল থাকে না মন তখন নিরালম্ব অসাড় হইয়া পড়ে।—

পার্সেলটা কোণের দিকে সরাইয়া দিয়া পঞ্চানন টানিয়া টানিয়া নিজেকে তক্তপোষের বাহিরে আনিল, এবং ছেলেদের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ভাবহীন স্থিরদৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেরা কেবল কোলাহল করিতেই জানে, কাজের ব্যবস্থা করিতে জানে না।···এই সময় ম্যানেজারবাবু সংবাদ পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িলেন, এবং তাঁর আগমনেই দেখিতে দেখিতে একটা ব্যবস্থা হইয়া গেল। তিনি বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক এবং ক্রোধে লাল হইয়া গেলেন ; গর্জন করিয়া বলিলেন,—কে তুমি ?

পঞ্চানন তাঁহার দিকে চোখ আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—আজ্ঞে আমি চোর। নাম আমার পঞ্চানন। চোরকে ক্ষমা করুন ; আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে।

ছেলেদের কুশল অকুশলের দায়িত্ব ম্যানেজারবাবুর। তিনি ছারপোকার কথা জানেন না ; তাই দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন,—সাজা কি হয়েছে, ধন ? তক্তপোষের নীচে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে উঠ্‌লে। এ সিট্ কার ?

চটি বলিল, আমার।

—কিচ্ছু টের পাওনি ?

—আজ্ঞে, না।

—আশ্চর্য !···পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কখন ঢুকেছিলে ?

—সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।

ম্যানেজারবাবু বলিলেন,—উঃ কি দুঃসাহস ! তোমাকে নিয়ে কি ক'রব তাই ভাবছি।—বলিয়া তিনি লোকটার আস্পর্দ্ধায় এবং নিজের কর্তব্যের ভাবনায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।—

ক্ষীরোদ বলিল,—ছেড়ে দিন্, সার।

এ অনুরোধ বাহুল্য—এমনিভাবে ঘাড় নাড়িয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন,—উঁ হু, কিছুতেই না !···এতবড় সাহস যে আমার বোর্ডিং-এ ঢুকে তক্তপোষের নীচে শুয়ে ঘুমোয়।···ব্যাটা খুনে···যদি কিছু ঘটত আমি কি কৈফিয়ৎ দিতুম বল দেখি।··কত বড় একটা বদনাম আমার হ'ত।···দেখ, ওর পকেট, ট্যাঁক সব দেখ ; তারপরে ব্যবস্থা করছি।—বলিয়া ম্যানেজারবাবু চোখ পাকাইয়া তুলিলেন।

পঞ্চাননের পকেট আর ট্যাঁক্ দেখিবার কাজে তিনজন লাগিয়া গেল তার জিব হইতে জুতা পর্যন্ত খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু অপরাধের প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না।—

রসিকমত একটা ছেলে পঞ্চাননের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে বলিল,—পয়সা-কড়ি নেই, থাকলে বাজত।

শুনিয়া ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।···দু' একজনের অদৃষ্ট এমন ভাল থাকে যে রসিক বলিয়া তার একটা অযোগ্য খ্যাতি যেন কেমন করিয়া বাহির হইয়া যায়। ওই ছেলেটা সেই দলের ; কিন্তু সেই অযোগ্যতার শাস্তি একদিন না একদিন আসেই—স্তাবকের দল না জানিয়াই পাঠাইয়া দেয়।

যাই হোক, ম্যানেজারবাবু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন,—ইচ্ছে করছে, তোমাকে জ্যান্ত কবর দি ; কিন্তু তা দেব না। ··আর কখনো এ দিক মাড়াবে ?

পঞ্চানন বলিল,—না।

—চোর ধরা পড়ে' ও-রকম বলে থাকে। জেল খেটেছ ক'বার ?

—চারবার।

—কি সর্বনাশ ! চারবার ? এবার তোমার স্বেচ্ছায় ফাঁসি যাওয়া উচিত।

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল,—চুরি করতে এসে ঘুমুলে কি করে ?

পঞ্চানন আনুপূর্বিক সব বলিল,—শেষে বলিল,—ওঁরা বলছিলেন, ভদ্দরলোকেরা সব লোপ পাবে যদি তারা ছুতোর মিস্তিরির কাজ না করে।···ঐ পর্যন্ত জানি···তার-পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি, শ্রান্ত ছিলাম...কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারিনি।

এই অবসরে ম্যানেজারবাবু কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।···পঞ্চাননকে জীবন্ত কবর দিবার ইচ্ছা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেও, তাহার গায়ে হাত দিবার সাহসও ম্যানেজারবাবুর হয় নাই।...রাস্তাঘাটে বেড়াইতে হয়—দলের কেউ যদি ছুরিই মারে।—পুলিসে দিলে সাক্ষিসাবুদের হাঁটাহাঁটির অনেক ঝঞ্ঝাট।

সুতরাং তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিলেন,—এবার ছেড়ে দিলুম। ফের যদি এদিকে তোমায় দেখি তবে মেরে হাড় থেকে মাস ছাড়িয়ে দেব।—যাও ত' হে, তোমরা চার-পাঁচজনে ওকে একেবারে রাস্তার ওপারে দিয়ে এস।—বলিয়া তিনি আংগুল তুলিয়া

জানালা দিয়া আকাশের প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন…যেন রাস্তার দুই পায়ের মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদী রহিয়াছে।—

বোর্ডিংশুদ্ধ যাইয়া পঞ্চাননকে রাস্তার ওপারে রাখিয়া আসিল।—

## তিন

### রাণী শান্তমণি

আমি একটা ছেলেকে জানি যার আঠারটা নাম। অনেক আরাধনা আর ধন্নার পর তার জন্ম হয়েছিল—তাই তার প্রথম নাম হ'ল আরাধনা, তারপর ধন্না—এবং তারপর খুড়ো খুড়ি পিসে পিসি প্রভৃতি যেখানে যে ছিল সবাই একটা ক'রে নাম রাখল…মোট দাঁড়াল আঠারটা।

যার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে এই গল্পের প্রস্ফুটন হবে তার নাম মাত্র দুটি—রাণী আর শান্তমণি। রাজমহিষী সে নয়, তবু কোন্ রাজ্যের সে রাণী, আর কেন সে রাণী তা পরে দেখা যাবে।

রাণী শান্তমণির দুগ্ধফেননিভ শুভ্র দেহ, অন্য রঙের কলঙ্ক কোথাও নাই।

বুড়ো আর বুড়ী তাকে মানুষ করে—কিন্তু বুড়ীর একদিন সজ্ঞানে নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। বুড়ো দাঁড়িয়ে কাঁদছিল—বুড়ী ইসারা ক'রে বললে, রাণীকে সামনে আনো।

বুড়ো রাণীকে দু'হাতে করে তুলে এনে আড়-কোলে করে তার সামনে দাঁড়াল…

সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুড়ীর চোখ ঘোলা হ'য়ে এল—দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে বালিশে পড়ল…বুড়োর কোলের ভেতর থেকে রাণী ডাকল—মিউ ; ডেকে চোখ বুঁজল।

বুড়ী ম'ল—

রাণী বুড়ীর বুক থেকে খসে পড়ল বুড়োর বুকে। বুড়ী থাকতে রাণী শান্তমণি বুড়ো বুড়ী দু'জনারই ছিল—বুড়ী ডাকত, রাণী !—বুড়ো ডাকত, শান্তমণি !

রাণী শান্তমণি ছিল দু'জনার, হ'ল একজনের একার, আর একজনের একার দায়।… শান্তমণি শুয়ে থাকে, ছুটে বেড়ায়, আরশোলার সাথে লুকোচুরি খেলে, ওৎ পাতে, চড়ুই ধরতে চায়, চড়ুই উড়ে গেলেও তাকিয়ে থাকে—

অক্ষয় নিস্তেজদৃষ্টি প্রাণপণে বিস্ফারিত ক'রে তা দেখে—আহ্লাদে তার প্রাণ, আর চোখে তার জল, টল্‌টল্ করে—

কিন্তু ভয়ও খুব, শত্রুও অনেক—

রাণীর স্বজাতিরা আসে—বদ্‌সংগ ব'লে তাদের তাড়িয়ে দিতে হয়, দস্যুর মত দুর্দান্ত আর হিংস্র কুকুর একটা আসে—তখন শান্তকে নিয়ে শশব্যস্ত হ'তে হয়…

অক্ষয় খোঁজ নিয়ে জেনেছে, খোঁয়াড়ে কুকুর নেয় না।…এদিকে অক্ষয়ের পাঁজরে তেমন জোর নেই—চেঁচিয়ে ডাকতে গেলে পাঁজরের হাড়ে খিল ধরে…রাত্তিরে হাঁতড়ে তাকে ধরতে গেলে গায়ে পায়ে কাঠের লোহার ধাক্কা লাগে।

প্রাণ কেবলই বুকের ভেতর আট্‌কা পড়ে আছে, এ-কথা যে বলে সে নিজের প্রাণের কথা জানে না ; প্রাণ ছড়িয়ে আছে—ছুটে বেড়ায় ; গুটিয়ে এসে বুকের ভেতর জড়ো হওয়ার নামই মৃত্যু।

বুড়োর প্রাণ শান্তমণির পিছু পিছু ছোটে—বুড়ো মরতে চায় না। আফিমের ঘোরে বুড়োর মনে হয়, শান্তমণি বিড়াল নয়—তাদের সন্তান ; গুণবতী যেমন চক্রপাণি আর বিমলার সন্তান, কুসুম যেমন বলরাম আর কৌশল্যার সন্তান, তেমনি। মায়ের স্তন ছেড়ে সে বুড়ীর কাছে ঝিনুক ধরেছিল—এখন নিজেই জিব দিয়ে তুলে তুলে খেতে পারে ; মাছের কাঁটা বেছে দিতে হ'ত—এখন তার কাঁটার ভয় নেই…

ভাবতে ভাবতে অক্ষয়ের স্তিমিত চক্ষু আনন্দে আরো স্তিমিত হ'য়ে আসে…দেখে, শান্তমণি এক হাতে একটা তিনসেরী বাটির একবাটি ইলিশমাছ ভাজা, অন্য হাতে পাঁচ-সেরী বাটির একবাটি সরসমেত ঘন-আওটা দুধ নিয়ে সুমুখে দাঁড়িয়ে—"কে এসেছে দেখ" বলে হাসছে…

"শান্তু।" বলে চেঁচিয়ে উঠেই অক্ষয়ের ঘোর ভেঙে যায়—চোখ মেলে চেয়ে দেখে শান্তমণি পাশেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অক্ষয় তাকে তখন কল্পিত ইলিশমাছ আর দুধ আনার কৃতজ্ঞতায় বিভোর হ'য়ে দু'হাতে করে আলগোছে কোলে তুলে নেয়।

বুড়ো বুড়ো হয়েছে ; তার মনে হয়, প্রাণটা যেন বুকের ভেতর গুটিয়ে আসছে… সময় সময় সব ভুলে গিয়ে সে অজ্ঞাত যাত্রাপথের যেখানে সুরু সেখানে এসে ঝিমিয়ে পড়ে—

সজাগ হয়েই মনে পড়ে—শান্তমণি ?

কিন্তু শান্তমণি কোথাও যায় নাই—এখানেই আছে।

সে অভাবে শান্তমণি কার হবে, এই হয়েছে অক্ষয়ের ভাবনা। রতির ইচ্ছে ছিল রাণীকে বোন মতির হাতে দিয়ে যাবে ; কিন্তু মতি রতির মোটে তিন বছরের ছোট—তার দিনও ত নিকটবর্তী…কাজেই মনঃস্থির করে রতির মরা হয় নাই।

মতি পাশেই থাকে ; তার তিনটী ছেলে বর্তমান ; বড় চারটি বড় হ'য়ে মারা যেয়ে এখন যে বড়য় দাঁড়িয়েছে তার নাম বোনা আর বয়স ষোলো। বোনা ছেলেটি আদৌ ভাল নয়। তাকে নিয়ে মুস্কিল এই যে রাগলে সে কি করবে তা বোঝা যায় ; কিন্তু তার রকম দেখে মনে হয় ঠাণ্ডা মেজাজে সে সব পারে—হাঁড়ি ভেঙে চুরমার করা থেকে চ্যালাকাঠে করে পিটিয়ে গর্ভধারিণীকে হত্যা করা পর্যন্ত…অথচ বোনার কথাবার্তা ভালমানুষের মত—অবাধ্য যে বেশী তা-ও নয়। এই সব কারণে ধাঁধায় পড়ে রতি তাকে ভয় করে চলত—অক্ষয় তাকে বিশ্বাস করে না।

আর আছে একজন—অক্ষয়ের ছোট ভাই অনন্ত। অনন্ত থাকে ভিন্ন গ্রামে, পোয়াটেক মাঠ পেরিয়েই বক্সীপুরে—ও পাড়া বললেই চলে।…শান্তমণিকে নিয়ে অক্ষয়ের মন এই দুই স্থানে দোলায় চেপে যাতায়াত করে।

তারপরও একটা কথা আছে ; কথাটা দামী এবং যজ্ঞেশ্বরের অনুকূলে ; তা এই যে, মতি আর যজ্ঞেশ্বর পাশেই থাকে…মৃত্যুর পর আত্মা জানতে পেরে সুস্থ থাকবে যে, শান্তমণি যেন এই বাড়ীতেই আছে…আগের মতই ঘুরছে ফিরছে, চোখ বুঁজে আরাম করছে। অনন্ত থাকে দূরে—এ-বাড়ীর উপর তার মায়া নাই বোধ হয়।

…অক্ষয় বলল, কিন্তু পারবি তুই যত্ন করতে ?…মাছ কড়া ভাজা হলে খায় না ; দুধ আউটে সর পড়িয়ে তাকে দেবার সময় আবার কুসুম কুসুম গরম করে দিতে হয়। পারবি ?…বলে অক্ষয় যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে আশা করে চেয়ে রইল।

—সব পারব, দাদা। বলে অক্ষয়ের ভায়রা-ভাই যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

অক্ষয় বিমর্ষ হয়ে বলল,—কিন্তু তোর ছেলে বোনাকে যে বিশ্বেস নাই—সে যদি বিরক্ত করে কি মারধোর করে ?

—হাড় গুঁড়িয়ে দেব তার। আমায় ত' তুমি চেন।

—চিনি ভাই তোমাকে।...এই কথাই রইল তা হ'লে—আমি অবর্তমানে এই ঘর-দুয়োর তোমার ; সিন্দুক প্যাঁটরা থালা বাসন ঘটি বাটি খাট খাটিয়া যা দেখছ সব তোমার—কিন্তু যতদিন শান্তমণি জীবিত থাকবে ঠিক ততদিন—তারপর এসব আমার ছোট ভাই অনন্তের হবে।

—কিন্তু সে যে উড়নচণ্ডে লক্ষ্মীছাড়া !

—তা-ই বলেই তাকে পরে দিচ্ছি।...অনন্তকেও আমি বলে যাব আমার শেষ ইচ্ছেটা দশজনের সামনে...সে এসে খোঁজ খবর নেবে—যদি শান্তমণির অযত্ন হচ্ছে দেখে তবে সে ঘরবাড়ী সব কেড়ে নেবে—এ-ক্ষমতা আমি তাকে দিয়ে যাব। আমার উইলে এ-সবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।...কি বল ?

শান্তমণি মাথা তুলে একবার হাই তুলে পা ছড়িয়ে সটান্ হয়ে রইল...

সেইদিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর বললে—সে তোমার ইচ্ছে, দাদা। তোমাকে বড় ভাই ছাড়া আর কিছু কোনোদিন ত' ভাবি নাই।

—কিন্তু তোমার ছোট ছেলে মোনার উপর আমি ভারি বিরক্ত হয়ে আছি।

—কেন, কেন ; কেন, দাদা ?

—সেদিন দেখলাম, আমার বাড়ীতে এসে সে শান্তমণির লেজ ধরে টানছে। আমায় দেখতে পেয়েই পালিয়ে গেল।

—কে, মোনা ? বটে ?—বলে যজ্ঞেশ্বর নিজের বাড়ীর দিকে মুখ করে "মোনা, মোনা" করে দুবার হুংকার ছাড়ল···

মোনা তার মায়ের কাছে বসে উকুন বাছাচ্ছিল—ও বাড়ী থেকে যজ্ঞেশ্বরের ডাক আসছে শুনে মোনার মা মোনার মুখ আঁচল দিয়ে মুছে সুন্দর করে দিল ; বলল—যা, ডাকছে।

মোনা লাফিয়ে এসে দাঁড়াতেই মোনার বাবা তার মাথায় হাতের মুঠোর তিনটি ঠোক্কর ঘন ঘন লাগিয়ে দিল···

'কি বলছ ?' বলে যে প্রশ্নটা মোনা মুখে করে এনেছিল তা সে গিলে ফেলল···

যজ্ঞেশ্বর চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর টানবি বেড়া—শান্তমণির লেজ ধরে ?

মোনা বলল—না।···আর পরিচ্ছন্ন মুখখানা চোখের জলে ভেসে গেল।

যজ্ঞেশ্বর তাকে যেতে বলে তাকিয়ে দেখল অক্ষয় খুসী হয়েছে।···বলল, আসি দাদা, এখন।

—আচ্ছা।

মোনাকে মারা নিয়ে মতি আর যজ্ঞেশ্বরের সমস্তটা দিন ঝগড়ায় কাটল···স্বামীর লোভ আর বুদ্ধিকে মতি বিঁধল যত বিড়ালের উদ্দেশে পিণ্ডদান করল তার চতুর্গুণ···

মতি চুপ করে ত' যজ্ঞেশ্বর বাধায়, যজ্ঞেশ্বর চুপ করে ত' মতি সুরু করে···দু'জনেই নূতন নূতন সুর ধরে—নূতন ভংগী নেয়...পুরাণো কথা তোলে···

শান্তমণি অতশত জানত না—

সে এই বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল—

যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ শান্তমণিকে সামনে পেয়ে তাদেরই ঝগড়ার রাগে তার পেটে এক লাথি মেরে তাকে শূন্যে তুলে দিল·· শান্তমণি শূন্যে শূন্যে উঠোন পার হচ্ছে—ভ্রূকুটি-ভীষণ যজ্ঞেশ্বরের পা তোলাই আছে...বোনা আর মোনা হাসছে...এমন সময় সেই পড়ন্ত রোদে এসে দাঁড়াল শান্তমণি যার সে-ই···অক্ষয় থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে থ হয়ে পরে লাল হয়ে উঠল—যজ্ঞেশ্বর পা নামিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে রইল···

এবং তারপর অক্ষয়ের মুখ দিয়ে যে কথা বেরুতে লাগল তা বলবে বলে সে এ বাড়ীতে আসে নাই—তা কটু—আর তার জবাব নাই।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে যজ্ঞেশ্বর সেই যে বসে পড়েছিল, মাথা নামিয়ে সে তেমনি বসে রইল...

অক্ষয় কখন চলে গেছে—

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বসেই আছে দেখে মোনা বলল, বাবা, মেসোমশায় চলে গেছে। ওঠো।···আধমরা যজ্ঞেশ্বর উঠল বটে, কিন্তু মৃত্যু কেন ষোল আনাই হল না এই আক্ষেপ নিয়ে।

রাত্রে যজ্ঞেশ্বর স্বপ্ন দেখল, শান্তমণি যেন তার কোলে শুয়ে আছে; সে তার লেজটা আলগোছে মুঠোর ভিতর ধরে টেনে টেনে ছেড়ে দিচ্ছে—কিন্তু লেজটা সোজা হচ্ছে না—গুটিয়ে পড়ছে।

সকালবেলা রাগ পড়েছে মনে করে যজ্ঞেশ্বর দাদার সমীপস্থ হল বটে, কিন্তু রাগ অক্ষয়ের পড়ে নাই—ফল হল না—

অক্ষয় বলল, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। বলে যজ্ঞেশ্বরকে বার করে দিয়ে সে বা'র-দরজায় খিল এঁটে দিল।

ক্ষুদ্র কর্মের বৃহৎ ফল প্রায়ই হয়—

শান্তমণিকে লাথিমারার ফলে অক্ষয়ের সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক বলে ধার্য হল, যজ্ঞেশ্বরের পরিবর্তে, অক্ষয়ের ভাই অনন্ত। দু'কাঠা ভূমির উপর দু'খানা ঘর, তদন্তর্গত দ্রব্যাদি; ভিতরে তুলসীমঞ্চ আর বাইরে বার বিঘা জমি, পাঁচ ঝাড় কলাগাছ, আর শান্তমণি—সবই অনন্ত পাবে। শান্তমণি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন ভোগ করবে অনন্ত; শান্তমণির মৃত্যুর পর প্রবেশ করবে যজ্ঞেশ্বর, এবং যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর পর এই বাড়ী কোনো সাধু বৈরাগীর আস্তানা যেন হয়। যজ্ঞেশ্বরের লোকান্তর আগে ঘটলেও এই ব্যবস্থা—শান্তমণি আস্তানারই সম্পত্তি হবে—

পঞ্চায়তের সম্মুখে এই উইল করে তার ভায়রাভাইয়ের উপর যে রাগের ঝাল ছিল অক্ষয় তা মিটাল—শান্তমণিকে লাথি মারা ক্ষমার্হ অপরাধ নয়।

অক্ষয় মারা গেল—

তার আগেই নিজের কুটীরখানা ভেঙে ফেলে দিয়ে অনন্ত এই বাড়ীতে উঠে এসেছে।

এই বাড়ীঘর প্রভৃতি যজ্ঞেশ্বরেরই পাওয়ার কথা—পেয়েই ছিল···গাছের ফলটির দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকেই, কিন্তু তা পড়ে এসে একজনের সামনে—লোকে বলে

অদৃষ্ট...অদৃষ্টের দোষেই যজ্ঞেশ্বর পাওয়া জিনিষ পেল না—পেয়ে দখল করে বসল এসে অনন্ত—মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়াই হল···

এমন অবস্থায় যজ্ঞেশ্বরের সংগে অনন্তের ভাব হবার কথা নয়, কিন্তু সবাই দেখল, ভাব হ'ল। যজ্ঞেশ্বর এতবড় ক্ষতির আঘাতটা হাসিমুখে বহন করছে দেখে লোকে তার স্থৈর্যগুণে অবাক হয়ে গেল...

কিন্তু তার ব্যবহারে লজ্জা পেল ভুষণ দাস। ভূষণ তাকে গোপনে ডেকে বলল, ছি, ছি, তুই কি ?

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

—বাহাত্তুরে বুড়ো অক্ষয় এমন অবিচার করে গেল, আর তুই হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস ! আমি হলে কি করতাম দেখতিস !...বলে ভুষণ দাস দাঁতে নখে হিংস্র হয়ে উঠল।

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর ভুষণের কথা যেন ভাল করে বুঝতেই পারল না ; চোখ বড় করে বলল, কিসের কথা বলছ ?

শুনে ভুষণ রেগে জবাব দিল না।

যজ্ঞেশ্বর আবার বলল, ভাই, অনন্ত দীর্ঘজীবী হোক, শান্তমণি চিরকাল বেঁচে থাকুক—আমি এই প্রার্থনা দিনরাত করছি।···আমি ত' কাটিয়ে গেলাম, বোনা বড় হয়ে···

কিন্তু রাগ আরো বেড়ে ভূষণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল—

খানিক গিয়েই দেখল, অনন্ত তার কলাবাগানে হেঁটে হেঁটে মাটিতে কি খুঁজছে !

ভুষণ দাঁড়িয়ে গেল—

জিজ্ঞাসা করল, কি হারাল ?

অনন্ত বলল, হারায়নি কিছু, পাচ্ছি। বলে সে কি একটা জিনিষ মাটি থেকে খুঁটে তুলল...বলল—কিসের গুঁড়োমাখানো মাছের টুকরো চার-পাঁচটা পেয়েছি, এই আর একটা।···বলে আরও একটা গুঁড়ো-মাখানো মাছের টুকরো ভুষণকে দেখাল—

দেখে ভুষণ হেসে অস্থির হয়ে গেল—

দৌড়ে গেল যজ্ঞেশ্বরের কাছে...বলল, ভাই, আমাকে ক্ষমা ক'রো।

যজ্ঞেশ্বর ভুরু তুলে রইল—

ভুষণ হেসে হেসে বলল, আমরা তোমার পাদ্দোক পাবার যুগ্যি নই, দাদা।—বলে ভূষণ গুঁড়ো-মাখানো মাছের টুকরোর কথাটা বলল—

শুনে যজ্ঞেশ্বর রাগে লাল হ'য়ে উঠল ; বলল, খবদ্দার, ভুষণ ; আমি বিষ খাইয়ে বিড়াল মারতে গিছি এমন কথা ফের বললে তোমার ভাল হবে না···

শুনে ভুষণ হাসতে হাসতে পাড়ায় গেল, এবং পাড়ায় বনবেহারীর বাংলায় বসে শান্তমণির আয়ুষ্কাল নিয়ে তাদের বহু কথা হ'ল···

কেউ বলল, এক সপ্তাহ—

কেউ বলল, এক পক্ষ—

কিন্তু একমাসের উর্ধকাল তাকে কেউ দিল না ; এবং নিধে বাউরী বেড়াল মারবার এত ফন্দি বাৎলে গেল যা শুনতেই চমৎকার।

তারপর নানাপ্রকারের গুজব কানে পেঁছে শান্তমণির মালিক অনন্ত চমকে চমকে উঠতে লাগল—যেন হত্যার ষড়যন্ত্র সত্যই হচ্ছে।

একজন কেবল ভয় দেখাতেই অনন্তকে বলে গেল, যজ্ঞেশ্বর খড়্গ শানাচ্ছে দেখে এলাম—অনন্ত, সাবধান।

অনন্ত তার বহু পূর্বে থেকেই সাবধান হয়ে আছে—চব্বিশ ঘণ্টার বার ঘণ্টা সে শান্তমণিকে ঘরে পুরে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখে ; আর বার ঘণ্টা তাকে তার পিছনে ছুটতে হয়।…হতে হতে শান্তমণির সে দুচক্ষের বিষ হয়ে উঠল—তাকে দেখলেই শান্তমণি মুখে ফ্যাস্ করে একটা শব্দ করে আর গা ফুলায় আর পিছু হাঁটে। অনন্তের খাটুনি বাড়ল যত, তার জ্বালা হল তত—বাইরে যেতে না পেয়ে আড্ডার কথা মনে পড়ে তার প্রাণ আই-ঢাই করে—হজম ভাল হয় না ; এদিকে ঘরের ভিতর, যার জন্য এত ক্লেশ, সে-ই মনে করে পরম শত্রু।

এই দুর্বহ জালার কথা শোনাতেই অনন্ত একদিন, অন্য লোকের অভাবে, ভুষণ দাসকেই রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল।

দুঃখের কথা বলা শেষ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অনন্ত বলল, ভাই ম'লাম। ঠায় ব'সে রাত জাগতে হচ্ছে !

ভূষণ বলল, তা বটে ; কিন্তু তোমার বেড়াল মরবে তোমার আগে। অষ্টপহর ঘরে পোরা থাকলে বেড়াল বাঁচে ! বেড়ালের প্রাণ খেলায়।

অক্ষয়ের আমলে শান্তমণিকে বেড়াল বলবার উপায় ছিল না ; কিন্তু অনন্ত এই অসম্মানে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, তা না ক'রে কি করব। শত্রু যে চারিদিকে ! বলে অনন্ত চারিদিকের তিনটা দিক ত্যাগ করে কেবল উত্তরদিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গী করে রইল—উত্তরদিকেই যজ্ঞেশ্বরের বাড়ী।

—তা হলে দুদিকেই বিপদ। বলে ভূষণ কলকে নামিয়ে রেখে নিঃস্পৃহ ব্যক্তির মত চলে গেল। মনে হয়, তার যেন যজ্ঞেশ্বরের দিকেই টান প্রবল।

অনন্ত ভেবে দেখল, দু'দিক বজায় রাখা যায়—অর্থাৎ এমন কৌশল করা যায় যাতে শান্তমণি বাইরের হাওয়া খেতে পারে অথচ শত্রুর ভয় থাকে না।

ভেবে সেইদিনই বগলোস আর শিকল কিনে শান্তমণির গলায় পরিয়ে তাকে নিজের আয়ত্তে রেখে অনন্ত তাকে হাওয়া খাওয়াতে বার করল—কিন্তু এমন বিপত্তি যে ঘটতে পারে অনন্ত তা আগে ভাবে নাই।

শান্তমণিকে নিয়ে বার হতেই দেশের কুকুর আর ছেলেপিলে তাই দেখতে এমন চীৎকার করে দৌড়ে এল যে শান্তমণি ভয়ে কুঁকড়ে যায় যায় হয়ে উঠল…আর অনন্ত একবার চোখে তুলে দেখতে পারল না, ওদের কেউ বা অন্য কেউ তাকেও লক্ষ্য করছে কি না…

মুখ লাল করে অনন্ত শান্তমণিকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকল যেন চোরাই মাল সামলাতে ; কিন্তু শান্তমণির দেহের আর মনের উপর এ-পীড়ন সইল না—টেনে তাকে আনতেই দরজার কাছে তার হঠাৎ মূর্চ্ছা এসে গেল…

মানুষের মূর্চ্ছা হলে ঠাণ্ডা জলে আর হাওয়ায় তার মূর্চ্ছা সারে ; কিন্তু বিড়ালের বেলায় গরম জল আর বন্ধ বাতাস ব্যবস্থা—অনন্ত তা জানত।

অনন্ত তাকে দু'হাতের উপর শুইয়ে ঘরে তুলল—গলার বাঁধন খুলে দিল…তারপর গরম জলে নাইয়ে তার মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে অনন্ত যখন গামছা দিয়ে তার গায়ের জল মুছে দিচ্ছে তখন সে উঠে দাঁড়াল—তারপর পিঠ বেঁকিয়ে হাই তুলল…এবং তারপরই যেন

ক্ষেপে গেল—অনন্তের হাতের ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়েই সে তীরের মত বেগে ঘর জুড়ে এমন ছুটতে সুরু করে দিল যে অনন্তর এমন সাহস হল না, তার কাছে এগোয়।... দরজা একটুখানি খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে অনন্ত বেরিয়ে এল—কোথায় যাচ্ছিল কে জানে; কিন্তু কলাবাগান পর্যন্ত গিয়েই ছোট একটা হাঁচির শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়াল...দাঁড়িয়ে সে ভাবছে ফিরি কি না—এমন সময় আর একটা হাঁচির শব্দ শুনে অনন্ত না ফিরে পারল না।—এসে দরজা খুলে দেখল, শান্তমণি রুগীর মত চুপটি করে এক কোণে শুয়ে আছে—আর তার নাক দিয়া জলো সর্দি ঝরছে...গা ঝাড়া দিয়ে যে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলবে এমন চেষ্টাই তার নাই। অনন্তের ভয় হল, বিড়ালের শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হলে তার বোধ হয় চিকিৎসাই নাই...

কিন্তু নিধি বাউরী এদিককার বিশেষজ্ঞ—জড় শিকড়ের গুণাগুণ সে অনেক জানে। তার কথা মনে পড়ে অনন্ত আবার ঘরের শিকল তুলে দিয়ে তাতে কুলুপ লাগিয়ে বেরুল...

নিধিরাম ঘরেই ছিল।

অবস্থা শুনে সে চিন্তিতই হল; বলল, তাই ত'! বলে মাথা নাড়তে লাগল...তারপর অনন্তের শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে নিধিরাম বলল,—এক ড্যালা মাখন নিয়ে ঘরে যাও—আমি ওষুদ নিয়ে এলাম বলে।

—আমার সঙ্গেই এস।

—তুমি যাও, আমি আসছি।

—দেরী কোরো না, ভাই তোমার হাতেই তাকে আমি দিলাম।...সারবে ত?

—না সারে ত' আমি এই বিদ্যে ত্যাগ করব। বলে নিধি একটু হেসে হাত নেড়ে বিদ্যে ত্যাগ করার রকমটা দেখাল...বলল,—ভয় কি তোমার আমি থাকতে? শান্তমণি বেঁচে থাকলে তুমি বর্তে যাবে তা কি আমি জানিনে!

শুনে অনন্তের আর সন্দেহ রইল না।

অনন্ত মাখন এনেছিল।

নিধিরাম সর্দির ওষুধ নিয়ে এল।

বলল, মাখনের সঙ্গে দিব্যি করে মাখিয়ে এই গুঁড়ো বেড়ালের গায়ে মাখিয়ে দাও—অল্প অল্প করে নিজেই সে চেটে খাবে। বলে নিধিরাম নিজেই হলদে গুঁড়ো ওষুধ মাখনে মিশিয়ে নিল—শান্তমণির গায়ে সে তা মাখাতে যাবে এমন সময় অনন্ত তার হাত চেপে ধরল; বলল,—আমি কেমন করে জানব এ বিষ নয়!

নিধি হাত টেনে নিল না।

বলল, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস করিয়া লয় যে হয় চতুর। বলে নিধিরাম মিটিমিটি চতুর হাসি হাসতে লাগল...বলল, তোমার বিড়াল মেরে আমার লাভ? বলে সে পরম দুঃখিত হয়ে রইল।

—তোমার সঙ্গে ও বাড়ীর যজ্ঞেশ্বরের নাকি খুব প্রণয়।

—প্রণয় আমার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর সবারই সঙ্গে। পানের বরজ, সুপুরি গাছ আর তামাকের ক্ষেত যতদিন আমার থাকবে, অপ্রণয় আমার কারু সঙ্গে হবে না।...আর, আমি খুব সরল লোক।...ওদিকে জল ঝরছে খুব। বলে নিধিরাম শান্তমণির দিকে কণ্ঠের ইঙ্গিত করল...

কিন্তু অনন্তের প্রাণে তখনও সর্দার চাইতে বিষের ভয় বেশী, খানিক কি ভেবে সে বলল, মাখনের এই ড্যালাটা তুমি খেতে পারো ?

নিধি বলল, না।

—কেন ?…জিজ্ঞাসা করেই অনন্ত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল…বলে বসল, খাও।

নিধিরাম ঘাড় নেড়ে বলল, উহুঁ।

—কি চাও তুমি ?

—কিছুই না—চাইব আর কি ? তুমি খেতে বলছ ; আমি বলছি, না। বলে নিধিরাম এতক্ষণে অনন্তের হাতের ভিতর থেকে হাত বার করে নিল।

—আট আনা ?

—না।

—এক টাকা ?

—তা-ও না।

দুটো ?

দুটো টাকাকেও সামান্যজ্ঞানে নিধিরাম ঠোঁট বাঁকাল।

পাপিষ্ঠকে হাতে-নাতে ধরে জব্দ করতে অনন্তের যেন জিদ বসে গেল…ফস করে বলে বসল, পাঁচটা ?

—দাও। বলে মাখনের গুলি তুলে নিয়ে নিধিরাম হাত পাতল…

অনন্ত বাক্স খুলে পাঁচটা টাকা বের করে এনে নিধিরামের প্রসারিত হাতের উপর রাখতেই নিধিরাম বোধ হয় ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে চোখ বুঁজে সেই বিষাক্ত মাখনের গুলি টপ করে মুখে ফেলে আর কোঁৎ করে গিলে ফেলে স্তব্ধ হয়ে থাকল.. গলা দিয়ে গুলি নেমে গেল তা দেখা গেল।

পাপিষ্ঠ ভেবে দেখল না, সে যদি মরে তবে টাকা পাঁচটা কোন কাজে লাগবে।

অনন্ত তার দিকে খানিক চেয়ে রইল…

তারপর ভয়ে ভয়ে ডাকল, নিধিরাম ?

নিধিরাম সাড়া দিল না—মাখন পেটে গিয়ে কি করছে কে জানে !…অনন্তের মনে হল নিধিরামের মুখ সাদা আর দেহ নিস্পন্দ হয়ে আসছে ; হয়তো সেটা তার ত্রাসের কল্পনা—কিন্তু নিধিরামের মুখের মাংস যে পাকযন্ত্রের আক্ষেপে মোচড় দিয়ে উঠছে তা ত' পরিষ্কার !

নিধিরামের গায়ে একটা ঠ্যালা দিয়ে অনন্ত আবার ডাকল, নিধিরাম ?

—কি।

—অমন করছ যে ? কেমন লাগছে ?

—ভাল না, ভাই…বুঝি বাঁচব না।—বলেই নিধিরাম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে উঠানে উবু হয়ে বসতেই তার গলা দিয়ে সেই মাখন উঠে এসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল…

নিধিরাম সেখানে বসেই কষ্টের সঙ্গে একটু হেসে বলল,—ঐ আমার রোগ—পেটে কিছু দাঁড়ায় না। কিন্তু শান্তমণির চিকিচ্ছা ত' হল না।—যেন নিজের চাইতে বিড়ালের ভাবনাই তার বড়।

কিন্তু নিধিরামের উপর অনন্তের আর শ্রদ্ধা রহিল না…পাঁচ টাকার লোভে যে

নিজের হাতে বিষ ভক্ষণ করে ; আর কেবল পাকযন্ত্র দুর্বল বলেই যার পেটে বিষ দাঁড়ায় না—তাকে আর বিশ্বাস নাই।

অনন্ত বললে,—না হোক ; আয়ু থাকে শান্ত আপনি বাঁচবে।…তুমি এস এখন।

—সে ইচ্ছে তোমার। বলে নিধিরাম লজ্জিত হয়ে চলে গেলে অনন্ত বারকতক শিউরে উঠল…

যাই হোক, শান্তমণির স্নানের অসুখ ততক্ষণে আপনি সেরে গেছে—সে উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অনন্ত খুব সজাগ হয়ে থাকল।

বিকালবেলায় কলা-বাগানের ধারেই অনন্তের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়ে গেল—বেড়ার এ-পিঠে ছিল অনন্ত, ও-পিঠে এসে, বোধ হয় না জেনেই দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর…

অনন্তের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল।

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল—অনন্ত তাকে পুলকিতকণ্ঠে ডেকে বলল, দাদা, এদিকে কোথায় ?

যজ্ঞেশ্বর প্রত্যুত্তরে বলল, কেন, এদিকটা তোমার মাটি নাকি ?

—না দাদা, তা বলছিনে। অন্য একটা কথা আছে—বলি শোনো।

—কি কথা ?

—শোনোই এদিকে। বলে অনন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরের হাত টেনে নিয়ে তার হাতের ভিতর দুটো পয়সা গুঁজে দিয়ে বলল, পয়সা দুটো মোনাকে দিও। বলে সে যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে সকৃতজ্ঞ উৎফুল্লমুখে চেয়ে থাকল…

—বাবদ ?

—বড় সৎ ছেলে তোমার ঐ মোনা ছেলেটি।…দেখা হলেই শুদোয়, শান্তমণি কেমন আছে ? ··দুদিন এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েও গেছে। বলতে বলতে মোনার সাধুপ্রবৃত্তির স্মৃতিতে অনন্ত বিগলিত হয়ে উঠল …

যজ্ঞেশ্বর উচ্চারণ করল, আচ্ছা দেব। বলে খানিক নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যখন সে চলতে সুরু করল তখন তার মনের অবস্থা কেমন তা জানিনে, কিন্তু তার চলন দেখে মনে হল, তাকে ধরে নিয়ে ঘরে পেঁাছে দিলেই যেন ভাল হয়…

পথেই দেখা ভূষণের সঙ্গে—

ভুষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,—ভাই, বড় ম্রিয়মাণ দেখছি !

বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে যজ্ঞেশ্বর বলল—ঐ পাকা কঞ্চিখানা ভেঙে দিতে পার ?

—খুব পারি। কি করবে ?

—মোনাটা ছাড় ছাড় করছে বহুদিন থেকে ; মনেই থাকে না !

কঞ্চির ছড়িখানা হাতে করে যজ্ঞেশ্বরের জ্বলুনি কিছু কমল।

একটি বছর গেছে। শান্তমণির দোলতে অনন্ত ধান অনেকগুলো আর অন্যান্য ফসল কিছু কিছু যজ্ঞেশ্বরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে এসে ঘরে তুলেছে।

শান্তমণি এখন তাকে ভালই বাসে—আর গোঁফ ফুলায় না। শান্ত এখন অনন্তের কোলে কোলে বেড়ায়···রোজ তিন পোয়া দুধ সে খায়—কিন্তু অনন্ত কেনে দেড় সের… ছোটলোকের দুটো ছেলেকে সে মাইনে করে রেখেছে—তারা দুধ খেয়ে দেখায় যে দুধে বিষ নাই।

দ্বিতীয় বছরে শান্তমণির ঘন ঘনই দুবার গা ম্যাস ম্যাস করল, কিন্তু সে কিছু নয় —একবেলা উপোস দেয়াতেই তা ভাল হয়ে গেল···কিন্তু অনন্তের দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ গেল না। হঠাৎ অসুখ করছে—ডাক্তার দেখানোই ভাল ; এই মনে করে সে শান্তমণিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এল।

ডাক্তার দুটি টাকা নিয়ে বললেন, খোলা হাওয়ায় খেলে বেড়ালে বেড়াল পঁচিশ বছর বাঁচে, বন্ধ বাতাসে···

কিন্তু অনন্ত তাঁকে বুঝিয়ে দিল, শান্তমণির স্বাধীনভাবে খোলা হাওয়ায় বিচরণ করার বিঘ্ন কত।···ডাক্তার তখন মত বদলে নিলেন, শান্তমণির শুভ্র ললাটে স্নেহভরে তর্জনীর দুটি মৃদু আঘাত করে বললেন, ঘরের ভেতরেও না বাঁচে এমন নয়, যদি ভগবান রাখেন তবে চাই কি ত্রিশ বছরও বাঁচতে পারে।

অনন্ত খুসী হয়ে চলে এল···এবং খুসীর সঙ্গেই তার সে বছরটা কাটল।

কিন্তু তৃতীয় বছরের সুরুতেই—

যা ঘটল তা বলছি।

দুটি বছর কোলেকাঁখে করে মানুষ করে অনন্তের মনে হয়েছিল, শান্তমণির হৃদয় জয় সে করেছে—এ বাড়ী ছেড়ে তার নিরুদ্দেশ হবার ভয় আর নাই। তার উপর, জানালা দরজা বন্ধ করে দিনের পর দিন দিনরাত থাকা সুখের কথা নয়—অনন্ত মনের অসুখে হাঁপিয়ে উঠে মানুষ যে শত্রু তা ভুলতে বসেছে।

এখন সে জানালাটা একটুখানি খোলে—শান্তমণির উপর লক্ষ্য রাখে, তারপর 'কে-জানে-অদৃষ্টের-কথা' মনে করে সে তাড়াতাড়ি খোলা জানালা বন্ধ করে দেয়···

এমনি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দোল খেতে খেতে অনন্ত হঠাৎ একদিন অন্যমনস্ক হয়ে গেল · জানালাটা খুলে রেখেই একটু সরে এদিকে এসেছে—খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠে সে দেখল, শান্তমণির শুভ্রদেহ জানালা দিয়ে গলে বাইরের দিকে অর্ধেক বেরিয়ে গেছে জানালার কপাটটা তখনও নড়ছে।

অনন্ত ছুটে যেতেই শান্তমণির নিষ্কলঙ্ক দেহের সবটাই বাইরে বেরিয়ে গেল···

পরক্ষণেই জানালা দিয়েই দেখা গেল, শান্তমণি কলাবাগানের বেড়ার ধারে এবং তারপর, গরাদে ভেঙে কি তার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুবার উপায় ছিল না বলে, অনন্ত যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোন ঘুরে কলাবাগানে এল তখন পলাতকা শান্তমণি সোজা রাস্তা আর প্রচুর সময় পেয়ে ছুটছে ·

অনন্ত তার পিছু নিল···

বিদ্যুতের আলোকপাত আঁকড়ে ধরা যায় কি না জানিনে, কিন্তু মুক্তি-আনন্দে পাগল সেই শান্তমণিকে ধরা গেল না···চোখের সামনে সে চক্ষের পলকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল···

অনন্তের চোখের সম্মুখটা অন্ধকারে ভরে এল—তার ভেতর মানুষের একটা কলরব উঠল—এবং সেই কলরবের ভেতর হত-চেতনের মত সে ঘুরতে লাগল···

অনন্ত একবার বলে,—হায় হায় !···একবার বলে,—আয়, আয় !

ব্যাকুল আত্মার "আয় আয়" ডাক কাহারো না কাহারো উদ্দেশে নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে —কিন্তু পলাতক তাতে ফেরে কি ?

শান্তমণি ফিরল না।

* * * সূর্য ডুবল, সন্ধ্যা হল।

অনন্ত তার দীপহীন অন্ধকার ঘরে ফিরল কেবল এইটুকু আশা নিয়ে যে সে ক্ষিদে সইতে পারে না—খাওয়ার ঘণ্টায় সে আসবে।

খাওয়ার ঘণ্টা অর্থাৎ আটটা বেজে গেল—শান্তমণির 'কুসুম কুসুম গরম দুধ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—শান্তমণি এল না। তার আসার আশায় অনন্ত দরজা খুলে বসে থাকল ...ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগল, তবু বিছানায় গেল না...ঘুমের নিমেষটা পার হয়েই তার মনে হতে লাগল, সেই অবসরে সে এসে বসে আছে বুঝি !...ঘুমে ভার চোখের পাতা টেনে তুলে সে ভাল করে চারিদিক নিজের পাশটা একোণ সেকোণ চেয়ে চেয়ে দেখে— কিন্তু শান্তমণি আসে নাই।

'মিউ মিউ' মিথ্যে ডাক শুনে সে চমকে উঠল শতবার...এমনি করে সে তিমির রাত্রি প্রভাত হল ! দেখা গেল, একরাত্রেই অনন্তের চোখ বসে গেছে।

অনন্ত ভেবেছিল, নিজেই খুঁজে তাকে উদ্ধার করবে, কিন্তু শক্তিতে কুলিয়ে উঠল না ; অভিমান আর চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তাকে সুহৃদগণের দ্বারস্থ হতে হল...

আগুন লাগলে ভূষণই দৌড়ে যায় আগে—এই খ্যাতির দরুণ অনন্ত ভূষণের সঙ্গে দেখা করে কথাটা পাড়ল ; কিন্তু ভূষণ বলল, কে তোমার বেগার দিতে যাবে ভাই, বন-জঙ্গল আর আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ! কাজের ক্ষতি করে আমরা তা পারিনে।

ভূষণ ভুল বুঝেছে দেখে অনন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, বাঃ...আমি কি তা বুঝিনে ! অমনি কি আমার হয়ে খাটবে ? আমি তা বলবই বা কোন মুখে ! তবে বিশ পঁচিশ খরচ করবার সাধ্য আমার নাই। দশটি টাকা আমি এনেছি—আলাদা করে রাখলাম।...বলে সে দশটি টাকা ভূষণকে দেখিয়ে ডান হাতে করে কপালে ঠেকিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে সত্যিই, যেন নরনারায়ণের সিন্নির জন্যে, আলাদা করে রাখল।

ভূষণ সুর টেনে বলল, দেখি।

অনন্ত চলে এল ; এবং দেখতে দেখতে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে অনন্ত দশটা টাকা কপালে ঠেকিয়ে আলাদা করে রেখেছে...শান্তমণিকে এনে দিলেই—ইত্যাদি।

ফল হল এক পলকেই—পিল পিল করে ছেলেবুড়ো সব বেরিয়ে এল...মেয়েরা বাড়ীর ভিতরটা আর ঘর-গোয়াল একবার ভাল করে দেখে নিয়ে চারিদিকে চোখ রাখল...

সবারই মুখে একই প্রশ্ন আর উত্তর—আর, সবারই এক হয়রাণী।

—পাওয়া গেল ?

—না।

—তুমি ?

—উঁহু।

তারপর দু'জনে ভিন্ন দিকে খুঁজতে যায়।

সাতকড়িরা পাঁচজনে এক দল বেঁধে দু'টাকার লোভেই প্রত্যেকে এমন স্থানে খুঁজতে গেল যেখানে যেতে হলে মাশুল দিতে হয়।

ক্রমশ শান্তমণিভ্রমে এমন সব বিড়াল এনে অনন্তকে ক্রমাগত দেখানো হতে লাগল, যারা শান্তমণির নখরস্পর্শে যোগ্যতা রাখে না।...অনন্ত মানুষের উপর রাগের বশে পুরস্কার পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দিল।

শুনে যক্ষ্মারোগী পাঁচকড়িও সুস্থবোধ করে রাস্তার ধারে এসে বসল—দেখলেই শান্তমণিকে ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

যেখানে যে ঝোপ ছিল তার একটী গাছ খাড়া রইল না—লোকে চটকে শুইয়ে দিল ; গাছের ওপর আছে কি না, ঘাড় তুলে তা দেখতে দেখতে রামনাথের ঘাড়ে ফিক ধরে মালিশের দরকার হল···

কিন্তু না গেল শান্তমণিকে পাওয়া, না গেল তাকে চোখে দেখা···মানুষ নিজের ঘর ভাল করে খুঁজতে গিয়ে নিজেরই কত লোকসান করল তার ঠিক নাই—কেউ ভাঙল ওষুধের শিশি, কেউ ভাঙল ভাতের হাঁড়ি, কেউ ভাঙল জলের কলসী—

নবীন কর্মকার তার কয়লার গাদায় খুঁজতে গিয়ে একটা পয়সাই পেল।

বোনা আর মোনাকে দুদিকে পাঠিয়ে যজ্ঞেশ্বর নিজেও বেরিয়ে এল। কিন্তু দুটি লোক একেবারে গা করল না—প্রবীণ ভট্টাচার্য মহাশয় আর নিধিরাম। বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আচরণের অর্থ হয়, কিন্তু লোকে নিধিরামের নির্লোভের অর্থ পেল না। লোকের চাল ছেয়ে খায় টাকায় তিন দিন হিসাবে—তার পনর টাকার প্রতি এমন নিঃস্পৃহা কেন, ভূষণ সময় করে নিয়ে তা-ই শুনতে গেল···

নিধিরাম তার পেটকাটা ঘরে ছিল—ভূষণকে দেখে বলল,—খুঁজেছ সব জায়গা ?

ভূষণ বলল—খুঁজছি।

—এখনো খুঁজছ ?

—হ্যাঁ। তুই যে চুপচাপ রয়েছিস ?

নিধি বলল—আরো খোঁজো, চোখ পড়বেই। বলে নিধি এমন করে হাসতে লাগল যেন এই খোঁজাখুঁজি যে নিরর্থক তা সে জানে।

—না-ও পড়তে পারে।...তুই যে বেরুসনি ?

—যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু কিনা, উপকারী লোক···আর সে-বেড়াল এখন কোথায় তা আমি কিছু কিছু জানি।...তবে তোমরাই খুঁজেপেতে দেখ—পাও ভালই ; পনরটা টাকা ত' তুচ্ছ নয়...টাকার উপর লোভ আমার কোনোকালেই নাই।···বলে সে হেসে উঠল ; তারপর বলল, বস, তামাক খাও।

—খাই। ···কিন্তু তুই যে বললি, 'সে বেড়াল এখন কোথায় তা আমি কিছু কিছু জানি'—তার মানে কি ?

—মানে আবার আমার কথার কবে থাকে ! তবে আঁকুবাকুর কাজ নয়—মন স্থির করে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে।

হঠাৎ ভূষণের একটা ছটফটানি ধরে গেল ; বলল, তোকে নগদ একটা টাকা জল খেতে দেব যদি তোর বাড়ীর ভেতরটা একবার দেখতে দিস, নিধি !

নিধিরাম ক্রুদ্ধ হল, বলল, খবর্দার, মানুষকে বে-ইজ্জতের কথা বলো না।···আমি মজুর বটে, কিন্তু আমার মানসম্ভ্রম আছে। বলে নিধিরাম মানের মাত্রায় গম্ভীর হয়ে রইল।

ভূষণ দুর্বার একটা সন্দেহ নিয়ে আর তামাক না খেয়েই ফিরে এল···কথাটা দু'কান থেকে তখনই দশ কানে গেল, লোকে বেড়াল খোঁজা ক্রমশঃ ছেড়ে দিল।

যজ্ঞেশ্বরও কথাটা শুনল—

শুনে তার আনন্দ হল কি না বলা যায় না ; কিন্তু বাড়ীতে সে প্রকাশ করল যে, অক্ষয়ের ঘরবাড়ী প্রভৃতি—যা তারই হত, কিন্তু হয়ে গেছে অনন্তের—তা আবার তারই হবে। শুনে মতি আনন্দাশ্রুমোচন করল।

সন্ধ্যা লাগতেই যজ্ঞেশ্বর গোপনে এসে নিধিরামের পেটকাটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল...

কে এসেছে তা না দেখেই নিধি শুধোল, পেয়েছে ?

যজ্ঞেশ্বর বলল, আমি যজ্ঞেশ্বর। সেই কথাই কইতে এসেছি। দরজা খোলো।

দরজা খুলে আর আসন পেতে নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরকে বসাল ; বলল, আমার দুয়োরে পায়ের ধুলো পড়েছে ঢের।...কথাটা কি শুনি ?

যজ্ঞেশ্বর বলল, কথাটা তোমাকে, ভাই, গোপনেই বলি। আমার মনে হয় শান্তমণি নেই।

—নেই তা সবাই দেখছে ; বুজছেও কেউ কেউ।

—সে না-থাকা নয় ; একেবারেই...

ঐ পর্যন্ত বলেই যজ্ঞেশ্বর নিধিরামের মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ...বলল, তবে সম্পত্তি দখল করতে যাওয়ার আগে খুব নিশ্চয় হওয়ার দরকার।

নিধি বললে, তা ত' বটেই।

—তুমি তার কি জানো তা বলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। নিধি অবাক হয়ে গেল, বলল, অবাক করলে আমাকে !···আমি তার কি জানি যে তোমাকে বলব ?

—শুনেছি, তুমি নাকি কিছু জানো।

—তোমরা যা জানো, আমিও তা-ই জানি—মানে, অনুমানে জানি। যখন কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কারো ঘরে সে আটকা পড়েছে, কিম্বা

—দেহটা ত' পাওয়া যেত যদি · সে কথা যাক—তুমি কি চাও বলো।

—কিসের দরুণ চাইব আমি !

—আমার হাতে তাকে দিয়ে দিতে।

নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে কথাটা যেন বুঝে নিল··· তারপর বলল, শান্তমণি মরলে তোমার সুবিধে, কিন্তু সে বেঁচে থাকলে অনন্তের সুবিধে। কার সুবিধের দাম বেশী কে জানে !...বলে নিধিরাম অন্যদিকে চেয়ে যেন হিসাব করতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, তোমার সুবিধে বেশী, মরলেই।

—কেমন করে তা জানব ?

তা জানাবার উপায় তেমন নাই, ভাই ; কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করে অর্থাৎ বিশ্বাসের উপর কথা।

—কিন্তু আমার ধারের চেয়ে নগদের উপর বিশ্বাস বেশী।

শুনে যজ্ঞেশ্বর চুপ করে রইল—

সে ভেবেছিল, পনরর উপর দু এক টাকা বাড়ালেই নিধিরামকে হাত করা যাবে—কিন্তু নগদ দেবার উপায় তার নাই –

যজ্ঞেশ্বর দুঃখিত হয়ে বলল, আমি সবটা দিতে পারি পরে, সম্পত্তি পেলে, কিন্তু তোমাকে তাতে রাজি হতে বলতে পারি নে। বলে যজ্ঞেশ্বর ভালোমানুষ সাজল।

—কেন পারবে না ! যার যা সাধ্য দরদস্তুর করবে, তাতে সংকোচ করা নেহাৎ অন্যায়।

—তা তুমি বলতে পারো ; ভাল লোকের কথাই ঐ।···আচ্ছা আমি যদি লিখে দি ?

—কি লিখে দেবে ?

—যে, তোমার মারফৎ মৃত বেড়াল পেলে আর সম্পত্তি দখলে এলে তোমাকে আমি—

কথায় বাধা দিয়ে নিধিরাম হেসে উঠল, বলল, ভাই, লিখিত-পড়িত কাজ এ-সব কাজে তেমন সাজে না, আমি সোজা-সাপটা মানুষ ; কিন্তু যথার্থ কথা হচ্ছে এই—তুমি তখন মাথা নেড়ে দিলেই সে কাগজ নিয়ে আমায় ধুনো দিতে হবে। বলে নিধিরাম খুব হাসতে লাগল…তারপর বলল ; কিন্তু তুমি আমাকে এ-সব কথা কেন বলছ বলো দেখি ?

মাথা চুলকে যজ্ঞেশ্বর বলল—না, কিছু বলিনি। তুমি কিছু মনে করবে তা জানতাম না। তবে, শান্তমণি যদি তোমার ঘরে এসে ঢুকে থাকে, আর যদি বেরিয়ে না থাকে…

মাথা নেড়ে নিধিরাম উৎসাহ দিল—

যজ্ঞেশ্বর তাতে ভরসা পেয়ে বলতে লাগল, আমার কাছে কিছু ছাপি নেই, ভাই ; আমি জানি।—তারপরই খপ করে নিধিরামের হাতখানা ধরে ফেলে যজ্ঞেশ্বর বলতে লাগল, ভাই, আমি বড় গরীব, ছা-পোষা মানুষ…এই বায়না ধরো পাঁচ টাকা…

'কর কি, কর কি !' বলে নিধিরাম অত্যন্ত চেঁচিয়ে উঠে আপত্তি করল—

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর জোর করে তার হাতের ভেতর টাকা পাঁচটি গুঁজে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল…

টাকা পাঁচটা ট্যাঁকে গুঁজে নিধিরাম বলল, আমি প্রাণপণে দেহপাত করে খুঁজতে পারি—এই পর্যন্ত আমি করতে পারি তোমার খাতিরে…এখন আমার হাতযশ, আর তোমার কপাল।

কিন্তু অন্যরকম বুঝে যজ্ঞেশ্বরের মনে হল, লোকটা এত চালাকিও জানে !… বলল, বেশ বেশ।

তারপর ঘণ্টাখানেক বসে দুজনায় অনেক কথাই হল ; এবং যখন বিদায়ের সময় এল তখন বন্ধুত্ব এমন নিঃস্বার্থ আর এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে, ছেড়ে দিতে আর ছেড়ে যেতে কষ্ট হতে লাগল—

—চললাম। বলে যজ্ঞেশ্বর পা বাড়াল—

এবং দরজার পাশ থেকে ভূষণ দাস নিঃশব্দে সরে গেল।

ভূষণ শুনলেই অনন্তের শোনা হল—

শান্তমণির প্রাণহত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে অনন্ত মার মার করে উঠতেই ভূষণ তার ডানা চেপে ধরে বলল, সবুর।

—সবুর কি ? শান্তমণির গায়ের একটি রোঁয়া খসিয়েছে কি যজ্ঞেশ্বরকে আমি খুন করব…সবুর কি ?— বলে শোকোন্মত্ত অনন্ত ভূষণের হাতের ভিতর থেকে ডানা ছাড়িয়ে নিল।

ভূষণ বলল, সবুর ; ঠাণ্ডা হও, কথা শোনো। তেড়েমেড়ে গেলেই কি তোমার কাজ হাঁসিল হবে ?…তোমার সাক্ষীপ্রমাণ কই ?

ভূষণের মেসো আদালতের পদাতিক।

অনন্ত বললে, চলো তবে নিধির কাছে—তাঁর কি বলবার আছে, আমায় সে তা বলুক……তারপর আমি বুঝব।

ভূষণ বলল, এটা সংগত কথা। বলে ভূষণ অনেক সুবচনে অনন্তকে শান্ত রেখে

নিধিরামের কাছে নিয়ে এল ··কিন্তু অনন্তের মুখের কথা বন্ধ হয়ে থাকলেও তার চোখের চেহারা বদলাল না।

ভূষণ কথাটা তুলতেই নিধিরাম তাকে ধিক্কার দিল, বলল, ছি ভূষণ !...আজও তোমরা আমায় চিনলে না !...অনন্ত, তোমার পক্ষেও এটা লজ্জার কথা, ভাই তোমার বেড়াল আমি লুকিয়ে রেখেছি ! ছিঃ। বলে প্রথমে ব্যথিত হয়ে পরে খরদৃষ্টিতে সে অনন্তের চোখের দিকে চেয়ে রইল···

অনন্ত বলল, তা হলে আমার এই কথাটার জবাব তুমি দাও—যজ্ঞেশ্বর তোমায় টাকা দিয়েছে কি না ?

—দিয়েছে···এই যে সে-টাকা। বলে নিধিরাম ট্যাক খুলে পাঁচটা টাকা সত্যিই দেখিয়ে দিল।

—কেন দিয়েছে ?

—কেন দিয়েছে জিজ্ঞাসা করছ ? খুঁজে দেখব বলে !···আমাদের বখরা বন্দোবস্ত হয়েছে—তুমি যে-পনর টাকা দেবে বলেছ তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক তার···আমরা দুজনেই একসঙ্গে খুঁজছি কিনা।

—খুঁজতে না মারতে দিয়েছে ?

শুনে নিধি একটু নির্যাতিত হাসি হাসল ; বলল, আমার সম্বন্ধে তোমার এই খারাপ ধারণা কেমন করে হল তা-ই আমি ভাবছি।...কিন্তু এ ধারণা থাকবে না—বেড়াল তুমি পাবেই—পেলে কিন্তু ক্ষমা চেয়ে যেও।...হয়ত—

খানিক অপেক্ষা করে থেকে অনন্ত বলল, হয় তো কি ?

—হয় তো যে পেয়েছে সে চেপে রেখেছে, ভাবছে, টাকা দেবে কিনা তার নাই ঠিক !

—ঠিক নাই কি রকম ? টাকা মজুত ! হাতে হাতে নেয় যেন সে।···বলতে বলতে অনন্ত আকুল হয়ে বলে উঠল, বল, ভাই, শান্তমণি বেঁচে আছে ?

--কি করে জানব বলো ! তবে আশা করতে দোষ কি !···আমার কেমন একটা ইয়ে আছে দেখছি, যার যা হারায় আমি খুঁজলেই পাই। সেবার ভটচাযের বাছুর—

—আমিই কেবল মিথ্যাবাদী ফাঁকিবাজ,—নয় ?···শান্তমণিকে যে এনে দেবে তাকে যদি টাকা আমি না দিই তবে সে টাকা গোরক্তুল্য হয়ে—

—কিন্তু তুমি যদি তখন বলো, তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে—টাকা কিসের ? দিব্যি কাটা গেছে—তখন ?

--চলো কালীতলায়, মায়ের আসন ছুঁয়ে বলছি, তা আমি বলব না।

ভূষণ বলল, আর কিছু নয়, কালীর আসন ! বলে ভয় দেখাল।

নিধিরাম বলল,—টাকাটা নগদ দিতে দোষ কি। বলে নিধিরাম ফস করে একটু হাসল।

—তারপর ?

—তারপর খুঁজে দেখব, আর পাবো নিশ্চয়ই।

অনন্ত চুপ করে থাকল—

নিধিরাম বলল,—তুমি যদি আমায় বিশ্বাস না করো, আর আমি যদি তোমায় অবিশ্বাস করি, তবে কি কথার শেষ হবে ?···আমি যে ঠুঁটো জগন্নাথ সেই ঠুঁটো জগন্নাথই।···তবে যজ্ঞেশ্বর লোক ভাল—এক কথায় তার সঙ্গে মিটে গেছে। বলে নিধিরাম ও-পক্ষের প্রতি প্রীতিবশতঃ এ-পক্ষের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—আচ্ছা, দেখি। বলে অনন্ত ভূষণের হাত ধরে উঠে এল···

কিন্তু বাড়ীতে এসে সে স্থির হয়ে বসতে পারল না ··তার কেবলি মনে হতে লাগল, যজ্ঞেশ্বর এতক্ষণ সেখানে গিয়ে টাকা কটি নগদ দিয়ে মরা বেড়াল সামনে রেখে হেসে হেসে উঠছে···অনন্তের গায়ে কাঁটা দিল···

তাড়াতাড়ির দরুণ পথে দুবার হোঁচট খেয়ে নিধিরামের বাড়ীতে পেঁছে অনন্ত দেখল, যজ্ঞেশ্বর সেখানে নাই—চার পাঁচটি বাজে লোক বসে নিধির সঙ্গে বাজে কথা কইছে···

অনন্ত ঝপ করে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের চমকে দিল এবং আচমকা নিধির হাতে ঝম করে টাকা ফেলতেই নিধিও চমকে উঠে বলল, এ কি ব্যাপার ?

—তোমার টাকা।

—তোমার বেড়াল কোথা তা আমি কি জানি।

—কোথায় তা দেখবে বলেই ত দিলাম।

—উত্তম।···বলে মুঠো বেঁধেনিধিরাম বলল, তুমি আমার অপমান কর নাই নিশ্চয়ই—সে-লোক তুমি নও।···আমি গরীব বটে কিন্তু কাঙাল নই। তবে যদি পরিশ্রমের দাম বলে দিতে চাও তবে আমি অক্লেশে নিতে পারি। নতুবা—বলে নিধি এমন একটু হাসল যার মত নির্দোষ আর কিছু হতে পারে না।

অনন্ত আশান্বিত হল, বলল, তা-ই ত দিচ্ছি !

—বেশ। আমি এতক্ষণে খুঁজতে বেরুই—পিছু ডেক না।···বলে সেখানে বসেই নিধিরাম ঘাড় তুলে ডাকল, পুসি, আয়।

অনন্ত চকিত হয়ে চারিদিকে চাইতে লাগল—শান্তমণি বুঝি আসছে !

তারপর নিধি বলল, উঠি তবে—টাকা খেয়েছি। বলে সে হুঁকো রেখে লাঠি নিয়ে উঠল...বলল, 'বাড়ীর ভেতরটা আগে দেখি।'

সে রাত্রিটা নিধিরাম নিজের বাড়ীর ভিতরটা দেখল, আর অনন্তের শেষ রাত্রে একটু ঘুম হল—

তার পরদিন নিধিরাম বাড়ীর বাইরে এল—

লোকের বাড়ীর আর বেড়ার ধারে গিয়ে সে ডাকে, পুসি, আয়।···গাছের দিকে তাকিয়ে ডাকে, তু তু, পুসি, আয়।···মানুষের বেগুনের ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে পুসি, আছিস এখানে ?···লোক দেখলেই তাকে দাঁড় করিয়ে জানতে চায়, শান্তমণিকে দেখেছ তোমরা ? ফিট্ সাদা একটা বেড়াল—লক্ষ্মীর মত সুশ্রী—ল্যাজটা খ্যাঁক-শেয়ালীর ল্যাজের মত ঝাঁকড়া—দেখেছ কেউ ?

যে বলে দেখি নাই, নিধি তাকে বলে, কি আশ্চর্য ; দেখ নাই ? দেখেছ বই কি !··· যদি সে তখন বলে, দেখেছি—নিধি তখন তাকে বলে তুমি মিথ্যেবাদী ; দেখ নাই।

কিছুক্ষণ পরেই লোকে নিধিকে দেখে পালাতে লাগল।...

অনন্ত ঘোরেফেরে আর নিধিরামের তল্লাস করে, কই হে ?

নিধি বলে, একটু সবুর।

নিধিরাম শান্তমণিকে খুঁজছে—

আর অনন্ত তার কলাবাগানে দাঁড়িয়ে আছে এবং যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়—

অনন্ত যজ্ঞেশ্বরকে বলছে, তোমার নরকের ভয় নাই—

যজ্ঞেশ্বর প্রত্যুত্তরে বলছে, পেটে খেলে পিঠে সয়—

এমন সময় দেখা গেল, অচেনা একটা লোক তাদের দিকে আসছে—তার হাতে মুখ-ঢাকা একটা সাজি—

লোকটা সাজি নিয়ে তাদের কাছেই এসে দাঁড়াল, এবং কেউ কিছু বলবার আগেই মুখ-ঢাকা সাজির ভেতর থেকেই শব্দ এল—মিউ ..যেন কান ঘেঁষে তীর গেল, এমনি ভয়ানক চমকে উঠল অনন্ত আর যজ্ঞেশ্বর দুজনাই।

নিধি বলল, শান্তমণি এসেছে, অমন মিঠে গলা তারই।

লোকটি বলল, অনন্ত কার নাম এখানকার ?

অনন্ত বলল, আমার।

লোকটি হেসে বলল, আমার কাছে এসে আছে আজ তিন দিন। তাড়াই তা-ও যায় না···আমি কি জানি এর এত দাম ! মায়ের মালিক আমার পনর টাকা বখশিস নিয়ে বসে আছেন ! আসুন দেখি।·· বলে সে সাজি নামিয়ে হাত বাড়াল ··

অনন্ত বলল, কি ?

—টাকা।

যজ্ঞেশ্বর ঢোক গিলছিল—তার দিকে তাকিয়ে নিধি লোকটাকে বলল, তোমারই পাওয়ার হক্‌ বটে। বলে সে আর একটু এগিয়ে এল।

কিন্তু অনন্তের তখন মেজাজের ঠিক নাই—যজ্ঞেশ্বর পুড়ছে···

সুতরাং অনন্ত চেঁচিয়ে নিধিরামকে আর লোকটাকে যা বলল এবং যজ্ঞেশ্বর অনন্তকে আর লোকটাকে যা বলল, আর লোকটা আর নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরকে আর অনন্তকে যা বলল, তা সব একসঙ্গে বলায় কারোর কথা কারো কানে গেল না···

গোল একটু কমলে শোনা গেল সেই লোকটা বলছে, তুমি কাকে কি দিয়েছ, কে তোমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করেছে তা আমায় শুনিয়ে কি হবে ? . আমার পাওনা আমি চাই···ফেল কড়ি, মাখো তেল···

নিধি বলল, তা তুমি বলতে পারো।

## ॥ চার ॥

### জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি

কে বড় ইহাই লইয়া বিবাদ।

ফিলাডেলফিয়া প্রত্যাগত ডাক্তার চ্যাটার্জির ম্যালেরোডিনা বড়, না কবিরাজ হরিহর রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত জ্বরশনি বড় ? কে বড় ? পশুর মধ্যে সিংহ বড়—গায়ের জোরে ; ঋতুর মধ্যে বসন্ত বড়—কাব্যকাননে ; কদলীর মধ্যে মর্তমান বড়—বহু পরীক্ষায়। ম্যালেরোডিনা বা জ্বরশনি গায়ের জোরে বড় হইতেই পারে না ; কাব্যকাননে তাহাদের স্থান নাই ; পরীক্ষা তাদের চলিতেছে,—তবু কে বড় ? প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নহে।

ম্যালেরিয়া-রোগী যারা তাদের অধিকাংশই মুখ বিকৃত করিয়া উভয়কে সমান অবিশ্বাস করিয়াছে ; তথাপি ম্যালেরোডিনার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক কথা—

পেটেণ্ট ঔষধ বড়, চাহিদার টানে কাটতির হিসাবে, আর কোন তুলাদণ্ড তাদের নাই। তবে ম্যালেরোডিনাই বড়।

ঐ দেখুন—রাজপথের দুইধারে বিচিত্র বড় বড় হরফে প্ল্যাকার্ড লাগান রহিয়াছে—

চ্যাটার্জি'র

**—ম্যালেরোডিনা—**

জ্বরের অঙ্কুর নির্মূল করে।

অব্যর্থ, অমোঘ, সুলভ।

ঐ দেখুন—ডাক্তার চ্যাটার্জি'র লোক মোড়ে মোড়ে হাজারে হাজারে হ্যাণ্ডবিল দুহাতে অজস্র বিতরণ করিতেছে, ছড়াইতেছে; ঐ দেখুন চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, বস্ত্রালয়ে, বৈঠকখানায়, বাড়ীর বাবুদের, মেসের ছেলেদের, হোটেলবাসীদের শিয়রে শিয়রে ম্যালেরোডিনার জয়বার্তাসমন্বিত সুশোভন ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে; প্রত্যেক জংসন ষ্টেশনে তাহা গাড়ী গাড়ী বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে; এজেণ্টগণ সুদূর পল্লী পর্যন্ত দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছে—তিন দাগ ঔষধ বিনামূল্যে না চাহিতেই দান করিতেছে; তাহাতে ফল দর্শিলে গরীবের দুর্দশা স্মরণ করিয়া এক টাকা মূল্যের বড় বোতল মাত্র দশ আনায় দিয়া আসিতেছে। ম্যালেরোডিনা অযাচিত প্রশংসাপত্র এত লাভ করিয়াছে যাহা একত্র করিয়া ছাপাইলে মহাভারত-তুল্য বিরাট একখানা গ্রন্থ হয়! লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ভুক্তভোগীর, পাঁচজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের, দশজন সবজজ, উকিল, মুন্সেফ, মোক্তার এবং একজন ইংরেজ মহিলার প্রশংসাপত্র পঞ্জিকার মলাটে ও দুর্গোৎসবের ছবির পশ্চাৎদিকে এবং বহুসংখ্যক ইংরাজী বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংবাদপত্রের ও সাহিত্য-পত্রিকার অপেক্ষাকৃত মূল্যবান স্থানে ভূরি ভূরি ছাপা হইয়া তাহা ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে।

ম্যালেরোডিনা জ্বরশনির চোখের উপর দিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছে!

বেচারা জ্বরশনির এ-সব অহঙ্কার আড়ম্বর কিছুই নাই—পরমুখাপেক্ষী মা-মরা নিরন্ন ছেলের মত সে বিষণ্ন, সংজ্ঞাহীন; গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনীর আড়াইশত পৃষ্ঠার একটি পৃষ্ঠায় জ্বরশনির পরিচয় টিম্ টিম্ করিতেছে—তাহাতে না আছে উল্লাস, না আছে বাক্যচ্ছটা, না আছে প্রলোভন; রথযাত্রার ভিড়ের মধ্যে উপেক্ষিতা সামান্য লোকের মত সে একস্থানে ম্লানমুখে বসিয়া আছে—কেহ তাহাকে লক্ষ্যও করিতেছে না। এজেণ্টগণ একে একে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে—খরিদ্দার মিলে নাই!

অবস্থা যখন এমনি ট্রাজিক তখন হরিহরের ছাত্র অনাথের মাথায় একটা দুর্বুদ্ধির উদয় হইল!—

ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্তী ম্যালেরিয়া-স্পেশ্যালিষ্ট, তাহার প্রশংসাপত্র একখানা সংগ্রহ করিতে পারিলেই জ্বরশনি জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে ইহা হরিহরও জানিতেন, অনাথও জানিত; চক্রবর্তী হেলায় অবহেলায় জ্বরশনির দিকে মাত্র কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি তুলিলেই রোগী তাহা গিলিবার পথ পাইবে না ইহা যেমন সত্য, চক্রবর্তীকে দিয়া ঐ তুচ্ছ কাজটুকু করানো ঠিক তেমনি অসম্ভব।

"ঔষধসাগরে আজ পর্যন্ত অনেক বুদ্‌বুদ
উঠিয়াছে ; তাহারা দিবালোকে এক মুহূর্ত নৃত্য
করিয়াই চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেছে।
কিন্তু ম্যালেরোডিনা অক্ষয় জীবন লইয়া
ব্যাধিনাশ করিতে আসিয়াছে। সে বাঁচিবে
ও বাঁচাইবে।"—

ম্যালেরোডিনার ঐ সদম্ভ ঘোষণালিপির নিম্নে স্বাক্ষর আছে ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্তীর। নীলমণি ডাক্তার ডাঃ চ্যাটার্জির বিশেষ বন্ধু ; বলিতে গেলে, নীলমণি ডাক্তারই ম্যালেরোডিনার জয়যাত্রার প্রধান রথী।

হরিহরের নিস্পন্দভাব দেখিয়া অনাথের গা জ্বলে। উহারা বোতল বোতল ময়লা জল বেচিয়া ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে তুলিতেছে, আর এমন জ্বরশনি কি না মানুষের চোখে পড়িল না ! এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান অনাথের নাই ! অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া ছেলেবুদ্ধির খেয়ালে সে একদিন এক কাণ্ড করিয়া বসিল ;—কবিরাজ মহাশয়কে লুকাইয়া সে "দৈনিক জনসখায়" বিজ্ঞাপন দিয়া আসিল ;

**সুসংবাদ !**

ভিষক্‌প্রবর হরিহর রায়
কাব্যতীর্থ মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

**জ্বরশনি**

ব্যবহার করাইয়া ডাক্তার
শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী এম্‌, ডি, মহাশয়
শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই

**আশ্চর্য**

সাফল্য লাভ করিয়াছেন !!!

হরিহরের ঠিকানাসহ বিজ্ঞাপন যথাসময়ে বাহির হইল।

অনাথ মনে মনে আশা করিয়াছিল, নীলমণি ডাক্তার ব্যস্ত লোক, তার স্নান আহারেরই সময় নাই—সে আবার দেখিতে যাইবে কোথায় কোন্‌ কাগজের কোন্‌ কোণে কি 'সুসংবাদ' বাহির হইল। অনাথ অনুমান করিয়াছিল ঠিকই, কিন্তু ভাবিতব্য অন্যরকম ; 'সুসংবাদ' নীলমণি ডাক্তারের ব্যস্তচক্ষু এড়াইয়া গেলেও ডাঃ চ্যাটার্জির অনুচরবর্গের চোখে পড়িয়া গেল—জুয়াচুরী ধরা পড়িল।

কবিরাজ মহাশয় প্রাতে ছাত্র অনাথাকে চরক পড়াইতেছিলেন, এমন সময় একখানা মোটর আসিয়া তাঁহার আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের দ্বারে দাঁড়াইল ; সাহেব-বেশধারী কাগজহাতে একজন গৌরবর্ণ বাঙালী নামিয়া পড়িলেন। পেনটুলানের পদার্পণ এই ক্ষুদ্র গৃহে পূর্বে কখন হয় নাই, হরিহর মুখ তুলিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

হরিহর নীলমণিকে চিনিতেন না, কিন্তু অনাথ চিনিত ; সে নীলমণিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কবিরাজের চরকের চাইতেও শুষ্ক এবং ডাক্তারের মোটেরের চাইতেও বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

নীলমণি চট্ পট্ ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—হরিহর কার নাম ?

প্রশ্নের ধৃষ্ট সুরটা হরিহরের কানে বাজিল ; অধিকতর বিস্মিত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—আজ্ঞে, আমার নাম। তারপর আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—আসুন, বসুন।

—বসছি ! বলিয়া নীলমণি না বসিয়াই ফর ফর করিয়া হাতের কাগজখানার ভাঁজ খুলিয়া হরিহরের সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন,—এই বিজ্ঞাপনটা আপনি দিয়েছেন ?

—কোন্‌টা ?

নীলমণি মনে মনে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—ন্যাকা। প্রকাশ্যে বলিলেন,—ঐ লাল পেন্সিলের মার্কা দে'য়াটা।

—আজ্ঞে, না।

কথাটা সত্য, হরিহরের বিস্ময়ও ভাণ নহে, কিন্তু নীলমণি ক্রোধে একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন !—অশিক্ষিত হাতুড়ে, এতবড় জুয়াচুরী করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, তবু কেমন অম্লানবদন ! অসহ্য !—হরিহরের ব্যাকুল মুখের দিকে রুদ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দুর্জয় ক্রোধে নীলমণি আপনি ও তুমির পার্থক্য একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—আমারই নাম নীলমণি চক্রবর্তী। জানো কি অপরাধ করেছ তুমি ? আইনে এ অপরাধের কি দণ্ড তা জানো ?

দিশেহারা হরিহর হাত জুড়িয়া বলিলেন—আমায় ক্ষমা করুন।

—কাল যেন তোমার 'সুসংবাদ' না বেরোয়। নির্লজ্জ !—বলিয়া নীলমণি মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন ; হরিহর হাত-পা গুটাইয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ কি কাণ্ড ! কোথা হইতে আসিয়া কেন ঐ লোকটা অকারণ এই অকথ্য অপমান করিয়া চলিয়া গেল ! নিদারুণ ব্যথায় জর্জর বৃদ্ধ হরিহরের দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

অনাথ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল—হঠাৎ সে হরিহরের পায়ের উপর ঠাস হইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভীতভাবে "কি হল, কি হল" বলিতে বলিতে হরিহর অনাথকে ঠেলিয়া তুলিলেন।

অনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমায় ক্ষমা করুন।

অনাথের অপরাধ কোথায় হরিহর তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন,—কি হয়েছে বল, বাবা।

অনাথ বলিল,—ঐ বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছিলাম। অত বুঝতে পারিনি—আমার দোষে আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমানিত হতে হল। বলিয়া সে আরো কাঁদিতে লাগিল।

—তুমি দিয়েছিলে ? কেন দিয়েছিলে ?

অনাথ কথা কহিল না কিন্তু হরিহর তার মনের কথা বুঝিলেন। অনাথের মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন—আমার ভালর জন্যই, নয় ? তবু অপরাধ তোমার হয়েছে, বাবা ; কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। যাও বাইরে একটু বেড়িয়ে এস। বলিয়া হরিহর অনুতপ্ত অনাথকে শান্ত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

## ॥ দুই ॥

উপর্যুক্ত ঘটনার ছ'মাস পরে আবার একদিন একখানা মোটর আসিয়া হরিহরের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া হরিহরের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ছ'মাস আগে একদিন এমনি সময় নীলমণি শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। আবার কি অপরাধ করিয়া বসিয়াছি ?

কিন্তু এবার নীলমণি নয়—সুদর্শন সুবেশ একটি ছেলে নামিয়া আসিয়া হরিহরকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে।

—কোথায় ?

ছেলেটি দূরবর্তী একটি পাড়ার নাম করিল।

—কার বাড়ী ?

ছেলেটি বলিল,—একটি মেয়ের বড় অসুখ।

—কি অসুখ ?

—জ্বর।

—কার বাড়ী ?

ছেলেটি বলিল,—আজ আঠাস দিন জ্বর, জ্বর লেগেই থাকে, বিচ্ছেদ হয় না। আপনি আমার সংগে এই মোটরেই চলুন।

হরিহর সেকালের অচতুর লোক হইলেও বুঝিতে পারিলেন, কার বাড়ীতে রোগী তাহা প্রকাশ করিতে ছেলেটি অনিচ্ছুক। তবে যে পাড়ায় সেই বাড়ী সেটা ভদ্রপল্লীই।

হরিহর উঠিয়া পড়িলেন, এবং প্রস্তুত হইয়া মোটরে উঠিয়া রোগীদর্শনে যাত্রা করিলেন।

বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া অন্দরে খবর পাঠান হইল, কবিরাজমহাশয় আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ভৃত্য আসিয়া আহ্বান করিল,—আসুন।

হরিহর ছেলেটির সহিত দ্বিতলে উঠিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিতেই পাশের দরজা দিয়া একটি মহিলা ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। হরিহর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, আট নয় বছরের একটি মেয়ে বিছানার সংগে একেবারে মিশিয়া শুইয়া আছে। ছেলেটি পালঙ্কের ধারে চেয়ার আগাইয়া দিল; হরিহর তাহাতে বসিলেন না; চটি খুলিয়া বিছানায় উঠিয়া চৌকা হইয়া বসিলেন, এবং চশমা খুলিয়া চোখে পরলেন।

—জ্বর কত দিন ?

ছেলেটি বলিল,—আজ আঠাস দিন।

—হুঁ। দেখি মা, তোমার বাঁ হাতখানা।

হরিহর অতীব মমতার সহিত মেয়েটির বিশীর্ণ বাঁ হাতখানা হাতের মধ্যে লইয়া নাড়ী-পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্নমালা গাঁথিতে সুরু করিয়া দিলেন,—মেয়ের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ তিথিতে জ্বর প্রথম হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন; এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তিনি এত সংবাদ জানিতেও চাহিলেন যে, তাহার কুল-কিনারা হিসাব-কিতাব নাই। যে ছেলেটি হরিহরের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল সে মাঝে মাঝে তাঁহার অন্যমনস্কতার সুযোগে অদূরবর্তী সেই দরজার দিকে চাহিয়া কখন ভ্রূভংগী, কখন হাস্য করিতেছিল।

যাহা হউক, সব কাজেরই শেষ নিশ্চয়ই আছে—তাই দেখা গেল, হরিহর কর্তৃক নাড়ীপরীক্ষারও শেষ পর্যন্ত শেষই হইল।—তারপর হরিহর তাঁর সুবিপুল কামিজটার সুপ্রসর পকেটের ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া টানিয়া টানিয়া বাহির করিলেন কাগজে-কাপড়ে প্রস্তুত বৃহদায়তন একটি পুঁটুলি ; পুঁটুলির অভ্যন্তরে অসংখ্য পুরিয়া ছিল—তাহার ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলেন একটি পুরিয়া, খুলিয়া বাহির করিলেন একটি বড়ি—সিঁদুরের মত লাল টকটকে, এতটুকু, মটরের মত।

হরিহর মাথা হেঁট করিয়া এত কাণ্ড করিতেছিলেন, এবং ছেলেটি দরজার দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। হরিহর বড়িটি দুই আঙগুলের মধ্যে করিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন,—এই বড়িটি—

বলিতেই ছেলেটি হাসি ঢাকিয়া তাঁহার দিকে ফিরিল। হরিহর পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন,—চার ভাগ ক'রে তিন ভাগ খাওয়াবে। অনুপান প্রথমবার—

ছেলেটি বলিল,—দাঁড়ান, লিখে নি। যদি আবার ভুলে যাই—

বলিয়া কাগজ-পেন্সিল আনিয়া সে লিখিতে বসিল ; লাল বড়ির বিভিন্ন অনুপান ও সেবন-বিধি লিখাইয়া দিয়া হরিহর একটি কালো বড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া বলিলেন,—কাল ভোরেই জ্বর ছেড়ে যাবে, ছেড়ে গেলে এই বড়িটি খাইয়ে দেবে। আমি এখন উঠি। আমার আসার আর দরকার হবে না।—বলিয়া হরিহর পা নামাইয়া চটির মধ্যে দিলেন।

ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল,—যদি অপরাধ না নেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

খাপে চশমা ভরিবার চেষ্টায় হাত এ-দিক ও-দিক করিতে করিতে হরিহর বলিলেন,—বল, বল।

—কি ওষুদ দিলেন ?

হরিহর খাপের যথাস্থানে চশমা রাখিতে সমর্থ হইয়া বলিলেন,—জ্বরশনি।

হরিহরের কথা ফলিয়াছে—মিনুর জ্বর ভোরেই ছাড়িয়াছে।

## ॥ তিন ॥

নীলমণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—জ্বরশনির গুণ আছে ত' !

গৃহিণী বলিলেন,—যখন সাতদিনেও জ্বর ছাড়ল না তখনই ত' আমি বলেছিলুম, হরি কবরেজকে ডাক। তুমি ত' তখন থু থু করে উঠেছিলে !

নীলমণি বলিলেন,—তা উঠেছিলাম বটে। তখন কি জানতাম যে, এক লাল বড়িতেই—

গৃহিণী বলিলেন,—অনর্থক মেয়েটাকে ভুগিয়েছ। একে রোগের যন্ত্রণা, তার ওপর তোমাদের দলে দলে এসে মেয়েটার সারা গায়ে সুঁচ ফোটান !

—কার মেয়ে তা জানতে পেলে বোধ হয় আসত না।

—আসত।

—কি করে জানলে ?

—বিলিতী ধাত নয় বলে ! তুমি সেদিন কি বলে এসেছিলে তা বোধ করি ওঁর মনেও নেই। সেকালের মানুষ কি না, ভোলানাথ।

খোঁচা খাইয়া চক্রবর্তী যেন লজ্জিত হইলেন।

মিনু মিহিস্বরে বলিল,—ভাত কবে খাব বাবা ?

—কবরেজ বলেছেন, অমাবস্যা আসছে, তারপর ভাত দিতে।

শুনিয়া মিনু আরও মলিন হইয়া গেল।

এই ঘটনার দিন পনর পরে একদিন, সেই দু'দিনের মত একখানা মোটর আসিয়া হরিহরের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের দ্বারে থামিল। হরিহর গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্তী নামিতেছেন—একটা দিনের স্মৃতি হঠাৎ বড় তাজা হইয়া উঠিল। আজও নীলমণি সাহেব সাজিয়া আসিয়াছেন। হরিহর পেণ্টুলানকেই রণসজ্জা মনে করিতে শিখিয়াছেন তাই নীলমণির অঙ্গে পেণ্টুলান দেখিয়া তিনি শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নীলমণি আজ ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর অনাহূতই বসিয়া পড়িলেন ; স্বাভাবিকস্বরেই বলিলেন,—কবরেজ মশাই, আপনার জ্বরশানি কত তৈরী আছে ?

অনাথ বড়ি প্রস্তুত করিতেছিল ; নীলমণির প্রশ্ন শুনিয়া সে তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হরিহর সেদিনকার চাইতেও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কেন বলুন ত' ?

—দরকার আছে। আপনার যত বড়ি তৈরী আছে, যতই থাক না, সব আমার ডিসপেন্সারীতে আজই পাঠিয়ে দেবেন। দাম ধ'রে দেবেন—সেই অনুসারে রসিদ দেব। ক্রমশঃ টাকা পাঠাতে থাকব, বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝেছেন ?

হরিহরের চোখের পলকপাত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; কোনোমতে তিনি উচ্চারণ করিলেন,—আজ্ঞে, পেরেছি।

—যত পারেন তৈরী ক'রতে থাকুন, কাটাবার ভার আমার। আজই যেন আপনার লোক যায় আপনার জ্বরশানি যত বড়ি আছে সব নিয়ে।...হরিহরের চোখের পলকপাত বন্ধই রহিল, অনাথের হাঁ খোলাই থাকিল, নীলমণি যাইয়া মোটরে উঠিলেন।

নীলমণি চট্‌পট্ আসিলেন, চট্‌পট্ কথা কহিলেন, তাঁহার অনুরোধ আদেশের মত শুনাইল এবং হরিহরের বুদ্ধি-সুদ্ধি তাল পাকাইয়া দিয়া তিনি চট্‌পট্ মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। এ কি কাণ্ড !

হরিহর অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—সেদিন লোকটা অপমান করিয়াছিল, আজ তামাসা করিয়া গেল। তার রাগের কারণ ছিল, কিন্তু এই তামাসার কারণ কি !

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক তামাসা নয় তাহার হাতে হাতে প্রমাণ হরিহর অল্পদিনেই পাইলেন।

*　　　　*　　　　*

ম্যালোরোডিনার আবিষ্কর্তা ডাঃ চাটার্জি এখন "আই স্পেশ্যালিষ্ট" ; হরিহর অল্পদিন হইল গ্রে ষ্ট্রীটে তাঁর নিজস্ব দ্বিতল অট্টালিকায় উঠিয়া আসিয়াছেন, এবং অনাথ এখন হরিহরের জ্বরশানিপ্রস্তুতের কারখানার কর্মকর্তা ; কিন্তু ললাট-লিপির এই আকস্মিক পাঠ-পরিবর্তনের রহস্যটা আজিও তাঁর অজ্ঞাত।

## ॥ পাঁচ ॥

কামাখ্যার কর্মদোষে—

পুজোর ছুটির মাত্র দু'দিন বাকি।

মাষ্টাররা আলগা দিয়েছেন, পড়ার চাপ অনেক কমে গেছে। আনন্দে আমরা আকাশে লাথি ছুড়ে বেড়াচ্ছি—

ফিফ্‌থ মাষ্টার নীরদবাবু হঠাৎ আমাদের মাতব্বর ক'জনকে ডেকে বললেন,—ওহে, আমার এক বন্ধু আসছেন, উঁচুদরের হিপ্‌নটিষ্ট। যদি হিপ্‌নটিজম দেখতে চাও ত' তাঁকে রাজি করতে পারবো।

শুনেই আমাদের শারদীয়া ফুর্তি চতুর্গুণ বেড়ে গেল; লাফিয়ে উঠে বললাম—দেখবো, স্যার।

—তবে হেডমাষ্টারকে রাজি করে যোগাড় করো; আজই তিনি আসবেন। বলে নীরদবাবু চলে গেলেন।

হেডমাষ্টার দু' একবার না না করে রাজি হলেন।

ইস্কুলের হলঘরে চেয়ারবেঞ্চি সাজিয়ে তামাসার আসর হল।

নীরদবাবুর বন্ধু এলেন—

নাম শুনলাম তাঁর কামাখ্যাবাবু; কিন্তু দেখে আমাদের ভক্তি হল না; কেমন যেন কাটখোট্টা চেহারা—ঘাড় খাড়া ত' বটেই, তার উপর মাথাটা যেন পেছন দিকে হেলে পড়ে বুকখানাকে বাড়িয়ে দিয়েছে; চোখ খুব বড় বড়—বারমুখো আড়ষ্ট—যেন মানুষের অন্তরাত্মা লক্ষ্য করতে করতে কবে তার পলকপড়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

যা-ই হোক, তামাসা সুরু হবে—হেডমাষ্টার থেকে মৌলভীসাহেব পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় সূচ্যগ্র হয়ে বসে আছেন—

আমরা ত' নির্বাক—

কার ঘাড়ে কে দাঁড়িয়ে পড়েছি তারই ঠিক নাই।

কামাখ্যাবাবু খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে অবতীর্ণ হলেন—

হয়েই বললেন,—যাদুবিদ্যায় আমি বহুদর্শী অভিজ্ঞ অধ্যক্ষের মত পারদর্শী নই; নিজের চেষ্টায় অল্পস্বল্প শিখেছি। আশা করি, তাতেই আমি আপনাদের সন্তুষ্ট এবং ততোধিক বিস্মিত করতে পারবো।

বলে সামনের খানকতক চেয়ার খালি করে নিয়ে জনকতক ছেলেকে বেছে নিয়ে তাতে বসিয়ে দিলেন। তারপর, তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা কিসের চাক্‌তি দিলেন আর বললেন,—এই চাক্‌তির দিকে প্রাণপণে চেয়ে থাকো।

···তারা চেয়েই রইলো—

থাকতে থাকতে চোখ টাটিয়ে বিষিয়ে উঠলো তবু যেমনকার তাই, কিছুই ফল হল না।··

কামাখ্যাবাবুর ভূমিকায় বিস্মিত হবার কথা ছিল, তাই আমরা বিস্মিত হলাম...

কামাখ্যাবাবুর মুণ্ডটার দিকে চেয়ে আমরা হাসতে সুরু করেছি এমন সময় রব উঠলো—চুপ, চুপ···

হাতের চাকতিখানা ঝম্ করে শাণের উপর পড়লো—এবং রামপদ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো—

আমরা হাসি চেপে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

কামাখ্যাবাবু রামপদর ডানা ধরে তাকে খাড়া করে দিলেন···তারপরই তামাসা ঘোরালো হয়ে উঠলো।

রামপদ লুচি মনে করে চটিজুতো মুখে দিলে—

রসগোল্লা মনে করে খোয়া কামড়ালে—একটু গানও গাইলে······

শুনে মৌলভীসাহেবের লাল দাড়ি দুলতে লাগল।

কামাখ্যাবাবু সামনের ছাত্র-সঙ্ঘের দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাদের কারো কিছু বলবার আছে?

একটা ছেলে উঠে বললে,—আমার আছে, সার।

কামাখ্যাবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে নীরদবাবু বন্ধুর সাফল্যে গর্ব অনুভব করছিলেন; তিনি বললেন,—বলো।

ছেলেটি বললে,—রামপদ আমার ঠেঙে চারটি পয়সা ধার নিয়েছিল—অনেকদিন হল, দেয় না। ওর এখন জ্ঞান নেই—এইবেলা যদি চেয়ে দেন······

দর্শকগণ কথাটা শুনে হেসে উঠলেন।

নীরদবাবু হেসে কামাখ্যাবাবুর মুখের দিকে চাইলেন; কামাখ্যাবাবু হেসে ছেলেটিকে বললেন,—সবুর করো, দিচ্ছি।

আর একটি ছেলে উঠে বললে,—আমিও দুটো পয়সা পেতাম, সার।

কামাখ্যাবাবু বললেন, বেরিয়ে এস। এসে রামপদর সামনে দাঁড়াও।

তারা এসে তাই দাঁড়ালে—

কামাখ্যাবাবু অভিভূত রামপদকে উদ্দেশ করে বললেন,—তোমার কাছে এরা পয়সা পাবে; তুমি ধার নিয়ে আর দাওনি।

তোমার ডান হাতের কাছে যে দাঁড়িয়ে তাকে দাও এক আনা; আর যে তোমার বাঁ হাতের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দাও দু' পয়সা—দিয়ে তুমি ঋণমুক্ত হও।

রামপদ নির্বিকারভাবে পকেটে হাত পুরে অক্লেশে পয়সা দিয়ে দিলে—

ছেলেদুটো একলাফে গিয়ে জায়গায় উঠলো—

আমাদেরও আমোদের সীমা রইল না।

হেডমাষ্টার চিরকাল ভীরুপ্রকৃতির লোক। বিপদসম্ভাবনায় তিনি সুরু থেকেই কেমন অস্থিরবোধ করছিলেন; বললেন,—এইবার ওকে ছেড়ে দিন।

—বেশ। বলে উল্টোদিকে হাত খেলিয়ে কামাখ্যাবাবু রামপদকে মোহমুক্ত করে জ্ঞানজগতে ফিরিয়ে আনলেন—

রামপদ টলতে টলতে গিয়ে তার দলের মধ্যে বসে পড়ল।······

আমাদেরই ক্লাসের গোবিন্দ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; কামাখ্যাবাবুর দুর্মতি ঘটল—তিনি তারই দিকে মুরুব্বিভাবে আংগুল তুলে বললেন,—ওহে সরফরাজ খাঁ, শোন দেখি এদিকে।

গোবিন্দ হাসতে হাসতে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। কামাখ্যাবাবু বললেন,—হিপ্‌নটাইজড্‌ হবে?

গোবিন্দ আমাদের পানে চাইলে—

আমরা চোখ নেড়ে তাকে রাজি হতে বললাম। গোবিন্দ বললে,—হবো। কিন্তু আমাকে পারবেন বলে মনে হয় না।

—কেন বলো দেখি? বলে কামাখ্যাবাবু চোখ বড় করে তুললেন।···রামপদকে বশে এনে তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল।

গোবিন্দ বললে,—আমার বড় কঠিন প্রাণ।

—এসো ত', দেখা যাক। বলে কামাখ্যাবাবু তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

গোবিন্দ তাঁকে সাবধান করে দিলে—আমি কিন্তু কারু ধারিটারিনে। আমার পকেটে পয়সা আছে—যেন খোয়া না যায়।

শুনে রামপদর বোধ করি সন্দেহ হল—

সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল,—আমার পয়সা?

নীরদবাবু ধমকে উঠলেন,—চুপ এখন। পরে হবে পয়সার কথা।···রামপদ এবং সভা তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল।

তখন কামাখ্যাবাবু গোবিন্দকে বললেন, তোমার নামটি কি?

গোবিন্দ বললে,—গোবিন্দ।

কামাখ্যাবাবু গোবিন্দর চোখের দিকে ভীষণভাবে চেয়ে বললেন,—আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক।

গোবিন্দ চেয়ে রইলো—

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলাম, যৌগিকবল আর পশুশক্তির সেই সংঘর্ষ।···ধীরে ধীরে পশুশক্তি পরাভূত হয়ে এল।···হঠাৎ গোবিন্দ সামনের দিকে ঝুঁকে এল; পড়েই যেত; কিন্তু কামাখ্যাবাবু তাকে চট্‌ করে ধরে ফেলে ঠিক করে বসিয়ে দিলেন।···

কামাখ্যাবাবু নীরদবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বললেন; নীরদবাবুও বললেন কিছু—

কামাখ্যাবাবু তখন গোবিন্দকে আদেশ করলেন,—গোবিন্দ, চোখ খোল—

গোবিন্দ চোখ খুললে।

কামাখ্যাবাবু ডাকলেন,—গোবিন্দ?

গোবিন্দ উত্তর দিলে,—আজ্ঞে।

তারপর প্রশ্নোত্তর সুরু হল।

—তুমি কোথায় ?

—স্কুলে, চেয়ারে বসে আছি।

—এখন তুমি আমার সম্পূর্ণ বশীভূত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার নাম কি ?

—শ্রীগোবিন্দবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

—না ; তোমার নাম শ্রীযদুপতি ব্যাকরণতীর্থ।

বুঝলাম, কামাখ্যাবাবু নীরদবাবুর কর্ণমূলে কথা কয়ে এই সমাচারটি নিয়েছিলেন। বলতে লাগলেন,—তুমি এই স্কুলের হেডপণ্ডিত। তোমার হাতে ব্যাকরণ-কৌমুদী রয়েছে। ছেলেদের পড়াও।

ব্যাকরণ-তীর্থের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।—হবারই কথা। এতগুলি লোকের সামনে তাঁর পদগৌরব আর পাণ্ডিত্যকে ভ্যাংচান—তাঁরই ছাত্রকে দিয়ে—বেশ মনোরম নয়।

গোবিন্দ আদেশ মানতে বাধ্য—

বললে,—হরে, এদিকে আয়...অমুক তমুক।

পণ্ডিতমশাইয়ের মুদ্রাদোষ ছিল ঐ অমুক তমুক বলা—কাজেই অমুক তমুক শুনেই ছেলেরা হো হো শব্দে হেসে উঠল।

হরি নামে গোবিন্দর, তথা আমাদের এক সহপাঠী সত্যই সেখানে ছিল ; ডাকতেই সে গোবিন্দর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ; বললে ত'—এসেছি, পণ্ডিত মশাই।

গোবিন্দ বললে,—পড়া করে এসেছিস আজ, না রোজকারমতই বলবি, মাথা ধরেছিল অমুক তমুক ?

হরে বললে,—আজ পড়া করে এসেছি, পণ্ডিতমশাই। বলেই হরে চট্ করে সত্যিকার পণ্ডিতমশাইয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে নিলে ; আমরাও দেখলাম, যেন কে লঙ্কা বেটে দিয়েছিল, মুখ তাঁর এমনি লাল।

গোবিন্দ খুসী হয়ে বলল,—বেশ। বল দেখি, সাধু শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে কি হয় অমুক তমুক ?

হরে বললে,—সাধবাঃ।

রুখে উঠে গোবিন্দ বললে,—এই পড়া করে এসেছ অমুক তমুক ? মেরে হাড় চূর্ণ করে দেব জানিস্ ? সাধু শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে সাধবাঃ ! হতভাগা ছেলে অমুক তমুক। যা সামনে থেকে।

হরে সরে গেল—

পণ্ডিতমশাইয়ের অবিকল নকল দেখে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে গেল ; ছোট ছোট ছেলেরা ত' হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল।...হেডমাষ্টারও হাসছিলেন ; পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে চেয়েই হঠাৎ তিনি দুরন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন ; বললেন, —থাক, আর না।

কামাখ্যাবাবুর তখন শনিগ্রহ প্রবল—

সে-কথায় তেমন কান দিলেন না।

গোবিন্দ বলতে লাগল,—গোবিন্দ, তুমি বড় বেয়াড়া ছেলে। কালকে রাস্তায় তোমায় আমি কুকথা বলতে শুনেছি। ঠিক কিনা অমুক তমুক ?

কেউ জবাব দিলে না—

গোবিন্দ তখন উঠে দাঁড়িয়ে, যেন ক্লাসের সব বেঞ্চিগুলিই দেখছে এমনিভাবে চেয়ে বললে,—অমুক তমুক, গোবিন্দ লুকোচ্ছে। মেরে হাড় চূর্ণ করে দেব জানিস ? বেঞ্চির ওপর দাঁড়া—দাঁড়া বলছি অমুক তমুক। কেশব, দপ্তরীকে ডাক, বেত নিয়ে আসুক। হতভাগার হাড় আমি চূর্ণ করে দিচ্ছি অমুক তমুক।

হেডমাষ্টার পণ্ডিতমশাইয়ের লজ্জায় লজ্জা পেয়ে ঘাড় হেঁট করেছিলেন—

মুখ তুলে পুনরায় বললেন—ঢের হয়েছে, আর না। ফিরিয়ে আনুন, কামাখ্যাবাবু।

কিন্তু কে জানত এমন হবে !

আরো খানিকটা হাসাবার ইচ্ছে বোধ হয় কামাখ্যাবাবুর ছিল ; কিন্তু হেডমাষ্টারের কথাটা তিনি বারবার অমান্য করতেও পারলেন না।—

গোবিন্দকে পণ্ডিতমশাই থেকে গোবিন্দে ফিরিয়ে আনবার মতলব করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গোবিন্দ ভেবে বসল তিনিই বুঝি গোবিন্দ—

যে কুকথা বলে বেড়ায়—

আর, ডাকলে কাছে আসে না।

গোবিন্দ তাই গোবিন্দর ওপর রেগেই ছিল—আচমকা কামাখ্যাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে,—সেই আসাই ত' এলি, গোবিন্দ। আগে এলে ত' এই চড়টা খেতে হত না।...

মাষ্টাররা সব হাঁ হাঁ করে উঠলেন ; ছেলেরা হৈ রৈ করে উঠল ; কামাখ্যাবাবু হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললেন,—ব্যস্ত হবেন না আপনারা, মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেছে দেখছি। তা হোক, এখুনি ঠিক করে নিচ্ছি।—বলে তিনি গোবিন্দকে চেয়ারে বসিয়ে দু' পা পিছিয়ে এসে তার মুখেচোখে যারপরনাই জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলেন—তাতে কামাখ্যাবাবুর গাল ফুলে, চোখ ঠিকরে মুখের চেহারা বদলে গেলেও গোবিন্দর মারমুখী উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেল—

কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা গেল না।

—"জাগো, জাগো"—বলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাঁকতে লাগলেন······পায়ের দিক থেকে হাত খেলিয়ে মাথা পর্যন্ত তুলতে লাগলেন······কামাখ্যাবাবু গোবিন্দকে জাগাবার ক্লেশে গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন······

কিন্তু গোবিন্দ জাগল না।

কামাখ্যাবাবুর মুখে তখন ভয়ের লক্ষণ দেখা দিল—রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বিব্রতভাবে বললেন,—জ্ঞান ফিরছে না ত' !······হাত তাঁর কাঁপছিল।

মৌলভীসাহেব দাড়ি তুলে নাক পর্যন্ত ঢেকে ফেললেন—

কিন্তু হেডমাষ্টার বললেন,—তারপর, এখন উপায় ?

এই হতাশ প্রশ্ন তিনি কাকে করলেন জানিনে—কিন্তু মনে হল, শঙ্কায় তাঁর বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

কামাখ্যাবাবু চেয়ারে বসে পড়ে বললেন,—আমার সাধ্যের বাইরে গেছে মনে হচ্ছে। আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

কিন্তু আর একবার চেষ্টা করতে না গেলেই ভাল হত·····উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গোবিন্দর নাক বরাবর দুটিমাত্র ফুৎকার ছেড়েছেন, এমন সময় গোবিন্দ গর্জন করে বলে উঠল,—আজ আমি গোবিন্দকে মেরেই ফেলব। আমার সামনে কুকথা উচ্চারণ? অমুক তমুক? বলেই সে লাফিয়ে উঠে কামাখ্যাবাবুর গলাটা দু'হাতে বেড়ির মত জড়িয়ে ধরে—

বেড়াল যেমন করে ইঁদুরের টুঁটি কামড়ে ঝাঁকায়—

তেমনি করে ঝাঁকাতে লাগল।

যেন মাটিতে আছড়ে ফেলবে।······

"ধরুন, ধরুন", বলে কামাখ্যাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন···নীরদবাবু প্রভৃতি ছুটে এসে গোবিন্দর হাত ছাড়িয়ে দিলেন······কামাখ্যাবাবু সরে এসে হাপরের মত হাঁপাতে লাগলেন···সভা নিঃশব্দ হয়ে গেল।

হেডমাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন—

হাত তুলে বললেন,—একি নীরদবাবু?

কামাখ্যাবাবু বন্ধু হলেও নীরদবাবু তাঁর কৃতকর্মের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন না; রুষ্টস্বরে বললেন,—কি হে কামাখ্যা?

অর্থাৎ আনাড়ি হয়ে এ কি তোমার দুঃসাহস; আর দায়িত্ব সব তোমারই স্কন্ধে তা কি জানো?···

কামাখ্যাবাবু তা বুঝলেন।

বললেন,—নিজের শক্তির পরিমাণ আমার অজ্ঞাত ছিল; সাবজেক্টে এত শক্তি অজ্ঞাতসারেই প্রেরণ করেছি যে, ঠিক এখন ও আমার আয়ত্তে নয়। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি; আমারই শক্তি নিয়ে ও এখন আমার চাইতে শক্তিমান। সেই শক্তিটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আমার চেয়ে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার পক্ষে অসম্ভব।—বলে তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

রাখালবাবু, থার্ড মাষ্টার, হঠাৎ ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে গেলেন; বিশ্রী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন,—এঃ অসম্ভব। তবে কেন এসেছিলেন মশাই? আবার হাসি হচ্ছে!······

মনে হল, সবাই যেন নিঃশব্দে রাখালবাবুর এই অসহিষ্ণু কটূক্তির সমর্থনই করলেন। সেটা কামাখ্যাবাবুরও চোখ এড়াবার কথা নয়।···সভয়ে চারিদিক চেয়ে তিনি সভাকেই সম্বোধন করে বললেন,—আমি প্রথমেই বলেছিলুম, এ-কাজে আমি নূতন। কেমন, বলিনি? বলে নীরদবাবুর দিকে তাকিয়ে যেন আশ্রয় চাইলেন।···কিন্তু নীরদবাবু ঠিক সেই সময়টিতে অন্যদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ছিলেন—কামাখ্যাবাবুর নির্ভরতা হড়কে গেল।

হেডমাষ্টার মাটিতে পা ঠুকে বললেন,—বাক্‌বিতণ্ডা থামান। এখন উপায় কি তা বলুন। আচ্ছা বিপদে ফেললেন দেখছি·····

—উপায় ঐ যে বললুম। অচৈতন্যই বলুন, মোহই বলুন, আপনি ক্ষয় হয়ে যাবে। ভয়ের কারণ নেই। বলে রুমাল পকেটে গুঁজে কামাখ্যাবাবু উঠে দাঁড়ালেন।··পুনশ্চ বললেন,—আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন; ও-র কথার প্রতিবাদ করবেন না, কাজে

বাধা দেবেন না। ও এখন যদুপতি ব্যাকরণতীর্থ, হেডপণ্ডিত,—তা নয় বলে ওকে বোঝাতে গেলে রাগের মাথায় মেরে বসতেও পারে, তার নমুনা পেয়েইছেন। বলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন।

নীরদবাবু ভীতভাবে বললেন—যাচ্ছ না কি ?—

হ্যাঁ, আমার আর কোনো কাজ নেই; বিশেষ আমাকে বড় অপছন্দ করছে, আমি থাকলেই কেস আরো খারাপ হবে। বলতে বলতে কামাখ্যাবাবু দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।··· ···

হেডমাষ্টারকে রাগ করতে দেখেছি; কিন্তু রাগে কখনো কাঁপতে দেখিনি; আজ দেখলাম।

কামাখ্যাবাবুকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন,— যাচ্ছেন কি রকম ? জানেন ছেলের জীবনের জন্য দায়ী আপনি ? যদি—

কিন্তু কামাখ্যাবাবু সে-কথা আদৌ কানে না তুলে সেই পায়েই ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরলেন।—

মাষ্টাররা আতঙ্কে শুকিয়ে একেবারে আদ্দেক হয়ে গেলেন···দিশেহারা ত' হলেনই।

একি কাণ্ড! যদি মারা যায়? যদি পাগল হয়ে যায় ? তা না হোক, যদি পন্ডিত হয়েই রয়ে যায় ? তামাসা দেখতে গিয়ে একি বিপদ!

······নিজেদের ওপর সমস্ত দায়িত্ব কল্পনা করে মাষ্টাররা ফৌজদারী, কয়েদখানা, খেসারৎ প্রভৃতির বিভীষিকা চতুর্দিকে যে কত দেখতে লাগলেন তার হিসাব নেই।—

তাঁদের সংগে সংগে আমরাও।

হরিষে বিষাদ ঘটে গেল—

এমন মনে হতে লাগল, দূর কর ছাই, ছুটিতে আর কাজ নেই। ··ছুটির ওপর এমন বিতৃষ্ণা আর কোনোদিন হয় নি।

গোবিন্দ এদিকে রীতিমত স্নান, আহ্নিক, আহারাদি করলে, ছড়ি হাতে করে পণ্ডিত-মশাইয়ের মত একটু ঘুরেও বেড়ালে। ··এক কথায়, সে যে গোবিন্দ নয়, সে যদুপতি ব্যাকরণতীর্থ এই ভ্রমটা ছাড়া, আর একটা আচ্ছন্ন নিশ্চেষ্টভাব ছাড়া, তার আর কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

পরদিন ইস্কুলের সময় গোবিন্দ খেয়েদেয়ে মাষ্টারদের ঘরে গিয়ে সমানচালে একখানা চেয়ার দখল করে বসল।···আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগলাম, সে কি করে!

গোবিন্দ হেডমাষ্টারকে বললে—শশধরবাবু, প্রথম ঘণ্টায় আমার কোন্ ক্লাস ?

হেডমাষ্টার বললেন,—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাস।

সবাই জানত, পণ্ডিতমশাই রোজ জিজ্ঞাসা করেই বেরুতেন, নতুবা তাঁর ভুল হত।

গোবিন্দ বললে,—শশধরবাবু, আর একটা কথা বলি আপনাকে, শুনুন। অমুক তমুক।

—বলুন। বলে শশধরবাবু উদ্‌গ্রীব হলেন।

গোবিন্দ বললে,—সখারামবাবু ক্লাসে ঘুমোন।......সখারামবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন..... গোবিন্দর কথা শুনে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

গোবিন্দ বলতে লাগল,—আর নস্য নেন। দুটোর একটাও ত' কাজ ভাল নয় অমুক তমুক।

হেডমাষ্টার বললেন,—তা ত' নয়ই। কি করতে বলেন?

—বারণ করে দেবেন। আর একটি কথা গোবিন্দকে ঢিট করা দরকার হয়েছে। সে আমার সামনে কুকথা উচ্চারণ করে অমুক তমুক? বলে গোবিন্দ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চোখ পাকিয়ে রইলো।

হেডমাষ্টার ঠাণ্ডাস্বরে বললেন,—তা শাসন কবে দেব'খন্।

গোবিন্দ আরো বেশী করে চোখ পাকিয়ে বললে,—আপনার ত' মুখে শুধু দেবো'খন্ দেবো'খন্. দিতে ত' একদিন দেখলাম না অমুক তমুক!

—সময় হয়েছে, এখন আপনার ক্লাসে যান। বলে হেডমাষ্টার যেন তাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন এমনি একটি অসহিষ্ণু ভংগী করে উঠে দাঁড়ালেন।

—যাই। বলে গোবিন্দও উঠে পড়ল।

গোবিন্দ পড়াতে চলেছে!—

তার পিছু পিছু ইস্কুলের সমস্ত মাষ্টার আর প্রায় আদ্দেক ছেলে থার্ড ক্লাসে ঢুকে পড়ল।

...যাচ্ছেতাই পড়া ধরে বেতিয়ে, ঠেঙিয়ে, ঘুষিয়ে, চড়িয়ে গোবিন্দ ছেলেদের আধমরা করে দিল।

রাখালবাবু বিমর্ষ হয়ে বললেন,—আজ ওকে ছুটি কেন দিলেন না?

—এত কি আগে জানি! বলে হেডমাষ্টার অতিশয় করুণচক্ষে থার্ড ক্লাসের ছেলেদের পানে চেয়ে রইলেন।

কামাখ্যাবাবু বলে গেছেন, বাধা দিলে ফল খারাপ হবে—

কাজেই গোবিন্দ নৃশংস অবাধগতিতে পড়িয়ে গেল......

এবং দৃশ্য কখন করুণ, কখন হাস্যকর হয়ে সে-দিনটা ওতেই কেটে গেল।

কিন্তু এমন করে ত' চিরকাল চলতে পারে না।

অতঃপর কি করা যায়, এই হল মাষ্টারদের মস্ত ভাবনা।

ডাক্তার এলেন—

বলে গেলেন, চিকিৎসা নেই। কবিরাজও ভরসা দিলেন না।......

মাষ্টারদের এ সংকটে আমরাও ভাবছিলাম।

চার পাঁচজনে পরামর্শ করে প্রস্তাব করলাম, গোবিন্দকে বাড়ী রেখে আসব; তার বাপমাকে বুঝিয়ে বলে আসব—তাঁরা কেঁদে কেটে না নেন। দরকার বুঝলে, গোবিন্দ ভালো না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার বাড়ীতেই থাকা যাবে।

শুনে হেডমাষ্টার কুল দেখতে পেলেন—

বললেন,—তাঁরা বুঝবেন ত' ব্যাপারটা?

—বুঝবেন বই কি ; তাঁরা খুব ইয়ে, মানে পাড়াগেঁয়ে হলেও একেবারে ইয়ে নয়। বলে হেডমাষ্টারকে সাহস দিলাম।

—দেখিস, বাবা, তাঁরা যেন নালিশটালিশ না করেন। তুই থাকিস কিছুদিন, তাঁদের থামিয়েথুমিয়ে রাখিস।

আমি বললাম,—আজ্ঞে আচ্ছা। নালিশটালিশ, খবরাখবর হতে কিছুতেই দেব না।

এই বন্দোবস্ত হয়ে রইল।

পরদিন মর্নিং-ইস্কুল হয়েই ছুটি।

বোর্ডিংএ গোবিন্দ, প্রকাশ আর আমি এক ঘরে থাকতাম। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করে শুয়েছি ; প্রকাশ নাক ডাকাচ্ছে ; আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে ; এমন সময় কে যেন আমার কানের সংগে মুখ ঠেকিয়ে চুপি চুপি ডাকলে,—শশাংক ?

আমি চমকে উঠে বললাম,—কে ?

—আমি গোবিন্দ।

—গোবিন্দ ?

গোবিন্দ আমার মুখ চেপে ধরে বললে,—চুপ।

তেমনি চাপা গলায় বললুম,—তোর সে ইয়ে সেরে গেছে ?

—কি, যদুপতি ব্যাকরণতীর্থ হওয়া ? হয়ই নি, তার সারবে কি ! সব মিছে কথা।

—বলিস কি ?

—তোর দিব্যি। যা করেছি সব সজ্ঞানে। কাল সকালে উঠেই আমায় বাড়ী রওনা করে দিবি কিন্তু। তুইও আমার সংগে যাবি—তুই একা। গাড়ীতে বসে হবে'খন।

—কাল সেরে উঠবি ?

—না। একটা মাস ওদের দুর্ভাবনায় কাটুক।

বলে গোবিন্দ গিয়ে শুলে।

এদিকে আমি আমার খাট কাঁপিয়ে হাসতে লাগলাম···ওদিকে গোবিন্দ তার খাট কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।··

পরদিন—

গোবিন্দকে নিয়ে রওনা হব তারি যোগাড় করছি ; বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে ; গোবিন্দর বাক্সে তার বইগুলো গুছিয়ে রেখে দশটি টাকা তার হাতে দিয়েছি, সে-ও টাকাগুলো ঝম করে পকেটে ফেলেছে—এমন সময় বারান্দার ও-ধারে একটা একটানা খস খস শব্দ উঠল।

রাখালবাবু এদিকে আসছেন—

ছড়িটা মাটির সংগে ঠেকিয়ে টেনে আনা ছিল তাঁর অভ্যাস।

শব্দটি শুনতে পেয়েই গোবিন্দর সংগে চোখোচোখি করেই সতর্ক হয়ে গেলাম।

রাখালবাবু এসে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে আমাদের যাওয়ার আয়োজন দেখলেন···

তারপর ভয়ংকর গম্ভীর গলায় গোবিন্দকে উদ্দেশ করে বললেন,—পণ্ডিতমশাই, আমার টাকা সাতটা দেবার এখন সুবিধে হবে কি ?

গোবিন্দ স্পষ্টই চমকে উঠল—

বললে,—টাকা ? অমুক তমুক—আপনার—

—আপনার মনে নেই দেখছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে নিয়েছিলেন, জামাইষষ্ঠীর ঠিক আগের দিন, জামাতৃ-অর্চন করেছিলেন। মনে পড়েছে ?—বলতে বলতে রাখালবাবু এগিয়ে এসে, গোবিন্দ বসেছিল—তার সামনে দাঁড়ালেন।

আমার মনে হল, রাখালবাবু পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে সচরাচর ঠিক এ-সুরে কথা বলেন না...আর তাঁর চোখমুখের ভাব যেন আক্রোশে ক্রূর।

গোবিন্দও ভয় পেয়েছে দেখলাম ; টাকাটা যথার্থই দিতে হবে বলে কি রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে তা সেই জানে···

রাখালবাবুও গোবিন্দের ভয়টা লক্ষ্য করলেন তা-ও বেশ বুঝলাম।

যাই হোক, ঋণের কথাটা ভুলে যাওয়ার দরুণ নিরতিশয় অপ্রতিভ হয়ে গোবিন্দ বললে—হেঁ হেঁ, মনে পড়েছে বটে, জামাইষষ্ঠীর ঠিক আগের দিন নিয়েছিলাম বটে, যথাসময়ে দিইও নি বটে—নিন নিন অমুক তমুক।

বলে টাকা সাতটি গুণে রাখালবাবুর হাতে দিতে গিয়েই হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে তন্দ্রা ভেঙে গোবিন্দ বলে উঠল,—আমি কোথায় ? বলেই অকপটবিস্ময়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

রাখালবাবু বললেন,—তুমি এখানে, ইস্কুলের বোর্ডিংএ।

গোবিন্দ রাখালবাবুর মুখের দিকে শুষ্কমুখে চেয়ে বললে, —কামাখ্যাবাবু কোথায় ?

—তিনি বাড়ী গেছেন। বলেই রাখালবাবু একেবারে অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে গোবিন্দের বাঁ কানটা ধরে ফেললেন—

হাঁ করে থাকলাম—

এবং গোবিন্দের মাথাটা তার কানের সাথে সাথে ডাইনেবাঁয়ে সমানতালে দুলতে লাগল···

রাখালবাবু দাঁত কড়মড় করে বলতে লাগলেন,—খাটে শুয়ে খুব হাসি হচ্ছিল যে রাত্তিরে...আমি যে তখন খড়খড়ি তুলে দাঁড়িয়ে ·····শুনেছি সব ·····শুনেছি······ শুনেছি · ···শুনেছি······

তিনটি প্রলয়ঙ্কর চাপড় তিনি গুণে গুণে গোবিন্দের মাথায় মারলেন।—

সব ফাঁস হয়ে গেল ; কিন্তু কামাখ্যাবাবুকে দুর্জয় একজন হিপ্‌নটিষ্ট বলে এখনো ইস্কুলের কেউ কেউ জানে।

## ॥ ছয় ॥

### জ্যাঠা নন্দ

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী যদি নিছক বা অত্যুক্ত কবিকল্পনা না হয় তবে স্বীকার করিতেই হইবে তিনি বড় দুরন্ত বালক ছিলেন। কৃষ্ণভক্ত পরিবারের একটি লোকের সম্পর্কে এই কথাটা বলা, কারণ, নামের গুণ চরিত্রে কখন কখন ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, যেমন দুঃশাসন।

আমাদের প্রতিবেশী পরম-বৈষ্ণব গৌরনিতাই দাসের ক্রোড় এবং স্কন্ধ বহুদিন হইতে আজ পর্যন্ত বিশ্রাম পায় নাই ; তাহার পুত্রবধূ তাহাকে অবিশ্রান্ত পৌত্র, পৌত্রী সরবরাহ করিয়া তাহাকে কোলের এবং কাঁধের উপর পাঠাইয়া দিয়াছে। এই সরবরাহের ভাণ্ডার শূন্য হইবার সূচনা আজিও দেখা যায় নাই। সংখ্যায় বর্তমানে তারা সাতটি। দেখিয়া দেখিয়া আমাদেরও বিরক্তবোধ হইত ; কিন্তু পরমসহিষ্ণু গৌরকে কখন বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এককালে তিন চারিটি আসিয়া গৌরকে নানাদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া হাত তুলিয়া বলিয়াছি আহা-হা-হা, বুড়ো মানুষ, লাগবে লাগবে। গৌর কিন্তু ধাক্কা খাইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া বলিয়াছে,—না, না, লাগবে না।

তিনটি কন্যার পর গৌরনিতাইয়ের বধূমাতা সংসারকে একটি পুত্র উপহার দিয়াছিলেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইলে গৌর দুই হাত আকাশে তুলিয়া দাড়ি উড়াইয়া উঠানময় যে তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল, বার বৎসর পুরাতন হইলেও সকলেরই সে দৃশ্য আজও মনে আছে। গৌর তখনও বৃদ্ধ, এখনও বৃদ্ধ ; তাহার হাড় কখানা অত শক্তি সেদিন কোথায় পাইয়াছিল তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। তিনটী নাতনীর পর যাহার নাতি জন্মিয়াছে, বুঝিবার সাধ্য যদি কাহারও থাকে তবে একমাত্র সেই তারই। যে বধূটি পর পর তিনটি মেয়ে দিয়াছে তাহার নিকট পুত্রলাভের আশা কতটা, তাহা বাড়ীর সবাই মনে মনে বাঝিয়াছিল। এমন সময়ে, আকাশের চাঁদ এবং সাগরের রত্নের মত ঐ পুত্র আঁতুড়ঘরে উদিত হইল,—নৃত্য পাইবে না ?

গৌরনিতাই কৃষ্ণভক্ত, নাতির নাম রাখিল নন্দদুলাল, ঠাকুরমা নাম রাখিল হরিবোলা, একেলে বাপ নাম রাখিল নিরঞ্জন, মা নাম রাখিল—যাক, নামের তালিকা লম্বা করিবার প্রয়োজন নাই, একটি নামেই আমাদের চলিবে।

নন্দর শৈশব-ইতিহাস অনুমেয়। তবে কথা ফুটিলে কিছুদিন সে গৌরকে বলিয়াছিল, বাবা, বাপকে বলিয়াছিল যাদব, মাকে বলিয়াছিল বৌমা, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় সে দেয় নাই। কিন্তু আদরে, আদরে, কোলে কোলে মানুষ হইয়া সে যখন বেশ বড়টি হইয়া উঠিল, তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, বার বছরের নন্দ জ্যাঠামিতে অনেক জ্যাঠাকে অতিক্রম করিয়া গেছে। এমনি তার কথার তোড় যে, ঠাকুর্দা ভাসিয়া ঠাকুরমার কাছে আসিল এবং দুইজনে একসঙ্গে ভাসিয়া কোথায় যাইত ঠিক নাই, এমন সময় আর একটি নাতি আসিয়া উভয়কে বাঁধিয়া ফেলিল। এক কথায় ঠাকুর্দার কোল এবং কাঁধ যখন নন্দর আর দরকার হইল না তখন সেটা সে স্পষ্টভাষায় তাহাকে জানাইয়া দিয়া গাছে উঠিয়া বসিল। পাড়ার লোক তাহার দুরন্তপনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার বাপের কাছে নালিশ করিল, বাপ দেখাইয়া দিল তাহার বাপকে। আরও এক ধাপ উঠিবার যো ছিল না, কাজেই আপীল, আদালত নন্দর বিবাহ দিয়া আর একটা হাকিম ঘরে আনিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

নন্দ পাঠশালা যায়, যাওয়া তার কামাই নাই। পাঠশালা যাইবার রাস্তাটা তাহাদের বাড়ীর কাছ দিয়া ইস্কুলের কাছাকাছি আসিয়া দুইভাগ হইয়া গিয়াছে, কাজেই রাস্তার বাহু চিনিয়া লইতে তাহার প্রায় নিত্যই ভুল হইয়া যাইত। পথটা ইস্কুলের দিকে গিয়াছে সেটা ইস্কুলেই শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পথটি অনেক লোভনীয় স্থানে পড়ুয়াগণকে নিমন্ত্রণ করিতে করিতে ভিন্ন পাড়ার ভিতর লইয়া যাইত। সেই পাড়ায় খেলিবার স্থান

ও সংগী প্রচুর, বড় বড় গাছ অনেক, পুকুরও দুইচারিটি আছে। নন্দদুলাল এইস্থানে পড়িতে আসিত। নন্দর অভাবে দুশ্চিন্তায় পণ্ডিতমহাশয়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিত না, তাই তিনি নন্দর অনুপস্থিতি সহ্য করিতে পারিতেন।

নন্দর স্ত্রীর নাম কিশোরী, বয়স নয় বছর; দেখিতেও বেশ। এই বয়সেই সে স্বামীকে লজ্জা করিতে শিখিয়াছে। নন্দকে দেখিলেই কিশোরী ঘোমটা টানিয়া দেয়।

একদিন নন্দ মাকে বলিল, মা দেখ। কি দেখাইতেছে তাহা না বুঝিয়াই নন্দর মা নন্দর দিকে চোখ ফিরাইল। নন্দ চোখের ইসারায় অবগুণ্ঠনবতী কিশোরীকে দেখাইয়া দিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—যেন পুতুলটি।

মা একটু হাসিল।

নন্দ এদিকে তাড়াতাড়ি যাইয়া কিশোরীর ঘোমটাটা একটানে খুলিয়া দিল এবং তাহার কাঁধ ধরিয়া কাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেল।

কিশোরী ঐ ঘোমটা টানিতেই শিখিয়াছে; কিন্তু স্বামী যদি শাশুড়ীর চোখের সামনে ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া কাৎ করিয়া দেয় তবে কি করিতে হয় তাহা শিখে নাই। কাজেই, সে কাঁদিয়া উঠিল। শাশুড়ী নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের উদ্দেশ্যে বকিতে বকিতে বধূকে উঠাইয়া বসাইয়া তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন এবং কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিলেন।

নন্দর দাম্পত্যলীলা শুধু ঘোমটা খুলিয়া দেওয়াতেই আবদ্ধ ছিল না; কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা পরে বলিব।

নাতি আর নাতবৌকে দুই হাঁটুর উপর বসাইয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিত,—নন্দ, বৌ পছন্দ হয়েছে রে? নন্দ গম্ভীরমুখে বলিত,—হ্যাঁ, ঘোমটাটোমটা সবই পছন্দসই।

—বলিস কি, মুখ দেখিস নি?

—কই আর দেখলুম?

—"তবে দেখ"—বলিয়া কিশোরীর ঘোমটা খুলিয়া দিয়া তার কাপড়সমেত ঘাড় চাপিয়া ধরিত, যেন নাতবৌ ঘোমটা আবার টানিতে না পারে।

কিশোরী চোখ বুঁজিয়া থাকিত।

নন্দ বলিত,—এঃ, কানা যে।

ঠাকুর্দা বলিত, খোল চোখ।

রাগের ভাণ করিয়া দুই তিনবার বলিতেই ছেলেমানুষ কিশোরী ভয় পাইয়া চোখ খুলিত।

ঠাকুর্দা তখন নন্দকে বলিত;—এইবার দেখ। কেমন? পছন্দ-সই?

নন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিত,—নাঃ।

—তুই শালাই কানা। এমন রাধিকার মত রূপ।

—রাধিকার মত না, কুব্জার মত?

—পাশে এসে বস ত', দেখি কেমন মানায়। নন্দ তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া অসঙ্কোচে কিশোরীর গা ঘেঁষিয়া বসিত। বৃদ্ধ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত, সুখ প্রাণে ধরিত না। কিশোরী তখন পালাই পালাই করিত।

এমনি অভিনয় প্রায়ই হইত।

নন্দ একদিন কিশোরীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল,—তোর সংগে একটা কথা আছে।

একবাড়ী লোক গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছে, ননদরা চারিদিকে ছিটাইয়া আছে, কেহই বসিয়া নাই, কে কোথা হইতে দেখিয়া ফেলিবে তাহার কিছু ঠিক নাই। এখন আবার কি কথা ?

কিশোরী কাতর হইয়া বলিল,—কি কথা ? এবং কথাটা না শুনিয়াই যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

নন্দ বলিল,—কি কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাচ্ছিস যে ? শুনবিনে কথাটা ?

কিশোরী ছটফট করিতে করিতে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল,—শুনবো, শিগ্‌গির বল।

—সে সব কথা তাড়াতাড়ি বলা যায় না, অত ছটফট করছিস কেন ? কেউ এখানে আসবে না। ঠিক উত্তর দিবি ?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ঠিক উত্তরই সে দিবে।

নন্দ তখন জিজ্ঞাসা করিল,—আমায় ভালবাসিস ?

নন্দর কথার ভংগীতে অনুচিত হালকাভাবের আভাসমাত্রও ছিল না।

কিন্তু যে উত্তর দিবে প্রশ্ন শুনিয়া সে পলায়নের পথ লইল।

নন্দ তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—না বললে যেতে দেব না।

কিশোরী ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি বলিল,—বাসি। কিশোরী ভাবিয়াছিল, বুঝি শেষ হইল। কিন্তু শেষ এখনও হয় নাই ; একটি কথায় উত্তরে নন্দ সন্তুষ্ট নহে ; নন্দ আরও কিছু চায়।

যথোচিত এবং অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত নন্দ বলিল,—সবাই বউকে চুমু খায় শুনি। তুইও ত' আমার বউ, একটা চুমু খেতে দে, তবে যেতে দেব।

প্রস্তাবটা বড়ই আকস্মিক, তাই টাগ্‌-অব্‌-ওয়ার বাধিয়া গেল ; কিশোরী আঁচল টানিতে লাগিল, নন্দ আঁচল ধরিয়া তাহাকে টানিতে লাগিল।

টানিতে টানিতে নন্দ বলিল,—ঠাকুর্দাকে বলে দেব তুই আমার কথা শুনিস নি, আর চেঁচিয়ে বামী, সুন্দরী সবাইকে এখানে ডাকছি, তারা এসে দেখুক তুই আমার কাছে রয়েছিস।

ঠাকুর্দার সংগে এ সব আলোচনা করা নন্দর পক্ষে অসম্ভব নয়। যে প্রস্তাবের সম্পর্কে সে স্বামীর অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে সে কথা ঠাকুর্দার কানে গেলে বড় লজ্জার কথা হইবে। তার উপর সবাইকে ডাকিয়া সাক্ষী করিয়া রাখিলে ঠাকুর্দার কোর্টে রীতিমত বিচার হইবে, এবং হয়ত সেইখানেই ঠাকুর্দার সামনেই নন্দর সংগে কথা বলিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে। ইতিপূর্বে নালিশের দুই একটা ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। আর "সেই বামী, সুন্দরী" সবাই! প্রকাশ্য বিচারালয়ে মোকদ্দমার শুনানি হইয়া লোক-জানাজানি না হইলেও উহাদের একজন যদি ঘুণাক্ষরেও এই ব্যাপারটা টের পায় তবে সেই বাঘিনীরা যে বাড়ী মাথায় করিয়া নাচিতে থাকিবে।

নিরুপায় কিশোরী মুখ কাঁদ-কাঁদ করিয়া নন্দর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দ দুইহাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বনটি কোন্‌ গালে ছোঁয়াইবে, মুখখানি একবার এপাশে একবার ওপাশে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাই বিবেচনা করিতেছে এমন সময়ে অদূরে পায়ের শব্দ শুনা গেল।

কিশোরী ক্রন্দনের সীমায় আসিয়া ঝুলিতেছিল, এইবার স্পষ্টই কাঁদিয়া ফেলিল,

এবং সে গড়াইয়া মাটীতে পড়িবার উপক্রম করিতেই নন্দ তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল,—তবে যা আজকার মত। আর একদিন কাঁদলেও ছাড়ব না।

নন্দ একদিন লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বাড়ীতে উঠিল। গৌর জপের থলিটি হাতে লইয়া বসিতে যাইতেছিল। নন্দ দুইহাতে তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ঠাকুর্দা, বড় খারাপ খবর।

গৌর চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—কার? কিসের?

—আমার নিজের।

—কি হয়েছে তোর?

—হয়নি কিছু—হবে।

—কি হবে?

—ও-পাড়ার ঠাকুরবাড়ীতে এক গণৎকার এসেছে, শুনেছ ত'?

—শুনেছি।

—ভারি গণৎকার, ঠিক ঠিক বলছে। সবাই তাকে হাত দেখাচ্ছে। আমিও দেখিয়ে এলুম।

—কি বললেন তিনি?

—ওই ত বললুম, বড় খারাপ খবর।

গৌর নন্দর বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া জপের থলিটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—বোস।

নন্দ বসিল। গৌর তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল,—কি কি বললেন তিনি?

নন্দ বলিল,—শুনবে তবে? আমি নাকি আর বেশীদিন বাঁচব না।

শুনিবামাত্র বৃদ্ধের মুখ সাদা হইয়া গেল এবং ডানহাতের শীর্ণমুষ্টিটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতহস্তে জপের থলিটা অন্যমনস্কের মত তুলিয়া লইয়া গৌর বলিল,—মিথ্যে বলছিস নে নন্দ? সত্যি করে বল, আমার গা ছুঁয়ে, তিনি ঐ কথা বলেছেন?

নন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল,—বলেছেনই ত। তবে খুব অল্পতেই ফাঁড়া কেটে যেতে পারে, তাতে মোট বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ।

বৃদ্ধ যেন পাথারে কূল পাইল। তাহার হাতের কাঁপুনিটি কমিয়া গেল এবং মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। বলিল,—কি করলে?

—শোন তবে। ঠাকুর আমার হাতের পানে চেয়েই আমার বাঁ হাতটা উল্টে নিয়ে কব্জিটা দেখলে। তারপর আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, তোর পরমায়ু বড় কম; তবে ফাঁড়া কেটে যেতে পারে যদি—

নন্দ থামিল।

গৌর তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—বল, তারপর তিনি কি বললেন।

—বলছি। ফাঁড়া কেটে যেতে পারে, তাতে বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ। পারবি খরচ করতে?

আমি বললুম, পারব। আরও অনেক অনেক লোক সেখানে ছিল, তারা সবাই বললে—যে আদরের নাতি ও! বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ ত' অতি সামান্য কথা, এই নাতিটির প্রাণ বাঁচাতে বুড়ো সর্বস্ব বেচে বনে যেতে পারে।

—তারপর ?

—খরচ করবে ত' ঠাকুর্দা বিশ-পঁচিশ টাকা ?

ঐ বিশ-পঁচিশের উপর বার বার অত্যন্ত ঝোঁক দেওয়ায় ঠাকুর্দার মনে কেমন একটা আব্ছায়া সন্দেহ জন্মিতেছিল, অথচ শেষ পর্যন্ত না শুনিলেও মন সুস্থির হয় না। বলিল,—করব।

নন্দ তাহার আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া বলিল,—কথা দিলে ?

—দিলুম।

—দেখো যেন, শেষে পিছিও না।

না রে পাগল, না।

নন্দ ঠাকুর্দার বাঁহাতখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—তারপর তাদের কথা শুনে ঠাকুর্দা বললে,—বেশ কথা, তার পর আমার হাতের ঠিক এইখানটায়—কব্জির ওপর টোকা মেরে বললে, এখানে ঘড়ি পরিস, ফাঁড়া কেটে যাবে, বিশ-পঁচিশের বেশী খরচ তাতে হবে না।

ব্যাপার বুঝিতে গৌরের তিন চার মুহূর্ত সময় লাগিল; তার পরেই নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া সে এমন হাসি জুড়িয়া দিল যে, মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক হাসি তেমন নয়। হাসি থামিলে গৌর বলিল—খুব চালাকি শিখেছিস রে শালা, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নন্দ বলিল—কথা দিয়েছ, ঠাকুর্দা! মনে থাকে যেন। বাবা, মা দিতে চাইবে না। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ, দেওয়াতেই হবে, নইলে তোমার বড় অধর্ম হবে।

—ধর্মরক্ষা করে এসে তবে মালা জপব, চল আমার সঙ্গে, বউমাকে রাজি করে আসি।

উভয়ে অন্দরে যখন আসিল তখনও গৌর থাকিয়া থাকিয়া হাসির বেগ চাপিতেছে। বাবা; ছেলের কি বুদ্ধি!

নন্দ-প্রসবিনীকে ডাকিয়া গৌর বলিল—বৌমা, তোমার ছেলের কীর্তি শুনেছ? বলিয়া সে পূর্বোক্ত ঘটনাটা প্রচুর হাসির দ্বারা অভিষিক্ত এবং ব্যাহত করিয়া আদ্যন্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া নন্দর মাও হাসিতে লাগিল।

গৌর বলিল—একটা ঐ ঘড়ি ওকে দিতেই হবে বউমা, আমি কথা দিয়েছি।

বৌমা স্বীকৃত হইল। বলিল,—আচ্ছা।

নন্দ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—আমি আজই চাই।

গৌর বলিল,—আজ কোথায় পাব? কলকাতায় চিঠি লিখতে হবে, তবে ডাকে আসবে। এখানে ত ঘড়ির দোকান নেই।

—তবে চিঠি আজই লেখা হোক।

—হবে রে হবে, আজ ত' চিঠি লেখার সময় নেই। বৌমা বলেছেন, চিঠি লিখে দেবেন।—বলিতে বলিতে ঠাকুর্দার জপের থলির কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

পরদিন নন্দ মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কলকাতায় চিঠি লেখা হয়েছে, মা?

—হয়েছে।

—কার কাছে লিখলে ?

—অত-শত আমি জানিনে বাপু, জিজ্ঞেস করগে ওদের কাছে।

—সত্যি লেখা হয়েছে, না অমনি বলছ? ফাঁকি দিলে কিন্তু চলবে না।

—চলবে না তা জানি।—বলিয়া নন্দর মা কাজে গেল।

নন্দ রোজই দিন গোণে আর ডাকঘরে যায়।

সপ্তম দিনেও ঘড়ির পার্শেল আসিল না। অষ্টম দিনে কব্জিটা সাবান দিয়া ধুইয়া নন্দ ডাকঘরে গেল ; ঘড়ির গায়ে ময়লা না লাগে। কিন্তু পার্শেল আসিল না।

নন্দ ডাকঘর হইতে আসিয়া ঠাকুর্দার ঘরে গেল। গৌর তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তোষামোদের সুরে বলিল,—কি দাদা ! কি খবর ?

নন্দ মাথা দুলাইয়া বলিল,—আমি সব বুঝি ঠাকুর্দা !

গৌর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নন্দ বলিতে লাগিল,—সেই ঘড়ির কথা বলছি। ঘড়ি পাঠাতে কলকাতায় কি কোন চুলোয় চিঠি লেখা হয় নি ?

—লেখা হয় নি ? কি করে জানলি ?

—কলকাতা ত' সাতসমুদ্র তের নদীর ওপারে নয় যে ঘড়ি আসতে ন'মাস ছ'মাস লেগে যাবে। চিঠি লেখা হলে ঘড়ি অবশ্যই আসত।

বৃদ্ধ একটু অসন্তুষ্ট হইল। বলিল—আয় আমার সঙ্গে, শুনিগে।

নন্দ বলিল,—তোমার দোষ নাই ঠাকুর্দা। তুমি থাক, আমিই ব্যবস্থা করছি।—বলিয়া বৃদ্ধকে বসাইয়া দিয়া নন্দ অন্দরে আসিল।

—কি হচ্ছে সব ?

নন্দর এক দিদি বলিল,—কাজ-কর্ম হচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখা হচ্ছে।—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

—আমিও ঘড়ি দেখাতেই এসেছি।

নন্দর মা বিস্মিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিল। নন্দ মায়ের বিস্ময়টুকু লক্ষ্য করিল। বলিল,—মা ভাবছে, ঘড়ি পেলে কোথায় ? তুমি ভেবেছ মা, তুমিই চালাক, নন্দ বড় বোকা। তোমরা চিঠি লিখবে না তা আমি জানতুম। পোষ্টমাষ্টারকে আমিই চিঠি লিখিয়েছিলাম। এই দেখ—বলিয়া নন্দ কিছুই দেখাইল না। কিন্তু নন্দর মা ফাঁদে পা দিল ; হাসিয়া বলিল—কি বদমায়েস ছেলে, মাগো, ওকে বললুম চিঠি লিখে দিতে, উনি বললেন, হাতে টাকা নেই, দেব একটা ঘড়ি কিছুদিন পরে, বাবা কথা দিয়েছেন—

শেষ না হইতেই নন্দ চীৎকার করিয়া বলিল—শোন তোমরা সবাই, মা নিজের মুখে স্বীকার করেছে ; কলকাতায় চিঠি লেখে নি। আমি চললুম এই ডুবে মরতে, ফাঁড়া ফলে যাক। পোষ্টমাষ্টারকে দিয়ে চিঠি লেখাবার কথাটাও মিথ্যে। বলিয়া নন্দ পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেইভাবেই বসিয়া রহিল ; নন্দর ডুবিয়া মরিবার ভয়ে কেহ চাঞ্চল্যপ্রকাশ করিল না।

অল্পক্ষণ পরেই জলে মানুষ পড়িবার শব্দ হইল।

আর উদাসীন থাকা চলিল না। নন্দর মা প্রভৃতি পুকুরের ধারে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, পুকুরের জলে ঢেউ খেলিতেছে, নন্দ কোথাও নাই। পরক্ষণেই পুকুরের চারিধার নারীকণ্ঠের চীৎকারে পূর্ণ হইয়া গেল। নন্দর মা কাঁদিয়া হাত চাপড়াইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বালক-বালিকারা আরও জোরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গৌর সংবাদ পাইয়া আলুথালু হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িতে উদ্যত হইল।

প্রতিবেশীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং সন্তরণ-পটু দুই ব্যক্তি জলে পড়িয়া ডুবিয়া ডুবিয়া নন্দকে খুঁজিয়া বৃথাই হয়রান হইতে লাগিল।

নন্দর মা লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর্দা রক্তবর্ণ শুষ্কচোখে পুকুরের জলের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ডুবাডুবি করিয়া লোক দুইটি উঠিয়া আসিল, নন্দকে পাওয়া গেল না। নন্দর বাপ ও ঠাকুর-মা বাড়ীতে ছিল না, ভিন্ন গ্রামে গিয়াছিল, তাহাদের ডাকিতে লোক ছুটিল। গৌর 'নন্দ' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া পুনরায় জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইল, নন্দর মা 'নন্দ রে' বলিয়া ফুকারিয়া উঠিল, এবং নন্দ নিজে দূরবর্তী একটা গাছের উপর থেকে বলিল,—আমি এখানে।……

—কোথায় তুই ?

—গাছের উপর। জলে ফেলেছিলাম থান ইট। বলিয়া নন্দ নামিয়া ঠাকুর্দার কাছে আসিল।

'শালা' বলিয়া গৌর অসহ্য আহ্লাদে নন্দকে মারিতে উঠিয়াই তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

যাহারা নন্দর মৃত বা জীবিত দেহ খুঁজিয়া নিজের দেহে জলের তলদেশের পাঁক মাখিয়াছিল, তাহারা স্পষ্টই বলিল,—হারামজাদা ছেলে।

নন্দর মা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—আপনি ছাড়ুন ত' একবার ওকে।

গৌর বাধা দিয়া বলিল,—এখন থাক, বৌমা। ঘড়ি একটা কিনে দিয়ে তবে মেরো।

সেইদিনই গৌর নিজেই কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া দিল।

## ॥ সাত ॥

### পেয়িং গেষ্ট

"প্রথম যখন বিয়ে হল
ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে—"

এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রণয়-সম্ভাবনার সূত্রপাতেই প্রিয়া আমার ভুল মুচড়ে ভেঙে দিলেন। প্রিয়ার লজ্জা ভাঙাবার কষ্ট আমাকে করতে হয়নি, কারণ তিনি লজ্জাটাকে কুসংস্কার মনে করতেন এবং সেটাকে নির্মূল করেই তিনি এসেছিলেন।

অতি অল্প সময় পরেই দেখলুম, প্রিয়া আমাকে উপার্জনক্ষম দেখতে যতটা আগ্রহান্বিতা, উপার্জন করতে আমি সেই অনুপাতে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি। এটা একটা অসামঞ্জস্য। অসামঞ্জস্যের যা অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের কোরক দাম্পত্যজীবনে তাই ফলে গেল। একটা বিপ্লব ঘটল। তিনি যত ঠেলতে লাগলেন, আমি ততই চেপে বসতে লাগলুম ; কাজেই সংঘর্ষণে আগুন জ্বলল, প্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করলুম। ঝগড়া অবশ্যই পরক্ষণেই লঘুক্রিয়ায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তিনি কথার সুর ছাড়লেন না। দাদারা মাথার ওপর থাকলেও এবং জীবিকা-সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হবার আবশ্যকতা না থাকলেও, বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার করে স্বতন্ত্র বাসা করে সস্ত্রীক একা বাস করার মধ্যে যে একটা অবাধ আনন্দ আছে, প্রিয়া আমাকে অতঃপর সেই আনন্দের প্রলোভন দেখাতে লাগলেন।

জীবনের ষোলটি বসন্ত তিনি অনূঢ়া অবস্থায় পার করে এসেছিলেন। স্বতন্ত্র বাসায় আমাকে নিয়ে একা থাকবার ইচ্ছার মূলে সেই ক্ষতিপূরণের অভিলাষ ছিল কিনা তা তাঁর অন্তর্যামী জানেন। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম এই ভেবে যে তাঁকে দেশে রেখে স্বাধীনতার তল্লাসে বিদেশে গেলে আমার যে সময়ের ক্ষতিটা হবে, উপার্জন যদি না করতে পারি তবে সে ক্ষতির পূরণ হবে কি করে?—এই প্রশ্নটির সদুত্তর আমি না পেলেও নেপ্টে থাকারই জয় হল; "দেখি" বলে সুর টেনে বেরিয়ে পড়লুম।

## ॥ দুই ॥

আমার বন্ধু ননী বলত, কাজের জায়গা কলকাতা। পকেটমারার ব্যবসা থেকে নোটজাল পর্যন্ত এবং মোসাহেবী বা বাজারসরকারী থেকে লাটদপ্তরের চাকরী পর্যন্ত—অসৎ ও সৎকাজের কেন্দ্র ঐ স্থানটি। ননী বয়সে বড়, বুদ্ধিমান এবং রোজগেরে। সুতরাং তার কথা মেনে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে তার বাড়ীতেই উঠলুম। উপার্জনের ক্ষেত্রের সন্ধান না পেলে 'স্বতন্ত্র' বাসার সন্ধান করা বৃথা।

দু'দিন অতিথিভাবে থেকে মাসিক একটা 'খরচ' দেবার কথাটা বলতেই ননী রাজী হয়ে গেল।

বললুম,—যৎসামান্য বারোটি টাকা, তবে যদি তার বেশী দে'য়া দরকার মনে কর তাতেও—

ননীর কাছে চক্ষুলজ্জার কোন কারণ আমার ছিল না, তাই টাকার কথা বলতে পারলুম; কিন্তু ননী শশব্যস্তে আমার মুখ চেপে ধরে কথা শেষ করতেই দিলে না।

একটা ঘরে বিছানা পেতে ফেললুম। ভাবলুম, কলকাতায় আহার এবং বাসস্থান মাত্র বারো টাকায়! বড় জিতেছি!

সোল্লাসে এই খবরটা প্রিয়াকে দিলুম। লিখলুম, যাত্রা শুভক্ষণেই হয়েছে।

## ॥ তিন ॥

ছেলেবেলায় ভূষণ নামে একটা বিদেশী ছেলে আমাদের খেলার সাথী ছিল। খুব বলবান, কিন্তু হাঁ ছিল তার বড়। এই কারণে তাকে একদিন হিড়িম্ব রাক্ষস বলে কটূক্তি করে হেসেছিলুম। মনে মনে তার রাগ ছিল। কিছুদিন পরে একদিন স্নানের সময় সে প্রতিশোধ নিলে। ডুবসাঁতার কেটে খেলতে খেলতে একবার হঠাৎ ভূষণের গায়ের কাছে গিয়ে হুপ করে ভেসে উঠতেই সে ফস করে আমার ডানা দু'খানা ধরে ফেললে এবং রাক্ষসের মত হাঁ দানবীয় উল্লাসে আরও বিস্তৃত করে আমাকে নাচাতে সুরু করে দিলে।—একবার ডুবিয়ে ধরে, পরক্ষণেই টেনে তুলে আবার তখনি ডুবিয়ে ধরে। আমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য তার ছিল না; মিনিটখানেক ডুবিয়ে ধরে রাখলেই সে উদ্দেশ্য অক্লেশে সিদ্ধ হত। জলের মধ্যে মুহুর্মুহু ওঠা-নামা করায় হাঁপিয়ে নাকেমুখে জল ঢুকে দম বন্ধ হয়ে সেদিন প্রাণ আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে পড়েছিল। আজ ডাঙগায়, ঘরে বসে, ঠিক সেদিনকার মতই প্রাণ আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে পড়ল, ননী এবং তার স্ত্রীর আদর

নাকেমুখে ঢুকে আমার দম বন্ধ করে দিতে লাগল। সে কী মিষ্ট আদর, কী মিষ্ট আপ্যায়ন, কী মিষ্ট সম্ভাষণ, কী মিষ্ট কথা, কী মিষ্ট ব্যবহার, আমার সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের কী তীক্ষ্ন লক্ষ্য; যেন আমি তাদের দেশের শিশু রাজপুত্র, প্রাসাদ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে তাদের কুটীরে খেলতে এসেছি, তারা তাই সম্ভ্রমমিশ্রিত অগাধ আদরের মধ্যে দোলা দিয়ে দিয়ে আমায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমারই সৌভাগ্যবশতঃ বহুপূর্ব হতেই এই নিয়ম চলে আসছে যে, যে নাচে সে-ও হাঁপায়। যে নাচায় সেও হাঁপায়। জাগতিক এই নিয়মের বশেই ননী এবং তার স্ত্রী হাঁপিয়ে উঠে আমাকে নাচাবার সেই অদৃশ্য রজ্জুটা ক্রমশঃ আলগা দিতে লাগলো।

ভাবলুম, বাঁচা গেল। অস্বাভাবিকতার ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না, এখন স্বাভাবিক মানুষের মত, নিজের খেয়ালমতই নড়েচড়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারব। বাড়াবাড়ি আদর যে পরাধীনতার শৃঙ্খল, এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করলুম।

কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার যে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সত্য তা দড়ির টান কম পড়তেই বুঝতে পারি নি; তবে বুঝতে বেশী বিলম্বও হল না। দিন পাঁচ সাত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগস্থলে কাটিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

ননীদের বাড়ীটা বনিয়াদি, কাজেই সেটা গলির গোলকধাঁধার মধ্যিখানে, স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকারময় এবং দুর্গন্ধযুক্ত। উপরতলায় জল এবং বাষ্প পেঁছিতে পারে না বলে ওরি মধ্যে একটু গন্ধহীন আর শুক্‌নো। জল নীচের তলাতেই আবদ্ধ। দুর্গন্ধটা আর একটু অগ্রসর হয়ে সিঁড়ির পাঁচ সাত ধাপ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। অন্ধকার এই বাড়ীটার মতই আদি জিনিষ, কাজেই সে এই বাড়ীর সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করে।

বোধ হয় আমারই খাতিরে প্রথম প্রথম উপরেই খাওয়া হত। দিন দশেক পরেই নেমে এলুম।

চা উপরে আসত, তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলুম, নামছি বেশ।

দুদিন নীচে নেমেই খানিকটা ফিনাইল ঢেলে গন্ধটাকে নিস্তেজ করে দিলুম; কিন্তু তৃতীয় দিনে বোতলটা খুঁজে পাওয়া গেল না; দেখে মনে দার্শনিক ভাবের উদয় হল। তাহা এই,—পণ্ডিতগণ বলেছেন সময় সন্তাপহারক; তাঁরা বলতে ভুলেছেন যে, অভ্যাস দুর্গন্ধাপহারক। পাপী আমি, নরককুণ্ডে বাস আমায় নিশ্চয়ই করতে হবে এবং সেটা গোলাপজল তৈরী নহে। সুতরাং অভ্যাসের দুর্গন্ধাপহারিকা শক্তি যদি এখন থেকে আখেরের জন্যে আমায় প্রস্তুত করে তোলে তবে তাতে আপশোষের কোন কারণই থাকে না, বরং ভালই হয়। '

প্রতিক্রিয়া লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

ননী এবং আমি একসঙ্গেই নীচে নেমে চা খেয়ে আসতুম। দ্বাদশ দিনের দিন ননীর ছেলেটা নীচে থেকে ডেকে বললে,—বাবা চা হয়েছে, খাবে এস। হরেনকাকা পরে খাবে।

ননী নেমে গেল। কিছু পরেই আমারও ডাক পড়ল। গিয়ে দেখলুম ননী চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছে; ঘরটি ঘিয়েভাজা সুজির গন্ধে আমোদিত।

আমি আসবার আগেই ননী হালুয়া খেয়ে সেরেছে মাত্র, গন্ধের দ্বারা তার নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না। পাশের বাড়ীতে—

কিন্তু দেখলুম, ( অবশ্য দৈবাৎ )—চায়ের পেয়ালা এবং রেকাবী ছাড়া তৃতীয় একটি পাত্র ননীর সম্মুখে স্থাপিত এবং সেই পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট মোহনভোগের কণা।

এইপ্রকার যে বাদ পড়ে, বাদ পড়ার মধ্যে তার একটা সহজ লজ্জার স্বরূপহীন হেতু নিহিত থাকে। আমি লজ্জা পেলুম।

হঠাৎ একদিন আমায় চা খেতে ডাকলে না।

চিৎ হয়ে শুয়ে ছাতের বনিয়াদি ঝুল দেখছিলুম, ননী কতক্ষণ পরে মুখ মুছতে মুছতে এসে মিষ্টকণ্ঠে বললে,—চা খেয়ে এস, ভাই। তোমার চা নিয়ে সেই তখন থেকে বসে আছে।

ঝুল দেখা বন্ধ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লুম, কারণ ডবল লজ্জা আক্রমণ করল। বন্ধুপত্নী আমার চা আগলে সেই তখন থেকে বসে আছে; পেয়ালায় চা ঢালা রয়েছে, এবং সেই তখন থেকে ঢালা থাকার দরুণ চা সুশীতল স্নিগ্ধ হয়ে আছে। ঢক ঢক করে একচুমুকে অবিকৃতমুখে সমস্তটা চা নিঃশেষে পান করে একটা বিড়ি ধরিয়ে গরম বোধ করতে লাগলুম। সুশীতল চা তিনদিন খেতেই সর্দি লেগে গেল।

প্রতিক্রিয়ার এমন দ্রুত অবতরণ, অথচ তার মধ্যে কেমন একটা উপভোগ্য সরল শৃঙ্খলা! দেখে খুসী হলুম।

ভাতের সঙ্গে তরকারীর সংখ্যা এবং পরিমাণ যথোপযুক্তই পেতুম।

অতীতের একটা দিনে ননী ব্যথিতস্বরে অনুযোগ করে বলেছিল,—তুমি কি খেতে ভালবাসো কিছুই ত' বল না, ভাই। অত যদি লজ্জা করে চল তবে ভারি দুঃখিত হব। তখন ক্রিয়ার উত্থানের দিন, সেই দড়ি আমায় সমানভাবে নাচিয়ে চলেছে। ননীর ব্যথিত স্বর আমাকে আঘাত করল; গদগদপ্রাণে চার পাঁচটি প্রিয় তরকারীর নাম করে ফেললুম। ননী স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে,—মোচার ঘণ্ট, ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে শাক, কুচো চিংড়ির বড়া, লাউয়ের তরকারী, কইমাছসহযোগে, আর একটা কি বললে?—

আমি বললুম,—সুক্তো।

ননী বললে,—হ্যাঁ, সুক্তো। এই পঞ্চ তরকারী আমাদের বন্ধুটি ভালবাসেন। মনে থাকে যেন।

তার স্ত্রী তখন এত জোরে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল যে মনে থাকবে, যে আমি ভেবেছিলুম, হাঁসের ডিমের ডালনার কথাটা না বলা ভাল হয় নি।

কিন্তু নিম্নগা প্রতিক্রিয়ার স্রোতের মুখে পড়ে সব ভেসে গেল, ভারি জিনিষ মনের উপর দাঁড়াতে পারল না।

চায়ের ঐ ঘটনার পরদিন আমার বিশেষ প্রিয়, তরকারী-পঞ্চের মধ্যে মোচার ঘণ্টর স্বাদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে করতে আহারে বসে দেখলুম নেবুর এক টুকরো আমার পাতে দিতে ভুল হয়ে গেছে। নেবু জিনিষটা কলকাতায় বেশী দামে বিকায় এবং আমার মুখরোচক, কিন্তু একখণ্ড চেয়ে নেওয়া হল না। চেয়ে নেওয়া আমার আসে না; দ্বিতীয়তঃ ভুলটা দেখিয়ে দিয়ে ননীর স্ত্রীকে লজ্জা দেওয়া শোভন হবে বলে মনে হল না। ভুলটা নিত্যই হতে হতে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

পরদিন প্রতিক্রিয়া একটা তরকারীকে স্পর্শ করল।

## ॥ চার ॥

ভাত আমি বেশী খাই না এবং পর্বতপ্রমাণ ভাত একেবারে ঢিবি বেঁধে থালায় দিলে আমার আহারে রুচি কমে যায়, আদরের দড়ি গলায় পরে একদা যখন নাচছিলুম, তখন একসময় লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ কথা বলে ফেলেছিলুম। তখন কথাটার সুফল অনুমান করতে পারি নি।

ননীর স্ত্রী আমার রুচির দিকে বেশ লক্ষ্য রেখে সুবিবেচকের মত বেশ কম করেই দিত ; কিন্তু এখন কাজের ভিড়ের দরুণ আমার আর ভাত লাগবে কিনা তা যাচাই করতে তার ভুল হতে লাগলো, অথবা অবসরের অভাব ঘটতে লাগলো। আজকাল ননী আমার আগেই খায়। ননীর সংগে ননীর স্ত্রী অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত উপরে উঠে যায় ; আমার আঁচাবার শব্দ পেলে তবে নামে। উপরেও কি এত কাজ ! কখন যে সে কি করে—কি করবে তার কিছুই ঠিক নেই।

যাহা হউক, আমার লাজুক মুখচোরা স্বভাবটা একটা পরিবারের উপকারে লেগে গেল দেখে আমি তৃপ্ত হলুম।

প্রিয়াকে লিখলুম,—এখানে আহারাদির কোনপ্রকার কষ্ট হইতেছে না। তজ্জন্য চিন্তার কারণ নাই।

শীত বাড়ল। এই দুরন্ত শীতে দুবেলা সমানে রান্না ননীর স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। শীতের দিনে ডাল-তরকারী পচে ওঠবার আশংকা নেই, কাজেই সন্ধ্যার পর চাট্টি চাল কোনমতে কায়ক্লেশে সিদ্ধ করে নিলেই ও-বেলাকার ডাল-তরকারী দিয়ে বেশ চলে যায়। দুদিন চললেও, তৃতীয় দিনে আর চলল না। কিন্তু আমি বোধ হয় প্রহ্লাদশ্রেণীর জীব, কার ধ্যানে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভুলে আছি কে জানে ! কষ্ট অনুভব করবার সমর্থ্যই আমার লোপ পেয়ে গেছে।

আমার জন্যে ও-বেলাকার ভাতই থাকতো। শীতের দিনে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে ভাত দিব্য বরফের মত শীতল হয়ে থাকতো, আমি সোনার মত মুখ করে তাহা আহার করতুম ; ননীর স্ত্রী ননীর পাতের ওপর ধুমায়মান ফুলকো লুচি কাঠিতে বিঁধে এনে ছেড়ে ছেড়ে দিত। দুই গ্রাস ভাত মুখে তুলতেই আমার আঙ্গুলের ডগাগুলো কুণ্ঠিত হয়ে কন কন করতো, সর্বাংগ ভিতরকার হিমে সির সির করতো, আর আমি অধোমুখে হেসে হেসে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ননীর সংগে কলরবসহকারে আলোচনা করতুম।

আমি আশ্চর্য হলুম এই ভেবে যে আমি এত অল্পদিনের এই বনিয়াদি পরিবারের মনের মত মানুষ হয়ে গেলুম কি করে ! আমার কোন কাজই এখন আর তারা পছন্দ করে না। আগে এক প্লাস জলের জন্যে আমি নীচে নামলে ননী রাগ করত। কেন ?—চাইলে কি ওরা এক প্লাস জল ওপরে দিয়ে যেতে পারে না ? স্নান করে একদিন কাপড়খানা নিজেই কেচেছিলুম। ননী তাই দেখে আমাকে দুটাকা জরিমানা করে টাকা আদায় করে তবে ছেড়েছিল এবং এমন কাজ আর করব না বলে শপথ করলে তবে টাকা ফেরত দিয়েছিল।

এখন আমি চা খেয়ে কাপ নিজেই ধুয়ে রাখি, কাপড় নিজেই কাচি, বিছানা নিজেই ঝাড়ি—পাতি, যে ঘরটাতে থাকি তা নিজেই ঝাঁট দি, ইত্যাদি। কিন্তু ননীর সংগে

মিত্রতা আমার এমনই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে আমার কোন কাজে বাধা দিয়ে আর আমায় সে ক্ষুণ্ণ করতে চায় না।

প্রিয়াকে লিখলুম,—আমি সংসারে উপযুক্ত হয়ে উঠেছি। এখন সংসার পাতিতে যা বিলম্ব!

## ॥ পাঁচ ॥

পোনামাছের ল্যাজের মত কাঁটার বালাই শিমুলগাছেও নেই। চুলের মত, সূচের মত, সোজা, বঁ্যাকা নানা আকারের কাঁটায় ল্যাজ একেবারে ঠাসা। ভেজে দিলে কাঁটা চিবিয়ে ভেঙে-চুরে একরকম সহনীয় করে নেওয়া যায়, কিন্তু ঝোলে ঐ ল্যাজের কাঁটা একলব্যের পরে কুকুরের মুখের মত একেবারে নির্বাক করে দেয়। 'দেয়' মানে যারা আমার মত প্রহ্লাদ-মার্কা মানুষ নয়, তাদের দেয়। আমার মুখগহ্বর এবং জিহ্বা নৃসিংহদেব রক্ষা করেন কিনা সে সন্ধান আমি জানতুম না এবং পরীক্ষা করবার প্রয়োজনও ইতিপূর্বে হয় নি; তবু পরীক্ষায় আমি সসম্মানে পাশ হয়েছি। এই বনিয়াদি বাড়ীতে যত ল্যাজ এসেছে তার সবগুলির ভোক্তাই আমি, কিন্তু তার কাঁটা নৃসিংহদেবের কৃপায় ভোজবাজীর জ্বলন্ত অংগারের মত আমার মুখের কিছুই করতে পারে নি। মাছের মাথার কথা স্বতন্ত্র।

অখাদ্য বিবেচনায় মাথার প্রতি লোভ আমার কোনদিনই নেই। ইলিশমাছের পেটি? —রাম কহ! রুই মাছের পেটি?—অসুখের ডিপো, পেটে গেলে রক্ষা থাকে না। ঐ সব নিদারুণ অখাদ্যের প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণার বিষয় আমি কখন সশব্দ ভাষায় প্রকাশ করি নি; কিন্তু দেখলুম প্রকাশ হয়ে পড়েছে!

শীতের রাত্রে গরম লুচি এবং মাছের মাথার কালিয়া খেয়ে ননী সস্ত্রীক শুকিয়ে উঠতে লাগল। যা খেয়ে আমার একটু ভুঁড়ি দেখা দিল তা বলেছি।

প্রিয়াকে ভুঁড়ির খবরটাও দিলুম।

## ॥ ছয় ॥

এইবার, উপসংহারের মুখে এসে যা বলব তা শুনে আপনারা আমায় অকৃতজ্ঞ, ঘৃণ্য, দুষ্টবুদ্ধি, অভদ্র, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি যার যা মুখে আসবে তাই বলে গাল দেবেন ত? আমি বারণ করছি, দেবেন না। আপনাদের প্রত্যক্ষ সম্মুখে বসে কেউ কখনো ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচি মাছের মাথার কালিয়া দিয়ে খেয়েছে কি? আপনারা শীতের দিনের চোদ্দ ঘণ্টার কড়কড়ে ভাত চোদ্দ ঘন্টার বাসি তরকারিসহযোগে গলাধঃকরণ করতে করতে সম্মুখবর্তী সেই লোকটার কুণ্ঠাহীন লুচিভক্ষণ দেখেছেন কি? শীতের প্রাতে যখন এক পেয়ালা ধূমোদ্গারী উষ্ণ চায়ের তৃষ্ণায় সমস্ত দেহমন হা হা করতে থাকে তখন সুশীতল চা পান করেছেন কি? কাজের ভিড়ের দরুণ আপনাকে অর্ধেক ভাত দিয়ে কেউ রান্নাঘর ছেড়ে অন্তর্ধান হয়েছে কি? এই সব ঘটনা জীবনে যদি ঘটে থাকে তবে আপনারা আমায় মার্জনা করবেনই। যদি না ঘটে থাকে তবে আমার কু-কথা বলবার

আগে, বেশী নয়, এক এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা শীতের প্রাতে খেয়ে দেখবেন। দেখবেন মনে তখন দুর্দান্ত কৌতুকেচ্ছার উদয় হয় কিনা।

## ॥ আট ॥

মৎস্যের মস্তকভক্ষণ দেখতে দেখতে একদিন কৌতুকপ্রিয়তা হঠাৎ কেমন অসহ্য হয়ে উঠল। ভাবলুম, মাথাখাওয়া বন্ধ করতে হচ্ছে।

আপনাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ববিদ যদি কেউ থাকেন তবে তিনি হয়ত ভুরু তুলে টেনে টেনে বললেন,—এ-টা বাপু, তোমার কৌতুকপ্রিয়তার কথা নয়, রাগের কথা। হাসছ বটে কিন্তু তোমার অন্তর জ্বলছে।

উত্তরে আমি বলব এখন জ্বলছে না, তবে জ্বলেছিল একদিন। প্রিয়া আমাকে যে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন তারই সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেলা একটার সময় ক্ষুধায় অন্ধকার দেখতে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকে যেদিন দেখেছিলুম আসনের সামনে থালার উপর ভয়ানক কালো কি একটা জিনিষ স্তূপীকৃত করা আছে, আর আমার গায়ের হাওয়া লেগে তার ওপর থেকে উড়ে গিয়েছিল লাখখানেক মাছি, আমার অন্তর জ্বলেছিল সেইদিন—আহারপণ্ডকারী মাছির বিরুদ্ধে এখন জ্বলছে না। যাক।

অনেক মাথা ঘামিয়েও মাথাখাওয়া বন্ধ করবার একটা পন্থা মাথায় এলো না। কিন্তু হাল ছাড়লুম না। মাছের মাথা খেও না বলে স্পষ্টবাক্যে নিষেধ করতে যাওয়া পাগলামী। মাছের মা পুত্র-কন্যার কল্যাণকামনায় এ নিষেধ করতে পারে, তাতে অসংগতি-দোষ ঘটে না।

আমি মাছের কে ?

আপ্রাণ চেষ্টায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন একটা কৌশল মনে এসে গেল—ঠিক ভোরবেলায়। তারিখটা মনে আছে ২রা জানুয়ারী। তারিখটা মনে থাকবার একমাত্র কারণ এই যে লেপের মধ্যে মুখ নিয়ে তখন খুব খানিকটা হেসেছিলুম। কেউ কেউ বলতে পারেন, ঐ তারিখটা মনে রাখবার মধ্যেই, বাপু, তোমার প্রতিহিংসার শিখা লক লক করছে। কিন্তু আমি বলবো, দোষান্বেষীর এ আবিষ্কার সাপের খোলসের মত আসল জিনিষ নয়।

কালবিলম্ব না করে লেপের মধ্যে কাগজ, পেন্সিল নিয়ে একটা মুসাবিদা করে ফেললুম, এবং সেই সকালবেলাই ছাপাখানায় গিয়ে পাঁচ শ' 'কপি'র অর্ডার দিয়ে এলুম।

কাগজ লাল কালিতে ছাপা হল, কারণ লাল রং বিপদের নিশানা। একটা খোট্টা ছোকরাকে আট আনা বখশিস দিয়ে বেলা সাড়ে আটটার সময় ছাতুবাবুর বাজারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলুম। ননীর বাজারে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে সে কাগজ বিলি করতে লাগল।

ননী বাজার নিয়ে এল। মাছের ন্যাকড়ার গিঁট খুলতেই রুই মাছের এত বড় একটা মাথা গড়িয়ে পড়ল। সেদিন মাথাটা পড়ল আমার পাতে !

আহারান্তে হুঁকো টানতে টানতে ননী বললে,—আমার সার্টের পকেটে লাল কালিতে ছাপা একখানা কাগজ আছে, বের কর ত'।

করলুম।

ননী বললে,—পড়। বড় আশ্চর্য কথা লেখা আছে। দিন দিন বিজ্ঞানের যেরকম উন্নতি হচ্ছে তাহাতে খাওয়াদাওয়া সব ছাড়তে হবে দেখছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কোথায় পেলে এ কাগজ ?

—একটা খোট্টা ছোঁড়া বিলি করছিল, একখানা দিলে। যখন বাজার নিয়ে আসছি তখন ব্যাটা দিলে।

ঐ 'নিয়ে'র ওপর বিরক্তিপূর্ণ একটা ঝোঁক দেখায় পরিষ্কার বোঝা গেল, বাজার নিয়ে আসবার সময় না দিয়ে যদি বাজারে ঢোকবার সময় কাগজখানা সে দিত তবে অত বড় মাথাটা আজেবাজে খরচ হত না।

গলা চড়িয়ে পড়তে লাগল—

"বিজ্ঞাপন।"

গড়দ্বারা স্বাস্থ্যোদ্ধার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

আমাদের স্বাস্থ্যহানির যতগুলি স্থূল এবং পরিহার্য কারণ লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে মৎস্যই প্রধান। মৎস্য অশেষ অনিষ্টের আকর। মাংস অপেক্ষা মৎস্য দুষ্পাচ্য। আমরা মাংস খাইলে তৎসঙ্গে দুধ খাই না, কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে মৎস্য সম্বন্ধেও এই সতর্কতা অবলম্বনীয়। মৎস্য খাইবার পর দুগ্ধ পান করিলে উভয়ের সংযুক্ত ক্রিয়া বিষতুল্য হয়।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক জিনিষ মৎস্যের মাথা। প্রসিদ্ধ জার্মাণ ডাক্তার ভণ ক্রুটেণবর্গ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মৎস্যের মাথার প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় ৮০ হাজার জীবাণু বাস করে। ঐ জীবাণুগুলি মৎস্যভোজীর বিবিধ রোগের মূল কারণ। ২৪ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জীবাণুগুলি মরিয়া যায় বটে কিন্তু সবলগুলি জীবিতই থাকে। মৎস্যের মাথার ঘি খাইলে দৃষ্টিশক্তি সবল হয় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত ডাঃ ভণ ক্রুটেনবর্গ উল্টাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ পদার্থে দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, স্নায়বিক দৌর্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং পাকস্থলীতে একপ্রকার রসসঞ্চার হয় যাহার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া গুরুতরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

( স্বাক্ষর ) টি, পি, গাঙ্গুলি, এম-এস্-সি, এম-ডি,

পরিচালক, গড়দ্বার স্বাস্থ্যোদ্ধার সমিতি।

আমি পড়া শেষ করে তাচ্ছিল্যভরে বললুম,—বাজে কথা !

ননী মাথা নেড়ে বললে,—উঁ হুঁঃ। জার্মাণরা বাজে কথা বলে না।

আমি বললুম,—তা-ও বটে।

ননীর পত্রে জানলুম, এখনও সে লুচি খায়, তবে মাছের মাথা বাড়ীতে আনা ত্যাগ করেছে।

## ॥ আট ॥

### দৈবধন

চারিটি লোকের সভা—কুমুদনাথ, তাঁহার স্ত্রী নির্মলা, উভয়ের পুত্র রঘুনাথ ; এই তিনজন আমাদের মতই, চতুর্থ ব্যক্তিটিই অন্যরকমের। তিনি গৃহস্থ নন, সন্ন্যাসী। সংসারে যখন ছিলেন তখন তাঁহার নাম ছিল, রামপ্রিয় গোস্বামী ; এখনকার পারমার্থিক

নাম তাঁর শ্রীমৎ বুধানন্দ স্বামী। কুমুদনাথ আর রামপ্রিয় বাল্যে ও যৌবনে সহপাঠী ছিলেন, উভয়ে বড়ই প্রণয় ছিল। এখন তাঁহাদের জীবনের ধারা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও বিভিন্ন হইলেও বন্ধুতা অটলই আছে। তাই বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদিন পরে মুণ্ডিতশির গেরুয়াপরিহিত বুধানন্দ—আজ প্রিয়বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দেশদেশান্তরের আশ্চর্য অনেক গল্প শুনিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—এমন কিছু কি তুমি পাওনি যা এ সবের চাইতেও আশ্চর্য ?

বুধানন্দ বলিলেন,—পেয়েছি।

—একখানা চিঠিতে একবার একটা বাঁদরের থাবার কথা কি লিখেছিলে যেন ?

—তারি কথাই বলছি। বলিয়া বুধানন্দ তাঁহার বিপুলবিস্তার আলখেল্লার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া সনখ শুষ্ক একটা বাঁদরের থাবা সত্যসত্যই বাহির করিয়া আনিলেন এবং সেটাকে সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিরুদ্যম কাতরতার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন,—এই সেই জিনিষ।

নির্মলা আগ্রহভরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বুধানন্দ সেটাকে চোখের সামনে রাখিতেই বস্তুটির কদর্যতায় তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। রঘুনাথ পরীক্ষকের মত সোৎসুকে সেটাকে হাতে তুলিয়া লইল। কুমুদনাথ প্রশ্ন করিলেন,—তারপর এই অপূর্ব সামগ্রীর অলৌকিকত্ব কি ?

বুধানন্দ বলিলেন,—বলতে পার ভোজবিদ্যা, কিন্তু তা সত্য নয়। এক মুসলমান উদাসীন ফকির এই থাবাটি মন্ত্রপূত করে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রমাণ হয়ে গেছে যে অদৃষ্টই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে ; সে-ই দেয়, সে-ই নেয়। তার কাজে বাধা দিলে মানুষ হাতে হাতে তার দুষ্কর্মের শাস্তি পায় ; অদৃষ্টের রোষ কেমন ভীষণ, সে যে খেলার জিনিষ নয়, এই থাবা তা দেখিয়েছে। ফকিরের মন্ত্রগুণে এই থাবা তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তির তিনটি বিভিন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করবে। ইহার ক্রিয়া অব্যর্থ।

বুধানন্দ থামিলেন, এবং আর তিনজন হাসিলেন। কিন্তু বুধানন্দের কণ্ঠস্বরে এমন সহজ একটা গুরুগাম্ভীর্যের বেগ ছিল যে তাঁহাদের অপ্রত্যয়ের হাল্কা হাসি তাঁহাদের নিজেরই কানে শ্রুতিকঠোর ঠেকিল।

রঘুনাথ বলিল,—আপনি কেন তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করে নেন না ?

শুনিয়া বুধানন্দ এমনভাবে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিলেন যেমন করিয়া অভিজ্ঞ বৃদ্ধ যৌবনের ধৃষ্টতাকে ক্লেশের সহিত মার্জনা করে। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, বলিলেন,—নিয়েছি।

—সত্যই আপনার তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল ?

—হয়েছিল।

—আর কারো হয়েছে কি ?

—প্রথম যে চেয়েছিল সে অভীষ্ট পেয়েছিল। তার দুটি আকাঙ্ক্ষা কি ছিল জানিনে, তৃতীয়টি ছিল মৃত্যু। দ্বিতীয় প্রার্থী আমি, পেয়েছি। প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরই এই কুহক আমি পাই। বলিয়া বুধানন্দ কি যেন আবেগ দমন করিতেছেন, এমনিভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সভা নিঃশব্দ হইয়া তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং চট করিয়াই তাঁহার

স্বরের অহেতুক ত্রাস এবং দুঃখের সংক্রমণ যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। তাঁহাদের মনে হইল, ঐ মুদ্রিত চক্ষু দুটির পাতাদুটি যেন বিরাট একটা অন্ধকারের সম্মুখে যবনিকার মত পড়িয়া আছে, পাতাদুটি উঠিয়া গেলেই বন্ধনমুক্ত অন্ধকার হু হু শব্দে ছুটিয়া বাহির হইবে। কিন্তু বুধানন্দ চোখ খুলিতেই তাঁহারা দেখিলেন, ম্লানভাবটুকু ইতিমধ্যেই কাটিয়া তাঁর চোখ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে।

একটু হাসিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—তোমার তিনটি ইচ্ছাই যখন পূর্ণ হয়েছে তখন প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তবে কেন সঙ্গে রেখেছ এটাকে ?

—জানিনে কেন। বোধ হয় খেয়াল।

—যদি আরও তিনটি ইচ্ছে পূর্ণ করবার ক্ষমতা এর থাকত তবে কি করতে ?

—জানিনে।

কুমুদনাথ থাবাটা হাতে করিয়া তার আঙ্গুলগুলি টানিতে টানিতে বলিলেন,—তোমার যদি প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে দেও এটা।

—না, দেব না।

—কেন দেবে না ?

বুধানন্দের চোখের উপর আবার সেই বিষণ্ণতার ছায়াপাত হইল। বলিলেন,—মানুষের অভিসম্পাতকে আমি বড় ডরাই। মর্মান্তিক আহত হয়ে মানুষের অন্তঃস্থল ভেদ করে যে বাক্য বেরিয়ে আসে তা অমোঘ, তা কখন ব্যর্থ হয় না। মানুষের ঈশ্বরত্ব ঐটুকু।

কুমুদনাথ কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—কি কথায় কি কথা বলছো হে ?

—অসংলগ্ন মনে হচ্ছে ? আমার অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করনি, এটাও না হয় না করলে। এ জিনিষ আমি তোমার হাতে দেব না। দুঃখ ত' সৌখীন জিনিষ নয়। বলিয়া বুধানন্দ হাত বাড়াইয়া দিলেন।

কুমুদনাথ বলিলেন,—না, আমার কাছে থাক। কেমন করে চাইতে হয় ?

—হাতের পাতার ওপর রেখে হাত তুলে সশব্দে।

—শুনতে ঠিক আরব্য উপন্যাসের মত, বলিয়া নির্মলা হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন,—তিনটীর মধ্যে আমার ফরমাস, আমার জন্য আর দুখানা হাত।

সঙ্গে সঙ্গে কুমুদনাথ থাবা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বুধানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণশক্তিতে নীচের দিকে টানিতে লাগিলেন। অন্ধ পথিক না জানিয়া গভীর গহ্বরের মুখের প্রান্তে পা তুলিলে দর্শক যেমন প্রাণান্তকর অস্থিরতায় হায় হায় করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, বুধানন্দের এই নিষেধের ভিতর তেমনি একটা সকরুণ ব্যাকুলতা দেখা গেল। কুমুদনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াই তিনি বলিলেন,—আমার বারণ না শুনে যদি চাইবেই তবে এমন কিছু চাও যা সম্ভব। অবিশ্বাস করো না, আমি আবার বলছি।

কুমুদনাথ বসিলেন।

বুধানন্দ বলিতে লাগিলেন,—চাইবে চাও, কিন্তু কৃতকর্মের ফলের দায়ী তখন আমায় করো না। আর একটা কথা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই, কিন্তু তা এমন অনাড়ম্বর স্বাভাবিক সহজভাবে যে মনে হবে চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার হেতুগত কার্যকারণ-সম্পর্ক নেই।

কুমুদনাথ মনে মনে বলিলেন,—ঐখানটাতেই তোমার ফাঁক। প্রকাশ্যে বলিলেন,—কথাটা আমাদের মনে থাকবে।

বুধানন্দ চলিয়া গেলে কুমুদনাথ হাসিয়া বলিলেন,—বুড় সন্ন্যাসী হলে কি হয়, প্রকৃতি ঠিক আগের মতই আছে দেখছি। ছেলেবেলাতেই যাদুবিদ্যার বই থেকে যত সব মন্ত্রতন্ত্র মুখস্থ করে এসে আমাদের আকাশে অদৃশ্য করে দিতে চাইত; ভস্ম আর জটা দেখলেই তার পেছনে ফেউ লেগে যেত; ঝাড়ফুক আরও কত যে কি করতো মনেও নেই। আজগুবি হিসেবে সেইরকমই আছে দেখছি।

নির্মলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কি মনে হয়? এটা কি আজগুবি?

—নয় ত' কি সত্যি?

—শুধু চাওয়ার অপেক্ষা, মুখ ফুটে চাইলেই কুবেরের ভাণ্ডার একটা সাম্রাজ্য আর স্বর্গসুখ ছাপ্পর ফুঁড়ে ঝুপ করে সামনে পড়বে। মন্দ কি?

রঘুনাথ বলিল—উনি ত' মায়ামুক্ত জীব। সশরীরে বৈকুণ্ঠে গেলেও ত' পারেন।

নির্মলা অন্যমনস্ক ছিলেন। বলিলেন,—কে?

—ঐ বুধানন্দ। বলিয়া রঘুনাথ পিতার দিকে চাহিল।

কুমুদনাথ বলিলেন,—আমি কি চাই তাই ভাবছি। মানুষে যা চায় সবই ত' আমার আছে। বলিয়া অপার সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত স্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। নির্মলা সর্বান্তঃকরণ দিয়া স্বামীর সৌভাগ্যের সন্তোষ আশীর্বাদের মত গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ চক্ষু নত করিয়া লজ্জা লুকাইল।

—নির্মলা বলিলেন, পাঁচ হাজার টাকা চাও, নমুনো। আরও দুটো বর হাতে রইলো। যদি পাওয়া যায় তবে ভেবেচিন্তে বড় বড় দেখে চাওয়া যাবে।

—বেশ, তাই হোক। বলিয়া কুমুদনাথ গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

নির্মলা ও রঘুনাথ কৌতুকহাস্য লইয়া চাহিয়া রহিলেন; কুমুদনাথ থাবাটা করতলের উপর সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া লইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত স্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করিলেন,—হে কপিহস্ত, আমি তোমার কাছে পাঁচ সহস্র মুদ্রা চাই—বলিতে বলিতেই তিনি ভীতস্বরে অস্ফুট একটা নিনাদ করিয়া শশব্যস্তে হাত ছাড়িয়া ফেলিলেন, থাবাটা ছিটকাইয়া দূরে যাইয়া পড়িল; কুমুদনাথ একদৃষ্টে থাবাটার দিকে চাহিয়া কেমন যেন করিতে লাগিলেন।

—কি হল? বলিয়া নির্মলা ও রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। নোংরা স্পর্শে যেন গা ঘিন ঘিন করিতেছে এমনিভাবে মুখ বিকৃত করিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—ওটা আমার হাতের উপর নড়ে উঠেছে ঠিক কোমরভাঙ্গা সাপের মত মোচড় খেয়ে। বলিয়া দারুণ বিরাগভরে তিনি অন্যদিকে চাহিলেন।

নির্মলা বলিলেন,—তোমার ভ্রম।

কুমুদনাথ জোরের সহিত বলিলেন,—না, না, ভ্রম নয়, খুব স্পষ্ট। যাই হোক আমি বড় চমক খেয়েছি।

নির্মলা বলিলেন,—বসো।

কুমুদনাথ বসিলেন।

রঘুনাথ থাবাটা কুড়াইয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিত; কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—কই, টাকার তোড়া পড়লো না ত' আকাশ থেকে! কতকাল ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকবো?

কুমুদনাথ এই কথাটায় হাসিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু হাসি তেমন ফুটিল না।

ইহার পর কেমন একটা ছমছমে অস্বস্তি লইয়া তিনজনেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন; তিনজনেরই মনের মধ্যে বুধানন্দের উচ্চারিত কথাগুলির এবং তাহা যে দুর্জ্ঞেয় অনিবার্য অকুশলের দিকে নানাপ্রকারে বার বার নির্দেশ করিয়াছিল তাহারই একটা দুরু দুরু আবর্তন চলিতে লাগিল। বাহিরে ঝড়ো হাওয়া তীব্রবেগে বহিতেছিল; কুমুদনাথ তাহার ঝটাপটির শব্দে ভয় ভয় বোধ করিতে লাগিলেন। একবার পাশের ঘরের জানালা একটা দড়াম করিয়া পড়িল; সেই শব্দে কুমুদনাথ—"ও কি?" বলিয়া স্পষ্টই চমকিয়া উঠিয়া নির্মলার দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই অপ্রতিভ হইলেন।

নীরবতা ক্রমশঃ ভারি হইয়া উঠিয়া যেন পীড়া দিতে লাগিল।

রঘুনাথ মুখ তুলিয়া বলিল,—শুতে গিয়ে না দেখি, বিছানার ওপর টাকার থলে রেখে দিয়ে কে যেন সিন্ধুকের ওদিক থেকে মাথা তুলে তুলে উঁকি মারছে। মা সাবধান।

এবারেও রঘুনাথের হাসিটা থমথমে নীরবতার গুমোটের মধ্যে পড়িয়া এক মুহূর্তও বাঁচিল না।

কুমুদনাথ ও নির্মলা শুইতে গেলেন। রঘুনাথ বসিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তন্দ্রার ঘোরে যেন সে দেখিল, নির্বাপিতপ্রায় আগুনের স্বল্পবিস্তার আলোকমণ্ডলের মধ্যে পুনঃপুনঃ রকমফের মুখের ছায়া পড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া অন্তর্হিত হইতেছে; শেষ মুখখানা কপির, আর তাহা ভয়াবহ ভঙ্গী করিতেছে। চট করিয়াই তাহার তন্দ্রার ঘোর নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু নিষ্পলক হইয়া রহিল। যেন সেই আগুনের উপর জল ঢালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে টেবিলের উপরকার গ্লাসটার জন্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইতেই সেই থাবাটার উপরেই তাহার হাত পড়িল; শিহরিয়া হাত টানিয়া লইয়া সে কাপড়ে হাত মুছিয়া ফেলিল, এবং অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে শুইতে গেল।

## ॥ দুই ॥

পরদিন সোমবার।

ঝলমল প্রাতরৌদ্রে তিনজনেরই মন লঘু হইয়া গেল। রাত্রের সেই স্বল্পালোক, বুধানন্দের প্রত্যয়ের দৃঢ় গাম্ভীর্য ও প্রত্যয় করাইবার ক্রূর ভঙ্গী এবং এ-সবের সম্মিলিত প্রভাবে তাঁহাদের তিনজনেরই ইচ্ছাবিরুদ্ধ সাময়িক একটা অনিশ্চিত অভিভূতভাব—এখন তাদের কোনটাই ছিল না।

চায়ের টেবিলে বসিয়া কুমুদনাথ নিজেরই আতঙ্কের উল্লেখ করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন,—ভোজবাজিওয়ালারা বড় চতুর। কথার তাড়সে অপরের মনটাকে আগে অবশ করে দিয়ে নিজেরই হাতে নিয়ে যেন তাকে খেলায়। যে যত বড় বাকপটু সে তত বড় যাদুকর। বুধানন্দ স্বামী খেলিয়েছে মন্দ নয়, ব্যাকগ্রাউণ্ড সাজিয়েছিল ভাল। বলিয়া টেবিলের উপর হইতে সেই থাবাটা লইয়া খোলা গা-আলমারীর তাক বরাবর ছুড়িয়া দিলেন, সেটা থপ করিয়া সেখানে পড়িল।

রঘুনাথ বলিল,—আবহাওয়াও ছিল বুধানন্দের ইন্দ্রজালের অনুকূল। বাহিরে ঝড়,

ভিতরে অস্পষ্টতা, মানুষকে ভয় দেখাবার এরা খুব উপযোগী। তার উপরে বাঁদরের শুকনো হাত, তা আবার উদাসীন ফকীর কর্তৃক মন্ত্রপূত।

নির্মলা বলিলেন,—সব সন্ন্যাসীই তোমার বুধানন্দের মত নাকি? এদিনেও ও সব চলে দেখছি। আমি ভাবতাম, অসভ্যতার অন্ধকার পাড়াগাঁয়ের ঝোপেজঙ্গলেই বাস করে। আর পাঁচ হাজার টাকা আমাদের কি এমন ক্ষতি করতে পারে যে অমন ভীষণ মুখ করে ভয় দেখিয়ে গেল?

রঘুনাথ বলিল,—থলিটা আকাশ থেকে মাথার উপর পড়ে জখম করতে পারে যে অমন ভীষণ মুখ করে ভয় দেখিয়ে গেল?

রঘুনাথ বলিল,—থলিটা আকাশ থেকে মাথার উপর পড়ে জখম করতে পারে। পাঁচ হাজার টাকার ওজন ত' বড় কম নয়!

কুমুদনাথ বলিলেন,—তা বটে।

রঘুনাথ উঠিতে উঠিতে বলিল,—আমি আসার আগেই যেন টাকা ভেংগে বসে থেক না, মা। এখন আসি। বলিয়া রঘুনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

নির্মলা পুত্রের সংগে সংগে হলের চৌকাঠ পর্যন্ত আগাইয়া আসিলেন। চলিতে চলিতে রঘুনাথ হাস্যময়ী জননীর দিকে দুইবার ফিরিয়া চাহিয়া রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রঘুনাথ বিলাতের পাশ ইঞ্জিনিয়ার, সাত শো টাকা মাহিনার চাকরী করে।

সন্ন্যাসীরা শতকরা একশর্তটিই গঞ্জিকাসেবী হইলেও এবং নেশার ঝোঁকে যা তা বকিলেও নির্মলার মনের কোণে একটা অজ্ঞাত আশার সঞ্চরণ সুরু হইয়াছিল। দরজার উপর ডাকপিয়নের করাঘাতটায় ইতিপূর্বে তিনি কোনদিন ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, কিন্তু আজ সেই শব্দটায় তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া নিজেই চিঠি আনিতে গেলেন। চিঠিগুলি সব একে একে পড়িয়া, অতি গোপনে যাহা আশা করিতেছিলেন তাহা না পাইয়া তিনি স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন না, কিন্তু ক্ষোভের একটা দাগ যেন মনের উপর পড়িল। হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—রঘুনাথ এসে দেখো, টাকার কথাটাই আগে শুধোবে।

কুমুদনাথ মনের সংগে তর্ক করিতেছিলেন। বলিলেন,—তোমরা যা-ই বল, বাঁদরের থাবা কিন্তু আমার হাতের ওপর মোচড় খেয়ে নড়েই উঠেছিল।

—তোমার মনে হয়েছিল যেন নড়ে উঠলো।

—না, ভেবে দেখলাম, আমার ভুল হয় নি। নড়েই উঠেছিল। বলিয়া কুমুদনাথ নিজের দক্ষিণ করতলটা চোখের অদূরে তুলিয়া ধরিলেন এবং সেইসংগে নড়িয়া উঠার সুড়সুড়ি আর সশঙ্ক ঘৃণাটা যেন তিনি পুনর্বার অনুভব করিলেন। সেইস্থানে বাঁ হাতের আংগুল বুলাইয়া বলিলেন,—এখনও এ জায়গাটা কেমন করছে।

বিকাল তিনটার সময় কুমুদনাথ ও নির্মলা দেখিলেন, একটি ভদ্রালোক তাঁহাদের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রবেশ করিবে কিনা তাহাই বিবেচনা করিতেছে, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিতেছে না। তার থতমত ইতস্ততঃ ভাবটা কুমুদনাথ ভাল বুঝিতে পারিলেন না। বাজে লোক হইলে দুরভিসন্ধি আরোপ করা যাইত, কিন্তু পাত্রহিসাবে এক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। ফটকের উপর তিনবার হাত রাখিয়া সে তিনবারই হাত টানিয়া লইল, অথচ এক মুহূর্তও একস্থানে সে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

নির্মলা সেই পাঁচ হাজারের সঙ্গে আগন্তুকের আবির্ভাব জুড়িয়া লইয়া লক্ষ্য করিলেন, লোকটার হ্যাট, কোট প্রভৃতি মূল্যবান।

বহুবার অগ্রপশ্চাৎ করিয়া আগন্তুক নিজেকে সজোরে ঠেলিয়া লইয়া ফটক খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। কুমুদনাথ হলের দরজা হইতে তাহাকে—"আসুন"।—বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া বসাইলেন। কিন্তু তাহার আচরণ বড় তাজ্জব বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। আগন্তুক চৌকিতে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া রহিল; একবার কুমুদনাথ আর নির্মলার দিকে সে চোখ তুলিল বটে কিন্তু তাহা আড়ে আড়ে আর মুহূর্তের জন্য।

কুমুদনাথ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দরকার আপনার?

আগন্তুক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মাথা তুলিয়া নির্মলার দিকে চাহিয়া এমনই ম্রিয়মাণ হইয়া গেল যে কুমুদনাথ ও নির্মলা যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবেই কাটিয়া গেল। কে এ? কি বলিতে আসিয়াছে? কথা কেন বলে না? আচরণ ইহার একেবারেই স্পষ্ট নয়, তথাপি সেই অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই যেন একটা অনির্বচনীয় কম্পনের বেগ তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া নির্মলা কিছু বিরক্তির সহিতই বলিলেন,—কি কাজে এসেছেন আপনি বলুন।

কুমুদনাথের দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিল,—আমি মা এ্যাণ্ড মেগিন্স কোম্পানীর অফিস থেকে আসছি। তাঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

—কোনো খবর আছে? সেখানে আমাদের পুত্র রঘুনাথ কাজ করে।

—জানি। তাঁর খবর এনেছি।

নির্মলা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তার খবর? কি খবর?

আগন্তুক কথা কহিল না, চক্ষু নত করিয়া রহিল।

—বলুন, বলুন, কি হয়েছে তার?

নির্মলার ব্যাকুলতা দেখিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—আগেই ব্যস্ত হইও না। আপনি কি দুঃসংবাদ এনেছেন?

—রঘুনাথ, বলিয়া আগন্তুক আবার থামিল।

কুমুদনাথ বলিলেন,—আহত হয়েছে?

—হ্যাঁ, তবে যন্ত্রণা এখন নেই, যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

নির্মলা বলিলেন,—খুব বেশী আঘাত লাগেনি ত'? এখন সে কেমন আছে? কেমন করে সে—বলিতে বলিতেই যন্ত্রণামুক্তির নিহিত অর্থটা বজ্রাগ্নিশিখার মত দপ করিয়া বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁর মনে হইল যেন ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর অন্তরাত্মা সুখদুঃখে স্পন্দনশীল চেতনাচেতন বোধশক্তির শেষসীমা অতিক্রম করিয়া স্তম্ভিত অসাড় হইয়া গেল। জীবনের লক্ষণের মধ্যে শুধু তাঁর রক্তহীন নিম্নাধর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কুমুদনাথ নির্মলার ডানহাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছিল?

—কল যখন চলছিল তখন তার দাঁতের সঙ্গে তার গায়ের জামা আটকে গেছল। কুমুদনাথের রক্তবর্ণ শুষ্ক চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি নির্গত হইতেছিল। তাহারই দিকে চাহিয়া একটু থামিয়া আগন্তুক বলিতে লাগিল,—আমি কোম্পানীর ভৃত্য, তাঁদের সংবাদ-

বাহক মাত্র। কোম্পানী এই দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত দঃখিত কিন্তু দায়ী নন। আপনাদের পুত্রের কর্মদক্ষতায় কোম্পানী বড় প্রীত হয়েছিলেন। কিছু ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবও তাঁরা করে পাঠিয়েছেন।

কুমুদনাথ স্ত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর শুষ্ককণ্ঠ দিয়া বাহির হইল,—কত ?

—পাঁচ হাজার।

নির্মলার অসাড়তা শূলবিদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমুদনাথ দৃষ্টিহীন অন্ধের মত সম্মুখে শূন্যের মধ্যে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ভূপতিত হইলেন।

## ॥ তিন ॥

এত শীঘ্র সব শেষ হইয়া গেল যে আশার মোহ ঘুচিতে চাহিল না। মায়ের প্রাণ অনুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে—একটি মা আহ্বান কি বিশ্বের কোনো প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিবে না ? বলিবে না, আমি আসিয়াছি মা, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলে। এই দুর্বহ দুঃসহ পর্বতভার মহাশূন্যতা উত্তোলিত করিতে পারে, বিধাতার রাজ্যে এমন কি কিছুই ঘটিবার নাই ? বুকজোড়া চিতাগ্নির শিখা মর্মস্থল নিরন্তর লেহন করিতেছে—কোন্ বিধাতার চরণতলে সে জ্বালা জুড়াইবার শান্তিবারি সঞ্চিত হইয়া আছে !

আশা ক্রমশঃ নিঃশেষে বিলীন হইয়া হতাশ্বাস বৈরাগ্যে পরিণত হইল। স্বামী-স্ত্রীতে আর কথা হয় না, বলিবার কিছু নাই। নির্জন দীর্ঘ দিবস, বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী কাটিতে চাহে না, উভয়ে ক্লান্ত অবসন্ন অচল হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে গভীর রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া কুমুদনাথ দেখিলেন, নির্মলা শয্যায় নাই, ঘর অন্ধকার, অন্ধকারের ভিতর অদূর হইতে চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ আসিতেছে। সস্নেহে ডাকিলেন,—নির্মল, বিছানায় এস।

ক্রন্দনের বেগ বাড়িল।

কুমুদনাথ উঠিয়া বাতি জ্বালিলেন। দেখিলেন, নির্মলা কক্ষতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া লুটাইতেছেন। কুমুদ ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নির্মলার শিয়রে বসিয়া তাঁর মাথার উপর হাত রাখিলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন,—ওঠো, ঠাণ্ডা লাগবে।

—ঠাণ্ডা ? কোথায় ঠাণ্ডা ? ঠাণ্ডা হলেই ত' বাঁচি। আমার রঘুনাথের দেহের উত্তাপ—বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া বসিয়া স্বামীর গলা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিলেন, তখনই গলা ছাড়িয়া দিয়া হাতে হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—সেই থাবা ! বাঁদরের সেই থাবা !

ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—কোথায় ? কি হয়েছে তার ?

আলুথালু চুলগুলি ক্ষিপ্রহস্তে জড়াইয়া লইয়া নির্মলা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমুদনাথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন,—ওঠো, আনো সেই থাবা, আমি চাই ? কোথায় রেখেছ তা ? নষ্ট করে ফেলনি ত' ?

কুমুদনাথের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—কেন? বৈঠকখানায় আছে। কি করবে তা দিয়ে? বলিয়া কুমুদনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে নির্মলা বলিতে লাগিলেন,—নিয়ে এস সেটা। হঠাৎ আমার মনে পড়লো। আগে কেন আমার মনে পড়েনি? তুমি কেন মনে করনি?

—কি মনে করিনি?

—আরও দুটো ইচ্ছা সে আমাদের পূর্ণ করবে যে। জানো না তা? আমাদের একটা ইচ্ছা সে পূর্ণ করেছে—।

—একটাই কি যথেষ্ট হয় নি?

—না হয়নি। যাও নিয়ে এবার এস, আমি তার কাছে রঘুনাথের পুনর্জীবন চাইব।

কুমুদনাথের সর্বাবয়ব কম্পিত হইতে লাগিল। বলিলেন,—কি বলছ তুমি নির্মল? অসম্ভব—অসম্ভব, তা হবার উপায় নেই।

—আছে। আনো, নিয়ে এস শীগগির।

—চল, শোবে চল, যা হবার নয়—

—কেন নয়? আমাদের প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয়টা কেন হবে না? যাও—

—তুমি জানো না নির্মল। তাঁর দেহ—তখনই সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। এখন—

—তুমি ভেবেছ আমি ভয় পাব? ভয় আমি পাবো না। সে রঘুনাথ আমার পেটের সন্তান। যাও, নিয়ে এস, আর কতবার বলবো।

যেখান হইতে কেহ ফেরে না সেই অপরিজ্ঞাত লোক হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে হইবে ইহারই দুর্নিবার দুরন্ত আগ্রহ নির্মলার প্রতি অংগে যেন নখদংষ্ট্রা মেলিয়া হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদনাথ স্ত্রীর এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, নীচে নামিয়া গেলেন। নীচের ঘর অন্ধকার ছিল, আলোক হইতে আসিয়া তাহা আরও দুর্ভেদ্য মনে হইল, তবু পরিচিত স্থানে যাইয়া পেঁাছিতে তাঁর কষ্ট হইল না। থাবাটা তাকের উপর ছিল। সেটা হাতে করিতেই এই ভয়টাই তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল যে, অনুচ্চারিত ইচ্ছার আকর্ষণেই রঘুনাথ তার ছিন্নভিন্ন বীভৎস দেহ লইয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্বেই আসিয়া না পড়ে। কুমুদনাথের প্রকৃতিই ছিল এইরূপ যে, কেহ ভয় দেখাইলে তিনি ভয় পাইতেন না, নিরপেক্ষ বিচারক সাজিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া কথার ওজন রক্ষা হইতেছে কিনা দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মনে অকারণ সংশয় বা অসম্পূর্ণ বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়া যে ভয় জন্মলাভ করিত তাহা তাঁহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া দিত। তাই অন্ধকার কক্ষে মন্ত্রযুক্ত থাবা হাতে করিয়া ভয়ের তাড়নায় তাঁহার দিকভ্রম হইয়া গেল। দরজা কোথায় তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুমানে চলিতে চলিতে তিনি টেবিলের সংগে ধাক্কা খাইলেন, তাঁহার কপাল ঘামিয়া হিম হইয়া উঠিল। টেবিলের ধার হইতে হাতড়াইতে সুরু করিয়া তিনি দেয়াল ধরিলেন এবং দেয়াল ধরিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া যখন তিনি দরজা পাইলেন তখন তাঁহার মনে হইল এক যুগ সময় এই ঘরে তাঁর কাটিয়াছে। শ্রান্তদেহে উপরে আসিয়া দেখিলেন, নির্মলার চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে, কেবল অস্বাভাবিক আশার উত্তেজনায় দুই চক্ষু প্রদীপ্ত।

নির্মলা বলিলেন,—বল,—পুত্র রঘুনাথ পুনর্জীবন লাভ করে আমাদের কাছে ফিরে আসুক।

কুমুদনাথ হাত তুলিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন।

—বল।

কুমুদনাথ তথাপি নির্বাক।

নির্মলা তাঁহার দিকে আংগুল তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে আদেশ করিলেন,—বল।

এ আদেশ অমান্য করিবার মত মনের বল ভয়াবিষ্ট কুমুদনাথের ছিল না। তিনি যন্ত্রচালিতের মত আবৃত্তি করিলেন,—পুত্র রঘুনাথের পুনর্জীবন লাভ করে আমাদের কাছে ফিরে আসুক। বলিয়াই তিনি ঘর্মাক্তদেহে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্রপূত কুহকবিগ্রহ সেইখানেই ধুলায় পড়িয়া রহিল।

নির্মলা জানালা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন,—পুত্র আসিতেছে। তাঁহার অন্তরব্যাপী কঠিনতম তমিস্রা অবোধ আশার আলোকে স্বচ্ছ হইয়া আসিলেও গুরুভার নীরবতার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতি মুহূর্ত বুকের অস্থি কাটিয়া কাটিয়া টানিয়া টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, সেটা শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া আসিয়া তার আধারের ভিতর হইতে দেয়ালে ও ছাতের উপর বারকতক ছায়া নাচাইয়া একেবারে নিবিয়া গেল। কুমুদনাথ উঠিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার তাঁর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁর মনে হইল, মৃত্যুপুরীর মত এই অন্তহীন নির্জন নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে তিনি অসহায়, একা ; এবং অসংখ্য প্রেতমূর্তি আসিয়া প্রহরীর মত তাঁরই শয্যার চতুর্দিকে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, পলায়নের পথ নাই। ঠিক এই সময়েই একটা ইঁদুর কোথায় খর খর শব্দ করিল। কুমুদনাথ ডাকিলেন,—নির্মল! স্বর বড় কষ্টে ফুটিল।

আহ্বানের উত্তর আসিল না। তবু আর একটি লোক অনতিদূরেই আছে, নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই কথাটি তাঁর মনে পড়িয়া গেল। একটু সাহস হইল।

বাতিগুলি নীচে ছিল ; তাহাই একটা আনিবার উদ্দেশ্যে কুমুদনাথ দিয়াশলাই হাতে লইয়া উঠিলেন। একটা কাঠি জ্বালিয়া তিনি সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামিলেন ; আর একটি জ্বালিয়া শেষ ধাপে পা দিতেই কাঠির আগুন নিবিয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই বাহির হইতে দরজার উপর যেন খট করিয়া একটা শব্দ হইল। শব্দ এত মৃদু যে ঠিক বোঝা গেল না। কুমুদনাথ সর্বাংগ নিশ্চল এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া রহিলেন। দ্বিতীয়বার শব্দ হইল আর একটু জোরে ; কুমুদনাথ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে ছুটিলেন ; দিয়াশলাই সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

নির্মলাও শয্যায় আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ?

—কিছু না, বলিয়া কুমুদনাথ শুইয়া পড়িয়া বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিলেন।

সেই সময়েই তৃতীয় করাঘাতের ধ্বনি ও তাহার প্রতিধ্বনি গৃহময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

নির্মলা সচকিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—কি ও ?

কুমুদনাথ বালিশের ভিতর হইতে বলিলেন,—ইঁদুর, সিঁড়ির উপর ছুটে বেড়াচ্ছে।

আবার শব্দ হইল, এবার আরও উচ্চতর।

—ঐ রঘুনাথ এসেছে। বলিয়া নির্মলা লাফ দিয়া নামিয়া দরজার দিকে ছুটিলেন ;

কিন্তু কুমুদনাথ তাঁহার পূর্বেই দরজায় যাইয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—জানো না নির্মল, তুমি কি করতে যাচ্ছ।

—ছাড় ছাড়, রঘুনাথ এসেছে, নিয়ে আসি তাকে।

কুমুদনাথ নির্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—না, না, সে নয়।

—সে-ই, সে-ই, আমি তার ডাক চিনি না ? দরজায় ঘা দিয়ে সে আমাকেই ডাকছে। পথ ছাড়—

বলিয়া তিনি কুমুদনাথকে প্রাণপণে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নামিয়া গেলেন। কিন্তু কুমুদনাথ গেলেন না। যেখানে বাঁদরের থাবাটা ফেলিয়াছিলেন অনুমানে তিনি সেইখানে আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকেই খুঁজিতে লাগিলেন। হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে সেটা হাতে ঠেকিল। কুমুদনাথ থাবাটা লইয়া দ্রুতপদে যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, তখন করাঘাত অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে এবং নির্মলা নীচের ছিটকিনি ও ডাণ্ডা খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে নির্মলা বলিলেন,—খুলে দাও ওপরের ছিটকিনি, আমি নাগাল পাইনে। বলিয়া নিজেই চেয়ার টানিয়া দরজার দিকে লইতে লাগিলেন।

দুঃসহ আতঙ্কে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত কুমুদনাথ থাবাসমেত হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া উচ্চারণ করিলেন,—রঘুনাথ, তুমি যাও।

করাঘাতধ্বনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল, ছিটকিনিও তখনই খুলিল। নির্মলার দুই ব্যগ্র বাহুর প্রচণ্ড আকর্ষণে দরজা খুলিয়া গেল—খোলা দরজার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া তিনি দেখিলেন, জনশূন্য রাজপথের উপর কয়েকটা আলো শুধু মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

* ইংরাজী হইতে

## ॥ নয় ॥

### ব্যস্তবাগীশ

······ও হোঃ, লাগেনি ত' ? হঠাৎ একটু ধাক্কা লেগে গেছে। বড্ড লেগেছে ?··· ·· সামনে দেখে চলছি বৈ কি।—মাপ করবেন।······যে আজ্ঞে, এখন থেকে দেখেই চলব। ······তুই কেরে আবার ?—একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিস !······আমি চোখে দেখিনে না তুই চোখে দেখিসনে !—দুধ চলকে পড়ে গেল তা আমি করব কি ? যেমন কাজ তেমনি—আরে কে ও, সিধুবাবু যে !...আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি ভালই।...এই হাটে এসেছি।······

তোর ঝাঁকায় কি রে ? কুমড়ো ? বড় পদার্থই এনেছ, কুমড়ো আবার মানুষে খায় !······খামখাই খায়, তোর কথায় ! দেখিস' খুনি বসে বসে কে খায়।······কত করে হে পটোল ?...চোদ্দ পয়সা ? ঐ শুকনো পটোল।···গছাচ্ছ না তা জানি।...তোমার এগুলো কি ?...উচ্ছে...তাই দেখছি। কাসুন্দিই গেছে ফুরিয়ে, এখন তোমার উচ্ছে অচল।······সুক্তো হয় ত' জানি।...বেগুন কত করে ?···এ-জন্মে কতই দেখলাম, বেগুনও দশ পয়সা হল—নিমেও হল মোড়ল !······লাউটা কত নিবিরে ?—পাঁচ আনা ? একি

দুর্ভিক্ষের মুলুক পেলি যে আর কিছু নেই, তোর ঐ জলভরা কদু মানুষে নেবে পাঁচ আনা দিয়ে! ছ'পয়সায় দিবি?...জানিস, ভদ্দরলোকের সংগে কথা কইছিস?...ক' আঁটি করে গা পয়সায় তোমার শাক? ··দু আঁটি?...ঐ দুবেনা ক' গাছা? যা ইচ্ছে বলে দিলেই হল।—কে হে তুমি ধাক্কা দিলে? দেখছ না ভদ্দরলোক?···ঘেঁষে এসে দাঁড়াও কেন?···পা মাড়িয়ে দিয়েছি, বেশ করেছি। অত যদি...তোমায় কে মধ্যস্থ মেনেছে, বাপু, এলে শালিসী করতে?···মোচাটা কত চাস রে ছোঁড়া?···বেশ বলেছিস, একেবারে চার আনা চাইলেই হত। নাঃ, বাজার করা বড়ই ঝক—মেয়েমানুষ, পুরুষ-মানুষ দেখে সরে গেলেই পারো; অতই যদি সমিহ, তবে হাটের মাঝে এসেছ কেন?... এ হেঃ, এ কার ধামা রে? ঠিক পথের ওপরেই রেখেছ বাপু, মানুষ খুন করতে।...আরে আরে, চোখে আমি ঢের দেখি, দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি এই চোখে দেখে।···

···মাছের এই ভাগাটা কত?...দেব, বাপু, দেব, পালাচ্ছিনে ত' ঘরবাড়ী দেশ ছেড়ে—তিন আনা পয়সা তোমার আসছে হাটেই···তোমার যে খালি কুচো চিংড়ী!···হ্যাঁ, আমিই; মাছের বাজার একেবারে আগুন যে রে, বলাই।—কুচো চিংড়ীর এ ভাগাটা কত?...অবাক করলি যে রে, পয়সায় যে তিনটেও পড়ে না! তিনটে নে, কি বলিস? গোমরে কথাই ক'সনে যে রে!—দে, তুলে দে এই ঠোংগাতে—এক আনাই হল।···বাপরে, এ কি হল দিনকে দিন!—আরে আনি আর দেখতে হবে না, ঝকঝকে রাজার মুখ।··· আজ্ঞে, খুড়োঠাকুর, এই কুচো চিংড়ীই নিলাম, জিনিষ মন্দ নয়!...যে আজ্ঞে, দেখুন ঘুরে, বাজার একেবারে আগুন!—আর ক'টা দে, বাবা, অনেকক্ষণ ঠোংগা পেতে আছি, চারটে পয়সা নিলি যেন ঘাড় ধরে।···বেশ বাবা, বেঁচে থাক। মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, মাছ নইলে তার ভাত রোচে না।—এইবার গেছি রে বাবা! কে বাবা মাথার কাছেই মুখ পেতেছিলে, মাথাটা দিলে ভেংগে। এঃ কপালটা ফুলে উঠেছে যে!···আমার দোষ নেই, বাপু, দোষ তোমারই।...আচ্ছা আচ্ছা—ছটফট আমি মোটেই করছিনে।—যাই দেখি বাড়ীপানে।—

···ও হোঃ, পান!—মেয়েদের কত জিনিষেরই দরকার।···দাও ত' হে পান এক পয়সার।—ক'টি দিলে? ছোট বড়য় পাঁচটা!—পান রাখো, বোঁটা ক'টি কেটে দাও, নিয়ে বাড়ী যাই।—আবার হাসি হচ্ছে! পয়সাটা পড়ল ঐ চুপড়ীর নীচে।-পেয়েছ?··· ঠকালে, বাপু। যাক গে—

···দেখো, দেখো; এখনিই ত' লেগেছিল ঠোকাঠুকি।

···অবিনাশ, ভাংগা হাটে কি মনে করে? ভাঁড়ে বুঝি দুধ? ··কত করে?···পাঁচ আনা? শুনে কানে আংগুল দিতে ইচ্ছে করে যে!...আচ্ছা এস।—

...নমস্কার রাধিকেবাবু।···ঠোংগায় কুচো চিংড়ী। চার পয়সায় দিয়েছে ক'টি তা একবার দেখুন—আচ্ছা, আচ্ছা, আসুন।···

···আমার গা ছাড়া ঘাম মুছবার আর জায়গা পেলে না? দিলে জামাটায় দাগ লাগিয়ে।...কানা আমি নই, কানা তুমি, একেবারে হুড়মড় করে এসে পড়ছ।—আবার দেঁতো হাসি দেখানো হচ্ছে!···

···হরেকেষ্ট, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমিও যাব।···চল। হ্যাঁ, হাট করা হল। বাজার যে আগুন, কার বাপের সাধ্য—এঃ, গেল জামাকাপড় জলেকাদায় মাখামাখি হয়ে; গর্তটায় জল জমে আছে—ফেলেছি পা তারি ভেতর।...তোমার গায়েও ছিটে লেগেছে। পুঁছে

ফেললেই যাবে'খন।—দেখি, আমায় এগিয়ে যেতে দাও, হয়েকেষ্ট, তোমার পা চলেনা। —টক্ টক্, একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও, বাপু, দেখছ না পাশ কাটাচ্ছি?…এটা কি রে বাবা।—তবু ভালো, চমকে উঠেছি দড়িগাছাটা দেখে, কোন্ ব্যাটা বজ্জাতের কাজ।… সামাল সামাল—অত জোরে হাটে! এখনি ত' পড়েছিলে ঘাড়ে—আমি ঠিকই চলেছি, ধড়ফড় করে ছুটেছ তুমি।—সকাল সকাল বেরুলেই হয়, বেলা ফুরিয়ে হাটে বেরুবে আর মানুষের ঘাড়ে পড়বে।…এই মরেছে; লাগল হোঁচট—শিকড়টা জেগে আছে রাস্তার ঠিক মাঝখানেই।…দেখে চললেই লাগে না।—কে বাপ টিপ্পনী কাটছ পেছন থেকে?

…কে যায়?—মৃত্যুঞ্জয়।—না, কোনো কথা নেই।—দেখি, যেতে দাও।—মাথায় আবার ধামা করেছ কোন্ কর্মে।—লাগল মাথাটায়।…তাড়াতাড়ি আমি মোটেই করছি নে।…হাতে কুচো চিংড়ীর ঠোঙ্গা…সে কথা আর জিজ্ঞেসা করো না—চারটে পয়সা নিলে কান দুটো ম'লে। এত দুঃখও ছিল কপালে—আমদানী নেই এক পয়সার, ওদিকে খরচ বেধাড়াক।—

…সরে যা, সরে যা—কে রে বাপু তোরা রাস্তার উপরেই খেলার জায়গা করে নিয়েছিস, মরছিলি ত' এখুনি একটা পায়ের তলায় পড়ে—এই সেরেছে, এই…এই… এই…সামলেছি—আবার জল ফেলেছে কতকগুলো, মরতাম পড়ে আর একটু হলেই;— পাজা হারামজাদারা।—

মৃত্যুঞ্জয় পা চালিয়ে হেঁটে এস।…আমি দৌড়চ্ছিনে, তুমিই হামা দিচ্ছ।—

…হারে রে রে রে রে উঠরে, কানাই বেলা হল চল, চল গোঠে যাই—

—ইস, লাগল শিঙ্গের খোঁচা কোমরে; গরুটা বেঁধেছে কোন্ ব্যাটা আহাম্মক একেবারে রাস্তা জুড়ে; গরুটাও তেমনি হাবা, মানুষ দেখে একটু সরেই যা, তা নয়, হাঁ করে চেয়ে আছে কোন্দিকে তার ঠিক নেই।—ইস্মাইল যে! গরু বুঝি তোমার?…তবে কার গরু?.. জানিনে বলে দিলেই খালাস।…দৌড়ব কেন রে!…হ্যাঁ বাড়ীর সব ভালই আছে। তোর হাসি পাচ্ছে কিসে।—

…আমি তারে দেখলে পরে আপনহারা হই, ওলো সই…

এই মরেছে, মল ব্যাংটা চেপ্টে, রাস্তায় এসে থপ থপ নেত্য কিরে বাপু? গেল ত' প্রাণটা অপঘাতে!—এখন স্বর্গে গিয়ে নাচগে যা।…মৃত্যুঞ্জয়? ও, বাবা, কত পেছনে। ধাড়ি মিন্সে যেন গড়িয়ে চলে।…

…তুমি কাদের কুলের বৌ গো তুমি কাদের কুলের বৌ…

শুনে ফেলল নাকি! তা কে জানে আবার জল আনতে এখনই চলেছিস! মরুকগে আর ভাবতে পারি নে।…

…ওরে রাজি, মাছ এনেছি দেখে যা—ঘ্যাঁক। যেমন পথে শোয়া তোর অভ্যেস তেমনি সাজা, ল্যাজের ওপর না পড়ে ঠ্যাঙ্গের ওপর পা পড়লেই ত' যেত ঠ্যাঙ্গখানা ভেঙ্গে।…রাজি, পা ধোয়ার জল আন।…কোথায় রেখেছিস জল?—রাখলাম মাছের ঠোঙ্গাটা এইখানেই; দিব্যি কুচো চিংড়ী এনেছি।—কোথায় ঘটি?—ঐ যাঃ গেল ঘটিটা গড়িয়ে পায়ের ধাক্কা লেগে। জল দে, রাজি, সব পড়ে গেছে।…তুমি থামো দিকিনি— আমি হুড়মুড় করছিনে, যেমন আক্কেল তোমাদের, জলের ঘটি রেখেছ ঠিক পথের ওপর। …পান এক পয়সার। বাজার একেবারে আগুন, তাকাবার যো নেই, তবু—

‥ কি বললি?…মাছ কই, আবার কি? মাছ ঐ ঠোঙ্গাতেই আছে।…তুই কানা

নাকি !...কুচো চিংড়ী, কুচো চিংড়ী, আবার কি মাছ !...একটাও নেই ?···ভালো করে দেখ।...ঠোংগা ছিঁড়ে তবে পড়ে গেছে।...এই নেও, কেঁদে ভাসালে—কাঁদিস নি, আসছে হাটে এনে দেব বড় বড় গলদা।—

॥ দশ ॥

অধ্রুবম্ নষ্টমেব হি

যে কখনো আসে নাই—

এবং যে হঠাৎ একদিন আসিয়াছিল—তাদেরই কাহারো একজনের প্রতীক্ষায় সাতটা হইতে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত, পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল, কাছারীঘরে নির্জনবাস করিয়া এই ভাবিয়া উঠিয়া আসিলাম যে আসিলে ডাকিবে নিশ্চয়ই ; উকিলের কাছে মক্কেল আসিয়া কি না ডাকিয়াই ফিরিয়া যাইবে !

তবু পিছটানটা রহিয়াই গেল—

পাশের উপেন সান্যালটা বড় ধূর্ত।

অন্দরে আসিয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে উঠানে নামিতেই আমার খড়মের শব্দ পাইয়া কমল রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল ; ভার ভার ক্লান্তস্বরে বলিল,—"আর ত' পারা যায় না"—

পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়াছিলাম—

মুখ তুলিয়া কমলের দিকে চাহিয়া আমারও সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না ; দেখিলাম —"আর পারি না"—এই মহাসত্যটি তার আপাদমস্তকে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে— অর্বাচীনেরও ভুল হইবার যো নাই। অন্য সময়ে কমলের মুখে "আর পারি না"—শুনিলে হয়তো মনে করিতে পারিতাম, অভাবের যে-ক্লেশ নিত্যসংগী হইয়া উঠিয়াছে, এই— "আর পারি না"—তাহারই দিকে তার শীর্ণ অংগুলি তুলিয়াছে ; লক্ষ্মীছাড়া নাই নাই রব আমাদের গৃহস্থালীর মর্মস্থল হইতে নিয়ত উত্থিত হইতেছে, এই—"আর পারি না" তাহারই কঠোর প্রতিধ্বনি।...

কিন্তু এখন তাহার মূর্তির দিকে চাহিয়া ইহাই মনে হইল, শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজগুলিই তার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।···দেখিলাম কমলের মুখখানি রক্তবর্ণ, ধোঁয়ায় ; হস্ত হরিদ্রাবর্ণ, হলুদে ; বসন বিচিত্রবর্ণ—তেলে, গোবরে, খয়েরে, কাদায় এবং কালিতে।···সধবার সৌভাগ্য সেই সিন্দুরের রেখাটি পর্যন্ত ঘোমটাটানা—কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রের ঠিক উপরেই কাপড়ের প্রশস্ত ছিদ্রপথে তাহার প্রচুর কেশরাশির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে—

হিন্দু-স্ত্রী স্বামীকে তাঁহার পায়ের দিকে চাহিতে দেন না। তাই দেখিয়াও দেখিলাম না—কমলের চরণযুগলের কি অবস্থা।

···কিন্তু আমার ভিতরে যে আত্মবিশ্বাসী দরদী পুরুষটি আছে সে সহসা অশ্রুমুখী হইয়া উঠিল।

হুঁকার ছিদ্রটির মুখে ধোঁয়া ফুরফুর করিতেছিল ; সেইদিকে চাহিয়া বলিলাম,—পেরে উঠছ না তা' বুঝতে পারছি। ঝি-টিকে কেন তুমি ছাড়িয়ে দিলে ?

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল—

কিন্তু আমি তাহাকে তিলার্ধ অবসর না দিয়াই বলিতে লাগিলাম,— মাঝে মাঝে তবু বিশ্রাম পেতে। বাসন মাজা, জল তোলা, ঘর নিকানো, ছেলেটাকে ধরা, সব সে-ই ত' করতো। খরচ বাঁচাতে গিয়ে তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ। সব গুছিয়ে নিয়ে রাঁধাবাড়া, খাওয়ানো, ধোয়া, মোছা, তার ওপর ছেলে সামলানো—এ কি সহজ কথা!—বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠস্বর বেসামাল গাঢ় হইয়া উঠিল।

কিন্তু, কমলা হাসিয়া উঠিল—মেঘের কোলে বলাকার মত; বলিল,—আমার কিছু বলবার আছে। তোমার বিলাপ শেষ হয়েছে?

আমি অপ্রস্তুতের মত কমলের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—

সে তরলকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—আমি বলতে এসেছিলাম কি, তুমি তা না শুনেই অনর্থক খানিক কেঁদে নিলে। আমি বলছিলাম দুধের সের দশ পয়সা থেকে তিন আনায় উঠেছে—গয়লা বলে গেছে। এখন কি করবো তা বলো।··

এই ত' মানুষের দুঃখের মূল্য!—

মুহূর্ত পূর্বে কমলের ছিন্নবস্ত্র আর ক্লান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া আমার দুঃখ আর আপশোষের শেষ ছিল না—

কিন্তু পরক্ষণেই তাহারই মুখের কৌতুকহাসির হাওয়া লাগিয়া সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া হৃদয় আমার গভীর সুখে ভরিয়া উঠিল · এ-কথা মনেই রহিল না যে, আমি নিত্য অভাবগ্রস্ত দরিদ্র। যাহা মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই সত্য; এবং দুধের মূল্যবৃদ্ধিতে তীব্র ঐ দুশ্চিন্তার মূলেও সেই সত্যই বিরাজ করিতেছে।·

দুশ্চিন্তা আড়ালে রাখিয়া কমল হাসিয়াছিল—

আমিও হাসিলাম; অর্থাৎ কমলেরই হাসির প্রতিবিম্ব আমার মুখে ফুটিয়া উঠিল—

তারপর এক কথায় সমস্যার মীমাংসা করিয়া বলিয়া দিলাম,—দুধ নেয়া বন্ধ করিয়া দাও।

কমল সঙ্গে সঙ্গে হাত উলটাইয়া বলিল,—ব্যস! · তুমি যে সেই রাজার মত করলে।

—কি রকম? কি রকম?

—রাজার মেয়ের বিয়ে, বর আসছে হাতীতে চেপে। সিংহদ্বারে এসে দেখা গেল, হাতী গলে কিন্তু বর গলে না। রাজা ত' ভেবেই খুন; মন্ত্রীও তাই। যে খবর এনেছিল রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বড় হচ্ছে কতটা? সে বললে, মাথাটা আটকাচ্ছে। রাজা বললেন, মাথা কেটে ঢোকাও; মাথা আটকাচ্ছে বলে ত' বিয়ে বন্ধ থাকতে পারে না।...বলিয়া কমল হাসিতে লাগিল।

আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিল; জিজ্ঞাসা করিলাম,—মন্ত্রীও কি তাই বললেন?

কমল বলিল,—তা জানিনে। কিন্তু তুমি মন্ত্রী হলে সেই মন্ত্রণাই দিতে; বুদ্ধি সেইরকমই দেখছি।

বলিয়াই ফেলি—

স্পষ্ট কথায় একটু লজ্জিতই হইলাম।

ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কতটুকু দুধ নিয়ে থাক রোজ?

বলা বাহুল্য যে, লক্ষ্মীঠাকুরাণী যাঁদের পেচকের পৃষ্ঠে চাপাইয়া স্বর্ণাঞ্চলের ছায়ায়

ঢাকিয়া ভবসমুদ্র পার করিতেছেন, আমি সে ভাগ্যবানের দলে নই। কিন্তু বিধাতার ইহাও ইচ্ছা নহে যে আমরা মরি—

তাই জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার চোখা চোখা আয়ুধগুলি তিনি আমাকে না দিলেও, হাত তুলিয়া অকৃপণ অকুণ্ঠচিত্তে তাহা দান করিয়াছেন কমলের তূণ ভরিয়া।……

গৃহলক্ষ্মী সংসার চালান—

আমি ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ছাড়ি, আর দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখি তাঁর প্রাণপণ অক্লান্ত প্রয়াস, উৎকণ্ঠিত সতর্কতা আর ব্যয়সঙ্কোচে সূক্ষ্ম নিপুণতা।……কমল কাজ করে, দায়িত্ব তার; তাই সে যখন তখন হাসিতে পারে, আমি পারি না।

কতটুকু দুধ লওয়া হয় রোজ, জিজ্ঞাসা করিতেই কমল পুনরায় হাসিয়া উঠিল; বলিল,—সে খবরটাও রাখো না? আড়াই সের করে।

চমকিয়া উঠিলাম—আড়াই সের? এই দেউলের বাড়ীতে রোজ আড়াই সের দুধ?

—অবাক করলে তুমি। ছেলেরা দু'বেলা খায়, তোমারও দু' বেলা দু' একটু পেটে না গেলে তুমি খাটবে কি করে!—বলিয়া কমল অতিশয় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

হায় অনভিজ্ঞা, আমার খাটুনি! কাছারীঘরে বসিয়া বসিয়া হাইতোলা কি খাটুনি? চেয়ারে বসিয়া আইনের পুস্তকের আড়ালে তন্দ্রা-উপভোগ কি খাটুনি? কাজের ভিড়ে কথা বলিবার অবসর নাই এমনি ব্যস্ততা দেখাইয়া বিনামূল্যে পরামর্শপ্রার্থীকে প্রবঞ্চনা করা কি খাটুনি? অথবা সুযোগ মিলিলেই মুন্সেফবাবুদের সন্তোষসাধন করা কি খাটুনি?

হাসিয়া বলিলাম,—তা হোক, এ খাটুনি আমার সয়ে গেছে, বলকারক পথ্য না পেলেও আমার চলবে। ছেলেদেরই বা দু'বেলা দুধের কি দরকার! এক কাজ করো—আড়াই সেরের জায়গায় দুধ দেড় সের করে নেও।

কমল ঘাড় বাঁকাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—না; তা হতেই পারে না। তোমাদের সামনে একবেলা দুধের বাটিটি না দিতে পারলে আমার সে দিনটাই কাটবে না; মনে হবে, তোমরা খাওয়া শেষ না করে উঠে গেছে। না, আড়াই সেরের একফোঁটা কমে আমার চলবে না।

—তা না চলুক, কিন্তু দুধের পরিমাণ কমবে না, অথচ দর বাড়লেও খরচ বাড়বে না—এ কেমন করে হতে পারে তা ত' জানিনে। বলিয়া অত্যন্ত সন্দেহের সংগে মাথা নাড়িতে লাগিলাম।

কমল বলিল,—বাছুরসমেত একটা গরু দেখ—আড়াই সের কি তিন সের দুধ দেয় এমনি একটি গরু। তোমার বা অন্য উকিলের ত' মেলাই চাষী মক্কেল আছে—তাদের কাউকে না হয় বলে দেখো। কি বল?

—তা দেখতে পারি। কিন্তু টাকা কই?

কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই মনে মনে এতখানি জিব কাটিলাম—করিয়াছি কি!…… ছুটিয়া সেখান হইতে পালাইব কি বসিয়াই থাকিব সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অসহায় মূঢ়ের মত কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।…অত্যন্ত জ্বালার সংগে মনে হইতে লাগিল, টাকা কই জিজ্ঞাসা করিবার মতি আমায় কে দিল!

এত ত্রাসের হেতুটা এই।

টাকা ছিল—আমাদের রোজ আড়াই সের করিয়া দুধ খাওয়াইয়াও কমলের হাতে ত্রিশটি টাকা জমিয়াছিল।

কিন্তু আমারই নির্বুদ্ধিতায় সে-টাকা এখন নাই।

আমার তৃতীয় পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইলে লোকমুখে সেই সুসংবাদটা পাইয়া দ্বিতীয় মুন্সেফবাবু একদিন এজলাস হইতেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তা হলে, অখিলবাবু খাওয়াটা কবে দিচ্ছেন ?......

উত্তরমেরুবাসীর সূর্যদর্শনের মত মুন্সেফবাবুর মুখে ঐ হাসিটুকু দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া ঐ হাসিটুকুর মূল্য ছাড়া আমার আর কোনো জ্ঞান রহিল না।···ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম ; বলিলাম, হুজুরের হুকুম যেদিন হবে সেইদিনেই।

এবং পরের রবিবারেই সাধ্যাতীত একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া ফেলিলাম—

প্রথম হাকিমকে বলিলাম, অতিরিক্তকেও বলিতে হইল, ডেপুটিও বাদ গেলেন না—

উকিল বন্ধুরা জয়ধ্বনিপূর্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।···কমলের মজুত টাকা খরচ হইয়া গেল—বাজারে কিছু দেনাও দাঁড়াইল।

কাজেই "টাকা কই" প্রশ্ন করা আমার উচিত হয় নাই ; কিন্তু কমল খোঁটা বা খোঁচার দিক দিয়াও গেল না ; একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—টাকার ভাবনা আমার, তুমি গরু দেখ। বলিয়া সে কাজে গেল—

এবং আরামে আমার চক্ষু বুঁজিয়া আসিল।

রাত্রে আহারান্তে পুনরায় গাভীর প্রসঙ্গ তুলিয়া কমল বলিল,—তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, খরচ কত কম পড়বে। গরুতে খাবে, ধর দিন চার আনা ; যে দুইয়ে দেবে তাকে মাসে আট দশ আনা কি একটী টাকাই দিতে হবে , এই গেল আট ন' টাকা ; কিন্তু আমরা দুধ পাব, গোবর পাব—একটু গোবরের জন্যে হাত পেতে বেড়াতে হবে না। বাঁচছে কত হিসেব করি দাঁড়াও—তিন আনা করে যদি দুধের সের হয় তবে আড়াই সেরে লাগছে তোমার তিনে তিনে ছয়, তিনের অর্দ্ধেক দেড়—সাড়ে সাত আনা আট আনা করে তোমার দিন লাগছে, মাসে পনর ষোল টাকা ; তার ওপর ঘুঁটেতে তোমার মাসে আট ন' আনা বাঁচবে।

আমি চলিলাম,—গরুর সেবা করবে কে ?

জানি খরচের একটি পয়সা সাশ্রয় করিতে কমল অহোরাত্র বুকে হাঁটিতেও প্রস্তুত।

যে কাজগুলি তাহাকে দিনের পর দিন একা হাতে করিয়া তুলিতে হয় তাহাই যে তিনটি লোকের—তার উপর গরু······

তাই প্রশ্ন করিয়াই কমলের মুখের দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম, সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া আছে।

হাসিয়া বলিলাম,—আচ্ছা, আচ্ছা। গরু কাল আসবে, বাছুরসমেত তিনসেরী।

কমল যেন হাত পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল ; বলিল,—সত্যি ? টাকা কোথায় পেলে ? দাম দিয়েছ ?

—দাম লাগবে না। আমার পুরণো এক মক্কেল দুধ খেতে অমনি দেবে।

······তার পর না ঘুমান পর্যন্ত যে আনন্দে সময় কাটিল তাহার তুলনা নাই।

পরদিন রবিবার—

বেলা দশটার সময় আমার বড় ছেলেটি দৌড়াইয়া আসিয়া পুলকিতকণ্ঠে খবর দিল, —বাবা, গরু এসেছে।

কমল ছুটিয়া যাইয়া জানালায় দাঁড়াইল—

আমি বহির্বাটিতে আসিলাম ; দেখিলাম, সত্যই গরু আসিয়াছে। প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায়, খর্বশৃঙ্গ, হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি—দেখিলে ভয় হয়। সঙ্গের বাছুরটি অতীব প্রিয়দর্শন ; মায়ের কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া সে নূতন স্থানের ইতস্ততঃ সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তিনজন লোকে মোটা দড়ি নিয়া বাঁধিয়া গাভীটিকে আনিয়াছে।···জিজ্ঞাসা করিলাম,—গরুটা বড় দুষ্ট, কাসেম ; তিনজনে বেঁধে এনেছ ?

কাসেম বলিল,—একটু বজ্জাত আছেন ; মিছে কথা কয়ে কি হবে, বজ্জাত একটু আছেন। কিন্তু ক্ষোতি তাতে কিছু হবেন না—দুধ যে দেবেন ক্ষীরের মতন।

শুনিয়া আশান্বিত হইলাম।

মজবুত একটা খুঁট' প্রস্তুত করিয়া পুঁতিয়া তাহারই সঙ্গে গরুর গলার দড়ি বাঁধিয়া দিয়া কাসেমরা চলিয়া গেল।

গরু আনিতে বলিয়াও তাহার থাকিবার স্থানের একটা বন্দোবস্ত করিবার কথা আমার স্মরণ হয় নাই—

এখন হইল।—একটী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া তুলিতে সময় লাগিবে—

আপাততঃই বা তাহাকে কোথায় রাখা যায় ?·· একমাত্র স্থান ঢেঁকিশালা ; কিন্তু গরুর খাতিরে ঢেঁকি ফেলিয়া দেওয়া চলিবেনা—ঢেঁকির দরকার সর্বদা ; আর, ঢেঁকির স্থানে গরুর কুলাইবে না ; গরু সজীব প্রাণী, ঢেঁকি তা নয় ; গরুর নড়িবার চড়িবার স্থান চাই। তবে ?—

প্রশ্নটি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক আইনঘটিত নহে—কাজেই উত্তরের জন্য কমলের কাছে আসিলাম। বলিলাম—ওগো, তোমার গরু ত' এল ; এখন সে থাকবে কোথায় ? কেমন গরুটি বল ত' ?

কমল বিগলিতকণ্ঠে বলিল,—দিব্যি গরুটি ; কেমন একটা লক্ষ্মীশ্রী দেখছ ! অমন মিস কালো গরু আমি কোথাও দেখিনি।—

যেন সে ভারতবর্ষের যাবতীয় গো-শালা পরিদর্শন শেষ করিয়া আসিয়াছে।

বলিলাম,—কালো গরুর দুধ নাকি খুব মিষ্টি হয়। তা যাক—তোমার অদ্বিতীয় গরুটি কোথায় থাকবে তাই ভাব।

কমল ভাবিতে লাগিল।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, গরুটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া গলায় লম্বা দড়ির অধিকাংশই পায়ের সঙ্গে পাকে পাকে জড়াইয়াছে ; ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া জোরে জোরে মাথা নাড়িতেছে, আর চক্ষুদুটি রোষকষায়িত।...বৎসটিকে দেখিতে পাইলাম না।—তাহারই সন্ধানে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছি, এমন সময় সামনের বাড়ী হইতে একটি বালক পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—কাকাবাবু, বাছুর পালিয়ে গেছে।

—কোনদিকে গেছে রে ?

—উই উদিকে। বলিয়া সে হাত তুলিয়া উত্তর দিকটা দেখাইয়া দিল।

সেদিকে ত' নদী !

গামছাখানি হাতে করিয়া উদ্বিগ্নমুখে বাছুর ধরিতে বাহির হইলাম। পথে দু'চার-জনকে খবর জিজ্ঞাসা করিতে এক ব্যক্তি বলিল, পাটকেল রঙের একটি বাছুরকে নদীতীরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে সে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছে, সম্ভবতঃ সেইটিই আমার।

ঠিকানা অবগত হইয়া নদীতীরে আসিলাম।

ঐ ত' আমার হারানিধি দিগ্বিদিকে বালি উড়াইয়া মহানন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে!

...দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি কৌশলে উহাকে ধৃত করা যায়—

...গামছাখানা দক্ষিণহস্তে লইয়া তাহাকে পশ্চাদ্দিকে লুকাইয়া ফেলিলাম, এবং বামহস্তে চার পাঁচটি কাঁঠালপাতা লইয়া মুখে "আয় আয়" শব্দ করিতে করিতে তাহার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।—

নদীর ধার দিয়া চড়ার উপর পথ পড়িয়া গেছে; সহরের উত্তরদিককার মফঃস্বল-বাসীরা ঐ পথ দিয়াই বাজারে যাতায়াত করে।—

একটি লোক বোধ হয় বাজারেই যাইতেছিল—আমার বাছুর ধরিবার ফিকির দেখিয়া সে দাঁড়াইল।

...আমার হাতের কাঁঠালপাতার লোভেই হোক, কি যে কারণেই হোক, বাছুরটিও স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

আমি অতি সন্তর্পণে তার নিকটস্থ হইয়া কাঁঠালপাতাগুলি আড়ষ্টহস্তে তার মুখের সামনে ধরিলাম।

মুখের ভিতর না লইয়া বাছুরটা কাঁঠালপাতার ঘ্রাণ লইতে লাগিল।

আমি ভাবিলাম, এই সুযোগ—

গলায় গামছা না দিয়া, ডান হাত দিয়া বাছুরের গলা জড়াইয়া ধরিতে পারিলেই...

চক্ষের পলকে গামছা মাটিতে ফেলিয়া হাতখানা তীরবেগে মাথা পর্যন্ত তুলিতেই লেজ তুলিয়া বাছুর বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল।—

যে লোকটি দাঁড়াইয়াছিল সে একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। শব্দটার আভিধানিক কোনো অর্থ নাই; কিন্তু আমার সন্দিগ্ধ মন তাহার একটা অর্থ করিয়া লইয়া লজ্জিত হইল—লোকটা বোধ হয় হাসিয়াছিল।

আমার চোখে সম্ভবতঃ একটা শূন্যতা আসিয়াছিল; নতুবা তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কেন!...ছ' সাতজন লোক কলরব করিতে করিতে সেইদিক দিয়াই যাইতেছিল—

আমার চোখের দিকে চাহিয়াই তারা ভূপতিত গামছাখানা লক্ষ্য করিল দেখিলাম—

বাছুরটিও কাছাকাছি ছিল—

এবং সবগুলি একত্র করিয়া তৎক্ষণাৎ তারা ধরিয়া ফেলিল যে, আমার নদীতীরে আগমনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ বায়ুসেবন নহে।

একজন বলিল,—বাবু বুঝি বাছুর ধরতে এসেছেন? ও কি আপনাদের মত লোকের একলার কাজ! আয় ত' রে।—বলিয়া সে অগ্রসর হইল।—

সবাই মিলিয়া গো-বৎসের চতুর্দিকে একটা চক্রব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিল; এবং দুই মিনিটও গেল না—

বাছুরের কান ধরিয়া আনিয়া আমার হাতে সমর্পণ করিয়া উপকারীর দল চলিয়া গেল।

দুর্বিনীত একটা গোবৎসের গলায় গামছা দিয়া তাহকে সদর রাস্তার উপর দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনা, দৃশ্যে হিসাবে মন্দ নয় ; দায়িত্বপূর্ণও।

কিন্তু একজন পরিচিত উকিলের পক্ষে সেটা গৌরবের বিষয় কি না—

তাই দুর্দমনীয় ক্রোধের উচ্ছ্বাস বাহিরে ফুটিতে দিই নাই……তাহাতে অবস্থা চতুর্গুণ খারাপ হইয়া যাইত।—

হাসিতে হাসিতেই বাছুরের গলায় গামছা টানিতে লাগিলাম,—যেন কৌতুকটি দশজনের মত আমিও উপভোগ করিতেছি—

যাহারা রাস্তায় চলিতে আমাদের দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—

যাহারা জানালা খুলিয়া চোখ বাহির করিয়া দিয়াছে—

যাহারা হাতের কাজ ফেলিয়া আমাদের দেখিতে উঠিয়া আসিয়াছে—

উহাদের সকলের মুখের মৃদু মৃদু হাসি আর আমার মুখের হাসি যেন একই……

তবু কোথায় যেন কাঁটার মত অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার শুষ্ক হাসির ফাঁকি সবারই কাছে ধরা পড়িয়া গেছে !—

বাড়ীর সম্মুখীন হইতেই সেই বালকটি পূর্ববৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল,—বাছুর পেয়েছেন, কাকাবাবু ?

আমার লোকদেখান শুষ্ক হাসি ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; ছোঁড়ার প্রশ্ন শুনিয়াই সেটা দপ করিয়া নিবিয়া গেল।

"—ঠাট্টা না কি হে ?"—বলিয়া রুক্ষস্বরে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া তাহার অকারণ কৌতূহলের নিবৃত্তি করিয়া দিলাম।···বাছুরটিকে আমার হাতের মধ্যে দেখিয়াও বাছুর পাইয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিবার তার কি দরকার পড়িয়াছিল ?

মধ্যম পুত্রটি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া মহা উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—বাবা, মা গরুর নাম রেখেছে শ্যামা, কালো বলে ; মা আরো কি কি করেছে দেখবে এস।

তাহার হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—যা, যা, বকাসনে।

সুখবর দিয়া সে আমায় সন্তুষ্ট করিতেই আসিয়াছিল। গরুর নামরাখা ব্যাপারে যখন সবাই এমন উৎসাহিত তখন আমিও তাহাদের সংগে সমানতালে কেন উৎসাহিত হইব না, কোথাও তাহার হেতু না থাকাই উচিত···

কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত ক্রুদ্ধকণ্ঠের তাড়নালাভ করিয়া জাপু মুখ একেবারে এতটুকু করিয়া সরিয়া গেল।

একগাছা শক্ত দড়ি সংগ্রহ করিয়া বাছুরটিকে খুঁটির সংগে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া ভিতরে আসিলাম। দেখিলাম, জাপু মিথ্যা কহে নাই···কমল আমাদের কাঠের ঘরের সমুদয় কাঠ ঢেঁকিশালায় আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছে এবং বড় পুত্র হাপু অতিশয় তৎপরতার সহিত তাহার সহায়তা করিতেছে।

আমাকে দেখিয়াই কমল হাসিয়া বলিল,—পেয়েছ বাছুর ? গরু থাকবে কোথায় ভেবে পাচ্ছিলে না—ঐ দেখ গরুর ঘর ! আমাদের শোবার ঘরের চেয়ে বরঞ্চ ভালই হয়েছে। —তারপর জাপুর দিকে হঠাৎ নজর পড়ায় বলিল,—কি গো মুখখানা ভার হল কিসে ?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—আমি ধমকেছি। বাছুর নিয়ে হয়রাণ হয়ে এসেছি, মহা বিরক্তবোধ হচ্ছিল, ও গিয়ে তখন খবর দিচ্ছে, তুমি গরুর নাম রেখেছ শ্যামা ; আরো কি কি সব করেছ।

কমল তাহার চিবুকস্পর্শ করিয়া চুম্বন করিতেই ছেলের মুখে আবার হাসি ফুটিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

দিনমানটা শ্যামা বাহিরের উঠানেই বাঁধা থাক ; সন্ধ্যার পূর্বে তাহাকে তাহার ঘরে আনা হইবে—এই পরামর্শ করিয়া স্নান করিতে গেলাম।

রবিবারের দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু নিদ্রার অভ্যাস করিতেছিলাম—

কমল বলে,—ছ'টা দিন খাটো, খেয়ে উঠেই ছুটতে হয় ; ছুটির দিনটা শুয়ে একটু আরাম করো ! বলিয়া জোর করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দিত।

কিন্তু নিদ্রা জমাট বাঁধিত না।

......দূরে কি নিকটে তাহা চট করিয়াই ধরিতে পারিলাম না—

কিন্তু "সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে"—এইরকম একটা কোলাহলের শব্দে আমার সবৎস গো-লাভের এই পুণ্যদিনের হালকা নিদ্রা ছুটিয়া গেল ; কিন্তু আলস্য তখনই ছাড়িল না।......সর্বাগ্রে মনে পড়িল, গৃহদাহ বা সর্পদংশনের কথাটিই......

কিন্তু পরক্ষণেই যে কথাগুলি গুলির মত কানে আসিয়া ঢুকিল তাহার সংগে সর্প বা অগ্নির সংস্রব থাকিতেই পারে না। একটি রমণীকণ্ঠ বলিতেছিল,—"হতভাগা মিনসের গাই পুষতে সাধ হয়েছে"—ইত্যাদি।

শুনিয়া প্রাণসংশয় দুর্ঘটনার সন্দেহটা গেল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার হইতে পারিলাম না।......উদ্দিষ্ট হতভাগ্য পুরুষটি কি আমি ? ইতিমধ্যেই শ্যামা কি কোনো গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিয়াছে ?

নিদারুণ সন্দেহ লইয়া উঠিউঠি করিতেছি—এমন সময় আমারই বহিরংগনের মধ্যস্থল হইতে আহ্বান আসিল,—অখিলবাবু ?

ডাক শুনিয়া আমার তন্দ্রা, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা, সন্দেহ প্রভৃতি উৎপাত এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল ; এবং আলুথালু হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমারই প্রতিবেশী হারাণবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন·····

শ্যামা অদৃশ্য।

আমাকে দেখিয়াই হারাণবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"আসুন, দেখে যান আপনার গরুর কীর্তি"—

পারেন ত' আমার টুঁটি কামড়াইয়া গরুর কীর্তি দেখাইতে লইয়া যান—এমনি তাঁর খিঁচুনি।······বলিতে লাগিলেন,—বাগানের শাকপাতা, গাছগাছড়া কিছু রাখেনি ; দামী দামী ক্রোটোন, ভাল ভাল গোলাপের চারা ভেঙে উপড়ে একেবারে তছনচ, পয়মাল করে দিয়েছে......

বলিতে বলিতে হারাণবাবুর গলা শ্লেষ্মায় নয়, জলে বুঁজিয়া আসিল।

আচমকা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া স্পষ্ট কিছুই ঠাহর করিতে পারিতেছি না, এমনি নির্বাক হইয়া আমি হারাণবাবুর মখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

হারাণবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—কিছু নেই, কিছু নেই, সব গেছে। আমার স্ত্রী ত' কেঁদেকেটে শয্যা নিয়েছেন।

কিন্তু শয্যা যে তাঁহার স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই তাহা আমি জানিতাম।......একটা জানালা একটু ফাঁক করা ছিল এবং সেই পথ দিয়া কাঁটা আসিয়া আমার পরকালের পথে ঝর ঝর করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

হারাণবাবুর অভিযোগের উত্তরে আমার বলিবার কিছু ছিল না; কিন্তু শত্রুকে নিরুত্তর দেখিয়া হারাণবাবুর ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল; বলিলেন,—বৃষকাষ্ঠের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত' আমায় উদ্ধার করা হবে না......গরু এখনো বাঁধবার বন্দোবস্ত করুন।

আমার যেন হুঁস ফিরিল, দিশা পাইলাম—

হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম—করছি, বাঁধবার যোগাড় করছি, দড়ি একগাছা নিয়ে আসি।

—দড়ি আনতে যাবেন কোন্ চুলোয় ? দড়ি আপনার গরুর গলাতেই আছে। আসুন, বেশী দেরী করলে—

বেশী দেরী করিলে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা হারাণবাবু স্পষ্ট বলিলেন না—

তাঁহারই সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইবে—

কি আমাকেই তিনি—

আর ভাবিতে পারিলাম না; হারাণবাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া হারাণবাবুরই বাগানের দিকে ছুটিলাম।

......কোলের বাছুরটিকে গ্রেপ্তার করিতে লোক লাগিয়াছিল সাতজন—

পুরা গরুটিকে গ্রেপ্তার করিতে কত লোক লাগিতে পারে তাহারই একটা মোটামুটি হিসাব করিতে করিতে হারাণবাবুর বাগানে পেঁছিয়া দেখিলাম, শ্যামা সেখানে নাই—

কিন্তু সন্দেহ রহিল না যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ক্ষতি করিয়াছে বিস্তর—

কারণ হারাণবাবুর বর্ণিত "দামী দামী ক্রোটন" আর "ভাল ভাল গোলাপের চারা" সেখানে একটিও দেখিলাম না; আর, শাকের ক্ষেত সে ক্ষুর দিয়া চষিয়া, দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া, পা দিয়া ছিটাইয়া চটকাইয়া ছটাকখানেক ভুঁইয়ের এমন হাল করিয়াছে যে সেদিকে চাওয়া যায় না।

......সেইদিকেই চাহিয়াছিলাম।

হঠাৎ একটি বালক-কণ্ঠ তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"কাকাবাবু, গরু ঐ উদিকে গেছে।"—চাহিয়া দেখি, সকালবেলা যে বালকটি অসদুদ্দেশ্যে প্রশ্ন করায় ধমক খাইয়াছিল, সে-ই।

হারাণবাবুর সংগেই ছিলেন—

বলিলেন,—আসুন, ধরুন এসে আপনার গরু। বলিয়া আগাইয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর হারাণবাবুর গরজ নয়, গরজ আমার। হারাণবাবু পথ না দেখাইলেও আমি নিজেই যাইতাম—

কিন্তু যাইয়া দেখিলাম, অনেকগুলি লোক জড় হইয়া অনর্থক তাড়না আর কলরব করিয়া শ্যামাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে—

চক্ষের পলকে লোকগুলাকে ধাক্কাইয়া সরাইয়া দিয়া লাফাইয়া গরুর দড়ির কাছে পড়িলাম—

গলায় গামছা জড়াইয়া বাছুর টানিয়া আনিতে হইয়াছিল ; এবার গরুর গলার দড়ি চাপিয়া ধরিলাম। তখনই আমাকে কেহ সাহায্য করিলে "এই আখ্যায়িকার রূপ ও রঙ বদলাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত, তাহা আন্দাজ করাও শক্ত"—

কিন্তু বাঙালীর প্রাণ দূষিত বাষ্পে প্রস্তত বলিয়াই এতগুলি লোক কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁত মেলিয়া হাঁসিতে লাগিল।…

শ্যামা নামেই গরু, কিন্তু বুদ্ধিতে বিচক্ষণ।

নূতন মালিকের দড়ি ধরিবার মতলব ঠিক বুঝিতে পারিয়া সে ক্রীড়াচ্ছলে ক্ষুদ্র একটি লম্ফ প্রদান করিয়া ছুটিতে সুরু করিয়া দিল—

দড়ির প্রান্ত ধরিয়াছিলাম বলিয়া আমাকেও ছুটিতে হইল।

গরু যখন নড়ে না, তখন সে পর্বতের মত অটল—নড়ায় কার সাধ্য! আবার যখন ছোটে তখন সে শৃংগচ্যুত শিলার মত দুর্বার—রোখে কার সাধ্য!…কাজেই শ্যামার গতিরোধ করিবার বৃথা চেষ্টায় আমি ছুটিতে সুরু করিলেও অনতিকাল পরেই ঘটনা দাঁড়াইল ইহাই যে, সে-ই আমাকে টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিল—

কতক্ষণ ছুটিতাম কে জানে?

হঠাৎ একবার উলটাইয়া যাইবার উপক্রম হইতেই দড়ি ছাড়িয়া দিলাম।—

কি ভাবিয়া শ্যামাও দাঁড়াইল—

দাঁড়াইয়া ঘাসে মুখ দিল।

পশ্চাতের সেই জড়বুদ্ধি রংদার লোকগুলি কি মনে করিয়া আমাদের সংগ লইয়াছিল, আর কি ভাবিয়াই বা তাহারা ঠিক এই সময়টিতে একটি অমানুষিক চীৎকার ছাড়িল, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন যিনি তাদের মানুষের মুখ, চোখ, হাত, পা আর অবয়ব দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বীভৎস চীৎকারশব্দে ভয় পাইয়াই হোক কি রুষ্ট হইয়াই হোক শ্যামা আবার ছুটিল—একেবারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া।

…মুহূর্তমধ্যে একটা তোলপাড়, লোমহর্ষণ কাণ্ড বাধিয়া গেল…রাস্তার লোকগুলি, হাতুড়ির মুখে বরফের টুকরার মত, পথের দুপাশে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল—

"সরে যাও সরে যাও" শব্দে চতুর্দিক উচ্চকিত হইয়া উঠিল—

ঘরে ঘরে জানালা খুলিয়া যাইতে লাগিল—গৃহিণীরা বহিরাগত পুত্রকন্যার নাম ধরিয়া প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল—

যাঁহাদের সে দুর্ভাবনা ছিল না তাঁহারাও সেই অবসরে বাঁধা গলা ছাড়িয়া দিলেন—

বাবুরা পিছাইতে পিছাইতে চেঁচাইতে লাগিলেন,—"মানুষ মেরে ফেলবে, ধরো শীগগির, বাঁধো শীগগির, রোখো শীগগির…কোথাকার হাঁ-করা আহাম্মক ব্যাটারা!"…

কিন্তু কে ধরে তার ঠিক নাই।

এততেও কিছু ক্ষতি হইত না—

কিন্তু দৈবাৎ গুরুদাসবাবুর ফটক খোলা ছিল ; শ্যামা ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া অনিবার্যবেগে সেই খোলা ফটক দিয়া ঢুকিয়া পড়িল…

আমিও লাফাইয়া তাঁর প্রাচীরের উপর উঠিলাম।

গুরুদাসবাবু বাহিরের উঠানে জলচৌকি পাতিয়া বৈকালিক আরাম উপভোগ করিতেছিলেন।……মহিষাসুরের মত দুর্ধর্ষ গাভীটিকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই কোঁচার কাপড়ে পা আটকাইয়া ভূপাতিত হইলেন, এবং সেই অবস্থাতেই চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"পুলিস পুলিস......

কিন্তু শান্তিরক্ষক পুলিশ তখনো রোঁদে বাহির হয় নাই।—

অবলাকণ্ঠে আর্তনাদ উঠিল,—মেরে ফেলেছে গো সর্বনেশে নির্বংশের গরু!......

গুরুদাসবাবুর পুত্র—তিনিও বাবু—বিরাজবাবু; বিরাজবাবু হাঁকিতে লাগিলেন,—বন্দুক, বন্দুক, শীগগির বন্দুকটা নিয়ে আয়, ওরে ভগলু।......ক্রোধের অস্থিরতায় তিনি বিস্মৃত হইয়া গেলেন যে, গোজাতি হিন্দুর অবধ্য—ভয় দেখাইয়া গুরুদাসবাবুকে ধরাশায়ী করিলেও।......

শ্যামা থমকিয়া দাঁড়াইল।

এবং আমার জিহ্বায় যেটুকু বাষ্প ছিল তাহাও এই ঘটনায় শুকাইয়া গেল।

বাবু গুরুদাস চৌধুরী আদমপুরের আদি জমিদার সেই চৌধুরীবংশের পুষ্ট ফল ও স্ফুটপুষ্প-সুশোভিত একটি শাখার গুরুভার মূল। গুরুদাসবাবুর পূর্বপুরুষগণের বিদ্রোহী প্রজাশাসন করিবার উপযোগী দোর্দণ্ড জিহ্বা এবং উত্তপ্ত তেজ ছিল। তাঁহারা গুরুদাসবাবুর জন্য বিদ্রোহী বা বশীভূত কোনো প্রজাই রাখিয়া যান নাই।—

কিন্তু তাঁহাদের পরাক্রমের আস্ফালন যেন গুরুদাসবাবু-রূপে মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

গুরুদাসবাবু গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টায় জলচৌকির বাহিরে ধড়ফড় করিতেছেন এবং ভগলু বন্দুকের পরিবর্তে সময়োপযোগী রেগুলেসন লাঠি লইয়া বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমি প্রাচীরের উপর হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়িলাম।

লাঠি শ্যামার পিঠে পড়িতে লাগিল শব্দ পাইলাম—

একটি ব্যাকুলকণ্ঠের প্রশ্নের উত্তরে গুরুদাসবাবু বলিলেন,—

"লাগেনি, লাগেনি"—তাহাও শুনিতে পাইলাম—

অনেকগুলি রুদ্ধস্বর প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"কার গরু, কার গরু?"—একটি বালক তারস্বরে চীৎকার করিয়া উত্তর করিল,—"জ্যাঠামশাই, ঐ কাকাবাবুর গরু, নতুন এনেছে।"...গুরুদাসবাবু বলিলেন,—"কাকাবাবুটা কে? ডাক তাকে।"..

ভগলু ততক্ষণে ঠ্যাঙাইয়া শ্যামাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছে—

এবং সে পুনরায় ছুটিতে সুরু করিয়াছে।

এবার আমি পলায়নপরা গাভীর পশ্চাদ্ধাবন করিলাম কি উদ্দেশ্যে - গরুটিকেই ধরিতে, কি গুরুদাসবাবুর সম্মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে—তাহা বলিব না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আদমপুরের বিখ্যাত জমিদার গুরুদাসবাবুর গৃহে অকস্মাৎ এই স্নায়বিক বিভ্রাট না ঘটিলে আমি গরুর পথে গরুকে পরিত্যাগ করিয়া এইস্থান হইতেই ঘরে ফিরিতাম।—

যাবতীয় শব্দ ছড়াইয়া বজ্রনির্ঘোষে শব্দ হইল,—অখিলবাবু?

আমি মুহূর্তের জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া "আসছি" বলিয়াই নিরুদ্দেশ হইয়া গেলাম।

আহ্বানকর্তা গুরুদাসবাবু স্বয়ং; এবং আমার চোখের সম্মুখে মানুষগুলি তখন ঝাপসা হইয়া গেছে—পায়ের নীচে মাটি কাঁপিতেছে।...

*     *     *     *     *

শ'খানেক কি দুশো গজ দৌড়াইয়াই বসিয়া পড়িলাম···

দৌড়-ধাবন বহুকাল হইল ছাড়িয়াছি—ওকালতি পাশ করিবার আগেই। এইটুকু শ্রমই আমার মুখ, কান গরম হইয়া দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

তাৎপর্যের কথা এই যে বাজে লোকগুলো কিন্তু তখনো আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই; আমার লাঞ্ছনার শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না সঙ্কল্প করিয়াই বোধ হয় তাহারা সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতে লাগিল; তবু তাহাদেরই ডাকিলাম; বলিলাম,—যে আমার গরু ধরে দিতে পারিবে এক সিকি সে বখ্‌শিস্‌ পাবে। বলিয়া একটি আঙ্গুল দেখাইলাম···বখ্‌শিস্‌ ঐ এক সিকির বেশী নয়।

একজন মুখপাত্র হইয়া বলিল,—একা ঐ গরুর কাছে কে এগোবে বাবু!

—ক'জন চাই?

—ছ' জনের কমে হবে না।

মনে পড়িল, বাছুর ধরিতেও ঐরকমই লাগিয়াছিল। বলিলাম—বেশ।

—কিন্তু ছ'জনকেই একটি করে সিকি দিতে হবে, দৌড়তে হবে ঢের।

বলিলাম, —তাই পাবে।...মনেও হইল না যে, ছ'সিকিতে দেড় টাকা। কিন্তু ইহাই মনে হইল যে, ঘর পুড়িবার সময় যারা লুঠ করে তাদের চেয়েও পাপিষ্ঠ জগতে আছে। —একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, তোরা কি জাত?···কিন্তু ততক্ষণে তাহারা গরু ধরিতে 'ধাওয়া' করিয়াছে।

...গুরুদাসবাবুর দ্বিতলালয়ের সম্মুখবর্তী রাস্তাটি পরিহার করিয়া, সত্যেনবাবুর বাগান দিয়া, রামলালের কানাচ দিয়া, ধীরেনবাবুর গলি দিয়া, রমণীবাবুর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অনেক ঘুরিয়া যখন ঘরে ফিরিলাম কমল তখন কাঁদিতেছে; ছেলেদের মুখ আর বাড়ীর আবহাওয়া অতিশয় বিষণ্ণ।

একটা খুঁটী ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িলাম—

থাকিয়া থাকিয়া একটি খেদের সুর কানে আসিতে লাগিল,—"সব খেয়ে গেছে গো, সব খেয়ে গেছে ঐ মুখপোড়ার সর্বনেশে গরু"···

পরদিনই কাসেমকে ডাকিয়া গরু ফেরৎ দিলাম—

কিন্তু ভুলিবার কোনো উপায়ই রহিল না যে, ছ'সিকিতে দেড় টাকা।

# সংকলন

বি. দ্র. বিংশ-শতাব্দীর প্রাক্-মধ্যযুগের, কল্লোল-প্রগতি যুগের 'আধুনিক বাঙলা কথা-সাহিত্যের' পূর্বসারথি জগদীশ গুপ্ত আজ বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু অনেক কারণেই বাঙলা-সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রায় অন্তরালেই থাকতেন। তাঁর চিঠি-পত্র, কোনও রচনা বা জীবনী-তথ্যের কোনও সন্ধান যদি সাহিত্যানুরাগী কেউ দিতে পারেন, তবে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী রচনাবলী-সংখ্যায় স্বীকৃতিপ্রদান করে মুদ্রিত হবে। সঃ।

## ১। স্মৃতির বাঁধন

[ স্থান—জীর্ণ পাকাকোঠার একটা ঘর। ]

[ একটি বৃদ্ধ আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট ; ছোট একটি মেয়ে তার পাশে টুলের উপর বসিয়া আছে। ]

বালিকা।—তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ঠাকুর্দা।

বৃদ্ধ।—কি বল্‌লি, লক্ষ্মি ?

বালিকা।—( উচ্চতর কণ্ঠে )—তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।

বৃদ্ধ।—ওষুধ ? ওষুধ আর খাবো না, দিদি।

বালিকা।—( উঠিয়া বৃদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া )—কেন খাবে না ? খাবে, ঠাকুর্দা।
( উঠিয়া চামচে ঔষধ ঢালিয়া আনিল। )
—ঠাকুর্দা, হাঁ করো, ওষুধ এনেছি।

বৃদ্ধা।—টল্‌কে আমার গায়ে পড়ে না যেন দেখিস্‌।

বালিকা।—পড়বে না, তুমি হাঁ করো।

[ বৃদ্ধ হাঁ করিল, বালিকা তাহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া মুখ মুছিয়া দিল। ]

বৃদ্ধ।—বড় কটু ওষুধ রে। কেন আমায় ওষুধ খাওয়াস্‌, লক্ষ্মি ?

বালিকা।—তুমি সবল থাকবে বলে।

বৃদ্ধ।—তোকে যেন আমার মত ওষুধ খেয়ে সবল থাকতে না হয়, লক্ষ্মি।

বালিকা।—আমায় কি অল্প বয়সেই মরতে বলো, ঠাকুর্দা ?

বৃদ্ধ।—না, না, তা বলি নি। বহুদিন বেঁচে থাকিস্‌, কিন্তু আমার মত হয়ে ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকিস্‌ নে। বড় কষ্ট রে।

বালিকা।—কিসের কষ্ট, ঠাকুর্দা, তোমার ?

বৃদ্ধ।—বড় কষ্ট রে, লক্ষ্মি। সুখ নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে। মনেও পড়ে না, কবে সুখ ছিল। মনে করার চেষ্টাও বড় কষ্টকর। সব কথা ভুলে গেছি লক্ষ্মি, সুখের দিনের স্মৃতি অসাড় হয়ে গেছে।

বালিকা।—ও-কথা বলো না, ঠাকুর্দা। আমরা আছি তোমার ; তুমি আমাদের অহঙ্কারের জিনিষ।

বৃদ্ধ।—কিসে রে ?

বালিকা।—তুমি দেশের সকলের চাইতে প্রাচীন ; লোকে তোমায় কত সম্মান করে—

বৃদ্ধ।—এ কথাটা ঠিক বলেছিস্‌ তুই। আমি সকলের চাইতে বুড়ো, নয় ? গঙ্গা বুড়ো মরেছে আজ পাঁচ বছর ; সে ছিল আমার দু'বছরের বড় ; আমি তাকে ডিঙিয়ে গেছি। আমায় নিয়ে অহঙ্কার করে কে রে ?

বালিকা।—সবাই করে। বাবা—

বৃদ্ধ।—বাবাও করে ? তার অহঙ্কারের বিষয় কেবল আমার বয়স, আমি নই—

বালিকা।—তুমিও ঠাকুর্দা। তোমার সব কথা ত' আমি তাঁর মুখেই শুনেছি। তোমার কথা বলতে বলতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তোমার মত—

বৃদ্ধ।—তোর মা?

বালিকা।—সে-ও।

বৃদ্ধ।—তুই?

বালিকা।—আমিও, ঠাকুর্দা। আমি তোমায় কত ভালবাসি।

বৃদ্ধ।—ভালবাসিস? কিন্তু তোর মা আমায় কোনোদিন ভাল চোখে দেখে নি। আমি তা টের পেতাম, লক্ষ্মি। কিন্তু মুখ ফুটে আজ তোকেই বললাম। তুই বাইরে যা; আমার কাছে বসে থাকতে তোর ভাল লাগছে না, আমি তা বুঝতে পারছি।

বালিকা।—আমি কেঁদে ফেলবো, ঠাকুর্দা, যদি মিথ্যে দোষ দিয়ে তোমার কাছ থেকে আমায় তাড়াও।

বৃদ্ধ।—না, না, তবে বসে থাক। তোর বয়সে মানুষ যে বড় চঞ্চল হয়, তাই বলছিলাম। আজ দিনটা কেমন রে?

বালিকা।—বড় সুন্দর, রোদে ভরা।

বৃদ্ধ।—আর?

বালিকা।—দোয়েল একটা শিস দিচ্ছে। জানলা খুলে দেব?

বৃদ্ধ।—অনর্থক কেন কষ্ট করবি? দোয়েলের শিস ত' শুনতে পাবো না, আর আমার চোখে ত' চিররাত্রি। কিন্তু সুন্দর দিনের মাধুর্য আমি অনুভব করছি। কেমন করে, বল ত?

বালিকা।—তা ত' আমি জানি নে, ঠাকুর্দা।

বৃদ্ধ।—জানিস নে? তুই আমার কাছে রয়েছিস বলে। তোর গলার সুরে যে সুন্দরের সুধার স্রোত বইছে। বাগানে ফুল ফুটেছে?

বালিকা।—ফুটেছে, অনেক ফুল।

বৃদ্ধ।—জানিস, লক্ষ্মি, আমি কবিতা লিখতাম?

বালিকা।—তুমি, ঠাকুর্দা?

বৃদ্ধ।—হাঁ। আমি কি চিরকালই—?

( অন্যমনস্ক হইয়া গেল )

বালিকা।—কি ভাবছো, ঠাকুর্দা?

বৃদ্ধ। স্মৃতি সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, লক্ষ্মি। কিন্তু একটা জিনিষ ঠিক আজকের মত স্পষ্ট। দেওয়া-পাওয়ার সব ইতিহাস অন্ধকারে সূত্র হারিয়ে দুর্বল হয়ে অতলে নেমে গেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলি নি, লক্ষ্মি।

বালিকা।—কি কথা, ঠাকুর্দা?

বৃদ্ধ।—ঐ কবিতার কথা। আমি কবিতা লিখতাম। বাগানে ফুল ফুটেছে?

বালিকা।—ফুটেছে, বললাম ত'।

বৃদ্ধ। কতদিন বাগানে বেড়াই নে। চাঁদের আলোয় আমরা বাগানের দিকে চেয়ে থাকতাম —সেখানে আমাদের মনে মনে স্পর্শ হত।

বালিকা।—তোমরা কে কে, ঠাকুর্দা? তুমি আর—

বৃদ্ধ।—আমার কবিতার খাতাখানা আনতে পারিস?

বালিকা।—কোথায় আছে?

বৃদ্ধ।—তোর মা কি তাকে রেখেছে? ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বুঝি।

বালিকা।—কোথায় ছিল বলো, আমি দেখে আসি।

বৃদ্ধ।—আমার কাঠের সিন্দুকটাতে সব জিনিষের নীচে রেখেছিলাম। পারবি তা আনতে ?

[ বালিকা চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ বাদেই খবরের কাগজের বিবর্ণ মলাট দে'য়া একখানা খাতা লইয়া আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ চেয়ারের উপর খাড়া হইয়া বসিয়া হাঁপাইতেছে। ]

বালিকা।—তুমি উঠে বসেছ যে, ঠাকুর্দা ? হাঁপাচ্ছ যে ?

বৃদ্ধ।—তুই যে আমার খাতা আনতে গেলি।

বালিকা।—( সবিস্ময়ে )—এনেছি ত'!

বৃদ্ধ। এনেছিস ? দে, আমার হাতে দে।

[ হাতে লইয়া বৃদ্ধ খাতাখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, তাহার জীর্ণ আঙুলগুলি কাঁপিতে লাগিল। ]

বালিকা।—ঠাকুর্দা, তোমার হাত কাঁপছে কেন ?

বৃদ্ধ।—লক্ষ্মি ?

বালিকা।—কি, ঠাকুর্দ্দা ?

বৃদ্ধ।—সব গেছে, কেবল ব্যথাই অমর হয়ে আছে।

বালিকা।—কিসের ব্যথা তোমার ?

বৃদ্ধ।—যতদিন চোখে দৃষ্টি ছিল, ততদিন এই খাতাখানিকে সামনে রেখে পুজো করেছি, আমার সর্বনাশের ইতিহাস বুকের রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছি। হাঁ, সর্বনাশই বটে—জীবনের সূর্য অস্তে যাবার নাম সর্বনাশই বটে, চোখের তারা-রত্ন জন্মের মত হারিয়ে যাবার নাম সর্বনাশই বটে। তবু, মাঝে মাঝে আমি সুখের ঘোরে নিস্পন্দ হয়ে যেতাম, ফুলের উপর প্রজাপতি নিস্পন্দ হয়ে থাকে।

বালিকা।—ঠাকুর্দা— ?

বৃদ্ধ।—পড় ত', লক্ষ্মি, গোড়া থেকে।

বালিকা।—দাও।

[ বালিকা খাতা হাতে লইয়া খুলিবার মত করিয়া ধরিতেই একটি বিশেষ স্থান খুলিয়া গেল। ]

বালিকা।—ঠাকুর্দা, বোঁটাশুদ্ধ একটা ফুল রয়েছে।

বৃদ্ধ।—( উত্তেজিতভাবে )—ফুল আছে ? ফুল আছে ? এখনো আছে ?

বালিকা।—আছে, ঠাকুর্দা।

বৃদ্ধ !—ফেলিস নে। একেবারে শুকিয়ে গেছে, না ?

বালিকা।—হাঁ, চেনা যায় না, কি ফুল ; রং নেই।

বৃদ্ধ।—ঠিক তার মত।

বালিকা।—কার মত ?

বৃদ্ধ। যার ফুল। লক্ষ্মি, দে ত' ফুলটা আমার হাতে। না, থাক। শুকিয়ে গেছে, ছুঁলেই গুঁড়ো হয়ে যাবে। তার শেষদান। ঐ ফুলের দলে তার প্রাণ, তার বিদায়ের ব্যথা ঢালা আছে—

বালিকা।—ঠাকুর্দা, কার কথা বলছো ? ঠাকুমার কথা ?

বৃদ্ধ।—( চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া )—না, না, তার কথা নয় ; যার কথা, সে তোর ঠাকুমা নয়। আমায় একটু জল দে, লক্ষ্মি।*

## ২। অদ্ভুত জীব

আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন মনে হয়,
বিছানাতে নাইকো কেহ শুয়ে,
নাকটা কেবল ডেকে ডেকে করছে আয়ু ক্ষয়—
দেহটাকে নিচ্ছে যেন দুয়ে।
লোকে বলে, কাহার নাক এ ?
এ নাকটাকে রাখিল গো কে
চাদর চাপা দিয়ে
এখানে শুইয়ে ?

আমি যখন হাওয়া খাই নেড়ে তালের পাখা
লোকে বলে, এই রে, বুঝি ছেঁড়ে—
বাতাস লেগে ! কাড়ো পাখা ; দাও মশারি ঢাকা—
আস্ত রাখার উপায় সেটা বেড়ে।
নিজেরে শেষ করবে ধুনে·········
মানুষ হলে হত খুনে।
বলে ওরা সবে
মাতে কলরবে !

আমি যখন হেঁটে বেড়াই তখন মনে হয়,
কেমন করে নামল এটা ভূঁয়ে ?
হাওয়া থেকে নামতে এটার হল না কি ভয় ?
কোথাও নিয়ে আলগোছে দাও রুয়ে।
লোকে বলে, কার চামড়া
কে দিয়েছে এমন জোড়া
সেলাই করে করে ?
খাঁচায় রাখো ভরে।

আমি যখন বাজারে যাই তখন লোকে ভাবে,
ছায়ার আবার খাদ্যে প্রয়োজন ?
কোন্ পথে তা প্রবেশ করে কোথায় দাঁড়াবে ?
কেমন করে বইবে ভাতের ওজন ?
লোকে বলে, কাহার ভূত এ ?

* ইংরেজি হইতে।

কেমন করে পারব ছুঁতে ?
ঘরেই যদি আসে !
মরছি তরাসে ।

আমি যখন টিকিট চাই, রেলে চাপ্‌ব বলে
টিকিটবাবু বলেন, আরে, আরে…
টিকিটের কি প্রয়োজন ? অমনি যান চলে—
বসবেন না জানলাগুলোর ধারে—
হাওয়ায় উড়ে বেরিয়ে যাবেন,
বেরিয়ে যাবে, থামবে না ট্রেন ;
চাপে একটু পড়লে
যেতেও পারেন গলে ।

আমি যখন রিক্সায় উঠি, রিক্সা চলে উড়ে,
মাটি ছেড়ে খানিক উঠে ছোটে ;
রিক্সা আসে এক মিনিটে দু'টি মাইল ঘুরে—
রিক্সাঅলা টের পায় না মোটে ;
ভাবে, বুঝি খালি গাড়িই টানি
কে বসে তা কিচ্ছু নাহি জানি !
নিয়ে হালকা গাড়ি
দিলাম বাতাস পাড়ি ।

আমি যখন গান ধরে দি তখন মনে হয়,
বিনামেঘে বাজ ডাকিছে বুঝি !
ঘরের পানে ছোটে মানুষ পেয়ে বেজায় ভয় —
চারিদিকে তাকায় দৈত্যে খুঁজি ।
আকাশ থেকে কোন্ দেবতা
এমন নাদে কইছে কথা ?
যন্ত্র নিরাকার
কাহার আবিষ্কার ?

কাজেই আমি ভালই আছি, নাইকো আমি কোথাও,
খাইনে কিছু, নেইনে কিছু চেয়ে—
পাইনে কিছু, দিইনে কিছু, চাইনে মারতে দাঁও,
সইনে জ্বালা ক্ষিদে তেষ্টা পেয়ে ;
কেবল আমার আছে অহঙ্কার
নামিয়ে দিচ্ছি সব জিনিসের ভার—
দ্রব্য গুরুপাক—
তাইতে ডাকে নাক ।

## ৩। পত্রগুচ্ছ

জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী

**( কালি-কলম সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখিত )**

॥ ১ ॥

কুষ্ঠিয়া
১৯।৩।২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি। "তৃষিত আত্মা" গল্পটি আপনাদের পছন্দ হয় নাই জানিয়া আমি দুঃখিত হই নাই। তবে আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে দু'একটি কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি; আশা করি, ইহাকে আমার নিজের পক্ষসমর্থন মনে করিবেন না।

পরকীয়া প্রেম, বস্তির দুঃখ, পতিতা ও নির্যাতিতা নারী—আজকাল আমাদের গল্প-সাহিত্যের বিষয়-বস্তু এইগুলিই প্রায়। Humorons গল্প বা uncanny গল্পের একান্ত অভাব। ঐ পরকীয়া প্রভৃতিকে লিখনভঙ্গির দ্বারা যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য দেওয়া হয়। কিন্তু, ইংরেজ যে কোনো গল্পের পত্রিকা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, তাহার মধ্যে humour আছে, uncanny আছে, race, detective, mystery, sea, war, navy, airship ইত্যাদি কতরকম যে আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর, তাদের আর একটি কায়দা আছে—সম্পাদক স্বয়ং গল্প নির্বাচন করেন বটে, কিন্তু প্রায়ই পুরস্কার ঘোষণা করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে একটি অভিমত সংগ্রহ করিয়া কোন্ শ্রেণীর গল্প পাঠক পছন্দ করে, তাহা জানিয়া লন। বিভিন্ন রুচির পাঠকের নিকট হইতে মতামত আসে—সম্পাদক সেই অনুসারে গল্প নির্বাচন করেন। তাঁহারা জানেন যে, পাঠকের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া চালাইতে পারিলেই কাগজ নির্বিবাদে চলে, নতুবা শুধু নিজেদের ভালমন্দ লাগার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। তাহাতে বিচার নির্ভুল হইলেও সর্ব-শ্রেণীর পাঠকের তুষ্টিসাধন নাও হইতে পারে। কারণ, রুচি বিভিন্ন। পরকীয়া যতই royal হোক, বস্তিকে যতই আলোড়িত করিয়া তাহার ক্লেশমোচনের চেষ্টা হোক, পতিতার আত্মমর্যাদা ও একনিষ্ঠার সম্ভাবনা যতই লিখিত হোক এবং নির্যাতিতা যতই নির্যাতিতা হোক—সবই মানুষের ঐ চিরন্তন সুখদুঃখের কথা। তাই যদি হয়, তবে ভূতজগৎ হইতে আগত সুখদুঃখের কথাটাই বা বলিব না কেন! আমি ভালো লিখিতে পারি নাই স্বীকার করি, কিন্তু আখ্যানবস্তু ভালো নয়, ইহা আমি স্বীকার করি না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ শ্রেণীর গল্প চায়, এমন পাঠক আছে বলিয়া আমার জানা আছে।

একটা কাজ করিলে আপনাদের কাগজের পক্ষে বোধ করি সুবিধা হয়। কোনো কোনো মাসিক-পত্রিকা মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা করিয়া থাকে। কালি-কলমের লেখা-গুলির সমালোচনা করাইয়া অনুকূল সমালোচনাগুলির "কপি" সেই সেই লেখকের কাছে পাঠাইলে লেখককে যারপরনাই সন্তুষ্ট করা হইবে। গল্পলেখকেরা এখানে অনাদৃত, একটু যত্ন লইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়। আশা করি, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

আমি আপনাদের হিতার্থী, ইহা বিশ্বাস করিয়া আমার কথার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

মা বড় পীড়িতা ; যে-কোন মুহূর্তে কথা বলিতে বলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটিতে পারে, ইহা কবিরাজ বলিয়া গেছেন। কাজেই দ্বিতীয় একটি গল্প এখনই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারিলাম না।

গল্পটি চিঠির সংগে কাল পাই নাই, আজও পাইলাম না।

নিবেদন ইতি—
—বিনীত—
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

পুঃ নিঃ—চৈত্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার "দিবসের শেষে" গল্পটি বোধ হয় পড়িয়াছেন এবং আশা করি, গল্পটি আপনাদের ভালো লাগিয়াছে।

॥ ২ ॥

কুষ্ঠিয়া
২৪।৩।২৬

সবিনয় নিবেদন,

আশা করি, আমার পূর্বপত্র পাইয়াছেন।

"তৃষিত আত্মা" গল্পটি আমার কাছে আসে নাই। গোলমালে বোধ হয় Book-Post খোয়া গেছে।

আমার অভ্যাস এই যে, আমি কাঁচা লিখিয়ে বলিয়া গল্প ফেরৎ পাইলে আমি তাদের অক্ষম স্থানগুলি সাধ্যমত খুঁজিয়া গল্পটি পুনর্বার লিখি। "তৃষিত আত্মা" গল্পটিও পুনর্বার সংশোধন করিয়া লিখিয়া অন্য পত্রিকায় দিলাম। সেখান হইতেও নিশ্চয়ই সেটা ফেরৎ আসিবে, এবং তখন আবার ঝালাইব।

আশা করি, "কালি-কলম" প্রেসে গেছে।

মা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

আপনাদের কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

নিঃ শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

॥ ৩ ॥

মেগচামী ( ফরিদপুর )
১১ই শ্রাবণ, '৩৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছি।—গল্পটি (১) আপনাদের ভাল লাগিয়াছে, ইহা আমার পক্ষে সুখের কথা।······

"কালি-কলম" দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই মনে হয়। আর আপনাদের তিনজনের কথা মনে করিয়া আমার বড় লোভ হয়—বেশ আছেন তিনটিতে। আমি বড় সুখে নাই।

এখানে আর দিন কুড়ি আছি, তারপর স্বস্থানে যাইব। এখানে যেন বন্দীর মত আছি, তবে হৈ-রৈ একটু আছে।

আমার কথা আপনাদের পরিচিত কে জানেন জানি না, তবে সুবোধ রায় জানিতে পারেন।—আমার বয়স আপনাদের-ই রকম, তবে কম-বেশী যা তা ঐ বছর-নয়েকের। খুব বেশী কি ?

একটা গল্প লিখিয়াছি। (২) চরিত্রসৃষ্টি আছে, একেবারে খোলাখুলিভাবে, কাজেই মনে হয়, আপনারা তা গ্রহণ করিবেন না ; গল্পটি বড়—হাতে লেখা ৩০ পৃষ্ঠার উপর হইবে। Fair করা শেষ হইলেই দেখিবার জন্য পাঠাইব।—কিন্তু গাল না খাইলে, নাম বাহির হয় না ; গাল খাইতে ইচ্ছা করে।......

ভবদীয়

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

[ (ক) 'কালি-কলমে' জগদীশ গুপ্তর প্রথম গল্প বার হয় ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে, তৃতীয় সংখ্যায়—গল্পটির নাম 'পুরাতন ভৃত্য'।

(২) 'জহর'। ১ম বর্ষের 'কালি-কলমে' ষষ্ঠ সংখ্যায় আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। ]

॥ ৪ ॥

কুষ্ঠিয়া

প্রীতিভাজনেষু— ৩।৯।২৬

কাল একটা গল্প (১) পাঠাইয়াছি। পাইয়াছেন বোধ হয়।

কাল রাত্রে ছোট একখানি ছবি আঁকিয়াছি। আজই সেটা আপনাদের কাছে পাঠাইলাম। "বুড়োর সুখ" এর সঙ্গে এটাকে (২) জুড়িয়া দিলে মোটা দেখাইবে—অবশ্য যদি এটাকে জুৎসই মনে হয়।

আপনারা এ কি কাণ্ড করিতেছেন বলুন ত! আপনারা জনপাঁচেক ওখানে, আর আমি এখানে—এই পাঁচ-সাতটি লোকের লেখাই প্রতি মাসে বাহির হইবে। লোকে বলিবে যে, উহারা কালি-কলমের দল সাজাইয়াছে—বাহিরের লোকের সেখানে "প্রবেশ নিষেধ।" আবার, ঈর্ষাপরায়ণ লোকের কুৎসা রটাইবার আশঙ্কাও আছে, মানে কাগজে-কলমে বিরুদ্ধ সমালোচনা। তবে, একটা কথা ঠিক জানি না—পাঠকের রুচি এবং চাহিদাকে যদি সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকেন, তবে বাহিরের সহায়তা না পাইলেও চলিবে। "কালি-কলমের দল" বলিয়া একটা কথা আগেই উঠিয়াছে। তা উঠুক, কিন্তু লোকে আপনাদের লেখা এখন চাহিলেও কতদিন সে রুচি তার থাকিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সাহিত্য-পত্রিকার এইটুকু বৈচিত্র্যই যথেষ্ট নহে যে, একই লেখক নূতন নূতন কথা লিখিতেছেন। তাহার এই নতুনত্ব পাঠকের কাছে ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া আসে—সুতরাং, আপনারা আরো লেখককে হাত করুন। নির্বাচনের বিড়ম্বনা তাহাতে আছে, কিন্তু সেটুকু এড়াইয়া বোধ হয়, এখনও চলিতে পারিতেছেন না।—উত্তম লেখার জন্য পুরস্কারঘোষণা করা কি আপনাদের পক্ষে অসম্ভব ?

আশা করি, এই বাচাল কথার জন্য বিরক্ত হন নাই।......

বিনীত

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

[ (১) 'বুড়োর সুখ'। প্রথম বর্ষের কালি-কলমের ১১ সংখ্যায় ফাল্গুন মাসে ছাপা হয়েছিল।

(২) 'ভরা সুখে' নামে কালি-কলমে তাঁর দ্বিতীয় গল্প, ১৩৩৩ সালের ভাদ্রে প্রকাশিত হয়। ]

॥ ৫ ॥

কুষ্ঠিয়া
৫ই আশ্বিন '৩৩।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ইং ১৬ তারিখের পত্র পাইয়াছি।......

'যৌবনযজ্ঞের কবি G. G.-র ইংরেজি হইতে লেখা।' কিন্তু, দুটি লেখার কোথাও মিল নাই।—একটি লেখা পড়িতে পড়িতে মনের পাশ দিয়া দ্বিতীয় যে একটির অস্পষ্ট সূক্ষ্মসৃষ্টি চলিতে থাকে, আমারটা তা-ই।

বিদেশী উপন্যাস, নাটক, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বড় বড় রচনার অনুবাদ সরাসরি হওয়াই উচিত। কিন্তু, বিদেশী চুট্‌কি লেখার, অর্থাৎ ছোট গল্প, কবিতা, প্রহসনের কেন্দ্রগত ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া তার শিল্পী-অবয়বে শিল্পী-রস ঢালিয়া দেওয়া মন্দ নহে। তাহাতে লেখকের সৃষ্টির উল্লাসটা অব্যাহত থাকে, কৃত্রিমতা আসিতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র রচনাকে সমগ্রভাবে ওলট্‌পালট্ করিয়া তাহার বিদেশী রংটা মুছিয়া যদি শিল্পী-আকারে গড়িয়া তোলা যায়, তবে রচনাকুলের রস হারাইলেও নিজস্ব রসে ভরপুর হইয়া ওঠে—শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টা তাহাতে গতিশীল সতেজ হইয়া শক্তির একটা পরিচয় পায়। কিন্তু সরাসরি অনুবাদে এটা ঘটে বলিয়া মনে হয় না।

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "তীর্থ-সলিল" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"একই কালে অনুবাদও মৌলিক রচনা।"—কথাটি বেশ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন—তাঁহার একটি গল্পের সঙ্গে ওয়াশিংটন আর্ভিং এর একটি গল্পের সাদৃশ্য যে, দুটিকে যমজ-ভাই বলিলেও চলে।......

জলধর সেন না বলিয়া মোপাসাঁকে শিল্পীছাঁচে ঢালিয়াছেন; আবার, সেই গল্পটাই কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত মাসিক বসুমতীতে ঋণ-স্বীকার করিয়া ছাপিয়েছেন।···অমৃতলাল বসুর চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে ইংরেজি বক্স এ্যাণ্ড কক্স-এর দ্বিতীয় মূর্তি। ছোট কবিতার ত' সংখ্যাই নাই—স্বীকৃত ও অস্বীকৃত ঋণ বহু। কিন্তু সে কবিতাগুলিও ত' বেশ লাগে।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রণালীতে বিদেশী ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে শিল্পী-মানুষের রসপিপাসু মন তৃপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে গুণ, গরিমা নিশ্চয়ই আছে, রসটা অখণ্ডভাবেই হয়তো কেহ কেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু, আমাদের অরসিক সাধারণ মন তাহাতে খুশী হইয়া উঠিতে পারে নাই; হইতে পারে, সেটা আমাদেরই অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা, কিন্তু সেই অক্ষমতাকে উপেক্ষা করিয়া রসসৃষ্টির সম্পূর্ণ সার্থকতা কোথায়, তাহাও ভাল করিয়া বুঝি না।—

চারুবাবুর 'চোরকাঁটা' অলিভার টুইষ্টের 'কপি'—জমে নাই; হরপ্রসাদ বন্দ্যোর 'মায়ের প্রাণ' ঈস্ট্‌লাইটের 'কপি'—জমে নাই; ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের "ম্যাকবেথ"

জমিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঐ 'কপি'গুলিও দিব্য জমাট্।...সুতরাং, ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

আমার ঐ গল্পটির মূল লেখক G. G. নামে পরিচিত নন্—ওটা তাঁর initial, শুধু "ইংরেজি হইতে", "মূল ফরাসী হইতে" লিখিয়া দিলেই যদি আইন বাঁচাইয়া কাজ করা হয়, তবে আর একধাপ উঠিয়া initial দিলেও কাজ চলিবে বোধ হয়।

আমি বাজি জিতিয়াছি।—

আমার স্ত্রী একদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—তুমি অতিশয় অকর্মা মানুষ।

পাঁচ বছর বেকার বসিয়া আছি কিনা, তাই।

আমি বলিয়াছিলাম,—অকর্মা মানুষ আমি? অমুক করেছি, তমুক করেছি, এ করেছি, ও করেছি, সাত করেছি, পাঁচ করেছি···

—ছাই করেছ।—বলিয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—লেখ দেখি এম্নিধারা গল্প!—

হাতে তখন তাঁর ছোটগল্পের বই একখানা ছিল।

—বেশ, নিও তুমি গল্প, গল্পই দেব।

বেকার অবস্থায় পাঁচটি বছর জলের মত কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু গল্প লিখিবার উদ্যোগপর্বেই সময় দুর্বহ হইয়া উঠিল।···কিছুই মনে আসে না।···

দিনদুই প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একটি গল্প লিখিলাম, সে গল্প ঐ "জহর"; উহার প্রথম নাম ছিল, "হরপ্রিয়া", তারপর "উল্টো হাওয়া" ইত্যাদি। ঐ গল্পটি আমার প্রথম লেখা।

স্ত্রী গল্প পড়িয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি অকর্মা ত' বটেই, উপরন্তু, প্রথম শ্রেণীর লম্পট!

সে যাই হোক, গল্প ছাপাইতে হইবে, সেই কাজে লাগিয়া গেলাম, এবং দমাদম ফেরৎ আসিতে লাগিল। স্ত্রী হাসিয়া আকুল।···

ইতিমধ্যে দুচারটা গল্প কোনো কোনো কাগজে ছাপা হইয়া গেল। কিন্তু, মুস্কিল বাধিল ঐ "জহর" লইয়া। কতবার যে উহাকে নকল করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই—তবু, রোখটা আমার যায় নাই।···

হঠাৎ আপনারা দয়া করিলেন। "জহর"[১] আপনাদের পাদপদ্মের মাহাত্ম্যে উদ্ধার হইল।··

স্ত্রী বলিলেন,—কিন্তু, এত যে খরচ করিলে সেটা উঠিল কৈ?···

ভগবানের কৃপায় 'প্রবাসী' দুটি গল্পের জন্য ১৪ টাকা ৫০ পয়সা দিল, আমি বাজি জিতিলাম।

এখন, Ink Manufacture-এর কাজটা পুনরুজ্জীবিত করিব, স্থির করিয়াছি। "Jago's Ink."

সুতরাং, 'কালি-কলমে'র লেখক হিসাবে যদি আমার সাক্ষাৎ আর না পান, তবে আমাকে অপরাধী করিবেন না—ইহাই আমার সর্বান্তঃকরণের অনুরোধ।

কালি-কলমের এবং আপনাদের কুশল ও উন্নতি কামনা করি। আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

নিঃ ইতি ভবদীয়

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

পুঃ নিঃ—পরেও যদি কোনো কাগজে আমার লেখা দেখেন, তবে জানিবেন, সে লেখা পূর্বেকার দাখিলী জিনিষ।

( ১। গল্পটি ১৩৩৩ সালে কালি-কলমে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত। )

॥ ৬ ॥

কুষ্ঠিয়া
১লা অক্টোবর, '২৬

প্রীতিভাজনেষু,

আমার পূর্বপত্র বোধ হয় পাইয়াছেন। কি মনে করিতেছেন, জানি না।

একটা গল্প লিখিয়াছি। আপনাদের কাছে পাঠাইতে চাই। পছন্দ হইলে, প্রয়োজনে লাগিবে বলিয়া যদি মনে করেন, তবে শীঘ্রই আমাকে জানাইবেন।…

'বঙ্গবাণী'র ভাদ্রসংখ্যায় "তৃষিত আত্মা"র সমালোচনা পড়িয়াছেন? নির্ভুল কথা-গুলি বেশ মনোরমভাবে লেখা আছে।

"জহর" সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হইলে, দয়া করিয়া জানাইবেন।…

প্রীতিপ্রার্থী
জগদীশ

॥ ৭ ॥

কুষ্ঠিয়া
৯, ১০, ২৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি।

গল্পটি* পড়িয়া আপনার মনে কি কথা আসিতেছিল, জানিবার জন্য উৎসুক আছি। গল্পটিতে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা অনেকেই বুঝিবে না। ঐ গ্রাম্য কথাগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকমের; সহরের লোকে এবং স্থানবিশেষের লোকে কথাগুলি বুঝিবে না, কিন্তু নিরুপায়। সর্বজনবোধ্য কোনো শব্দের ব্যবহার নাই। সুতরাং, আমাকে উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

শৈলজাবাবুরা ভুগিতেছেন শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছি। কলিকাতায় থাকিয়াও আপনারা অত ভোগেন কেন, বুঝিতে পারি না। তবে বাসা যদি ভাড়াটে বাসা হয়, তবে খুব সাবধানে দেখিয়া শুনিয়া বাসাটি লওয়া দরকার। যক্ষ্মার বীজ পর্যন্ত আমাদের বাড়ীর মধ্যেই থাকে।

আমি দু'তিন দিনের মধ্যে স্থানান্তরে যাইব ইচ্ছা আছে; কোনো পল্লীগ্রামে। অগ্রহায়ণ মাসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

…সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি। "ভাত-কাপড়ের কথা নাই, লাথি মারিবার গোঁসাই।"— পয়সা একটা কেউ দেবে না, অথচ গাল দেবার বেলায় সবাই আছেন।—একটা গল্পও দিয়াছি, লইয়াছে।

জগদীশ

( *প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী। ১৩৩৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কালি-কলমে প্রকাশিত। )

॥ ৮ ॥

কুষ্ঠিয়া
লক্ষ্মী-পূর্ণিমা

প্রীতিভাজনেষু,

বিজয়ার সপ্রীতি প্রতিনমস্কার গ্রহণ করুন।···

লোকের মুখে আমার লেখার প্রশংসা শুনিয়া আপনার বিদেশভ্রমণের আনন্দ বাড়িতেছে শুনিয়া যথার্থই তৃপ্ত হইয়াছি। আনন্দ দেওয়া আর পাওয়া ছাড়া লেখার আর কোনো সার্থকতার আমি প্রত্যাশা করি না।—যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া লিখিতে বসেন, তাঁহারা ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, কিন্তু আমাদের সাময়িক একটু আনন্দই হয় লাভ।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি।

মহেন্দ্রবাবুকে* আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবেন। ইতি

জগদীশ

( *সুলেখক শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় )

॥ ৯ ॥

কুষ্ঠিয়া,
৩রা অগ্রহায়ণ, '৩৩

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার দু'খানা পত্রই পাইয়াছি। লেখা দেওয়া বিষয়ে আপনার উপদেশ-অনুসারেই বলিব। কিন্তু, প্রাপ্তি বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি অভাবে কাহারাও অচল হইয়া থাকিবে না।

যে বইখানা আপনাকে পড়িতে দিয়াছি, ওখানা ঠিক নাটক নয়,—কি যে তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

ঐ স্বপ্নের গল্পটা ছাড়া আরও একটি গল্প লিখিয়াছি। আপনার কাজের ভার একটু হাল্কা হইয়াছে যখন মনে হইবে, তখন পাঠাইব। গল্পটি ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।···

উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।

Remizov-এর কিছু অনুবাদ শীঘ্র পাঠাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।

নেহাৎ অতুলবাবুর[1] প্রবন্ধ[2] না পান, তবে গল্প দিয়া পূর্ণ করিয়া দেওয়া বোধ করি বেখাপ হয় না।···

আপনাদের বড় মধুর আবহাওয়া—মন শুধু সেইদিকেই ছোটে।···

ইতি

মুগ্ধ শ্রীজগদীশ

(১) অতুলচন্দ্র গুপ্ত (২) কামিনী

॥ ১০ ॥

কুষ্ঠিয়া
২০শে নভেম্বর, '২৬

প্রিয় মুরলীবাবু,

কাল যে গল্পটির কথা লিখিয়াছি, সে এইটে। রবিবারে পড়িবার একটু সময় পাইবেন মনে করিয়া আজই পাঠাইলাম—দুটির একটি রাখিয়া একটি বদলাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। "দক্ষিণা" কেহ দিবে বলিয়া মনে হয়? ··

ফটো তুলিয়াছি। ইতি—

আপনাদের
জঃ

॥ ১১ ॥

কুষ্ঠিয়া
২৪।১১।২৬

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি।

কোনো পত্রিকায় গল্প যাচিয়া দিবার দরকার নাই, সে চেষ্টা করিবেন না।··· গল্প দিয়া প্রাপ্তিসংবাদ পাইতেই তিন মাস যায়। বছরে তাহাতে ৪টা গল্প ছাপা হওয়া অসম্ভব।···আরো কুলীন। সুতরাং, প্রচারের জন্য ঐ দুই পত্রিকা প্রশস্ত হইলেও উহাদের অবকাশ কম। আমরা ছোট, ছোটর হাত ধরিয়াই চলিব।

আমারই দুই গল্প[১] একেবারে? লোকে নিশ্চয়ই হাসিবে। গল্পের এই দুর্ভিক্ষ, তবু শৈলজাবাবুরও দর নাই!!

গুরুর কেচ্ছা কি লিখিব? মনে কিছু আসে না, নিজের জানাশোনার মধ্যে যা ঘটিয়াছে তা "লীলাময়ে"[২] চূড়ান্ত করিয়া লেখা হইয়াছে।

আর একটি গল্প লিখিয়াছি—একটু বড়। পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দিব।

প্রবাসী পূর্ববৎ নীরব—ভারতীও তাই। সরলা দেবীকে চিঠি দিলাম।

শৈলজাবাবুর গল্প আসিয়াছে?

অল্প জ্বর হইয়াছে।···

জগদীশ

১) "প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' ও "স্বপ্ন যখন হঠাৎ সত্য হয়"

২) ১৩৩২ সালে সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত কথা-নাট্য।

॥ ১২ ॥

কুষ্ঠিয়া
১।১২।২৬

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কয়েকদিন অল্প অল্প জ্বর হইয়া পর্যন্ত ভয়ঙ্কর জ্বর আসিয়াছিল। সেইজনাই উত্তর দিতে দেরী হইল। বড়ই দুর্বল।

'নিঠুর গরজী', কোথাও গরজ দেখাইয়া দিতে যাওয়া ঠিক নয়। আপনাদেরই কাজে লাগাইয়া দিবেন, যদি ভাল হইয়াছে মনে হয়। যাহা লিখিয়া আপনাদের কাছে পাঠাই,

তাহা সর্বপ্রথম আপনাদের জন্যই—উদ্বৃত্ত বা আপনাদের অপছন্দ যাহা হইবে তাহাই এদিক ওদিক চালাইবার জন্য।

'ভারতী' এইমাত্র পাইলাম। পাতা উল্টাইয়া গিয়াছি, পড়ি নাই।

'কালি-কলম' বোধ করি পর্শু পাইব। দেখিবার জন্য হাঁ করিয়া আছি।

নৃপেনবাবুর[2] কষ্টের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইয়াছি। এ-পথে পা দেওয়া যেন পাপের মত, শাস্তিভোগ করিতেই হয়।…

নূতন গল্পের নাম দিয়াছি "অরূপের রাগ"। দুই-এক পাতা copy করিতে বাকি আছে। হইলেই পাঠাইব। আর একটার লাইন তিন লিখিয়াছি, এমন সময় জ্বর আসিল।

জগদীশ

১) ১৩৩৩ সালে পৌষ মাসে কালি-কলমে প্রকাশিত।

২) শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

॥ ১৩ ॥

কুষ্ঠিয়া
৩রা পৌষ, '৩৩

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম। বহুদিন পরে কাল চারটি ভাত খাইয়াছি। কিন্তু, এবারকার জ্বরে একেবারে জখম করিয়া রাখিয়া গেছে।…

আপনি কুষ্ঠিয়া আসিবেন সংবাদে সুখী হইয়াছি। কিন্তু, আমাকে বোধ হয়, বড় জোর বসিয়া গল্প করিতে হইবে—বেড়াইতে পারিব না।

শ্রীর দিক দিয়া কালি-কলমের উন্নতির খবরে যথার্থই সুখী হইয়াছি। কেদারবাবু লেখা[1] দিয়াছেন শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছি।…

…ব্যবহারের নালিশ শুনিবে, এখন কেহ এ দেশে নাই বলিয়াই মনে হয়।…

…কাছে টাকা চাহিয়াছি।—৩টি জিনিষ দিতে পারেন! প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠীর Original-টা, উত্তরায় প্রকাশিত আমার গল্পটা, আর V. P.-র সঙ্গে যে appeal আপনারা পাঠান, তার এক কপি।…

ধূর্জটিবাবু[2] কল্লোলে লিখিয়াছিলেন, কালি-কলমের humour নাই, এবার সে অপবাদ যাইবে।

প্রবাসীকে তাগিদ দিলাম।

'নিঠুর গরজী'র শেষটা "সে ত বি-বি-বি বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল"—দিলে কেমন হয়?… ইতি

জঃ

( ১ কবুলতি—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। )

॥ ১৪ ॥

২৩ ডি, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

মুরলীবাবু, ৭।১।২৭

আলোচনাধীন গল্পটি কাল আসিয়া দু'বার পড়িয়াছি।—এইবার আপনার সঙ্গে আমার যথার্থ মতানৈক্য ঘটিল। গল্পটি আদৌ stale হয় নাই।—প্রেম নয়, ত্যাগ নয়, শুধু, সুবর্ণের লোভের ভিতর দিয়া, সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, ব্যক্তি যতটা সম্ভব ফুটিতে পারে, তাহা ফুটিয়াছে। ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটনা এবং তাহার পরিণতিকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া যায়, তবে গল্প হিসাবে খুব দোষের হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। —আপনারা যাহাকে "বিস্বাদ" বলিতেছেন, সেটা গল্পের "বিস্তৃতি"। অনুভূতির দ্বারা গল্পের গতির অনুসরণে যে আনন্দ, ঘটনা-প্রধান গল্পে তাহাই স্বাভাবিক, কিন্তু স্বল্পতাকেই আপনারা Flatness বলিতেছেন। কিন্তু, গল্পটি শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিণতির মধ্যে ভিতরের স্বাভাবিক রস অসম্পূর্ণতা আপনি রসপ্রাচুর্যে ও সমগ্রতার উপলব্ধিতে পূর্ণতালাভ করে—এটা আমার ধারণা। নির্বোধ গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতাটাই অত্যন্ত করুণ এবং তাহার পরিণতিও করুণ।—দারিদ্র্যের একটি জীবনেতিহাস সুলিখিত হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মতের গরমিল আমার ও আপনার মধ্যে; ৩য় পক্ষ পাঠক; শৈলজাবাবু ও প্রেমেনবাবু এখন ৩য় পক্ষের মধ্যেই। আপনি ঠিক কি, গল্পটি ছাপাইয়া তাহারই একটা বিচার হউক না। আমার মতটা একটিবারের জন্য, আমার ও আপনার অতীত হইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কষ্টিপাথরে ফেলিবার অবসর দিল না। ৪টির ভিতর একটি গল্প যদি একটু up to the standard না হয়, তবে এমনই কি ক্ষতি!…আশা করি ও প্রার্থনা করি, প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবেন।

শরীর ভাল নাই। কাল সিউড়ী যাইব। পত্র দিবেন। কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

জগদীশ গুপ্ত

॥ ১৫ ॥

২৩ ডি, হেমচন্দ্র স্ট্রীট
খিদিরপুর, কলিকাতা

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার নির্দেশমত গল্পটির আবেদন করিয়াছি, কোথাও ছাঁটিয়া দিয়াছি, কোথাও বাড়াইয়াছি, আশা করি, এইবার আপনি যেমনটি চান, তেমনটি হইয়াছে, অর্থাৎ সর্বত্র মাত্রাপরিমিত হইয়া সমগ্রটার একটা ভরাট ভাব আসিয়াছে। এখনও যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে ইহার উপর আরও উৎকর্ষতা আনা আমার সাধ্যাতীত বলিয়া জানিবেন। যাহা হউক, এমনি অবস্থায় ছাপাইলেও নিন্দার হইবে বলিয়া মনে হয় না; আপনাদের যদি হাত দিবার দরকার হয়, তবে দিবেন।

চাকরি সম্বন্ধে শীঘ্রই পত্র লিখিব।

কামিনী পড়িলেন কি? মত কি?

জগদীশ

॥ ১৬ ॥

সিভিল কোর্ট
বোলপুর
( বীরভূম )
তারিখ ধরুন ১২/১/২৭

প্রিয় মুরলীবাবু,

খিদিরপুরে আপনার পোঃ কার্ড পাইয়াছিলাম।

সেইদিনই এখানে আসিয়াছি। আসিয়া থাকিবার স্থান সংগ্রহ করিতে এবং হোটেল একটা দেখিয়া লইতে ইত্যাদি অন্যান্য কারণে পত্র লিখিতে দেরী হইয়া গেল। দায়গ্রস্তের অপরাধ মার্জনা করিবেন।

গল্পটি[১] সম্বন্ধে আপনার আপত্তির কথাটা আরও ভাবিয়া দেখিয়াছি—গাড়ীতে বসিয়া। আপনি বলিয়াছিলেন, শিবপ্রিয় তেমন কেহই নাই। ঘটনা যেখানে মানুষকে নিষ্পেষিত করিতেছে সেখানে ঘটনাই বড় হইয়া চোখে পড়ে, মানুষ ঢাকা পড়িয়া যায়। মানুষ যখন ঘটনার বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া চলে, তখন সেই প্রধান; কিন্তু, ঘটনা যখন ঐ কাজটা করে, তখন যে মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফুটিতে দেয় না। এই অবস্থায় দেখিতে হইবে, মানুষ কিভাবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত গ্রহণ করিতেছে এবং সেই গ্রহণ করার ফলে তাহার মানসিক কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের "মহেশ" এবং "অরক্ষণীয়া" ইহার দৃষ্টান্ত। মহেশে মানুষ তেমন কেহই নাই, যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাও ঘটনা তাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে বলিয়া। মানুষটির জীবনে দৈবাগত ঘটনাগুলি তাহাকে দেশছাড়া করিল—এ ছাপটিই আমাদের মনের উপর পড়ে এবং থাকে। কিন্তু, অরক্ষণীয়ায় মানুষ কর্তা—তাই সেখানে স্বর্ণমঞ্জরী হইতে মাধুরী পর্যন্ত বেশ জীবন্ত।—

শিবপ্রিয়র উপরে কি ভাবে অদৃষ্টদত্ত আঘাত কাজ করিয়াছে তাহারই একটা চিত্র ফুটিলেই গল্পের গল্পত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ফুটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সে যে Calibre-এর লোক তাহাতে তাহার দ্বারা ঐ কাজগুলি হওয়া স্বাভাবিক। সুরুতে শিবপ্রিয় স্বাধীন অর্থাৎ ঘটনার দাস নয়; তখন সে কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ চোখের সামনে, কিন্তু দুর্লোভের আবির্ভাবেই তার ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। শিবপ্রিয় সুচতুর নয়, কিন্তু কোমল। তাহার কোমলতার উপর ক্রমাগত আঘাতগুলি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাই সে বেদনায় পাগল হইয়া গেল। সে জলে ডুবিয়া মরিলেও ক্ষতি ছিল না (যেমন আগে ছিল)—এই হিসাবে যে দৈবই অথবা নিয়তি তাহাকে নিরাশ্বাস শূন্যতার শেষ সীমায় আনিয়া একেবারে পরপারে পেঁছিয়া দিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে না কি?

নিজের লেখা সম্বন্ধে বিস্তর বাগাড়ম্বর করিয়া আপনাকে পথে আনিতেছি কি আপনার পথ ভুলাইয়া দিতেছি, তাহা জানি না। সুতরাং মার্জনা চাই।—আবার ইহাও ভাবিতেছি যে, যাঁহারা লেখা বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেন এবং আমি লেখা সম্বন্ধে যাঁহাদের মতাবলম্বী, তাঁহারা এটাকে কি বলেন, দেখা যাক্। আপনি অবশ্য বন্ধুবর্গের মতামতটা আমাকে জানাইবেন।

শরীর ভাল নাই, কেমন ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে।

গুপ্তের গল্পের[২] একটা গল্প নেবেন ? "জ্যাটানন্দ" গল্পটা rewrite করিয়া দিলে চলিতে পারে।

বইয়ের জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আছে। খবর পাই নাই। এই ৩২ বছরে তার নাকি ফাঁড়া আছে। কুইনিন খাইতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, তেতোতে কি ফাঁড়া কাটে ?

শৈলজাবাবুদের দেশের নিন্দা করিতে হয় বলিয়া নূতন স্থানের সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। তবে এত গোযান, পচা পুকুর এবং ভাঙ্গাবাড়ী আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শান্তিনিকেতনের ওদিকে শনিবার বেড়াইতে যাইব, ইচ্ছা আছে।

'বঙ্গবাণী' পুনরায় গল্প চাহিয়াছে। 'অরূপের রাস' পাঠাইয়া দিয়াছি।…

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর গল্পটি কবে লিখিব জানি না। কোর্টের কাজে বেগার দিতে হয় যথেষ্ট। নূতন লোক পাইয়া ঠকাইতেছে।—ভয়ে ভয়ে না বলিতেও পারি না। সকালবেলা ৭টা হইতে বিকাল ছ'টা পর্যন্ত কাজ—মাঝে ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত খাওয়ার সময়। উত্তর দিবেন।

ইতি
জগদীশ

অমল হোমের Pamphlet চাই কিন্তু।

(১) যে গল্প নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক তার নাম—'চুন্ চুন্ সন মোরে মরী ঐ'। গল্পটি অবশেষে ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের কালি-কলমে প্রকাশিত হয়। (২) ১৩৬৪ ১৫ই বৈশাখ রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীযতীন্দ্র সেন লিখছেনঃ ( পাটনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ) কলকাতায় এসে এই সময় ( ? ) তিনি গল্পের একখানি ( সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ঠিক মনে নেই ) পত্রিকা বের করলেন। ঐ পত্রিকার নাম "গুপ্তের গল্প।" পত্রিকার এই নামের নীচে ছাপা থাকত "পড়ে লোকে হেসে খুন।" গুপ্তের গল্পে তাঁর নিজের লেখা একটি বা দুইটি হালকা ধরণের গল্প থাকত। এই পত্রিকা বেশীদিন চলল না।…)

॥ ১৭ ॥

বোলপুর
২০-১-২৭

প্রিয় মুরলীবাবু,

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া সর্বসমাচার জ্ঞাত হইয়াছি, এবং অন্তর্গত কয়েকটি সুসংবাদে সুখী হইয়াছি। মার্জনা চাওয়া যদি অপরাধ হয়, তবে সেই মার্জনা চাওয়াটা দয়া করিয়া মার্জনা করিবেন।—

এ স্থান বনেদি, সন্দেহ নাই ; কারণ Underground-এই এখানকার লোক বাস করে বেশী। সত্যিই কি মাটির নিচে থাকে !—তা নয়। তবে বনেদি স্থানের জীর্ণতার নীচে ১৫ আনাই সগৌরবে বিরাজ করিতেছে, এক আনা ( আশা করি ) বাহিরে আছে। এই জেলায় ৫টি পীঠস্থান ; কিন্তু, আমার মনে হয়, সমস্ত জেলাটাই একটা প্রকাণ্ড কামরূপ কামাখ্যা…

'কালি-কলম' দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছি। বিশেষতঃ আজ 'কল্লোল' পাইয়া বেশী করিয়া মনে হইতেছে।

গল্প লিখিবার সময় নাই—৭টা হইতে ১০টা এবং ১১টা হইতে ৫৷৷ টা পর্যন্ত অফিস্। তারপর, বন্ধুদের জোর করিয়া হাকিমদের গল্প শোনানো। তারপর, হোটেলে খাওয়ার গর্ভযন্ত্রণা। যে ঘণ্টাগুলি কাছারীতে কাটাই, সবগুলি কাজের এবং উৎকণ্ঠার। সুতরাং, লিখিবার যে-একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহার এখন মূর্ছিতাবস্থা। নিরুপায়-পক্ষে যেমন তেমন একটা উপজীবিকার উপায়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এইটে আসিয়া পড়ায় মনটা কঠোর বাক্য এবং বন্দীদশার মধ্যেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গল্প অন্ন দেয় নাই, দিবে, এ আশাও দেয় নাই; কিন্তু, এই কাজটা দিতেছে। আবার এখনকার কথা সর্বপ্রাণ দিয়া চিন্তা করা উচিত সে বিষয়ে একটা পরামর্শ দিবেন এবং মনে রাখিবেন, ৫ বছর আমি গল্পলেখক এবং অন্নদাস ছিলাম; এখন গল্পের কথা কদাচিৎ মনে হয়, কিন্তু, উপার্জন করিতেছি।—

আশা করি, আমাকে পূর্ববৎ ভালবাসিবেন।

বৌ ভাল আছে। ভাল আছি।—

ইতি
জগদীশ

॥ ১৮ ॥

বোলপুর
২১-১-২৭

Urgent

প্রিয় মুরলীবাবু,

কাল এক পত্র লিখিয়াছি। আজ এক প্রস্তাব করিতেছি।

আমি যত গল্প আজ পর্যন্ত লিখিয়াছি, সমুদয়ের স্বত্বত্যাগ করিয়া যদি বরদা এজেন্সীকে দিতে চাই, তবে শিশিরবাবু [১] লইতে রাজি আছেন কি না শুনিয়া আমাকে কালই লিখিবেন। কত টাকা দিতে পারেন, জানাইবেন।—By instalment লইতে আমি রাজি আছি।…

জগদীশ

পুঃ—আমার আশা খুব limited.

(১ শিশিরকুমার নিয়োগী—বরদা এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী ও কালি-কলমের কর্মসচিব।)

॥ ১৯ ॥

বোলপুর
২৮-১-২৭

প্রিয় মুরলীবাবু,

…গল্পের বই সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমার জানা কথা এবং আপনার নিকট হইতে ঐ উত্তরই আশা করিয়াছিলাম। তবু, আপনাকে লেখার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, সাহিত্যের বাজারের নাড়ী-নক্ষত্র যাঁহারা অবগত, তাঁহাদের নিকট হইতে

Production-এর Commercial value-টা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়া লইব।—দীনেশ-বাবু[১] এক পত্র লিখিয়াছেন, এখন খুব সাবধানে লিখিবেন, এবং 'কল্লোলে'র জন্য ভাল একটা গল্প চাই।—কিন্তু জিনিষ যতই ভাল হোক, তাহার যদি Commercial value না থাকে, তবে needy লোক সে বস্তু উৎপন্ন করিতে চাহিবে না। প্রেরণা, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কথা ঋণদায়গ্রস্তকে বেশী সান্ত্বনা দিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।—সাহিত্যসেবা ত স্বর্গীয় বস্তু, তাতে শক্তিমানের অধিকার।

জগদীশ

( ১ কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। )

॥ ২০ ॥

বোলপুর
২-৪-২৭

মুরলীবাবু,

শুনিয়াছি।

"বিস্মৃতিই শান্তি"—কথাটা ঠিক।

কিছু বলিবার নাই, বলিবার ভাষা নাই, ভাষার মূল্য নাই। আপনি আমার লেখা পড়িতে ভালবাসেন।...আপনার একটু মনোরঞ্জনের জন্য এই গল্পটি[১] পাঠাইলাম। দুঃখ বড় কঠিন হইয়া বাজিয়াছে, অল্পক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক করিব।

কালি-কলমে কাজ আপনারই আশা করি, করিতেছেন।—কিছুতেই যেন ভুলিবেন না, মালা ছিঁড়িয়া গেলেও সূত্রটি তার বুকে বুকে স্পর্শ দিয়াই আছে; তাহার বিনাশ নাই; তিনি আছেন।...প্রেমে সূত্র অক্ষয়, তাই, মানুষ অমর। তাই, বিস্মৃতি যেন আসে... অভাবের বিস্মৃতি।

আমরা ভাল আছি।

চিঠি চাই।

ভালবাসা লউন। কুশল লিখিবেন।

ইতি
জগদীশ

( ১ গল্পটি "...পয়োমুখম্" )

॥ ২১ ॥

বোলপুর
৩০।৪।২৭

মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি! "..পয়োমুখম্" পড়িয়া আপনাদের "চমৎকার" লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। "অরূপের রাগ" সম্বন্ধে চৈত্রের "মানসী ও মর্মবাণী" কি লিখিয়াছে বোধ হয় দেখিয়াছেন।...আমার ইচ্ছা ছিল, গল্পটি কালি-কলমে ছাপা হয়, কিন্তু, আপনি গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, সেজন্য দুঃখ নাই।

আপনারা আমাকে লইয়া একটু বিপদে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়।—কি করিবেন, এখনও স্থির করিতে না পারিয়া আপনারা একটু অস্থির আছেন।...কিন্তু, দুনিয়ার গতিক এমনি যে, আমি জানিতে পারিয়াও আপনাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না।...নিরুপায়ের দুঃখ আমিও পাইতেছি!...কথাটা পরিষ্কার হইল না! কিন্তু পরিষ্কার করিবার উপায় নাই। যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক।

পূর্বপত্রের সকল কথার উত্তর পাই নাই। আশা করি, শীঘ্রই বড় পত্র পাইব। "কামিনী" সুবিধামত পাঠাইয়া দিবেন।...ইতি

জগদীশ

॥ ২২ ॥

বোলপুর
১১।৫।২৭

মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

আমাকে লইয়া আপনাদের বিপদ এই যে, আপনারা ঋণস্বীকার না করাটা "দৌর্বল্য" মনে করেন, কিন্তু, যে কারণেই হোক, আমি তা করিনা অথচ আমি ঋণ লই, অথবা চুরি করি; এবং তাহা লইয়া তর্ক করিতেও চাই।...আপনারা অবশ্য ভদ্রতা করিয়া আমার চুরিকে চোরের কার্য বলেন না; এবং স্পষ্ট কথা না বলিতে পারার যে কষ্ট, আমাকে লইয়া আপনাদের বিপদ সেইটুকু।...

বঙ্গবাণীতে গল্প দিয়াছি—হাল্কা গল্প।

কল্লোলেও দিলাম—ঐ—

দক্ষিণা...[১]

আমার স্ত্রীর শরীর ভাল নাই—পেটের অসুখ আর সর্বশরীরে ব্যথা · অনেক কষ্টে রাঁধিতেছি।

আমি ভাল আছি।...

জগদীশ

পুঃ নিঃ—আমার সম্বন্ধে কে কি বলে না বলে, তাহা না জানাইয়া কি লেখে, তাহাই আমাকে জানাইলে আমার উপকার করা হইবে। আশা করি, দয়া করিয়া কথাটি মনে রাখিবেন।

( ১ এখানে উঁচানো বুড়ো আঙুলের ছবি এঁকে দিয়েছেন )।

॥ ২৩ ॥

বোলপুর
২৩।৬।২৭

প্রিয় মুরলীবাবু,

......গল্পটি[১] পাঠাইলাম, Second Copy। পড়িতে কষ্ট হইলেও পড়া একেবারে অসম্ভব বোধ করি হইবে না, অন্ততঃ বিচার করিবার মত একটা ধারণা ধরা দিবে। যদি

বোঝেন, কালি-কলমে ছাপা যাইতে পারে, তবে পাঠাইয়া দিবেন, শীঘ্রই পুনরায় Copy করিয়া পাঠাইয়া দিব। আর তা যদি না হয়, তবে সুবিধামত পাঠাইয়া দিবেন।—অন্য কাগজে ও গল্প লইবে না।

সুরেনবাবু[২] আমার নিকট যাহা প্রত্যাশা করেন, তাহা দিবার মত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকাশশক্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; থাকিলে, এতদিনে তা প্রকাশ পাইত। কিন্তু, আমার মনে হয়, ছোট গল্পের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, চরিত্রের বৈচিত্র্য ফোটানো এক হিসাবে বড় কঠিন কথা; অর্থাৎ যে অল্প বিস্তারের সীমায় আবদ্ধ করিয়া ছোট গল্পের ঘটনাকে বা চরিত্রগত ভিত্তিকে খাড়া করিতে হইবে, তাহার উপর চরিত্র-বৈচিত্র্যের একটু ইঙ্গিতই আমার পক্ষে সম্ভব, এবং তাহাই এতদিন হইয়া আসিয়াছে।—সুতরাং, ঘটনাটাই প্রবল হইয়া গোচরে আসিয়াছে, চরিত্র চোখে পড়ে নাই।—আর এক কথা, কথাসাহিত্যে কথাকে প্রাধান্য না দিয়া, শুধু তাহাকে চরিত্র ফুটাইবার অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিলে সে ক্ষুণ্ণ হয়, অর্থাৎ কথা আর কথা থাকে না, বক্তৃতায় দাঁড়াইয়া যায়।......

নরনারীর মনের গতির পরিচয় কিছু কিছু যদি এতদিন না দিয়া থাকি, তবে আমার লেখা বৃথা হইয়াছে।—যাহা হউক, সুরেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিত আমি গ্রহণ করিলাম।—এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। .... ইতি।

জগদীশ

( ১ 'আদি কথার একটি'-র খসড়া।
২ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় )।

॥ ২৪ ॥

বোলপুর
৬।৭।২৭

মুরলীবাবু,

আপনার পত্রদুখানাই পাইয়াছি।

আপনাদের নির্দেশমত গল্পটি সংশোধিত করিয়া পাঠাইলাম।

গল্পটির প্রথম স্তরে যেখানে আসিয়া যে উঁচু পর্দায় দাঁড়াইয়াছে, দ্বিতীয় স্তরে পর্দা ছাড়িয়া সে নামিতে বাধ্য, উপায় নাই। কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণার প্রারম্ভেই পূর্বের পর্দা বজায় রাখা আখ্যানের গতির দিক দিয়াই অসম্ভব, আমার পক্ষে। এবং, লক্ষ্য করিলেই অন্যত্রও এরূপ ওঠানামা দেখিতে পাইবেন বলিয়াই মনে হয়।—

অনেকগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, যাহাতে আপনাদের আপত্তি আছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, সবগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যে সমাজের গল্প, সেই সমাজের atmosphere-টা গল্পে অবতীর্ণ হয় ঐরূপ কথার প্রয়োগের দ্বারাই—ইহাই আমার ধারণা, ধারণা ভুল কি না জানি না।—যাহা হউক, দেখিয়া শুনিয়া লইবেন।

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিলাম। আপনারাই কাটিয়া কুটিয়া প্রকাশযোগ্য করিয়া লইতে যদি পারেন, তবেই হইবে।......

জগদীশ

পুঃ নিঃ—নারীমেধের¹ আর আমারটির central idea মিলিয়া গেছে......একটুখানি রকমফের। দামিনীর episode-টা তুলিয়া দিতে হইল বলিয়া 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা' নামটা চলিবে না। যে নাম দিয়াছি, তাহার অর্থ আর কিছুই নয়—কেবল কাম। মানুষ যখন আদিতে পশুত্বের পরিধির মধ্যেই ছিল, তখন তাহাকে নাড়া দিত কেবল কাম, অন্য কিছু latent থাকিলেও চালিত করবার মত পরিস্ফুট তখন হয় নাই।---

নামটা পছন্দ না হইলে বদলাইয়া দিতে পারেন।

গল্পের 'মার্জিনে' তার উন্নতিবিষয়ক নির্দেশগুলির জন্য আপনি কয়েকবার সংকোচ-প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম।—কিছুই দরকার ছিল না, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন।—আমি বদ্‌রাগী বলিয়া একটা অপবাদ রটিলেও এত রাগী নই যে, গল্পের খুঁৎ দেখাইয়া দিলে লাঠি লইয়া তাড়াইয়া যাইব।—আমাকে অত ভয় করিবেন না, নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হয়।

এই গল্পটিতে উপন্যাসের উপাদান আছে।·····প্রগতিতেও দেখিলাম, চারজনে এক উপন্যাস লিখিতেছেন, নাম চৌরঙ্গী। আমরা কি কলেজ ষ্ট্রিট, অন্ততঃ বেনেটোলাও পারি না? শৈলজাবাবুর কাছে প্রস্তাব করিলে কেমন হয়? জানাইবেন না।

জগদীশ

(১ শৈলজানন্দের একটি গল্প)

॥ ২৫ ॥

বোলপুর
২৫।৭।২৭

মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম।

'শরৎচন্দ্র' আবার পাঠাইলাম, দেখিয়া শুনিয়া লইবেন।

গল্প সম্বন্ধে একটু মুস্কিলে পড়িয়াছি। আপনার পূর্বপত্র পাইবার আগে প্রবাসীতে একটা দিয়াছি; আর একটা আছে; সেটা কল্লোলের প্রতিযোগিতায় দিব মনে করিয়াছি। টাকার খুব দরকার। যদি হঠাৎ পাইয়া যাই, এই মনে করিয়া দিতে চাই। তবে এখনো সময় আছে। যদি পারিয়া উঠি, তবে গল্প নিশ্চয় দিব।

··· · তরফে অনেকে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু Persistence ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই, যাহার দ্বারা ঈর্ষার, নিন্দার এবং আতঙ্কের মুখ বন্ধ করিতে পারি। কাহারো কথায় বা মধ্যস্থতায় তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া ভালমন্দের বিচার চূড়ান্ত হইয়া যাইবে, এ আশা করা যায় না। আমাদের যাহা বলিবার, তাহা সত্যই বলিবার মত,এ ধারণা যদি থাকে, তবে বিরুদ্ধ-বাদীর কথায় একেবারে লাফাইতে থাকিলে, একটা কিছু করিতেছি বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও দু'দিন বাদেই তাহাকে অনাবশ্যক গোল করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইবে।—তবে একেবারে গা ছাড়িয়া থাকিলেও সুবিধা হইবে না; মাঝে মাঝে চক্র ধরিতেই হইবে। সেটা সম্পাদকীয় স্তম্ভেই বোধ হয়, ভাল করিয়া দেখানো যাইবে।...

জগদীশ

॥ ২৬ ॥

বোলপুর
৭।৮।২৭

মুরলীবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম।

"হাড়" আপনাদের পছন্দ হইয়াছে শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

আমার যে অপবাদের কথা লিখিয়াছেন, সে অপবাদের কারণের কতটা সংশোধন আমার পক্ষে সম্ভব, তাহা জানি না। তবে সংশয়ের কথা এই যে, আমার গল্পগুলি গল্পই হইতেছে কি না। যদি সেগুলি সংবাদপত্রের রিপোর্ট না হইয়া গল্পই হয় তবে, আমার মতে, তাহাই তাহার চরম সার্থকতা এবং সৌন্দর্য। গল্প বলিয়া মানিয়া লইলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হয় যে, কারুকার্য ফুটিয়াছে এবং সৌন্দর্যমাখানো হইয়াছে!— আর, সেগুলি যদি গল্প না হয় তবে, সূক্ষ্ম কারুকার্য, কবিত্ব এবং সৌন্দর্য যতই ফুটাই আর মাখাই, সেটা কাপড়পরানো ছবির মত দেখিতে হইবে; মুখ, চোখ ছবির, কিন্তু সাঁচ্চা জরির পোষাকটা জীবিতের।

"হাড়" গল্পটির তরতরে ঝরঝরে ভাবটা আপনাদের ভাল লাগিয়াছে লিখিয়াছেন। আমার মনে হয়, উহার অনাড়ম্বরতাই উহার সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং উহাই তাহার সৌন্দর্য; অর্থাৎ, সেইটিই আপনার মনের চোখে আগে পড়িয়াছে, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে রসতল্লাসী মন রসের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু, অনেকেই তা 'জানতি' পারে না।

গল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য কথাটার মানে কিছু বুঝি; কিন্তু, তার কবিত্ব বা সৌন্দর্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানি না। গল্প পড়িতে শুরু করিয়া পথের মধ্যে কোথাও বাধা না পাইয়া পাঠক যদি অন্তিম শব্দে আসিয়া পেঁছে, তবেই গল্পে কবিত্ব বা সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে—মনে করিতে হইবে। সূক্ষ্ম কারুকার্য মানে ইহাই বুঝি যে, তাহা বোধ করি, গল্পের লোকগুলির মনের সূক্ষ্মতম গতিটুকু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা। সুতরাং, আমায় যাঁহারা অপবাদ করিতেছেন, তাঁহারা হতাশ হইয়াই করিতেছেন।

কিন্তু, ব্যাপারটা যদি নিছক তুলনামূলক হয়, তবে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলে আমি তাঁহার অনুকরণ করিব না, কিন্তু আর্টটি হাতে-নাতে বুঝিয়া লইতে পারিব।

"শরৎচন্দ্র" মেরামত করিয়া লইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে আর কে লিখিলেন, জানিতে ইচ্ছা করে।...আমাকে দিয়া কেন স্তুতিটা লিখাইলেন, বুঝিতে পারিতেছি না; যোগ্যতর ব্যক্তি আরো অনেকে ছিলেন ত'! বঙ্গবাণীতে গল্প দিয়াছি।

দুটি গল্প ইতিপূর্বে বঙ্গবাণীতে ছাপা হইয়াছে; তাহারই বিনিময়ে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। এবার বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে বলিয়া নগদ টাকা চাহিয়াছি।

জগদীশ

॥ ২৭ ॥

বোলপুর
১৬, ৯, ২৭

মুরলীবাবু,

..প্রবাসীতে "জননী" সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানিবার জন্য উৎসুক আছি।

আমার মনে হয়, আপনার উদ্দেশ্য সমস্ত পত্রিকাগুলি দখল করা—নতুবা বিরোধী পত্রিকাগুলি আমাদের গল্পের প্রতি লোলুপতা দেখাইলে আপনার এত আনন্দিত হইবার অন্য কোনো কারণ নাই। তাই নয় কি? আমারও একান্ত ইচ্ছা তাই; কিন্তু, কাজটি বড় কঠিন। সবারই কেল্লা ফতে করিবার মত অত লেখা পাই কোথায়? তার উপর, আবার জনে জনের ভিন্ন রুচি লেখার টেকনিকের প্রতি, ম্যানারিজমের প্রতি, বিষয়বস্তুর প্রতি ইত্যাদি। কাজেই শুধু লেখা অপর্যাপ্ত হইলেই চলিবে না—কষ্ট করিয়া নানা প্রকারের ভঙ্গিও দেখাইতে হইবে; বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বুদ্ধদেব বসু মহাশয় কল্লোলে লিখিয়াছেন যে, বাংলাদেশে কবির উৎপত্তি এবং উন্নতি যতটা সহজ, বিষয়বস্তুর অভাবেই গল্প-লেখকের ততটা উন্নতি দূরে থাক্, গতিই সহজ নহে। শুধু, গল্প লিখিবার বিষয়সৃষ্টির জন্যই তিনি সামাজিক ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিতে চান।

কিন্তু, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংসারিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল, তখন এ কথা বলা চলিত। কিন্তু, এখন সে কায়দা ত' নাই......উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংগে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।

...ইহাও বুদ্ধদেব না জানেন এমন নয়, কারণ, তিনিও ঐ ধাঁচেরই গল্প লিখিয়াছেন। তবে হয়তো তিনি না বুঝিয়াই লিখিয়াছেন।

* * *

আগে দৈনিক কাগজগুলি Political গালাগালিতে আর গলাবাজিতে বেশি কাটিত ...রাগ না করিয়াই, রাগ দেখাইয়া একজন আর একজনে গালি দিত · ...প্রচণ্ড সে ব্যবসায়বুদ্ধি।

আমাদের এই গল্পলেখার গালাগালিতেও সেই প্রচণ্ড ব্যবসায়বুদ্ধি কাজ করিতেছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস্।

"পুরুষাসংহম্" তরুণ বাঙালী লেখককে বাঙালী বলিয়াই এক-স্থানে গাল দিয়াছেন; অথচ, তিনিও যে অবাঙালী নন, ইহাও ঠিক।......বাংলার মাটিতেই নারীর প্রতি সহজ লালসা এত বেশি জন্মে যে, তাহারই আওতায় জন্মগ্রহণ করিয়া নারীকে শুধু ভোগের জন্যই প্রাপ্য মনে করিতে বাঙালী লেখকের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না।—সে লোকও বাঙালী এবং তাঁহার কথা সত্য হইলে ঐ লোভটি তাঁরও আছে। কাজেই, সেটা সাহিত্যে ফুটিলে সে বিষয়ে তাঁহার অরুচি দেখানো, হয় ভণ্ডামি, না হয়, ব্যবসাদারি চাল। আমার মনে হয়, মনে মনে তাঁরা সবই উপভোগ করেন এবং রাগ যা দেখান, তা কেবল ব্যবসায় ফলাইতে।......গাল বড় মুখরোচক—চিরকাল। ইহা সত্য যে, যে

আমাদের লেখা পছন্দ করে এবং পড়ে, আমাদের কেহ গালি দিলে গালটাও সে উপভোগ করে।……এবং, আমাদের যারা গাল দেয়, তারা পাঠকদের মনের এই দিক্‌টার সঙ্গে পরিচিত।……র নাম সর্বত্র কেবল এই কারণেই।……

আমার শরীর যেন কেমন হইয়া গিয়াছে—সর্বদাই মনে হয়, জ্বর বুঝি এলো। তবে কয়েকদিন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি, রোজ Quinine ঠুকিতেছি।

আমার স্ত্রীর শরীরও ভাল নাই।……পূজার ছুটিতে কোথায় যাইবেন এবং কি করিবেন? আমরা বর্ধমানে কবিরাজ দেখাইতে যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। ভাল কবিরাজ সেখানে একজন আছেন, শুনিতেছি।

আপনাদের কুশল লিখিবেন। নতুন খবর খুঁটিয়া দিবেন।

উত্তর চাই।

ইতি—
জগদীশ

॥ ২৮ ॥

বোলপুর
২০ আশ্বিন, '৩৪

মুরলীবাবু,

……এখানে এক ব্যাপার ঘটিতেছে।

'গোরুর গাড়ী' নামক একখানি কাব্য লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ। বইখানির কাটতি আছে কি না জানি না, কিন্তু, 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী' খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রশংসা করিয়াছেন। উনি আর একখানা বই লিখিয়াছেন, এবং তাহার প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্, বইয়ের নাম—"রক্ত-করবীর মর্মকথা," অর্থাৎ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর 'নন্দিনী' 'নাম্নী ব্যাখ্যা' উক্ত ভোলানাথবাবুর নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা; তাঁহার লেখা অনেকগুলি খণ্ডকবিতা, গান প্রভৃতি মজুত আছে; কিন্তু, নামের বা লেখার প্রচারের সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, সাহিত্য-পত্রিকাকে আশ্রয় করা ভুল, এই হিসাবে যে,—তাহা কবিকে কেবল খণ্ড এবং অসম্পূর্ণভাবে দেখায় মাত্র।

মাসিক-পত্রিকায় কবিতা পাঠাইয়া তিনি ফেরৎ পাইয়া ঐ মতটি অবলম্বন করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু, তিনি আপাততঃ নব ফান্দ বাহির করিয়াছেন।

দিন ৪।৫ হইতে একটা প্রস্তাব চলিতেছে যে, তিনি, আমি এবং তাঁহারই বন্ধু জনৈক সাহিত্যিককে লইয়া একটি স্থানীয় কেন্দ্র গঠিত হউক। এই তিনজনের অপ্রকাশিত অথচ উচ্চ ধরণের সাতটি লেখা লইয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত করা হউক—যাহাতে পৃষ্ঠা থাকিবে ৬৪ এবং যাহার দাম ৫০ পয়সা। ভোলানাথবাবুর মত রচনা আছে, কেবল তাহাই দিয়া তিনি ঐ খরচে নিজস্ব একখানা বই ছাপিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া আরো দু' জনকে সঙ্গী করিবার প্রস্তাব কেন করিতেছেন, তাহা সঠিক অনুমান করিতে পারিতেছি না। সন্দেহ অনেকরকমই হয়, তথাপি আমি স্বীকৃত হইয়াছি। স্বীকৃত হইবার কারণ এই যে, ঐ সাতটি লেখার একটি হইয়াছে বলিয়া আমার লেখা কেহ পড়ুক না পড়ুক, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—বহুল-প্রচারিত মাসিকপত্রে প্রকাশিত

হইলেও, যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে, সে নিজের পরমায়ু বাড়াইতে পারে না।—কাজেই কপাল ঠুকিয়া লাগিয়া পড়িতে চাই—যদি বইখানা দৈবাৎ বিক্রয় হইতে থাকে, তবে লভ্যাংশ কিছু পাইব বলিয়া আশা করি। এ বিষয়ে ভোলানাথবাবুর সংগে কোনো কথা হয় নাই।—যে গল্প ভোলানাথবাবুকে দিতে চাই, তাহা এই সংগে আপনাকে দেখিতে পাঠাইলাম। গল্পটি কখন হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনাদের—আপনার ও সুরেনবাবুর[১]—মতামত চাই।—যদি মনে করেন, এ-গল্পের পরমায়ু থাকা উচিত এবং কালি-কলমে প্রকাশযোগ্য, তবে রাখিয়া দিবেন। আর, যদি তার বিপরীত মনে হয়, তবে যত শীঘ্র পারেন, ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন।

বর্ধমান কবে যাইব, তাহার ঠিক নাই—ত্রয়োদশীর দিন বাসা বদলাইব ; তারপর যাইবার উদ্যোগ করিব।......

জগদীশ

( ১ সুরেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায়। )

॥ ২৯ ॥

বোলপুর

মুরলীবাবু,

......'বংগবাণী' উঠিয়া যাওয়ায় মর্মাহত হইলাম, মনে হইতেছে, যেন একটি সংগীর অকালমৃত্যু ঘটিল। শুনিতাম, ৪/৫ বছর টিকিয়া গেলে, কোনো মাসিকপত্রিকার মৃত্যু-ভয় আর থাকে না। কিন্তু, বংগবাণীকে মরিতে দেখিয়া সে-কথা এখন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

শৈলজাবাবু কালি-কলমের সম্পাদক আর থাকিবেন না, সংকল্প করিয়াছেন, ইহাও দুঃখের কথা। পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণের কথাটা মনে পড়িতেছে।···

কালিদাসবাবু 'বিনোদিনী' পাইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন ; নরেশবাবুও লিখিয়াছেন ; কিন্তু, মোহিতবাবু আজ পর্যন্ত প্রাপ্তিস্বীকার করেন নাই। তাঁহার বোধ হয়, অবসর অল্প।

নরেশবাবু আমাকে দীর্ঘ এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে এমন সব প্রশংসার কথা লিখিয়াছেন যে, ভারি লজ্জা করিতেছে। যাহা হউক, তাঁহাকে যে খুশী করিতে পারিয়াছি, ইহাই বড় আনন্দের কথা।

কিন্তু, একটি কথায় বড় বিস্মিত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের সংগে নরেশবাবু ঝগড়া করিয়াছেন এবং সেইজন্যই ( নরেশবাবু লিখিয়াছেন ) তিনি মন ভাংগিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুর প্রতি অবিচার এবং অকারণে রোষ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তাই বলিয়া নরেশবাবু লেখা ছাড়িয়া দিবেন কেন, তাহা বুঝিলাম না। তাহা হইলে ত' আমাদের আর কোন কুলই থাকে না। আমাদের ত কোনো encouragement-ই নাই। নরেশবাবু জনপ্রিয় হইয়াও এক রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটিতেই হতাশ হইয়া পড়িবেন, ইহা আমাদের তরফ হইতেই প্রতিবাদের বিষয়। তাঁহাকে বলিবেন।

গল্প একটা পাঠাইলাম। কেমন লাগে, জানাইবেন।

"ফিলজফির বুদ্বুদ" কি আমাদেরই বিপক্ষে যাইবে ? বোধ হয়, নয়। আমার লক্ষ্য, আমরা নিশ্চয়ই নই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

জগদীশ

॥ ৩০ ॥

বোলপুর
২৪-২-২৮

মুরলীবাবু,

পত্র পাইয়াছি। "তমসার পথে"[১] ভাল লাগিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু ক্রমশঃ দিয়া আরো খানিকটা প্রকাশে আপনাদের অমত কেন হইল, আপনার চিঠি পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না।...

"তমসার পথে" যতটা কাটাইয়াছি, ঠিক আর ততখানি লিখিয়াছি। সুতরাং, চৈত্রের ও বৈশাখের সংখ্যাতেই শেষ হইয়া যাইবে। অচিন্ত্যবাবু[২] কি ভাবে তাঁর "বেদে"[৩] লিখিয়াছেন জানি না ; এবং পরবর্তী অংশটাকে স্বতন্ত্র গল্পের আকার দিতে গেলে কি-ভাবে তার গোড়াপত্তন করিতে হইবে, তাহাও ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। গল্পটা যে ঝোঁক লইয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেই ঝোঁকেই সে চলিবে ; স্বতন্ত্র গল্প করিতে গেলে সূত্র বজায় রাখা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গল্পটা যত দীর্ঘ হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে "নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী"র[৪] আকার ত' দেওয়া চলিবে না।

লক্ষ্মী বিমুখ, সুতরাং, ভয় কাহাকেও নাই। তবে আপনাদের সংকোচ হইতে পারে।...

বড় পত্র দিবেন।

'উপলাহতে'[৫]র জন্য কোনো ক্ষোভ নাই।...

জগদীশ

( ১ তমসার পথে। ২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাস —'অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী' ( ১ম খণ্ড ) দ্রষ্টব্য। ৪ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বড় গল্প। ৫ জগদীশ গুপ্তের গল্প—'উপলাহত প্রবাহ'-কালি-কলম, ফাল্গুন, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত। )

॥ ৩১ ॥

বোলপুর
১, ৪, ২৮

মুরলীবাবু,

·· নানা কারণে আগামী বৎসরেও কালি-কলম চালাইতে হইবে লিখিয়াছিলেন। কি কারণে বাধ্য হইয়াছেন, জানি না। তবে, শুধু সাহিত্যটার জন্যই বোধ হয় বাধ্য হন নাই। কিন্তু, আপনার প্রেরণা সেইদিকে। কিছুদিন পূর্বে আপনারা আধুনিক নামে পরিচিত হইলেও, এখন আপনারই পুরাতনের দলে হইয়া 'বিচিত্রা' 'ভারতবর্ষ" প্রভৃতি

আধুনিকে দাঁড়াইয়া গেছে। কিম্বা যদি না যাইয়া থাকে, তবে অবিলম্বেই যাইবে। আধুনিকের জয় যখন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তখন পুরাতনই আধুনিক সাজিয়া বসিতে বসিয়াছে। সুতরাং, আপনাদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে নিরস্ত হইতে বাধ্য, আপনাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। মধ্যপন্থীর স্থান কোথায়?

গল্প লিখি নাই; কল্পনাতেও নাই। সুতরাং, আমার গল্প ছাড়িয়া দিন। ভাল আছি। কুশল চাই। নমস্কার লউন।

ইতি—

জগদীশ

পুঃ—আপনাদের Competition-এখন 'কল্লোলে'র সঙ্গে নয়। 'ভারতবর্ষ' ও 'বিচিত্রা'র সঙ্গে। পারিয়া উঠিবেন কি?

॥ ৩২ ॥

বোলপুর
১৭, ৪, ২৮

মুরলীবাবু,

...আমার মতে গল্পটি ঐখানেই শেষ হওয়া উচিত।

আপনি লিখিয়াছেন ঃ

"ঐ তমসার পথেই কি এমন একটি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনা, যে দীর্ঘকাল পথে, বিপথে দুরন্ত অন্তরের ক্ষুধা লইয়া..." ইত্যাদি—

"যে সব জানিয়া শুনিয়া ও যোগমায়াকে নিবিড় আনন্দের প্রেরণায় প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করিবে···" ইত্যাদি—

অর্থাৎ, আপনি চান, ভালবাসার জন্য ভালবাসা।

মনে হয়, আপনি অভয়া, রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রীরই রূপান্তর দেখিতে চান, অথবা ছায়া—

কিন্তু, যোগমায়ার সেরূপ পরিবর্তন দেখানো অসম্ভব। কারণ, গল্পের ২য় অধ্যায়ের এক স্থানে আছে—"জাগ্রত জননীর অযোগ্যতার বেদনায় * * * কোলে মাধাই···এ সেই স্বামীরই দান...কলুষ তাহাতে ছিল না"—

আছে—"যোগমায়া মাধাইয়ের···শিহরিয়া বিহ্বল হইয়া যায়···সজলচক্ষে মনে মনে সে সহস্রবার আবৃত্তি করে—ভগবানকে।"

পুনশ্চ আছে—"কিন্তু, পুরুষের যে নিষ্ঠুরতম * * * সজল করিয়া তুলিল।"

পুনরায় আছে—"তারপর বিগলিত, কিন্তু, মথিত করিয়া মনে হইল—দুষ্কৃতির প্রথম শাস্তিগ্রহণ করিবে।" ইত্যাদি—

ঐ উদ্ধৃত অংশগুলি খুলে সম্পূর্ণভাবে পুনরায় পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যোগমায়াকে দিয়া অন্য পুরুষকে ভালবাসানো যায় না।

তার উপর, যোগমায়াকে যেমন নিরীহ, ভয়কাতুরে করা হইয়াছে এবং বাহিরের পৃথিবী যার ধারণাতেই আসে না বলিয়াই এমন ভয়াবহ মনে হয় যে, মুখে কথা ফোটে না, চোখ বুঁজিয়া আসে—তাহাকে দিয়া কেবল পুরুষের পরিচর্যা করানোই চলে, বিদ্রোহ

করানো চলে না। স্বামীর স্মৃতিকে ধ্যান করিয়া উপায়ান্তর অভাবেই ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের হাতে পরাভূত আত্মাকে সমর্পণ করা ছাড়া যোগমায়ার চরিত্রের লোকের পক্ষে অপর কিছু সম্ভব নহে।—"অরক্ষণীয়া"র গেনি অন্যরকম হইলে অনেক কিছু করিতে পারিত, কিন্তু কেবল বশ্যতাস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু সে করে নাই। এ-ও তেমনি।—এবং তাহার অদৃষ্টের tragedy-ই ঐ।—বিবাহাতীত প্রণয়ের সফলতা উহার দ্বারা দেখানো চলিবে না।

ভাল আছি।—

—"মন্ মনসে"—কেমন লাগে জানাইবেন।

ভালবাসা গ্রহণ করুন।

ইতি—
জগদীশ

॥ ৩৩ ॥

বোলপুর
২২-৫-২৯

মুরলীবাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার কিছুই তেমন নাই বলিয়াই, এতদিন গড়িমসি করিয়াছি। আশা করি, বিলম্বের অপরাধ মার্জনা করিবেন।

"কালি-কলম" উঠিয়া যাওয়ায় সুখী হইয়াছি কি দুঃখিত হইয়াছি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সুখের কারণ এইটুকু যে, মানুষের মনের ওজন পাওয়া গেল, আর দরদীর দরদ কষা হইয়া গেল। কালি-কলম যতদিন ছিল, ততদিন ইহা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু উঠিয়া যাইতেই আমার কাছে ইহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নূতন কিছু করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন কি?

কালি-কলমের অকালমৃত্যুর মাঝে যেন আমার নিজেরও সমাধি হইয়াছে, এইরূপ অনুভব করিতেছি। লোকে যেমন চায় তেমনটি আমরা দিতে পারি নাই। যাহা হউক, মৃতের জন্য শোক করিয়া লাভ নাই। আত্মা তার চিরজীবী হোক, ইহাই কামনা।

ভাল আছি। কুশল চাই। নমস্কার লউন।

জগদীশ

---

# জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

## প্রথম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী
ও
গ্রন্থপরিচয়


নিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

## জীবনীর সংক্ষিপ্ত তথ্য

যে কোনও সাহিত্যিকের রচনাবলী-প্রকাশকদের একটি দায়িত্ব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু তথ্য সরবরাহ করা। জগদীশচন্দ্র ছিলেন 'অন্তরালের সাহিত্যিক'। নিজস্ব সীমিত পরিবেশের বাইরে তিনি বিশেষ আত্মপ্রকাশ করতেন না। তৎকালীন 'কল্লোল' পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখক। 'কল্লোলের' আড্ডায় তৎকালের সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই যোগ দিয়েছেন। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত অনুপস্থিত। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' স্মৃতি-গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'জগদীশ গুপ্ত কোনোদিন কল্লোল অফিসে আসেন নি। মফঃস্বল সহরে থাকতেন, সেইখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসে সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেননি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন। স্বস্থানসংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার। অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত। নদী বেগদ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ। লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের মানুষটি। চোখে বেশি-পাওয়ারের পুরু চশমা, চোখের চাউনি কখনো উদাস কখনো তীক্ষ্ণ—মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু ঠোঁটের উপর কালো গোঁফজোড়াটি বেশ জমকালো। "কালি-কলম"-কে তিনি অফুরন্ত সাহায্য করেছেন গল্প দিয়ে, সেই সম্পর্কে মুরলীদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তার আরেক প্রমাণ।'

এই 'অন্তরাল সাহিত্যিকের' জীবনের তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তিনি নিঃসন্তান। স্ত্রী শ্রীচারুবালা গুপ্তা প্রায় অশীতিপরা বৃদ্ধা, এবং বহুলাংশে স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তিহীনা। জগদীশচন্দ্রের তথ্যপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনী সংগ্রহে সম্পাদক সচেষ্ট। যথাসময়ে রচনাবলীর পরবর্তী কোনও সংখ্যায় সেই সকল প্রকাশিত হবে। বর্তমানে যেটুকু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খোর্দমেঘচামী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের সন্তান জগদীশচন্দ্র। পিতা কৈলাসচন্দ্র, মাতা সৌদামিনী। কার্যোপলক্ষ্যে এই পরিবারটি তৎকালীন নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া শহরে বসবাস করত। সেইখানেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্রের জন্ম।

তাঁহার বিদ্যারম্ভ কুষ্ঠিয়ার পণ্ডিত রামলাল সাহার পাঠশালায়। তারপর স্থানীয় হাইস্কুলে। বাংলাসাহিত্যের অনেক সিদ্ধকাম কথাশিল্পীর মতো জগদীশচন্দ্রের সৃজনী-প্রতিভাও সর্বপ্রথম অভিব্যক্তিলাভ করেছিল কাব্যপ্রবাহে। মাত্র ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই স্কুলে পড়বার সময় হতেই তিনি গোপনে কবিতালেখার চর্চা করতেন। পরীক্ষাপাশের পরিপন্থী এই ব্যাপারটি ধরা পড়তে বিলম্ব হলো না। আরও একটি বিপদ ঘটল।

গুরুজনদের চোখে পড়ে গেল তার কবিতার খাতাখানা। কবিতাগুলি পড়ে তাঁরা শিহরিত। উপযুক্ত শাস্তি দিতেও বিলম্ব হলো না। জগদীশচন্দ্র নির্বাসিত হলেন কলকাতার ৪৪/৩ হ্যারিসন্ রোডের মেস্-বাড়িতে। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো নীতি-শাসিত বিখ্যাত সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ( ১৯০৪ )। কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল তার গতিবিধি, মেসের সংকীর্ণ গন্ডীর ভিতরে চলতে লাগল পাড়াশুনো। ফল ভালোই হলো, ১৯০৫ সনে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তারপর রিপন কলেজ। পারিবারিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কলেজের পড়াশুনায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। বছরখানেক পরেই শুরু করতে হলো তাঁকে কর্মজীবন।

প্রথম কর্মজীবন শুরু বীরভূম জেলার সদর সিউড়ির জজ-আদালতে। তারপর সম্বলপুর, তারপর কটক সার্কিট কোর্টে, তারপর পাটনা হাইকোর্টে, তারপরে বোলপুর চৌকি-আদালতে।

চাকরি-জীবনের সূত্রপাতের সময়েই শ্রীযুক্তা চারুবালা গুপ্তার সংগে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান। অবশ্য তাঁর একটি পালিতা কন্যা ছিল।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে চাকরি হতে অবসরগ্রহণের পরে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে দক্ষিণ কলকাতার পরাশর রোডে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫০ সনে চারুবালা দেবী স্ব-চেষ্টায় দক্ষিণ শহরপ্রান্তে রামগড় কলোনীতে নিজস্ব একটি বাসস্থানের বন্দোবস্ত করেন। অবশ্য এই বাসস্থান একটি 'কুড়েঘর' মাত্র। এই বিষয়ে চারুবালা দেবীর একটি চিরকুট হতে জানা যায় :

'১৯৫০ সনে স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিতৃদত্ত অলংকার বিক্রয় করিয়া যাদবপুর সন্নিকট রামগড় কলোনীতে রিফিউজি হিসাবে জবরদস্তি জমিতে বাড়ি করি। কলোনীর প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে ৪৫·০০ দিতে হয়। ঘর তোলা প্রভৃতি বাবদ খরচ আলাদা। রামগড়ে যাইবার পর দেখা গেল স্বামী খুব খুশী।

১৯৫৪ সনে রামগড় কলোনীর প্রগতিসংঘের সভ্যবৃন্দ বাংলা সন ১৩৬০ সনের ৫ই পৌষ রবিবার স্বর্গত সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তকে মানপত্র দেন।···

নিজের সম্বন্ধে বিশেষ লিখতে কিম্বা বলতে লজ্জাবোধ হয়। আপনাদের প্রয়োজন-বোধে সামান্য কিছু লিখছি। ছোটবেলা থেকেই সূচিকর্মের দিকে আমার খুব ঝোঁক। তুলো দিয়ে পুতুল তৈরী করে বাচ্চাদের দিয়ে খুব আনন্দ। ক্রুশের নানারকম ডিজাইন বোনা লেস্ প্রভৃতি এ সব আমি যৌবনে অনেক করেছি। নানারকম ছবি কিনিয়া তাকে সাজিয়ে কাপড় পরিয়ে খুব আনন্দ পেয়ে থাকি। স্বাঃ চারুবালা গুপ্ত।'

এই সি/৩৬ রামগড় কলোনীর কুড়ে-ঘরেই জগদীশচন্দ্রের জীবনের শেষ কয়টি বছর কাটে। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে ভারত সরকার ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হতে তাঁকে প্রতি মাসে ১৫০·০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করে। তৎপরে ঐ ভাতা কমিয়ে ৭৫·০০ টাকা করা হয়। জগদীশচন্দ্রের দফতরের নানা চিরকুট হতে জানা যায় যে, কোনও সংস্থা বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ জগদীশচন্দ্রকে এই সময়ে সামান্য হলেও কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন।

১৩৬০ সনের ৫ই পৌষ রামগড়ে জগদীশচন্দ্রকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয় সেই সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর দফতরে পত্রিকার যে টুকরোটি পাওয়া যায় সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

'সম্প্রতি যাদবপুরের নিকটবর্তী রামগড় কলোনীতে প্রগতি সংঘের সভ্যগণের উদ্যোগে এই কলোনীর অধিবাসী সাহিত্যিক শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। গুপ্ত মহাশয় আজীবন সাহিত্যসাধনা করিয়া জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর এবং দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল ও লুপ্তপ্রায়। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণ জগদীশবাবুর রসাল রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ-বয়সে সাহায্যকল্পে সদাশয় ভারত গভর্ণমেণ্ট গত নভেম্বর মাস হইতে ( ? ) মাসিক ১৫০ টাকার একটি বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ সাহিত্যিককে রামগড় কলোনীর অধিবাসিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রগতি সঙ্ঘের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতিলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রগতি সংঘের সেক্রেটারী শ্রীকান্তি দাশগুপ্ত মহাশয়কে মাল্যভূষিত করিয়া একটি সুদৃশ্য আধারে বেষ্টিত মানপত্র পাঠান্তে তাঁহার করকমলে প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা জগদীশবাবুর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া জাতি সংগঠনে সাহিত্যের প্রভাব যে কত শক্তিশালী তাহা বর্ণনা করেন। জগদীশবাবুর পক্ষ হইতেও তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয় এবং তিনি কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।' ( দুঃখের বিষয় এই 'কাটিংটি' কোন্ দৈনিক পত্রিকার তাহার উল্লেখ নেই। মনে হয় ১৩।১৪ জানুয়ারী ১৯৫৫ সনে এই সংবাদটি কোনও দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। )

## জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য

'অন্তরালের সাহিত্যিক' হলেও 'আধুনিক সাহিত্যিকদের' মধ্যে জগদীশচন্দ্র বিশেষ ভাবে সমালোচিত। সেই সকল সমালোচনা ক্রমশঃ রচনাবলীভুক্ত হবে। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের সীমিত স্থানে যতটুকু তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব তাই প্রদত্ত হলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাহিত্যের পৃষ্ঠায় জগদীশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় কবিতা দিয়ে। কৈশোরেই তিনি ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের অনুকরণে কবিতারচনা শুরু করেন। বলাবাহুল্য, সেই সকল রচনা আদ্যন্ত নারীতৃষ্ণার ক্লেশকাকুলিতে ছিল পূর্ণ। অবশ্য, কবি হিসেবে তিনি প্রখ্যাত না হলেও কবিতা লেখা তিনি কখনও ত্যাগ করেন নি। তাঁর জীবনের উত্তরকালের একটি কবিতা ('অদ্ভুত জীব') রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের সংকলন বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের প্রথম রচনাটি একটি গল্প, নাম 'পেয়িং গেষ্ট'। ১৩৩১ সালের ২৯শে ফালগুন-সংখ্যা 'বিজলীতে' এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে এই গল্পটি 'উদয়লেখা' গল্প-সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ( গল্পটির জন্য রচনাবলীর ৫৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'অক্ষরা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই কাব্য-গ্রন্থটি এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য, উপরোক্ত গল্প 'পেয়িং-গেষ্ট' প্রকাশের পূর্বে ১৩১৮ ( ১৯১১ ) সালে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' নামে একটি অনুবাদ-গল্প তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'জগদীশচন্দ্রের গল্পে ভাবিকতার (আইডিয়ালিজম্) মাত্রা খুবই কম, বড় গল্পে হয়তো একটু-আধটু আছে।... জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ-ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে—ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক "আধুনিক" লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই...তিনি কিছুকে বা কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ অদৃষ্টশক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে, তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন। শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনায় "আধুনিক সাহিত্যিকের ভীরুতা নাই...।'

এই 'ভাবিকতা' অভাবের কারণ হয়তো এই যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যখন সাহিতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১৩৩৪) তাঁর ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে লিখলেনঃ 'বয়সে কিছু বড়, কিন্তু, বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও য়েটা দোষ, সেটাও ঐ তারুণ্যের দোষ—হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।'

অবশ্য, তাঁর সেই অপসৃত যৌবনের বেদনা সুনিবিড়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ১৩৩৩ সালের কার্তিক সংখ্যা 'কালিকলমে' প্রকাশিত তাঁর 'যৌবন-যজ্ঞের কবি' গল্পে। গল্পটির মুখ্যচরিত্র বিশ্লেষণ যেন আত্মবিশ্লেষণ। গল্পটিতে নায়ক সম্বন্ধে তিনি লিখলেনঃ

'যৌবন তার বহুদূরে সরিয়া গেছে।

সিন্ধুর মত প্রাণবান্ জীবন্ত, সিন্ধুর মতই চঞ্চল পাগল, সিন্ধুর মতই পিচ্ছিল সে যৌবন, যেন ধরা না দিয়াই হাসিয়া পালাইয়াছে। সিন্ধু অনন্তকাল-বিহারী, কিন্তু যৌবন তা নয়—তবু সিন্ধুর মত লুটাইতে লুটাইতে সে অগ্রসর হয়। বাহিরে সে উচ্ছল, উদ্দাম, গর্ভে তার কত রত্ন। নিরবয়ব, আয়ত্তাতীত, ক্ষুধিত সমুদ্রের স্ফূর্তির মত তার যৌবনের স্ফূর্তির মোহ আছে,—আবেশ আছে।

...যৌবনের অন্তরে অন্তরে যত দীপ্তির হিরণ্যশ্রী একে একে ফুটিয়াছিল, তাহারই দেওয়া অঙ্গারে বুক কালো হইয়া আছে, আশার যত মুকুল দেখা দিয়াছিল তার একটিও ফোটে নাই।

সে আজ বিশবছরের কথা।

...ভগবান তার মস্তিষ্কে অতুল শক্তি দিয়াছিলেন,—সে অতুল শক্তির সে অপব্যবহার করে নাই। তার যৌবন-যজ্ঞ জগদ্ধাত্রীর রত্নখচিত সিংহাসনের মত অনবদ্য চমকপ্রদ, যৌবন-যজ্ঞেয় প্রতিছত্রে বহু-ভঙ্গিম অপূর্ব অধ্যাত্মসম্পদ দেদীপ্যমান, তার প্রত্যেকটি কবিতা পূর্ণবিকশিত; শতদলের মত রূপে নিরুপম, হোমশিখার মত প্রদীপ্ত, পবিত্র, যজ্ঞের মতই অর্থে ব্যাপক, শরতের আকাশের মত স্বচ্ছ, সুপ্রসন্ন।

তবু যৌবন-যজ্ঞ অজ্ঞাত হইয়া গেল...

যে জীবন্ত প্রবন্ধে প্রতিভা মানবের মানসীসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপাদানসংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা একটি আঘাতেই ভাঙিয়া শুকাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল—ক্ষুধার আঁচে পুড়িয়া সেই অপরূপ রসের ভাণ্ডার হরনেত্রের আগুনে দগ্ধ মদনের মত একেবারে শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে নিঃশব্দ আর্তনাদ পৃথিবীর কাহারও কানে গেল না!

কবি আজ ম্লানচক্ষু, ন্যুব্জ, মানুষের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস তাহার নাই।'

ঐ অনাদৃত যৌবনই বোধ হয় জগদীশচন্দ্রের লেখনীকে মমতাহীন নিষ্ঠুরতায় প্লাবিত করেছিল। অবশ্য, আরো হয়তো একটি কারণ ছিলো। জীবনে অভিযোগহীন এবং প্রতিকারহীন দারিদ্র্য তাকে করেছিল অন্তর্বৃত, সাহিত্যক্ষেত্রের উন্মুক্তমঞ্চে এবং সামাজিক জীবনেও। প্রয়াত সম্পাদক ও সাহিত্যসমালোচক পরিমল গোস্বামীর সংগে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি তাঁর 'যখন সম্পাদক ছিলাম' স্মৃতি-গ্রন্থে লিখেছেন: 'জগদীশ গুপ্ত আমার অপেক্ষা ১১ বছরের বড় ছিলেন · পিছন ফিরে চাইলে আর একটি বিষণ্ণমূর্তি মনে পড়ে! জগদীশচন্দ্র গুপ্তের সেই ম্লান চাহনি, চরম দুঃখ সহ্য করেও সে বিষয়ে একটি অভিযোগ না করা। দরিদ্র অবস্থাতেই তিনি প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন, শেষজীবনে দারিদ্র্য আরো কঠোর হয়ে উঠেছিল, আর সে-জন্য স্বাস্থ্যও তাঁর অপটু দেখেছি খুবই। এমন একটি মানুষ সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল বলেই মনে হয়েছে।'

'জগদীশ গুপ্ত' প্রবন্ধে (চতুষ্কোণ, আশ্বিন, ১৩৮৪-সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়' প্রবন্ধ উল্লেখ করে লিখেছেন:

'তিনি (জগদীশচন্দ্র) একবার পোস্টকার্ডে বন্ধুবর নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে কয়েক লাইন কবিতা লিখেছিলেন:

"দুঃখ কষ্ট এ জীবনে চিরস্থায়ী নয়,
আজ হ'ক, কাল হ'ক, হবে তার ক্ষয়।
তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে,
দুঃখ অন্তে সুখোদয় সম্ভবে কপালে।
আমি নয় সেই দলে তাতে নাই ক্ষতি
অশ্রুর কমলে পূজি দুঃখ-সরস্বতী।"

গৃহহীন, সম্বলহীন, সন্তানহীন জগদীশ গুপ্ত ছিলেন সর্ববন্ধনবিমুক্ত সন্ন্যাসীর মতো। ব্যাধি তাঁকে কাতর করেনি, দারিদ্র্য বিচলিত করেনি, যে সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর চেয়ে অনুপযুক্তেরাও পেয়েছেন, তিনি পান নি, তার জন্যে কোনো অনুযোগ করেন নি। নির্লোভ, নির্লিপ্ত চরিত্র তাঁর। চোখে ছিল এমন একটা সংযত প্রসন্নতা, যা দেখলে মন তৃপ্ত হত।"

মাত্র কয়েকটি কথায় নন্দগোপাল যেন 'বিনোদিনী'-র প্রচ্ছদচিত্রের মতো জগদীশচন্দ্র গুপ্তের সামগ্রিক জীবন ও চরিত্রের বিচিত্র রূপরেখা এঁকেছেন।'

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের সূচনায় ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি'/কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৮০ দ্রষ্টব্য) লিখেছেন:

"জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন অবহেলিত লেখক। অথচ, কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্ঘাটনে তিনি অতি-দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু, জীবৎকালে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি পাননি। জনপ্রিয়তা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের সংস্করণান্তর হয়নি। বর্তমানে, মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর কোনো বই-ই প্রায় মুদ্রিত আকারে ক্রেতাদের সামনে নেই। চাহিদাও নেই। অথচ, সতর্ক পাঠক জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী পাঠ করলে তাঁর বাইরের স্বল্পায়োজনে এবং অন্তরের অতি গভীর মানবিক সম্পদে বিস্মিত হবেন—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়..."

বিনীতভাবে বলছি, অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের উক্তির শেষ অংশটুকু আংশিক সত্য। জগদীশচন্দ্রের কিছু কিছু বই এখনও বাজারে পাওয়া যায়। এই রচনাবলী প্রকাশের সংবাদে পাঠকমহল হতে আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি।

জগদীশচন্দ্র বস্তুতপক্ষে ছোটগল্পকার। তাঁর উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত গ্রন্থগুলিও প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্পের বাঁধুনিতে বাঁধা—আয়তনে মাত্র কিছু বড়। ছোটগল্পকে যেখানেই তিনি প্রলম্বিত করতে গিয়েছিলেন, সেখানেই ব্যর্থ হয়েছেন। (বর্তমান খণ্ডে সংযোজিত 'নিষেধের পটভূমিকায়' নাটকের তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক ডক্টর ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' সমালোচনাগ্রন্থে অতি সুনিপুণভাবে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। সন্দেহ নেই যে, বিশেষভাবে তৎকালীন 'কল্লোল' এবং 'কালিকলম' পত্রিকার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। কিন্তু, তবুও তিনি যেন ঐ দুটি পত্রিকার ভাবধারার তন্ত্রবাহক ছিলেন না। এই বিষয়ে অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন ঃ

'কল্লোল' সমকালীন শিল্পীদের মত পুরাতনের প্রতি কেবল অবিশ্বাসই নয়,—প্রাচীন বিশ্বাসের আমূল ভিতটিকে পর্যন্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচূর্ণ করে দেবার এক দুর্দম স্পৃহা নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্প-শিল্পী জগদীশ গুপ্ত।...সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ-যুগ-প্রচলিত নীতি-চেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ।... ফলে জীবন-সম্পর্কিত সকল নীতি-বোধ ও কল্যাণমূলক মূল্যমানকে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন,—বিশ্ব-প্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক,—ক্রূর এবং কদর্য।...আজ জগদীশ গুপ্তের অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-নিয়মের অমোঘ-বিভীষণ পরিণাম সম্পর্কে তাঁর আত্মিক বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তায়। এত দৃঢ়তার সঙ্গে বিধাতাকে ঘৃণা করতে পেরেছেন বাংলা সাহিত্যের খুব কম গাল্পিকই।...এ-শৈলীকে কঠিন পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,—নিভাঁজ, জমাট, শক্ত এক কালো পাথর, প্রচণ্ড আঘাতেও যা ভাঙে না, দুমড়োয় না, আর দুর্মর দৃঢ়-সংবদ্ধ এই রূপে জগদীশ গুপ্তের আত্মবিশ্বাসের ঘন কাঠিন্যকে তিল তিল আত্মস্থ করেই গড়ে উঠতে পেরেছে। বিশ্ব-নিয়তির বিভীষিকাময় পরিচয় ও পরিণাম সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস তাঁর পক্ষে একান্ত অভ্রান্ত, প্রায় নিজের অস্তিত্বের মতই। এর বিরুদ্ধে শিল্পীর অনুচ্ছ্বসিত, কঠিন, যথাযথ তির্যক স্পষ্টোক্তি আসলে তাঁর আহত আত্মার জমাট আক্রোশেরই অপ্রতিহত কাঠিন্য দিয়ে গড়া।'

'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' ('বিচিত্রা'/ভাদ্র, ১৩৩৬) প্রবন্ধে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় লিখেছেন ঃ 'তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এ সবই যে মিথ্যা, শুধু

তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা, সে এক নির্মম ক্রূরহৃদয় শয়তান। তিনি সর্বত্রই দেখিতেছেন শুধু শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোট গল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন। তাই সেইগুলি হইয়া উঠিতেছে 'রূপে, রসে অদ্বিতীয়'।'

ইতিপূর্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প-সংকলন 'বিনোদিনীর' গল্পগুলির মধ্যে ঐ রূপ ও রসের আস্বাদন পেয়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করে চিঠি লিখলেন, 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।'

কবি, সমালোচক এবং অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' ('সাহিত্য বিতান' সমালোচনা গ্রন্থ) সমালোচনায় লিখেছেন: ···কয়েকজন সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী শক্তিমান লেখকের পরিচয় দিব।···'রিয়ালিজম্' অর্থে আমি অবশ্য একটি বিশেষ মতবাদের কথা বলিতেছি না, সাহিত্যের 'রিয়ালিজম্' অর্থনীতি বা দর্শনশাস্ত্রের 'রিয়ালিজম্' নয়। কল্পনা বা মনোগত রাগ-বিরাগ, এবং ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির সংস্কারমুক্ত হইয়া জীবনকে অকুণ্ঠিতচিত্তে দেখিবার যে ভঙ্গি, অথচ তাহাতেই একপ্রকার রসাস্বাদের যে প্রবৃত্তি, তাহাই সাহিত্যের 'রিয়ালিজম্' আর একটু ব্যাপক বা মূল সন্ধানী হইলে তাহাই 'Naturalism'-এ পরিণত হয়।···পরবর্তীগণের মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারেন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত।···জগদীশচন্দ্র এখনও যথোচিত প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই। (উক্ত সমালোচনাগ্রন্থ ভাদ্র, ১৩৬৮ সালে প্রকাশিত)। অথচ তিনি শৈলজানন্দ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং মনে হয়, তাঁহারাও পূর্বে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন, দুর্জ্ঞেয়, দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন, আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ংকর নয়—যত ভয়ংকর তাহারই সেই অতি-প্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থবুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে—শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদিগকে অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটি বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি, যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত চৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এ সকল যেন তাহারই কদাচিৎ-দৃষ্ট মূর্তি; আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় ইহার ছায়া পড়িত। কিন্তু, এখনও সেই সকল অনুভূতি হয়তো আমাদের চেতনার নির্জন স্তরে সঞ্চিত আছে, অতি প্রাকৃতের সেই বিরাট বেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, নানা ইঙ্গিতে, ইশারায় আমরা সে কথা স্মরণ করিতে বাধ্য হই। জগদীশচন্দ্রের একটি গল্পে, মৃত্যুর পরেই পুনর্জন্ম ঘটানো এবং সেই সম্পর্কে একটি স্বপ্ন এমনভাবে বিবৃত হইয়াছিল—যাহা একটি লৌকিক কুসংস্কারমাত্র, তাহাও গুরুতর রহস্যভাবের মতো মনের উপর চাপিয়া বসে। এই ঘটনাটি সত্য বলিয়াই মনে হয়, অর্থাৎ, কোনও একটা অর্থে কোথাও ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু, লেখকের নিজস্ব কল্পনা ও রচনাভঙ্গি ইহাতে এমন একটা রূপ দিয়াছে যে, তাহা

অপেক্ষা bizarre বা uncanny কিছু বাংলা গল্পে আর কোথাও ফুটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয়, কারণ, ইহা normal বা সুস্থ নয় ; তথাপি, ইহাও আর্টের পর্যায়ভুক্ত। জগদীশচন্দ্র ইহাতেও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন...।'

'বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর' প্রবন্ধ সঙ্কলন গ্রন্থে 'উপন্যাসের ভাষারীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যময় উপন্যাস-ভাষার স্রষ্টা হিসেবে জগদীশ গুপ্তর···নাম অবশ্যকর্তব্য। যে দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট জগদীশ গুপ্তের লেখায় বারে বারে ছায়া ফেলেছে তারই স্পর্শের হিম-শীতলতা যেন জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যের ভাষাশৈলীতে অনুভবগম্য। যাকে আপাতদৃষ্টিতে অমনোযোগ বলে মনে হয়, তা যে আসলে এক গূঢ় মনোযোগেরই নামান্তর, জগদীশ গুপ্তের লেখায় তা খানিকক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায়।'

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-শৈলীর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো লিখেছেন ঃ···প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো জগদীশ গুপ্তের অন্তর্দৃষ্টির একটি নিজস্ব অখণ্ড গঠন, রবীন্দ্র-অতিক্রমণ জাতীয় কোনো সৌখিন সাহিত্য-অভিরুচি এই অন্তর্দৃষ্টির রচয়িতা নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী-প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। সেই গভীর তাৎপর্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়।'

* * *

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা সম্পাদকের দপ্তরে সংকলিত হয়েছে। স্থানাভাববশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে আর সংযোজন করা সম্ভব হলো না। এই খণ্ডে তৎকালীন 'কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখিত জগদীশ গুপ্তের তেত্রিশখানি পত্র অত্র-খণ্ডের সংকলন-বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে। ঐ পত্রগুচ্ছ হতেও তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক-জীবনের প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

**জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী**

প্রথম খণ্ড

সংখ্যা হিসেবে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি বিপুল নয়। এই পর্যন্ত যে সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাঁইত্রিশ। এদের মধ্যে অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংযোজিত গ্রন্থের কয়েকখানিও বিশেষ অনুসন্ধানের পরে পাওয়া গেছে। তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা চারুবালা গুপ্তা একটিও অখণ্ড গ্রন্থ আমাদের সরবরাহ করতে পারেন নি। এমন কি, জগদীশচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থরাজির তালিকাও তাঁর কাছে নেই। তাঁর অপ্রকাশিত নাটক 'নিষেধের পটভূমিকায়' রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হলো। জগদীশচন্দ্রের বহুতর রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেই সকল সংগ্রহ করবার প্রচেষ্টাও চলছে।

রচনাবলীতে আমরা সাধারণতঃ গ্রন্থপ্রকাশের কালক্রম অনুসরণ করে সংযোজনা করে থাকি। বর্তমান রচনাখণ্ডে তা সম্ভব হয়নি। যখন যে বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে,

সেইখানাকেই রচনাবলীভুক্ত করা হয়েছে। এইজন্য, সংযোজনায়ও কিছু ত্রুটি লক্ষ্যিত হবে। এই খণ্ডে সংযোজিত গল্প-সংকলন 'উদয়লেখা' তাই সর্বশেষে সংযোজিত হয়েছে।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে নিম্নলিখিত রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে ঃ

উপন্যাস ।। লঘু-গুরু, অসাধু সিদ্ধার্থ, মহিষী, দুলালের দোলা, তাতল সৈকতে, নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ।

অপ্রকাশিত নাটক ।। নিষেধের পটভূমিকায়।

গল্প-গ্রন্থ ।। বিনোদিনী, উদয়লেখা।

সংকলন ।। গল্প, কবিতা ও পত্রগুচ্ছ।

১। লঘু-গুরু। উপন্যাস। ৩-৬৯ পৃষ্ঠা।

উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯২৮/২৯ ( ? )। ১৩৩৮ সালে নাথ ব্রাদার্স ( কলকাতা ) উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। প্রকাশক ঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, ২৩-সি, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলকাতা ; ১৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

এইটিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ সনে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলীর' এক খণ্ড প্রকাশ করে। উক্ত খণ্ডে এই উপন্যাসটি সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমান খণ্ডে সেই পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরে লেখক একখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। পাঠান্তে কবিগুরু 'পরিচয়' পত্রিকার কার্ত্তিক/১৩৩৮ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ সমালোচনা করেন—

'যে-বই পড়ার জবাবদিহি আছে, সে-বই পড়তে সহজে রাজি হইনে। আমার বয়সে কর্তব্যের চেয়ে অবকাশের মূল্য অনেক বেশি। বিশেষতঃ, যে কর্তব্য আমার অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে।

তবু, লেখকের অনুরোধ রক্ষা করেছি, তাঁর "লঘু-গুরু" বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তার আছে, এ কথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।

লেখকের ক্ষমতা আছে বললে বোঝায়, লেখক যেটাকে লেখেন, সেটাকে পাঠ্য করে তুলতে পারেন, সেটা পথ্য না হলেও। সাহিত্য সম্পর্কে পথ্য কথাটা বলতে এ বোঝায় না যে, জ্ঞানের দিক থেকে সেটা পুষ্টিকর, বা নীতির দিক থেকে সেটা স্বাস্থ্যজনক। যেটাকে মন সম্পূর্ণ সায় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে, সেটাই পথ্য। মন যেটাকে বিশ্বাস করতে পারে, সেটাকেই গ্রহণ করে। এস্থানে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিললে তো কোন কথাই নেই, নইলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দরকার। সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে, কিন্তু, তাতে সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই বলে হলফ করে, আমার কথা যতই মিথ্যে হোক্, তবু সেটা সত্য।

লঘু-গুরু গল্প সম্বন্ধে যদি জজিয়তি করতেই হয়, তা হলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এ-দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায়

উঁকি মেরে এসেছেন। আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, লেখক আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাখিল করেছেন, কিন্তু, তার যথেষ্ট সমর্থনের যোগাড় করতে পারেননি। যেটা দেখাতে চেয়েছেন, তিনি নিজে তার সবটাই যে দেখেছেন এমন লক্ষণ অন্ততঃ লেখা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

গল্পের প্রথম নায়ক বিশ্বম্ভর তার ভগিনীপতি লালমোহনকে নিয়ে দেখা দিলে। লেখকের কাছ থেকে কোনো একটা বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে আসেনি। তার থেকে ঠিক করে নিলুম, আমাদের দেশে সচরাচর যাদের ভদ্রলোক বলে থাকে, দেখা হলেই যাদের বলে থাকি, এই যে মশায়, ভালো আছেন তো, এও তাদেরই দলের। অতএব চৌকিটা এগিয়ে দেবার পূর্বে প্রশ্ন করবার দরকার নেই।

আরো খানিকটা গিয়ে যে পরিচয়টুকু পেলুম, তাতে জানা গেল, মদের আসরের উপকরণ জোগাতে আলস্য করছিল বলে বিশ্বম্ভর তাড়া করাতে তার অসুস্থ গর্ভিণী স্ত্রী পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাতে মারা যায়। যাদের আমরা চৌকি এগিয়ে দিই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব বিশ্বম্ভরকে ভদ্দরশ্রেণীর লোক বলে মেনে নিতে এখনও সন্দেহের কারণ ঘটল না।

তারপরে হঠাৎ শুনি, বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় "উত্তম" নামধারিণী এক বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হোলো। এটাও ভদ্দরলোকের লক্ষণে বাধে না। কিন্তু, বেশ্যাকে যখন নিজের শিশু-মেয়ের বিমাতা পরিচয় দিয়ে ঘরে তুলে নিলে এবং পাড়ার মেয়েরা প্রথমটা ছি, ছি করেও অবশেষে একদিন সয়ে গেল, তখন মনে ভাবনা এলো এই যে, স্ত্রী-হত্যা প্রভৃতি ধর্মবিরুদ্ধ অপরাধ ভদ্দরলোকের পক্ষে মার্জনীয় বটে, তবু বেশ্যাবিবাহের মতো সমাজবিরুদ্ধ অপরাধ তো তেমন চুপচাপে সমাজে পার হয় না। তখন মনে হোলো যে, নায়কের যে পরিচয়ে এটা সম্ভব মনে হতে পারত, গল্পের গোড়া থেকেই সেই বিশেষ পরিচয়টা সাজিয়ে রাখা উচিত ছিল। সেটা না হওয়াতে মানুষটার প্রতি নেহাৎ অবিচার করা হয়েছে। হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে লোকটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য—তবু, আমরা যে ওকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারলুম, বিশ্বম্ভরের দোহাই মেনে সেই তার প্রতি সন্দেহের সম্ভাবনাটুকু চুকিয়ে রাখা উচিত ছিল।

তারপরে ভাবে, ভঙ্গিতে বোধ হচ্ছে, এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায়, আচরণে উপরের স্তরের ছিল। সেটাও লেখকের জবানবন্দীর উপর বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। উত্তমের এই দিককার ছবিটা একেবারে বাদ দিয়েই সুরু করা হয়েছে। উত্তম যদি সাধারণ বেশ্যার মতোই হত, তা হলে পাঠকের কল্পনার উপরে বরাৎ দিয়ে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখলে কোনো অসুবিধা ঘটত না। কোনো এককালে তার পতন হয়েছে বলেই যে, সে মেয়ে একেবারে নষ্ট হবে, এমন কথা নেই, কিন্তু সেটা প্রমাণের দায় লেখকের পরে। অর্থাৎ, পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে, পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, এই তত্ত্বটাকে একটা চমক-লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে। সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণ-বাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙিয়ে তোলায় যত বড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে, তাকে সেণ্টিমেণ্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজমের নাম দিয়ে এ কালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ। যেটা সহজ, সেই তো আর্টের বিপদ ঘটায়।

দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ, এইজন্যই দেশাভিমানী কাব্যে, গল্পে আর্ট জিনিষটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে। দুঃখে, অপমানে উত্তমের প্রায়শ্চিত্তই এই আখ্যানের প্রধান বস্তু, এইজন্যেই উত্তমের চরিত্রকে সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। বেশ্যাবৃত্তিতে যে-মেয়ে অভ্যস্ত, সে-ও একদা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্য গৃহিণীর জায়গা নিতে পারে, এই কথাটাকে স্বীকার করিয়ে নেবার ভার লেখক নিয়েছেন, কিন্তু ধরেই নিয়েছেন, আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করব। তারো কারণ, আধুনিক রিয়ালিজ্‌মের সেণ্টিমেণ্টালিটিতে এই কথাটির বাজার দাম বাঁধা হয়ে গেছে।

এই গল্পে দুইজন পুরুষ নায়ক, বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ। একজন স্বভাবান্ধ ইতর, আর একজন কোমর-বাঁধা সয়তান। বিশ্বম্ভরের ছবিটা ইতরতার নোংরা রঙে বেশ মূর্তিমান। মানুষটি অকৃত্রিম ছোটোলোক, সম্পূর্ণ অসঙ্কুচিত। ইতরতা পদার্থটা সংসারে সুলভ, তার নানা পরিচয় নানাবেশে চারিদিকেই দেখা যায়, কিন্তু খাঁটি সয়তানী এত সামান্য নয়, খাঁটি সাধুতার মতোই সে দুষ্প্রাপ্য। সয়তানীর পাঁচফোড়নে সাঁৎলিয়ে তৈরি মানুষ হাজার হাজার আছে, কিন্তু হাড়ে, মাসে ষোল আনা সয়তানীতে যাদের ক্ষণ-জন্মা বল্‌লেই হয়, ভাগ্যক্রমে পথেঘাটে তাদের দর্শন মেলে না। অতএব তাদের বিশ্বাস-যোগ্য ছবি বিশেষ যত্ন করে না আঁকলে বাস্তবতার তৃপ্তি পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভরের পালার পটপরিবর্তনের পরেই এল পরিতোষ, যে-উত্তম অন্তরে সাধ্বী, বাহিরে অসতী, যেন তাকেই শাস্তি দেবার জন্য ধর্মরাজ ঐ জীবটিকে টাট্‌কা বানিয়ে পাঠিয়েছেন, শাস্তির প্যাঁচকলে একটা পাকের পরে আরো একটা পাক দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু, নিঃসন্দিগ্ধ দলিল চাই। এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে, রবিবাসরিক খৃষ্টান স্কুলের হেডমাষ্টার লোকশিক্ষার জন্যে ওকে জুজু সাজিয়ে পাঠিয়েছেন।

যাই হোক্, এ কথা মানতে হবে, রচনা-নৈপুণ্য লেখকের আছে। আধুনিক আসরে রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন যদি তাঁকে পেয়ে বসে, তবে তাঁর ক্ষতি হবে। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে বাস্তব-প্রবণতা বা ভাবপ্রবণতা নিয়ে জাতিভেদের মামলা তোলা প্রায় আধুনিক কমুনালিজ্‌মের মতোই দাঁড়িয়েছে। অথচ, সাহিত্যে ওর মধ্যে কোনটারই জাতিগত বিশেষ মর্যাদা নেই। সাহিত্যে সম্মানের অধিকার বহির্নির্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে। অর্থাৎ, পৈতে নিয়ে নয়, গুণ নিয়ে। আধুনিক একদল লেখক পণ করেছেন তাঁরা পুরাতনের অনুবৃত্তি করবেন না। কোনোকালেই অনুবৃত্তি করাটা ভালো নয়, এ কথা মানতেই হবে। নরসংহিতাসম্মত ফোঁটা-তিলকটা, আধুনিকতাও গতানু-গতিক হয়ে ওঠে। সেটার অনুবৃত্তিও দুর্বলতা। চন্দনের তিলক যখন চলতি ছিল, তখন অধিকাংশ লেখা চন্দনের তিলকধারী হ'য়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্যসমাজে চল্‌তি হয়ে ওঠে, তা হলে পঙ্কের বাজারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে চড়ে যায়। বঙ্গবিভাগের সময় দেশী চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে, বিদেশী চিনিকে মাটি মিশিয়ে দেশী করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা, রসিকেরা মাটির রং দেখ্‌লেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়ালিজ্‌মের রং ধরবে এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি। মানুষের এমন সব প্রবৃত্তি আছে, যার উত্তেজনার জন্য গুণপনার দরকার করে না। অত্যন্ত সহজ বলেই মানুষ সেগুলোকে নানা শিক্ষায়, অভ্যাসে, লজ্জায়, সঙ্কোচে সরিয়ে রেখে দিতে চায়,

নইলে বিনা-চাষেই যে-সব আগাছা ক্ষেত ছেয়ে ফেলতে পারে, তাদের মতোই এরা মানুষের দুর্মূল্য ফসলকে চেপে দিয়ে জীবনকে জংগল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের বহুযুগের। কিন্তু, সাহিত্য-বিচারে এ-সম্বন্ধে নৈতিক ক্ষতির কথা তুল্‌তে চাইনে। আমার বলবার কথা এই যে, যে সকল তাড়িখানায় সাহিত্যকে শস্তা ক'রে তোলে, রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে তার ব্যবসা-চালানোয় কল্পনার দুর্বলতা ঘটবে। এ-রকম শস্তা মাদকতা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, সমাজেও। আজকের য়ুরোপ তার প্রমাণ। সেখানে অন্যযুগেও ক্ষণে ক্ষণে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদ্যাসুন্দরও সেই জাতের সাহিত্য, এককালে বাংলাদেশে প্রচুর বাহবা পেয়েছিল। তখনকার বাবুয়ানাও ছিল ঐ ছাঁদের, নাগরিকতা যাকে বলা হত, তার ইংরেজি প্রতিশব্দ সিটিজেন্‌শিপ্‌ নয়। হুতুম প্যাঁচার নক্‌সায় তখনকার আবহাওয়ার একটা আমেজ পাওয়া যায়। একটা বাঁধন-ছেঁড়া মাতামাতি, তার মধ্যে বৈদগ্ধ ছিল না, কেবলমাত্র ছিল বেআব্রুতা। কিন্তু, তবু সেটা টিকল না। সেই নব কলিকাতার নবীন যুগের কাদা-গোলা জলে সাহিত্যকে হোলিখেলা দেখতে দেখতে সরে পড়তে হলো। তার কারণ, ফ্যাশানের চাঁড়-মন্দির উপরেও যে একটা নিত্যরসের পসরা আছে, বাজারদর যতই বাঁক ফিরিয়ে চলুক, তারই আমদানী হয় বারে বারে ফিরে ফিরে, বস্তুতঃ সেই হচ্ছে নিত্য আধুনিকের সামগ্রী। আজ এই কথাটাকে অবজ্ঞা করা সহজ, কিন্তু কালকের দিন আজকের দিনের এক প্রহরের পায়ের তলায় কাদা-চাপা পড়েনি।

একটা কথা বলা উচিত, প্রসংগক্রমে রিয়ালিজ্‌ম নিয়ে যে কথাটা উঠে পড়ল, তার সমস্তটা "লঘু-গুরু" বইটি সম্বন্ধে খাটে না। এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে, তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই। পূর্বেই বলেছি যে, গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্ছে না, এইটেতেই আমার আপত্তি।'

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত সমালোচনার উত্তরে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তব্য 'নিবেদন' করেন। উক্ত বক্তব্যটি তাঁর 'উদয়লেখা' গল্প-সংকলনের মুখবন্ধ হিসেবে মুদ্রিত হয়। নিম্নে সেই নিবেদনটি উদ্ধৃত হলো—

'নিবেদন—আমার "লঘু-গুরু" বইখানি সম্বন্ধে জজিয়তি করিতে বসিয়া বিভিন্ন জজগণ যে রায় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে পরিচয়ে প্রকাশিত রায়টিই প্রধান—কারণ, তাহার ঘোষক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ; এবং দ্বিতীয় কারণ, বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে, অর্থাৎ, আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাহা আসামীর নির্দোষ জনককে আক্রমণ করিয়াছে ! কিন্তু আপীল নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ "লঘু-গুরু" গল্প সম্বন্ধে যদি জজিয়তি করতেই হয়, তা হলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হয় যে, এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে ; সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এ-দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বললেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"

পুস্তকের শেষ অংশের চেহারাটাকে তার অভদ্র হুলের দরুণ নিঃসন্দিগ্ধ পুস্তক-পরিচয়ের মত দেখাইতেছে না—ইহাতেই আমার আপত্তি।

"অনতিপরিচিত" এবং "ও-জায়গা" শব্দ দু'টী অত্যন্ত রিয়ালিষ্টিক সন্দেহ নাই—কারণ,…"বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় 'উত্তম' নামধারিণী এক বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হোলো।" "লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল" আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে "স্বভাবসিদ্ধ ইতর" এবং "কোমর বাঁধা শয়তান" নিশ্চয়ই আছে ; এবং বোলপুরের টাউন-প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, "ও-জায়গা" আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু, তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ, উহা সমালোচকের "অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে" এবং তাহার "সুস্পষ্ট প্রমাণ" ছিল না।

স্থানাভাবে এই নিবেদনটি ইতিপূর্বে ব্যক্ত করিতে পারি নাই। শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

বোলপুর। ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৯।

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত 'আধুনিক' সাহিত্য-সমালোচক। উক্ত উপন্যাসটি আলোচনাপ্রসঙ্গে উপসংহারে তিনি বলেন : 'নাট্যকারের নির্লিপ্ত জগদীশবাবুর আদর্শ বলে তিনি উপন্যাসে যৎপরোনাস্তি স্বল্পভাষী।. এ-স্বল্পভাষিতা কখনো কখনো তাঁকে ত্রুটির সীমায় উপনীত করেছে। করেনি যে-সমস্ত ক্ষেত্রে, উত্তম তার অন্যতম। উত্তম চেয়েছিল টুকির জন্য তার সমস্ত ক্ষেত্রে অতীতকে মুছে ফেলতে।…টুকির অন্ধকারে অন্তর্ধানের ভেতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমের সাধনার অন্ধকারে বিলুপ্ত—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বম্ভর, পাড়া-প্রতিবাসী, বিশ্বম্ভরের বন্ধুবান্ধব সকলের কাছ থেকে শুধু আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ-রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম। লঘুগুরু তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ করি জগদীশ গুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।'

২। অসাধু সিদ্ধার্থ। উপন্যাস। ৭১—১৫২ পৃষ্ঠা।

উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশের তারিখ নেই। খুব সম্ভবতঃ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৩৬ সালে ( সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ )। ক্রাউন, ১৯৩ পৃষ্ঠা। মূল্য একটাকা চার আনা। উৎসর্গ—'ছায়াপথ যার আভরণ, ধূমকেতু যার কলঙ্ক, সেই শূন্যকে'।

এই উপন্যাসটির কাঠামো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদ্বীপ' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়। প্রভাতকুমারের সাহিত্যের দ্বারা জগদীশচন্দ্র বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রভাতকুমারের গল্প সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন : 'কালের নিকষমণিতে কতদিন পর্যন্ত টিকিতে পারিবে, তাহা অনুমান করা শক্ত।' ( 'কল্লোল'/ভাদ্র, ১৩৩৪)। বস্তুতঃপক্ষে এই মন্তব্যের উত্তরে জগদীশ 'কালি-কলম', পৌষ, ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রভাতকুমার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ আলোচনা করেন। সাহিত্য বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের কিছু মতামতও এই আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই উক্ত প্রবন্ধ হতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

'…গভীর উদ্দেশ্য লইয়া, নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোনো অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া তিনি ( প্রভাতকুমার ) অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই, মানুষের স্বাভাবিক আত্মস্থ অবস্থাটা যাহা চায়, তাহাই তিনি মনের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্য হইতে দানগ্রহণের সার্থকতা

আছে ; কিন্তু, তাহার ভাণ্ডারে দান করিতেছি মনে করিয়া লেখনীচালনার সার্থকতা নাই। বিশ্বসাহিত্য অন্ধ নহে ; যেখানকার যে-সৃষ্টি, তাহার অংশ সে তাহাকে নিজেই টানিয়া লইবে, দান আনিয়াছি বলিয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াইবার দরকার নাই। নরনারীর যৌনসমস্যা যে স্বল্পক্ষেত্রেও এত জটিল এবং পাত্রপাত্রীর দৈহিক সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ ও বিবাহনিরপেক্ষ, তাহা তখনকার দিনে প্রভাতবাবু কল্পলোকে ফুটিতে দেখেন নাই, অথবা দেখিলেও দেখান আবশ্যক মনে করেন নাই।'

কাঠামোর সামঞ্জস্য থাকলেও জগদীশচন্দ্রের নটবর প্রভাতকুমারের 'রত্নদ্বীপের' রাখালের চেয়ে অনেকাংশে বাস্তব। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ দুটি চরিত্রের তুলনা করতে গিয়ে বলেন :...( ছদ্মবেশী ) রাখালকে বঙ্কিমের moral teaching-এর অনুবর্তী প্রভাতকুমার ফুটিয়েছেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে তিনি সার্থককাম। জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যরকম। "নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ"—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট-লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।...দেখা যায় রূপকের আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সত্ত্বেও জগদীশবাবু নটবরের জীবনের মৌল-সমস্যাকে বিশ্ব-জীবনের মূল ধারার সংগে অন্বিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রভাতবাবুর পক্ষে রাখালের পাপ-সাধ্যের সীমা হল রাখালের ( মূলতঃ অব্যবহৃত ) দ্বন্দ্বের হেতু। এখানে দেখানো হলো, পাপ-ক্ষমতার ভিতর দিয়েই প্রকাশমান পৃথিবীর শাশ্বত নিরাময়-সঞ্চারিণী শক্তি। সে জীবনান্তের বাসনায় ছলনার পথের পথিক—সেই বাসনার এমনই অন্তর্নিহিত অমৃত-ধারা যে, তারই এক অঞ্জলিপানে পাপও, ছলনাও অমর হতে চায়। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য-নির্মাণের দিক থেকে জগদীশবাবুর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমারের থেকে একপদ অগ্রবর্তী।'

৩। মহিষী। উপন্যাস। ১৫৫-২০২ পৃষ্ঠা।

কালিদাস রায় সম্পাদিত বসুধারা পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স-এর পক্ষে, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন হতে শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী। মূল্য দেড় টাকা।

একবার প্রবাসীতে ১০০ খানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে 'মহিষী' উপন্যাসখানি স্থান পেয়েছিল।

৪। দুলালের দোলা। উপন্যাস। ২০৩-২৬২ পৃষ্ঠা।

এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। ১৩৩৮ সন। ক্রাউন ১৩০ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা। উৎসর্গ : শ্রীচারু গুপ্তা কল্যাণীয়াসু।

এই উপন্যাসের একটি অংশ 'বেলোয়ারী টোপ' নামে গল্প হিসেবে 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে শ্রীসাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'শতবর্ষের শত গল্প' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। অংশ-বিশেষটির জন্য রচনাবলীর ২১৬ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা হতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

উপন্যাসটির ভূমিকায় জগদীশচন্দ্র লিখেছেন :

'এই লেখাটির ভিতরকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা ভূমিকাস্বরূপ বলিতে চাই। ইহাতে "প্লট্" নাই—আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র ; গল্পতৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তু সংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই। "রোমন্থন" লেখাটিতে তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখানো হইয়াছে। ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফলপ্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক আর না-ই থাক্, পল্লীর সংগে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না। শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত বোলপুর ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮।'

স্ত্রী চারুবালা জানিয়েছেন : 'একবার বোলপুর হইতে তিন চার মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি যাইয়া থাকেন। সেই সময়ে 'দুলালের দোলা' আর 'রোমন্থন' নামে দুখানা বই লেখেন।' সুতরাং, উক্ত দুখানা গ্রন্থের বক্তব্য ও লিখন-শৈলীর মধ্যে সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

উক্ত উপন্যাসের চুম্বক এই যে, এক গর্ভিণী রমণী স্বামীর যৌনক্ষুধায় উত্যক্ত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে। নিদারুণ জ্বালার এই বোধ হয় একমাত্র সমাধান ছিল। 'জগদীশ গুপ্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ( 'চতুষ্কোণ', আশ্বিন/১৩৮৪ দ্রষ্টব্য ) শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'দুলালের দোলার' সতীশ আর এক ভাগ্যহারা মানুষ। তার বংশে কলঙ্ক ছিল। পিতামহীর অসতী অখ্যাতি ছিল। এই কানাকানি, এই কলঙ্কের পসরা সতীশের মনে বিকার ঘটিয়ে তুলল। পরিবারস্থ সকলের চরিত্র সম্বন্ধে তার সংশয়। নিজের স্ত্রী, কন্যা, সবাই চরিত্রহীনা। এই বদ্ধমূল ধারণা সে সর্বত্র বলে বেড়ায়। সে এক দারুণ ম্যানিয়াক, দুর্বিষহ মনোবিকারের শিকার। নিদারুণ অন্তর্দাহে একটা নিরপরাধ মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে ধীরে ধীরে বিনষ্ট করেছে। লেখক বলেছেন—"একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে নামাইবার স্থান নাই। তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছটফটানির অন্ত নাই।"

'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ( কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ) রবীন্দ্রনাথকৃত জগদীশচন্দ্রের 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যায় ( মাঘ, ১৩৩৮ ) 'দুলালের দোলা' উপন্যাসটির সমালোচনা করেন শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য—

'লেখক প্রথমেই বলেছেন গল্পতৈরী তাঁর উদ্দেশ্য নয় ;—আসল উদ্দেশ্য, ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করা। ভূমিকায় স্পষ্ট করে লিখেছেন, "ঘটনার গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্, পল্লীর সংগে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা দূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।" অর্থাৎ পল্লীগ্রামে গিয়া কোনো ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন। আর গল্পটা, অর্থাৎ ঘটনাটা এই-প্রবাসে প্রতিপালিত এক যুবক দেশে বেড়াতে এসে প্রথমে পল্লীসৌন্দর্য দেখে ও পিসিমার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল—কিন্তু পরে ঘরে ঘরে যে রকম জাতিভেদ আর ছোঁয়াছুঁয়ির

ব্যাপার দেখলে, লোকের নানারকম কুকীর্তির কাহিনী শুনলে,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে তাকে থালা মেজে দিয়ে আসতে হয়েছিল—তাতে সে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে অপর এক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে এবং দুকথা শুনিয়ে দিলে। এ-ব্রাহ্মণ ছিল চোরের সর্দার, কাজেই এরই ফলে চোরে সিঁদ কেটে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ অমর্যাদার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়ে তার দেশ ছেড়ে পালাতে বিলম্ব হোলো না। লেখকের ভাষা বেশ স্পষ্ট, অলঙ্কারবহুল, ভাবেও অভাব নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এই সব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য ব'লে মেনে নিতে হবে ? নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ছেলেকে পরম আপ্যায়িত ক'রে শেষে তাকে বাসন মাজতে বলা অস্বাভাবিক নয় কি ? গ্রামে কি কলাপাতারও অভাব ছিল ? এ-ছাড়া, পাড়াগাঁয়ে অবশ্য সহরের সভ্যসমাজের মত মিহি গলায় রকমারি সুরের "বর্ষামঙ্গলের" গান শোনা যায় না বটে কিন্তু লেখক যে রকম বিকৃত ভাষায় বিচিত্র ঢংয়ের গানের উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর শ্লেষ করবার বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কোনো মজলিসে বাস্তবিক তেমন গান শোনা যায় না। পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত বা অশিষ্ট হ'তে পারে কিন্তু অভদ্র হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুটি চাষীকে উচ্চমনা ক'রে তাদের মুখে কত তত্ত্বকথা শোনালেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের গৃহস্থদের এত হীন ক'রে দেখালেন কেন বোঝা গেল না। আর শেষকালে একটা সামান্য অজুহাতে practical joke স্বরূপে চুরির কাণ্ডটা ঘটালেন, কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করেন না। আর এক কথা, এক আশী বছরের বুড়ো চাষীর মুখে শোনালেন,—"ধর্মপত্নী কথার কোনো মানে নেই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল,—তার দেহটাই আসল।" এ কথা লেখকের মুখে শোভা পেতে পারে, কিন্তু ঐ বুড়োর মুখে নয়।

জাতিভেদ, প্রভৃতি পল্লীজীবনের এই দিকটা নিয়ে অনেকটা এই ধরণের লেখা আর একটি গল্প অনেকদিন আগে বেরিয়েছিল—খ্যাতনামা নাট্যকার ৺ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "চাঁদের আলো"। তাতেও গল্পের নায়ক গ্রামে নবাগত এক প্রবাসী বালক,—বাড়ী আগলে থাকেন এই রকম এক পিসিমা। ঘটনার মধ্যে এমনই জাতি বিচার ও ছোঁয়াছুঁয়ির গণ্ডগোল, এবং আশ্চর্যের বিষয়, তাতেও এক ধোপার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সংশ্রব ও তার আত্মহত্যার কথা আছে। ভাষাও তেমনি অলঙ্কারবহুল। অবশ্য অন্যান্য ঘটনার বিস্তর প্রভেদ আছে,—আর সেটা আদিরসমিশ্রিত একটা নিছক গল্প, আর এটি গল্পচ্ছলে প্রবন্ধ। তবে তুলনা করলে বুঝা যায় যে, ঘটনার একটা সামঞ্জস্য আছে,… আর তাতে ছুঁৎমার্গের কেবল আচার-বিচারের কথাই নেই, তার একটা শেষ মীমাংসা আছে। যাই হোক্, এই বই লেখার সার্থকতা কোথায় জানি না। প্রবাসী বাঙালীর কাছে দেশের এই চিত্র উপস্থিত করলে তারা আর দেশে ফিরবার কথা ভাবতেও ভয় পাবে। লেখকের ভাষা ও ভাব দুই বিষয়েই দখল আছে, কিন্তু ঘটনাবৈষম্য আর সহজ বিবেচনা শক্তির অভাবে বইখানি গল্প হিসেবেও জমেনি, প্রবন্ধ হিসেবেও স্থান পেতে পারে না।'

৫। তাতল সৈকতে। উপন্যাস। ২৬৩-৩৩২ পৃষ্ঠা

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। যে বইখানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার নামপত্রটি নেই। অতএব প্রথম প্রকাশের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হলো না। কিন্তু, উপন্যাসটির মুখপত্রে (২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হতে আন্দাজ করা যায় যে, এইটি ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভ্রাতা শ্রীমান ক্ষিতিশচন্দ্র গুপ্তকে উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

৬। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ। উপন্যাস। ৩৩৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা

এই উপন্যাসটি অন্যান্য আরও চারজন ঔপন্যাসিকের চারটি উপন্যাসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উপন্যাসপঞ্চক নামে প্রকাশিত হয়। নামপত্র না থাকায় প্রকাশক এবং প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য উপন্যাসের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে রয়েছেন—আশালতা দেবী। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

৭। নিষেধের পটভূমিকায়। নাটক। ৩৫৯-৪২৯ পৃষ্ঠা

জগদীশচন্দ্রের 'মেঘাবৃত অশনি' ( ১৩৫৪ সাল ) গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'শঙ্কিত অভয়া'। এই গল্পটিকে প্রলম্বিত করে তিনি উপন্যাসে পরিণত করেন। উক্ত উপন্যাসটি কমলা পাবলিসিং হাউস ( ৮।১এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা ) ১৩৫৯ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশ করে। ৪+১৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

উক্ত উপন্যাসটির একটি নাট্যরূপ জগদীশচন্দ্রের দপ্তরে পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে ছিল। চারুবালা দেবীর আনুকূল্যে পাণ্ডুলিপিটির উদ্ধার হয় খুব জীর্ণ অবস্থায়। যাহা হোক, সেই পাণ্ডুলিপি হতেই এই নাটকটি রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়।

স্থানাভাববশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে আকর গল্পটি এবং উপন্যাসটির সংযোজন করা যায়নি। পরবর্তী খণ্ডে ঐ দুটিই মুদ্রিত হবে। সেই সময়েই উক্ত গল্প, উপন্যাস এবং নাটকটির তথ্য পরিবেশন করা হবে।

৮। বিনোদিনী। গল্প-সংকলন। ৪৩৩-৪৯৯ পৃষ্ঠা।

এই গল্প-সংকলনটির প্রকাশক শ্রীব্রজবল্লভ বসু, বোলপুর, বীরভূম। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৩৪ সালে। মুদ্রক ঃ শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য, দি মডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬৬।১ এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ১।৮ ফুলস্ক্যাপ সাইজ। ৮+৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা মাত্র। উৎসর্গপত্রে 'মলয়'-কে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা রয়েছে। তারপরেই 'গল্প কেন লিখলাম' বলে লেখকের কৈফিয়ৎ। ( কবিতা এবং 'কৈফিয়ৎটির জন্য রচনাবলী'র ৪৩৪ এবং ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সংকলনটিতে নিম্নলিখিত মোট আটটি গল্প রয়েছে—

দিবসের শেষে, ভরা সুখে,
এইবার লোকে ঠিক বলে,
অন্নদার অভিশাপে, পুরাতন ভৃত্য,
প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী, প্রয়োমুখম্,
ও তৃষিত আত্মা।

এই গল্প-সংকলনটি প্রকাশের পিছনে একটি সকরুণ ইতিহাস রয়েছে। লেখক নিজেই সেটি বিবৃত করেছেন তাঁর 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' সংকলনের ভূমিকা হিসেবে। সেইটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

## ভূমিকা

কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কবে গল্প লিখতে শুরু করি, অর্থাৎ "ইনি জগদীশবাবু, গল্প-টল্প লেখেন", এই গৌরবমূলক পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, প্রথম গল্প কোন্‌টা, প্রথম বই কোন্‌খানা, কত বয়সে লিখিতে আরম্ভ করি, কি অনুপ্রেরণার বশে কলম ধরি, বাতিকে না তাগিদে, ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে আমার লেখা এবং আমি সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করি না ; কারণ, ঐ সব সংবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছু নাই, যে-মানুষের পরের ঘরের খবর জানার কৌতূহলে দিবারাত্র অস্থির ঠেকে তারও আমার জন্মতারিখ জানার কৌতূহল থাকা সম্ভব নয়। আমার লেখা ভাল লাগিলে পাঠক তাহা গ্রহণ এবং স্বীকার করিবেন—ভাল না লাগিলে নাকচ করিয়া দিবেন—গণনার ভিতর আনিবেন না। পাঠকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল ঐটুকু—তদতিরিক্ত কিছু চিন্তা বা অনুভব আমিই করি না—পাঠক করিবেন কেন ?

আমি কেমন লিখি বিচার্য বিষয় হইবে তাহাই। দেশের সেবা করিতে যাইয়া জেল খাটিয়াছি কি না, গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেকে একদা নিযুক্ত করিয়াছিলাম কি না, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছি কি না, দরিদ্রগণে যথাসাধ্য ভরণ করিয়াছি কি না, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি কি না, এ-সবও অবান্তর। আমার লেখা পড়িবার সময় আমার লেখার সর্বাঙ্গীণতা ও সর্ব্বজনীনতা, অনুভূতির প্রখরতা, প্রকাশের ভঙ্গি, বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে ভাবাভিব্যক্তির উৎকর্ষ, ইত্যাদি গুণাগুণ পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এবং লক্ষ্য করিবেন, জীবন্ত কোনো রসাশ্রিত সামগ্রী আমি তাঁহাদের উপভোগের জন্য দিতে পারিয়াছি কি না। আমার জন্মের ও প্রথম বই-প্রকাশের সন-তারিখ, আর, বইয়ের তালিকা কোনোই কাজে লাগিবে না যদি লেখা ভাল না হয়—তা ব্যর্থ হইবেই।

শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবু ১৩৫৬/অগ্রহায়ণের পূর্বাশায় প্রকাশিত "কল্লোল-যুগ" প্রবন্ধে একটি অকপট সত্য অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই "অনুপস্থিত"। এই একটি শব্দ, "অনুপস্থিত" শব্দটি, আমার সঙ্গে পাঠকের যোগরেখা চমৎকার নির্বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। একটি শব্দের দ্বারা এতটা সত্যের উদ্ঘাটন আমার পক্ষে ভয়াবহ হইলেও আনন্দপ্রদ। সরল ভাষায় কথাটার অর্থ এ-ই যে, অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই। কাজেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, যাহাদের কাছে আমি "অনুপস্থিত" তাঁহাদের সম্মুখে, "এই নিন্ আমার জন্মতারিখ আর বইয়ের লিষ্ট" বলিয়া আচম্‌কা লাফাইয়া পড়িতে আমি পারি না। লেখা পড়াইয়া সন্তোষবিধান ব্যতীত নিজের খবর আর তথ্য জানাইয়া তাঁদের কৃতার্থ করিবার দায়িত্ব আমার নাই।

নিজের সম্বন্ধে আমি যতই ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফলাইয়া লিখি না কেন কোনো সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেন না ; হয়ত হাসিবেন এবং হাসাহাসি করিবেন। আর, "অনুপস্থিত" লোকের হঠাৎ আসিয়া গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাগাড়ম্বরপূর্বক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা, দায়িত্ব, স্থায়িত্ব, উদ্দেশ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইবে ততোধিক হাস্যের কারণ।

তবে, একেবারেই যে খবর নাই, কিম্বা সব খবরই যে বলিতে আমি অনিচ্ছুক এমন নয়। একটি খবর দিব।

বোলপুর টাউনে গেলাম। কিছুদিন পরেই মাসিকপত্রের মাধ্যমেক্রমে কানাকানি হইয়া গেল যে, আমি একজন লেখক। দু'টি বন্ধু পাইলাম : শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীশান্তিরাম চক্রবর্ত্তী। তৎপূর্বেই ভোলানাথবাবু তাঁর সুপাঠ্য "গোরুর গাড়ী" কাব্য ছাপাইয়াছেন। ঐ দু'টি বন্ধুর মানুষের অন্তরের তত্ত্ব হৃদয়ংগম করার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া এবং তাঁদের রসাল রসিকতায় ভারী মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহারাই একদিন প্রস্তাব করিলেন : গল্পের বই করুন একখানা।

জানাইলাম, প্রকাশক পাইব না।

সেখানেই উপস্থিত ছিলেন সেখানকার কানুবাবু—শ্রীব্রজজনবল্লভ বসু। তিনি জানিতে চাহিলেন : ছাপ্‌তে কত টাকা লাগ্‌তে পারে?

বলিলাম, শ' আড়াই।

—আমি দেব। ছাপুন।

কানুবাবু যথাসময়ে টক্কাটা দিলেন—'বিনোদিনী' গল্পের বই ছাপা হইল।

৩০/৩৫ খানা বই এঁ-কে ওঁ-কে দিলাম; অবশিষ্ট হাজারখানেক বই, আমার আর কানুবাবুর "বিনোদিনী", প্যাকিং-ব্যাক্সের ভিতর রহিয়া গেল; পরে কীটে খাইল।

লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল মানসিক এই গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ' আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।

আমার নিজের সম্বন্ধে আর একটি কথা এ-ই যে, আমি যদি তখন মরি তবে যাঁহারা আমাকে চেনেন তাঁহারা বলিবেন : "বয়েস পেয়েই গেছেন"। জগদীশ গুপ্ত। ৭.২.'৫৭'

'বিনোদিনী' প্রকাশের পরে বাংলা সাহিত্য-জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'তোমার গল্পে নূতন রূপ ও রস দেখিয়া খুসী হইলাম।' অভিনন্দন জানালেন ডক্টর নরেশ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। গল্প লেখার কৈফিয়ৎ লেখক নিজেই দিয়েছেন 'বিনোদিনীর' মুখবন্ধে (রচনাবলীর ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন : 'নয়টি গল্প লইয়া বাহির হইল প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী'...বইখানির আকৃতি সাধারণ গল্পের বইয়ের মতো নয়, এবং গল্পগুলিতে যে রূপ পরিবেশিত হইল তাহাও অভিনব। সাধারণ সুস্থ মানুষের অবচেতনায়ও পাগলামির বীজ লুক্কায়িত থাকিতে পারে। তাহা ঘটনার ও পারিপার্শ্বিকের চাপে কখনো কখনো চেতনার উপরতলাতে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার কর্মচিন্তার উপর বুদ্ধির ব্রেক্ কাজ করে না। এমন মনোবিকৃতির ঘটনা জগদীশচন্দ্রের বিশিষ্ট গল্পগুলির অ-সাধারণ বিশেষত্ব। পরবর্তী গল্পগুলিতেও জগদীশচন্দ্রের শিল্প-দক্ষতা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন আছে।' ('বাংগালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)।

চুন্‌চুন্ সএ হামারে মরী ঐ' নামে জগদীশচন্দ্রের একটি গল্প তৎকালীন 'আত্মশক্তি'তে (?) প্রকাশিত হয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই গল্পটি সম্বন্ধে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেন : 'বিনোদিনী' গল্প গ্রন্থের প্রচ্ছদেও আছে villainous জীবনের হাতে বিপর্যস্ত মানুষের এক ভয়াবহ চিত্র, 'চুন্ চুন্ সএ হামারে মরী ঐ' নামক অদ্ভুত নাম ও বিষয়াশ্রিত গল্প থেকে গৃহীত যার ভাব।...মাতা এবং বধূকে বিস্মৃত হল একদিন শিবপ্রিয় অতিশয় অর্থের লোভে।...নানা দুর্ভোগের পর সর্বস্বান্ত হয়ে

যখন বাড়ি ফিরে এল ভগ্নদেহে, নিত্য ( বধূ ) তখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মিথ্যা কলঙ্কের গ্লানিতে।...অর্ধোম্মাদ হয়েছে শিবপ্রিয় ততদিনে,—ভিক্ষাই জীবিকার একমাত্র আশ্রয়,—তারই ফাঁকে ফাঁকে চেঁচিয়ে ওঠে,—'চুন্ চুন্ সএ হামারে মারী ঐ'— অর্থাৎ 'বেছে বেছে আমার শত্রুকে বিনাশ করে ফেলো'। কেউ তার অর্থ বোঝে না, ভাবে পাগল।' ( 'বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' দ্রষ্টব্য )।

উক্ত গল্পটি নাম বদলিয়ে 'এইবার লোকে ঠিক বলে' নামে 'বিনোদিনীর' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ( রচনাবলীর ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। রচনাবলীতে 'বিনোদিনী' মুদ্রণে একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। রচনাবলীর ৪৩৯ হতে ৪৯৯ পর্যন্ত বিজোড় পৃষ্ঠার শীর্ষে 'বিনোদিনী'-র বদলে 'দিবসের শেষে' মুদ্রিত হয়েছে। এই মুদ্রণ-ত্রুটির জন্য দুঃখিত। 'বিনোদিনী' প্রকাশের পরে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৩৫ সালের সংখ্যায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত হলো :

'এই গ্রন্থে নয়টি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে ডট্ ও ড্যাশের এবং দুই চারি কথার ছোট ছোট প্যারার প্রাচুর্য দেখিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল এই গল্পগুলি বুঝি প্রথম-রিপুমূলক অর্থাৎ "অতি আধুনিক" ধরণের হইবে। কিন্তু পড়িয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল—কোনও গল্পেই লেখক ভদ্রতা ও শালীনতাকে কিছুমাত্র অতিক্রম করেন নাই। অতি-আধুনিক ভাষাপদ্ধতিমাত্র তিনি অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে রচনা অনেক স্থলে জটিল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভঙ্গি করিয়া কথা বলার মোহ তিনি সংবরণ করিলে, সহজ সরল ন্যাকামি-বর্জিত ভাষায় লিখিলে, গল্পগুলি অধিকতর উপাদেয় হইত।

কয়েকটি গল্পের আখ্যানবস্তু বেশ ঘোরালো হইয়াছে। "পয়োমুখম্" গল্পটির আখ্যান-কৌশল, যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখকের যোগ্য। ডট্ ও ড্যাশ এবং স্থানে স্থানে ভাষার বক্রতাকে ছাপাইয়াও, ইহার রস ও সৌন্দর্য পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলে। "পল্লীশ্মশান" চিত্র হিসাবে অনবদ্য। ভাবের দিক দিয়া "দিবসের শেষে" এবং "ভরা সুখে" গল্পদ্বয়ও সুন্দর। কিন্তু বাকী কয়টি গল্প—হংসমধ্যে বকো যথা হইয়া এই পুস্তকে জুড়িয়া বসিয়াছে। হয় আখ্যান-কৌশল, নয় কেন্দ্রগত ভাবটি উচ্চাঙ্গের হওয়া আবশ্যক। যে গল্পে আখ্যান-বস্তু এবং কেন্দ্রগত ভাব উভয়ই তুচ্ছ, তাহা অচল হইয়া দাঁড়ায়।

পুস্তকের প্রারম্ভে "গল্প কেন লিখলাম" কৈফিয়ৎটি, নিতান্ত বালকোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা বাদ দিলেই শোভন হইবে।

গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, কথাসাহিত্যে জগদীশবাবু বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার পূর্বে অতি-আধুনিকদের বিকৃত ও বিরক্তিকর বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণ বর্জন করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন।"

৯। উদয়লেখা। গল্প-সংকলন। ৫০১—৫৯৩ পৃষ্ঠা।

এই গল্পসংকলনটি ১৩৩৯ ( ১৯৩২ সনে ) সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক সত্যেন্দ্রকুমার শীল, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর পক্ষে ৯৭/১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ক্রাউন সাইজ, ৬ + ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। মুখবন্ধে লেখক কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'লঘু-গুরু' সমালোচনার উত্তরে একটি 'নিবেদন' আছে। এইটির তারিখ, বোলপুর, ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৯। এই 'নিবেদনটি' 'লঘু-গুরু' উপন্যাসের তথ্যপঞ্জীতে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই গল্পগ্রন্থে মোট ১০টি গল্প সংকলিত ঃ জগন্নাথের যন্ত্রণা ( ৫০১ পৃ. ), মারে কেষ্ট রাখে কে (৫১০ পৃ. ), রাণী শান্তমণি ( ৫২৩ পৃ. ), ঈশ্বরশানির গ্রহশান্ধি ( ৫৩৯ পৃ ), কামাখ্যার কর্মদোষ ( ৫৪৬ পৃ. ), জ্যাঠা নন্দ ( ৫৫৫ পৃ. ), পেয়িং গেষ্ট ( ৫৬২ পৃ. ), দৈবধন ( ৫৬৯ পৃ. ), ব্যস্তবাগীশ ( ৫৭৯ পৃ. ), এবং অধ্রুবম্ নষ্টমেব হি ( ৫৮২ পৃ. ) ।

উক্ত গল্পগুলির মধ্যে 'পেয়িং গেষ্ট' গল্পটি জগদীশচন্দ্রের সর্ব-প্রথম প্রকাশিত নিজস্ব গল্প। এইটির তথ্যপঞ্জী পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দৈবধন গল্পটি বিখ্যাত 'দি মান্‌কিস্ প্য' ইংরেজী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

জগদীশচন্দ্রের গল্প-সমালোচনা প্রসংগে 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' নামে অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে শুধু 'বিনোদিনীর' গল্পগুলিই আলোচিত হয়নি, বস্তুতঃপক্ষে লেখকের সামগ্রিক সাহিত্য-শৈলীর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। অংশমাত্র উদ্ধৃত করলে সেই আলোচনার সামগ্রিক রূপটি ব্যাহত হবে। সেইজন্য সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

"...আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে, সেটি একেবারে মৌলিক। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ছোট গল্পে যে ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়। তিনি philosophy of sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না। তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এ সবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ-সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূরহৃদয় শয়তান। অন্যান্য আধুনিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করুন, তাহারা জগতে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তি ও জড় অন্ধ শক্তিরই খেলা দেখেন কিন্তু এ জগৎটা যে শয়তানেরই রাজ্য এটাও তাঁহারা বলেন না। তাঁহাদের লেখায় মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ ফুটিয়া উঠে, "নিখিলব্যাপী এই বিরাট মিথ্যাচারের বাহিরে সত্যবস্তু হয়ত বা কোথাও কিছু থাকিতেও পারে।" ( 'দিক্‌ভুল'—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ) কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মধ্যে সেরূপ সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নাই। তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শুধু শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলি রচনা করিতেছেন, তাই সেইগুলি হইয়া উঠিতেছে "রূপে রসে অদ্বিতীয়"।

"বিনোদিনী" জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প-পুস্তক। এই পুস্তকটি বাংলার অতি আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। "বিনোদিনী"তে যতগুলি গল্প আছে তাহার প্রত্যেকটিতে এক একটি সয়তানী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ-জগতের যে নিয়ন্তা সে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না, নানাভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহার আনন্দ, মানুষের মধ্যেও যে সব প্রবৃত্তি আছে তাহা ঐ নিয়ন্তারই অনুরূপ। শিবপ্রিয় মা, স্ত্রী ও তিনটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া পল্লীপ্রান্তে সুখেই ছিল। কিন্তু বিধাতার তাহা সহিল না। একজন সাধু আসিয়া তাহাকে লোভ দেখাইল, সোনা তৈরি করিবার বিদ্যা শিখাইয়া দিবে। সুখের সংসার ছাড়িয়া শিবপ্রিয় সাধুর সহিত চলিয়া গেল, ছয়মাস গাধার মত খাটিয়া সাধুর সেবা করিল, তাহার পর একদিন সাধু তাহাকে ফেলিয়া চম্পট দিল, অসময়ের সম্বল বলিয়া শিবপ্রিয় যে কাঁচা টাকা দশটা আনিয়াছিল তাহাও সাধুর সংগেই অন্তর্হিত হইল। উপবাসে অনিদ্রায় শিবপ্রিয়ের

এমন চেহারা হইয়াছে যে, দেখিলে চেনা যায় না। ছয়মাস পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে শুনিল, তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছিল, সে অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। আরও দুই একটা আঘাত পাইবার পর শিবপ্রিয় পাগল হইয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় সে চিৎকার করিয়া বেড়াইত—"চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ", 'অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রুনিপাত কর'। উন্মাদ শিবপ্রিয়ের ছবিটি 'বিনোদিনী'র প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত হইয়াছে। সব গল্পগুলিই এই ছাঁচে ঢালা। রবীন্দ্রনাথ "পুরাতন ভৃত্য" নামক কবিতায় মানবমহত্ত্বের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র যেন সেইটিকে ব্যঙ্গ করিয়াই তাহার "পুরাতন ভৃত্য" গল্পটি লিখিয়াছেন। মাঠে একটা নামগোত্রহীন লোক পড়িয়া মরিতেছিল, যাজক ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর তাহাকে ঘরে আনিয়া বাঁচাইল। পরে সে ঐ সংসারের অতি বিশ্বাসী ভৃত্য হইল, কর্তা ও গৃহিণীর মত। তারপর একদিন মাঠের মাঝে প্রভুর বুকে ছুরি মারিয়া তাহার টাকাগুলি লইয়া ভৃত্য চম্পট দিল। সদুখাঁ একটি গ্রাম্য কুলবধূর রূপে মুগ্ধ হইয়া কিরূপ প্রতারণার দ্বারা আত্মীয়তা পাতাইয়া তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া তুলিল, "প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী"তে তাহার বর্ণনা আছে। জসিম্ তাহার বৌকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌ নিজেই আর জসিমের কাছে ফিরিয়া আসিতে চাহিল না। "পয়োমুখম্" গল্পটিতে দেখান হইয়াছে, পিতা কেমন পুত্রের বিবাহ দিয়া পণের টাকা লইবার জন্য একটির পর একটি পুত্রবধূকে বিষ দিয়া হত্যা করিতেছে, কিন্তু মুখে তাহাদের প্রতি স্নেহ আদরের কোনও ত্রুটি নাই। "অন্নদার অভিশাপ" গল্পে দেখান হইয়াছে, একজন লোক আত্মসম্মানরক্ষার জন্য চাকুরীতে জবাব দিয়াছিল, ফলে স্ত্রীকে লইয়া দুইটি অন্নের জন্য আত্মীয়ের গৃহে তাহাকে কি লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল, শেষকালে মনের ধিক্কারে স্ত্রীকে লইয়া সে খ্রীষ্টান হইল এবং মিশনারী স্কুলে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরীগ্রহণ করিল। আর একটি গল্পের নাম "ভরা সুখে"। নামটি পড়িয়া ভরসা হইয়াছিল জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ একটিও সুখের সংসার বর্ণনা করিবেন। তা তিনি করিলেন। হরমোহিনীর রত্নগর্ভা সাতটি সন্তান, তার মধ্যে একটি মেয়ে। ছেলেদের মাসিক আয় ছ' হাজারের উপর। মেয়ে, বৌ, ছেলেরা সকলেই মা বলিতে অজ্ঞান। মায়ের আদেশ একটিও লঙ্ঘিত হয় না। এই ত' ভরা সুখ। হরমোহিনী অসুখে পড়িয়াছিলেন, বাঁচিবেন এ আশাই ছিল না, অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন, আজ তিনি অন্নপথ্য করিবেন। ছ'টি ছেলের ছয়ছক ছত্রিশটি ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীর প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপর মা। সেই মা পথ্য করিতেছেন, সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিশে ঠেশ্ দিয়া সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরমোহিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পথ্যের বাটি মুখে ধরা হইল, মা নীরব। গঙ্গাধর মায়ের নাড়ী টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "মা ত' নাই।" পরক্ষণেই মা মা আহ্বানে আর আর্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই "ভরা সুখের" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

শুধু মানুষই যে মানুষের সহিত নির্মম ব্যবহার করে তাহা নহে, জগতে যে সব অদৃশ্য শক্তি রহিয়াছে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়াই তাহাদের আনন্দ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলীধারণ করে—তারপর পেটে আসে পাঁচু। পাঁচু পাঁচ বছরের হইল, তাহাকে অসংখ্য কবচ তাবিজ পরাইয়াও পাঁচুর মায়ের স্বস্তি নাই, কখন কি অমঙ্গল ঘটে। সেই পাঁচু একদিন

সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা আজ আমায় কুমীরে নেবে। এই হ'ল গল্পের আরম্ভ। পাঁচু ভয়ে আড়ষ্ট, পাঁচুর মা বাপ কখনও ভাবে এ সব অসম্ভব কথা ছেলেতে বলিয়াই থাকে, কামদা নদীতে কেহ কখনও কুমীর দেখে নাই, আবার কখনও ভাবে যদি পাঁচুর কথা সত্যসত্যই ফলিয়া যায়। কি সর্বনাশ! প্রতিবেশীরা দু'রকমই বলে। পাঠকের মনও একটা উৎকট আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত দুলিতে থাকে। এ কদিন ছেলেটাকে নদীর ধারে না পাঠালেই কোন আর গোল থাকে না, কিন্তু এমনই ঘটনাচক্র যে "দিবসের শেষে" বাপই ছেলেটিকে নদীর ধারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল এবং সত্যই তাহাকে কুমীরে লইয়া গেল। জগদীশচন্দ্রের ছোট গল্প লিখিবার বাস্তবিকই যে ক্ষমতা আছে এই একটি গল্প পড়িলেই তাহা বুঝা যায়।

কি বলা হইতেছে তাহার হিসাব না করিয়া কেমন করিয়া বলা হইতেছে তাহাই যদি আর্টের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে এই "দিবসের শেষে" গল্পটি একটি নিখুঁত সৃষ্টি, a perfect piece of art। জগৎ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের যাহা অনুভূতি, এই গল্পটিতে তিনি তাহা অতি সুন্দরভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, আর্টের ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ বিচার করিতে হইলে শুধু প্রকাশভঙ্গিটি দেখিলেই চলে না, কি প্রকাশ করা হইতেছে তাহাও দেখিতে হয়। "বিনোদিনী"তে যদি দুই একটি গল্প এরূপ থাকিত তাহা হইলে হয়ত বলিবার কিছুই ছিল না, কারণ সংসারে এরূপ নিয়তির নির্মমতা কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি জগদীশচন্দ্রের সকল গল্পই এই একছাঁচে ঢালা। গ্রামের পাশে কামদা নদী, মায়ের মত স্নেহময়ী, কোনদিন সে নদী কাহারও অনিষ্ট করে নাই, হঠাৎ তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা কুমীর উঠিয়া রতি নাপিতের পাঁচ বছরের ছেলেটাকে লইয়া গেল।—ঠিক এইরকমই সংসারের সর্বত্র শয়তানী শক্তি খেলা করিতেছে, যে-কেন মুহূর্ত্তে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। সে শক্তি শুধুই জড় নহে, প্রকৃতির অন্ধ খেলামাত্র নহে, তাহা সজ্ঞান, সচেতন, তাহা জানিয়া শুনিয়া মানুষের সর্বনাশ করে এবং তাহাতেই আনন্দলাভ করে, তাই আমরা ইহার নাম দিয়াছি শয়তানী শক্তি। জগদীশচন্দ্রের humour (*sic*) বা রসিকতার চেষ্টাতেও কিরূপ শয়তানী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, "দিবসের শেষে"র শেষ অংশটুকু পড়িলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।—কুম্ভীরটি পাঁচুকে লইয়া একেবারে লুকাইয়া গেল না, আর একবার তাহার বাপকে এবং অন্যান্য লোককে দেখাইয়া লইয়া গেল—"যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে নিশ্চল।—···জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুমীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।" শয়তানীর এমন জীবন্ত, মর্মান্তিক চিত্র আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

"বিনোদিনী"র শেষ গল্পটির নাম "তৃষিত-আত্মা", সুস্থ সবল সীতাপতি তামাক খাইতে খাইতে অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মারা গেল! তাহার পর হইতেই সীতাপতির পুত্রবধূ ভয় খাইতে লাগিল। তাহার কোলে তিন মাসের শিশুপুত্র। সীতাপতি এই নাতিটিকে খুব স্নেহ করিত। মরিয়াও সে তাহার মায়া কাটাইতে পারিল না। তাহার তৃষিত প্রেতাত্মা ঐ শিশুটিকে কয়েকদিনের মধ্যেই চুষিয়া মারিয়া ফেলিল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"চোখের উপর শিশু-হনন চলিতেছে, অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই, বাধা দিবার সাধ্য নাই, সান্ত্বনা নাই।"

ইহাই জগদীশচন্দ্রের জগৎ ! এখানে মানুষ, জড়প্রকৃতি, প্রেতাত্মা সকলেই মানুষের মর্ম ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত এবং এই সবের অন্তরালে থাকিয়া একজন নিয়ন্তা—তাহাকে শয়তানই বলা যায়—মানুষের এই মর্মবেদনায় আনন্দলাভ করিতেছে। এই আনন্দের রসকে রূপ দিয়াছেন বলিয়া কি জগদীশচন্দ্র তাঁহার এই বইখানির নাম দিয়াছেন "বিনোদিনী" ?* শুধু "বিনোদিনী" নহে, প্রতিমাসে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই জগদীশচন্দ্রের একটা একটা নূতন গল্প বাহির হইতেছে, সবেরই বিষয়বস্তু এক, শয়তানী। বাপের আদর, মায়ের স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সাধুর ধর্ম, এ-সব শয়তানীরই বিভিন্নপ্রকার ভেদ ! এইভাবে তিমিরান্ধ বাঙ্গালীর চক্ষু-উন্মীলন করিয়া দিতেছেন বলিয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার আর একটি গল্প-পুস্তকের নাম দিয়াছেন "অঞ্জন-শলাকা"। অন্যান্য আধুনিক লেখকদের লেখা পাঠ করিলে মনে হয় মানুষের মধ্যে পশুটা সত্য, জগদীশচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় মানুষের মধ্যে শয়তানটাই একমাত্র সত্য। অন্যান্য রচনাতে এক প্রকারের আনন্দ আছে তাহা যতই নীচের বা পাশবিক হউক ; কিন্তু, জগদীশচন্দ্রের লেখা পাঠ করিলে প্রাণের রস শুকাইয়া যায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, আতঙ্কে মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। অতএব, শুধু সত্যের দিক হইতে বা নীতির দিক হইতে নহে, রসের দিক হইতেও জগদীশচন্দ্রের লেখা সৎ-সাহিত্যের মধ্যে কেমন করিয়া স্থান পায় তাহা আমরা বুঝি না। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ অশ্লীলতাকে কাব্যের দোষ বলিয়াছেন। যে কথা শুনিয়া মনে লজ্জা, ঘৃণা অথচ অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয় সেই বাক্যই অশ্লীল—ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী। অশ্লীলতা দোষের, কেননা তাহা কাব্যের রস নষ্ট করে, 'কারণ, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়, একটি বদ্ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়।" জগদীশচন্দ্রের আগাগোড়াই বদ্ সুর, বদ্ রস। আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু শয়তানী আছে, তাই "শনিবারের চিঠি" পড়িতে আমাদের বেশ লাগে। "বিনোদিনী"তে আমরা রূপরসের সন্ধান পাই। কিন্তু, আমাদের মধ্যের এই শয়তানী ভাবটা দূর করা, আমাদের রুচিকে উন্নত ও মার্জিত করাই সৎ-সাহিত্যের কার্য নহে কি ?

জীবনে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, শয়তানীও আছে, সে-সব বর্ণনা করলেই যে কাব্যের রসভঙ্গ হয় তাহা নহে। পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন "Our sweet songs are those that tell of saddest thought।" শরৎচন্দ্র যে-সব বেদনার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিই জাগিয়া উঠে, ঘৃণা বা আতঙ্ক নহে, তাই রসভঙ্গ হয় না। Shakespeareএর Tragedyগুলি রূপে রসে তাহার Comedy গুলির অনেক উপরে। যে-সকল Tragedy জগতের রস-সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইয়াছে সেগুলিতে দুঃখ দৈন্যের চিত্র এমনভাবে দেওয়া হইয়াছে—যেন মানুষের প্রতি সমবেদনার উদ্রেক হয়, জীবনে নূতন interest বা রস জন্মায়, মানুষের সুপ্ত শক্তি-সকল জাগিয়া উঠে, বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষ পরাজিত হইলেও সেই সংঘর্ষ ও সংগ্রামই উৎসাহের সৃষ্টি করে, যে-সকল ভুলের জন্য মানুষের শোচনীয় পরিণাম হয় Tragedyতে তাহার চিত্র দেখিয়া মানুষ সে-সবের প্রতি অবহিত হইতে শিখে, নম্রতা শিখে, সহিষ্ণুতা শিখে, এই ভাবে Tragedy'র দ্বারা ভাবশুদ্ধি হয়। তাহা ছাড়া সকল দেশের সকল Tragedyর পিছনেই একটা moral order আছে, নৈতিক

*কামদা, শিবপ্রিয়, ভয়াসুখে প্রভৃতি নামগুলির ভিতরেও সংসারের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নিয়মের শৃঙ্খলা আছে, তাই সে চিত্র দেখিয়া মানুষ অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে না। Shakespeare-এর Tragedyগুলিতে দেখা যায়, কোথাও বড় রকমের কোন অন্যায়, অত্যাচার, পাপ সংঘটিত হইলে সংসার তাহা বরদাস্ত করে না, চতুর্দিকে একটা বিষম উপদ্রবের সৃষ্টি হয় এবং সেই পাপের কারণকে সংহার না করিয়া সে উপদ্রব শান্ত হয় না। কিন্তু, ঐ উপদ্রব শুধু পাপীকে, দোষীকেই সংহার করে না, সেই সঙ্গে নির্দোষী, নিরপরাধীও সাজা পায়, এইটাই Shakespeare-এর Tragedyর নিগূঢ় রহস্য। ঠিক যেমন একটা বিস্ফোটকে অস্ত্র করিলে শুধু বিষাক্ত পুঁয্ রক্তই বাহির হয় না, তাহার সহিত কতকটা তাজা রক্তও বাহির হইয়া যায়। যাহাই হউক, জগতে যে মূল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা যে এইরূপ নির্মমভাবে পাপকে, অন্যায়কে, অত্যাচারকে নির্মূল করিতে করিতে চলিয়াছে, ইহা দেখিলে প্রাণে আশারই সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সাহিত্যেও দেখা যায়, লোকে আপন আপন কর্মের ফলেই দুঃখভোগ করে, আবার ধর্মের দ্বারাই তাহা হইতে মুক্ত হয়। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ moral order বা নৈতিক নিয়মের কোনও বালাই নাই, সেখানে মানুষ শুধু শয়তানের তৃপ্তির জন্যই কষ্ট পাইতেছে।

আমাদের প্রাচীনেরা সংসারকে অসারই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংসারের সাধারণ জীবন ছাড়াইয়া যে এক দিব্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায় তাহার সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছিলেন, অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। সংসারের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন এইসকল হইতে মুক্তির পথ সন্ধান করে তখনই দুঃখ সার্থক হয়, এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে সংসারের দুঃখ আলোচনা করিবার উপদেশ আছে, জন্ম মৃত্যু জরা—ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারকে শয়তানের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা নয়, পরন্তু এই সকল দুঃখকে অতিক্রম করিবার প্রযত্ন করা। জগদীশচন্দ্র সংসারের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। বাস্তবিকই জগতে অসুর, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি অদৃশ্য শক্তি রহিয়াছে, মানুষকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু, তাহারাই জগতের চরম নিয়ন্তা নহে, জগতে যেমন অসুর আছে, পিশাচ আছে, রাক্ষস আছে, তেমনি দেবতাও আছে এবং সকলের উপরে আছেন ভগবান। মানুষকে লইয়া, জগৎকে লইয়া দেবতা ও শয়তানে সংগ্রাম চলিতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এই সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত দেবতারই জয় হইবে, এই সংসারে ধর্মরাজ্য, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে তাঁহাদের বাণী শুনিয়াই এই দুঃখময় সংসারে মানুষ সাহস পায়, আশা পায়, শক্তি পায়।

প্রাচীন গ্রীস্‌দেশীয় tragedyতে নিয়তির ( Doom, Necessity, Hate ) খেলা বর্ণিত হইয়াছে, জগদীশচন্দ্রের শয়তানী শক্তির সহিত তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অদৃষ্ট বা নিয়তি যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমণ করিবে। সে-শক্তি মানুষের ভোগের, সুখের উন্নতির শত্রু। তাই পদে পদে মানুষকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে, যতক্ষণ মানুষের পুরুষাকারের শক্তি থাকে ততক্ষণ সে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু, সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করে এবং একটু ভুল, ভ্রান্তি দুর্বলতার সুযোগ পাইলেই মনুষ্যের উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু, নিয়তিও খামখেয়ালী নহে, কারণ মানুষ যতক্ষণ না অতি বাড় বাড়িতে চায় ততক্ষণ নিয়তি তাহার পিছনে লাগে না, এই নিয়তি যেন বলে, "যদি তুমি বাড়িতে যাও তাহা হইলে

সেইরূপ শক্তি অর্জন করা চাই, নতুবা ফাঁকি দিয়া বড় হইতে পাইবে না।" এইজন্যই সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যবহার করা গ্রীস্‌দেশীয় আদর্শ, "moderation in all things is the great part of virtue"। অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে একটা moal order, নিয়মের রাজ্য। মানুষ নিজের কর্মফলেই নিজের উপর নিয়তির নির্মম আঘাত ডাকিয়া আনে। কিন্তু, জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। রতি নাপিতের পাঁচ বছরের ছেলেটাকে কুমীরে লইয়া গেল। সীতাপাতি প্রেত হইয়া তিন মাসের শিশুকে শুষিয়া মারিয়া ফেলিল, আত্মীয়ের মৃতদেহ সৎকার হইল না, নদীর জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে দেহ ভাসিয়া উঠিয়া নদীর দুই তীরে এত স্থান থাকিতে তাহাদেরই ঘাটে আসিয়া লাগিল, পরম আত্মীয়ের চোখের সম্মুখে শিয়াল কুকুরে কাকে শকুনে ঝাপ্‌টা-ঝাপ্টি কাড়াকাড়ি করিয়া সেই দেহ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল—এ সব লইয়াই জগদীশচন্দ্রের রূপ ও রসের সৃষ্টি!

এ-হেন "বিনোদিনী" সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যরথীগণ কি মত প্রকাশ করিতেছেন তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে দুঃখবাদ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে কত গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বিনোদিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ছোট গল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।" কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন—"রূপে রসে অদ্বিতীয়।" কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"গল্প-সাহিত্যে বিনোদিনীর স্থান বহু ঊর্ধ্বে।" কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন "অতি সুন্দর।" ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন—"এমনটি আর নাই।"

আমাদের দেশের পতিত, লাঞ্ছিত অবস্থাই যে আমাদের সাহিত্যকে এরূপ গভীর দুঃখবাদে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, সাহিত্য জাতির মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু, আবার সেই মনোভাবকে পরিবর্তিত করা, জাতিকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করাইয়া দেওয়াও সাহিত্যের কাজ, কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা, সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্—(রাজশেখর)। কবিকে যে সাক্ষাৎভাবে সমাজসংস্কারক বা দেশোদ্ধারক হইতে হইবে তাহা নহে, কবি রূপ রসেরই সৃষ্টি করিবেন এবং তাহার দ্বারাই মানুষের ভাব শুদ্ধ হইবে, হৃদয় উন্নত হইবে, জীবনে নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে। কিন্তু, কেবল জাতির, সমাজের, মানুষের দোষগুলি, দৈন্যগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখাইলে জাতিকে উঠিতে সহায়তা করা হয় না, নীচের দিকেই ঠেলিয়া দেওয়া হয়। সত্য, শিব, সুন্দর—কোনও আদর্শ অনুসারেই এরূপ মক্ষিকাবৃত্তি-সাহিত্যকে সমর্থন করা যায় না।

বহুদিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের আসিয়াছে একটা Inferiority complex, জাতি হিসাবে, মানুষ হিসাবে আমরা নেহাৎ ছোট, নেহাৎ নীচ, অক্ষম, এই ভাব। তাই দেখিতে পাই আমাদের কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাজনীতিক, কি সমালোচক, সকলেই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, "ভূতলে বাঙালী অধম জাতি।"

১০। সংকলন। ৫৯৫ পৃষ্ঠা।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের বহুতর রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে—কোনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সেই সকল রচনা ও তাঁর চিঠিপত্র ও অন্যান্য তথ্যের সংকলন এই বিভাগে সংযোজিত হবে।

রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত রচনা এবং পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হলো—

১। স্মৃতির বাঁধন। ( নাটিকা )।

এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ( শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) প্রকাশিত হয়।

২। অদ্ভুত জীব। কবিতা।

জগদীশচন্দ্রের দপ্তরে একটি পত্রিকার কাটিং-এ এই কবিতাটি পাওয়া যায়। শ্রীচারুবালা দেবীর পত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দৃষ্টান্ত থেকে আন্দাজ করা যায় যে, এই কবিতাটি জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বোধ হয় বসুমতীতে মুদ্রিত হয়।

৩। পত্রগুচ্ছ।

'কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখিত তেত্রিশখানি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। এই পত্রাবলী জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের উপরে বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করবে।

* * *

বলা বাহুল্য, জগদীশচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতে বিলম্ব হওয়াতেই এই রচনাবলী প্রকাশে বিলম্ব হলো। বানান সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সংযোজিত রচনার মূল যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। এই রচনাবলী-প্রকাশ সম্ভব হয়েছে অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরীর সক্রিয় আনুকূল্যে। তাঁর কাছে সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাই। তথ্যপঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথ ও বিশিষ্ট সমালোচকগণের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সময়াভাবে হয়তো তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানানো সম্ভব হয়নি। যথাস্থানে তাঁদের নাম এবং সমালোচনার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী এবং বিদগ্ধ সমালোচকগণের নিকট আমার ঋণস্বীকার করছি এবং সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এইসঙ্গে বন্ধুবর অধ্যাপক ডক্টর সরোজমোহন মিত্রের সহযোগিতা স্মরণ করি। অনুজোপম সহযোগী শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিশ্রম ও সক্রিয় সহযোগ ব্যতীত এই রচনাবলী প্রকাশ সম্ভব হতো না। তাকে আমার সস্নেহ প্রীতি ও ভালোবাসা জানাই। মুদ্রক শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঁইঞা ও সহকর্মী শ্রীদুলালচন্দ্র পর্বতের অক্লান্ত পরিশ্রম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ত্রুটি অনেকই রয়ে গেছে, সেইজন্য পাঠকজনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী—